সাহিত্য-অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব

মনোজ বসু

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৬০

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

নিশিকুটুম্ব

(প্রথম পর্ব)

আমার পিতৃদেব
রামলাল বসুর
পুণ্যস্মৃতিতে

এত শৈশবে তাঁকে হারিয়েছি যে চেহারাই মনে করতে পারিনে।
তাঁর পদ্য ও গদ্য রচনার মধ্যেই পিতৃসান্নিধ্য পেয়েছি।

প্রথম পর্ব

এক

গায়ের উপর মৃদু স্পর্শ। বাহুর উপর, বাহু থেকে গলায়, তারপর কোমরের দিকটায়। জানি গো জানি—তোমার হাতের আঙুল। চঞ্চল আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে সরীসৃপের মতন।

ঘুমের মধ্যে আশালতার মুখে হাসি খেলে যায়। সর্বাঙ্গ শিরশির করে। ঝিমিয়ে আসে আরও যেন চেতনা। হাত একটা বাড়িয়ে দেয় পুরুষের দিকে, কাছে টেনে আনে। একেবারে কাছে। হবে এই রকম, সাহেব তা জানে। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে।

নাম হল গণেশ, সাহেব-সাহেব করে সকলে। আরও পরে অঞ্চলময় এই নাম ছড়িয়ে গিয়েছিল, সকলের আতঙ্ক—সাহেব-চোর।

হাতের বেষ্টনে আশালতা কঠিন করে বেঁধেছে। যুবতী মেয়ের দেহের মধ্যে নিঃসাড় হয়ে আছে সাহেব। মেয়েমানুষের কোমল অঙ্গের উষ্ণ স্পর্শ নয়—কাঠ একটুকরো। অথবা খুব বেশি তো তুলোর পাশবালিশ একটা। এ-ও নিয়ম। নিঃসাড় হয়ে খানিক পড়ে থেকে ভাব বুঝে নেবে। তারপরে কাজ।

ঘর অন্ধকার। যত অন্ধকার, তত এরা ভাল দেখে; চোখ জ্বলে মেনি বিড়ালের মতো, সময়বিশেষে বন্য বাঘের মতো। মেয়েটা কালো কি ফর্সা ধরা যায় না, কিন্তু ভরভরন্ত যৌবন। নিশিরাত্রে বিশাল খাটের গদির বিছানায় যৌবনের যেন ঢেউ দিয়েছে, দেহ ছাপিয়ে যৌবন উছলে পড়ে যায়। কিন্তু এ-সবে গরজ নেই কিছু। কোমরের সোনার চন্দ্রহার বেরিয়ে পড়ে চিকচিক করছে। গলায়, যতটা দেখা যায়, দু-রকম—একালের নেকলেশ, সেকালের কণ্ঠমালা। বেশিও থাকতে পারে। হাতে কঙ্কণ, বাহুতে অনন্ত, কানে কানপাশা। হাত বুলিয়ে দেখে নিয়েছে সাহেব, হাতের স্পর্শে ওজনেরও মোটামুটি আন্দাজ পেয়েছে। দিব্যি ভারীসারি জিনিস। হবেই—নবগ্রামের সেন-বাড়ির বউ যে। সেনেরা পুরানো গৃহস্থ, টাকাকড়ির বড় দেমাক। সেই বাড়ির শঙ্করানন্দ সেনের সঙ্গে আশালতার বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। খুঁজিয়াল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করেছে, অতিশয় পাকা লোক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তার খবরে ভুল থাকে না।

দোজপক্ষের বর শঙ্করানন্দ—বিয়ের আগে বুড়ো বর বলে ভাংচি পড়েছিল। কন্যাপক্ষের জ্ঞাতিগোষ্ঠি ও আত্মীয়-স্বজনরা দোমনা হলেন, শুভকর্মে টালবাহানা হল খানিকটা। কিন্তু মিথ্যা রটনা, দুটো-পাঁচটার বেশি বরের মাথায় চুল পাকে নি। হিংসা করে লোকে বুড়ো-বুড়ো করছিল। বিয়ের পরে এবার সেনরা তার শোধ তুললেন। নতুন বউকে আগাগোড়া সোনায় মোড়ক করে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছেন। মেয়ের সুখ দেখুক সেই হিংসুকেরা, দেখে জ্বলে-পুড়ে মরুক।

হয়েছে ঠিক তাই। আশালতা বাপের বাড়ি পা দিতে খবর হয়ে গেল। বউ-মেয়েরা ভেঙে এসে পড়ে। তাকে দেখতে নয়—পাড়ার মেয়ে চিরকালই দেখে আসছে, নতুন করে কি দেখবে আবার। দেখছে গয়না। হাতের গয়না, কানের গয়না, সিঁথির গয়না, খোঁপার গয়না, গলার গয়না, কোমরের গয়না, পায়ের গয়না—দেখে সব হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নিজে দেখে, অন্যকে দেখায়। মুখ সিঁটকায়: ওমা সেকেলে প্যাটার্ন, ঠাকুরমা-দিদিমারা পরতেন, আজকাল কেউ পরে না এ জিনিস। আবার তারিফও করছে: সে যাই হোক, মালে আছে কিন্তু। আজকালকার ফঙ্গবেনে জিনিস নয়।

বলছে হেসে হেসে বটে, মনের মধ্যে বিষের জ্বালা। মেয়েটা সেদিন সাদামাটা অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি গেল, আজ দুপুরে রাজরাজেশ্বরী হয়ে ফিরেছে, দেখ। সারা বিকেল পাড়াসুদ্ধ আনাগোনা, রাত্রি হয়ে গেল তখন অবধি চলছে। এরই মধ্যে এক গণকঠাকুর এসে গেছেন বাড়িতে—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। অতি মহাশয় ব্যক্তি তিনি। এই তল্লাটে ঘুরছেন ক'দিন। আজ সকালে গাঁয়ের ঘাটে এসেছেন। আশালতার হাত দেখে আশীর্বাদ করে গেছেন: বৃহস্পতি তুঙ্গী, সুখ-সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না তোমার মা, কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রী বৃহস্পতি। আশীর্বাদ করে যথারীতি প্রণামী নিয়ে গেছেন। তাঁর যা করণীয়, সন্ধ্যার আগে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

রাত-দুপুরে এইবার সাহেবদের কাজ। ডেপুটি অপেক্ষা করছে বাইরে বাঁশবাগানের অন্ধকারে। আরও দূরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সতর্ক পাহারাদার। আজ রাত্রের কাজখানার কারিগর সাহেব। কিন্তু খাটের উপরে আশালতার কঠিন বন্ধনে সে বাঁধা পড়ে আছে। তবু তো দেখেনি মেয়েটা কী রূপ ধরে এই পুরুষ! ফর্সা ধবধবে দেহবর্ণের জন্য নাম হয়ে গেল সাহেব। সাহেব একেবারে মড়া হয়ে পড়ে আছে—নিশ্বাসটাও পড়ে কি না পড়ে। অজগর সাপে পেঁচিয়ে ধরেছে যেন। অজগরের কবল থেকে এমনি কায়দায় বাঁচতে হয়—জোরজারি করতে গেলে উল্টো ফল। ছোবল দেয়।

সত্যি সত্যি ঘটেছিল তাই এক নিশিরাত্রে। সাহেব সোলমাছ ধরতে গিয়েছিল কুঠির দীঘিতে। ফুলহাটা গাঁয়ে সেকালের নীলকর সাহেবদের শৈবালাচ্ছন্ন বিশাল দীঘি। ছিপে বেঙ গেঁথে পাড়ের জঙ্গলের ভিতর দাঁড়িয়ে সাহেব জলের উপর নাচাচ্ছে। পায়ের উপর এমনি সময় ঠাণ্ডা স্পর্শ। এই জঙ্গলে জাত গোখরো কালাজ কেউটে কত যে আছে, সীমাসংখ্যা নেই। তাদেরই একটি নিঃসন্দেহে। সাহেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, একবিন্দু নড়াচড়া করে না। দুখানা পায়ের পাতার উপর দিয়ে সাপ ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে গেল গাছের শিকড় বা অমনি একটা কিছু ভেবে। চলে গেছে, তখনও সাহেব অচল অনড়। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জায়গা থেকে সরে এল। আজকেও অবিকল তাই।

উঁহু তার বেশি। সাপের চেয়ে যুবতী মেয়েমানুষের কবল বেশি শক্ত। শুধু চুপচাপ থেকে হবে না, আলতো ভাবে আঙুল বুলাতে হবে গায়ে—আদর-সোহাগ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে পাঁচটা আঙুলের ডগা বেয়ে। এবং মুখে নিদালি-বিড়ি—প্রয়োজন মতো ধোঁয়া ছাড়বে। চুপিসারে এরই মধ্যে কাজ চলেছে। শিকার বল কিম্বা মক্কেল বল সে মেয়ে ব্যাপার কিছু বুঝতে পারে না —নিজেকে এলিয়ে দিয়ে আরও সুবিধা করে দিচ্ছে কাজের! জোঁকে ধরলে যেমন হয়—দু-মুখ দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে, সে কি টের পাও? সুড়সুড় করছে ক্ষতস্থানে, আরাম লাগছে। হাত দুটো জোঁকের দুই মুখের মতন হতে হবে, ওস্তাদ বলে দিয়েছে।

দুটো হাতই ব্যস্ত এখন সাহেবের। বাঁ-হাতটা আদর বুলাচ্ছে, ডান হাতের ক্ষিপ্র আঙুলগুলো ইতিমধ্যে নেকলেশ, চন্দ্রহার, কঙ্কণ একটা একটা করে খুলে সরিয়ে নিল। গা খালি হয়ে গেল—কিছুই টের পায় না মেয়ে, আবেশে চোখ বুজে আছে। হাতের এমনিধারা মিহি কাজ। শুধু সাহেবই পারে, আর পারতেন বোধহয় সেকালের মুরুব্বিদের কেউ কেউ। আজকাল ওসব নেই, কষ্ট করে কেউ কিছু শিখতে চায় না! নজর খাটো—সামনের মাথায় ক্ষুদকুড়ো যা পেল কুড়িয়েবাড়িয়ে অবসর। কাজেরও তাই ইজ্জত থাকে না—বলে, চুরি-ছ্যাচড়ামি। সেকালে ছিল—চোর মানেই চতুর, চুরি হল চাতুরী।

চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা—বড় নাম এমনি হয় নি। অতিশয় কঠিন বিদ্যা। এ লাইনে দিকপাল হতে হলে ওস্তাদের কাছে রীতিমত পাঠ নিতে হত। পরীক্ষা দিতে হত। সাদা কাগজে খানিকটা কালির আঁকজোক কেটে বি-এ এম-এ-র মতো পরীক্ষা নয়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটা—পরীক্ষায় পাশ করে তবে তার 'বাইটা' খেতাব। সে যে কী ভীষণ পরীক্ষা—কিন্তু থাক এখন, ওস্তাদের

মুখেই শোনা যাবে যথাসময়ে। এবং সাহেবকে কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হল ঐ বাইটা মশায়ের কাছে—। আসবে সে কথা পরে, সময়ে বলব।

সাহেব নিঃসাড়ে পড়ে আছে। কাজ চুকেছে, তবু নড়াচড়ার জো নেই। সেই মাছ ধরতে গিয়ে সাপ পায়ে ওঠার অবস্থা। যতক্ষণ না যুবতী নিজের ইচ্ছায় বাহুর বাঁধন খুলে দিচ্ছে, ততক্ষণ পড়ে থাকবে এমনি। হল তাই একসময়—হতেই হবে—হাত সরিয়ে নিয়ে আশালতা নড়েচড়ে ভাল হয়ে শুল। স্বড়ুত করে সাহেব উঠে পড়ে তখনি। দুয়োরের খিল খুলে রেখে দিয়েছে, টিপিটিপি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধীরেসুস্থে সমস্ত, তড়িঘড়ির কিছু নয়। বেরিয়ে পড়ে এক লহমার মধ্যে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়।

যুবতী আবেশে বিহ্বল। অনেকক্ষণ সাড়া না পেয়ে কথা ফুটল এইবার। ফিসফিসিয়ে বলে, ঘুমুলে? চোখ মেলল। ধ্বক করে অমনি মনে পড়ে যায়, শ্বশুরবাড়ির কথা—এ যে বাপের বাড়ি। একে একে সমস্ত মনে পড়ে: নবগ্রাম থেকে আজ দুপুরে বাপের বাড়ি জুড়নপুর চলে এসেছে। শঙ্করানন্দ তাকে জুড়নপুরের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে সেই পানসিতে খুলনা সদর চলে গেল সম্পত্তিঘটিত জরুরি মামলা সেখানে। কাল নিশিরাত্রে কথা কাটাকাটি এই নিয়ে। আশালতা বলেছিল, যেও না, অসুখ হয়েছে বলে মামলার সময় নাও শেষটা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়ল, বর অশেষ রকমে চেষ্টা করেও সে মান ভাঙ্গাতে পারে নি। তার পরে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর কিছু সে জানে না। সকালবেলা চক্ষু মুছে উঠেই রওনা হবার তোড়জোড়। শঙ্করানন্দ বলে গেছে, বাড়ি ফেরবার মুখে শ্বশুরবাড়ির ঘাটে নামবে একবার, নেমে একটা দিন অন্তত থেকে দেখেশুনে যাবে। তার এখনো ছ-সাত দিন দেরি। আর কয়েকটা দিনের অভ্যাসে আশালতা কিনা আজ রাত্রেই ভিন্ন এক পুরুষকে সেই মানুষ ভেবে—ছি-ছি-ছি!

ছি-ছি করে জিভ কাটে। সত্যি সত্যি ঘটেছে, অথবা ঘুমের ভিতর আজব স্বপ্ন একটা? উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি আশালতা আলো জ্বালে। দক্ষিণের পোতার ঘরে ছোটবোন শান্তিলতাকে নিয়ে শুয়েছে। বড় খাটের শেষ প্রান্তে দেয়াল ঘেঁসে শান্তি ঘুমুচ্ছে বিভোর হয়ে—এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিছু জানে না; খোলা দরজা হাঁ-হাঁ করছে! কেমন একটা গন্ধ গন্ধ ঘরের মধ্যে—অতি মধুর। আর দেখে, জানালার ঠিক নিচে সিঁধ।

চোর, চোর! চোর এসেছে—

আচমকা চেঁচামেচিতে শান্তিলতা ধড়মড়িয়ে উঠে দিদিকে জড়িয়ে ধরে।

থরথর কাঁপছে বুক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। বাড়িসুদ্ধ তোলপাড়। বড়ভাই মধুসূদন লাফ দিয়ে উঠানের উপর পড়ল। ভাজ ছুটে এসে তার হাত এঁটে ধরে। চার বছরের ছেলেটাও দেখি ঘুম ভেঙে দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছে। মধুসূদনের মা গিয়ে তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলেন। চাকর-মাহিন্দারেরা বাইরে-বাড়ি থেকে ছুটে এল। কর্তামশায়ের ওঠার অবস্থা নেই, পুবের ঘর থেকে তুমুল চিৎকার করছেন তিনি।

কোন দিকে গেল চোর ? কতক্ষণ পালাল ? দাঁড়িয়ে কী গুলতানি হচ্ছে, বাইরে গিয়ে দেখ সব। নিয়েছে নাকি কিছু ? কি কি নিল ?

এইবারে আশালতার খেয়াল হচ্ছে, কোমরের চন্দ্রহারটা নেই। পুরানো ভারী জিনিস, অনেক সোনা—বুড়ি দিদিশাশুড়ী এই দিয়ে নতুন বউয়ের মুখ দেখেছিলেন। গলার নেকলেশটাও নেই যে! একটা হাতের কঙ্কণ নেই। এ দুটো শঙ্করানন্দের আগের স্ত্রীর গয়না। ডান-হাত চেপে কাত হয়ে ছিল, একটা কঙ্কণ তাই রক্ষে পেয়েছে।

মধুসূদন ওদিকে হাত ছাড়াবার জন্য ঝুলোঝুলি। বউয়ের উপর তড়পাচ্ছে : ছাড়ো বলছি। অপমানের একশেষ। বলি, বাড়িটা আমাদের না চোরের ? যেখানে থাকুক টুঁটি চেপে ধরব। আকাশে উঠুক আর সাগরে ডুবে থাক, আমার কাছে পার পাবে না।

বউ প্রাণপণে ধরে থাকে। মুখের কথাই শুধু নয়, মানুষটা সেই রকমের বটে। রোগা দেহ, বলশক্তিও তেমন নেই, কিন্তু দুনিয়ার উপর কিছুই পরোয়া করে না। কপালখানা জুড়ে কাটা দাগ—সে চিহ্ন কোনদিন মুছবার নয়, একবরের গোয়ার্তুমির পরিণাম। হাড়মাংস কেটে ইঞ্চিখানেক ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, যমে-মানুষে টানাটানি করে বাঁচিয়েছে, কিন্তু শিক্ষা হয় নি কিছুমাত্র। ছাড়া পেলেই ধনুক থেকে ছোঁড়া তীরের মতো অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বউ বোঝাচ্ছে : একজন দু-জন নয় ওরা দল বেঁধে আসে। তলোয়ার-ছোরা সঙ্গে রাখে। সেবারে মাথা ফাটিয়েছিল, গলা কেটে নেবে কোন দিন।

মধুসূদন গর্জে ওঠে : নিক তাই। অসতের সঙ্গে লড়ে প্রাণ যাবে তো যাক। সে মরণে পুণ্যি আছে।

বউ রেগে উঠে ব্যঙ্গের সুরে বলে, কাজকর্ম না থাকলে বড় বড় বচন আসে অমনি। মাথার উপরে সব রয়েছেন, সংসারের কুটোগাছটি ভাঙতে হয় না তো!

আশালতা হাপুসনয়নে কাঁদছে। গয়নার শোক বড় শোক মেয়েদের কাছে। অঙ্গ একখানা কেটে নাও, খুব বেশি আপত্তি নেই। কিন্তু সেই অঙ্গের গয়নাখানা

অতি-অবশ্য খুলে রেখে যেও। মা বকছেন: একটা একটা করে এতগুলো জিনিস গা থেকে খুলল, টের পেলি নে তুই। ঘুমুচ্ছিলি না মরে ছিলি?

কেমন করে খুলে খুলে নিয়েছে সে তো মরে গেলেও বলা যাবে না। যা মনে আসে মায়ের কাছে সেই রকম বলে যাচ্ছে: কঙ্কণে টান পড়তেই তো ধড়মড়িয়ে উঠলাম মা। কে-কে—করছি, ছুড়দাড় করে পালিয়ে গেল। যদি টের না পেতাম, গয়নার একখানাও থাকত নাকি?

গয়নার দুঃখ আছে—কিন্তু তার চেয়ে বড় দুঃখ, মেয়েমানুষের জীবনে সকলের বড় যে গয়না অচেনা পুরুষ এসে তার খানিক তছনছ করে দিয়ে গেল। খানিকটা তো বটেই। আশালতা তাই হতে দিয়েছে, নিজেই যেচে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়েছে। সেই বুক-ফেটে চৌচির হবে, কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটবে না কারও কাছে।

চোরের নামে পাড়াপ্রতিবেশী এসে জুটছে। সিঁধের দিকে উকিঝুকি দিচ্ছে কেউ কেউ। বড় বাহারের সিঁধ গো! দেখ, দেখ—জানলার গবরাটের নিচে মাটির দেয়াল আধখানা চাঁদের মতো কেটেছে। কেটেছে যেন কম্পাস ধরে, একচুলের এদিক-ওদিক নেই। হাত কত চোস্ত হলে তাড়াতাড়ির মধ্যে এমন নিখুঁত গর্ত হয়।

কাজের প্রশংসা সাহেব কানে শুনছে না—কিন্তু জগবন্ধু বলাধিকারীর গল্পের সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারী, হেন শাস্ত্র নেই যা তাঁর অজানা। সাহেব তাঁর বড় অনুরক্ত। মৃচ্ছকটিক নাটকের গল্প। ব্রাহ্মণ-ঘরের ছেলে শর্বিলক এদিকে চতুর্বেদ-বিশারাদ, আবার চোরও তেমনি পাকা। চারুদত্তের বাড়ি সিঁধ কেটে গয়না নিয়ে গেছে। গচ্ছিত-রাখা গয়না সমস্ত—কি নিয়ে গেছে, ক্ষতির বিবেচনা পরে। চারুদত্ত মুগ্ধ হয়ে সিঁধ দেখছে—সত্যিকার শিল্পকর্ম একটি। সাহেবেরও তেমনি কতকটা—হাতের কাজের তুলনা নেই। জাত-কারিগরের কাজ।

পাড়ার এক গিন্নি করকর করে ওঠেন: কেমনধারা আক্কেল তোমার আশার মা! সোমত্ত মেয়ে তার এক-গা গয়না—কি কি নিয়ে গেল শুনি; সেই চন্দ্রহার, বল কি, অনেক দামের জিনিস গো, বিস্তর সোনা—

বিকালবেলা ইনিই কিন্তু অন্যকে চোখ টিপে বলেছিলেন, সোনা না কচু। গিল্টি। কাপড়ের নিচে কোমরে পরবে, কেউ চোখে দেখবে না, সোনা কেন দিতে যাবে? সোনায় গিনি গেঁথে তার চেয়ে সিন্দুকে রাখবে। বলেছিলেন এমনি সব। সেই চন্দ্রহার চুরি যাওয়ায় মনে মনে আরাম পাচ্ছেন! বলছেন আক্কেল বলিহারি! সোমত্ত মেয়েটাকে ঐটুকু এক গুঁড়ো মেয়ের জিম্মেয় আলাদা

করে দিয়েছ। তবু ভাল যে শুধু গয়নার উপর দিয়েই গেছে—

অপ্রতিভ হয়ে মা বলছেন, বললাম তো আমি শুই তোর সঙ্গে, শান্তিলতা বাপের কাছে থাকুক। মেয়ে আড় হয়ে পড়ল, ঠেলে পাঠিয়ে দিল পুবের ঘরে। আজকালকার মেয়ে কারও কি কথা শোনে !

আশালতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। রাত্তিরবেলা কখন কি দরকার হয়—

মধুসূদনের বউ বলে, আমিও তো বলেছিলাম ভাই—

তার কথার আশালতা জবাব দেয় না। বলেছিল বউ সত্যিই, কিন্তু আশালতাই প্রাণ ধরে সেটা হতে দেয় নি। বর নিয়ে শোওয়ার স্বাদ পেয়ে এসেছে, মন চায় নি ওদের স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করতে। তাছাড়া একটা-দুটো রাতের ব্যাপার নয়, চৈত্র মাস সামনে—সেই মাসটা পুরো থাকবে সে বাপের বাড়ি। দাদা-বউদি ততদিন আলাদা শোবে—নিজের হলে ঠেকবে কেমন ? এই তো, একটা রাতের বিচ্ছেদেই কী কেলেঙ্কারি ঘটে গেল।

যত ভাবছে, ভয়ে লজ্জায় তত কাঁটা হয়ে যায়। গয়না চুরি নিয়ে শ্বশুর-বাড়ির ওরা কি বলবে ? এত সাজিয়ে বউ পাঠাল, কী বেশে গিয়ে দাঁড়াবে আবার সেখানে ! বলতেও পারে, বাপ-ভাই গয়না বেচে দিয়ে চুরির রটনা করেছে। মুখে না বলুক, মনে মনে ভাববে হয়তো তাই। সর্বরক্ষে, তবু ঐ ছাইভস্ম সোনার উপর দিয়ে গেছে, ধর্ম কেড়ে নেয় নি। কেড়ে নেবার কথাও তো ওঠে না, ঘুমের ঘোরে তখনকার যা অবস্থা—

পাড়াশুদ্ধ লোক হৈ-হৈ করে চোর ধরতে বেরুল। ঘরের ডানদিকে কশাড় বাঁশবন। লণ্ঠন তুলে কয়েকজন উঁকিঝুঁকি দেয় সেদিকে। বেশি এগোবার সাহস নেই—কী জানি কোনখানে বজ্জাত চোর ঘাপটি মেরে আছে। দিল বা অন্ধকারে এক বাঁশের বাড়ি কষিয়ে। একদা মধুসূদনের মাথা যেমন দু-ফাঁক করে দিয়েছিল।

থানা ক্রোশখানেক দূরে। বাঁশবনটা ছাড়িয়েই নদী, কিনারা ধরে পথ। তারার আলোয় নদী-জল চিক-চিক করছে। ঘাটের উপর এক ডিঙিতে গণকঠাকুর ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সুর করে মহাভারত পাঠ করছে। আরও পাঁচ-ছ'খানা নৌকো—মাঝিমাল্লা চড়ন্দার উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সকলে। হেন কালে চোর-চোর—উৎকট চেঁচামেচি। চোরের নামে এ-নৌকো সে-নৌকো থেকে

নেমে পড়ে অনেকে। পাঠে বাধা পড়ে যায়, ভট্টাচার্য অতিমাত্রায় বিরক্ত। গ্রামের চৌকিদার এই রাত্রে খবর দিতে থানায় ছুটেছে।

যারা নেমে পড়েছে, তারা সব জিজ্ঞাসা করে: চুরি কোন বাড়ি? ধরা পড়েছে নাকি চোর? পালিয়েছে—কোন দিকে গেল?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য পাঠ থামিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ছিল, গলা চড়িয়ে আবার শুরু করল:

নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্যচক্ষু সর্বজনে দেন নারায়ণ॥
দিব্যচক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল তাহা কহেন না যায়॥
তেত্রিশ দেবতা কোটি দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে আছে ব্রহ্মা দেখে সবিশেষে॥
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোবন।
নয়নে দেখায় একাদশ রুদ্রগণ॥
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে তারা কহিতে লাগিল॥

পাণ্ডব হইবে জয়ী কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥
এত বলি কর্ণবীর করিল গমন।
প্রেম রূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন॥
হরিহরপুর গ্রাম সর্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে॥

ভণিতা শেষ করে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সশব্দে পুঁথি বন্ধ করল। চোরের খবরাখবর নিয়ে তখন সকলে ফিরে আসছে। পাশের নৌকোর বৃদ্ধ মাঝি বলে, চলুক না ঠাকুরমশায় আরো খানিক।

না—। ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়ল। রাগ হয়েছে, রাগের সঙ্গে অভিমানও। বলে, বেনাবনে মুক্তো ছড়ালাম আমি এতক্ষণ ধরে। সৎপ্রসঙ্গে কারো মতি

নেই, কেউ কানে নাওনি তোমরা। যাকগে, বলে আর কী হবে! অন্য কেউ না শোনে, আমরা নিজের কাজ তো হল! আমার শিষ্যসাগরেদ এরা ক'জন শুনল। তাই বা মন্দ কি!

কে-একজন ওদিক থেকে টিপ্পনী কেটে ওঠে: একটি সাগরেদ কাড়ালে ঐ তো চট মুড়ি দিয়ে পড়েছে সন্ধ্যে থেকে। সকলেরই ঐ গতিক—নয় তো সাড়া পাওয়া যায় না কেন? ঠাকুরমশায়, মাছ খায় সবাই, নাম পড়ে কেবল মাছরাঙার।

বুড়ো মাঝি লজ্জা পেয়ে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে: শুনছিলাম তো ঠাকুরমশায়। চোরের কথা কানে পড়েই না ছোঁড়াগুলো হৈ-হৈ করে ছুটল।

ছোঁড়া বলে কেন, তুমি নিজেও ছুটেছিলে মুরুব্বির পো। তাই তো দেখলাম, পাপ কলিযুগে গোবিন্দ-নামের চেয়ে চোরের নামের কদর বেশি।

এর পর কিছুক্ষণ ক্ষুদিরাম গুম হয়ে রইল। রাগ পড়েনি, পুঁথি আর খুলল না। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। কাড়ালের দিকটায় চট মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে সাহেব—ঐ নৌকোর লোক খোঁটা দিয়ে যার কথা বলল। সন্ধ্যা থেকেই সকলে চট-মোড়া মানুষটা দেখছে। ছিল কিন্তু চটের নিচে রামদাস। কর্ম সাঙ্গ হবার পর—এদিকে জমিয়ে সকলে পাঠ শুনছে, রামদাসকে সরিয়ে সাহেব নিঃসাড়ে ঢুকে পড়ল। গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে।

ছোট ডিঙি সকালবেলা আজ এই ঘাটে ধরেছে। মূল সোয়ারি ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, তল্পিদার বংশী। এবং সাহেবের সম্বন্ধে কী বলা যায়—সাগরেদ হলে সকলের সেরা পয়লা নম্বরের সাগরেদ সে। হাল বেয়ে বেয়ে জলে আলোড়ন তুলে নৌকো লাগাল ঘাটে, ঘাটে লাগতে না লাগতে একছুটে হাটখোলায় গিয়ে চাল-ডাল নুন-তেল কিনে আনল, মুহুর্মুহু তামাক সেজে সসম্ভ্রমে ভট্টাচার্যের দিকে হুঁকো এগিয়ে দিচ্ছে, উনুনে আগুন দিয়ে ফু' পাড়ছে মুখ ফুলিয়ে। এ ছাড়া মাল্লা দু-জন—কেষ্টদাস রামদাস। মোটমাট পাঁচ।

সেকালে ফি বছর শীতের সময়টা ক্ষুদিরাম ডিঙি নিয়ে এই রকম বেরিয়ে পড়ত। বয়স হয়ে ইদানীং বন্ধ একরকম। খাতিরে পড়ে এইবারটা কেবল বেরিয়েছে। নদীখাল যেন জাল বুনে আছে—জলের জীবন, জলের ধারে বসবাস মানুষের। ডিঙি আস্তেব্যস্তে স্রোতে ভেসে চলে। ভাল গাঁগ্রাম দেখে নেমে পড়ে ভট্টাচার্য মশায়, ভদ্র গৃহস্থবাড়ি উঠে আলাপ-পরিচয় করে। ব্যাগ খুলে স্বর্ণসিঁদুর ও চটি-মকরধ্বজ বের করে দেখায়—বাজারে বস্তু নয়, ভট্টাচার্য নিজ হাতে বকাল মেপে ষোলআনা শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে বানিয়েছে, ছেলেপুলের ঘরে রেখে দিতে হয় এ সমস্ত—সামান্য অসুখবিসুখে বড় কাজে লাগে। এ ছাড়া

হস্তরেখাদি বিচার করে ক্ষুদিরাম, খড়ি পেতে ভবিষ্যতের কথা বলে দেয়! অতিশয় নিষ্ঠাবাণ ব্রাহ্মণ—তা সত্ত্বেও চাপাচাপি করলে সংগৃহস্থের বাড়ি চাট্টি চাল ফুটিয়ে সেবা নিতে খুব বেশি অপেত্তি করবে না। বাইরের পরিচয় এই হল মোটামুটি।

জলের কাজ—নৌকো চেপে জলে জলে ঘোরা। ডাঙার কাজের চেয়ে সোজা, সুবিধা অনেক বেশি। সকালে জানে না সন্ধ্যাবেলা কোনখানে আজ আস্তানা। শিকার হয়ে কে মুখে এসে পড়ে, কোন-কিছু ঠিকঠিকানা নেই। অথবা ভাগ্যদোষে নিজেরাও পড়তে পারে জলপুলিসের শিকার হয়ে। তখন সাঁ-সাঁ করে নৌকো ছুটিয়ে কোন এক পাশখালিতে ঢুকে পড়ে। আঁকাবাঁকা খাল, বাঁকে বাঁকে শতেক মুখ বেরিয়েছে। বেঁচে যায় সেই গোলকধাঁধাঁর মধ্যে লুকোচুরি খেলে। আবার কত সময় ধরেও ফেলে ফাঁদ পেতে সুকৌশলে খালের মধ্যে ঢুকিয়ে। এমন হয়েছে, দলকে দল একেবারে খতম হয়ে গেছে। দল নয়, নল বলাই ঠিক। দল তো অতি সামান্য জিনিস, পাঁচটি মানুষ এরা যেমন দল করে এসেছে। বড় বড় নল উৎখাত হয়েছে, তবু কাজকর্ম ঠিক চলেছে, এক দিনের তরে বন্ধ হয়নি। নতুন নতুন নল গড়ে উঠেছে আবার। এখন তো দয়াময় সরকার। ধরল এবং আদালতে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে গেল তো এক বছর দু-বছরের জেল। সরকারি পাকা দালান, শীতের কম্বল, নিশ্চিন্তে তিন বেলা আহার—আর দশটা গুণীর সঙ্গে মিলেমিশে দিনগুলো দিব্যি কেটে যায়। গায়ে গত্তি লাগে, মনে স্ফূর্তি আসে। বেরিয়ে এসে ডবল জোরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড় আবার। কিন্তু সেকালে—অনেক কাল আগে—এমন সুখ ছিল না। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শোনা। মহাবিদ্বান জগবন্ধু বলাধিকারী—তাঁর যে কাজ তাতে খাটাখাটনি অল্প, বইপত্র নিয়ে দিনরাত পড়ে আছেন। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মতো কোঁটা-কাঁটা মানুষভোলানো পণ্ডিত নন তিনি। সেকালে নাকি খুব কড়া ব্যবস্থা ছিল—চোরকে শূলে দিত, চোরের হাত কেটে ফেলত। তা বলে বিদ্যা কি লোপ পেয়েছে কোন রাজ্যে? বড়-বিদ্যা বলে কত জাঁক। এই বিদ্যার জোরে কত দেশের কত শত মানুষ করে খাচ্ছে। চুরি কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে মানী লোকের বোধকরি ইজ্জতহানি ঘটে। রকমারি নাম দিয়েছে তাই—পান খাওয়া, উপরি পাওনা। হালফিল আবার একটা নতুন নাম কানে আসে—কালোবাজারি। নাম যা-ই হোক, কাজ সেই সনাতন বস্তু। এই সমস্ত বলেন বলাধিকারী, আর হেসে হেসে খুন হন।

সে যাকগে। সাহেব চট মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে ডিঙির উপর, তারই ত্রিশ হাতের ভিতর পাড়ের রাস্তা দিয়ে হনহন করে চৌকিদার থানায় চলল।

বাঁশের জঙ্গল না থাকলে সেই দক্ষিণের পোতার ঘরটাও নজরে আসত এই জায়গা থেকে। গাঁয়ের মানুষ পাতি-পাতি করে চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে, এদিকে কেউ তাকায় না। চোর যে কাজ সেরে এসে ভালমানুষ হয়ে বাড়ির ঘাটে শুয়ে পড়েছে, এমন সন্দেহ হয় না কারো। হলেই বা কি! নৌকো তল্লাসি করলে মিলবে হাঁড়িকুঁড়ি চাল-ডাল তেল-মশলা এবং ভট্টাচার্য মশায়ের ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু স্বর্ণ সিঁদুর মকরধ্বজ মধু এবং মহাভারত নূতন-পঞ্জিকা কাকচরিত্র বৃহৎ জ্যোতিষসিদ্ধান্ত এই জাতীয় বই কয়েকখানা। গয়না সিকিখানা পাবে না খুঁজে, সমস্ত গাঙের নিচে। সিঁধ কাটার সময়টা বংশী সাহেবের পাশে থেকে সাহায্য করছিল, তারপর সাহেব ঘরে ঢুকে গেল তো সে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। এদের ভাষায় পদটিকে বলে ডেপুটি। মাল নিয়ে বাইরে এসে ডেপুটির হাতে পাচার করে দিল। ব্যস, কারিগরের দায়িত্ব শেষ, ছুটি এবার। যা করবার ডেপুটি করবে।

গামছায় পুঁটলি করে সেই মাল বংশী গাঙের জলে ছুঁড়ে দেয়। নিশানা আছে—সরু দড়ি গিঁট দেওয়া পুঁটলিতে, দড়ির অন্য মাথা আগাছার সঙ্গে বাঁধা। দড়ি টেনে যখন খুশি মাল ডাঙায় আনা যাবে। সিঁধকাঠি ছোরা লেজা রামদা—সরঞ্জামগুলোরও ঐ ব্যবস্থা। ডিঙির উপরে যা-কিছু সমস্ত নিরীহ নির্দোষ জিনিস। জলের উপর কাজকারবারে এই বড় সুবিধা। তাড়াহুড়ো করলে সন্দেহ অর্শাবে যদি বোঝ, নৌকো চাপান দিয়ে গদিয়ান হয়ে ঘাটে থাক একদিন দু-দিন। ফাঁক বুঝে তারপর পিঠটান দাও, মাল থাকুক যেমন আছে পড়ে। চারিদিক ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কোন একসময় এসে তুলে নেওয়া যাবে। নৌকো না হল তো হেঁটেই চলে আসবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই।

সাহেব ফিরে আসতে একবার চোখাচোখি হল ক্ষুদিরামের সঙ্গে। বড় খুশি দু-জনেই। পাঠ চলছে—তপোধন নারদ শোভা পাচ্ছেন শ্রীগোবিন্দবক্ষে—বলতে বলতে নিজের বুকে প্রচণ্ড এক থাবা বসিয়ে দেয়। অর্থাৎ দেখলে বটে তো ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের কাজের নমুনা—কী দরের খুঁজিয়াল বুঝে দেখ। খোঁজদারির বখরা অন্য লোকের যদি হয় এক আনা, ক্ষুদিরামের নিদেনপক্ষে ছয় পয়সা। কাজ যা করে একেবারে নিটোল, কোন অঙ্গে ভুলচুক থাকে না। যেমন এই আজকের কাজ।

আশালতা গা-ভরা গয়না নিয়ে বাপের বাড়ি এসেছে, ডিঙিতে বসে বসে টের পাবার কথা নয়। খুঁজিয়াল খবর বয়ে এনে দিল। অন্যের মুখের খবর নয়, খোদ ক্ষুদিরামের—গণকঠাকুর হয়ে নিজে দেখেশুনে মেয়ের হাত গণে এসে বলল। যা করবার আজ রাত্রেই। দেরি হলে হবে না, দেরিতে মানুষের

বুদ্ধিবিবেচনা এসে যায়। বাড়িসুদ্ধ আজকের দিন দেমাকে রয়েছে, পাড়ার মানুষদের গয়নাগাঁটি দেখাচ্ছে। একদিন দু-দিন পরে তুলেপেড়ে ফেলবে। বড়লোক মিত্তিরদের লোহার সিন্দুকে রেখে আসবে সম্ভবত। তখন সিঁধকাঠিতে কুলাবে না, রীতিমত বন্দুক-বোমার ব্যাপার। চুরি নয় তখন, ডাকাতি—আয়োজন তার বিস্তর। কাজও নোংরা। চুরির মতন এমনধারা পরিচ্ছন্ন নয় যে—মাল সমস্ত পাচার হয়ে গেল, বাড়ির মানুষের গায়ে আঁচড়টি পড়ল না।

পহরখানেক রাতে আর একবার নৌকা থেকে নেমে ক্ষুদিরাম শেষ খবর এনে দিল। না, কুকুর নেই বাড়িতে। বাইরের অতিথি অভ্যাগত নেই। ছোট্ট সংসার। অসুখ-বিসুখের কথা যদি বল—আছে অসুখ বটে, কিন্তু পুরানো ব্যাধি। পক্ষাঘাতে কর্তামশায় শয্যাশায়ী। কর্তার সেই পুবের ঘরও অনেকখানি দূর দক্ষিণের পোতার ঘর থেকে। ছোট বোন আজ একসঙ্গে এক খাটে শুয়ে আছে। বয়সে ছেলেমানুষ, শুয়েছেও একেবারে দেয়াল ঘেঁষে। এসব মেয়ে ঘুমিয়েই থাকে, হাঙ্গামা করে না। ভাবনা কিছু মূল-মক্কেলকে নিয়ে—আশালতাটা ডবকা রীতিমত। তবে বিয়ে হয়ে গেছে, নতুন বিয়ের পর আজকেই দ্বিরাগমনে ফিরল। এবারে তুমি বিবেচনা করে দেখ সাহেব।

খবর বুঝিয়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম ছইয়ের মাথায় হেরিকেন-লণ্ঠন টাঙিয়ে নিশ্চিন্তে এবার মহাভারত খুলে বসল। উদ্যোগ পর্ব। কুরুক্ষেত্র আসন্ন—তারই ঠিক আগের পাঠ।

খুব ঠাণ্ডা মাথার বিবেচনা। ওস্তাদের নিষেধ, ডবকা মেয়ের ঘরে ঢুকবে না। সে মেয়ে অবিবাহিতা কুমারী হলে তো কথাই নেই। ঢুকে পড়লেও কদাপি সে মেয়ের গা ছোঁবে না। না, না, না,—ওস্তাদের দিব্যি দেওয়া আছে। কুমারী-দেহ অপবিত্র হবে, সেটা খুব বড় কথা নয়। যে সময়টা কাজে নেমে পড়েছ, পুরুষমানুষ নও তুমি তখন। মানুষই নও। কাজ করবার কল। যেমন সিঁধকাঠি আছে, সিঁধকাঠি ধরবার কলও আছে একটা। সে কলের একজোড়া চোখ, সেই চোখের জ্বলজ্বলে নজর। নজর কিন্তু মেয়ের গায়ের দিকে নয়, গায়ের উপর যেখানে যে বস্তু রয়েছে শুধুমাত্র সেইটুকুর উপর। মুশকিল হল ভিন্ন দিক দিয়ে। অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের পশরা সাজিয়ে মেয়েটা উন্মুখ হয়ে আছে ডালি দেবার জন্য। রক্ষে আছে অঙ্গের উপর প্রথম পুরুষের ছোঁওয়া পেলে! ঘুমে হোক আর জাগরণে হোক মাথা থেকে পদতল অবধি সিরসির করে উঠবে, গায়ে কাঁটা দেবে। ঘুমন্ত হলে চক্ষের পলকে জাগবে, ভয় পেয়ে চেঁচাবে নতুন অনুভূতিতে।

এবং আর একদিক দিয়েও বিবেচনা—গয়না কখানাই বা থাকে কুমারী মেয়ের গায়ে! হাতে দু-গাছা চুড়ি, কি দুটো কানের ফুলের জন্য অতখানি ঝুঁকি কোন সুবুদ্ধি কারিগর নিতে যাবে?

কিন্তু বিবাহিত মেয়ের আলাদা বৃত্তান্ত। এক কথায় খারিজ করা যাবে না। পুরুষ-সঙ্গ অভ্যাসে এসে গেছে তার এখন। গয়নাগাঁটিও খুব এসে জমে বিয়ের পর থেকে। জোয়ালের জলের মতো। বাপের বাড়ির গয়না—বিয়ের মুখে কষেমেজে পাত্রপক্ষ যা আদায় করেছে। শ্বশুরবাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের দেওয়া গয়না। আর সোহাগিনী বউকে সুগোপনে-দেওয়া বরের গয়না। সেই সব গয়না পরে দেমাকে মেয়ে ঘুরে বেড়ায়। গা-ভরা টাকশাল। পার যদি সেই টাকশালের টাকা সরাতে নিষেধ নেই। পেরে উঠবে কিনা সেই বিবেচনা। ঐ যা বলা হল—ডবকা মেয়ে ঘুমোয় না বেশি। বয়সের দোষে ছটফট করে, ক্ষণে ক্ষণে উঠে বসে। ঘুমাল তো অতি পাতলা সে ঘুম। একটা ইঁদুর নড়লে জেগে ওঠে। ঢুকে পড়তে পার এ হেন গয়না-পরা নতুন বিয়ের মেয়ের ঘরে—ওস্তাদের আশীর্বাদ এবং ষড়ানন কার্তিকের ও মা-কালীর তেমনিধারা কৃপা যদি থাকে তোমার উপর। জ্ঞান-গুণ যদি থাকে। একটা সূঁচ পড়ার যে শব্দ, সেটুকুও হবে না তোমার চলাচলে। সিঁধ কাটতে গিয়ে ঝুরঝুর করে মাটির গুঁড়ো পড়বে না, ডেপুটি হাতের মুঠোয় ধরে নিয়ে আস্তে আস্তে রাখবে। নিঃসাড়ে মেয়েটার কাছে চলে যাবে, অবস্থা বিশেষে শুয়ে পড়বে পাশটিতে। বর যেমনধারা করে। গায়ে হাত দেবে আলতো ভাবে, সইয়ে সইয়ে—ঘোর কেটে না যায় মেয়ের, সন্দেহ না আসে যে ভিন্ন পুরুষ। বড় কঠিন কাজ। যৌবন বয়সের জোয়ানপুরুষ তুমি, মন কিন্তু দুলবে না একটুকু। সে কেমন? ভরা কলসি নিয়ে নাচওয়ালী যেমন সভায় নাচে। ঢং করছে কত রকম, পুরুষের দিকে চক্ষু হানচে। করতে হয়, তাই করে। কিন্তু আসল নজর মাথার কলসি মাটিতে না পড়ে যায়। তোমারও তেমনি! যুবতী নারী কে বলেছে, শুধুমাত্র একটি মক্কেল। কুষ্ঠী অষ্টাবক্র হলে যা করতে, যুবতীর বেলাতেও সেই পদ্ধতি অবিকল। কাজ কিসে হাসিল হবে তাই শুধু দেখ।

ঘুমেরও একটা হিসাব নিতে হবে। ঘুমোচ্ছে কতক্ষণ ধরে। ঘরের কানাচে বসে বসে সাড় নাও। বেড়ার ঘর হলে নিশ্বাসের শব্দ থেকে টের পাবে—এতক্ষণে জেগে ছিল, ঘুমাল এইবারে। এই সঙ্গে কালাকালের বিচার আছে। শীতকালে ঘুম আসতে দেরি হয় না—লেপের তলে গিয়েই সন্ধ্যারাত্রে ঘুমিয়ে পড়ে। শেষরাতের ঘুম তাই পাতলা, ভোর না হতে জেগে ওঠে। শীতকালের কাজকর্ম অতএব সকাল সকাল। গরমের সময়টা ঠিক উল্টো। সারারাত আই-

টাই করে ভোররাত্রে ঘুম আসে। অতএব গ্রীষ্মের কাজে চুপচাপ ধৈর্য ধরে বসে থাকবে। ছটফট করলে হবে না।

কত দিক কত রকমের বিচার-বন্দোবস্ত। নির্বিঘ্নে তবেই এক একখানা কাজ নামানো যায়। চুরি অমনি করলেই হল না, বিদ্যেটা সহজ নয়। তাই যদি হত, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ সোজাসুজি বেরিয়ে পড়ত সিঁধকাঠি হাতে। ঘোরপ্যাচ করে বেনামি চুরির তালে যেত না।

সকালবেলা বংশী নেমে গিয়ে একটা আশশ্যাওড়ার ডাল ভেঙে গাঙের ধারে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁতন করল। শীত-শীত বলে চাদর জড়িয়ে নিয়েছে গায়ে। দড়ি টেনে টুক করে গয়নার পুঁটলি তুলে ফেলল একসময়। তুলে চাদরের নিচে ঢুকিয়েছে। ছোট জিনিস বলেই হাতের কায়দা দেখানো গেল। সরঞ্জামগুলোর ব্যাপারে সাহস করা যায় না, চাদরে সামলে হবে না অত জিনিস। জলতলে থাকুক পড়ে আপাতত, যাচ্ছে কোথায়? আর গেলেই বা কী—কত আর দাম!

কাজ সমাধা, নানান জায়গায় বেকুব হয়ে হয়ে এইবারে আশাতীত রকম হয়ে গেল। কুড়নপুরের ঘাটে আর কেন? অকুস্থলে অকারণ পড়ে থাকতে নেই। সাহস দেখাতে হবে বটে, কিন্তু মাত্রা আছে।

চললাম ভাইসকল। অর্ধেক জোয়ার হয়ে গেল, জো ধরে গিয়ে উঠি।

রৌদ্রে ভরে গেছে চারিদিক। ঘাটের মাঝিমাল্লাদের বলেকয়ে রীতিমত শব্দসাড়া করে ভট্টাচার্য মশায়ের ডিঙি ছাড়ল।

কালকের সেই বুড়ো মাঝি প্রশ্ন করে, কদ্দুর যাওয়া হচ্ছেন?

হুঁকো টানছিল ক্ষুদিরাম, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, সেটা তো জানিনে। গাঙের স্রোত আর ভবিতব্য যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। জীবনেও ঠিক এমনি, ভাই। কাল রাত্রে এখানে এই ঘাটে কত সৎপ্রসঙ্গ করেছি, আজ রাত্রের কোন কাজ বিধাতাপুরুষ কোন ঘাটে লিখে রেখেছেন—

মাঝি গদগদ হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে কিন্তু চালাকি খাটে না বিধাতা-পুরুষের। কপালের লিখন কেমন পুটপুট করে বলে দেন।

ক্ষুদিরাম একগাল হেসে গৌরবটা পরিপাক করে দেয়। মাঝি বলছে, সকলের হাঁড়ির খবর বলে দেন ঠাকুরমশায়, নিজেরটা কেন তবে পারবেন না?

ঐ তো মজা। ডাক্তারে তাবৎ লোকের চিকিচ্ছে করে বেড়ায়, নিজের রোগ ধরতে পারে না। বলি খনার চেয়ে তো বিদ্যাবতী কেউ ছিল না—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান নখের উপর ভাসত, চোখ তুলে একটিবার দেখে নেবার ওয়াস্তা।

কিন্তু শ্বশুর বেটা যে জিভ কেটে টিকটিকি দিয়ে খাওয়াবে সেইটেই ধরতে পারলেন না তিনি।

বাঁক ঘুরে যেতে বংশীকেই ক্ষুদিরাম সেই প্রশ্ন করে : যাওয়া হচ্ছেন কতদূর? উত্তর অঞ্চলে, কয়েকটা ভাল তল্লাট আছে, ঢুঁ মেরে আসা যায়। তুমিই বল বংশী, তোমার দায়ে যখন বেরিয়ে পড়েছি।

বংশী বলে সকলের আগে ফুলহাটা। বলাধিকারী মশায়ের হাতে মাল গিয়ে তো পড়ুক। তারপরে তিনি যেমন বলেন।

সাহেবেরও সেই মত। নৌকোর সকলেরই। মাল বলাধিকারী অবধি পৌঁছলে তখনই জানলাম, রোজগারের টাকা সত্যি সত্যি গাঁটে এসে গেল। মাল গলিয়ে বিক্রি-করা টাকাপয়সা বখরা করে দেওয়া সমস্ত তাঁর কাজ। ধর্মভীরু মানুষ—চিরকাল, সেই যখন দারোগা ছিলেন তখনও। সিকি পয়সার তঞ্চকতা নেই তাঁর কাছে। কত কত মহাজন এ-লাইনে, কিন্তু জগবন্ধু বলাধিকারী দ্বিতীয় একজন নেই। কাজও তাই অঢেল। বড় বড় দলের সঙ্গে কাজকারবার। কাপ্তেন কেনা মল্লিক প্রধান তার মধ্যে। ছোটখাট দল আমল পায় না। তবে সাহেব আছে বলে এদের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা। বড় গুণের ছোকরা, বলাধিকারী বড় ভালবাসেন। তার উপর ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য—বলাধিকারীর চিরকালের পোষ্য। বংশীও পায়ে-পায়ে ঘোরে তাঁর। হাত পেতে নেবেন তিনি এদের জিনিস। নৌকো অতএব সোজা গিয়ে ফুলহাটা উঠুক, পথের মধ্যে কোনখানে থামাথামি নেই।

বড় গাঙ ছেড়ে সরু খালে ঢুকল। ফুলহাটা এসে গেছে। কত বড় জায়গা ছিল একদিন, কত জাঁকজমক। ফুলহাটার নীলকুঠির এদেশ-সেদেশ নামডাক, অঞ্চলের যত নীল নৌকো বোঝাই হয়ে খালের ঘাটে উঠত। প্রকাণ্ড দীঘি, দীঘির পাড়ে সারি সারি নীল পচানোর চৌবাচ্চা। তেতলা বিশাল অট্টালিকা—নীলকর সাহেবরা থাকত সেখানে। সময় সময় মেমসাহেবরাও আসত বিলাত থেকে, ছ-মাস এক বছর থেকে আবার চলে যেত। কাঠের মেজের নাচঘর বানিয়েছিল অট্টালিকার নিচের তলায়। ভেঙেচুরে কাঠে উই ধরে এখনো খানিকটা নমুনা রয়েছে। দিনদুপুরে আজ বুনোশুয়োর আর সাপ-শিয়াল চরে বেড়ায় নীলকুঠির জঙ্গলে। শীতকালে কেঁদোবাঘও আসে।

জঙ্গল ফুঁড়ে অট্টালিকার চিলেকোঠা উঠেছে, ডিঙি থেকে নজরে পাওয়া যায়। বলাধিকারীর চোখ বেঁধে একদিন ঐখানে কোথায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। উঃ, কী কাণ্ড! গল্প শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হেসেও খুন হতে হয়। আজকে সেই জায়গায় সকলের প্রভু হয়ে আছেন বলাধিকারী, অপ্রতিহত প্রভাবে

রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্বিশেষে আশ্রিত-পালন করছেন। অঞ্চলের যাবতীয় থানার লোক এসে খোশামোদ করে যায়। না করে উপায় কি? খুব খাওয়ান তাদের বলাধিকারী। অন্তরালে তাদের সম্বন্ধে বলেন: ভাল খাওয়ার লোভে আসে তো যতবার আসুক আপত্তি নেই। অতিথি-সেবার ত্রুটি হবে না। ভিতরে অন্য কোন মতলব থাকে তো বিপদে পড়বে। আমিও দারোগা ছিলাম একদিন, অত্যন্ত দুঁদে দারোগা। আমার যেমন হয়েছিল, তার শতেক গুণ নাজেহাল হতে হবে।

গয়নাগুলো ঘরের মধ্যে নিয়ে নেড়েচেড়ে রেখে এলেন বলাধিকারী। ফিরে এসে সাহেবকে তারিপ করেন: পাকা কারিগর তুমি হে! এইটুকু বয়সে এমনধারা কাজ আমার আমলে কখনো দেখি নি। না হবে না কেন, শিক্ষা কত বড় ওস্তাদের কাছে! আবার তা-ও বলি, বীজ ভাল হলেই ফসল যে সব সময় ভাল হবে তা নয়। উর্বর ক্ষেত্র চাই, তবে অঙ্কুর ওঠে। অঙ্কুর থেকে গাছ গাছ থেকে সুফল। তোমার ব্যাপারে সেইটে হয়েছে। তুমি যে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, রেলগাড়ির কামরায় পয়লা নজরে সেটা টের পেয়েছিলাম। তখনই ঠিক করলাম, এমন প্রতিভা নষ্ট হতে দেব না। হয়েছে তাই। আরও কত হবে। আজ আমার বড় আনন্দ।

পেশায় মহাজন বটে, কিন্তু বলাধিকারী সত্যিকার বিদ্বান মানুষ। কথা-বার্তা পণ্ডিতজনের মতো। গদগদ হয়ে সাহেবকে তিনি আশীর্বাদ করেন: ভবিষ্যদ্বাণী করছি, কাপ্তেন হবে তুমি একদিন। কাপ্তেন তো কতজনা—কেনা মল্লিকও মস্তবড় কাপ্তেন। কিন্তু মিহি কাজ বড় কেউ জানে না। তুমি যাবে সকলের উপরে। পুঁথিপুরাণে অনেক ইজ্জত এই বিদ্যার। সর্বশাস্ত্রের সঙ্গে রাজপুত্র চৌর্যবিদ্যারও পাঠ নিচ্ছেন, নইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। চৌষট্টি কলার একটি। উচ্চাঙ্গের কলা বটে—যা এক একটা বিবরণ পাওয়া যায়, শিল্পীর দক্ষ হাত ছাড়া তেমন বস্তু না। অতদূরের পুরাণ-ইতিহাসেই বা যেতে হবে কেন—তোমারই ওস্তাদ বাইটা মশায় বয়সকালে কী সব কাণ্ড করে বেরিয়েছে! একদিন গিয়ে তোমার এই কাজকর্মের কথা সবিস্তারে বলে এসো বুড়োকে, বড় আনন্দ পাবে। যেমন গুরু ঠিক তার উপযুক্ত শিষ্য।

সাহেবের গুরু পঞ্চানন বর্ধন। পচা বাইটা নামে পরিচয়। ওস্তাদের কথা উঠলে সাহেবের হাত দুটো আপনি জোড় হয়ে কপালে গিয়ে ওঠে, ঘাড় নুয়ে আসে। সেকালের কথা জানিনে, কিন্তু এখনকার দিনে এত বড় ওস্তাদ আর জন্মে না।

গয়নার পুঁটলি নিয়ে কোথায় চলে গেলেন বলাধিকারী। এই অধ্যায়টা একেবারে অজ্ঞাত, নানা জনের নানা রকম আন্দাজ। হঠাৎ একদিন বলাধিকারীর মুখে বখরার হিসাব পাওয়া যায়, বখরাদার যত জনই থাকুক, টাকা-আনা পয়সার কার কত পাওয়া মুখে মুখে বলে দেন। এ কাজে কাগজ-কালির কারবার নেই। কাগজের লেখা সর্বনেশে জিনিস—বিপদ ঐ পথ ধরে আসে অনেক সময়। বলাধিকারীর মৌখিক হিসাবে সকলে খুশি। আড়ম্বরে গদি সাজিয়ে দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে ঐ যে হিসাবপত্র রাখে, যত গলদ তাদেরই কাছে। বলাধিকারীর কাছ থেকে মানুষে হরদম আগাম নিয়ে যাচ্ছে, তারও লেখাজোখা থাকে না, মনে গেঁথে রাখেন। আগামের টাকাপয়সা কেটে নিয়ে বাকি প্রাপ্য মিটিয়ে দিচ্ছেন, সিকি পয়সার ভুলচুক নেই।

গয়নার ব্যবস্থায় পুরো একটা বেলা কাটিয়ে বলাধিকারী বাসায় ফিরলেন। হাসি-হাসি মুখ—তাই থেকে অনুমান হয়, মাল অতিশয় সাচ্চা। এবং ওজনে উত্তম। কাজ চুকিয়ে এসে এখন অন্য দশরকম কথাবার্তা।

একবার বললেন, তাড়াহুড়ো করতে বলিনে, শুয়ে বসে থাক এখন পাঁচ-সাত দশ দিন—জিরিয়ে নাও। ছিপ ফেল, তাস-পাশা খেল। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ওদিকে দিন দেখতে লাগুন আবার একটা। শুভক্ষণে বেরিয়ে পড়ো মাতৃনাম স্মরণ করে। পয় যাচ্ছে এখন, দু-হাতে কুড়োও।

হাতে কাজকর্ম না থাকলে ক্ষুদিরাম অবিরত পঞ্জিকা উলটায়। সকলের বড় শাস্ত্র, তার মতে, পঞ্জিকা। ডিঙি থেকে ডাঙায় উঠেই সে পাঁজি নিয়ে পড়েছে। দিনক্ষণ প্রায় কণ্ঠস্থ। বলে, সামনের বিষ্যুৎবারেই হতে পারে। নবমী তিথি আছে, যেটা হল রিক্তা তিথি। মঘা নক্ষত্র তার উপরে—যাত্রামুখে মঘা, সামলাবি তুই ক'ঘা ?

সাহেব শিউরে উঠে বলে, ওরে বাবা !

ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে বলে, সেই তো মজা। বিষে বিষক্ষয়। তুই শয়তান কাঁধে কাঁধ দিয়ে অমৃতযোগ হয়ে দাঁড়াল। অব্যর্থ অভীষ্টলাভ।

বলাধিকারী বললেন, জলে জলে নয়, এবারে ডাঙা অঞ্চলে। ডাঙার কাজ একখানা দেখাতে হবে সাহেব—নিখুঁত পরিপাটি কাজ। কেনা মল্লিকের কাছে জাঁক করে জলের কথা বলব, তেমনি ডাঙার কথাও বলতে পারি যেন।

বিস্তর ভাল ভাল গাঁ-গ্রাম আছে, গাঙখাল নেই সেখানে। নৌকো করে যাওয়া যায় না, গাড়ি-পাল্কিতে অথবা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। চীনের হুয়েনসাং এসে যা দেখেছিলেন, এখনকার এই যুগেও প্রায় সেই অবস্থা—উৎপাতের অভাবে দরজায় খিল দিতে ভুলে যায় সেখানকার লোকে, বাক্সের তালা-চাবি কেনা

বাহুল্য মনে করে। সাহেব গিয়ে বাহিরের কাজ কিছু দেখিয়ে আসুক, চারিদিকে তোলপাড় পড়ে যাক। যাতায়াতের কষ্ট বলে মানুষগুলো কেন একেবারে বঞ্চিত হয়ে থাকবে? এবং ভেবে দেখলে, সাহেবদের পক্ষেও সেটা অগৌরবের কথা বটে।

কিন্তু আর একবার তো আশালতাদের গাঁয়ে যেতে হয়। জুড়নপুর গাঁয়ে। সরঞ্জামগুলো গাঙের নিচে পড়ে রইল, কি নিয়ে তেবে কাজে বেরোয়? প্রশ্ন হবে, সরঞ্জাম এই একটা সেট কি শুধু? পড়ুক না ওরা বেরিয়ে—বলাধিকারী মশায়ের উপর ভার থাকবে, সুযোগ মতন তিনি ওগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করবেন। কিন্তু আর যাই হোক, সিঁধকাঠিটা আদর ও সম্মানের বস্তু সাহেবের কাছে। ওটা হাতে না পেয়ে বেরুবে না। ঐ কাঠি ওস্তাদ তার হাতে দিয়েছে। সে ওস্তাদ আজেবাজে কেউ নয়, স্বয়ং পচা বাইটা। কাঠিখানাও বাজারের সাধারণ জিনিস নয়, যুধিষ্ঠিরের নিজ হাতে গড়া। অমন কারিগর তল্লাটের মধ্যে নেই, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কামান-বন্দুক গড়েছে তার পূর্ব-পুরুষেরা। সেই বংশের কারিগর যুধিষ্ঠির।

তাছাড়া নতুন কাঠির কথাই তো আসে না। ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছেন, সে বস্তু তুলবেই সে জল থেকে। লাইনে নেমেই এতখানি নামযশ, সেটা সাহেবের নিজের কিছু নয়—ওস্তাদের অশীর্বাদ আর ওস্তাদের দেওয়া কাঠির গুণে। অনেক রকম গুণজ্ঞান থাকে তো ওঁদের, হয়তো বা মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন বস্তুটা। কাঠি ধরে কাজে বসলে সাহেব তখন আর এই মানুষ থাকে না। কী এসে ভর করে যেন কাঁধে—আলাদা মানুষ।

ফাঁসুড়ে ঠগদের কথা বলেন বলাধিকারী। বিস্তর তাজ্জব কাহিনী। এমনি তারা খুব ভাল। ধার্মিক, দয়াশীল, দানধ্যান জপতপ পুজোআচ্চা করে—বলতে হবে বাড়াবাড়ি রকমের ধার্মিক। বছরের মধ্যে অন্তত একটিবার বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যেশ্বরী অথবা কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর পাদপদ্মে গিয়ে পড়বে, আয়ের একটা মোটা অংশ পূজোয় খরচ করবে। গলায় রুমালের ফাঁস এঁটে মানুষ মারা পেশা তাদের। পেশা বলা ঠিক হল না, দেবী চামুণ্ডার নিত্যপূজা এই পদ্ধতিতে। মানুষ মেরে টাকাপয়সা নিয়ে নেয় বটে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য টাকা নয় সেটা তো যৎসামান্য উপরি লাভ। চামুণ্ডার তুষ্টিতে নরবধ—এক একটা নরবধে বিস্তর পুণ্য। কাজটা আসলে দেবীরই, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করে দেয়। পৌরাণিক রক্তবীজ-দৈত্য বধ করতে গিয়ে দেবী নাজেহাল হলেন, সেই তখন থেকেই ধারা চলে আসছে। মন্ত্র-পড়া একরকম গুড় আছে, কাজের আগে দলের মানুষকে সেই গুড় খাইয়ে দেয়।

মুহূর্তে সে ভিন্ন একজন। গলায় ফাঁস দেবার জন্য হাত নিসপিস করে ; সেই মুখে বাইরের মানুষ না পেলে শেষটা হয়তো হাতের রুমালে নিজেরই গলায় দেবে টেনে ফাঁস। সিঁধকাঠির বেলাতেও তাই, হাতে ধরলে সাহেব আলাদা মানুষ। কী করি কী করি অবস্থা। যুবতীর পাশে শুয়ে নির্বিঘ্নে কাজ চুকিয়ে বেরিয়ে এল নিশ্চিন্ত ঐ কাঠির গুণে। কত লোকে ঐ অবস্থায় ধর্মভ্রষ্ট হয়, ধরা পড়ে জেল খেটে খেটে লবেজান হয়। চোরের সমাজের কলঙ্ক তারা।

জুড়নপুরের ঘাটে এসে পৌছল সাহেব। আশালতাদের সেই ঘাট। প্রায় দুপুর তখন। ঘাটে আজ বড় মহাজনী নৌকা একখানা—গাঁয়ে গাঁয়ে লঙ্কা মসুরকলাই আর খেজুরগুড় কিনে বোঝাই দিচ্ছে। বিপদ হয়েছে, মাঝিমাল্লারা হঠাৎ কি রকম কবিভাবাপন্ন হয়ে নৌকো থেকে নেমে গাঙের ধারে অশথতলায় রান্নাবান্নায় লেগেছে। ঝাঁটপাট দেওয়ার ধুম দেখে অনুমান করা যায়, আহারাদিও ঐ জায়গায় হবে। এবং আহারান্তে শীতল ছায়াতলে শুয়ে বসে গুলতানি করাও একেবারেও অসম্ভব বলা যায় না। বিষম বিপদ। কিছু না হোক, সিঁধকাঠি তো তুলতেই হবে। সেই সঙ্গে ছোরাখানা যদি পারা যায়। এত পথ ভেঙে সেই জন্যে এসেছে। তুলে নিলেই হবে না, কাপড়ের নিচে উরুর সঙ্গে বেঁধে ফেলতে হবে। দুই উরুতে দু-খানা। খানিকটা তো সময় লাগবে —এতগুলো মানুষের দৃষ্টি বাঁচিয়ে কাজ। সেই ফুরসত কতক্ষণে হবে, ঠিক-ঠিকানা নেই। গাঙের ধারেই বা কাঁহাতক ঘোরাঘুরি করা যায়—নজর পড়ে যাবে ওদের, সন্দেহ করতে পারে।

খুনীর সম্বন্ধে শোনা যায়, যেখানে খুন করেছে টানে টানে একটিবার অন্তত যেতে হবে সেই জায়গায়। ঝানু পুলিস ওত পেতে থাকে, অপরাধী স্বেচ্ছায় কবলে গিয়ে পড়ে।

ঘাটের উপর এসে সাহেবেরও আজ দুর্দম লোভ, আর কয়েক পা এগিয়ে বাড়িটা ঘুরে দেখে আসে। রাত্রিবেলা দেখেছে, দিনমানে দেখবে। অন্ধকার ঘরে ঘুমের মধ্যে আশালতা মেয়েটা বউয়ের মতো ভাব করেছিল, দিনদুপুরে সেই মেয়ের চেহারাটা ভাল করে দেখবার কৌতুহল। তার উপরে, যদি সম্ভব হয়, দেখে আসবে দিনের আলোয় এখন সে কী সব বলে, কেমন ভাব দেখায়।

দক্ষিণের পোতার ঘর, পিছনে বাঁশবন—এই ঘরে ছিল দুইবোন। জানলার নিচে মাটির দেয়ালে সিঁধ কেটেছিল, সেটা মেরামত করে ফেলেছে। পুরানো দেওয়ালের সঙ্গে নতুন মাটি মিশ খায় নি, চিনতে পারা যায় জায়গাটা।

আরও এগিয়ে সাহেব ভিতর-উঠানে এসে দাঁড়ায়। লাউমাচা এদিকে, লম্বা আকারের লাউ ঝুলে ঝুলে আছে। গাইগরু একটা মাটিতে শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে বোধকরি একটি ঘাসের আশায়। পুবের ঘরের ছাঁচতলায় সারি সারি ধানের ছড়া ঝোলানো—দাওয়ায় উঠতে নামতে সর্বক্ষণ মাথার উপর ধানের আশীর্বাদ ঠেকে যায়। বাঁশবাগানের নিচে ছায়াচ্ছন্ন ছোট পুকুর একটা ডোবার মতন। লকলকে কলমিডগায় বেগুনি কলমিফুল ফুটে আছে অজস্র। রান্নাঘরে ছ্যাঁকছোক করে সমারোহে রান্নাবান্না হচ্ছে। কিন্তু বাইরে কোন দিকে একটা মানুষ দেখা যায় না।

নিঃশব্দে এমন দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহজনক। সাহেব সাড়া দেয়: ঘরে কে আছেন, জল দেবেন একটু। জল খাব।

রান্নাঘর নয়, পুবের ঘর থেকে স্ত্রীকণ্ঠ করকর করে ওঠে। আশালতার মা উনি—ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের হিসাব মতো। কর্তা-গিন্নি থাকেন ঐ ঘরে। দিনমানে এখন অন্য মেয়েলোক যে না থাকতে পারে এমন নয়। কিন্তু কর্তৃত্বের ঝাঁজে বাড়ির গিন্নি বলেই তো ঠেকে। বলছেন, একটা-কিছু মুখে করে যে না সে-ই ঢুকে পড়বে, ভদ্দরলোকের বাড়ির একটা আবরুপর্দা নেই। সেদিন এই এতবড় সর্বনাশ হল। এত করে বলি: দেয়াল দেবার পয়সা না জোটে বাঁশ ফেড়ে কাচনির বেড়া তো দিয়ে দেওয়া যায়। তা শুয়ে বসে আড্ডা দিয়ে সময় পায় না, ফুরসত কোথা বাবুর ?

নিশ্চয় গিন্নিঠাকরুন। বাবু বলে ঠেস দিচ্ছেন ছেলেকে—আশালতার বড় ভাই মধুসূদনকে। চুরির দরুন মনের ভিতরটা জ্বলছে, কথার মাঝে ফুটে বেরুচ্ছে জ্বলুনি। নিজের বাহাদুরিতে সাহেবের তো মজা পাবার কথা—কিন্তু কষ্ট হচ্ছে। তার এই উল্টো স্বভাব। এয়ারবন্ধু যত আছে সকলের থেকে আলাদা। মধ্যবিত্ত সংসার—পক্ষাঘাতে গৃহকর্তার পঙ্গু অবস্থা, কিছু জমিজমা আছে, কষ্টেসৃষ্টে দুবেলা দু-মুঠোর সংস্থান হয় কোন রকমে। কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। বড়লোক দেখে জামাই করেছেন, জামাইয়ের বয়সটা আমলের মধ্যে আনেন নি। সমস্ত খবর ক্ষুদিরামের কাছে পাওয়া গেছে। গয়না সেই বড়লোকদের। সাহেবই এতবড় সর্বনাশ করে গেছে নীরীহ পরিবারের।

ঘরের ভিতরের বকাবকি থামতেই চায় না। অপরাধ তো একঢোক জল চেয়েছে। বলছেন, গাঙ-খাল রয়েছে, সে সমস্ত চোখে পড়ে না। জলসত্র করেছি কিনা আমরা, বাড়ির মধ্যে পাছদুয়োর অবধি ম্যাচ-ম্যাচ করে মানুষ চলে আসে !

সাহেবের কিন্তু একটুও মনে লাগে না। ন্যায্য পাওনা। পাওনা অনেক বেশি—তারই ছিঁটেফোঁটা সামান্য একটু। হেন অবস্থায় চলে যাওয়া বোধ হয় উচিত, সে ইতস্তত করছে। এমনি সময় এঁটো থালা-বাটি-গেলাস নিয়ে গিন্নি বেরিয়ে এলেন। পঙ্গু স্বামীর খাওয়া সকাল-সকাল সকলের আগে সমাধা হল, বাসন কখানা ধুয়ে নেবেন। এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, ডাকছিলে কে তুমি? কোন দিকে?

নজর তুলে দেখে সাহেব পাথর। কী সর্বনাশ! একবার ভাবে, চোঁচা দৌড় দিয়ে বেরোয়। তাতে অব্যাহতি নেই—এই দিনমানে চোর চোর বলে সারা গ্রাম পিছন ছুটে পলকের মধ্যে ধরে ফেলবে। দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই—সাহস করে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ফুৎকারে অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া! ট্রেনের কামরায় দেখা হয়েছিল মা-জননীর সঙ্গে—ভিন্ন অবস্থায়। এঁরই ঠিক পায়ের নিচে শুয়েছিল। ইনি এবং ছেলে-বউ, একটি ছোট বাচ্চা। চেহারা হুবহু মনে গাঁথা আছে, ভুল হবার জো নেই। গিন্নিঠাকরুনও বুঝি চিনেছেন, ভ্রু কুঞ্চিত করে চোখ দুটো স্থাপিত করেছেন তার দিকে। সাহেবও ঠিক করে ফেলেছে—যত কিছু বলুন, ন্যাকা সেজে সমস্ত বেকবুল যাবে। জন্মে চোখে দেখিনি এঁদের, এই প্রথম দেখছে—এমনিতরো ভাব।

গিন্নি বললেন, জল না খেয়ে চলে যাচ্ছ যে বড়? সোনাদানা নয়, শুধু একটু তেষ্টার জল। না খেয়ে ফিরে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ। দিচ্ছে এক্ষুনি, দাঁড়াও।

আশালতার উদ্দেশে হাঁক দিয়ে ওঠেন, বড়-খুকি, কানে শুনতে পাস নে? জল চাচ্ছে, এক গেলাস জল গড়িয়ে দিয়ে যা ছেলেটাকে।

সাহেবের গোলমাল হয়ে যায়। কী ভেবেছিল, আর দাঁড়াল কী রকমটা! ঘরের ভিতরে উৎকট মেজাজ—বেরিয়ে এসে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জুড়িয়ে গঙ্গাজল। কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা, এ যেন এক ভিন্ন মানুষ কথা বলছেন।

সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, জল খেয়েই যাব আমি মা। বাইরের ওদিকটায় গিয়ে দাঁড়াই, জল ঐখানে পাঠিয়ে দেন।

অর্থাৎ চোখের সামনে থেকে একটুকু সরে পড়তে দাও বুড়ি, তারপরে বুঝব। জল এখন মাথায় উঠে গেছে।

বৃদ্ধা বলেন, এসে পড়েছ যখন জলটা খেয়েই বাইরে যাবে। রাগ হয়েছে তোমার, সেটা কিছু অন্যায় নয়। আমি ভেবেছিলাম কে না কে—আজেবাজে চোর-জোচ্চোর মানুষ এসেও তো দাঁড়াতে পারে ছাঁচতলায়। সেদিন আমাদের এক মস্তবড় সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা।

সাহেব অতএব সেই আজেবাজে চোর-জোচ্চোরের দলের মধ্যে পড়ে না। সাধুসজ্জন লোক, ঘরের ছাঁচতলায় স্বচ্ছন্দে যতক্ষণ খুশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। চিনতে পারেন নি বুড়োমানুষটি। এই একটা জিনিস বরাবর দেখে এল, মানুষ কেমন চট করে সাহেবের আপন হয়ে যায়। যেন গুণ করে ফেলে। চটকদার চেহারাখানা, নিরীহ চাউনি, চলাফেরার ভাবভঙ্গি—সমস্ত মিলিয়ে গুণীনের মন্ত্রের চেয়ে বেশি জোরদার। কথা বলছেন গিন্নিঠাকরুন—সত্যিকার মা সে জানে না, বোধকরি তারা ছেলের সঙ্গে এমনিভাবেই বলে থাকে!

অধীর কণ্ঠে মেয়ের উদ্দেশে বলছেন, শুনতে পেলি বড়-খুকি? এঁটোকাঁটা নিয়ে আমি তো মেটেকলসি ছুঁতে পারব না। বাসন ক'খানা মেজেঘষে তাড়াতাড়ি নেয়েধুয়ে আসি। এক্ষুনি জামাই এসে পড়বে।

আশালতা দক্ষিণের ঘর থেকে জবাব দিল: যাচ্ছি মা। আলতার শিশি খুলে নিয়ে বসেছি। এই হয়ে গেল আমার, যাচ্ছি—

সন্ধ্যার দিকে সকলে সাজগোজ করে, এই মেয়ে খাওয়াদাওয়ার বেলায় আলতা পরতে বসে গিয়েছে—ভারি তো শৌখিন মেয়ে তবে! আর ঠাকরুন বললেন তাড়াতাড়ি নেয়েধুয়ে আসবেন, তারও তো গতিক দেখা যায় না। এঁটো থালা চিতানো বাঁ-হাতের উপর ধরে সেই এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে সাহেবের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছেন। চোখে বোধকরি পলকও পড়ে না। বিপদ কেটেছে ভেবে সাহেব নিশ্চিন্ত ছিল, এতক্ষণ পরে সেই শঙ্কার কথা উঠে পড়ে—

তোমায় কোথায় যেন দেখেছি বাবা।

সাহেব গুরুর নাম জপছে মনে মনে। ঘাড় নেড়ে হেসে বলে, আজ্ঞে না, কোথায় দেখবেন? আমি এদিকে আসি নি আর কখনো। গরু কিনতে বেরিয়েছি।

একগাদা আত্মপরিচয় দিয়ে যায়: গাঁয়ে ঘুরে গরু কেনা ভাল, দেখে শুনে খোঁজখবর নিয়ে পছন্দ করা যায়। তা পেলাম না তেমন; মিছামিছি হয়রানি। শেষবেশ গাবতলির হাট আছে—বিস্তর গরু ওঠে, আজকেই তো হাটবার—

বৃদ্ধা এসব শুনছেন না। বলে উঠলেন, হুঁ, নিশ্চয় দেখেছি, মনে পড়েছে—

এমনি সময়ে বাচ্চা ভাইপোটাকে কোলে করে শান্তিলতা পাড়া বেড়িয়ে এল। গিন্নিঠাকরুন হাসি-হাসি মুখে রহস্যভরা কণ্ঠে বলেন, ছোট-খুকি, বল দিকি কে ছেলেটা? দেখি, কেমন মনে আছে তোর।

শান্তিলতা এক নজর দেখে নিয়ে বলে, জানিনে তো মা।

কী তোরা! তুই তো ছিলি সঙ্গে। গরিবপীরের থানে পুজো দিতে গিয়ে পিছল ঘাটে গেলাম। ছেলেটা ধরে ফেলল। প্রাণ বাঁচাল বলতে হবে। প্রসাদ রান্নাবান্না করে একসঙ্গে খেলি তোরা সবাই। দেখ দিকি ঠাহর করে।

শান্তিলতা বলে, মা তোমার চোখের নজর একেবারে গেছে। সে তো কালোভূষো এই গাট্টাগোট্টা মানুষ।

সেই উঠানের প্রান্তে আঁস্তাকুঁড়ের পাশে ঠাকরুন বাসন ধুতে বসে গেলেন। সে মানুষ এই নয়, বুঝতে পেরেছেন। ঘটনাটা মাস পাঁচ ছয় আগেকার। জাগ্রত গরিবপীরের থান দূরবর্তী নয়। প্রতি বৃহস্পতিবার হিন্দু মুসলমান অগণ্য মানুষ থানে যায়, রোগপীড়া বিপদআপদের জন্য মানসিক করে, বিপদ কাটলে ঢাকঢোল নিয়ে মানসিক শোধ দিতে যায় আবার একদিন। হিন্দুর পাঁঠা-বলি মুসলমানের মুরগি-জবাই—একই গাছতলায় পূর্বদিকে আর পশ্চিম দিকে দুই তরফের পুজো-সিন্নি চলে। বড়-পুকুরের দুই পারে দুই জাতের আলাদা রান্নাবান্না ও বিশ্রামের ঘর। সেদিন উপকারী মানুষটাকে ওরা ছেড়ে দেয় নি—বলির পাঁঠা রান্নাবান্না হল, খাওয়াদাওয়ার পর প্রায় সন্ধ্যা অবধি ছিল সকলে একসঙ্গে। ঠাকরুন চোখে কম দেখেন, কিন্তু শান্তিলতার কাঁচা চোখে তফাৎ না বুঝবার কথা নয়।

দক্ষিণের ঘরের দিকে মুখ করে ঠাকরুন আবার বলে উঠলেন, রেকাবিতে করে চাট্টি মুড়কি নিয়ে আসবি রে বড়-খুকি। যা মেয়ে তোরা আজকালকার, জলের কথা বলেছি তো শুধু এক গেলাস জলই এনে ধরলি মুখের কাছে!

আশালতার গলা আসে: মুড়কি কোথায় রেখেছ মা?

বিরক্ত হয়ে ঠাকরুন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন: রেখেছি আমার মাথায়। মুড়কি কোঁচড়ে নিয়ে বাসন ধুতে বসেছি। কুলোয় আছে, নয়তো ধামায়। মাথার উপর দুটো চোখ বসানো আছে কি করতে?

সাহেবের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্বর পালটে বলেন, মনে পড়েছে। ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে এসেছিলে সেবার। নতুন পৈতে হয়েছে, মাথা মুড়ানো। রাত্রে স্বর করে ভাগবত পড়লে—কী মিষ্টি গলা, এখনো ভুলতে পারি নি—

শান্তিলতা বলে, না মা, ঠাকুরমশায়ের ছেলে নয়।

বিরক্ত হয়ে ঠাকরুন বলেন, তোমার নামটা কি বল তো বাবা?

আশালতা খোঁজাখুঁজি করছিল, এই সময়ে রায় দিয়ে উঠল: পাচ্ছিনে তো মুড়কি। নেই।

নেই তবে আর কি হবে? জল চেয়েছে, তাই দাও এনে, আর কতক্ষণ ভোগাবে? আমি গেলে ঠিক পেতাম। একটা কাজ দেখেশুনে গুছিয়ে করবার যদি ক্ষমতা থাকে!

মায়ের বকুনি খেয়ে—বিশেষ করে বাইরের লোকের সমানে—আশালতা রাগে গরগর করতে করতে জলের গেলাস নিয়ে বাইরে আসে। বেরিয়েই ও মা, ও বাবাগো—তুমুল আর্তনাদ।

সাহেবের মুখ সাদা হয়ে গেছে। অন্ধকারে চোখে তো দেখেনি, মেয়েটা চিনল তবে কি করে? শাস্তিলতা খিলখিল করে হাসছে। একটুকরো ঢিল ছুঁড়ে মারল—সাহেবকে নয়, একটা বিড়ালের দিকে। বিড়াল ছুটে পালায়। হাসিতে শাস্তিলতা শতখান হয়ে ভেঙে পড়ে।

মা-ঠাকরুন বলেন, মেয়ের আধিক্যেতা দেখে বাঁচিনে। বাঘ দেখেও মানুষ এমন চেঁচায় না।

অপ্রতিভ মুখে আশলতা জল দিতে এলো। হাত বাড়িয়ে সাহেব নেবে কি, চোখ মেলে দেখেই কুল পায় না। দু-চোখ দিয়ে গিলে যাচ্ছে যৌবনবতীকে। স্নান করে পরিচ্ছন্ন পরিপাটি হয়ে ধবধবে কাপড় পরেছে, আলতা দিয়েছে পায়ে। কপালে সিঁদুরের টিপ, কী সব গন্ধ-টন্ধ মেখেছে, এইসব করছিল এতক্ষণ বসে বসে— কাছে এসে মাথা ঘুরিয়ে দেয়। জান না মেয়ে, সে রাত্রে কাছে যাকে টেনেছিলে সে মানুষ আমি। চোরকে বলে রাতের কুটুম—বিদ্বান বলাধিকারী বাহার করে বলেন নিশিকুটুম্ব। নিশিকুটুম্ব আজ দিনমানে এসে পড়েছি। ওস্তাদের আশীর্বাদী সিঁধকাঠি নিয়ে চোর ছিলাম সে রাত্রে—সিঁধকাঠি বিহনে আজকে মানুষ। জোয়ান যুবা পুরুষমানুষ। আর তুমি যুবতী নারী আমার সামনে।

জলের গেলাস আশালতা হাতে দেয় না, পৈঠার উপর রেখে দিল। নিক ওখান থেকে তুলে। লোকটা কি দেখে রে অমনধারা তাকিয়ে? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আশালতার। ভয় করছে! শিশুটা কোলে নিয়ে শাস্তিলতা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে—আশালতা সেদিকে তাকায়। একফোঁটা মেয়ে তার কোন খেয়াল নেই।

মাঠাকরুন তখন বাসন ধুয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছেন। আশালতা ডেকে বলে, মুড়কি তো নেই, খেয়ে ফেলেছি আমরা সব। ভাত হয়ে গেছে, বল তো ভাত এনে দিই।

ঠাকরুন ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রীত হয়ে বললেন, ভাল বলছিস মা। জামাই আসছে বাড়িতে, দশ রকম রান্নাবান্না—দুপুরবেলা ছেলেটা শুধু-মুখে বেরিয়ে

যাবে, মনটা খচখচ করছিল আমার। চাট্টি ভাতি খেয়ে যাও বাবা। দাওয়ার উপর একটা ঠাঁই করে দে ছোট-খুকি।

আশালতা ভাত এনে দেবে—নিশিকুটুম্বর সেবা আসল জামাই-কুটুম্বর আগে। সাহেব একগাল হেসে বলে, দেন তাই, মালক্ষ্মীকে কখনো না বলতে নেই।

যে ঘরে সিঁধ কেটেছিল, সেই দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় শান্তিলতা জল ছিটিয়ে, পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিল। স্নানে যাচ্ছেন ঠাকরুন, দাওয়ার ধারে এসে একবার দাঁড়ান। পরিচয় দিচ্ছেন : আমার বড় মেয়ে ঐ ভাত আনতে গেল, ওর বিয়ে দিয়েছি এক মাসও হয়নি এখনো। আজকে সেই নতুন জামাই আসছে। বউমা সাত সকালে চান করে রান্নাঘরে ঢুকেছে। ছেলে পাঁচ-বেঁকির মুখ অবধি এগিয়ে বসে আছে—সদর থেকে ফিরছে আজ জামাই—না আসতে চায় তো জোরজার করে নিয়ে আসবে। খুব বড়লোক তারা, নবগ্রামের সেনেরা—

শান্তিলতা ঠাঁই করে দিয়ে ছেলেটাকে কোলে তুলেছে আবার। কথার মধ্যে সে প্রশ্ন করে ওঠে : বেলা তো অনেক হল। আসে না কেন এখনো?

পাঁচবেঁকি তো এখানে নয়। তার উপর উজোন টেনে আসতে হচ্ছে। এইবারে এসে পড়বে। না আসবার হলে একলা মধু পায়ে হেঁটে এতক্ষণ ফিরে আসত।

মধু—মধুসূদন নামে নতুন করে সাহেবের চমক লাগে। বেপরোয়া গোঁয়ারগোবিন্দ মধুসূদনের চিনে ফেলতে মুহূর্তকাল দেরি হবে না। মধুর বউ রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, নইলে সেও চিনত। শান্তিলতার কোলের এই ছেলেটাই রেলের কামরায় ছিল সেদিন। অজান্তে একেবারে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়েছে। তার উপর লোভে পড়ে—আশালতাকে ভাল করে অনেকক্ষণ ধরে অনেকবার দেখবার লোভে—খেতে বসে গেল। বুড়ি ঠাহর করতে পারলেন না—কিন্তু মধুসূদন দেখতে পেলে, এমন কি বউটা দেখলেও রক্ষে নেই। চিনে ফেলবে এক নজর দেখেই। এক্ষুনি আসছে মধু, যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে সরে পড়তে পারলে হয় তার আগে।

মাঠাকরুন হঠাৎ ধরা গলায় বলে উঠলেন, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবা। বড়লোক কুটুম্ব এক-গা গয়না দিয়ে বউকে রাজরানী সাজিয়ে বাপের বাড়ি পাঠাল, সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে চোরে সমস্ত নিয়ে গেছে।

[সতেজ লতার মতো যুবতী মেয়ে—গয়নাগুলো অঙ্গ জুড়ে ফুল হয়ে ফুটে

ফুটে ছিল। সোনার ফুল। খুঁটে খুঁটে সাহেব ফুল তুলে নিয়ে লতা শূন্য করে দিয়ে গেছে।]

ঠাকরুণ বলছেন, জামাই আসছে, ভয়ে লজ্জায় কাঁটা হয়ে আছি বাবা। কী বলব, মনে মনে ওরাই বা কী ভাববে! অভাবে পড়ে মেয়ের গয়না বেচে খেয়েছি, তাই যদি ভাবে বসে—

সাহেবের মনের মধ্যে কেমন করে ওঠে—গয়না গলে গিয়ে এত দিনে যে টাকা হয়ে গেছে! নয়তো সেই গয়না ছুঁড়ে দিয়ে যেত আবার এক রাত্রে এসে। প্রতিবাদ করে উঠল: তা ভাবতে যাবে কেন? সত্যিই যখন সিঁধ কেটেছিল—

সিঁধ তো আমরাও কেটে চেঁচামেচি করে লোক-জানান দিতে পারি। অভাবে মানুষ কত কি করে—

এরই মধ্যে খপ করে বললেন, আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলি। সত্যিই তোমায় দেখেছি, কোনখানে সেটা মনে করতে পারছি নে। হাটের মধ্যে আমার মধুকে মেরেধরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, তুমি বোধ হয় সেই ছেলেটা—সকলের সঙ্গে লড়ালড়ি করে তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে। ঠিক, মনে পড়েছে এবার। রক্তে কাপড়-চোপড় ভেসে যাচ্ছে—মাগো মা, ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে তুমি। গোড়ায় ভাবলাম, জখম তুমিই হয়েছ, পালিয়ে চলে এসেছ হাট থেকে—

এই উদ্বেগের মধ্যে বারম্বার এক ধরনের কথা ভাল লাগে না। সাহেব বলে, ভুল করছেন। আমি নই, সে অন্য কেউ—

বয়স হয়ে ঠাকরুনের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। স্মৃতিও দুর্বল। যত ভাল ভাল কাজ চাপাচ্ছেন সাহেবের উপর। বৃদ্ধাকে বাঁচিয়েছে সে, অথবা তাঁর ছেলেকে। নেহাৎ পক্ষে মুণ্ডিতশির গুরুপুত্র হয়ে ভাগবত পাঠ করে গেছে এ বাড়ি। যে কর্মের মধ্যে সত্যি সত্যি দেখা হয়েছিল, সেটা কিছুতে মনে পড়ে না মা-জননীর।

আশালতা রান্নাঘরে ঢুকে ভাজকে বলে, ও বউদি কুটুম্ব এসেছে।

এসে গেল বর? মধুসূদনের বউ মুখ টিপে হেসে তাড়া দিয়ে ওঠে: তুমি বুঝি ধোঁয়ার মধ্যে মুখ লুকোতো এলে। যাও বলছি, নয় তো চেলা-কাঠের এক বাড়ি—

আশালতা বসে, উঁহু, সে কুটুম্ব নয়—আলাদা একজন। ভেবে ভেবে মা ধরতে পারছে না, মানুষটা কে। কিন্তু কুটুম্ব ঠিকই। জল খেতে চেয়েছিল, শুধু জল দিয়েছি বলে মা রেগে আগুন। দশখানা তরকারি দিয়ে ভাত বেড়ে দিতে বলল।

বউ এবারে রাগ করে উঠল: বাড়িতে জামাই আসছে—এ কোন লাটসাহেব এসে উদয় হল, আগ ভেঙে ভাত-তরকারি দিতে হবে?

দিতেই হবে। নয় তো রক্ষে রাখবে না মা। হেসে চোখ-মুখ নাচিয়ে আশালতা বলে, চুপি চুপি বলি বউদি, চেহারায় কার্তিকঠাকুরটি, ময়ূর থেকে নেমে যেন উঠানের উপর দাঁড়িয়েছে। অত ভাল লেগেছে মায়ের তাই।

রান্না শেষ হয় নি, কড়াইয়ে তেল ঢেলে দিয়েছে, বউ সেদিকে ব্যস্ত! থালা নিয়ে আশালতা ভাত বাড়ল। ডালের সঙ্গে চিংড়িমাছ, ডাল ঢেলে নিয়েছে খানিকটা বাটিতে—

নজর পড়ে বউ রে-রে করে ওঠে: সকলের বড় মাছটা দিয়ে দিলে, এ কোন ঠাকুরজামাই বল তো ঠাকুরঝি?

আশালতা নিরীহ ভাবে বলে, কি জানি কোনটা বড় আর কোনটা ছোট। তোমাদের নিক্তি-ধরা ওজন বুঝিনে আমি বাপু। জামাইয়ের মাছ সিকি আন্দাজ যদি কমই হয়, মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

বউ কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বলে, হুঁ, বুঝতে পেরেছি। মজেছ তুমি কার্তিক ঠাকুরটি দেখে।

পিঁড়ির উপর সাহেব বসে আছে ভাতের অপেক্ষায়। ইচ্ছাসুখে নয়, না বসে উপায় নেই সেই জন্য। দুই পাহারাদার সামনে খাড়া—শান্তিলতা আর গিন্নিঠাকরুন। স্নানে যাওয়া এখনো ঠাকরুনের হয়ে ওঠেনি, সুখ-দুঃখের কথা নিয়ে মেতে গেছেন। সাহেব যেন কতকালের চেনা কত আপন! কথার মাঝে হঠাৎ চুপ করে যান—স্মৃতির সমুদ্রে আলোড়ন চলছে, কোনখানে দেখেছেন একে? কবে? রেলের কামরার মধ্যে সেই বিচিত্র ঘটনার কথা কেউ যদি এখন মনে করিয়ে দেয়, ঘাড় নেড়ে ঠাকরুন নিজেই বেকবুল যাবেন। চুরির কাজের মধ্যে এই ছেলে—অসম্ভব, শত্রুতা করে বলছে।

আশালতা দাওয়ায় উঠে সাহেবের সামনে ঝুঁকে পড়ে ভাতের থালা রাখল। ব্যবধান বিঘতখানেক বড় জোর। কিন্তু সে রাত্রে একেবারে কিছু ছিল না, গায়ে গায়ে শুয়েছিল দুজনে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য তন্ন তন্ন করে খবর নিয়ে গিয়েছিল। জামাই বড়লোক বটে, কিন্তু বয়সে আধ-বুড়ো, চেহারায় কালো-কুচ্ছিত। আলতা পরে গন্ধ মেখে এতক্ষণ ধরে সাজগোজ করেছে সেই লোকের মন ভোলাবার জন্য। দিনমানে একবার দেখ না রূপসী তোমার সেই বরের পাশাপাশি মনে মনে মিলিয়ে। কিছু অভ্যাসক্রমে খানিক হয়তো শিকড় পোড়ানোর ধোঁয়া ও নিদালি-বিড়ির গুণে এবং খানিকটা কারিগরের আঙুলের সম্মোহনে অন্ধকারের মধ্যে আলিঙ্গনে বেঁধেছিলে, কিন্তু আমাদের মতন

আঁধারে দেখবার চোখ যদি থাকত চেঁচিয়ে উঠতে নাকি সতীসাধ্বী বউয়ের যা করা উচিত ?

যৌবন জলছে যেন দুপুরের রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এরই গায়ে গা ঠেকিয়েছিল, যত ভাবছে ততই এখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সাহেব। বাঘের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বুঝি একবার লোকের চোখের সামনে—যা হবার হোক। রাত্রিবেলা গায়ের গয়না চুরি করে নিয়েছিল, ডাকাতি করে আজকে গোটা মানুষটাকেই নিয়ে বুঝি পালায় !

এমনি সময় বাইরের দিকে কলরব। মধুসূদনের গলা : ও মা, এসে গেছি আমরা—

জামাই নিয়ে এসেছে। শান্তিলতা ছুটল। গিন্নিঠাকরুনের স্নানের কথা মনে পড়েছে, এঁটোকাঁটা ছুঁয়ে জামাইয়ের কাছে দাঁড়াবেন কেমন করে ! দ্রুতপায়ে বাঁশতলার পুকুরে চললেন। মধুসূদনের বউ খুন্তি হাতে রান্নাঘরের দরজায়, নজর ঐ বাইরের দিকে। সে নজর সাহেবের দাওয়ার দিকে ফিরবে না, সেটা জানা আছে। আশালতা ঘরে ঢুকে গেছে, সে-ও বর দেখছে সুনিশ্চিত। এইবারের ফুরসত। বড় গলদা-চিংড়ি সাহেব সবেমাত্র থালায় নামিয়ে নিয়েছে। কথা বলতে বলতে মধুসূদন ভগ্নিপতির হাত ধরে উঠানে এসে পড়ল। লহমার তরে দেখে নিয়েছে সাহেব। সেই ফাটা কপাল—জাঁক করে যাকে বলেছিল জয়তিলক।

সাহেব আর নেই। শূন্য পিঁড়ি। পাখি হয়ে উড়ল, কিংবা বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল।

মাথায় উলুখড়ের আঁটি, বলাধিকারীর ফুলহাটায় সাহেব এসে হাজির। বোঝা দাওয়ার উপর ফেলল। পাকানো গামছার বিড়ে মাথা থেকে নিয়ে বাতাস খেল দু-চারবার। বংশীকে ডেকে চাপাগলায় বলে, সমস্ত এসে গেছে —কাঠি ছোরা, লেজা রামদা, যা সমস্ত রেখে এসেছিল। আঁটি খুলে তুলেপেড়ে রাখ।

হেসে বলে, জলজ্যান্ত মানুষের ঘরে ঢুকে সিঁধের মুখে ধনসম্পত্তি বের করে নিয়ে আসি, জলের নিচের ক'টা জিনিস আনব এ আর আর কত বড় কথা !

আশালতাদের বাড়ি ছেড়ে সাহেব সোজা নদীর ধারে অশ্বথের মাথায় চড়ে বসল। আপাতত কিছু নয়, পাতার আড়ালে চুপচাপ বসে থাকা। মহাজনি নৌকো বিদায় হয়েছে, কপালক্রমে ঘাট একেবারে খালি। তাই বলে নামা চলবে না, শখ করে নদীস্নানেও এসে পড়তে পারে শ্যালক আর ভগ্নিপতি।

এলো না অবশ্য। খানিক পরে আন্দাজ করে নিল খাওয়াদাওয়ায় বসেছে এইবার। গুরুভোজনের পরেই তো গড়িয়ে পড়া। এবং হল তো বউয়ের সঙ্গে নতুন জামাইয়ের নিরিবিলি ঘরে কিছু ফষ্টিনষ্টি।

সাহেব পরম নিশ্চিন্তে ধীরেসুস্থে জিনিসগুলো তুলে ফেলল। লেজার লম্বা আছাড় খুলে জলে ছুঁড়ে দেয়। মতলব ঠিক করা আছে—চরের উলুবনে চাষীরা উলু কেটে কেটে আঁটি করে রেখেছে; ঘর ছাইতে লাগে। তারই একটা নিল মাথায় তুলে। সিঁধকাঠি ও ছোরা নিজ অঙ্গের সমান—ঐ দুটো বস্তু আলাদা রাখতে পারে না, কাপড়ের নিচ উরুর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে। আর সমস্ত উলুর আঁটির ভিতর গোঁজা। সদর পথের উপর দিয়ে বুক চিতিয়ে চলে এসেছে সাহেব। চাষাভুষো লোক হামেশাই এমন যায়, চোখ তুলে কেউ তাকায় না।

আঁটি থেকে বের করে সেরে সামলে রাখ বংশী—

বলাধিকারী সাহেবকে দেখে বললেন, একটা চিঠি এসেছে গণেশচন্দ্র পালের নামে। গণেশটা কে, ভেবে পাইনে। বংশী বলল, তোমার তোলা-নাম!

চিঠির নামে সাহেব রীতিমত ভড়কে যায়।

আমার? আমায় কে চিঠি দিতে যাবে? গণেশ নামই ছিল নাকি গোড়ার দিকে। শোনা কথা, জ্ঞান হয়নি তখন আমার। কারও সে নাম মনে নেই, আমার নিজেরও নেই। চিঠি অন্য কারো হবে, ঠিকানা ভুল করে এসেছে।

বলাধিকারী মুখ টিপে হেসে বলেন, তোমার মা লিখেছে।

সাহেব জলে উঠল: মা নেই আমার। থাকলে তবে তো মা লিখবে চিঠি।

বলাধিকারী বিশ্বাস করলেন, মনে হয় না। আগের কথারই জের টেনে বলছেন, বিয়েথাওয়া দিয়ে শোধন করে তুলতে চায় তোমার মা। গব্যরসে যেমন পারা শোধন করে। বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরতে দেবে না।

হাসতে হাসতে তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। পোস্টকার্ডের চিঠির আদ্যন্ত পড়েছেন, তাই আরও বেশি হাসি সাহেবের উৎকট রাগ দেখে। রাগারাগি করে ছোঁড়াটা ঘর থেকে পালিয়েছে, মা তাকে বাঁধার কলাকৌশল করছে। খুব সম্ভব প্রণয়ের ব্যাপার—মনের মানুষ না পেয়ে মনোদুঃখে পালিয়ে এসেছে।

হেসে গেলেন বলাধিকারী—হাসিটা নিদারুণ রকম ব্যঙ্গের। সাহেবের বুকে ধারালো ছুরির মতো কেটে কেটে বসে। বিয়ে করে ঘর-লাগা শিষ্ট মানুষ হয়ে যাবে, এত বড় অপদার্থ ভাবলেন তাকে। সে যেন আর এক বংশী। বংশীও কথাটা শুনে নিল—কত রকম ঠাট্টাতামাশা করবে সে, সকলকে বলে দেবে।

উপস্থিত বংশীর কাছেই সাহেব সাফাই দিচ্ছে: মা-টা নেই আমার। কোনদিন ছিল না।

চিঠি হাতে করে এমনি সময় জগবন্ধু বলাধিকারী ফিরে এলেন।

নেই বুঝি মা তোমার? পড়ে দেখ, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। কুড়িখানেক কনে দেখা হয়ে গেছে, গোটা চার-পাঁচ মনে ধরেছে তার ভিতর। মা নেই তো করছে কে এত সব? ছেলের বিয়ে দিয়ে গৃহস্থালী পাতাবার সাধ মা ছাড়া কার এমন?

থেমে গিয়ে হঠাৎ কৌতুককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, রানীকে জানো তুমি?

চমক লাগে সাহেবের। এত খবর ঐটুকু চিঠিতে। বিয়ের কথা, আবার রানীর কথাও! মুখ টিপে হাসছেন বলাধিকারী। প্রণয়ের ব্যাপার ভেবেছেন, কিন্তু সাহেবের একেবারে নির্বিকার ভাব। এটুকু যদি না পারবে, অতবড় ওস্তাদের কাছে শিখল কি এতদিন ধরে? চোর গ্রেপ্তার করে দারোগা কত রকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তার উপরে বাঘা-বাঘা উকিল-হাকিমের জেরা—তুমি নিপাট মালমানুষ হয়ে বেকবুল যাচ্ছ আগাগোড়া। সিকিখানা কথা আদায় করতে পারবে না কেউ। শিক্ষা তো এই।

রানীকে চেনো না?

সাহেব বলে, দুনিয়া জুড়ে কত রাজা কত রানী রয়েছে। তাদের চেনবার লোক কি আমরা?

মুকুট-পরা রানী নয়। রানী বলে একটা মেয়ে। এখন তার অনেক টাকা। খুব ধনীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বুঝি?

দেন তো দেখি—

ফস করে পোস্টকার্ডটা একরকম ছিনিয়ে নিল জগবন্ধু বলাধিকারীর হাত থেকে। চিঠি চোখের সামনে ধরে বলে, বুঝেছি, নফরকেষ্টর কারসাজি। হাতের লেখা লেখার বয়ান সমস্ত তার। মার খেতে খেতে পালিয়ে বাঁচল—সেই রাগ রয়েছে তো! দল থেকে বের করে আবার আমাকে কালীঘাটে নিয়ে ফেলতে চায়। তাই তো বলি, সরকারের জল-পুলিসে পাত্তা পায় না, আর পোস্টকার্ডের চিঠি এতগুলো গাঙ-খাল স্টেশন-বন্দর পার হয়ে এসে ধরে ফেলল —পিছনে চর না থাকলে এমন হয় না। নফরাই ঠিকানা জানে, সে ছাড়া অন্য কেউ পারত না।

নফরকেষ্ট মানুষটা এই ফুলহাটাতেই ছিল, সাহেবের সঙ্গে এসেছিল। কাজের মধ্যে সর্বনাশা বেকুবি করল, তুমুল কাণ্ড হতে হতে কোন রকমে বেঁচে এল সবাই। অনেক রকমে জগবন্ধু তাকে দেখেছেন। সেই মানুষের এমন

ক্ষমতা, বিশ্বাস করবেন কেন? বলবেন, ইতি—'তোমায় মা' বলে সই করেছে, কিন্তু সুধামুখী দাসী।

সাহেব আরও জোর দিয়ে বলে, সুধামুখী-টুখি কিছু নয়, রানীও কেউ নেই। আগাগোড়া বানানো।

ঝকমকে হস্তাক্ষর, এমন খাসা রচনাশক্তি—রীতিমত গুণীলোক তবে তো! বললে না কেন, এখানে যখন ছিল। তবে আর ছেড়ে দিই! চাকরি দিয়ে কাছে কাছে রাখতাম। আমার আত্মজীবনী বলে যেতাম, নিজের মতন করে সে লিখত। নবেল-নাটক হার মানত সেই বইয়ের কাছে।

হাসতে হাসতে জগবন্ধু আবার বললেন, নফরকেষ্টও কিন্তু বলত, বাপ হয় সে তোমার। বংশীকে বলেছে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে বলেছে, আরও বলেছে কতজনকে। তুমি বলছ বানানো। বানানো বাপ, বানানো মা। তুমি কি তবে স্বয়ম্ভু হয়ে ভুবনে এসেছ বাপধন? স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা—সুবর্ণঅণ্ডে জলের উপর জন্ম?

সাহেব রাগ করে বলে, বিশ্বাস হবে না জানিই তো। চোরের কথা কে বিশ্বাস করে!

বলাধিকারী তখন কোমল স্বরে বলেন, যাদের ঘরের কনে বাছবাছি হচ্ছে, পিতামাতা গাঁইগোত্র নিয়ে তারাই সব মাথা ঘামাক। আমাদের বিশ্বাস হল না-হল কী যায় আসে! পড়ে ফেল চিঠিখানা, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। কালীঘাটে নিয়ে তোলবারই যদি ফিকির—যে বিদ্যে শিখেছ, শহরে গিয়ে কিন্তু কোন সুবিধে হবে না। শহরের কাজের ধরন আলাদা। সে হল তাস-পাশা খেলার মতো—একটুখানি জায়গার মধ্যে এক ঘণ্টা দু-ঘণ্টার ব্যাপার। তোমার কাজ হল দরাজ জায়গায় খেলা দেখানো। বড় বড় গাঙ ভারি ভারি গাঁ-গ্রাম বনজঙ্গল ডাঙা-ডহরের এলাকা জুড়ে দিগ্বিজয়ী বাহিনী। কেনা মল্লিকের নামই শুনেছ, মরশুম এলে বেরিয়ে পোড়ো তাদের কোন একটা দলের সঙ্গে। তোমার মতন কারিগর লুফে নেবে তারা। বৃহৎ কাজের নমুনা দেখে এসো স্বচক্ষে। মস্তবড় জীবন সামনে—দেখেশুনে বুঝে-সমঝে তারপর পথ ঠিক করে নাও।

চিঠি নিয়ে সাহেব চলে গেল। গেল নির্জন খালের ধারে। ফ্রী প্রাইমারি ইস্কুলে যাতায়াত ছিল, তার উপরে বলাধিকারী মশায়ের সঙ্গে এতগুলো দিন। সঙ্গদোষে এখানেও দশ-বিশটা বই পড়ে ফেলেছে। জগবন্ধু বলেন, ও সাহেব, তোমার যা মাথা, নিয়মিত লেখাপড়া করলে—

সাহেবের তুড়ুক জবাব: করলে কচু হত। হতাম আর এক মুকুন্দ মাস্টার! ওরে বাবা, কী বাঁচা বেঁচে গিয়েছি!

সুধামুখী সাহেবকে লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিল। তারই জেদে ইস্কুলে যেতে হয়েছিল কিছুকাল। চিঠি অতএব না পড়তে পারার কথা নয়। মুক্তার মতন ঝকঝকে অক্ষরগুলো সাজিয়ে গেছে—না পড়ে চিঠির উপর শুধুমাত্র একবার হাত বুলিয়েই বোধকরি মর্মকথা বলে দেওয়া যায়।

কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরে সুধামুখী স্বপ্ন দেখছে।

সাহেবের বিয়ের আগেই বস্তি ছেড়ে তারা ভদ্রপাড়ায় গিয়ে উঠবে। কালীঘাট থেকে অনেক দূরে, কালীঘাটের লোক যে পাড়ায় না যায়। বস্তির ঘরে পুরুষ ডেকে ডেকে এনে দিন গুজরান করত, সাহেবের বউ সে কথা জানবে না, নতুন পাড়ার কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। মনের বাঞ্ছা সুধামুখী কতদিন মুখে মুখে বলেছে—সাহেবকে বলেছে, নফরকেষ্টর কাছে বলেছে। পিছন-পথের সকল পঙ্ক গঙ্গাজলে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে নতুন পাড়ার নতুন জীবনে যাবে। পোস্টকার্ডের চিঠিতে খোলাখুলি লেখা চলে না। কিন্তু বরানগরে ঘর দেখে পছন্দ করে এসেছে—বাসা বদলের মানেই তো সেই পুরানো অভিপ্রায়। অথচ বস্তির নতুন মালিক হচ্ছে নাকি অন্য কেউ নয়—রানী। টাকা হয়েছে রানীর, মাটকোঠা ভেঙে ইতিমধ্যেই তাদের দু-কুঠুরি দালান হয়ে গেছে। বস্তি ছাড়তে হলে সুধামুখীর রাতারাতি পালাতে হবে—চোখের উপর দিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই, রানী সে মেয়ে নয়।

সাহেবকে বলাধিকারী ঠাট্টা করে বলেন স্বয়ম্ভু। বিস্তর পুঁথিপত্র পড়া আছে, তাই দেবতাগোঁসাইয়ের তুলনা দিয়ে বললেন। দেবতা না হয়ে সাহেব হল সিঁধেল চোর। বাপমায়ের ব্যাপারটা কিন্তু তা-বড় তা-বড় দেবদেবী মুনিঋষিদের মতোই গোলমেলে। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মা হরিণী, সীতা লাঙলের ফলায় উঠে এলেন, বশিষ্ঠ জন্ম নিলেন ভাঁড়ের মধ্যে—

এই কথাবার্তার সময় বংশীটা ছিল। কৌতূহলে এক সময়ে বলল, নফরা আমাদের কাছেও বলেছে কিন্তু। নেশার মুখে বেশি করে বলত, আর হাউহাউ করে কাঁদত। সে নাকি বাপ হয় তোমার—

সাহেব নির্লিপ্ত কণ্ঠে ভিন্ন কথা বলেন এখন : হতে পারে।

বলাধিকারী মশায়ের কাছে তবে যে 'না' বলে দিলে ?

সাহেব বলে, না-ও হতে পারে। মিথ্যুকে আর সত্যবাদীতে মিশাল দুনিয়া। সত্যি মিথ্যে কোনটা সে বলত, কে জানে ?

বংশী আবার জিজ্ঞাসা করে, আর ঐ মায়ের কথাটা—বললে কে মা নেই তোমার ?

সাহেব দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলে, মা নেই তো ভবধামে এলাম কি করে? জন্মেছি যখন মা ঠিক আছে একটা।

হাসছে সাহেব। হেসে উঠে বলে, অত খোঁজ কেন রে বংশী? মেয়ে বিয়ে দিয়ে জামাই করতে চাও? সবেধন একটা ছেলে তো তোমার। তা দুনিয়া আজব—বউয়ের পেটে না হলেও কত মেয়ে কত দিকে জন্মে থাকতে পারে। সেই মুনিঋষির কাল থেকেই হয়ে আসছে!

জ্ঞান হওয়া অবধি এই বড় সমস্যা সাহেবের—কে তার বাবা? মা কে? নফরটা বড় আঁকুপাকু করে—কিন্তু নফরকেষ্ট নামের বদলে নফরকালি বলে তার মিশকালো রঙের জন্য—ঐ বাপের সাহেব হেন ছেলে কেমনে হতে পারে? সুধামুখীও তেমনি মা নয়—হাড়গিলের শাবক হাড়গিলেই হয়, মানুষ হয় না কখনো। তবু কিন্তু মনটা কী রকম হয়ে আছে সেই থেকে—সুধামুখীর চিঠি যখন তখন চোখের সামনে মেলে ধরে। হঠাৎ এক সময় দুর্নিবার ঝোঁক উঠল—সাহেব এক বেলার পথ পোস্টঅফিস অবধি গিয়ে পোস্টমাস্টারকে দিয়ে ইংরেজিতে ঠিকানা লিখিয়ে চিঠির জবাব ডাকে দিয়ে এল: চাকরিতে আছি আমি, ভাবনাচিন্তা কোরো না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। ইতিমধ্যে কিছু টাকাও পাঠাচ্ছি, নতুন বাসার দরুন বায়না দিতে হয় তো দিও।

কালীঘাট ছাড়বে সুধামুখী, কিন্তু শহর ছাড়ার কথা মাথায় আসে না। আসবে তো আসুক চলে পাকারাস্তা আর কলের জলের মোহ কাটিয়ে, পিছনের জীবন বিস্মৃতির জলে ডুবিয়ে দিয়ে। কোন এক বিশাল গাঙে ঢেউয়ের আছাড়িপিছাড়ি, তারই কূলে বাড়ি তুলবে। সুধামুখী হল শাশুড়ী, আশালতার মতো একটা ডাগরডোগর বউ। গোলপাতার ছাউনির ঘর একটা-দুটো, লাউয়ের মাচা উঠানে, লম্বা লম্বা লাউ ঝুলে আছে। কানাচের ছোট্ট পুকুরে প্যাক-প্যাক করে পাতিহাঁস নামে সকালবেলা। মাঘ মাসে ধানের পালায় পালায় উঠানে পা দেবার জায়গা থাকে না। বাচ্চাছেলে থপথপ করে লুকোচুরি খেলে বেড়ায় ধানের পালার আড়ালে আবডালে। আশালতা ছুটে গিয়ে ধরে তোলে বুকের উপর: মাগো মা, চলে যাচ্ছিল বাঁশতলার পুকুরের দিকে, কী যে করি এই ডাকাতটুকু নিয়ে!

যুবতী নারীর গায়ে ঠিক বিষ থাকে। বিষের ছোঁয়া সে রাত্রে গায়ে লেগেছিল, তারই জ্বালায় বংশীর কাজটা সে নিজে নিয়ে নিল। সিঁধকাঠি আনার নামে চলে গিয়েছিল জুড়নপুর গাঁয়ে আশালতার কাছে। সুধামুখীর বেলা সাহেবকেও ঠিক নেশায় ধরেছে, নেশার ঝোঁকে সুধামুখীর চিঠির জবাব দিয়ে এল। কিম্বা মনের গড়নটাই তার এমনি। মনের উপরে যখন তখন

স্বপ্ন খেলে বেড়ায়। বাপ কিম্বা মা একজনের মন বোধহয় এইরকম ছিল, সাহেব তাই পেয়েছে। মা কিম্বা বাপের একজন ছিল ভাল, খুব ভাল—অপর জন রাক্ষস।

জন্মলাভের সময় শিশুর যে জ্ঞানবুদ্ধি থাকে না! ক্ষুদে শিশু চোখ পিটপিট করে দেখছিল সেই রাক্ষস বাপ বা রাক্ষসী মায়ের ষড়যন্ত্র, কিন্তু বড় হয়ে মনে নেই আর কিছু। তা হলে সত্যিকার বাপ খুঁজে বের করে ফেলত। কিম্বা সেই মা-জননীটিকে। কী করত তখন! চুলের মুঠি ধরত গরীয়সী জননীর: বাপের নামটা বল্, বাপ চিনিয়ে দে। চুলের মুঠি ধরে বনবন করে পাক দিত। বয়সটা কত হবে এখন সাহেবের? আঠার অথবা কুড়ি। সঠিক বলতে পারে সুধামুখী। সেই ততটা বছর আগে এই কব্জির জোর আর মানুষ চেনবার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে জন্ম নিতে পারত যদি!

চলে যাই সেই আঠারো অথবা কুড়িটা বছর পিছিয়ে সায়েব-চোরের যখন জন্ম। কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধারে—গঙ্গার ঠিক উপরে বস্তি। দোতলা মাটকোঠা। সুধামুখী ও আর কতকগুলো মেয়ে থাকে।

দুই

আদিগঙ্গার উপরে মাটকোঠা। মেয়েরা থাকে। বিকালবেলা সেই মেয়েদের সাজগোজের ধুম। সন্ধ্যা থেকেই রাজকন্যা এক একটি। পরের দিন ঘুম ভাঙতে বেলা দেড়প্রহর। তখন বিসর্জনের পরের প্রতিমার মতো খড়-দড়ির বোঝা।

এক বিকালে সুধামুখীর সাড়া-শব্দ নেই, ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় টোকা পড়ে, ফিসফিসিয়ে তার নাম ধরে ডাকছে।

ভিতর থেকে সুধামুখী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: শরীর ভাল নেই। চলে যাও।

মিহি গলায় সুর করে ডাকছিল, মানুষটা এবার খিকখিক করে হেসে উঠে।

বুঝতে পেরেছে সুধামুখী, নিঃসংশয় হবার জন্ত তবু একবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কে?

গলায় চিনলে না, হায় আমার কপাল! কঙ্কেষ্ট আমি গো। নফরা,

নফরকালি—বেটা বললে বোঝ। দুয়োর এঁটে দিয়ে কার আদর-সোহাগ হচ্ছে শুনি ?

এ হেন কথার উপরেও সুধামুখী বাপ তুলে মা তুলে করকর করে ওঠে না। প্রেমের গৌরচন্দ্রিকা হল গালি—ঐ বস্তুর লোভে নফরকেষ্ট মজে আছে, এত কালেও নেশা কাটে না। খানিক সে হতভম্ব হয়ে থাকে। একটা-কিছু হয়েছে আজ ঠিক, বড় রকমের কোন গোলমেলে ব্যাপার।

বলে. খবর আছে। দুটি বাবু গান শুনতে আসবে আজ।

বললাম তো শরীর গতিক খারাপ। পেরে উঠব না, বল গিয়ে সেই বাবুদের।

নফরকেষ্ট এবারে সত্যি রেগে গেল : স্বর্গ-মর্ত্য চুঁড়ে মানুষ আনব, এক কথায় উনি নাকচ করে দেবেন। খোল না দরজা, কী হয়েছে দেখি।

সুধামুখীর এবার নরম হতে হয়। নফরকেষ্টর সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক। বয়সের সঙ্গে কুঞ্জবনের বিহঙ্গেরা পিঠটান দিয়েছে, শুধু এই নফরায় ঠেকেছে। কুহু-ডাকা কোকিল নয়, নিশিরাত্রের পেঁচা। অনেক দিনের মানুষটা, সেসব দিনের একমাত্র অবশেষ।

একদিন নফর ভাবে গদগদ হয়ে মনের কথা বলে ফেলেছিল। এমনি এক বিকালবেলা। সুধামুখী স্নান করে এসে চুল আঁচড়াচ্ছে, পাউডার বুলাচ্ছে মুখে, গয়নাগাটি পরছে। নফরকেষ্ট উদয় হয়ে হঠাৎ প্রেমগুঞ্জন শুরু করে দিল : ভালবাসি, তোমার মতন কাউকে ভালবাসিনি আমি জীবনে।

সুধামুখীর হাত জোড়া, এতগুলো কথা তাই বলতে পেরেছে। কানের ছিদ্রে টাবজোড়া লাগানো শেষ করে ধাঁই করে চাপড় কষিয়ে দিল নফরকেষ্টর গালে। পাহাড়ের মতো জোয়ান পুরুষটা হকচকিয়ে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

মিথ্যে বলবে না। অত সব বানানো কথা তোমার মুখে শুনতে পারিনে।

মিথ্যে বলছি, কেমন করে জানলে ? ভাল না বাসলে পিছন পিছন ঘুরি কেন দিনরাত ?

বউ আমল দেয় না, বারো মাস বাপের বাড়ি পড়ে থাকে, সেইজন্যে। বউয়ের সোহাগ পেলে থুতু ফেলতেও আসতে না। কিন্তু দিনে আসতে মানা করে দিয়েছি না ? দিনমানে কিছু নয়, তোমার ভালবাসা রাত্রে—গভীর রাত্রে। সন্ধ্যারাত্রের মানুষেরা ভালটাল বেসে চলে যাবে, তারপরে। তারা টাকা দিয়ে ভালবাসে, তোমার মুফতের ভালবাসায় তো ক্ষিধে মরবে না। রাত করে এসো—ভালবাসা পাবে।

নিশিরাত্রে নফরকেষ্টর আসার সময়। সুধামুখীর দিনকাল এখন খারাপ—আপোসে বড় কেউ ভালবাসতে আসে না। সন্ধ্যারাত্রে আগেকার মতন। তদ্বির করে আনতে হয়। সে তদ্বির সুধামুখী নিজে তো বটেই, নফরকেষ্টও করে থাকে। আজকে তেমনি এক খবর নিয়ে এসেছে।

নফর বলে, দেখি কী হয়েছে তোমার।

গায়েগতরে ব্যথা, মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। চোখে দেখে কী বুঝবে তুমি?

আরও খানিকটা ইতস্তত করে ধীরেসুস্থে সুধামুখী দরজার খিল খুলে দিল। আজকে যা হয়েছে, ঠিক এমনি জিনিসই একদিন ঘটেছিল তার জীবনে। পুরানো কথা নফরকেষ্টর জানতে বাকি নেই। সে এসে দেখবে, বড় লজ্জা হচ্ছে। ভয়ও বটে। যদি সে খোঁটা দিয়ে কিছু বলে বসে। বহুকালের ক্ষতে রক্ত ঝরবে আবার।

তা হলেও খুলতে হয় দরজা। খুলতে খুলতে সহজভাবে একটা সাফাই গেয়ে রাখে: যেটা ভাবলে, মোটেই কিন্তু তা নয়। বাইরের মানুষ নেই ঘরে। থাকলে কেন বলব না, কাকে ডরাই?

খুব আড়ম্বর করে নফরকেষ্ট উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আলনার কাপড়চোপড় সরিয়ে দেখে। ঘাড় লম্বা করে বড় আলমারির পিছনটা দেখে নেয়। এসব সুধামুখীকে চটাবার জন্য! চটে গিয়ে গালিগালাজ করবে অন্য দিনের মতো, নিষ্প্রাণ ঘর অকস্মাৎ রসে টইটম্বুর হবে, উঠানে জানলার সামনে হয়তো বা অন্য মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে দাঁড়িয়ে যাবে। ভারি সে এক মজা!

কিছুই না। পালঙ্কের পাশে গিয়ে নফরকেষ্টর নিজেরই মুখে বাক্য নেই। দুষমন চেহারার পুরুষ, মহিষের মতো মোটা, মহিষের মতোই কালো, টকটকে রাঙা চোখে চেয়ে দেখে না—যেন রক্ত শুষে নেয়। সেই দৃষ্টিদুটো দিয়ে পাখির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে যেন। পালঙ্কের গদির উপরে শাড়ি ভাঁজ করে এক বাচ্চা শুইয়ে দিয়েছে।

নফরকেষ্ট বলে, সুধা, তুমি মিছে কথা বললে। মানুষ নেই নাকি ঘরে?

একগাল হেসে সুধামুখী বলে, বয়স একদিন কি দুদিন। এই আবার মানুষ নাকি? রক্ত-মাংসের দলা—

গভীর কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে ওঠে, রক্ত-মাংস নয় গো, মাখন। মাখনের পুতুল গড়ে পাঠিয়েছেন বিধাতাপুরুষ।

সুধামুখী কোথা থেকে মধু সংগ্রহ করেছে। দরজা খুলতে গিয়েছিল, ফিরে এসে আবার এক ছিটে মধু আঙুলের ডগায় লাগিয়ে বাচ্চার মুখে ধরল। চুকচুক করে কেমন সেই আঙুলটা চুষছে।

নফরকেষ্ট বলে, রাক্ষস। তোমার আঙুলসুদ্ধ না খেয়ে ফেলে!

হেসে আবার আগের প্রসঙ্গই শুরু করে: বাচ্চাছেলে মানুষ না-ই হল, বাইরের বটে তো! পুরো সত্যি তবে হল কই?

সুধামুখী বলে, বাইরের কেন হবে! আমার ছেলে।

তোমার? কবে হল গো?

আজ সকালে।

পালঙ্কের কাছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথার পিঠে কথা দিয়ে রসের ঝগড়া চলল খানিকক্ষণ। নফরকেষ্ট ব্যাপার খানিকটা আন্দাজ করেছে। ঘাড় নেড়ে বলে, ছেলে তোমার নয়—আমার, আমার। সকাল থেকে পাচ্ছিলাম না খুঁজে, এখানে এসে জুটেছে কেমন করে বুঝব?

ফিকফিক করে হাসে একটু আপন মনে। বলে, কালকুটি পাথরের বাটি, তোমার আম্বা দেখে বাঁচিনে সুধামুখী। মুখের উপর বলছি, রাগ করো না। ছেলে তোমার হলে, ঐ যে কাপড়ের উপর শুইয়ে দিয়েছ—ছেলের ঘামের কালিতে ওটা এতক্ষণ কাল হয়ে যেত।

সুধামুখীর ভারি ভাল মেজাজ, কিছুতে আজ রাগ করে না। বলে, তুমি কিন্তু নফরকালি সাক্ষাৎ কন্দর্পঠাকুর। চেহারায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। ছেলে তোমার, এক নজর দেখেই লোকে সেটা বলে দেবে।

নিজ অঙ্গের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নফরকেষ্ট বলে, তা কেন। আমার বউ দেখনি তো। মাগী আধা মেমসাহেব। ছেলে যদি মায়ের রং পেয়ে থাকে?

সুধামুখী তর্ক করে: আমার বেলাও বা সেইটে হবে না কেন? কতলোক আসে—তার মধ্যে যে জন ওর বাপ, সে হল খাঁটি বিলাতি সাহেব। ছেলে বাপের মতন হয়েছে।

নফরাকে কোণঠাসা করবার জন্য হঠাৎ আবার বলে ওঠে, তবু যদি একদিনের তরে ঘরবসত করত তোমার মেমসাহেব বউ!

ব্যথার জায়গাটায় নিষ্ঠুর সুধামুখী ঘা দিয়েছে। হাশিখুশি রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে গরল উঠে গেল। মেজাজের মুখে নফরকেষ্ট সমস্ত খুলে বলেছে সুধামুখীর কাছে। কথা সে পেটে রাখতে পারে না, বলেকয়ে খালাস। খুব সুন্দরী বউ নফরার, হাজারে অমন একটা হয় না।

সুধামুখী বলে, কতই তো মেম আছে দুনিয়ায়। ট্রামরাস্তা ধরে এগিয়ে যাও, চৌরঙ্গিপাড়ায় ডজন ডজন মেমসাহেব। লঙ্কায় সোনা সস্তা—তোমার কোন মুনাফা তাতে?

নফরকেষ্ট সগর্বে বলে, বিয়ে-করা বউ আমার। মন্তোর পড়ে সাতপাক ঘোরানো। বড় শক্ত গিঁঠ—তিন সাতে একুশটা উল্টো পাক দিলেও ফাঁক কাটিয়ে বেরুবার জো নেই। যাবে কোথায়? আজ না হল কাল, কাল না হল পরশু—

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলে, আমি খারাপ কিনা! ভাল হলে আসবে বলেছে।

খাওয়ানো শেষ হয়েছে। মধুর শিশি কুলুঙ্গিতে রেখে সুধামুখী নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, ভাল হয়ে গেলেই তো পার।

সে আর এ জন্মে হবে না। লেখাপড়া করিনি, স্বভাব নষ্ট করে ফেলেছি। নইলে যা বউ আমার—পেটে ছেলে ধরলে ঠিক এই জিনিসই বেরুত। কিন্তু আমিও ছাড়ছিনে। ভাইকে সব খুলে বললাম, ভাল হতে যদি না-ই পারি টাকা হলে তোমার বউদি এসে পড়বে ঠিক! দিনরাত টাকার ধান্দায় ঘুরি। হাতে কিছু জমলেই বাড়ি চলে যাই। তোমায় আর কি বলব, কোন্‌টা তুমি জান না সুধামুখী? রমারম খরচা করি বাড়ি গিয়ে; হাটে গিয়ে সকলের বড় মাছটা কিনি, মানুষজন ডেকে ডেকে খাওয়াই। বুঝলে না, মাছ মারতে গিয়ে চার ফেলে যেমন আগে—চারের গন্ধে মাছ আসে। শ্বশুরবাড়ি তিন ক্রোশ পথ—খবর পৌঁছতে দেরী হয় না। চার ফেলেই যাচ্ছি—মাছ আসে আসে, আসে না। একবার প্রায় এসে গিয়েছিল, কিন্তু টাকাকড়ি তদ্দিনে ফুঁকে গেছে। চারেই সব খরচা হয়েছে, টোপের মসলা নেই। পালিয়ে এলাম।

হেসে উঠল উদ্দাম হাসি। মস্তবড় দেহখানা হাসির দমকে দুলে দুলে ওঠে। ছেলের দিকে একনজরে তাকিয়ে আছে। বলে তাগড়া একটা বউ গাঁথা চাট্টিকথা নয়, মবলগ টাকা লাগে। তাই সই, আমিও ছাড়ছিনে।

সুধামুখী হেসে বলে, 'একবার না পারিলে দেখ শতবার, পারিব না এ কথাটি বলিও না আর'—

কথাবার্তা সহজ হয়ে এসেছে। নফরকেষ্ট বলে, কষ্টদুঃখের কথা থাক। এই ছেলে কিন্তু সত্যি সত্যি মেমের বাচ্চা। চৌরঙ্গিপাড়ারই কোন মেম-সাহেবের। আমাদের পাড়ায় এ জিনিস হয় না।

সুধামুখী বলে, যেমন তোমার কথা। মেমসাহেব বাচ্চা ফেলতে আদি-গঙ্গায় এসেছে! তে-মহলা, চার-মহলা মস্ত মস্ত বাড়ি—কত ভাল ভাল মেয়ে সেই সব বাড়িতে। ধুলো লাগে না, মাটি লাগে না, কাজকর্ম করে বেড়াতে হয় না, ঝিলিক মারছে গায়ের রং। মেমসাহেব তাদের পা ধোয়ানোর যুগ্যি নয়। দেখ নি, মোটর হাঁকিয়ে তারা মায়ের মন্দিরে আসে—

কথা কেড়ে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, মন্দিরে এসে মায়ের দিকে তাকায় না একবারও—ফালুকফুলুক করে! নাটমণ্ডপের উঠান থেকে ফুলবাবু কেউ ইশারা দিল, চলল গাড়ি হাঁকিয়ে ঢাকুরে গোড়ে ছাড়িয়ে যে চুলো অবধি দুজনের চার চক্ষু যায়।

সুধা বলে, ফল তারপরে একদিন গঙ্গায় সমর্পণ করে দিয়ে যায় চুপি চুপি কালির দাগ মুছে যেমনকার তেমনি ঘরে ফেরে।

বাচ্চার গলার দিকে নজর পড়ে যায় হঠাৎ; নফরকেষ্ট হেন দস্যুমানুষও শিউরে উঠল: হায় হায় গো, গলা টিপে মারতে গিয়েছিল। গলার উপর আঙুলের দাগ কালশিটে পড়ে আছে। পেটের সন্তান দম আটকে মেরে ফেলে—মা নয় সে রাক্ষসী।

সুধামুখী বারংবার ঘাড় নেড়ে আর্তনাদের মতো বলে মা কখনো করেনি, কখনো না। বাবা, পুরুষমানুষ। মেয়েমানুষে এ কাজ পারে না।

তার বাচ্চার বেলা সুধামুখী গলায় দাগ পায় নি পেয়েছিল গলার ভিতরে—নুন। গালের ভিতরে নুন ঠেসে ঠেসে নাক টিপে মেরে ফেলা। পুরুষের পাকা হাত ছাড়া তেমন কাজ হয় না। সে পুরুষ নার্সিং-হোমের ডাক্তারবাবু। কিংবা সুধামুখীর বাবা—অতি নিরীহ পুণ্যবান মানুষটি। অথবা এমন হতে পারে, বাচ্চার জন্মদাতা প্রেমিকপ্রবরটি হঠাৎ কোন ফাঁকে আবির্ভূত হয়ে পিতৃকর্তব্য সেরে গেছে।

তিক্ত কণ্ঠে সুধামুখী বলে, খুনজখম পুরুষের পেশা নফরকালি। পুরুষেরা রাক্ষস।

নফরকেষ্ট আজকে যেন যাবতীয় পুরুষজাতির প্রতিনিধি। জোর গলায় সে সুধামুখীর প্রতিবাদ করে: পুরুষের খুনোখুনি সামনে সামনে—খুন করতে গিয়ে খুনও সে হয়ে যায়। একদিন-দুদিন বয়সের একফোঁটা অবোধ শিশু যার সঙ্গে কোন রকম শত্রুতা নেই—

শত্রুতা নেই কী বলছ! পেটের শত্তুর—পেটে জন্মানোই যে শত্রুতা। ধার্মিক মানুষ আমার বাবা একটা মাছি-পিঁপড়ে মারতে কষ্ট হয়—এমন মানুষটিও ক্ষেপে ওঠেন ক্ষুদে শত্তুর নিপাতের জন্য।

বলতে বলতে সুধামুখীর কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। সেই বাচ্চাকে পেয়ে গেছে আবার যেন। ছেলে নয়, সেটি মেয়ে। প্রসবে বড় কষ্ট পেয়েছিল দিনরাত, তারপরে কাতর হয়ে ঘুমাত। সন্দেহ, ডাক্তার চৌধুরির কারসাজি—ওষুধ দিয়ে তিনি ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। পরে একদিন এই নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া, মায়ের মন বলে সন্দেহ উঠেছিল কেমন একটা।

নার্সটাকেও সে উত্যক্ত করে তুলল। নার্স-ডাক্তারে স্তোক দিয়েছিল: ভাল আছে, শিশু ঘুমুচ্ছে। নিয়ে এল তারপর সামনে। আনতেই হল, সুধামুখী এমন চেঁচামেচি করছে। জীবনদীপ নিবে গেছে তখন—মুঠি-করা হাত দুখানি, চোখ দুটি বন্ধ।

কঠিন মুঠিতে সুধামুখী ডাক্তার চৌধুরির হাত চেপে ধরল: ঘুমুচ্ছে বললেন যে, ঘুম থেকে জাগিয়ে দিন এবার। দিন, দিন—

রোগিনীর মূর্তিতে ডাক্তার ভয় পেয়ে গেছেন, মুখে হঠাৎ উত্তর যোগায় না। বললেন, আমাদের কাজ বাঁচিয়ে তোলা, মেরে ফেলা নয়। চেষ্টা যথেষ্ট করেছি, কিন্তু হেরে গেলাম। গর্ভাবস্থায় অনেক বিষাক্ত অষুধ খাওয়ানো হয়েছে, শিশু শেষ পর্যন্ত ধকল সামলাতে পারল না। গালিগালাজ তাদের দাওগে, ব্যবস্থা দিয়ে যারা সেই সব অষুধ গিলিয়েছে।

সহসা সুধামুখীর নজরে পড়ে, নুন আছে বাচ্চার ঠোঁটের কোণে, নুনের গোলা। হাঁ করাতে গালের মধ্যেও কিছু ভিজে নুন পাওয়া গেল। ডাক্তার পাগলের মতো দিব্যিদিলেশা করেছেন, তিনি কিছু জানেন না, একেবারে কিছুই না। অমলা নামে নার্স মেয়েটা—ডাক্তার চৌধুরি পরে যাকে বিয়ে করেন, বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন—সে-ও নির্দোষ। ব্রতের মতো রোগী-সেবা নিয়ে পড়ে আছে, এমন জঘন্য কাণ্ড সেই মেয়ের সম্বন্ধে ভাবতে যাওয়াও মহাপাপ।

বললেন, নার্সিং-হোমে তোমার বাবাও তো হরদম আসাযাওয়া করছেন। প্রবীণ মানুষ, ধর্মভীরুও বটে—নিজের চোখে যখন দেখিনি, তাঁর সম্বন্ধেও কিছু বলতে চাইনে।

ব্যাপারটা মোটের উপর রহস্যময় হয়ে আছে। সন্তানের বাপটি গোলমাল বুঝে শহর থেকেই পিঠটান দিয়েছিল। সুধামুখীর এখনও সন্দেহ হয়, কর্তব্যের তাড়নায় সেই লোক এসে পড়ে ডাক্তার-নার্সকে টাকা খাইয়ে দায়িত্ব শেষ করে গেল নাকি?

মধু খাওয়ানো হয়ে গিয়ে সুধামুখী এখন পালঙ্কের উপর শিশুর শিয়রে বসে গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

নফরকেষ্ট বলে ওঠে, ও কি, কাঁদছ তুমি সুধা? কী হল তোমার?

দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে, সুধামুখী বাচ্চা ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলায়। শনির দৃষ্টি না পড়ে যেন শিশুর উপর। মা দক্ষিণাকালী, দেখো তুমি একে। শয়তান মানুষের দৃষ্টি না পড়ে। কোন ডাক্তারের দৃষ্টি। যে জন্য একে ধরণীতে এনেছে সেই জন্মদাতা পিতার দৃষ্টি।

সেই ছেলে গণেশ। গণেশ নাম বড় কেউ জানে না। গণেশচন্দ্র পাল— শিরোনামায় চিঠি এসেছে, বলাধিকারী লোক খুঁজে খুঁজে হয়রান। নাম শুনে সাহেবের নিজেরও গোড়ায় ধাঁধা লেগেছিল—নিজের নামই ভুলে বসে আছে। সকলে সাহেব-সাহেব করে ছোট বয়সের সেই গায়ের রঙের জন্য। রঙেই শুধু নয়—টানা চোখ, টিকল নাক। অযত্নে, অবহেলায় গায়ের রঙ জলেপুড়ে অবশেষে তামাটে হয়ে গেল। শিশু-বয়সটা বস্তির ঘরে—তার-পরেই বা ভাল জায়গায় কে কবে থাকতে দিল দয়াময় সরকার বাহাদুর ছাড়া? জেলখানায় নিয়ে পোরো, পাকা দালানে আয়েস করে থাকা যায়। সে সুখও বা বেশি কী হল জীবনে! বুড়ো হবার পর এখন তো একেবারেই গেছে। দারোগা বিশ্বাসই করে না জেলবাস অর্জনের মতো তাগত আছে তার বুড়ো-বয়সের শরীরে। খাওয়া-থাকাটা চলনসই গোছের হলেও সাহেব কেন, রাজার ঘরের ছেলে বলে চালানো যেত এই চোর মানুষটাকে!

•

যাকগে, সেই গোড়ার কথা যা হচ্ছিল। সুধামুখীর কথা। সতের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সুধামুখীর, বিশ বছরে চুকিয়েবুকিয়ে বাপের বাড়ি উঠল। বাপের বাড়ি বেলেঘাটার এক ঘিঞ্জি রাস্তার কয়েকটা কুঠুরি। সমস্ত ঘুচে গেল, পোড়া যৌবন গেল না। চার বোনের মধ্যে সে সকলের বড়। মা নেই মাথার উপরে। বাপ এক ব্যারিস্টারের কেরানি। কেরানির কাজ হাইকোর্টে নয়, সাহেবের বাড়িতে। গবেষণার বাতিক আছে ব্যারিস্টারের— লাইব্রেরীতে বসে সাহেবের হয়ে সুধামুখীর বাপকে সেই মত করে দিতে হয়। লাইব্রেরিতে পুঁথিপত্র এবং বাড়িতে পুজোআচ্চা এই দুটো মাত্র জিনিস জানেন তিনি জগৎসংসারে। সুধামুখীরই অতএব সকল দিক বুঝেসমঝে সংসারের হাল ধরবার কথা। কিন্তু অবুঝ হল সে নিজেই, সাধুভাষায় যাকে বলে পদস্খলন তাই ঘটে গেল। বাপ চোখে সর্ষের ফুল দেখেন। এ লাইনের যারা বহুদর্শী, দায়ে পড়ে এমনি দু-এক জনের দ্বারস্থ হলেন। অষুধপত্র খাওয়ানো হল যথারীতি, কিন্তু নিষ্ফল। নিরুপায় হয়ে ডাক্তার চৌধুরীর হেফাজতে দেওয়া হল—তাঁর নার্সিং-হোমে।

ডাক্তার চৌধুরি কোন রকমে পশার জমাতে না পেরে শহরতলীতে নতুন নার্সিং-হোম খুলেছেন। ভাল টাকা পেলে যে কোন রকম চিকিৎসায় রাজি। একটিমাত্র নার্স, অমলা—পরে যাকে বিয়ে করেছিলেন। এবং ঠিকে ঝি ও বিশ্বাসী পুরানো চাকর। রোগী যা আসত, সবই প্রায় এই জাতীয়—রোগী নয় রোগিণী। এখন দিন ফিরেছে ডাক্তার চৌধুরির, ডাক্তার হিসাবে

রীতিমতো নামডাক। সেই জন্যেই পুরো নাম প্রকাশ করা ঠিক হবে না। কালীঘাটের অনতিদূরে নতুন রাস্তার উপর প্রকাণ্ড বাড়ি তুলছেন। সেদিনের সেই জঙ্গলে শহরতলী জায়গা জমজমে শহর এখন। নার্সিং-হোমেরও খ্যাতি খুব, আজেবাজে রোগী নেওয়া হয় না।

জঞ্জালমুক্ত হয়ে মেয়ে স্বস্থ হয়ে উঠেছে, বাপ নিতে এলেন: চল সুধা, বাড়ি এইবারে।

সুধামুখীর কী রকম জাতক্রোধ সেই ব্যাপারের পর থেকে—বাপ বলে নয়, বিশ্বসুদ্ধ সকলের উপর। বলে, তোমার মেয়ে পাপ করেছে তো বিষ খাইয়ে তাকেই বধ করলে না কেন? মারলে মেয়ের পেটের মেয়েটাকে, যে কিছু জানে না। ধার্মিক মানুষ হয়ে এ তোমার কেমন বিচার?

বাপ থতমত খেয়ে যান! কোথায় লজ্জায় নুয়ে থাকবে তা নয় উল্টে ধমকানি। ভালমানুষ লোক—ঠিক জবাবটা হাতড়ে পাচ্ছেন না তিনি। বলেন, আপদ বিদায় হয়ে ময়লা সাফসাফাই হল। আরও তিনতিনটে মেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সেগুলো পার করতে হবে। সকলে আমায় খাতিরসম্ভ্রম করে। এমনি বাপের মেয়ের যা হওয়া উচিত, এর পর সেই রকম থাকবি।

নিয়ে এলেন বাড়িতে। বৃত্তান্তটা ভেবেছিলেন বাড়ির মধ্যের তাঁরা কটা প্রাণী ছাড়া বাইরের কেউ জানে না। আড়াই মাস পরে সুধামুখী বাড়ি পা দিতে না দিতেই বোঝা গেল, রসের খবর বাতাসের আগে ছড়িয়েছে। সম্পূর্ণ দায়মুক্ত সেই প্রেমিকপ্রবরটিরও বুঝি একদিন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, পাড়ার মানুষ ধরে তাকে আচ্ছা রকম পিটুনি দিয়ে দিল। মচ্ছব না জমে যায় কোথা এর পর?

তিন বোন মাথায় মাথায়, বিয়ের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কোনখানে সম্বন্ধ গাঁথে না। বাড়ির উপরে সুধামুখী হেন মেয়ে রয়েছে, সেই একটা কারণ। প্রধান কারণই হয়তো তাই। বোনেরা খিটখিট করে রাত্রিদিন, কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করেছে সুধামুখীর সঙ্গে, পাঁচ বার জিজ্ঞাসা করলে তবে হয়তো একটা জবাব দিল। বিধবা আধবুড়ো এক মেয়েলোক রান্নাবান্না করে, একদিন সে কাজ ছাড়বে বলে হুমকি দিল, সুধামুখী ছোঁয়াছুঁয়ি করেছে সেইজন্য। বাপ একটু বকুনি দিলেন: কী দরকার তোর রান্নাঘরে যাবার? পরে জানা গেল, বোনেরা উসকে দিয়েছিল রাঁধুনিকে, নিজে থেকে সে কিছু বলতে যায়নি।

টিকে থাকা হেন অবস্থায় অসম্ভব। ঘরের অন্ধকূপে দম বন্ধ হয়ে আসে। জানলায় এসে আকাশের একটু ফাঁকা হাওয়া নিয়ে বাঁচবে, সে উপায় নেই। প্রায়ই দেখা যায়, কেউ না কেউ সেখানে—মূর্তিমান কোন প্রেমিক।

কয়লার জায়গা থেকে এক টুকরো কয়লা ছুঁড়ে মারল রাগ করে। গায়ে লাগে নি, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জানলার পাখি দিয়ে সুধামুখী তাকিয়ে দেখে, ছোঁড়া সেই কয়লাখণ্ড হাতে তুলে নিয়ে দেখছে। ওর সঙ্গে প্রেমপত্র বাঁধা আছে কিনা, খুঁজছে নিশ্চয় তাই। বাপের বাড়ি এই কটা বছর কী করে যে কাটিয়ে এসেছে সে শুধু তার অন্তর্যামীর জানা।

বাড়ি ছেড়ে সুধামুখী ডাক্তার চৌধুরির নার্সিং-হোমে এসে হাজির। বলে, অমলাদিদি কাজ তো ছেড়ে দিয়েছেন। সেই নার্সের কাজ আমায় দিন ডাক্তারবাবু।

চৌধুরি বলেন, ট্রেনিং চাইতো আগে। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' কেমন করে হয়। কিছু শিখে পড়ে নাও।

চলল সেই ট্রেনিং সদাসয় ডাক্তারবাবু উঠে পড়ে লাগলেন। জরুরি কেস এসে ডাক্তারের পাত্তা পায় না! একদিন হঠাৎ অমলা এসে পড়ে পায়ের স্লিপার খুলে পটাপট ঘা কতক দিয়ে সুধামুখীকে দূর করে দিলে।

হনহন করে যাচ্ছে সে চলে, মোড়ের মাথায় শুভানুধ্যায়ী ডাক্তারবাবু।

আপনজন সবই তো ছেড়ে এসেছে, যাচ্ছ কার কাছে শুনি?

নিশ্চিন্ত কণ্ঠে সুধামুখী বলে, জুটিয়ে নেবো নতুন নতুন আপন জন।

তাকিয়ে দেখে, গিলে খেতে আসছেন যেন ডাক্তারবাবু। মুখে নয়, চোখ দুটো দিয়ে।

বলে, আপনি হবেন তো বলুন।

ডাক্তার চৌধুরি সামলে নিয়েছেন ততক্ষণে। স্বরে গাম্ভীর্য এনে মোটা রকম উপদেশ ছাড়েন: বাঁদরামি করো না। বিস্তর তো দেখলে। ভাল হয়ে থাকবে এবার থেকে, কথা দিয়ে যাও।

সুধামুখী বলে, এই মাত্র জুতো খেয়েছি। জুতোর বাড়ি কেটে কেটে বসেছে। আজকের রাতটা ভাল থাকব, কথা দিচ্ছি। কাল থেকে। নইলে কে আমায় খাওয়াবে বলতে পারেন? থাকব কোথা?

হি-হি করে উৎকট হাসি হাসে। উন্মাদের মতো। বলে জুতো না খেলেও চলে যেতাম! আজ না হলেও কাল-পরশু। থাকার উপায় নেই, সে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। রোগী হয়ে আপনার নার্সিং-হোমে থেকে গেছি—সেই রোগের বৃত্তান্ত জানাজানি হয়ে গেল। তার পরে আমার হাতে শুধুমাত্র নার্সের সেবা নিয়ে লোকে খুশি থাকতে পারে না। সে আমি জানতাম! ভেবেছিলাম, রোগীরা মুশকিল করবে। কিন্তু সে অবধি পৌঁছনোর আগেই দেখি ডাক্তার—

ডাক্তারবাবুর এ সব কানেই যাচ্ছে না, অথবা কানে শুনেও বুঝতে পারেন না। নিরীহভাবে বলেন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কোনখানে গিয়ে উঠবে ঠিকঠাক আছে কিছু?

সুধামুখী বলে, খুব ভাল জায়গা। গতিকটা বুঝে আগে থাকতে ঘর দেখে রেখেছি। কালীঘাটে মা-কালীর পাদপদ্মের নিচে। ঠিক একেবারে আদিগঙ্গার পাশে। বড্ড সুবিধা। যত খুশি অনাচার কর, সকালবেলা গোটা কয়েক ডুব দিয়ে সাফসাফাই। সমস্ত পাপ ধুয়ে গেল, পতিতপাবনী সব গ্লানি ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। আবার চালাও পুরো দিন আর পুরো রাত্রি। গঙ্গায় স্রোত যতক্ষণ আছে, কী ভাবনা!

রাত্রে খুব বৃষ্টিবাদলা হয়ে গেছে। জের কাটে নি, ভোরবেলাতেও জোর হাওয়া, আকাশ মেঘে থমথম করছে। সুধামুখী যথানিয়ম গঙ্গাস্নানে গেছে। দুর্যোগে একটা মানুষও ঘাটে আসে নি এখন অবধি। শেষ ভাঁটা, বাঁধানো ঘাটের শেষ সিঁড়িরও অনেক নিচে জল। কতটুকু আর—এক হাত দেড় হাত গভীর হবে বড় জোর। অবগাহন স্নান হবে না আজ, কোন একখানে বসে পড়ে গামছা ডুবিয়ে জল মাথায় দেওয়া। সেই জল অবধি গিয়ে পৌঁছুতেও অনেক কাদা।

যাচ্ছে তাই সুধামুখী, না গিয়ে উপায় কী! গঙ্গাজলে যতক্ষণ না দেহটা ধোয়া হচ্ছে, গা ঘিনঘিন করে। অসুখবিসুখ যা ই হোক, রাতের বিছানা ছেড়ে উঠেই সকলের আগে ঘাটে ছুটবে।

নজরে পড়ল, ভাঙা সিঁড়ির ইটের গাঁথনির গায়ে ন্যাকড়ার পুঁটলি আটকে আছে। কী বস্তু না জানি ভেসে এসেছে! কোন দিকে কেউ দেখছে না, ভয়সঙ্কোচের কারণ নেই। দিনকাল বড্ড খারাপ যাচ্ছে। পরশুদিন পারুল নামে মেয়েটার কাছ থেকে ধার করে এনে চালিয়েছে। নির্জন দুপুরে কাল বড় দুঃখে কালীবাড়ির নাটমণ্ডপে পড়ে কেঁদেছিল একা একা। মা তাই কি পাঠিয়ে দিলেন কিছু? দামি মাল যদি হয় গাপ করবে। নোংরা-আবর্জনা হলে—গঙ্গাগর্ভে রয়েছে, স্নানের জন্যই তো এসেছে—ছুঁড়ে ফেলে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে ঘরে ফিরবে।

পুঁটলি খুলে দেখে বাচ্চা ছেলে। কী ছেলে মরি মরি! মেরে ফেলে গঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়েছে। কার বুকের নিধি ছিনিয়ে আনল গো! ঠাহর হল, ধুকপুকানি এখনো যেন বুকে, এই হিমের মধ্যেও একটু যেন উত্তাপ পাওয়া যায়। এত গর্ভযন্ত্রণা সয়ে ধরাতলে এসে নামল, সঙ্গে সঙ্গেই অমনি প্রাণটা

দিতে চায় না, আঁকুপাকু করে দেখে। তার মেয়েটাও এমনি হয়তো ছিল, কিন্তু দেখতেই দিল না ভাল করে। নার্সিং-হোমের চাকরটা তাড়াতাড়ি বস্তায় ভরে রেললাইন পার হয়ে গিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত কবরখানায় কোনখানে পুঁতে রেখে এল। নিশ্চিন্ত! প্রাণ নিয়ে দৈবক্রমে ফিরবে, তেমন কোন শঙ্কা রইল না।

কে কখন এসে পড়ে এমন ধারা দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কী হল সুধামুখীর —নিজেরই চলে না শঙ্করাকে ডাকে—ঘাটের জঞ্জাল ঘরে তোলার ঝঞ্ঝাট বুঝে দেখল না। গঙ্গাস্নান হল না আজ, কাপড়ের নিচে বাচ্চা জড়িয়ে ঘরে ফিরে এল।

ঘরে গিয়ে সেঁকতাপ দিচ্ছে। লাইনের সর্বশেষে সকলের বড় ঘরখানায় পারুল থাকে। মেয়েটা ভাল। তাকে ডেকে এনে দু-জনে মিলে করছে।

সুধাময়ী বলে তুই একটুখানি থাক পারুল। ডাক্তার নিয়ে আসি।

পারুল বলে, ডাক্তার কি হবে! সাড় তো হয়েছে একটু, আরও হবে।

তবু একবার দেখানো ভাল। ডাক্তারের পয়সা তো লাগছে না! বড় ডাক্তার—এমনি আসবে।

সকালবেলা এই সময়টা রোগীর ভিড়। ডাক্তার চৌধুরির বাড়ি। সুধাময়ী সেখানে গিয়ে পড়ল। চৌধুরি স্তম্ভিত। সিঁড়ির দিকে সশঙ্কে তাকান, উপর নিচে করবার মুখে অমলার নজরে সুধাময়ী পড়ে না যায়।

হাতের রোগীটাকে আপাতত শুইয়ে রেখে বসবার ঘরে সুধামুখীকে নিয়ে গেলেন। এখানে কি?—বেশ রাগত স্বরেই বললেন।

সুধামুখী বলে, আমার বাড়িতে একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু।

অসম্ভব।

সুধামুখীর স্বর ঝাঁঝাল হয়ে ওঠে: আমার দরকারে আজ যাবেন না, নিজের যেদিন দরকার ছিল তখন তো গটগট করে চলে যেতেন। গড়ের মাঠে বাজি পোড়ানো দেখতে গেছি—সেইমাত্র একটা রাত—তা-ও দেখি রেগেমেগে চিঠি রেখে এসেছেন।

ডাক্তারবাবু গোঁ-গোঁ করে অবোধ্য আওয়াজ করেন একটা। হয়তো প্রতিবাদ, হয়তো বা কিছুই নয়। জবাব দেবার কিছু নেই, সেইজন্যে।

সুধামুখী আরও রেগে বলে, মিছে কথা? একদিন সমস্ত মিথ্যে হয়ে যাবে, আমিও তা জানতাম। সে চিঠি রয়েছে আমার কাছে। আমার দলিল। দরকার হলে বের করে দেখাব। অমলা-দিদিকে দেখিয়ে যাব।

ডাক্তার চৌধুরির চক্ষু কপালে উঠে যায়ঃ বলিস কি রে, এমনি সর্বনেশে মেয়েমানুষ তুই! ঝোঁকের মাথায় কোন অবস্থায় লিখেছিলাম, সেই চোতা কাগজ তুই রেখে দিয়েছিস ব্লাকমেইল করবি বলে। এই তোর ধর্ম হল।

সুধামুখী শান্ত হয়ে বলে, কিছু করব না! আসুন আপনি ডাক্তারবাবু, এসে একটিবার দেখে যান। হয়তো কিছুই নয়। তবু কাছাকাছি এত বড় ডাক্তার আছেন, একবার না দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি নে!

চৌধুরি কিছু নির্ভয় হয়ে বলেন, কার অসুখ?

আমার ছেলের—

বটে! ছেলে হয়েছে বুঝি তোর! কবে হল, কিছু তো জানিনে। বয়স কত ছেলের?

একদিন কিম্বা দু-দিন।

ডাক্তার সচকিত হয়ে সুধামুখীর দিকে নজর ঘুরিয়ে নেন। কাঁচা পোয়াতির লক্ষণ নেই, সুধামুখী মিছেকথা বলছে।

সুধামুখী বলে, পেটে আসে নি, কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল।

দু-চক্ষু বুজে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মুহূর্তকাল বুঝি অশ্রু সামলে নিলঃ মাটিতে পুঁতেছিলেন আমার বাচ্চা—মাটি ফুড়ে সে-ই আবার ফিরে এসেছে। সাত ভাই চম্পার তাই হয়েছিল ডাক্তারবাবু, আমার বাচ্চারই বা কেন হবে না?

ডাক্তার বিরক্তির সুরে বললেন, হেঁয়ালি ছাড়। কী ব্যাপার খুলে বল সমস্ত। ডাক্তারকে না বললে চিকিচ্ছে হবে কি করে?

সুধামুখী সমস্ত বলল। বলে, এত চেষ্টা হচ্ছে তবু কেমন সাড়া পাওয়া যায় না। ভয় ঘোচে না। সেইজন্যে ছুটে এলাম। সেবারে মেরেছিলেন, এবারে বাঁচিয়ে দিতে হবে ডাক্তারবাবু। তা যদি করেন, চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলব। আপনার সামনেই ছিঁড়ব।

ডাক্তার একটু ভেবে বলেন, না গেলে হবে না? এখান থেকে যদি ওষুধ দিয়ে দিই?

কঠিন স্বরে সুধামুখী বলে, না—

ডাক্তার বলেন, ষোল টাকা ফী আমার। এক পয়সা কম করতে পারব না।

সুধামুখী সকৌতুকে বলে, কী আমার কাছেও?

আর কম্পাউণ্ডার যাবে আমার সঙ্গে। ছোঁড়া শুধু-হাতে ফিরবে, সেই বা কেমন! তার দু-টাকা বখশিস।

কম্পাউণ্ডারের কি দরকার?

তক্ষণে ডাক্তার চৌধুরি মনিব্যাগ খুলে দু-খানা দশ টাকার নোট সুধামুখীর হাতে দিলেন।

নিয়ে চলে যা তাড়াতাড়ি। এদিককার এই দরজা দিয়ে। ঠিক সাড়ে-দশটায় তোর বাড়ি যাব। কম্পাউণ্ডারের দরকার তোর নয়, আমারও নয়—অমলার। কম্পাউণ্ডারের সামনে গুণে ষোল আর দুই, আঠারো টাকা দিবি। সে ছোঁড়া অমলার লোক, কি রকম ভাই সম্পর্কের হয় তার। স্পাই রেখেছে আমার উপর খবরদারি করতে। ডাক্তার আর রোগী—ছোঁড়ার সামনে আমাদের এইমাত্র সম্পর্ক, খাতির-উপরোধ নেই। খেয়াল রাখিস। আমি ঠিক তেমনি ভাবে কথাবার্তা বলব। যাব ঠিক সুধা, ভাবনা করিস নে।

রূপকথার সাত-ভাই-চম্পা সুধামুখীর মনে এসে গেল হঠাৎ, ডাক্তার চৌধুরির কাছে বলে ফেলল। চক্রান্ত করে দুয়োরাণীর সাত ছেলে আর এক মেয়ে ছাইগাদায় পুঁতে ফেলেছিল। ফুল হয়ে তারা ডালে ডালে ফুটে উঠল, মায়ের কোলে-কাঁখে ঝুপঝুপ করে নেমে এল একদিন। সারা পথ ঐ গল্প ভাবতে ভাবতে সুধামুখী বাসায় ফিরেছে। চেয়ে চেয়ে যে বস্তু পাওয়া যায় না, নাছোড়বান্দা মানুষ তাই রূপকথার মধ্যে গেঁথে প্রাণ ভরে বলাবলি করে। রূপকথাতেই ঘটে, আর ঘটে গেছে সুধামুখীর অদৃষ্টে। মা-গঙ্গা বাচ্চা ছেলে কোন মুলুক থেকে ভাসিয়ে এনে ভোরবেলা তার ঘাটে তুলে দিয়ে গেলেন।

ডাক্তার চৌধুরি কম্পাউণ্ডার-সহ যথাসময়ে এসে দর্শন দিলেন। ভালই আছে ছেলে। ওষুধপত্র দিলেন না, এক কোঁটা দু-কোঁটা করে মধু খাওয়াতে বললেন। ভিজিটের পুরো টাকা গুণে নিয়ে পকেটে ফেলে বিদায় হলেন।

সারা বেলা ধরে বাচ্চার খেদমত চলেছে! এঘর থেকে ওঘর থেকে মেয়েরা কতবার এসে দেখে যাচ্ছে। আহা, হাত নাড়ছে পা নাড়ছে সোনার পুতুল একটুকুন। আসায় যাওয়ায় মেলার মচ্ছব সুধামুখীর ঘরে। আর সন্ধ্যার মুখে সকলের শেষে এই নফরকেষ্ট।

নফরা চলে যেতে পারুল এসে আবার ঘরে ঢুকল। নফরকেষ্ট ডাকাডাকি করছিল, তখনকার কথাবার্তা সমস্ত কানে গিয়েছে তার। বলে, শরীরের কথা বলে লোক তাড়াচ্ছ দিদি, কিন্তু যে অসুখ ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, শরীর তো একদিন দু-দিনে সারবার নয়। চিরকাল জীবনভোর চলবে। ছোট বোনের কথায় দোষ নিও না—দিন চলবে কিসে সেটাও ভেবে দেখ। মাথার উপরে শ্বশুর-সোয়ামি নেই যে তারা রোজগার-পত্তর করে আনল, ঘরে খিল দিয়ে বসে বসে তুমি ছেলের সোহাগ করলে।

কথা বড্ড খাঁটি। সুধামুখী খানিকটা কৈফিয়তের ভাবে বলে, চানের ঘাটে মা-গঙ্গা হাতের উপর তুলে দিলেন, ফেলে আসি কেমন করে? দুটো-চারটে দিন তাউত করে তো তুলি, দেখা যাবে তারপরে।

সাজসজ্জা সারা করে এসেছে পারুল। দিনের শেষে এই সময়টুকুর জন্যই এতক্ষণ ধরে সাজ করেছে। তবু কিন্তু চলে যেতে পারে না। এক দিনের বাচ্চার গাল টিপে আদর করছে। করছে কত রকম! হাত বুলাচ্ছে দুটো গালে। মুঠির আঙুল খুলে দেয়, আবার কেমন বুঁজে আসে। এই এক খেলা। সুধামুখীর জবাবে মুখ তুলে চাইল পারুল। বলে, দু-চারটে দিনের পরে কি হবে দিদি, কি করবে? রাখতে না পার তো আমায় দিয়ে দিও। এই বলা রইল। একগাদা বিড়াল পুষি, খরগোস পুষি, কাকাতুয়া পুষি—তার উপরে রইল না হয় একটা ছেলে। আমার অসুবিধে নেই, আমি তো ঘরের বার হইনে। বড্ড খাসা ছেলে গো!

দেমাকের কথা। নবীন বয়স পারুলের, সুখের দিন। চলার ঢঙে যৌবন ছলকে ছলকে ওঠে। বাড়ির মধ্যে তাকেই শুধু দরজায় দাঁড়িয়ে রূপ দেখাতে হয় না। লোকে তার ঘরে চলে আসে—উল্টে ধমক দেয় সে, মেজাজ দেখায়। চরণের গোলাম যত পুরুষ।

আলাদা চাকর, আলাদা ঝি—হাটবাজার রান্না-বান্না তারাই সব করে। পারুলের কেবল শুয়ে বসে ঘরের মধ্যে থাকা—দিনমানটা কিছুতেই কাটতে চায় না। বলছে অবশ্য ভাল কথাই। বিবেচনার কথা! ছেলে পোষা বিলাসিতাই একটা—এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র পারুলই পারে সেটা। দেখা যাক কিছুদিন—খদ্দের তো রইলই। পারুল বলে কেন, দেয়ালপাটের মতো ছেলে হাত বাড়িয়ে নেবার কত মানুষ কত দিকে!

মাসখানেকের মধ্যে ছেলে রীতিমত চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মুশকিল রাত্রিবেলা। বাড়ির সবগুলো মেয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন। দিনমানটা যত দূর সম্ভব ছেলে জাগিয়ে রাখে, সন্ধ্যা থেকে যাতে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। শোয়ানোর বাড়তি ঘর কোথা—রান্নার জন্য পিছন দিকে খোলার চালা, সেইখানে মেজের উপর পাশাপাশি দু-খানা পিঁড়ি পেতে ঘুমন্ত ছেলে শুইয়ে দেয়।

একদিন ছেলের বোধহয় পেট কামড়াচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে ওঠে। চলছে সেই বেলা দুপুর থেকে, রাত্রেও যদি এমনি করে তো সর্বনাশ। আরও একদিন হয়েছিল, ঘর ছেড়ে সুধামুখীকে বেরিয়ে আসতে হল ছেলে ঠাণ্ডা করতে। ঘরের লোক বিরক্ত হয়ে বলে, আর আসব না তোমার কাছে। গোড়াকার

সেই সব দিনে রূপ তেমন কিছু না থাক, বয়সটা ছিল। বয়সেও ভাঁটা ধরেছে—আদরযত্ন করে, মিষ্টি কথা বলে এবং ভগবান যে কণ্ঠখানা দিয়েছেন—সেই কণ্ঠের গান গেয়ে ত্রুটি ঢাকতে হয়। কালীবাড়ির দিকে ফিরে সভয়ে বার বার হাত জোড় করে: হে মা দক্ষিণাকালী, ছেলের কান্না ভাল করে দাও। এক্ষুনি—সন্ধ্যে লাগবার আগে।

যত সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ততই ব্যাকুল হয়ে পড়ছে। কালকের দিনের কানাকড়ি নেই—কী উপায়! ঝিয়ের মাইনের হারাহারি অংশ দিতে হয়—সকাল বিকাল জোর তাগিদ লাগিয়েছে, কাল যদি না পায় পাড়া চৌচির করে কোন্দল লাগাবে। খাওয়া নিয়েও ভাবনা। নিজে উপোস দিয়ে টান-টান হয়ে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু বাচ্চার তো এক ঘণ্টারও সবুর সয় না। দুধ বিহনে জলবার্লিটুকুও না পেলে কেঁদেকেটে অনর্থ করবে। আবার বজ্জাত কী রকম—এরই মধ্যে স্বাদের তফাত ধরতে শিখেছে। বার্লি যদি দিলে, পেটের ক্ষিদেয় দশ-বারো ঝিনুক খেয়ে তার পরে আর খেতে চাইবে না। দাঁতে দাঁত চেপে থাকবে। ঝিনুক চেপে মাড়ির ফাঁকে ঢেলে দিলে তো ফুঃ—করে ফোয়ারার মতন ছড়িয়ে দেবে। এক মাসের ছেলে এই, বড় হয়ে তো আস্ত ডাকাত হবে। কিন্তু এই জল-বার্লিও তো জোটানো যাচ্ছে না।

আরও কত রকমের দায়দেনা—ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে আসে। ভাবনার মধ্যে সুধামুখী যেতে চায় না ভয়ে ভয়ে। নফরকেষ্টর দশাও তথৈবচ। একদিন দুটো টাকা পাওয়া গেল তো আবার কবে মিলবে ঠিকঠিকানা নেই। পারতপক্ষে সে দিতেও চায় না, বউ গাঁথবার টোপের সংগ্রহে আছে। কেড়েকুড়ে নিতে হয় এক একদিন মল্লযুদ্ধ করে।

উল্টে রাতদুপুরে এসে হুমকি ছাড়বে: আর তরকারি কোথা? কতবার বলেছি, এক তরকরি-ভাত খেতে পারি নে, খেয়ে পেট ভরে না আমার। শুধুমাত্র রাত্রিবাস নয়, রাত্রিবেলা খাওয়ার স্বত্ব জন্মে গেছে যেন এখানে। সুধামুখী হতে দিয়েছে। পারুল জীবজন্তু পোষে, তারও তেমনি একটা পোষা জীব। ভাগ্যবতী বটে পারুল, পশুপাখির উপরেও বাচ্চা পোষার শখ। আরও দু-তিন দিন বলেছে, লুকিয়ে আছে। দিয়ে দিতে হবে শেষ অবধি, তা ছাড়া উপায় দেখিনে।

ভাবছে সুধামুখী, আর প্রাণপণ ছেলে থাবড়াচ্ছে। ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি ঘুম দিয়ে যাও, বাটা ভরে পান দিলাম গাল পুরে খাও। গুণগুণ করছে মিষ্টি সুরে। মাসিপিসিদের কাছে পানের চেয়ে প্রিয়তর জিনিস কী! লোভে পড়ে বোধকরি অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন কেউ, চোখ বুজল

ছেলে। ক্রমশ নেতিয়ে পড়ল। হে মা-কালা, রাতের মধ্যে আর নড়াচড়া করে না যেন।

সন্তর্পণে তুলে যথারীতি রান্নাঘরে শুইয়ে দিয়ে সুধামুখী বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। কপাল আজ বড্ড ভাল গো—সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল না জানি। সেই দলটা এসে গলিতে ঢুকল। একটি মানুষ ওর মধ্যে ভাল রকম চেনা—রাজবাহাদুর নামে যার পরিচয়। পাড়ার সবাই চেনে। রাজা হন না হন, বড়লোক দস্তুরমতো। নিজে থাকেন চুপচাপ, আমোদ-স্ফূর্তি যত কিছু সঙ্গের মোসাহেবরা করে। এ গলির সবাই চায়, রাজাবাহাদুর আসুন তার ঘরে।

সুধামুখী সবুর করতে পারে না। কোন মুখপুড়ী কোন দিক থেকে এসে গেঁথে ফেলে—ছুটে সে চলে যায় রাজবাহাদুরের কাছে: আজকে আমি আপনার সেবা করব।

রাজাবাহাদুর ভ্রকুটি করেন: বলিস কী রে! তোর আস্পর্ধা কম নয়। আমার চাকর-বাকরের সেবাদাসী—এবারে আমা অবধি হাত বাড়াস! হাত মুচড়ে ভেঙে দেব না?

বলে হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়েন। তার মানে দয়া হয়েছে, সুধাই পেয়ে গেল দলটা। রাজাবাহাদুর আগে আগে চললেন সুধামুখীর পাশাপাশি।

দেখ, বাজারের ভোজ্য আমি ছুঁইনে। জাত্যাংশে সদ্‌ব্রাহ্মণ, অনাচার আমায় দিয়ে হবে না। উচ্ছিষ্ট খেয়ে জাত হারাব না, আমার ভোজ সকলের আগে। যে বস্তু উচ্ছিষ্ট হয় নি—

কথার মাঝে আবার হেসে ওঠেন রাজাবাহাদুর। বললেন, যাকে বলে উদ্যানের অনাঘ্রাত কুসুম। তোদের সব চোখে দেখেই আমার গা বমি-বমি করে।

সুধামুখী আহত কণ্ঠে বলে, তবে আসেন কেন আমাদের পাড়ায়?

রাজাবাহাদুর বলেন, চারটে পোষা কুকুর আছে আমার বাড়িতে, নিজ হাতে খাওয়াই। খাওয়ানোর শখ খুব আমার। কুকুরগুলো ভাল, আ-তু-উ-উ—ডাকলে ছুটে আসে, এসে লেজ নাড়ে।

সঙ্গীদের দেখিয়ে বলেন, এদের মতন আছে আটজন। ঐ চার আর এই আট—পুরোপুরি ডজন হল। এরাও বেশ ভাল। ডাকতে হয় না, চোখ টিপলে ছুটে আসে। সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কথাটা শেষ করে রাজাবাহাদুর হাসবেন, তার আগেই হি-হি করে লোক-

গুলো হেসে অস্থির। রাজাবাহাদুরের পোষা কুকুরের সঙ্গে তুলনায় তারা কৃতার্থ হয়ে আনন্দে গলে গিয়েছে।

সবে জমে এসেছে, হেনকালে যে ভয় করা গিয়েছিল—ছেলে কেঁদে উঠল। সুধামুখী কাতর হয়ে বলে, ছুটি দিন একটুখানি রাজাবাহাদুর। ছেলের অসুখ, উঠে পড়েছে, ঘুম পাড়িয়ে আসি। এক্ষুনি এসে যাব।

রাজাবাহাদুর চোখ বড় বড় করে বলেন, কী বলিস, তুই আবার ছেলে পেটে ধরিল কবে রে! ও-মাসেও তো এসে গেছি। মিথ্যে বলবার জায়গা পেলিনে!

সুধামুখী বলে, পেটে না ধরলেও ছেলের কোন অভাব আছে? পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে ছেলে। আপনারা কত সব আছেন মস্ত মস্ত মানীলোক—উচ্ছিষ্ট যাঁদের চলে না। মুঠো মুঠো টাকা ছড়িয়ে ভাল জিনিস উচ্ছিষ্ট করে আসেন। ফল পুষ্ট হবার আগে কুঁড়ি অবস্থায় বেশির ভাগ নষ্ট করে দেন। যাদের সে সুবিধা হল না, তাক বুঝে রাতদুপুরে মা-গঙ্গায় নিবেদন করে দায় খালাস হয়ে আসে।

ছেলে চুপ করে গেছে, আর কাঁদে না। জেগে পড়েছিল, আপনাআপনি আবার ঘুমিয়ে গেছে। একছুটে দেখে গিয়ে সুধামুখী বসে পড়ল আবার। যেটুকু কামাই হল পুষিয়ে নেবার জন্য ডবল করে হাসতে লেগেছে। বলে, জানেন তো রাজাবাহাদুর, সেকালে মরাঞ্চে পোয়াতিরা গঙ্গায় ছেলে ফেলে দিত তার পরের বাচ্চাটা যাতে মায়ের কোলে আলো করে বেঁচেবর্তে থাকে, শতেক পরমায়ু হয় তার। একালের মা-কুন্তীরাও পয়লা বাচ্চা গঙ্গায় দিয়ে মনে মনে বলে, গোড়ার ফলটা তোমায় দিয়ে যাচ্ছি মাগো। ভাল ঘর-বর হয় যেন, সতীসাধ্বী হয়ে পাকাচুলে সিঁদুর পরে চিরদিন সংসারধর্ম করি।

বেড়ে বলেছিল রে! রাজাবাহাদুর হাসিতে ফেটে পড়লেন, দেখাদেখি সঙ্গীগুলোও হাসে। বলেন, হনুমান বুক ফেড়ে রামনাম দেখিয়েছিল—একালের অনেক সতার বুকের তলা অমনি যদি কেউ ফেড়ে ফেলে, দেখা যাবে কত গণ্ডা নাম লেখা সেখানে।

হাসি থামিয়ে খানিকটা নড়েচড়ে রাজাবাহাদুর আড় হয়ে পড়লেন পালঙ্কের বিছানায়। বললেন, তোর ঘরে কী জন্যে আসি বল দিকি?

সুধামুখী বলে, ভাগ্য আমার! আপনার মতো মানুষের নেকনজরে পড়েছি।

দুর, নজরই তো বন্ধ করে থাকি তোর কাছে। তুই হলি কোকিল—গলা কোকিলের, চেহারাখানাও তাই। চেহারা দেখতে গেলে গা ঘিনঘিন করে,

গানে আর মজা থাকে না। দু-চক্ষু বন্ধ করে গান শুনে যাই। তোর কথার আবার বেশি বাহার গানের চেয়ে। ভাল ঘরের মেয়ে ঠিক তুই, ভাল ভাল কথাবার্তা শুনে পরিপক্ক হয়ে এসেছিল। বিদ্যেসাধিও কিছু হয়ত আছে পেটে।

সুধামুখী দীর্ঘশ্বাস চেপে নেয়। টাকাকড়ি না থাক, বাবা কিন্তু বিদ্যার বারিধি। বলেছিলেন, পড়াশুনো নিয়ে থাক সুধা, আমি দেখিয়েশুনিয়ে দেব, ঘরে পড়ে গ্রাজুয়েট হবি স্বচ্ছন্দে।

আগের কথার জের ধরে রাজাবাহাদুর বলেন, কাদের ঘরের কোন জাতের মেয়ে তুই, ঠিক করে বল আমায়।

সুধামুখী বলে, ছেলে যেমন গাঙে ভেসে এল, আমি একদিন ভাসতে ভাসতে কালীবাড়ির আঁস্তাকুড়ে এসে পড়েছি। জাতজন্ম নেই আমার, পিছন অন্ধকার। আমি একাই, বাবা আর বোনেদের উঁচু মাথা কেন হেঁট করতে যাব বলুন।

আরও অনেক কথা বলতে গিয়ে বলল না, চেপে গেল। পিছনে ঘনঘোর অন্ধকার, সামনেটাও তাই। কিন্তু মনের দুর্ভাবনা খদ্দেরের কাছে বলা চলে না। বরঞ্চ ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে হেসে ঢলে ঢলে পড়তে হয়।

কোন খেয়ালে রাজাবাহাদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন: চল রে, তোর ছেলে দেখে আসি।

রান্নাঘরের সুঁড়িপথটা অতি সঙ্কীর্ণ। যা মোটা মানুষ--ভুড়ি বেধে আটকে যাবেন জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুরের মতন। চালও বড় নিচু সেখানটা। লম্বা মানুষ রাজাবাহাদুর, তায় রঙে রয়েছেন। কত বার মাথা ঠুকে যাবে ঠিক নেই, তখন মেজাজ বিগড়াবে।

সুধামুখী বলে, আপনি কি জন্যে যেতে যাবেন? বড্ড নোংরা ওদিকটা।

মাতালের রোখ চেপে গেছে। বলেন, তোর ঘরে এসে বলতে পারছি, এর চেয়ে নোংরা জায়গা ভবসংসারে কোথায় আছে রে? নোংরা বলেই তো আসি, নোংরার জন্যে মন কেমন করে ওঠে এক এক সন্ধ্যাবেলা।

হি-হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে বলেন, মানুষ জাতটা হল মহিষের রকমফের। সবুজ মাঠে চরে চরে সুখ হয় না; এঁদো ডোবার পচা পাঁকে গিয়ে পড়বে। পড়তেই হবে। এই আমারই দেয় না—ঘরে খাসা সুন্দরী বউ। একটা গেলে তো তারও চেয়ে সুন্দরী দেখে দুই নম্বর বিয়ে করে আনলাম। ভালবাসাবাসিও দস্তুরমতো—সে ভালবাসে, আমিও। কিন্তু এটা হল ভিন্ন ব্যাপার! দশের মধ্যে সভা জমিয়ে সৎপ্রসঙ্গ করে এসে ছুটো ময়লা কথার জন্য ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ানো। ঐ মহিষের বৃত্তি।

উঠে কয়েক পা গিয়েছেনও রাজাবাহাদুর। দেহ বিষম টলছে, গড়িয়ে পড়েন বুঝি বা। সুধামুখী তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, আপনি ছেলের মুখ দেখবেন, সে তো ছেলের বাপের ভাগ্যি, সাতপুরুষের ভাগ্যি। রান্নাঘরে টেমির আলো ঘুরিয়ে আপনি দেখবেন, সে কি একটা কথার কথা হল? ফরমাস করুন, ঝাড়লণ্ঠনের নিচে গদির উপর এনে দেখিয়ে দিই।

নেশার উপরে হলেও রাজাবাহাদুর নিজের দৌড় বুঝে নিয়েছেন। পা টলছে বেয়াড়া রকম। হাসতে হাসতে ধপ করে চেয়ারখানায় বসে পড়লেন।

নিয়ে আয় এখানে, তোর যখন তক্তাউশে তুলে দেখানোর অভিরুচি। বটেই তো, কত মানমর্যাদা আমার! আমি কেন যেতে যাব খারাপ মেয়েমানুষের ছেলে দেখতে? তুই এনে দেখা, বকশিস পাবি।

নিয়ে আসে সুধামুখী। রাজাবাহাদুরের চোখ ঠিকরে যায়। ইয়ারগুলো বকবক করছিল, তারাও চুপ হয়ে গেছে: অ্যাঁ রাজপুত্তুর ছেলে যে!

বিশাল পালঙ্কের উপর বিঘতখানেক পুরু গদি। ধবধবে চাদর-বালিশ তার উপরে। রাজাবাহাদুর হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: আরে দূর, কত মানুষ শুয়ে বসে গেছে, ওর উপর শোয়ায় কখনো! ভাল কিছু পেতে দে। তুই আর ভাল কী পাবি, নোংরার মধ্যে সবই তো ছোঁয়া-লেপা হয়ে আছে। রোস—

বিচিত্র নক্সাদার সেকেলে জামিয়ারখানা কাঁধের উপর থেকে নিয়ে রাজবাহাদুর শয্যার উপরে পেতে দিলেন। হেসে বলেন, এ ছেলে আমারও হতে পারে। কত ঠাঁই ঘোরাঘুরি করি—কার ঘর থেকে বাচ্চা বেরুল, অত কে হিসাব রেখে বেড়ায়!

একটু থেমে রাজাবাহাদুর আবার বলেন, আমার না-ও যদি হয়, আমারই মতন কোন শয়তান-বেল্লিকের তো বটে! হোক শয়তানের তা হলেও বড়-বাপের বেটা। খাতির-যত্ন করিস রে মাগি, ছেঁড়া ঘরের ছেলে নয়—দস্তুরমতো বনেদি রক্ত চামড়ার নিচে।

সুধামুখী জোর দিয়ে বলে, ছেলে আপনারই। না বললে শুনি নে। অবিকল আপনার মত চাউনি। ফালুকফালুক করে চোরা চাউনি দিচ্ছে ঐ দেখুন না।

রাজবাহাদুর রাগের ভান করে বলেন, বটে রে! চোরা চাউনি মেরে বেড়াই, এই কলঙ্ক দিলি তুই আমায়? তা বেশ, মেনেই নিলাম ছেলে আমার। এই ছেলের বাপ হতে যে-না-সেই আগ বাড়িয়ে এসে দাঁড়াবে। দু-দুটো বিয়ে করা পরিবারে দিল না—ছেলে আলটপকা তোদের নরককুণ্ডের মধ্যে পেয়ে গেলাম।

চটে না সুধামুখী, চটলে কাজ হয় না। প্রগলভ স্বরে বলে, ছেলের মুখ-দেখানি দিলেন কই ? দেখুন না, ঐ দেখুন, ঠোঁট ফোলাচ্ছে ছেলে।

মুহূর্তকাল ছেলের দিকে তাকিয়ে থেকে রাজাবাহাদুর হা-হা করে হেসে উঠলেন। কী দেখতে পেলেন তিনিই জানেন, বললেন, আচ্ছা ফিচেল ছেলে তো! হবে না—আমি লোকটা কি রকম। কচুর বেটা ঘেচু বড় বাড়েন তো মান।

মেজাজ দিলদরিয়া এখন, মেজাজের গন্ধ ভকভক করে মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে নোটে টাকায় টাকা পনেরোর মত বেরুল।

রাজাবাহাদুর অবাক হয়ে বলেন, মোটে এই ? আরো তো ছিল ; আরো অনেক থাকবার কথা। গেল কোথা টাকা ?

সঙ্গীদের একটি বলে ওঠে, বলবেন না, বলবেন না, বড্ড পাজি জিনিস টাকা। পাখি খাঁচায় পুরে আটকানো যায়, টাকা কোনরকমে পোষ মানে না। উড়ে পালায় পাঁচ আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

রাজাবাহাদুর বলেন, রাজপুত্তুরকে বুঝিয়ে বল রে সুধা, আজকে নেই। সোনার টাকায় মুখ দেখে যাব আর একদিন এসে।

এর পরে একটা জিনিস দেখা গেল, রাজাবাহাদুর পাড়ার মধ্যে ঢুকলেই সরাসরি সুধামুখীর ঘরে আসেন। ডাকাডাকি করতে হয় না। একাই আসেন বেশি, সোজা এসে ছেলের কাছে বসে পড়েন। একদঙ্গল পারিষদ জুটিয়ে এনে হুল্লোড় করেন না আগেকার মতো। অসাধারণ রকমের ফর্সা রং বলে সাহেব-সাহেব করেন—সাহেব নাম চালু হয়ে গেল তাঁরই মুখ থেকে সোনার টাকা দেন নি বটে, তা বলে খালি হাতেও আসেন না কখনো কোনদিন জামা কোনদিন বা দুটো খেলনা—কিছু না কিছু আনবেই। হিংসা এই নিয়ে বাড়ির অন্য মেয়েদের। এবং পাড়ার সকলেরও। কত বড় লোকটাকে গেঁথে ফেলেছে মাংসের দলা ঐ একটুকু ছেলে দেখিয়ে।

প্রথম দিন জামিয়ারখানা পেতে দিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিয়ে যান নি। সাহেবেরই হয়ে গেল সেটা। দামি জিনিস—তবে অনেক দিনের পুরানো, পোকায় কাটা, ফেঁসে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। বেচতে গেলে খদ্দের হবে না। সাহেব যখন দশ-বারো বছরের, শীতের ক'মাস সুধামুখী জিনিসটা দোভাঁজ করে বুকের উপর দিয়ে পিঠের উপর দিয়ে জড়িয়ে পিঠ বেঁধে দিত। গরম খুব, অথচ পাখির পালকের মতো হালকা। শাল গায়ে চড়িয়ে সাহেবের মেজাজ চড়ে যেত, সমবয়সি সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়াত : আমার বাবার গায়ের জিনিস। দেখ কী সুন্দর ! বাবার এমনি গাদা গাদা ছিল, যাকে তাকে দিয়ে দিত।

রাজাবাহাদুরের যাতায়াত তার অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষটা একেবারে ফৌত। এ লাইনে হয়ে থাকে যেমন। রাজবাহাদুরের চেহারাটাও সাহেবের ভাল মনে পড়ে না। কিন্তু চালচলন মনমেজাজ সুধামুখীর কথাবার্তার মধ্যে শুনেছে অনেক। তাই নিয়ে সমবয়সিদের কাছে দেমাক করে: বড়লোক আমার বাবা। গা থেকে শাল খুলে আমার বিছানায় পেতে দিল। পকেটের টাকাপয়সা মুঠো মুঠো তুলে মুড়িমুড়কির মতো ছড়িয়ে দিত।

বালকের সামান্য কথায় নফরকেষ্টর বুক টনটন করে। অসহিষ্ণু হয়ে বলে ওঠে, সেই বাপটা তোর বড়লোকই ছিল রে সাহেব। কিন্তু পোকায়-কাটা বড়লোক। গায়ের জামিয়ারখানা যেমন, মানুষটাও তাই।

সুধামুখী শুনতে পেয়ে ধমক দিয়েছিল নফরকে। কিন্তু মনে মনে সায় দেয়। এককালে অনেক ছিল রাজাবাহাদুরের—হাবে-ভাবে কথাবার্তায় বেরিয়ে আসে। হেন মানুষটা গলিঘুঁজির পচা আবর্জনায় আনাগোনা করে, বুঝতে হবে ঘুণে-খাওয়া নিতান্ত জীর্ণ অবস্থা তখন।

কিন্তু তাই বা কেমন করে? টাকায় মানুষও যে আসে না, এমন নয়। কোন মানুষের কিসে স্ফূর্তি, বাঁধা নিয়মে তার হিসাব হয় না। একজন এসেছিল—টাকাকড়ি যেন খোলামকুচি তার কাছে, পকেটের ভারবোঝা। নিতান্ত গঙ্গার জলে না ফেলে গঙ্গার পাড়ে বস্তির ঘরে দু-হাতে ছড়াতে এসেছে। সকালবেলা, অসময়। বাজার করা স্নান করা রান্না করা—খাওয়াদাওয়া অন্তে হল বা কড়িখেলা তাসখেলা দু-এক হাত। শুয়ে পড়ে তারপরে বিশ্রাম। সময়টুকু একেবারে নিজস্ব মেয়েদের। দোকান যদি বলতে চাও তো পুরোপুরি ঝাঁপবন্ধ দোকানঘরের।

এ হেন সময় মানুষটা সিল্কের চাদর উড়িয়ে জুতা মসমস করে ঢুকে পড়ল। পারুলের ঘরটা আয়তনে বড় আর সাজসজ্জায় চমকদার—উঠানের শেষ প্রান্তে সেই ঘরে উঠল সোজা গিয়ে। খোঁজখবর নিয়েই এসেছে, আনকোরা নতুন মানুষ হলে ঠিক ঠিক ঘর চিনে যাবে কি করে? পারুল ভাগ্যধরী গা তুলে নড়ে বসতে হয় না তার। সে-ই পারে অবেলার খদ্দের সামলাতে।

ক্ষণপরে—ওমা, আরও দু-তিনটে মেয়ে পিলপিল করে যায় যে ওদিকে। সুধামুখীরও ডাক এল, পারুল ঝি পাঠিয়ে দিয়েছে।

দূর, তোর দিদিমণির যেমন আক্কেল—আধবুড়ো মাগি বসছি গিয়ে আমি ওদের মধ্যে! বসলে কাজকর্ম করে দেবে কে আমার? ছেলে এই এক্ষুনি জেগে উঠবে, তাকে খাওয়ানো—

যাবে না তো পারুল নিজেই এসে পড়ল। সত্যিই ভালবাসে মেয়েটা, বড্ড টানে। বলে, চলে এস দিদি। টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে, ফাঁকতালে কিছু কুড়িয়ে নাও। সাহেব ঘুমুচ্ছে, থাকুক না একলা একটুখানি।

হাত ধরে টেনেটুনে নিয়ে বসাল। শতমুখে লোকটা নিজের চতুরতার কথা বলছে। বাড়ির মেয়েরা ঝেঁটিয়ে এসেছে পূজো দিতে। তিন-চারটে পাণ্ডা জুটে গেছে—যেমন আয়োজনের পূজো, সারা হতে আড়াইটে-তিনটে বাজবে। বলি, চোদ্দ-শাকের মধ্যে ওল-পরামাণিক আমি বেটা কাহাতক ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াই। জায়গা খুঁজে বসিগে। খাস কলকাতার পাড়াগুলো বহু বার সার্ভে হয়ে গেছে, দক্ষিণের এইগুলো বাকি। দূর বলেই হয়ে ওঠে নি। নকুলেশ্বর-তলায় যাই বলে ওদের কাছে থেকে সরে পড়লাম।

বেলেল্লা কাণ্ডবাণ্ড। সেই ব্যাপার, সেই যা বলতেন রাজাবাহাদুর—মহিষ দিন দুপুরে পচা ডোবায় গা ডোবাতে এসেছে। মানুষও ইতর জন্তু একটা, সদরে একে অন্যের সঙ্গে অভিনয় করে বেড়ায়—অন্তরঙ্গ ক্ষেত্রের নিবারণ মূর্তি দেখে এই তত্ত্বে সন্দেহ থাকে না। এই জীবনে এসে কত-কিছু চোখে দেখে, তারও বেশি কানে শুনে থাকে—তবু এই দিনের আলোয় সর্বদেহ কুঁকড়ে ওঠে সুধামুখীর। ধমকানি দেয়ঃ যান—চলে যান আপনি। ভদ্দর-লোকের চেহারা তো আপনার—টাকার লোভে পেটের দায়ে আমরা যদিই বা নোংরা হই, আপনি লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেলেন কি করে! তেমন জায়গা নয় আমাদের, দু-পা গিয়ে ভাল লোকের বাড়ি। হালদার মশায়দের এলাকা, ছিটেফোঁটা কোনরকমে কানে উঠলে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে পাড়াসুদ্ধ গঙ্গা পার করে দিয়ে আসবেন।

মানুষটা চলে গেলে পারুলকেও তারপর গালি দিয়েছিলঃ অন্য সকলে জুটল পেটের ধান্দায়—না গিয়ে তাদের উপায় নেই। দুর্জনের মনিব্যাগ থেকে বেরুলেও টাকার উপরে দাগ থাকে না, বাজারে চলে। সেই লোভে গিয়েছিল। কিন্তু তুই বোন এই নোংরামীর কি জন্যে আস্কারা দিবি? তোর তো সে অবস্থা নয়।

পারুল একটুও লজ্জিত নয়, হাসিতে গলে গলে পড়ে। বলে, ছোটবেলায় রাস্তায় পাগল দেখলে ক্ষেপিয়ে দিয়ে মজা দেখতাম। এ লোকটাও তাই—উদ্দণ্ড পাগল একটা। পাগল ক্ষেপে গিয়ে টাকার হরির লুঠ দিচ্ছে। দুটো-চারটে করে আঁচল বেঁধে যে-যার ফিরল—তুমি বোকা মানুষ, ফরফরিয়ে বেরিয়ে এলে রাগ করে। সত্যি দিদি, দলছাড়া গোত্রছাড়া তুমি যেন আলাদা কী এক রকম।

অতি-বড় কলঙ্কভাগিনী—বংশের উপরে আর বাপের মনে দাগা দিয়ে জন্মের মতো বেরিয়ে এসেছে, সুধামুখী মানুষটা তবু সত্যিই ভিন্নগোত্রের। এক বাবু এসেছিল তার ঘরে কয়েকটা দিন—সাকুল্যে আট দশ দিন মাত্র। এই মোটা লেন্সের চশমা চোখে, ছেঁড়া-খোড়া কাপড়-চোপড়—খবরের কাগজ হাতে করে এসেছিল, কাগজটা ফেলে চলে গেল। ঢাউস বাংলা কাগজ, অনেকগুলো পৃষ্ঠা। সুধামুখী পুরো দু-দিন ধরে কাগজখানা পড়ল—সকল অন্ধিসন্ধি, বিজ্ঞাপনের প্রতিটি লাইন। ঘরে দুয়োর দিয়ে ঘুমের ভান করে পড়ত। এমনই তো 'বিদ্যেবতী সরস্বতী' বলে অন্য মেয়েরা, কাগজ পড়তে দেখলে তারা রক্ষে রাখত না।

বস্তিবাড়ির বাইরে বৃহৎ একখানা জগৎ—বেলেঘাটার ঘিঞ্জি গলিতে তার আনাগোনা ছিল, কিন্তু এ জায়গায় নেই। রূপকথার উড়ন্ত কার্পেটের মতো খবরের কাগজের উপর চেপে সেই জগৎ অনেক দিন পরে সুধামুখীর ঘরের মধ্যে হাজির হল। নেশা ধরে গেল, বাজারের মাছ-শাক কিনতে কিনতে ঐ সঙ্গে কাগজও একটা করে কিনে আনত। কদিন পরেই অবশ্য বন্ধ করতে হল পয়সার অভাবে। কোন দেশের এক রাজপুত্র আর তার বউকে মেরেছে, সেই ছুতোর পৃথিবী জুড়ে দুরন্ত লড়াই। দুটো মানুষের বদলা হাজার লক্ষ মানুষ। সে লড়াই ডাঙায় আর সাগরের উপরে শুধু নয়—মানুষের পাখনা গজিয়েছে, আকাশে উড়ে উড়েও লড়াই। রামায়ণের ইন্দ্রজিতের যে কায়দা ছিল। খবর পড়তে-পড়তে সুধামুখীর মনটাও যেন আকাশ-মুখো রওনা হয়ে পড়ে খাপরায় ছাওয়া বস্তিবাড়ির অশ্লীল ইতর জীবন ফেলে মেঘের উপর গা ভাসিয়ে দিয়ে।

ঠাট্টা করে সেই বাবুর সকলে নাম দিয়েছিল ঠাণ্ডাবাবু। ঠাট্টার পাত্র তো বটেই। নিপাট ভাল মানুষজনও এখানে এলে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এ মাটির এমনি মহিমা। মত্ত মানুষই বা কেন, মত্ত মহিষ। এঁর অপরাধ, মানুষই থাকেন পুরোপুরি। শান্ত হয়ে বসে বসে মোটা চুরুট খান, বই হাতে থাকল তো বই পড়েন চুপচাপ। এক-একদিন কেমন গল্পে পেয়ে যায়। অনেক দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন বোধহয়, ঘাঁটা দিলে রকমবেরকমের গল্প বেরিয়ে আসে। গল্পের আর অন্ত থাকে না।

না থাকতে পেরে সুধামুখী একদিন বলেছিল, আপনি গিয়েছেন বুঝি ঐ সব জায়গায়?

ঠাণ্ডাবাবু হেসে বললেন, মিছে জিজ্ঞাসা কর কেন? চাপাচাপি করলে কতকগুলো বাজে উত্তর শুনবে। নিজের কথা তোমাদের কাছে কেউ বলতে আসে না, আমিও বলব না। নিজের ইচ্ছেয় যা বলি, সেইগুলো শুধু শুনে

যাও। ভাল না লাগে কি অন্য রকম যদি তাড়া থাকে, খোলাখুলি বল। উঠে পড়ব এখনই।

সুধামুখী তাড়াতাড়ি বলে, উঠবেন না আপনি, মাথার দিব্যি। বলুন কি বলছিলেন—সারা রাত ধরে বলে যান। ভাল লাগে আমার।

বাবুটি নিজেই এক খবরের কাগজ। কাইজারের নাম তখন লোকের মুখে মুখে—জর্মন দেশের রাজা কাইজার। লড়াইয়ের কাইজার হরদম জিতছে—পিটে পিটে তুলো-ধোনা করছে শত্রুদের। কাইজারের দেশে এক বনেদি শহরের গল্প—ছাপাখানা করে প্রথম যে জায়গায় বই ছাপা হল। নাম-করা এক পুরানো কফিখানা আছে, বাঘা বাঘা গুণীজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সেখানে যেতেন। মাটির উপরে আমরা একতলা দোতলা তেতলা দেখে থাকি, কফিখানার বাড়িতে মাটির নিচে ঠিক তেমনি তেতলা চারতলা পাঁচতলা নেমে গেছে। যত নিচে তত বেশি অন্ধকার—গুহার মত কুঠুরিগুলো, আসবাবপত্র অতিশয় নোংরা। কফির দাম কিন্তু লাফিয়ে লাফিয়ে দ্বিগুণ চারগুণ ছ-গুণ হয়ে যাচ্ছে, বস্তু যদিচ সর্বত্র এক। এইসব ঘরে এই সমস্ত চেয়ারে বসে সেকালের অনেক দিকপাল খানাপিনা ও আমোদস্ফূর্তি করে গেছেন। নিশিরাত্রে চুপি চুপি এসে জুটতেন, প্রেমিকারা আসত, পাতালপুরীর বেলেল্লাপনা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মানুষের কানে বড়-একটা পৌঁছত না। পুরানো আমলের কিছু কিছু প্রেমপত্র কাচে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রেখেছে ঐসব কুঠুরিয়া দেয়ালে। একালের মানুষ যেখানে বসে নিতান্ত নিরামিষ একপাত্র কফি খেয়ে আসে। কিন্তু গুণীদের রাসমণ্ডপে বসে খেয়েছে, সেই বাবদে অতিরিক্ত মাশুল গুণে দিতে হল। কফির দামের উপরে মাশুল চেপে গিয়ে অঙ্কটা নিদারুণ।

গল্পের উপসংহারে নীতি-উপদেশ : বুঝে দেখ, আমরাই নতুন কিছু করিনে। এক রীতি সর্বদেশে আর সর্বকালে। হতেই হবে। এই তোমার ঘরে যতক্ষণ আছি, পুরোপুরি এখানকারই। অন্য যা-কিছু পরিচয়—গলির মোড়ে খুলে রেখে এসেছি। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার সেটা গায়ে চড়িয়ে ভদ্র-সমাজে নেমে পড়ব। উঁকি দিতে যেও না সেদিকে, অনধিকারচর্চা হবে।

রাজাবাহাদুরের সেই কথা! মহিষ পচা পাঁকে গা ডোবাতে এসেছে। গোয়ালটা কোথা, সে খবরে কি দরকার? তা বলে মন মানতে চায় না। যে সব লোক আসে তারা ঠিক জলে ভেসে-আসা ঐ সাহেবেরই মতন। পিছনের নাম-গোত্র পরিচয় নেই! একাকী এসে রাজাবাহাদুর বেহুঁশ হয়ে ঘুমুতেন কোন কোন দিন। সুধামুখী তখন জামার পকেট হাতড়েছে। আর দশটা মেয়ের মতো টাকা-পয়সা গাপ করা নয়, কোন একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ে যদি

পকেট থেকে, অথবা এক টুকরো পরিচয়ের কাগজ। ছেলে-ছেলে করে ছুটে এসে পড়েন—স্নেহ-বুভুক্ষার কারণ যদি কিছু আবিষ্কার হয়। অথবা এই যে মানুষটি—ঠাণ্ডাবাবু বলে যার উপর অন্যেরা নাক সিঁটকায়। এমনও রটনা আছে, পুলিশের চর নাকি উনি—বোমা-পিস্তলের স্বদেশিদের ধরবার উদ্দেশ্যে চুপচাপ বসে বসে নজর রাখেন, মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকুনি দেন। আবার ঠিক উল্টোটাই বলে কেউ কেউ: উনিই স্বদেশি মানুষ—বিপদের গন্ধ পেয়ে এ পাড়ায় এসে ঠাঁই নিয়েছেন। সরকারের পুলিস সর্বত্র তোলপাড় করবে, লুচ্চো-লম্পটের আড্ডা বলে পরিচিত এই রকমের বাড়িগুলো বাদ দিয়ে।

ঠাণ্ডাবাবুর সত্য পরিচয় কে বলবে ?

একদিনের ব্যাপার, বাবুটি এসে সুধামুখীর দাওয়ায় উঠছেন। দাওয়ার নিচে পৈঠার উপর পা দিয়েছেন, একখানা ইট খুলে উল্টে পড়ল, উনিও পড়লেন। কিসের খোচায় পা কেটে গেল একটুখানি। অতিশয় ছোট ঘটনা। কত সব ভাল বড় বড় কথা বলতেন তিনি। সমস্ত তলিয়ে গিয়ে এই এক দিনের তুচ্ছ কথা ভুলল না সুধামুখী জীবনে।

পড়ে গেলেন তিনি পৈঠার ইট খসে। ইটের ফাঁকে আমের চারা। চারা বলা ঠিক হবে না। আম খেয়ে আটি ছুড়েছিল, আটি ফেটে অঙ্কুর বেরিয়েছে। ইটের তলে বাড়তে পারেনি—সেই অঙ্কুর অবস্থায় রয়ে গেছে। সবুজ নয়, সাদা—মানুষ হলে রক্তহীন ফ্যাকাসে বলা চলত। আঘাত পেয়েছেন ঠাণ্ডাবাবু কিন্তু সেটা কিছু নয়। কত বড় একটা আশ্চর্য জিনিস, এমনিভাবে সুধামুখীকে ডাকলেন ? দেখ দেখ, ক্ষমতাটা দেখে যাও এদিকে এসে। ইটের তলে পড়েও মরেনি ঐটুকু অঙ্কুর। দুটো পাতা অবধি বের করে দিয়েছে শিশুর মুখে দু-খানা দুধে-দাঁতের মতন। আশাখানা রোঝ—দু-তিন ইঞ্চিও যদি মাথা বাড়াতে পারে, আলোর এলাকায় পড়ে যাবে। তখন ঐ পাতার মুখে আলো টেনে টেনে বেঁচে যাবে, বড় হবে, ডালে-পাতায় মহীরূহ হবে একদিন। বাঁচবার কত সাধ দেখ।

কী উল্লাস মানুষটির—উল্লাসের চোটে এক পাক নেচেই ফেলেন বুঝি বা! কাটা-পায়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সুধামুখী ব্যস্ত হয়ে বলে; ইস রে, ঘরে আসুন, গাঁদাফুলের পাতা বেটে লাগিয়ে দিচ্ছি।

কানে নিতে বয়ে গেছে তাঁর। হাতের কাছে এক ভোঁতা কাটারি পেয়ে তাই নিয়ে মাটি খুঁড়ে অতি সন্তর্পণে চারাটা তুলছেন। বলে যাচ্ছেন যেন

নিজেকেই শুনিয়ে : কী মায়া পৃথিবীর মাটির! অমৃতের পুত্র কেবল মানুষই নয়—জীবজন্তু, গাছপালা সকলে। মরতে সবাই গররাজি। একটা জীবন নেওয়া বড় সোজা নয়। পারল এই এতবড় ইটখানা?

পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপরে পাঁচিল। পাঁচিলের ধারে আমের চারা পুঁতে দিয়ে এলেন। বলেন, দিলাম একটু সাহায্য। মানুষের জন্য কিছু করতে পারিনে, এ-ও একটা জীব বটে তো! গরু-ছাগল পাঁচিলের ভিতর ঢুকতে পারবে না। কিন্তু মানুষে না উপড়ে ফেলে সেইটে নজর রেখ তোমরা।

কিছুদিন পরে এই ঠাণ্ডাবাবু উধাও হলেন। নতুন কিছু নয়, কত এমন আসে যায়। চিড়িয়াখানায় কোন এক মরশুমে হঠাৎ যেমন বিচিত্র বর্ণের পাখি এসে ঝিলের উপর পড়ে, আবার একদিন চলে যায়। এ ব্যাপার নিয়ত চলছে। মানুষটি নেই, হাতের গাছটা দিব্যি বেঁচে উঠল। বেশ খানিকটা লম্বা হয়ে ডালপালা বেরুচ্ছে। দেখতে দেখতে সাহেবও দেড় বছরেরটি। কথা ফুটছে এইবার।

পারুল আসে যখন-তখন। ছেলের কাছে বসে থাকে। কথা শেখায়। বলে, আমার কাকাতুয়াকে পড়িয়ে পড়িয়ে কত শিখিয়েছি, ছেলে শেখানো আর কি! জানো দিদি, ভোর না হতেই দাঁড়ের উপর পাখনা ঝটপট করে বলবে, হরি বল মন-রসনা। বোষ্টমঠাকুর যেন প্রভাতী গাইতে উঠোনের উপর এসেছেন। আবার রাতের বেলা অন্ধকারে থেকে হঠাৎ বলে উঠবে, দেখছি—দেখতে পেয়েছি। শিখিয়েছি তাই আমি।

খিলখিল করে হেসে উঠল পারুল। বলে, বজ্জাত কি রকম বোঝ দিদি। যে মানুষটা থাকে, ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে ওঠে : কে কে ওখানে? কী দেখতে পেল? অবিকল মানুষের গলা তো! তবু তো পাখি একটা—পাখি কতটুকুই বা শিখবে! এই ছেলেকে যা একখানা করে তুলব। লোকে এসে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে শুনবে, কাছ ছেড়ে নড়বে না।

সাহেবের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে সুধামুখী তাড়া দিয়ে উঠল : না, আজেবাজে ফাজলামি শেখাতে পারবি নে, খবরদার!

পারুল সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বলে, তা কেন, শেখাব শুধু ঠাকুর-দেবতার কথা। রামায়ণ-মহাভারত, আর দেহতত্ত্বের ভাল ভাল উক্তি—কত আশা করে রে মানব তুই দিনেই তরে আসিয়া, কাঁচামাটির দেহটি লইয়া অহংকারে মাতিয়া। এই সব।

চপল কণ্ঠ সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, ছেলে চাইলাম তোমার কাছে, তুমি তো দিলে না। তারপরে—কাউকে বলবে না কিন্তু দিদি, মাথার দিব্যি রইল—কেমন এক ঝোঁক চেপে গেল আমার, তারপরে কতদিন ভোরে ভোরে গঙ্গার ঘাটে গিয়েছি দিদি, যদি এসে পড়ে আবার অমনি একটি! ডাস্টবিন খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি। সে কি আর যার তার কপালে দেয় বিধাতাপুরুষ!

সুধামুখী হেসে বলে, আমি বুঝি জানি নে কিছু!

পারুল সচকিত হয়ে তাকায় চারিদিকে। বারবধূ—তবু একটুকু লজ্জার আভা যেন মুখের উপর। বলে, বাজে কথা। কোন রকম অসুখবিসুখ হয়তো। মিছে হয়ে যাবে অসুখ সেরে গিয়ে। কিন্তু কথাটা এরই মধ্যে রটে গেল—একগাদা মেয়েমানুষ এক জায়গায় থাকলে যা হয়। কতবারই তো রটল কত কথা!

সুধামুখী সত্যি সত্যি স্নেহ করে পারুলকে। তার সেই বোন তিনজন—শেষটা অবশ্য বিরূপ হয়েছিল, কিন্তু ছোট বয়সে কত ভাল ছিল তারা। তাদেরই একটি যেন পারুল। গভীর স্বরে বলে, না পারুল, এবারে মিছে নয়। গোপন করিস কেন? হাসপাতালে গিয়ে দেখিয়ে এসেছিস, তাও জানি? বাচ্চা আসুক কোল জুড়ে। বাচ্চার বড় সাধ তোর। আমি না দিয়ে থাকি, স্বয়ং বিধাতাপুরুষ দিচ্ছেন।

এবারের প্রত্যাশা মিছে হয়নি। মেয়ে এল পারুলের কোলে। রানী। বলাধিকারী যার কথা নিয়ে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানীকে চেন তুমি? নাকি ধনীর ঘরে বিয়ে হয়েছে সেই রানীর—সুধামুখীর চিঠিতে সেই কথা। সৎপাত্রে মেয়ে দেবে, পারুলের বড় ইচ্ছা। তাই বোধহয় হয়েছে। ফণী আড্ডির ছোট ছেলেটা—ডাক-নাম ঝিঙে, ঘুরঘুর করত ঐ বয়স থেকেই! সে-ই বর হল কিনা কে জানে! রানীর নাম করে জগবন্ধু বলাধিকারী মুখ টিপে হাসলেন। অর্থাৎ রানীকে না পেয়ে প্রণয়ভঙ্গ হয়ে সাহেব বাউণ্ডুলে হয়েছে, সেই অবস্থায় রেলের কামরায় তাদের ধরেছেন।

সন্ধ্যার মুখে থাবা দিয়ে দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়ানো এবার। ঘুম এসে গেছে, বজ্জাত ছেলে তবু নরম হবে না। চোখ বুজল একবার, মিটিমিটি তখনই আবার তাকিয়ে পড়ে। ঘুমো, ঘুমো—বড্ড দেরি হয়ে গেল, ওরা সব গিয়ে পড়েছে এতক্ষণ গলির মুখে।

এরই মধ্যে সুধামুখীর হঠাৎ কি রকম হল—ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ে চুপিচুপি বুলি শেখাচ্ছে। বল রে খোকা—মা। সোনামণি লক্ষ্মীধন, বল—

মা, মা, মা—। চারিদিকে তাকিয়ে নিল একবার: আমি তোর মা হই রে, আমারই জন্মে ভেসে ভেসে এসেছিল—

জল নেমে আসে দু'-চোখ ছাপিয়ে। বিগতযৌবন কালোকুৎসিত নারী—কেউ না দেখতে পায়—চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে। আয়না তুলে নিয়ে সভয়ে দেখে, রং ধুয়ে গিয়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল বুঝি! রাজবাহাদুর যাকে বলেন কোকিলের চেহারা। মানুষ তবে তো থু-থু করে সরে যাবে, রূপ দেখার পরে কেউ আর এগুবে না।

সকালে উঠে নফরকেষ্ট বেরিয়ে যায়। তার অনেক আগে রাত্রি থাকতেই ছেলে জেগে ওঠে। হাত-পা ছোঁড়ে অঁ অঁ করে? যেন পাখির কাকলি। কথা বলছে শিশু যেন কার সঙ্গে। পাতলা ঘুমে নফরকেষ্টর চমক লাগল একদিন। মা-কালী বেরিয়ে এসেছেন মন্দির ছেড়ে, ছেড়ে এসেই যেন এই মাটকোঠার বন্ধ দরজা ভেদ করে শিশুর পাশে দাঁড়িয়েছেন হাসি-হাসি মুখ করে। শশু অ ধ্য দেবভাষায় কত কি বলছে তাঁকে। চোখ বুজে বুজে নফরকেষ্ট সেইসব ক র মানে ধরবার চেষ্টা করে। বলছে কি দুঃখকষ্টের কথা এই সংসারের? ধ জোটে না, বার্লির জল খাওয়ায়। তাতেও একটুখানি মিষ্টি দেয় না। জ নীর কাছে নালিশ করছে? ঘুমের ভারে চোখ আচ্ছন্ন, চোখ মেলা যেন বিস্তর খাটুনির ব্যাপার—কান দুটোয় শুনে যাচ্ছে! চোখ মেলতে পারলে দেখা যেত ঠিক স্পষ্টাস্পষ্টি: মা দাঁড়িয়ে আছেন, নৃমুণ্ডমালা খুলে রেখে সোনার মটরমালা পরে এসেছেন গলায়, খড়্গ-খর্পর ফেলে এক হাতে ধরেছেন ঝিনুক আর হাতে দুধের বাটি। সে বাটিতে দুধই বটে, জল-বার্লি নয়। ভোররাত্রে চুপিসারে ক্ষুধার্ত শিশুকে দুধ খাইয়ে বাতাস হয়ে এখনই মিলিয়ে যাবেন। চোখ মেললে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু পাতা যেন আঠা দিয়ে এঁটে রেখেছে, চোখে দেখা নফরার আর ঘটে উঠল না।

সকালবেলা পাখিপাখালি ডাকতে সুধামুখী বাইরে গেছে। চোখ মুছে নফরকেষ্টও উঠে পড়ল। ছেলে ড্যাব-ড্যাব করে একনজরে কি দেখছে ঘরের চালের দিকে। তারপরে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে তক্তপোষের উপর দুম-দুম পা ছুঁড়লে, আর সেই অঁ-অঁ-অঁ—

নফরকেষ্ট শিক্ষা দিচ্ছে: অঁ-অঁ নয় রে বোকারাম। মা—মা, মা-জননী—

সুধামুখী এসে পড়েছে। বলে, তবু ভাল, মা ডাক বেরোয় আজও তোমার মুখ দিয়ে।

নফর বলে, সে মা কি আর নরলোকের পাঁচি-খেঁদি মা! যা দু-চার পয়সা রোজগার করি, সবই সেই মায়ের দয়ায়। মা দক্ষিণাকালী। জননী স্বয়ং

এসেছিলেন তোমার ঘরে। চোখ খুলতে পারলাম না, তাই দর্শন হল না। বুঝে দেখ, যোগী-ঋষি ধেয়ানে পায় না—তাই আমার হতে যাচ্ছিল। ঘুমের ঝোঁকে নষ্ট করে ফেললাম।

স্বপ্ন ছাড়া কি—পুরো স্বপ্ন না হোক, আধাআধি গোছের। বলল সমস্ত নফরকেষ্ট। সুধামুখী উড়িয়ে দেয় না। বলে, দেবী যদি হন—উনি মা-কালী নন, মা-ষষ্ঠী। এসব ষষ্ঠীঠাকরুনের কাজ—বাচ্চা যেখানে, ষষ্ঠীও সেখানে। বাচ্চা কতবার আছাড় খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে উঁচু জায়গা থেকে —বড় ছেলে হলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ উল্টে পড়ত। ওদের কিছুই লাগে না, ষষ্ঠীঠাকরুন কোল পেতে ধরেন। বাচ্চার গায়ে মাছিটা বসলে আঁচল নেড়ে তাড়িয়ে দেন। কালকেউটে ফণা তুলেছে, সে ফণায় আর ছোবল দিতে পারে না, ষষ্ঠীঠাকরুনের হুকুমে দাঁড়িয়েই থাকে, বাচ্চার উপর ফণার ছত্র ধরে। ছিনতাই-ছ্যাঁচড়ামি কাজ তোমার—কোন ঠাকুরের কি মাহাত্ম্য, শিখবে আর কোথায় তুমি!

নফরকেষ্ট ফ্যা-ফ্যা করে হাসে। বলে, যা দেখেছি, এখন বুঝলাম মা-কালী নয় মা-ষষ্ঠীও নয়। দেবদেবীর হাতে ঝিনুক-বাটি, কোন পটে দেখিনি, পুঁথিতেও শোনা নেই—

সুধামুখীর খোশামুদ করে এই রকম মাঝে মাঝে, মিষ্টি কথার বন্যা বইয়ে দেয় বলে, দেবতা-টেবতা নয় গো, মনে মনে তখন তোমাকেই দেখেছি। এই যেমন ভাবে তুমি এসেছ, রোজ সকালবেলা যেমন আস। একটা রক্তের ডেলাকে গড়েপিটে মানুষ করা কী সোজা ব্যাপার! ছেলেকে আমি শেখাচ্ছিলাম-বুলি ধরে সকালের আগে তোমায় ডাকবে—মা!

মেঝের উপর সুধামুখী ছেলে নিয়ে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। খাওয়াচ্ছে। বলে, আমি শেখাব—বাবা। মা নয় রে খোকামণি, বাবা বলা শিখে নে তাড়াতাড়ি। বাবা, বাবা, বাবা—! সেই হল আসল।

নফরকেষ্ট গদ-গদ হয়ে উঠেছে। মুখে হাসির ছটা। বল কি গো, বাবা ডাকবে আগে! আমি কী-ই বা করলাম! একটা দুটো টাকা—সে তো বরাবর দিয়ে থাকি। ছেলে এসে বেশি কি দিতে পেরেছি, ক্ষমতা কতটুকু আমার!

নফরার হাসি সুধামুখী নিমেষে ঘুচিয়ে দেয়, ফুৎকারে আলো নেভানোর মতো। বলে, শখ দেখে বাঁচিনে! কালোভুতো উৎকট এক বুনো-হাতি—তোমায় বাবা ডাকতে বয়ে গেছে। বাবা ডাকবার মানুষ আমার বাছাই-করা আছে। ডাক এক-একখানা ছাড়বে, আর টুং-টাং করে টাকা এসে পড়বে। বাবা ডাক মাংনা হয় না।

সেই বাছাই-করা মানুষ—একজন তো দেখা যাচ্ছে রাজাবাহাদুর। বাছাইয়ে ভুল হয়নি। তিনি এলেই সুধামুখী ছেলে বসিয়ে দেয় সামানা-সামনি। তারপর খানিকটা পিছু হটে রাজাবাহাদুরের পিছন দিকে গিয়ে ইসারা করে। পাগলের পোষা কাকাতুয়া যেমন—সঙ্গে সঙ্গে ইসারা বুঝে নিয়ে সাহেব ডেকে ওঠে, বাবা! নতুন বুলি বলতে গিয়ে চাঁপার কলির মতো ঠোঁট দুখানা একত্র করে আনে। হাসি-হাসি মুখ। সেই সময়টা পলকহীন চোখে তাকিয়ে না থেকে উপায় নেই।

সাহেব ডাকে : বাবা, বা-আ-ব্বা—। রাজাবাহাদুর গলে গেছেন একেবারে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে অনেকবার শুনতে চান, শুনে শুনে আশ মেটে না। জিনিসপত্র যা হাতে করে এসেছেন, গোড়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে। এক সময়ে উঠে জামার পকেটের ব্যাগ বের করে একগাদা পয়সা-দুয়ানি-সিকি সাহেবের সামনে রাখেন। খেলা করুক ছেলে যেমন ইচ্ছে ফেলে-ছড়িয়ে। মেজাজি মানুষ যা বের করে দিয়েছেন, পকেটে আর ফিরে তোলেন না।

•

সুধামুখীর দিনকাল খারাপ। আসেন ঐ রাজাবাহাদুর—ছেলের ফাঁদ পেতে বাঁকে আটকেছে। ঘরের মানুষ নফরকেষ্টরও দুর্দিন—একটা দুটো টাকা দিত আগে, তাও আর পেরে ওঠে না।

দুঃখে এক-একদিন নফরকেষ্ট ভেঙে পড়ে। সরল মানুষটা মনের কথা চাপতে পারে না সুধামুখীকে খুলে বলে। মানুষটা ভাল হতে পারবে না তো টাকার মানুষ হবে, সেই ধান্দায় অহরহ ঘুরে বেড়ায়। টাকা রোজগারের সবচেয়ে ইতর পথটা বেছে নিয়েছে। ঘটিচোর বাটিচোর বলে ঠাট্টাতামাসা চলে—সকলের অধম ছিনতাই মানুষ, পথেঘাটে যারা হাতের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। চোর-ডাকাতের যে সমাজ, তার মধ্যে অন্ত্যজ। অথচ শিক্ষা চাই এই কর্মে—পুরোদস্তুর ম্যাজিক দেখানো শতেক জনের চোখের উপর। পাকা হাত হলে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তা হাত নিয়ে নফরকেষ্ট করতে পারে বটে দেমাক!

একদিন হল কি—পকেট থেকে নোটের তাড়া তুলে নিয়েছে। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ—পুরো একটা দল যাচ্ছিল নতুনবাজারে কেনাকাটা করতে। নফরার সঙ্গেও জন তিনেক। এমনটা হবার কথা নয়, তবু কি গতিকে মক্কেলদের একজনের নজরে পড়ে নফরার হাত এঁটে ধরেছে। অন্যদেরও ঘিরে ফেলেছে সবাই, সরে পড়তে দেয় নি। এই মারে তো মারে। মেরে আধমরা তারপর পুলিশ ডাকবে, পথের কাজের যে রকম দস্তুর। নফরা

নিরীহভাবে দু-হাত উঁচু করে তুলেছে : বাজে কথা বললে তো হবে না, তল্লাস করে দেখে তারপরে বলুন। অতএব তল্লাসই চলল—একা একজন নয়, দলসুদ্ধ মিলে। সেই কোথাও। অপর তিনজনকেও দেখে। নেই, নেই! নফরা এবার জোর পেয়ে গেছে : দেখলেন তবে তো? খুশি হলেন? নিজেরা কোথায় ফেলেছেন। কিম্বা আনেন নি হয় তো একেবারেই। পথের মানুষ ধরে টানাটানি। দল হয়ে যাচ্ছেন, যা ইচ্ছে করলেই হল।

পাবে কোথায় সে বস্তু? যে মানুষটা নফরাকে চেপে ধরেছে, নফরা তারই পকেটে ফেলে দিয়েছে টুক করে। দুনিয়া জুড়ে তল্লাস করলে, নিজের পকেটে কখনো নয়। সরাবার অতএব সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

বিষম বেকুব হয়ে গেছে তারা। দাঁত মেলে হাসির মতো ভাব করে নফরকেষ্ট নমস্কার করে : খুশি হয়েছেন—আসতে পারি তো এবার? এমন আর করবেন না।

ভদ্রতা মাফিক বিদায় নিয়ে এল। ডেরায় চলে এসেছে। কই, বের কর দিকি, গোনাগুনতি হোক।

সেই নোট নিয়েই ফিরেছে। নফরকেষ্ট নয়, অন্য একজনের কাছ থেকে বেরুল। নমস্কার করে বিদায় নিয়ে আসবার সময় সেই মানুষটার গা ঘেঁষে পুনশ্চ পকেট থেকে তুলে নিয়েছে। গচ্ছিত-রাখা জিনিসটা ফেরত আনার মতো।

এমনি কত। যা সমস্ত নফরকেষ্ট বলে, বাড়িয়ে বলে ঠিকই—খানিকটা তবু সত্যি। নফরকেষ্ট না-ও যদি করে থাকে, কেউ না কেউ করেছে এমনি। দিনকাল তারপরে খারাপ হতে লাগল। মক্কেলরা সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে। পয়সা-কড়ির অভাব, মানুষজন প্রায়ই খালি পকেটে বেরোয়। নফরকেষ্ট ট্রামে যেত আগে ফার্স্ট ক্লাসে। খুব একজন বাবুলোকের পাশে গিয়ে বসল। একটা পকেটে বাবুর হাত ঢোকানো। তার মানে নিজেই দেখিয়ে দিচ্ছে, মাল আছে এইখানটা। নফরকেষ্টর হাতে ঘড়ি—বাজে বাতিল জিনিস, দেখতে চকচকে ঝকঝকে কিন্তু চলে না। নফরা বলে, চলবার জন্য তো ঘড়ি নয় পরবার জন্যে, কাজের সাজপোষাকের মধ্যে পড়ে এটা। সেই ঘড়িসুদ্ধ হাত কানের কাছে এনে ধরে : কী মুশকিল, এখন আটটা? দম দেওয়া নেই, বন্ধ হয়ে আছে। বলুন তো ক'টা বেজেছে। পাশের ভদ্রলোক পকেটের হাত তুলে ঘড়ি দেখে সময় বললেন। হাত সঙ্গে সঙ্গেই যথাস্থানে ঢুকেছে। হাসি ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়, হাত ঢুকিয়ে কি সামলাচ্ছ এখন মানিক? সে বস্তু কি আছে, ডিম ফেটে পাখি হয়ে উড়ে বেরিয়ে গেছে পকেট থেকে। নফরই আবার ভদ্র-

লোকের নজরে এনে দেয়ঃ ব্যাগ পড়ে গেছে আপনার। শশব্যস্তে ভদ্রলোক তুলে নিলেন। হাসি আসে আবার নফরকেষ্টর মুখে—ব্যাগ-ভরা কতই যেন ধনসম্পত্তি! তবু যদি পরীক্ষা করে না দেখতাম! দু-তিন আনা ছিল হয়তো গোড়ায় ফার্স্ট ক্লাস ট্রামের টিকিট কাটতে খরচা হয়ে গেছে। একেবারে শূন্য ব্যাগ।

সেই থেকে নফরকেষ্ট ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে সেকেণ্ডক্লাস ধরল। তাতে বরঞ্চ মেলে কিছু। এই শিক্ষা হল, ভাল মক্কেল উঁচু ক্লাসে চড়ে না। এক জায়গায় একই সময়ে গাড়ি পৌঁছচ্ছে, বুদ্ধিমান হিসাবি লোক ফার্স্ট ক্লাসের অতিরিক্ত একটা-দুইটা পয়সা দিতে যাবে কেন? দেয় যার বেপরোয়া উড়নচণ্ডী বাইরে কোঁচার পত্তন, পকেটে ছুঁচোর কেত্তন।

এসব আগের দিনের কথা, এই ক'টা বছরে বাজার পুড়েজ্বলে গেছে একেবারে। বয়সের সঙ্গে বেঢপ মোটা হচ্ছে নফরকেষ্ট, গায়ের রং আরও ঘন হচ্ছে দিনকে দিন—যা নিয়ে সুধামুখী কথায় কথায় খোঁটা দেয়। বড় বড় রাঙা চোখ—আয়নায় চেহারা দেখে নিজেরই ভয় করে। নিরীহ পকেটের কারবারি কে বলবে, খুনি-দাঙ্গাবাজগুলোই হয় এ রকম। তার যে পেশা, সর্বদা সেজন্য মানুষের কাছাকাছি হতে হয়—কাছ ঘেঁষে গায়ে গা ঠেকিয়ে তবেই তো হাতের খেলা। কিন্তু চোখে দেখেই মক্কেল যদি ছিটকে পড়ে, কাজ হবে কেমন করে?

তার উপরে হাল আমলের ব্যবস্থাও সব নতুন। কাজের এলাকা ভাগ হয়ে গেছে। রাজার যেমন রাজ্যসীমা থাকে। ভিন্ন এলকায় ঢুঁ মারতে গিয়েছ কি মেরে তক্তাপেটা করবে। পুলিসে নয়, যারা একই কাজের কাজি তারাই। এই কালীঘাটে সে আমলে মফস্বলের সরলপ্রাণ ভক্ত মেয়েপুরুষরা আসত। আসে এখনও গাঁ-গ্রাম থেকে, কিন্তু বিষম ধড়িবাজ—শহুরে মানুষের কান কেটে দেয় তারা। সমস্ত দিন ঘুরেও ভক্তিবিহ্বল আপন-ভোলা মানুষের মতো মানুষ একটি মেলে না। মায়ের নামে পকেটে নিয়ে এসেছে তো সর্বসাকুল্যে গণ্ডা পাঁচ-সাত পয়সা—চলেছে কিন্তু লক্ষপতির মেজাজে। ছত্রিশগড়ের রাজা কি ছত্রির নবাববাহাদুর। পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়লে মাল ঠেকবে ঠিকই—সে মাল রূপোর টাকা কি সোনার মোহর কি তামার পয়সা বাইরে থেকে কেমন করে বোঝে? এসব কাজকারবার একলা একজন দিয়ে হয় না, মক্কেল সাব্যস্ত হয়ে গেল দুটো-তিনটে ডেপুটি অর্থাৎ সরকারী লাগে। কাজ অন্তে সকলের বখরা। সেই বখরা বিলির সময় ধুন্ধুমার লেগে যায়—তামার পয়সা তারা মুখে ছুঁড়ে মারে। নফর-

কেষ্টর গলায় গামছা দিয়ে টানে: ওসব জানি নে, লোক যখন কেলা হয়েছে খাটনির উপযুক্ত মজুরি চাই। কর কেন ভুয়ো-মক্কেল বাছাই—ধরে ফেললে মারগুতোন কি কম করে দিত পাবলিক? কোর্টে কেস উঠলে ছ-মাসের সাজা কি ছ-দিন দিত? হয় মজুরি দেবে, নয়তো তোমায় মেরে হাতের সুখ করব।

এই ছ্যাঁচড়া কাজ ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথবা উৎকৃষ্ট এক খোঁজদার জুটিয়ে নেওয়া। সেই খোঁজদার আদি অবস্থায় গড়েপিটে গোছগাছ করে দিল, নফরকেষ্ট ক্রত গিয়ে কাজ হাসিল করল তারপর। নফরা আর সেই লোক—আজেবাজে ডেপুটি ডাকবে না।

আরও এক নতুন উপদ্রব—থানা-পুলিস। এতকাল তাঁদের নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের কারণ ছিল না। থানায় সদাশয় পুরুষরা ছিলেন, পাকা বন্দোবস্ত ছিল। তাঁরা রোজগার করতে এসেছেন, তোমরাও এসেছ—কেউ কারও প্রতি-যোগী নয়। মাঝে মাঝে তাঁদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে নিজ রাজ্যে অবাধে চরে খাও—থানা তাকিয়েও দেখবে না। এখন এক হাড়বজ্জাত এসে বসেছে সেই থানার চূড়োয়।

মোক্তারমশায়রা আছেন, অতিশয় দক্ষ ও বিচক্ষণ। আদালতের লিস্টে তাঁদের নাম হয়তো রয়েছে, কিন্তু প্রাকটিশ থানার উপর এবং থানার আশেপাশে। যাবতীয় বন্দোবস্তে এঁরাই মধ্যবর্তী—নাম সেইজন্য পুলিসের মোক্তার। যেমন একজন বসন্ত মোক্তার। দু-হাতে রোজগার, কিন্তু একদিনও আদালত মুখো হন না। পথ চিনে আদালতে হয়তো পৌঁছতেই পারবেন না। না যেতে যেতে ভুলে গেছেন।

বসন্ত মোক্তার গেলেন নফরকেষ্টর হয়ে। প্রবীন মানুষটা চোখ-মুখ রাঙা করে ফিরলেন: নচ্ছার ফাজিল ছোঁড়া একটা, মানীর মান রাখে না। ইংরাজি শিখে পুলিসলাইনে ঢুকেছে কিনা, বিদ্যের দেমাকে ফেটে মরছে। কাজের একটু আঁচ দিতে গড়গড় করে ইংরাজি ছাড়তে লাগল—সাপ না ব্যাং মানে কিছু বুঝিনে। জুত হবে না, এইটুকু বেশ ভাল করে বুঝে এলাম।

বললেন, চিরকেলেমক্কেল তুমি, ফাঁকিজুকি দেব না। একটা টাকা ফী দিয়ে দিও।

নফরকেষ্ট বলে, কাজ হল না, তবু ফী?

সেই জন্যেই তো ষোলআনা। কাজ হলে ষোল টাকাতেও কি পার পেতে? টাকা আজকেই যে দিতে হবে তার মানে নেই। হাতে যখন আসবে, সেই সময় দিও।

বসন্ত সেজেছে বাংলা মোক্তার! তাঁর কমতায় হল না তো নফরকেষ্ট ইংরাজিনবিশ রাজমোহন সেনকে গিয়ে ধরে। বিস্তর অসাধ্যসাধন করেছেন ইতিপূর্বে। গেলেনও তিনি দু-তিন দিন, কিন্তু মুখ ভোঁতা করে ফেলেন। বললেন, শুচ্চের বুকনি শুনে এলাম, আর কিছু নয়। অন্তরে বিবেক, মাথার উপর ভগবান—সৎপথে সাধুভাবে কাজকর্ম করে যাবে। সরকার যথাযোগ্য বেতন দিয়ে পুষছেন, সেই বেতনের উপর একটি আধেলা গোরক্ত-ব্রহ্মরক্ত। সংসার না চললে বরঞ্চ দু-বেলার জায়গায় একবেলা খাবে, অধর্মের পথে তবু পা বাড়াবে না।

সৎপথের পথিক হয়ে ছোকরা দারোগার কোন মোক্ষ লাভ হল, নফরকেষ্ট জানে না। এর অনেক পরে আর এক সাধু-দারোগা জগবন্ধু বলাধিকারীর পরিণাম শুনেছিল সে। বলতে বলতে বলাধিকারী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন: ধর্ম না কচু! মুকুন্দ মাস্টারের মতো অপদার্থ যারা, গাল-ভরা এসব বলে তারা দশের কাছে মান বাড়ায়, নিজের মনে সান্ত্বনা আনে। পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয় ওটা নিতান্তই কথার কথা। কিছু হয়তো সেকালে চলত, এখন চলে উল্টোটাই। পাপ নামটাই ভুল—পাপের পথ নয়, প্রয়োজনের পথ। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি থাকলে প্রয়োজনের পথই আঁকড়ে ধরবে লোকে। নিরানব্বুই পার্সেন্ট যা করছে তাই বাতিল করে এক পার্সেন্ট পাগলের কথায় নাচানাচি করা আহাম্মুকি ছাড়া কিছু নয়।

এমনি কত কি। পণ্ডিত মানুষ বলাধিকারীর অনেক কথাই নফরকেষ্টর মাথায় ঢুকত না। বলতেন তিনি নফরকেষ্টকে উদ্দেশ করেও নয়। সাহেব থাকত, দলবলের অনেকেই থাকত। কিন্তু যেটুকু যা-ই বুঝুক, সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হত তাঁর এই নতুন ধরনের কথায়। একটা প্রতিহিংসার ভাবও যেন কালীঘাটের সেই ছোকরা-দারোগার উপর। বেঁচে থাকে তো দিব্যজ্ঞান পেয়ে সে-ও এমনিধারা উল্টো-কথা বলে নিশ্চয়।

কিন্তু বলাধিকারীর সঙ্গে পরিচয়—সে হল অনেক পরের ব্যাপার। থানা থেকে অপদস্থ হয়ে ফিরে রাজমোহন সেনের ব্রহ্মতালু অবধি দাউদাউ করে জ্বলছে। খুঁচিয়ে ওঠেন অলক্ষ্যে দারোগার উদ্দেশে: কসাইখানার মধ্যে বেটা ব্রহ্মার ঘৃত-পায়েস চড়িয়েছে। সাধু হয়েছিল তো বকল পরে বনে যা, থানার উপর কেন?

নফরকেষ্টরও মনের কথা তাই। বাবুমশায়রা, ভগবান অঢেল দিয়েছেন, ধর্মপথে থেকে জপতপ হোমযজ্ঞি নামগানে লেগে থাকুনগে। কিন্তু অহরহ ছুটোছুটি করে অন্ন জোটাতে হয়, মাথার উপর পঞ্চাশমণি এক ভগবান চাপানো থাকলে আমাদের দিন চলবে কেমন করে?

মনের দুঃখে নফরকেষ্ট সেই কথা বলছিল, কাজ-কারবার শিকেয় উঠে গেল। সদর রাস্তায় নিপাট ভালমানুষ হয়ে বেড়ালেও ধরবে। শহরের খুরে দণ্ডবৎ রে বাবা, ঘরবাড়ি রয়েছে সেখানে গিয়ে উঠিগে।

সুধামুখী আহা-ওহো করে না, উল্টে খিলখিল করে হাসে: বাড়িঘরে তুমি যাবে না, যেতে পারো না। কেন মিছে ভয় দেখাচ্ছ?

চটে গিয়ে নফরকেষ্ট বলে, হাসির কী হল শুনি? বাড়ি আমার নেই বুঝি? সে বাড়িতে নেই কোন জিনিস! এক-গোয়াল গরু, আউড়ি-ভরা ধান। ভাইরা আছে বোন আছে—ভাই-বোন পৌণে দু-গণ্ডা। ভর ভরন্ত সংসার—তার মধ্যে আমিই কেবল হতচ্ছাড়া।

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, সমস্ত আছে, নেই শুধু বউটা।

আছে আলবৎ। দরবার-গুলজার বউ আমার। এই কালীঘাটের মোড়ে এনে যদি দাঁড় করিয়ে দিই, তীর্থিধর্ম চুলোয় দিয়ে লোকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে আমার বউয়ের পানে। তুমি তার পাশে দাঁড়ালে চরণের দাসী ছাড়া কেউ ভাবতে পারবে না।

এত বড় কথার উপরেও সুধামুখী রাগ করে না, হাসিমুখে টিপ্পনী কাটে: বউ নিজের বাড়িতেই নিতে পার না, কালীঘাটে আনবে কী করে? বাড়ি গিয়েও তো চার ছড়ানো আর টোপ-গাঁথার ব্যাপার। লম্ফঝম্ফ যতই কর, কোনখানে তোমার নড়বার জো নেই। এই দাসীবাঁদী পোড়ামুখির ঘাড়েই এঁটে থাকবে জোঁকের মতো। যদ্দিন না আবার গাঁট ভারী হচ্ছে।

মর্মভেদী অনেকগুলো কথা বলে শেষটা বোধকরি করুণা হল মানুষটার উপর। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এত যাই যাই করবার কি হল শুনি? পড়তা খারাপ—তোমার রোজগার নেই। আমারও না। তা ছেলে কামাইদার হয়েছে, তার পয়সাই খেতে লাগি এখন।

পুলকের আতিশয্যে সুধামুখী বালিশ সরিয়ে বের করে ধরে। রাজাবাহাদুর এই আজকের দিনেই বাচ্চাকে যা খেলতে দিয়ে গেছেন। রুমাল বেঁধে সেগুলো বালিশের তলে রেখেছিল, রুমাল খুলে গণে দেখল। বলে, দেখ একদিনের রোজগার। তোমার কথা জানি নে, কিন্তু আমায় এতগুলো কেউ দেয় না। রাজাবাহাদুর হপ্তায় দু-তিনবার আসছেন— ভাবনা কিসের, উপোসি থাকব না আমরা।

নফরকেষ্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনে। এত হাসিখুশি সুধামুখী রোজগেরে ছেলের মা বলেই। কঠিন কথাও সেই দেমাকে গায়ে মাখল না। নফরকেষ্ট শতকণ্ঠে তারিফ করছে: বাহাদুর ছেলে বটে, ভাল করে কথা না ফুটতেই রোজগারে

নেমেছে। ভাগ্যিস তখন পারুলকে দিয়ে দাও নি। এখনই এই, বড় হলে ছেলে তো বস্তা বস্তা টাকা এনে দেবে।

ফোঁস করে গভীর নিশ্বাস ছাড়ল : আমার সেই হারামজাদি বউকে একটা দিনও ঘরে আনা গেল না। ছেলে থাকার কত গুণ, এ জন্মে বুঝল না।

চার দিনের মাথায় রাজাবাহাদুর আবার এসেছেন। ইদানীং বেশি ঘনিষ্ঠতা—তিনি এলে সুধামুখী এটা-ওটা খাওয়ায়। আজকে পিঠে হচ্ছে, পিঠে ভাজতে সে রান্নাঘরে ছিল। ঘরে এসে দেখে, সাহেব একাই বকবক করছে, রাজাবাহাদুর উঠে আলনায় টাঙানো জামার পকেট উদ্বিগ্নভাবে উল্টেপাল্টে খুঁজছেন।

সুধামুখী বলে, কি হল ?

রাজাবাহাদুর বলেন, মনিব্যাগ পাচ্ছি নে। ট্রামে আসতে হয় তোর বাড়ি, সহিস-কোচোয়ান জেনে ফেলবে বলে নিজের গাড়িতে আসতে পারি নে! পকেট মেরে দিল না কি হল—খোঁজ করতে গিয়ে দেখছি, নেই।

সুধামুখী গম্ভীর হল : ছিল কত ব্যাগে ?

তাই আমি গণে দেখেছি নাকি ? নিতান্ত খারাপ ছিল না। দশ-বিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে—

সুধামুখী বলে, এক-শ ?

হতে পারে। পাঁচ-শ হলেও অবাক হব না। খাজাঞ্চিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব।

হেসে বললেন, সমস্ত গেছে, ফিরতি ভাড়াটাও রেখে যায় নি। যাবার সময় গোটা টাকা দিস তো সুধা। ছেলেটার হাতে দুটো-চারটে করে পয়সা দিই। অভ্যাস হয়ে গেছে ওর, হাত পাতে। আজ আমি ভাহা বেকুব হলাম ছেলের কাছে।

মুশকিল, আজকেই একটু আগে সুধামুখী ঘরভাড়া চুকিয়ে দিল। হাত শূন্য। নির্ভাবনায় ছিল, রাজাবাহাদুরের আসবার তারিখ। আবার নফরকেষ্ট বলেছে, ডেপুটি হয়ে কোন এক সাঙাতের কাজ করে দিয়েছে—আজ বখরা পাবে। দেবে কিছু রাত্রিবেলা। দুটো মাত্র টাকাও ঘরে নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। ঘর খোলা পারুলের—সন্ধ্যার মুখে বন্ধু কেউ এসে থাকে তো বিদায় হয়ে চলে গেছে। মেজাজি মেয়ে পারুল—স্বয়ং লাটসাহেব এলেও তার মন-মেজাজ বুঝে চলতে হবে। যখন বলব, তদ্দণ্ডেই বেরুতে হবে। না পোষায় তো এসো না। কে খোশামুদি করতে যাচ্ছে! সময় ভাল পড়লে এই রকমই হয়, খদ্দের পায়ে-পায়ে ঘোরে।

ঝিরিঝিরি ঘরে পারুল এখন মেয়ে নিয়ে আছে। সোহাগি মেয়ে—হাসলে মাণিক পড়ে, কাঁদলে মুক্তো ঝরে। মেয়ের চোখে কাজল, কপালে কাচপোকার টিপ, গায়ে রংবেরঙের জামা। পাউডার বুলিয়েছে মুখে—সমস্ত হয়ে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট পা-ছুখানা কোলের উপর তুলে তুলে দিয়ে আলতা পরাচ্ছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুধামুখী তাকিয়ে দেখে নিশ্বাস চেপে নেয়। বলে, ছুটো টাকা হাওলাত চাচ্ছে সাহেবের বাপ।

পারুল তাকিয়ে পড়তে মৃদু হেসে বলে, সেই যে রাজাবাহাদুরের বাপটা। ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছে না। আবার যেদিন আসবে, দিয়ে দেবে।

উঠে গিয়ে টাকা বের করতে করতে পারুল কলকণ্ঠে বলল, পাঁজি দেখিয়ে এনেছি দিদি, বিষ্যুৎবারে আমার রানীর মুখে-ভাত। পুজোআচ্চা আর কি— মায়ের মন্দিরে নিয়ে প্রসাদ খাইয়ে আনব। বন্ধুমানুষ ক'জনকে বলছি, আর এ-বাড়ির যারা আছে। বেশি জড়াতে গেলে পারব না, কে ব্যবস্থা করে দেয় বলো। তোমার নফরকেষ্ট অবিশ্যি খুব পুলক দিচ্ছে, কিন্তু আমি সাহস করি নে।

সুধামুখী সভয়ে বলে, নফরার হাতে টাকাকড়ি দিস নি তো রে?

পাঁচটা টাকা নিয়ে গেল। রানাঘাটে কে ওর আপন লোক আছে, সেখান থেকে পান্তুয়া আনবে। তার বায়না!

সুধামুখী হতাশভাবে বলে, রানাঘাটের পান্তুয়ার আশায় থাকিসনে পারুল। মিষ্টির অন্য ব্যবস্থা করে ফেল। নফরা দেশেঘরে চলে গেল।

পারুল অবাক হয়ে বলে, বল কি! এই তো, এইমাত্তর এসে টাকা নিয়ে গেল।

এসেছিল, সে আমি টের পেয়েছি। নয় তো রাজাবাহাদুরের ব্যাগ গেল কোথায়? আমায় দেখা দেয় নি—দেখা হলে হাঙ্গামায় পড়ত। ধরে নে, ঐ পাঁচ টাকাও সে হাওলাত নিয়ে গেছে।

একটু হেসে বলে, সাহেবের বাবাগুলো আজ মহাজন পাকড়েছে তোকে। ছু-জনে পর পর। ফিরে এসে শোধও করবে ঠিক। ফিরছে কবে, সেই হল কথা! তোর হল পাঁচ টাকা; আর রাজাবাহাদুর বলছেন তাঁর দশ হতে পারে পাঁচ-শও হতে পারে—

বিড়বিড় করে নিজের মনেই যেন হিসাব করে দেখছে: পাঁচ আর দশ একুনে পনের। তা হলে দিন দশেকের বেশি নয়। পাঁচ-শ যদি হয় ধরে নাও বছর খানেক। ঘুঁটি ধরার টোপ ফেলতে যাওয়া—খরচের ব্যাপার—টাকা একদিন ফুরোবেই। সেদিন না এসে যাবে কোথা? কেন যদি একনাগাড়ে টাকা জমিয়ে যেত, তবে আর নফরকেষ্ট বাড়ি ছেড়ে ফিরত না।

কথাবার্তায় কেমন এক রহস্যের ছোঁওয়া। কৌতূহলী পারুল বলে, দাঁড়িয়ে কেন দিদি, বোলোই না শুনি! সাহেবের বাপ সাহেবকে নিয়ে আছে, তোমায় তার কোন গরজ নেই।

বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে সুধামুখী বলে, বাড়ি গিয়ে নফরা চাকরে সাজে। বাবু নফরকেষ্ট পাল—কলকাতার বড় চাকরে বাবু। মানুষটা এমনি ভাল তো —এক-একদিন বলে ফেলে অন্তরের কথা। বলে আর চোখ মোছে। চাকরে মানুষের মতো দু-হাতে রমারম খরচ করতে হয়। নয়তো সন্দেহ করবে, খাতিরযত্ন উপে যাবে, হেনস্তা হবে। বউ থাকে বাপের বাড়ি—টাকা দেখিয়ে তাকে খপ্পরে এনে ফেলতে চায়। বউটাও তেমনি খড়েল আবার—

পারুল অবাক হয়ে বলে, টাকার বউ তো আমারই সব। শালগ্রাম সাক্ষি রেখে মন্তোর পড়ে যাকে বিয়ে-করা—

জানিস নে পারুল, বিয়ের বউয়েরই বেশি খরচা। বউ পোষা আর হাতি পোষা। তা-ও তো সে বউ কাছে পেল না একদিন, লোভে লোভেই ঘুরছে। সম্বল ফুরোলে বাড়িতে তারপর লহমাও দাঁড়াবে না। আসতে হবে এই চুলোয়—আমার কাছে। রাত দুপুরে আপাদমস্তক ক্ষিদে নিয়ে রাক্ষস হয়ে আসবে, তার জন্যে ভাত রেঁধে রাখতে হবে আমায়। গোগ্রাসে পুরো এক পেট গিলে তার পরে কথা। তখন আর কিছুতে নড়বে না। আমি বলি জোঁক—জোঁক যেমন দু-মুখ আটকে গায়ে লেপটে থাকে। কিছুতে ছাড়ান নেই।

বলে, ক'দিন থেকে বাড়ি-বাড়ি করছে। রূপসী বউয়ের টান ধরেছে। আমারই ভুল, রাজাবাহাদুরকে সাবধান করে দিই নি। জানালার কাছে জামা রেখেছেন, বাইরে থেকে ব্যাগ তুলে নিয়েছে। গায়ে থাকলেই বা কি হত— মন্তোর-পড়া হাত ওর, চোখ মেলে তাকিয়ে থেকেও ধরা যায় না।

টাকা নিয়ে সুধামুখী উঠে পড়ল। দু-পা গিয়ে কি ভেবে দাঁড়ায়ঃ তোরা বলিস, নফরা দিদির ভালবাসার মানুষ। হাসিতামাসা করিস। মিছেও নয়। কিন্তু সেই ভালবাসা নিয়ে সদাসর্বদা সামাল। টাকা হাতে পড়েছে বুঝতে পারলে ঝগড়া করে ভাব করে চুরিচামারি করে, যেমন করে হোক টাকাটা গাপ করে নিতে হবে। রক্তে পেট মোটা হলে জোঁক তখন আর গায়ে থাকে না, খসে পড়বে। আমাদের ভালবাসা জিইয়ে রাখতে কী কষ্ট রে পারুল!

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সুধামুখী বেরিয়ে গেল।

তিন

অনেক দিন—অনেক বছর পরে। সাহেব বড় হয়েছে। সেই এক বড় সমস্যা। বাচ্চা বয়সে রান্নাঘরে জোড়া পিঁড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রাখত, কুণ্ডলী পাকিয়ে ছেলে পড়ে পড়ে ঘুমুত। এখন আর সেটা চলে না। শোয়াতে পুরো মাপের মাদুর দরকার। এবং মাদুর পাতবার উপযুক্ত পরিমাণ জায়গা। সন্ধ্যারাত্রে তো ঘুমাবেই না। ঘরে রাখা চলে না ও-সময়—দিনরাত্রির মধ্যে কাজকারবারের ঐ সময়টুকু। বস্তিবাড়ি তখন মানুষজনের হুল্লোড়—বড়সড় ছেলের কাছে মুখ দেখাতে অনিচ্ছুক সেই সব মানুষ। ছোটখাট আলাদা একটু থাকবার জায়গা পেত ছেলের জন্যে!

সাহেবের চোখ-কান ফুটেছে, জায়গা খুঁজেপেতে নিল নিজেই। কিছু না হোক, শোওয়ার সুখ বড্ড এই পাড়াটায়। বড়বড় লোকেরা গঙ্গার কূলে ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মার্বেলপাথরে নাম খোদাই-করা—একের পুণ্য অন্যের হিসাবে ভুলক্রমে জমা পড়ে না যায় খিলান-করা মণ্ডপ ঘাটের উপরে, বৃষ্টির সময়ের আশ্রয়। সেই সব ঘাটের উপর কোন একখানে পড়ে শুয়ে। সিমেন্ট-বাঁধানো মসৃণ চাতাল, ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়া। সীতারামের সুখ যাকে বলে। শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখ, তারা দেখ। মেঘ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, চাঁদ-তারা ঢেকে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এক ঘুমে রাত কাবার।

মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই বোধ করি এমনি ফুরেফুরে গঙ্গার হাওয়ায় চাঁদ-তারা দেখতে দেখতে একদিন সাহেব ঘাটে ভেসে এসেছিল। উজান স্রোতে ভেসে ভেসে গিয়ে সেই মা-বাপ আত্মীয়জনদের একটিবার যদি দেখে আসা যায়!

ঘাটে সে এমনি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। কাজকর্ম মিটিয়ে সুধামুখী নিশি-রাত্রে এক সময় ঘরে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে সাহেব আরও খানিকটা বড় হয়ে যাবার পর সেটাও আর ঘটে ওঠে না। মাঝরাত্রে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে হেঁটে হেঁটে বাড়ি অবধি যেতে বড় নারাজ সাহেব। ঐ ভয়ে শেষটা পালাতে লাগল। ঘাটের তো অবধি নেই—আজ এ-ঘাটে থাকে তো কাল ও-ঘাটে। সুধামুখী খুঁজে পায় না। বেশি খোঁজাখুঁজি হলে দূরে অনেক দূরে হয়তো চলে যাবে। এ তবু পাড়ার ভিতরে—বাইরে বেপাড়ায় গিয়ে কবে

কোন বিপদ ঘটে না জানি। ভেবেচিন্তে সুধামুখী বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে না। মা-গঙ্গার উদ্দেশে বলে, তোমার পাশে পড়ে থাকে মা-জননী, দেখো আমার ছেলেকে। হেরিকেন-লণ্ঠন হাতে গভীর রাত্রে ঘাটের উপর ঘুমন্ত সাহেবকে দেখে চলে যায়। মাথার নিচে বালিশটা গুঁজে দিয়ে গেল কোনদিন হয়তো।

এমন স্ফূর্তির ঘুমানোয় মুশকিলও কিছু আছে, সেইটে বড় বিশ্রী লাগে। উষাকালে পুণ্যার্থীর সব গঙ্গাস্নানে আসেন: আরে মেলো ঘাট জুড়ে পড়ে রয়েছে। উঠে যা ছোঁড়া, নরে যা। চানের পর ছোঁয়াছুয়ি হয়ে মরি শেষকালে।

চোখে ঘুম এঁটে আছে, হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ে সাহেব। পুণ্যবানের পথ আটকে থাকতে যাবে কেন? দেবেই বা কেন তারা থাকতে? হাতে লাঠি থাকে কোন কোন বুড়োমানুষের। গঙ্গাজল নিয়ে যাবার কলসি থাকে পুণ্যবতীদের কাঁখে। বলা যায় না—লাঠি মারল হয়তো পিঠে, কলসি ভাঙল হয়তো-বা তার মাথায়।

সাহেবের এই রকম। সেই রাজবাহাদুর বাপও অদৃশ্য হয়েছেন অনেক কাল আগে। বয়স আরও তো বেড়েছে—এ পাড়ায় আসেন না তিনি। কোন পাড়ায় যান কে বলবে। হয়তো কোনখানেই নয়। বৃদ্ধ হয়ে মতিগতি বদলেছে, পূজা-আহ্নিক ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছেন। কিম্বা মরেই গেছেন হয়তো। সুধামুখী আজকাল খবরের-কাগজ পড়ে না—সংসারের দশ রকম খরচা এবং ছেলের খরচা কুলিয়ে তার উপরে আর কাগজের বিলাসিতা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাই জানে না, কোন সকালবেলা হয়তো-বা কাগজে রাজাবাহাদুরের ছবি বেরিয়ে গেছে। অসংখ্য গুণাবলীর মালিক পূতচরিত্র এ রকম মানুষ হয় না, তাঁর বিয়োগে হাহাকার চতুর্দিকে। অসম্ভব কিছু নয়। নিয়তই ঘটছে তো এমনি। সেই ঠাণ্ডাবাবু বলত জর্মানির কোন লাইপজিগ শহরের কফিখানার গল্প। কফিখানার পাতালতলে যে মেয়েরা নিশিরাত্রে এসে প্রেমলীলা চালাত, তাদের কাছে দিকপাল মানুষদের খুব সম্ভব একটি মাত্র পরিচয়—লম্পট নটবর। মানুষ মাত্রেই অভিনেতা, বলতেন ঠাণ্ডাবাবু। নকল সাজগোজ নিয়ে এ ওর কাছে ভাঁওতা দিয়ে বেড়ায়—সাজ ফেললে ভণ্ড বীভৎস রূপ। এই সঙ্গে গবেষক ব্যারিস্টার সাহেবের কথাও মনে আসে—সুধামুখীর বাপ যাঁর লাইব্রেরিতে কাজকর্ম করেন। অগাধ পাণ্ডিত্য, দেশ বিশ্রুত নাম—লাইব্রেরির সংগ্রহ যেমন বিপুল তেমনি মূল্যবান। কিন্তু আরও এক নিগূঢ় সংগ্রহ আছে, বাইরের লোকের মধ্যে জেনেছিলেন একমাত্র সুধামুখীর বাপ। ধার্মিক মানুষ বাবা পরম বেদনায় গুরুদেবকে বলছিলেন মানুষের রুচিবিকৃতি ও পাপলিপ্সার কথা।

প্রতিরোধের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে মহাপণ্ডিত ব্যারিস্টার সাহেবের কথা তুললেন। এইটুকু সুধামুখীর হঠাৎ কানে সড়ে গেল, জানলার বাইরে থেকে সে শুনতে পেয়েছিল। লাইব্রেরীর ভিতর একটা লোহার আলমারি সর্বক্ষণ তালাবন্ধ থাকে, তার মধ্যে দেশ-বিদেশের যত অশ্লীল বই আর ছবি। অতি গোপনে বিস্তর দামে এ সব বিক্রি হয়, পুলিশে টের পেলে টানতে টানতে শ্রীঘরে তুলবে। এত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জলের মতন অর্থব্যয় করে বছরের পর বছর ব্যারিস্টার সাহেব সংগ্রহ জমিয়ে তুলেছেন। রাত্রে নিরিবিলি আলমারি খুলে দরজায় খিল এঁটে এই সমস্ত নাড়াচাড়া করেন। ছেলেপুলে সবাই জানে, গভীর গবেষণায় ডুবে রয়েছেন, পা টিপেটিপে চলাচল করে তারা শব্দসাড়া হয়ে পাঠে কোনরকমে ব্যাঘাত না ঘটে। এ ব্যাধি থেকে কবে মুক্ত মানুষ? হবে কি কোনদিন?

কিন্তু পরের কথা থাকুক এখন। দিনকাল আরও খারাপ। সুধামুখী চোখে অন্ধকার দেখে—কী হবে, ভবিষ্যতের কোন্ উপায়? রাজাবাহাদুর ফৌত, তার উপর নফরকেষ্টরও বিপদ। ধরা পড়েছে সে, ধরে নিয়ে আটকে ফেলেছে। তারই মুখের কথা এ সমস্ত—আগে আগে বলত সে এইরকম। আটকে রেখেছে জেলে নয়, বড়গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় ভাইয়ের বাসায়। অবরেসবরে চলে আসে সেখান থেকে। আসে দিনমানে, ছুটিছাটার দিনে।

বলত, জেলের চেয়ে বেশি খারাপ এ জায়গা। কয়েদিরা ছোবড়া পেটে ঘানি টানে সতরঞ্চি বোনে। সে হল আরামের কাজ। এখানে কারখানার ভিতর হাজার চিন্তার গনগনে আগুন—হরিশ্চন্দ্র পালার চণ্ডালের মত সর্বক্ষণ সেই আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ। জেল হলে মেয়াদ অন্তে কোন একদিন ছাড়ও হয়ে যায়। ভাইয়ের বাসার গোলকধাঁধা থেকে কোনকালেই বেরুতে দেবে না, শ্বশুরবাড়ি থেকে বউটাকে এনে ফেলে ভাল করে আটঘাট বন্ধ করবে, শুনতে পাচ্ছি। টাকা পড়ে মরুক, একটা সিকিও মুঠোয় রাখতে দেয় না। মাসের মাইনে হাত পেতে নিয়েছি কি ভাই অমনি ছোঁ মেরে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলবে।

হেসে বলে, আমার কাছে টাকা দেখলে কারও প্রাণে জল থাকে না সুধামুখী। টাকার গরমে জল ঝাঁপিয়ে পড়ি না ফানুস হয়ে আকাশে উড়ি কেউ যেন সাব্যস্ত করে উঠতে পারে না। কেড়ে নিয়ে তবে সোয়াস্তি। সে আমি তোমার বেলাতেও দেখেছি।

আগে আগে ইনিয়েবিনিয়ে বলত এমনি সব। কেমন করে গ্রেপ্তার হল তা-ও বলেছে। নফরের ঠিক পরের ভাই নিমাইকেষ্ট। নিমাইয়ের শ্বশুর

হাওড়ার এক ঢালাই কারখানার ম্যানেজার। তিনিই জামাইয়ের চাকরি জুটিয়ে পাড়াগাঁ থেকে মেয়েজামাই উদ্ধার করে আনলেন। কারখানা থেকে ঘর দিয়েছে, বাসা সেখানে। কিন্তু নিজের ভাল নিয়েই নিমাইকেষ্ট খুশি নয়—বড়ভাইটা কত বছর আগে শহরে এসে উঠেছে, তার খোঁজ নিচ্ছে তন্নতন্ন করে। কোথায় থাকে সে, কি কাজ করে, রোজগারের টাকাকড়ি যায় কোথায়—

সুধামুখীর কাছে হাত ঘুরিয়ে নফরকেষ্ট ভাইয়ের ব্যাখ্যান করে: কলিযুগের লক্ষ্মণ সম ভাই। খোঁজ করে করে ঠিক গিয়ে ধরেছে। নিমাই কেন যে কারখানার কাজে গেল, টিকটিকি-পুলিশের লাইন হল ওর, অঢেল উন্নতি করত।

একটা গোপন ডেরা আছে নফরাদের, এতকালের ঘনিষ্ঠতায় সুধামুখী পর্যন্ত তার ঠিকানা জানে না। কেমন করে গলির গলি তস্য গলি ঘুরে পনের-বিশটা নর্দমা লাফিয়ে পার হয়ে আঁস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে নিমাইকেষ্ট সেখানে গিয়ে হাজির।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ভাইয়ের অবস্থার মোটামুটি আন্দাজ নিয়ে নিল। স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা: চাকরিটা কোথায় তোমার দাদা?

থতমত খেলে সন্দেহ করবে। যেমন যেমন মুখে আসে, নফরকেষ্ট চাকরিস্থলের ঠিকানা বলে দেয়।

নিমাইকেষ্ট মেনে নিয়ে চুপচাপ চলে গেল। পরদিন আবার এসেছে। থমথমে মুখ। নফর প্রমাদ গণে।

গিয়েছিলাম দাদা তোমার আপিসে। বিস্তর লোকের বড় আপিস বললে—দেখলাম বিস্তরই বটে। লোক নয়, গরু আর মহিষ জাবনা খাচ্ছে। চাকরিটা কী তোমার—খাটালের গরু-মহিষের জাবনা মাখা?

নফরকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে, বাড়ির নম্বরের হেরফের হয়েছে, ওর পাশের বাড়িটা—চুয়ান্ন নম্বর।

সেইরকম ভেবে আমিও দু পাশের বাড়ি দুটোয় খোঁজ করেছি। একটার চুল কাটার সেলুন—চুল ছাঁটে দাড়ি কামায়। আর একটি মেসবাড়ি—দি গ্রাণ্ড প্যারাডাইস লজ।

নিমাইকেষ্ট মুখে কথা বলে, আর দু-হাতে ভাইয়ের জিনিসপত্র কুড়োয়। এইদিক দিয়ে বড় সুবিধা, একটা বোঁচকায় সমস্ত ধরে গেল। বোঁচকা বড়ও নয় এমন কিছু। হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে ডাকে: চলো—

—কোথায় রে?

বাসা হয়েছে হাওড়ায়, তোমার বউমা এসেছে। বাড়ির বউ মজুত থাকতে ভাসুর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবে—ছি-ছি করবে লোকে জানতে পারলে।

কলাও করে নফরকেষ্ট বাসায় নিয়ে তোলার কাহিনীটা বলত। বড় সহজ

সেটা হয়নি, পাকছাট মেরেছে সে বিস্তর। নিমাইকেষ্ট তখন হাত চেপে ধরল। সে আরো বেশি পালোয়ান। গায়ের জোরে হিড়হিড় করে ট্রাম তুলে এবং অবশেষে বাসায় ঢুকিয়ে দিয়ে তবে সে হাতের কব্জি ছাড়ে। জেলখানায় ঢোকানো বলছে কেন আর তবে!

নফরকেষ্ট বাড়িয়ে বলত নিঃসন্দেহে, এতদূর কখনও হতে পারে না। সুধামুখীর কাছে ভালমানুষি দেখানো—বুঝতে সেটা আটকায় না। বয়স হয়ে গিয়ে পুরানো কাজকর্মে জুত করতে পারছে না। থানার শনির দৃষ্টি তদুপরি। বাউণ্ডুলেপনা ছেড়ে নফরা ঘরসংসারে চেপে পড়ল।

ছোট ভাই নিমাই তাই করে তবে ছেড়েছে। বাসায় তুলে ক্ষান্ত হয় নি, শশুরকে ধরে কারখানায় একটা কাজও জুটিয়ে দিল। হায়রে কপাল, নফরকেষ্ট পাল চাকরে মানুষ রীতিমত। চাকরি করে বলে আগে সে লোকের কাছে খাপ্পা দিত—কিন্তু কথা তো ক্ষণে-অক্ষণে পড়ে যায়, অন্তরীক্ষের ভগবান তথাস্তু বলে দিলেন। চাকরির গুঁতোয় লবেজান এবারে দিনের পর দিন। আটটায় ভোঁ বাজলে হন্তদন্ত হয়ে কারখানায় ছোট। গলিত লোহা—লোহা কে বলবে, তরল আগুন—সেই আগুন বালতি বালতি এনে ঢালছে ছাঁচের মধ্যে। ঢালছে অবিরত, লহমার জিরান নেই—কলেই সমস্ত করে। নফরকেষ্টকে খাড়া দাঁড়িয়ে নজর রাখতে হয়। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, তাপে তারও দেহ এইবারে বুঝি গলে টগবগ করে ফুটবে। পিঠ চুলকাতে কিংবা গায়ের ঘাম মুছতে ভয় করে—হাতের চাপে সুসিদ্ধ হাড়-মাস-চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে খাবলা খাবলা উঠে আসবে হাতের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা টলতে টলতে বাসায় এসে পড়ে, তারপরে আর উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। ছুটির দিনে যে একটু-আধটু বেরোয়, ভাইবউ সেই পণ্ড করবার জন্যে আগেভাগে একশ গণ্ডা কাজের ফরমাস দিয়ে রাখে। আর বাসায় ফিরে ঘরে পা ঠেকানো মাত্র ছোট ভাইয়েরও হাজার গণ্ডা। বলে তা হলে, জেলখানার বাকি থাকল কিসে?

গোড়ার আমলে নফরকেষ্ট এমনি সব বলত। ইদানিং আর বলে না, ধাতস্থ হয়ে এসেছে। বলে, ভাল মানুষ না হয়ে আমি টাকার মানুষ হতে গিয়েছিলাম, টাকায় সব কিনব। কিন্তু টাকা হল না, হবার ভরসাও নেই। এবারে মানুষ ভাল হয়ে দেখি। সংসারের বাজারটা আমি করে দিই। নিমাইএর বউ মান্যগণ্য করে বেশ, পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে সাজিয়ে এনে দেয়। সন্ধ্যের পর পাড়ার ক্লাবে গিয়ে কোন দিন তাসে বসে যাই। কোন দিন বা থিয়েটারের রিহার্শাল দেয়, শুনি তাই বসে বসে। মাইনেও ফি বছর দু-তিন টাকা করে বেড়ে যাচ্ছে।

তবে আর কি! সংসার পোষ মানিয়ে ফেলেছে। এখন হয়তো মাসে একবার আসে, এর পর ছ-মাসেও আসবে না। টাকাপয়সার প্রত্যাশা ছাড়, মানুষটারই চোখের দেখা মিলবে না। হয়তো বা সারা জীবনের মধ্যে নয়—রাজাবাহাদুরের মতো। ভাল হয়ে গেছে নফর, বলবার কিছু নেই। প্রশংসারই ব্যাপার।

সুধামুখী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, বউ এল বাসায়?

উহু, আসেনি এখনও। আসার বেশ খানিকটা ভাব হয়েছে। আমার এক খুড়তুতো বোনের বিয়ে হল শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে—বোনকে নাকি আমার চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

প্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলে, আছি আমি লেগে পড়ে। আসতেই হবে—না এসে যাবে কোথায়, হারামজাদি? আজ না হয়তো কাল। বয়স তারও বাড়ছে, রূপের গুমোর আর বেশি দিন নয়। পাড়ার ছোঁড়ারা, আগে তো শুনতে পাই, ঘরের চারিদিকে ঘুরঘুর করত, শিয়াল তাড়ানোর মতো হাঁকডাক করতে হত রাত্রে। এখন একটাবার বেড়ায় ঘা পড়ে না, নাক ডেকে ঘুমোয়। আমরাও ইদিকে বছর বছর মাইনে বেড়ে যাচ্ছে। ধর্মপত্নী হয়তো ঠিক একদিন এসে উঠবে।

পারুল ছোট বোনের মতো, সুধামুখীর সকল সুখ-দুঃখের কথা তার সঙ্গে।

ভাঙা আসর কোনদিন আর জমবে না পারুল। থুতু ফেলতেও কেউ আসে না। আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে বসে থাকা এবার থেকে।

ফোঁস করে পারুল নিশ্বাস ছাড়ে। মেয়ে হওয়ার পর থেকে তাকেও ভয়ে ধরেছে। বলে, ত্রিভুবনে আমাদের আপন-কেউ নেই। সবাই সুখের পায়রা, সুখের দিনে ঘরে এসে বকবকম করে চলে যায়। শ্বশুরবাড়ি যদি পড়ে থাকতাম, রমারম টাকাকড়ি আসত না, গয়নাগাঁটি গাঁয়ে উঠত না। কিন্তু গয়না-টাকায় মন ভরে না দিদি, সুখ আসে না।

পারুলের বয়স আছে, যৌবন আছে। তার আসর অন্ধকার হতে অনেক দেরি। লোকের সামনে কত ঠাকঠমক! সর্বাঙ্গে দোলন দিয়ে দিয়ে হাসে—খিক-খিক খুক-খুক। কিন্তু আড়ালে-আডালে এমনি হয়ে যায়। আলাদা মানুষ—আমোদ স্ফূর্তির মুখোসখানা ঘরের তাকে খুলে রেখে যেন সুধামুখীর কাছে এসে বসেছে, সন্ধ্যাবেলা আবার পরবে।

বলে মেয়েটা বড় হচ্ছে, ওর দিকে তাকিয়ে প্রাণে জল থাকে না দিদি। বিয়েথাওয়া দিতে পারব না, সারা জীবন শস্তেক হেনস্তা সয়ে বেড়াবে।

সুধামুখী শাসনা দেয়ঃ এখন খাসা মেয়ে, বিয়ে হবে না, কে বলল! বয়সকালে আরও কী রকম শ্রী-ছাঁদ খুলবে দেখিস।

ম্লান হেসে পারুল বলে, এই মায়ের মেয়ে কে ঘরে নিতে যাবে বল। মায়ের পাপে মেয়ের খোয়ার। আমার মেয়েও যে ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো, এ কথা কেউ বুঝে দেখবে না।

খপ করে সুধামুখীর হাত চেপে ধরল: তুমি যদি বউ করে নাও সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে। বড় ভাব দুটিতে একসঙ্গে বেড়ায়—

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুধামুখী হেসে বলে, চখাচখী—যেমনবারা পদ্যে লিখে থাকে। একরত্তি ছেলে আর একফোঁটা মেয়ে, সমবয়সি খেলার সাথী—তুই একেবারে প্রেমিক-প্রেমিকা ধরে নিলি রে! বিয়ে না হলে মেয়ে অন্নত্যাগ করবে, ছেলে দেশান্তরী হবে—উঁ?

পারুল বলে, এড়িয়ে গেলে শুনব না দিদি। এখনই কে বলছে, কথাবার্তা হয়ে থাক আমাদের। সাহেবকে আমি নিতে চেয়েছিলাম, দাওনি সেদিন। এবার আমার রানীকে দিতে চাচ্ছি, নিয়ে যাও।

সুধামুখী ধমক দিয়ে ওঠে: আস্ত পাগল তুই একটা। মায়ের দুধের গন্ধ এখনও মুখে—সেই মেয়ের বিয়ের ভাবনা লেগে গেল। বিয়ে না দিলে অরক্ষণীয়া মেয়ে ঘর ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। বড় হতে দে, তখন দেখবি সাহেব তো সাহেব—কত ভাল ভাল সম্বন্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সাহেবের কথা উঠলে তুই-ই হয়তো তখন নাকচ করে দিবি।

হত তাই দিদি, না হবার কিছু ছিল না, আমি কালামুখী যদি ওর মা না হতাম। পণ দিয়ে দানসামগ্রী সাজিয়ে আমার ঐ একটা মেয়ের বর খরিদ করে আনতাম। কিন্তু আমার টাকা কলঙ্কের টাকা। বরের বাপের মনে মনে ইচ্ছে হলেও সমাজের ভয়ে পেরে উঠবে না।

চোখে আঁচল-ঢাকা দিল পারুল। কিন্তু পারুলের সঙ্গে যতই ভাবসাব থাক, সুধামুখী কথা দিতে পারে না। ছেলে নিয়ে তার সমস্ত আশা। রূপে যেমন গুণেও একদিন সাহেব সকলের সেরা হবে। সকলের মান্য হবে। এখনই বোঝা যায়, ছেলের কত টান তার উপরে! কিসে একটু সাশ্রয় হবে সেজন্য আঁকুপাঁকু করে ঐটুকু ছেলে। বিয়ে সাহেবের কি এই ঘরের ঐ রানীর মতো মেয়ের সঙ্গে! কত সুন্দর বউ নিয়ে আসবে, সে মতলব মনে মনে সুধামুখীর ছকা রয়েছে।

চোখ মুছে পারুল বলে, কী দুর্বুদ্ধি হল, কেন যে এসেছিলাম মরতে! মেয়েটার একটু সাজতেগুজতে সাধ, তা আমি একটা ভাল কাপড় পরতে

দিইনে—নোংরা জায়গার দশ শয়তানে রংতামাশা করবে তাই নিয়ে। এর চেয়ে সমাজের মধ্যে শ্বশুরের ভিটেয় নুন-ভাত খেয়ে যদি থাকতাম, সে ছিল ভাল। মানসম্ভ্রম ছিল তাতে। দায়-বেদায়ে পাড়াপড়শিরা ছিল। বড্ড অনুতাপ হয় দিদি।

আমার হয় না।

কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়ে পারুল তার মুখে তাকায়। সজোরে ঘাড় নেড়ে সুধামুখী বলে, কোনদিন আমার হয়নি। কিসের অনুতাপ! কলঙ্ক চাপা দিয়ে ঘরে থাকার মতো যন্ত্রণা নেই। সর্বদা আতঙ্ক, কখন কি ঘটে, কে কখন কি বলে বসে। মানুষ সুযোগও নিয়েছে ভয় দেখিয়ে। আজকে ঢাকাঢাকি নেই। আমি সত্যি সত্যি যে-মানুষ, তারই স্পষ্টাস্পষ্টি চেহারা। অনেক সোয়াস্তি এতে, অনেক আরাম।

পারুল প্রতিবাদ করে বলে, এ তোমার মুখের অহঙ্কার। ছোট বোনের কাছে মিথ্যে বলছ তুমি। কতদিন কাঁদতে দেখেছি তোমায়। আমায় দেখে চোখের জল মুছেছ।

দূর পাগলি, সে বুঝি অনুতাপে! আমার পয়লা নম্বর প্রেমিকটার কথা মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে। "জীবনে মরণে তোমার"—কেমন মিষ্টি করে বলত। প্রেমের কথা কতই তো শুনেছি, কিন্তু অমন মিঠে গলা কারো পেলাম না। পাগল হয়ে যেতাম, বুকের মধ্যে তোলপাড় করত। সারাক্ষণ তার পথ চেয়ে থাকতাম।

একটু থেমে ম্লান হেসে সুধামুখী বলে, তারপরে সেই বিপদের লক্ষণ দেখা দিল। আঁচটুকু পাওয়ামাত্র "জীবনে-মরণে" সুড়ুৎ করে সরে পড়ল। পুরুষমানুষের সুবিধে আছে—"না" বলে ঝেড়ে ফেলে দিয়েই পার পেয়ে যায়। প্রমাণ হবে কিসে? মেয়েদের দুটো রাস্তা—হয় নিজের মরণ, নয়তো সেই বিপদের মরণ। বিপদ কাটিয়ে এসে দিব্যি আবার জমিয়ে আছি। সেই মানুষের দেখা পাবার জন্য আকুলি-বিকুলি করি। পথের দিকে তাকিয়ে ভাবি, এতজনে ঘোরাফেরা করছে—সে একটিবার আসে না!

পারুল গভীর কণ্ঠে বলে, আজও তাকে ভুলতে পার নি?

ভুলি কেমন করে? হাত নিশপিশ করে, সামনে পেলে খ্যাংরার বাড়ি মারি ঘা কতক। কিন্তু আসবে না সে। হয়তো কোন লাটবেলাট এখন! কোন দেশ-নেতা। এমনি তো আখছার হচ্ছে।

পারুল চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ। সহসা নিশ্বাস ফেলে বলে, মানুষ খুন করলে তো ফাঁসি হয়। আমাদেরও খুন করেছে। খুনেই শোধ যায় নি, মড়া নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে খুনেরা এসে। এতে আরও বেশি করে ফাঁসি হবার কথা।

সুধামুখী বলে, ফাঁসি দেয় ওরা সাদামাঠা মানুষ মারলে। খুন করার জন্যে আবার সুখ্যাতিও হয়। খুব বেশি খুন করলে ইতিহাসে জায়গা দিয়ে দেয়।

ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো। কদিন মাত্র এসে কত রকম ভাবনাই দিয়ে গেছেন। খবরের-কাগজের পাতা-ভরা লড়াইয়ের কথা—মানুষ মারার খবর। তখন আর মানুষ নয় তারা—শত্রু। একজন-দুজন কিম্বা পাঁচজন-দশজন নয়—রেজিমেণ্ট। শত্রু মারবার কত রকম কলকৌশল, বৈজ্ঞানিকেরা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে তাই নিয়ে গবেষণা করছেন—

পারুলের পোষা কাকাতুয়া সহসা ও-ঘর থেকে বলে ওঠে, কৃষ্ণ-কথা বলো—

হেসে ফেলে সুধামুখী: ঠিক একেবারে মানুষের স্বরে বলে উঠল। তুই যা শিখিয়েছিস, সেই বাঁধা বুলি বলছে। সমস্ত কিন্তু বলতে পারে ওরা। হ্যাঁ, সত্যি। আগেকার দিনে বলত—রূপকথায় পুরাণো পুঁথিপত্রে রয়েছে। এখনও পারে ঠিক তেমনি। এই কাকাতুয়া বলে নয়, সমস্ত জীব-জন্তু পারে: বলে না কেন জানিস?

পারুলের মুখের উপর মুখ তুলে তীব্র স্বরে বলে, ঘেন্না করে ওরা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে। মানুষের উপরে মানুষ যেমন নৃশংস, কোন ইতর জানোয়ারের সে রকম নয়।

রানীর বড্ড বাহার খুলেছে দু-কানে দুই মাকড়ি পরে। বলে দেয় ইহুদি-মাকড়ি এর নাম। সাহেব হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কথায় কথায় ঘাড় দোলানো রানীর অভ্যাস, মনের খুশিতে আজ বেশি করে দোলাচ্ছে। ঘাড় দোলানির সঙ্গে মাকড়ি দুটো দোলে, আর যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। কী সুন্দর—মরি, কত সুন্দর হয়েছে রানী নতুন গয়না পরে। হঠাৎ যেন বড়সড় হয়ে উঠেছে। বয়সে দু বছরের ছোট, তবু যেন সাহেবের চেয়ে সে অনেকখানি বড়। চালচলনে বড়দের ভাব। মেয়েছেলে কেমন আগে বড় হয়ে যায়! বড্ড কড়া মা পারুল, ফ্রক পরা বন্ধ করে দিয়েছে—নাকি আব্রু থাকে না ফ্রকে, বিশ্রী দেখায়। শাড়ি পরে রানী—শাড়ি পরেই হঠাৎ বড় হয়ে পড়ল। রানী যেন আলাদা মানুষ আজকাল।

ভ্রূভঙ্গি করে সাহেব বলে, সাহস বলিহারি তোর রানী। কানে গয়না ঝুলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছিস।

রানী অবাক হয়ে তাকায়।

বুঝতে পারছিস নে?

রানী বলে, গয়না পরব না, তবে মা টাকা খরচ করে কিনে দিল কেন ?

কত টাকা রে ?

রানী ঘাড় দুলিয়ে চোখ বড় বড় করে বলে, তা দশ টাকা হবে। নয়তো পঁচিশ টাকা। সোনা, হীরে, মুক্তো বসানো কিনা।

রানীর কানের পিঠে হাত রেখে হাতের উপর সাহেব ঘুরিয়েফিরিয়ে মাকড়ি দেখল। হীরে এই বস্তু ! কোহিনূর হীরকের কথা পড়া আছে—জিনিস আলাদা হোক, জাত সেই একই বটে ! বুকের মধ্যে জ্বালা করে ওঠে !

চাট্টি মুড়ি খেয়ে আছে সাহেব, সুধামুখী তা-ও নয়। সন্ধ্যার মুখে কাল সুধামুখী বলল, সর্দি জমে বুকের মধ্যে পাথরের মতো ভারী হয়ে আছে, উপোস দিলে টেনে যাবে। উপোস প্রায়ই দেয় আজকাল। রাতের পর রাত। কিন্তু ঐ সর্দি কিছুতেই টানে না। এ সমস্ত বাইরের কাউকে জানতে দেবে না সুধামুখী, পারুলকেও না। কথায় আছে, নিত্যি মরায় কাঁদবে কে ? তোমার বাড়ি নিত্যিদিন যদি মরতে থাকে, শেষটা কাঁদবার লোক পাওয়া যাবে না আর। তাই হয়েছে, দুঃখের কাঁদুনি লোকের কাছে গাইতে লজ্জা লাগে।

কিন্তু সুধামুখীর না হয় সর্দিজ্বর, ছেলেমানুষ সাহেবের কি ? তার যে ক্ষিধে লাগে, ভাত না খেলে পেটই ভরে না। সুধামুখী বলে, জ্বরে কাঁপুনি ধরেছে, রাঁধতে যেতে পারছি নে বাবা। রাতটুকু মুড়ি খেয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দে। সকালে উঠেই ফ্যানসা-ভাত রেঁধে দেব। গরম গরম ভাত, আলু-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

মুড়িও এত ক'টি মাত্র ঠোঙায়। কলাইয়ের বাটিতে সেগুলো ঢেলে দিয়ে জ্বরাক্রান্ত সুধামুখী কিন্তু লেপ-কাঁথার নিচে গেল না। ভাদ্র মাসের টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘ গলিটা শেষ করে বড়রাস্তার মোড় অবধি গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব বোঝে সমস্ত। দোমহলা-তেমহলার বাবু-ছেলেপুলের মতো ভ্যাবা-গঙ্গারাম নয় এরা। সেই মোড় থেকে সুধামুখী পথচারী কাউকে নিয়ে আসবে ঘরে।

সাহেব মুড়ি ক'টা চিবিয়ে ঢকঢক করে জল খেয়ে ততক্ষণে ঘাটে চলে গিয়েছে। রানীকেও নিয়ে বসে কখনোসখনো, কিন্তু মেয়েটা ভালমন্দ খেয়ে তো ঢেকুর তুলছে, তাকে ডাকতে আজ ভাল লাগল না। ঘাটের পাকা পৈঠার উপর একলা বসে নৌকো দেখে। ঘুম ধরলে কোন জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে। রাস্তার মোড়ে সুধামুখী তখন আর একটা মেয়ের গলা ধরে হাসিতে গলে পড়েছে। হাসে আর সতর্কভাবে তাকিয়ে দেখে, চলতে চলতে থমকে

দাঁড়াল কিনা কেউ। তা যদি হল, বাড়ির দিকে ফিরবে এবার। এক-পা দু-পা চলে, আর আড়চোখে তাকায়—মানুষটা পিছন ধরল কিনা। একা একা ঘরে ফিরতে হলে কাল সকালে ক্যানসা-ভাতের লোভ দেখিয়েছে,—সেই বস্তু হয়ে উঠবে না। জ্বর আরও বাড়বে, জ্বরের তাড়সে মাথা ছিঁড়ে পড়বে : মাথা একেবারে তুলতে পারছিনে সাহেব, কেমন করে রাঁধতে বসি বল্ তুই।

কাল রাত্রে সাহেব মুড়ি চিবিয়ে আছে আর হীরে-মুক্তোর মাকড়ি দুলিয়ে বেড়াচ্ছে রানী। চোখ জ্বালা করে—অসহ্য চোখ মেলে গয়নার বাহার দেখা। সাহেব বলে, কানের মাকড়ি খুলে রাখ রানী। দেমাক দেখিয়ে বেড়ানো ভাল নয়।

সাধ করে রানী দেখতে এসেছে, সাহেবের কথায় মর্মাহত হল। রাগ হয়ে গেল। মাথা ঝাঁকি দিয়ে জেদ করে বলে, না—। মাকড়ি দুলে ওঠে।

তোর ভালর জন্যেই বলি। মজা টের পাবি কানের নেতি ছিঁড়ে নিয়ে যাবে যখন।

রানী সবিস্ময়ে বলে, মাকড়ি আমার—কে নিতে যাবে ? এত টাকা দিয়ে মা কিনে দিয়েছে—

নেয় না ? গেরোনের দিনে কি হল সেবার—পাথরপটির ভিতরে একজনের গলা থেকে মবচেন নিয়ে নিল না ? তুইও তো ছিলি সেখানে।

ঠিক বটে। রানীর মনে পড়ে গেল। কত লোক জমে গিয়েছিল, কত হৈ-চৈ !

সাহেব বলে, কত দিকে কত সব চোর জুয়োচোর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। একটানে ছিঁড়ে নেবে। নেতি ছিঁড়ে ফাঁক করে ফেলবে, রক্ত বেরুবে গলগল করে। কানে আর কোন দিন গয়না পরতে হবে না।

রক্ত বেরোক, আর নেতি কেন গোটা কানই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক, রানী তাতে বিচলিত নয়। কিন্তু সারা জীবনে যে কানের গয়না পরা হবে না, তার বড় দুঃখ আর নেই।

পারুলের কাছে গিয়ে রানী সেই কথা বলল, সাহেব-দা আজ বড্ড ভয় দেখিয়েছে, কান ছিঁড়ে মাকড়ি নিয়ে নেবে নাকি।

কথাটা ভাল করে শুনে পারুলও ঘাবড়ে যায়। খাঁটি কথা বলেছে। এতখানি তার মনে আসে নি, অথচ আশ্চর্য দেখ ছেলেমানুষটার হুঁশজ্ঞান ! বলে, গয়না গেলে গয়না হবে। একখানার জায়গায় পাঁচখানা হতে পারে। তার জন্য

ভাবিনে। কিন্তু একটা অঙ্গের খুঁত হয়ে থাকলে সেটা বড় লজ্জার কথা। যেমন কুসুমের নাম হয়ে গিয়েছিল আঙুল-কাটা কুসি! ডাব কাটতে গিয়ে দায়ের কোপ আঙুলে মেরে বসেছিল। যদ্দিন না মরণ হল, আঙুলকাটা শুনতে শুনতে কান পচে গেল কুসির। আমার কাছেই কেঁদেছে কত।

মাকড়ি নিজেই খুলল মেয়ের কান থেকে। বলে, রেখে দে তুই, আর পারিস নে। কানফুল কিনে দেব, নাকছাবি কিনে দেব, যে গয়না ছিঁড়ে নিতে পারে না। মাকড়ি যায়, সেটা কিছু নয়। কান ছিঁড়ে যাবে, লোকে কান-কাটা কান-কাটা করবে—কান-কাটা রানী। সর্বনেশে কথা। বিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠাকুরদেবতারা একটা খুঁতো পাঁঠা বলি নিতে চান না, খুঁতো কনে কোন বর নেবে?

তালপূজো সেদিনটা। অমাবস্যা তিথি, তার উপর মঙ্গলবার পড়েছে, ভাদ্রমাস তো আছেই। মা-কালীর ডালির সঙ্গে একটা করে তাল দিতে হয়, তাল পেয়ে দেবী মহাতুষ্ট হন। এতগুলো যোগাযোগ প্রতিবছর ঘটে না, মন্দিরে আজ তাই বড় মচ্ছব। দূর-দূরান্তর থেকেও মানুষ এসে ভিড় করেছে। বাহারের সাজপোশাকে ধাঁধা লাগে চোখে।

সুধামুখীর জ্বর ও মাথাধরা তেমনি চলছে। শুয়ে ছিল, সন্ধ্যার মুখে উঠে পড়ল। সাহেবকে বলে, ভরা অমাবস্যা, তায় ভাদ্দরমাস। তার উপরে এত বড় পরব। পুরোদস্তুর নিশিপালন আজ বুঝলি রে সাহেব? তেষ্টার জলটুকু ছাড়া কিছু নয়।

আরও কি কি যেন বোঝাতে যাচ্ছিল, গলা আটকে আসে, হাহাকারের মতন একটা আওয়াজ বেরোয়। জলের ঘটিটা নিয়ে সুধামুখী দ্রুতপায়ে বাইরে চলে যায়। জল থাবড়াল খানিকটা মাথায়, ভিজা চুলে তেল দিল। চুল আঁচড়াচ্ছে, রঙিন শাড়ি বের করেছে। এতক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, মাকে আজ একমনে ডাকতে হয়—মাগো, ভাত-কাপড় দাও, সুখ-শান্তি দাও। উপোসি থেকে খুব ভক্তিভাবে বল্ দিকি—ছেলেমানুষের কথা আজকের দিনে মা ফেলবেন না, যা চাইবি ঠিক তাই ফলে যাবে।

কাল চাট্টি মুড়ি হয়েছিল, অদৃষ্টে আজ তা-ও নেই বোঝা যাচ্ছে। নিরম্বু উপোস। সাহেব ক্ষেপে গেল: মিছে কথা তোমার, খেতে না দেবার ছুতো। কাল কেন তবে মুড়ি খেতে হয়েছে? ভাত আমি চাই। ভাত রেঁধে দেবে, নয় তো রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ভেঙে তছনছ করব। পারুল-মাসি নিতে চেয়েছিল, আমি জানি সমস্ত। কত যত্ন করত। রানীকে কত কি কিনে দেয়, আমাকেও দিত। কেন আমায় দাওনি তখন!

সুধামুখী বলে, মা হয়ে ছেলে পোষানি দেব ?

মা না হাতি। চালাকি করে মা হয়ে আছ। শুনতে আমার বাকি নেই। পরের বাচ্চা গঙ্গা থেকে কুড়িয়ে এনে মা ! চোরাই-মা তুমি।

সুধামুখী আকুল হয়ে কেঁদে পড়েঃ এত বড় কথা বললি তুই সাহেব—পারলি বলতে ?

নিঃশব্দে সুধামুখী কাঁদতে লাগল। কথা-কাটাকাটি করে না, এই কলহের একটি কথাও বাইরে চলে না যায়। বাড়িটা এমনি, মজার গন্ধ পেয়ে ভিড় হয়ে যাবে, কাজকর্ম ফেলে মেয়েরা এসে জুটবে। রসাল জিজ্ঞাসা নানা রকম। সাহেবের দিকে সবাই, শতমুখে সুধামুখীর নিন্দা করবেঃ আক্কেল দেখ না ! আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নাদুসনুদুস সোনা হেন ছেলেটাকে না খেতে দিয়ে সলতে করে তুলেছে !

সাহেব রান্নাঘরে হাঁড়িকুড়ি ভাঙতে যায় না, সুধামুখীর দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়ল। চুপচাপ ঘাটের উপর গিয়ে বসে। মায়ের গর্ভ থেকে নেমেই ভাসতে ভাসতে একদিন যে ঘাটে এসে লেগেছিল। বন্ধু জুটেছে সমবয়সি কয়েকটা ছোঁড়া, ঘাটের বাঁধানো সমতলের উপরে একটু গর্ত খুঁড়ে নিয়ে গুলি খেলে সকলে মিলে। ঘাটের মণ্ডপের ছাতে কলেকৌশলে উঠে গিয়ে ঘুঁড়ি উড়ায়। হঠাৎ এক সময় তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে তীরবেগে ঘুঁড়ি ধরতে ছোটে। নৌকোঘাটা ঠিক পাশে বলে মাঝিমাল্লাদের এই ঘাটের উপর দিয়ে যাতায়াত। সাহেব তাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে গল্প শোনার লোভে। ফুটফুটে ছেলেটা দেখে তারা কাছে ডাকে। ডেকে কত সময় নৌকোর উপর নিয়ে যায়। গল্প শোনা সাহেবের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। কত কত গহিন নদী, কত অজানা দেশভুঁই। মালপত্র খালি করে নৌকো আবার ভেসে ভেসে চলে যায়। অমনি করে তারও নতুন নতুন জায়গায় ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করে।

ঝিঙে হল ছোঁড়াদের সর্দার। এই বস্তির মালিক ফণী আড্ডির ছোট ছেলে। ঝিঙে ছাড়া আরও দুই ছেলে ফণীর। দুনিয়ায় আসা যেমন করে হোক দুটো পয়সা রোজগারের জন্য, ভগবান সেই জন্য নরজন্ম দিয়ে পাঠান—ফণী আড্ডি হামেশাই এই কথা বলেন। এবং ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের জন্য অহরহ লেগে পড়ে আছেন। ছেলে কোনটা কোথায় পড়ে রইল, খোঁজ নেবার সময় পান না। বাড়িওয়ালার ছেলে—সেই খাতিরে, এবং নিজের গুণপনার জন্যে ঝিঙে ছোঁড়াদের মধ্যে মাতব্বর।

ঝিঙে ডাকে, কালীবাড়ি চল সাহেব। আমরা যাচ্ছি।

না।

কত লোক এসেছে দেখতে পাবি। কত মজা।

ভাল লাগছে না। জ্বর হয়েছে আমার, শুয়ে পড়ব।

পারুলও আজ বাড়ি থেকে বেরুল। বড়রাস্তার মোড় অবধি এসে অন্য সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে—মা-কালী করুন, পারুলের তেমন দশা কোন দিন যেন না ঘটে। মোড় ছেড়ে হেঁটে হেঁটে সে মন্দির অবধি চলে এসেছে। আলো দেখছে, দোকানপাট দেখছে,—কত রকমের মানুষ এসে আড়ম্বরের পূজো দিচ্ছে—ঘুরে ঘুরে তা-ও দেখল কতক্ষণ। যেখানে মানুষের ভিড় সেইখানে পারুল। ভিড়ের মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখবে সেই ব্যবস্থা আজ অঢেল রকম করে এসেছে! সারা বেলাস্ত খেটেছে দেহটা নিয়ে। খাটুনি মিছা হয় নি পায়ে পায়ে সেটা বুঝতে পারে। এই রকম এক-একটা বিশেষ দিনে পারুল বেরিয়ে পড়ে। ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে বেড়ায়। মানুষ টানবার ক্ষমতা বেড়েছে না কমে গেছে গত বছরের তুলনায়, তারও বুঝি একটা পরীক্ষা করে দেখে। একটা-ত্নটো লোক যেন খিমচি কেটে তুলে নিয়ে আসে জমাট ভিড়ের গা থেকে। খেয়ালি মেয়েমানুষ। লোক পিছনে তো ইচ্ছে করেই পারুল উল্টোপাল্টা এদিক-সেদিক নিয়ে ত্নলো তেত্নলো পথ ঘুরিয়ে মারে। কষ্ট হোক বেশি, কষ্ট বিনে কেষ্ট মেলে না। ছিটকে পড়ে কিনা দেখাই যাক।—এক-বার-বা পিছন ফিরে, বন্ধন ইতিমধ্যে কিছু ঢিলে হয়ে থাকে তো, চোখের নজরে মুচকি হাসিতে আঁটসাট করে নেয় সেটা। ঢুকল এসে গলিতে, পৌছল বাড়ির দরজায়। হঠাৎ তখন মারমুখি হয়ে পড়ে: পথের জঞ্জাল আদাড়-আঁস্তাকুড় বাড়ি ঢুকবার শখ তোমার! বেরো, বেরো—। পরথ যা করবার, হয়ে গেছে। অথবা মনে ধরল তো মোলায়েম কণ্ঠ: আসুন না ভালবাসা, মন্দ বাসায় ঢুকে পড়ুন। টেনে নিয়ে তুলল সাজানো ঘরে—ঘরের খাটের বিছানায়। কত খেলায় এমনি! অজানা নতুন রাজ্যে দিগ্বিজয়ের আনন্দ।

রানীও মায়ের সঙ্গে। শাসন যতই হোক, মচ্ছবের দিনে মেয়েটি মুখ চুন করে একলা বাড়ি পড়ে থাকবে, সেটা হয় না। কোন প্রাণে পারুল মানা করতে যাবে। কেউ যদি পিছন ধরে তো রানীকে বলে দিতে হবে না, আপনা থেকেই ভিন্ন পথে এগিয়ে চলে যাবে। যেন মা-মেয়ে নয়—নিতান্তই পথের পথিক, কোনরকম জানাশুনো নেই তুইয়ের মধ্যে। কোন অবস্থায় কেমন ভাব দেখাতে হবে, ছেলেমেয়েরে এখানে হাতে ধরে শেখাতে হয় না।

মন্দিরে যাবার ইচ্ছা সুধামুখীরও। কিন্তু বৃষ্টির পশলা, গায় জ্বর, আপাদ-মস্তক দেহটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে একেবারে। হেন অবস্থায় ভয় হল অতদূর

হাঁটতে। তার চেয়েও বড় ভয়—হাত-মুখে রং মেখে সজ্জা করেছে, উজ্জল আলোয় কারসাজি সমস্ত ধরা পড়ে যাবে। গলির মুখে প্রতিদিনের সন্ধ্যাবেলার আলোআঁধারি জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়াল। ভিড় কিছু পাড়ার মধ্যেও ছিটকে এসে পড়েছে। মা-কালীর উদ্দেশে জোড় হাতে সুধামুখী বারম্বার কান্নাকাটি করে: পার্বণ শুধু তোমার মন্দিরে কেন মা, আমার ঘরেও যেন ছিটেফোঁটা এসে পড়ে। আমার সাহেবের মুখে চাট্টি চাল ফুটিয়ে ধরতে পারি যেন মা।

সাহেব গঙ্গার ঘাটে। সুড়ুৎ করে এক সময় বস্তিবাড়িতে ঢুকে পড়ল। সব ঘরের মানুষ বেরিয়ে পড়েছে, দরজায় দরজায় শিকল তোলা। গিয়েছে বেশির ভাগ কালীবাড়িতে, দু-চারজন মোড়ের উপর। এজমালি ভৃত্য মহাবীর —ভৃত্য বটে, আবার খানিকটা অভিভাবকও বটে। সে লোকটাকেও দেখা যায় না, গিয়ে মচ্ছবে জমে পড়েছে ঠিক। সন্ধ্যাবেলাটা এখন পাহারা দেবার কিছু নেই, মানুষজন আসতে লাগে নি যে এটা-ওটার ফাইফরমাস হবে। নির্ভাবনায় কোনখানে গিয়ে সে আড্ডা জমাচ্ছে!

অবিকল এমনটাই ভেবে রেখেছে সাহেব। নিশ্চিন্ত। কাজও সাব্যস্ত হয়ে আছে—লাইনের সর্বশেষে পারুল মাসির ঘরে। দেখেশুনে রেখেছে তবু, ঠিক কাজের মুখটায় সতর্কভাবে আর একবার দেখে নেওয়া উচিত। ঘরের ওপাশে ফাঁকা জায়গাটুকুতে কয়েকটা গাঁদা দোপাটি ও পাতাবাহারের গাছ। ঠাণ্ডাবাবু সেই আমচারা পুঁতে গিয়েছিলেন, বিস্তর ঝড়ঝাপটা খেয়েছে—সেবারের আশ্বিনের বড় ঝড়ে পুরানো পাঁচিলে খানিকটা ভেঙে পড়েছিল চারাগাছের উপর—সামনে উঠে ডালপালা মেলে দিব্যি এখন তেজীয়ান হয়েছে! সেই গাছের উপর চড়ে সাহেব উঁকিঝুঁকি দেয়—এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে দেখতে পাওয়া যায় কি না, দেখছে কি না কোন লোক। নিঃসংশয় হয়ে এবার বারাণ্ডায় উঠে পড়ল।

ওরে বাবা, কত বড় তালা ঝুলিয়ে গেছে দেখ দরজায়। আদিগঙ্গার ওপারে লক্ষপতি মহাজনদের বড় বড় আড়ত, তারা কখনো এইরকম আধমনি তালা ঝুলায় না। কী করা যায়, কী করা যায়! ঝিঙেটা বাহাদুরি করে, সে নাকি হামেশাই এসব করে থাকে। রায় সাহেব, ধরতে গেলে, নিজের ঘরেই কাজ করতে এসে হার স্বীকার করে ফিরে যাবে?

খোঁজাখুঁজি করে পেয়ে গেল কয়লাভাঙ্গা ভারী লোহাখানা। ঠিক হয়েছে। দু হাতে তুলে তালার উপর দেবে মোক্ষম বাড়ি। একের বেশি দুটো বাড়ি লাগবে না। কাছে-পিঠে মানুষ নেই যে শব্দ শুনে রে-রে—করে আসবে। আসে যদি, তারও উপায় ঠিক আছে। আমগাছ বেয়ে উঠে দেবে লাফ

পাঁচিলের ওপারে। পাঁচিল টপকানো ব্যাপারটা সাহেবের খুব রপ্ত। সাধারণ যাতায়াতের ব্যাপারও এই পথ বেশি পছন্দ তার। দরজার ছোট খোপ গলে আর দশটা মানুষের মতো চলাচল সে কালেভদ্রে করে থাকে।

লোহাটা তুলে নিয়ে চতুর্দিক আরও একবার দেখে নেয়। মালকোঁচা সেঁটে নিল। তাড়া খেয়ে দ্রুত যদি পাঁচিলে উঠতে হয়, ঢলঢলে কাপড়ে বেধে বিপর্যয় ঘটাতে পারে। হাতিয়ারপত্র সহ রীতিমতো বীরমূর্তি। তালাটা হাতে ধরে ঘুরিয়ে দিচ্ছে, ঠিক জায়গায় বাড়িটা যাতে লাগে—

হরি, হরি! হাতে ছুঁতে না ছুঁতে তালা হাঁ হয়ে পড়ে। পুরানো বাতিল বস্তু, কোনগতিকে একটুখানি চেপে দিয়ে চলে গেছে। তালার সাইজ দেখেই চোর আঁতকে উঠে সরে পড়বে—ক্ষেতের মধ্যে যেমন খড়ের মানুষ দাঁড করিয়ে কাক-পক্ষী তাড়ায়। সাহেব খল-খল করে হাসে: পারুল-মাসি দশ টাকা কিম্বা পঁচিশ টাকা দিয়ে হীরে-মুক্তোর মাকড়ি কিনে দিয়েছে, দরজার জন্য চার গণ্ডা পয়সারও একটা তালা কিনতে পারে না।

বড় হয়ে এই দিনের ঘটনা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা নিজেদের মধ্যে। সাহেব বলত, তালা ঠিকই ছিল, তালোদ্ঘাটিনী মন্ত্রে খুলে গেল। এখন সেটা বুঝতে পারি, সেদিন অবাক হয়েছিলাম। তালোদ্ঘাটিনী অতি প্রাচীন মন্ত্র—বলাধিকারী মশায় বলেন, বেদের আমলেও এই পদ্ধতি চলত? শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে তার। নাকি মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালা আপনি খুলে পড়বে। এ লাইনের ভাল ভাল মুরুব্বিদেরও, ঠিক এই বস্তু না হোক, তালা খোলার নানা রকম তুকতাক জানা। এক রকম পাতার রস তালার ছিদ্রে ঢেলে দিলে তালা খুলে পড়ে! শিকড়ও আছে, বুলিয়ে দিতে হয়। সমরাদিত্য-সংক্ষেপ নামে পুঁথিতে গল্প আছে—গুরু-শিষ্যকে তালা ভাঙার মন্ত্র দিচ্ছেন, কিন্তু চুক্তি হচ্ছে কদাপি সে মিথ্যা বলতে পারবে না। কথা রাখতে পারল না শিষ্য, দৈবাৎ মিথ্যা বলে ফেলেছে। ফল অমনি হাতে হাতে। তালা ভেঙে যেইমাত্র ঢোকা, গৃহস্থ ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে। মোটের উপর এই একটা কথা। রীতিমতো নিষ্ঠাবান হতে হবে আপনাকে, নইলে চোরের দেবতা কার্তিকেয়র অভিশাপ লাগবে, যত সতর্কই হন নিশ্চিত ধরে ফেলবে ঘরের ভিতর।

সাহেব তাই বড়াই করে বলে, আমার কি রকম নিষ্ঠা দেখ ভেবে। রানীর সঙ্গে এত ভাবসাব, আমাদের দুজনের জুড়ি দেখে সবাই বর-বউ বলত। আদর্শ বউয়ের যেমনটি হতে হয়—রানীর সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সব কথা আমার সঙ্গে। তবু দেখ তারই ঘরে কাজের বউনি আমার। অবলীলাক্রমে ঘরে ঢুকে

গেলাম। পারুল-মাসির সাজানো বড়ঘরের পাশে ছোট ঘরখানা—পোষা কাকাতুয়া, বাক্স-পেঁটরা, কাপড়-চোপড় ও পানের সরঞ্জাম থাকে। সন্ধ্যাবেলাটা বড়ঘর ছেড়ে রানী এসে এখানে আস্তানা নেয়, তার ধনসম্পত্তি যাবতীয় সেখানে।

পুতুলের বাক্সে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রানী মাকড়ি রেখেছে, সমস্ত জানা। লুকিয়ে দেখে গেছে। ঘরে ঢোকা, গয়না নিয়ে বেরুনো এবং তালা যেমন ছিল তেমনিভাবে লাগিয়ে রাখা—পলক ফেলতে না ফেলতে হয়ে গেল। পাঁচিল টপকে সাহেব সাঁ করে সরে পড়ল। ডুবে গেল তালপুজোর মচ্ছবে। একবারও যে বাড়ি ঢুকেছিল, কেউ তা জানতে পারবে না।

পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত সাহেব-চোর—ডাঙায় হোক, জলে হোক পরিচ্ছন্ন নিখুঁত একখানা কাজ দেখলেই লোকে বলত নিশিরাত্রে সাহেব-কুটুম্ব এসে গেছে নিশ্চয়। ভাঁটি অঞ্চলের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে সন্ধ্যাবেলা সুর করে যার নামে ছড়া কাটত—

> কচ্ছপের খোলা দুয়োরে—
> সাহেব চলল শহরে।
> কুচে-কচ্ছপ-কাঁকড়া
> সাহেব পালায় আগরা।
> শিং-নড়বড়ে বোকা দাড়ি
> চৌকি দেচ্ছেন আমার বাড়ি।
> আম-শিমের অম্বল
> কাঠ-শিমের ঝোল
> সাহেব-চোর যায় পলায়ে
> বুড়ি ভদ্রার কোল।

সেই সাহেবের পয়লা দিনের কাজ এই। রানীর সাধের মাকড়িজোড়া হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরছে। যায় কোথা এখন, মাল সামলাবার উপায়টা কি?

সাহেব-চোরের পয়লা দিনের কাজ। জীবনের পাপ বল, দোষ-ত্রুটি বল, এই তার সর্বপ্রথম। অনেক কাল পরে বলাধিকারীকে সে বলেছিল রানীর

মাকড়ি-চুরির এই কাহিনী। আনুপূর্বিক শুনে তো হো-হো করে হেসে ওঠা উচিত! কিন্তু না হেসে তিনি সবিস্ময়ে তাকালেন: আদর্শ মাতৃভক্তি—মায়ের কথা ভেবেই ভালবাসার জনের মনে দুঃখ দিতে সঙ্কোচ হয়নি। তুলনা করা ঠিক হবে না—তবু আমার বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা মনে পড়ল। আরও বিস্তর বড় বড় লোকের কথা। মায়ের আশীর্বাদে তাঁরা সব বড় হয়েছেন। তুমিও বড় হবে সাহেব, এই আমি বলে দিলাম।

এত বলেও বলাধিকারীর উচ্ছ্বাস থামে না। আবার বললেন, মহৎ মানুষের ভাল ভাল কাজকর্মের কথাই পুঁথিপত্রে লেখে। চোরের কথা কে লিখতে যাবে? পুণ্যের বড় মান, পাপ হোক খানখান—গালি দিয়ে, থুঃ-থুঃ করে থুতু ফেলে সকলে সামাজিক কর্তব্য সেরে যায়। ভালমানুষ হয় অন্যের কাছে। মানুষের ভিতর অবধি তলিয়ে দেখবার চোখ আছে ক-জনার?

কৌতুক-চোখে সাহেব পিছনের এইসব দিনের পানে তাকিয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি সাহেব একসময় খুব বড় হল, নামডাক হল প্রচুর। সাহেবচোর বলতে একডাকে চিনে ফেলত ভাঁটি অঞ্চলের মানুষ। পয়লা কাজে মাতৃআশীর্বাদ পেয়েছিল, তারই ফলে বোধ হয়। সুধামুখীর চোখ ফেটে জল এসেছিল, তাল-পুজোর রাত্রে চাল-ডাল কিনে এনে সাহেব যখন তার হাতে দিল। সাহেবের মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে কি বলল খানিক। কিন্তু সুধামুখীকে মা-ই যদি বলতে হয় তো চোরাই-মা। সেই মায়ের আশীর্বাদে সন্তান বড় জ্ঞানী, বড় গুণী হয় না—হয় মস্তবড় চোর। সাচ্চা মা হলে সাহেবও সাচ্চা মানুষ হত—যাঁদের নামে লোকে ধন্য-ধন্য করে। তাঁদের পাশাপাশি না হোক, পায়ের নিচে বসবার ঠাঁই পেত।

সেইদিন আরও এক মাতৃভক্তির গল্প করলেন বলাধিকারী। সুবিখ্যাত কাপ্তেন কেনা মল্লিক, তার বড় ভাই বেচারামের। মহামান্য সরকারের বিচারে ফাঁসি হয়েছিল তার। আঙুল ফুলে কলাগাছ বলে—এই বেচা মল্লিক শালগাছ হয়েছিল। কাজের শুরুতে চোরও নয়, চোরাই মাল বয়ে আনার মুটে মাত্র। চোরেদের সঙ্গে গিয়ে পদ্ধতিটা তীক্ষ্ণ নজরে দেখত। চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের জোরে সেই মানুষটা কালক্রমে ধুরন্ধর হয়ে উঠল, জলের পুলিস, ডাঙার পুলিস ঘোল খাইয়ে বেড়িয়েছে একাদিক্রমে সাত-আট বছর। এমনি সময় তার উপর রোমহর্ষক এক খুনের চার্জ এল। খুন করা নিয়ম নয় এদের। মহাপাপ—সমাজে অপাংক্তেয় হতে হয় ইচ্ছায় হোক দৈবক্রমে হোক মানুষ খুন হয়ে গেলে। তার উপরে মেয়ে খুন। মেয়েমানুষের উপর তিল পরিমাণ অত্যাচার হলে ওস্তাদের অভিশাপ লাগে, সর্বনাশ ঘটে যায়। সমস্ত জেনে বুঝে বেচারাম

মুক্তাময়ী নামে ধনী ঘরের রূপসী মেয়েটাকে খুন করল—যে মেয়ে বেচারামের জন্য পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে এসেছিল। খুন না করে উপায় ছিল না। প্রণয়ে হতাশ হয়ে মেয়েটা দলের কথা ফাঁস করে দিয়েছিল পুলিশের কাছে।

সরকার বাহাদুর বেচারামের মাথার মূল্য ধরে দিলেন দু-হাজার টাকা। জীবিত হোক মৃত হোক, যে জুটিয়ে এনে দেবে তার এই লভ্য। বুঝুন এবারে। যে লোক সিঁধেল চোরের পিছু পিছু ঘুরে বমাল মাথায় বয়ে সমস্ত রাত্রে আটআনা রোজগার করেছে, সেই মাথাটারই আজ এই দাম উঠে গেছে।

পাঁকাল মাছের মতো বিস্তর কাল পিছলে পিছলে বেড়িয়ে অবশেষে একদিন বেচারাম ধরা পড়ল। সরকারের সবচেয়ে মোটা যে পদ্ধতি তারই প্রয়োগে এ হেন প্রতিভাধরের মর্যাদার ব্যবস্থা হল। ফাঁসি। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে যতক্ষণ না তুমি দম আটকে মারা যাও—জজের রায়ের বাঁধুনিটা এই প্রকার।

আঁতুড়ঘরে বেচারামের মা মারা গিয়েছিল। মানুষ করেছে সৎমা—যার গর্ভে কাপ্তেন কেনা মল্লিকের জন্ম। ফাঁসির আগে সেই বিধবা সৎমা দেখতে এল। এমন শক্ত মানুষ বেচারাম, কিন্তু আজ সে হাপুসনয়নে কাঁদছে। সৎমায়ের পায়ের কাছে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে: বড় অভাগা আমি মা। বুকের দুধ কত খাইয়েছ, একবার দুধের ঋণ শোধ করে যেতে পারলাম না।

সে এমন, জেলখানার মানুষ যারা পাহারায় ছিল, তারা অবধি চোখের জল ঠেকাতে পারে না। বাড়ির পিছনে তেঁতুলগাছটার কথা বলে, ছোটবেলা ওর ছায়ায় কত খেলা করেছে। বড় টান ঐ গাছের উপর। বলে, ফাঁসির পর মড়া তোমাদের দিয়ে দেবে মা। তেঁতুল-কাঠে পোড়ায় যেন আমায়। গোড়াসুদ্ধ গাছটা উপড়ে ফেলবে, চিহ্ন না থাকে। পোড়াতে যা লাগে, বাদ বাকি সমস্ত কাঠ গাঙের জলে ভাসিয়ে দেবে। মাটির উপর ঐ গাছ থাকতে আমার মুক্তি নেই, অপদেবতা হয়ে ডালে বাসা করতে হবে। গাছ থাকলে তোমারও তো যখন তখন আমার কথা মনে আসবে। কাঁদবে নিরালায়।

শেষ ইচ্ছা তেঁতুলগাছ উপড়ে ফেলা, তেঁতুল-কাঠে দাহ করা। উপড়াতে গিয়ে আসল মতলব পাওয়া গেল। তেঁতুলের শিকড়বাকড়ের মধ্যে ঘটিভরা মোহর। বেচারাম পুঁতে রেখেছে। মায়ের দুধের ঋণ শোধ দিয়ে গেল, মৃত্যুর সামনে একমাত্র মায়ের কথাই সে ভেবেছে।

মাকড়িজোড়া সাহেবের হাতের মুঠোয়। যায় কোথা এখন, মালের কোন ব্যবস্থা করে ?

বেশ খানিকটা গিয়ে আদিগঙ্গার কিনারে রেলের পুলের পাশে প্রাচীন এক শিবমন্দির, এবং আনুষঙ্গিক বাগানে দু-পাঁচটা ফলসা গাছ। সাহেব ঐখানে পেয়ারা খেতে আসে। বাগানের ধারে সরু গলির সঙ্কীর্ণ অন্ধকার ঘরে এক খুনখুনে বুড়ো স্যাকরা দিনমানেও প্রদীপ জেলে ঠুকঠুক করে সোনারূপোর গয়না গড়ে। সে বুড়োর যেন খাওয়া নেই, ঘুম নেই—সাহেব যখনই যায়, কাজ করছে সে একই ভাবে। কাজ করে একাকী—এতদিনের মধ্যে একবার মাত্র সেই ঘরে একটি দ্বিতীয় মানুষ দেখেছে।

বড়রাস্তার ভিড়ের দোকানে যেতে ভরসা পায় না, ভেবেচিন্তে ছুটল সেই স্যাকরার কাছে। এমন পার্বণের দিনে ধর্মকর্মে বুড়োমানুষেরেই বেশি করে যাওয়ার কথা। সন্দেহ ছিল পাওয়া যাবে কি না যাবে। কিন্তু স্যাকরামশায় ঠিক তার কাজে—মেজের মাটির উপর নিচু হয়ে পড়ে মুচির আগুনে প্রাণপণে ফুঁ পাড়ছে।

পিছন ফিরে ছিল। চৌকাঠে সাহেব যেইমাত্র পা ঠেকিয়েছে, গুটানো সাপ যেমন করে ফণা তুলে ওঠে, স্যাকরামশায় চক্ষের পলকে তেমনি খাড়া হয়ে মুখ ফেরাল সাহেবের দিকে।

কে তুমি কি নাম ? কোথায় থাক ? কেন এসেছ, এখানে কী দরকার বল।

সাহেবের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে দেখে সঙ্গে সঙ্গে সুর বদলে যায়। বলে, বস তুমি। মালটাল এনেছ নাকি, না এমনি জিজ্ঞাসা করতে এসেছ ?

বাঁচা গেল রে বাবা। সাহেবকে কোন ভূমিকা করতে হল না। বলে, একজোড়া মাকড়ি নিয়ে এসেছি। নেন যদি আপনি।

কার মাকড়ি ?

আমার মার।

এ ছাড়া অন্য কি বলা যায় ! ঢোঁক গিলে নিয়ে বলে, মায়ের বড় অসুখ, ওষুধপথ্যি হচ্ছে না। মা-ই তখন বের করে দিল—

ছোট ছেলের মুখে এত বড় দুঃখের কথা শুনেও স্যাকরা কিন্তু ফ্যা-ফ্যা করে হাসে : বটেই তো। দায়েবেদায়ে কাজে লাগবে বলেই তো গয়না গড়িয়ে লোকে টাকা লগ্নি করে রাখে। অসময়ে বের করে দেয় ! তা বস তুমি, ঘোড়ার জিন দিয়ে এসে কাজ হয় না। মাদুরটা টেনে নিয়ে বসে পড়।

ফুঁ পাড়া বন্ধ করে দু-হাতে ঝেড়েঝুড়ে এবারে ভাল হয়ে ঘুরে বসল বুড়ো : দাও কি জিনিস দেখি—

হাতে নিয়েই ভ্রূ কুঁচকে তাকায় : তোমার মায়ের বয়স কত বাপধন ?

অ্যাঁ—

এই যখন মায়ের গয়না, মা আর বেটা একবয়সি তোমরা। কোন কারিগর গয়না গড়িয়েছে, তার নামটা বল দিকি।

মুচকি হাসছিল এতক্ষণ, এইবারে সে দুলে দুলে হাসতে লাগল। সাহেব রাগ করে বলে, এত খবরাখবর কিসের জন্য ? পছন্দ হলে উচিত দামে নিয়ে নেবেন। না হল তো তা-ও বলে দিন।

হাসি থামিয়ে স্যাকরা বলে, জিনিসটা হাতে করে এসেছ, পরখ করে তবে দেখিয়ে দিই। মনে আর সন্দ থাকে কেন ?

কষ্টিপাথর বের করে মাকড়ির একটা কিনারে ঘষল বার কয়েক। পাথরখানা সাহেবের দিকে এগিয়ে ধরে। সগর্বে বলল, দেখতে পাচ্ছ ? পাথর ঠুকে বলতে হয় না, চোখের নজরেই বলে দিতে পারি। জিনিস সোনা নয় বাপধন, পিতল। এই কর্ম করে করে বয়স চার কুড়ি বছর পার হয়েছে, বিরাশিতে পা দিয়েছি। জোচ্চুরি করে পিতল গছাতে এসেছ—বুড়োমানুষটা ধরতে পারবে না, উঁ ?

সাহেব আগুন হয়ে বলে, জোচ্চোর আমি নই। কক্ষনো না। না বুঝতে পেরে এসেছি, আমাদেরই ঠকিয়ে দিয়েছে। দিয়ে দিন ওটা, চলে যাই।

স্যাকরা বলে, চটে যাচ্ছ বাপধন। কাঁচা বয়সে মানুষ হয় এমনি রগচটা।

কাঠের হাতবাক্স থেকে দুটো টাকা দিল সাহেবকে : নিয়ে যাও—

পাথরের দাগ দেখে সাহেব কিছু বোঝে নি, সোনা চিনবার বয়স নয় তার। এবার ভাবছে, বুড়োরই ভাঁওতা। বলে, শুধু যদি পিতলই হয়, দাম তবে কিসের ?

টাকার সঙ্গে স্যাকরা মাকড়ি দুটোও দিয়ে দিল। বলে, ষোলআনা পিতল —সোনা একরতিও নেই। এ জিনিস আর কোথাও বেচতে যেও না। জোচ্চোর ভাববে, গণ্ডগোলে পড়তে পার। নিতান্ত দায়ে পড়েছ বলেই আমার কাছে এসে উঠেছ। সেটা বুঝি বাপধন। শুধু হাতে ফেরানো যায় না, সেই জন্যে এই সামান্য কিছু। একেবারে দিচ্ছিনে কিন্তু। দান আমার কুষ্ঠিতে নেই, কারবার তাহলে লাটে উঠবে। সময় হলে শোধ দিয়ে যেও। কেমন ?

শুনে সাহেব হতভম্ব হয়ে যায়। সুধামুখী বলেছিল, মা-কালীকে ডাকবি আজ এই পার্বণের রাত্রে, মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সত্যিই তো সেই ব্যাপার। ক্ষিধের চোটে ব্যাকুল হয়ে ঠাকরুনের কাছে খেতে চেয়েছিল। মা-কালী স্যাকরা বুড়োর উপর ভর করে চালের দাম দিয়ে দিচ্ছেন। নইলে

চেনা নেই জানা নেই, কে এমন লোক টাকা দেয়! টাকা একটা নয়, দু-দুটো।

বলে, টাকা শোধ দিয়ে যেতে বলছেন—না-ই যদি দিই? নাম একবারটি জিজ্ঞাসা করলেন, তারও তো জবাব নিলেন না।

বুড়ো বলে, জবাব নিয়ে কি করব? নাম একটা বলতে, সেটা বানানো নাম। পয়লা দিন অজানা লোকের কাছে সত্যি নাম-ঠিকানা কেউ বলে না। নিতান্ত হাঁদারাম বলে বলে হয়তো। আমি তোমায় না-ই জানলাম, আমার আস্তানা তোমার জানা হয়ে রইল। শোধ দেবার অবস্থা হলে এইখানে এসে দিয়ে যেও। হাসতে হাসতে আবার বলে, সত্যি কথাই বলেছ, জোচ্চোর নও তুমি—চোর। হ্যাঁ বাপধন, চোখে দেখেই ধরতে পারি, মুখে কিছু বলতে হয় না। যেমন ঐ মাকড়ি পাথরে ঠোকার আগেই বলে দিলাম, মেকি জিনিস। নিতান্ত কাঁচা চোর, নতুন কাজে নেমেছ। মাল সরাতে শিখেছ, কিন্তু হাত বুলিয়ে সোনা-পিতলের তফাত ধরতে পার না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। কত ছেলে দেখলাম—আজকে আনাড়ি, দুটো দিন যেতে না যেতে পুরো লায়েক। লাইনে যখন এসেছ, আমাদের সঙ্গে কারবার রাখতে হবে। আমার কাছে না এসো, অন্য কোথাও যাবে। টাকা দুটো তোমায় শোধ করে যেতে হবে না। ঋণ নয়, ধরো ওটা দাদন দিয়ে রাখলাম। মাল দিয়ে রমারম টাকা গুণে নেবে, তাই থেকে দুটো টাকা কেটে নেব আমি তখন। তা সে বিশ-পঁচিশ দিনে হোক, আর বিশ-পঁচিশ বছরেই হোক।

চাল কিনেছে, তার উপর আলাদা এক ঠোঙায় ডাল একপোয়া। সেই রাজসূয় আয়োজন হাতে করে সাহেব বাড়ি এল। সুধামুখী ফেরে নি। সাহেব পাঁচিল টপকে বেরিয়েছিল ঢুকেছেও, সেই পথে। বড়রাস্তার মোড় হয়ে আসবার উপায় নেই। মা-মাসিরা রয়েছে, ছেলেমানুষের যাওয়ার বাধা আছে এখন। কাঠ-কাঠ উপোসের কথা হচ্ছিল—সেই জায়গায় চাল ফুটিয়ে ভাত বানিয়ে ভরপেট খাওয়া, ভাতের সঙ্গে আবার ডাল। কিন্তু যে-মানুষটি চাল ফোটাবে সর্দিজ্বর নিয়ে বৃষ্টিজলের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে এই তো কয়েক পা মাত্র দূরে। গিয়ে সে হাত ধরে টানবে: এস মা, আজ-কাল-পরশু তিন দিনের যোগাড় হয়ে গেছে, তিনটে দিন জিরেন নিয়ে অসুখটা সেরে ফেল, রান্নাঘরে এসে নির্ভাবনায় উনুন ধরাও…কিন্তু হবার জো নেই।

একসময় সুধামুখী ফিরে এল। একাই ফিরেছে, অবসন্নভাবে থপথপ করে আসছে।

সাহেব ডাকে, মাগো, শুতে গেলে হবে না। দেখবে এসো—ডাল-চাল এনেছি। রান্না চাপাও এইবার। আমি খাব, তুমি খাবে।

সাহেব উচ্ছ্বাস ভরে বলে, সেই যে তুমি বললে, তার পর মা-কালীকে খুব করে ডাকতে লাগলাম : কত মানুষ এসে তোমায় কত কি ভোগ দিয়ে যাচ্ছে, আজকের দিনটা নিশিপালন করিও না। ঠিক কথাই বলেছিলে মা, পালা-পার্বণের দিন ঠাকুর খুব জাগ্রত থাকেন—ডালা-নৈবিদ্যি-টাকাপয়সা বিস্তর পড়ে তো! আমার দরবার কানে পৌঁছে গেল—চাল আর ডাল দিয়েছেন এই দেখ।

কী রকমটা হল সুধামুখীর—সাহেবের মাথায় হাতখানা রেখে চোখ বোজে। ঠোঁট নড়ছে, বিড়বিড় করে বলছে কি যেন।

সামলে নিয়ে তারপর বলে, কে দিল এসব?

বললাম তো, মা-কালী দিয়ে দিলেন। বুড়োথুথ্‌ড়ে একজনের হাত দিয়ে। মানুষটার নাম জানি নে, দেখে থাকি মাঝে মাঝে। আমায় সে কাছে ডাকল—

দিব্যি তো বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে! নিজের ক্ষমতা দেখে সাহেব অবাক।

মানুষটা কাছে ডেকে গায়ে হাত বুলিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, মুখ শুকনো তোমার, খাওয়া হয় নি বুঝি? হাত ধরে হিড়হিড় করে দোকানে নিয়ে চাল কিনে দিল। আর খাঁড়িমুসুরির ডাল। তার মধ্যে ঠিক ঠাকুর ভর করেছিলেন, মানুষে তো এমন করে না। কি বল মা?

খাওয়াদাওয়া বেশ হল মাকালীর দয়ায়। চালই যখন জুটেছে, ভাদ্দুরে অমাবস্যায় উপোসি থেকে পুণ্যার্জনের কথা আর ওঠে না।

খেয়েদেয়ে সাহেব গঙ্গার ঘাটে চলল। বাইরে বাইরে ঘোরে এ-সময়টা—ঘাটে যায়, রানী ঘুমিয়ে না পড়লে যায় সেখানেও। অনেক রাত্রি অবধি ঘোরাঘুরি করে তারপর একসময় শুয়ে পড়ে।

আজ সুধামুখী মানা করল : যাসনে কোথাও সাহেব। ঘর খালি, কী দরকার! সকাল সকাল আমার পাশে আজ শুয়ে পড়।

মা-কালী এমনি যদি দয়া করে যান আর কয়েকটা বছর! মা আর ছেলে নিত্যিদিন তবে সন্ধ্যারাত্রে শুয়ে পড়বে। সাহেব বড় হয়ে গেলে তখন তো মজা—পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছেলের রোজগার খাবে। খাওয়াচ্ছে ছেলে সেই তো ক'দিন বয়স থেকে। অল্পবয়সে বিয়ে দেবে সাহেবের—টুকটুকে বউ আনবে, ঘুরঘুর করে বউ বাড়িময় বেড়াবে······

শুয়ে পড়েছে সাহেব বড়খাটের একপাশে। মাকড়িজোড়া গাঁটে, পাশ ফিরতে বারবার গায়ে ফুটেছে। ঝুটো গয়না গাঁটে কেন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, তাই ভাবে। গঙ্গায় ছুঁড়ে দিলেই আপদের শান্তি।

সুধামুখীকে বলে, রানী ঐ যে গয়না পরে বেড়ায়, ও কি সোনার গয়না ?

সোনা ছাড়া কি—

উঁহু, সোনা নয়। ওরা সব বলছে পিতল।

ওরা কারা, সে প্রশ্ন সুধামুখী করে না। এক বাড়িতে এতগুলো মেয়ে—পরের সাচ্চা গিনিসোনাও ঠোঁট উলটে পিতল বলে দেয়। নিজের ভাবনায় সে ব্যস্ত, নিস্পৃহভাবে বলে, হতে পারে—

পরে তো পিতল, তবে তার অত দেমাক কেন ?

সোনা কি পিতল রানী অতশত কি করে বুঝবে ? সোনা না দিয়ে থাকে তো ভালোই করেছে। ছোট মেয়ে কি যত্ন জানে ? হারাবে, হয়তো বা ধোকা দিয়ে নিয়ে নেবে কেউ। গয়না পরেছে না গয়না পরেছে—ছেলেমানুষের মন ভুলোনা। তুই কিছু বলতে যাবি নে, কিন্তু সাহেব ! রানী কষ্ট পাবে, পারুলও রাগ করবে।

সাহেব বলে দাম নাকি দশ টাকা, পঁচিশ টাকা। দশ-পঁচিশ খেলে তো, লম্বা লম্বা অঙ্ক তাই শিখে ফেলেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ সে অন্য কথায় চলে যায়: ফলা-নানান রপ্ত হয়েছে মা, গড়গড় করে পড়ে যেতে পারি ! অঙ্ক শিখব আমি এবারে, কাল থেকেই—উঁ ?

সুধামুখী সায় দিয়ে বলে, আচ্ছা। সায় না দিলে ভ্যানর-ভ্যানর করবে, ঘুমুবে না।

তখন সাহেব ভাবে ভাল করেছি মাগড়ি গঙ্গায় না ফেলে। গয়না ঝুটো কি সাচ্চা, রানী সেটা জানে না। কোনদিন জানবে না। এক ফাঁকে ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকে মাকড়িজোড়া রেখে আসব।

সকালেও সাহেব পারুলের ঘরের দিকে যায় নি। ঘাটে একাকী বসে। ওপারে বড় বড় আড়ত। লগি বেয়ে দূরদেশের ভারী ভারী নৌকো হেলতে দুলতে গজেন্দ্রগতিতে আড়তের সামনের ঘাটে লাগে। দালাল-পাইকারের ভিড় জমে যায়। নৌকোর খোল থেকে বস্তা টেনে টেনে গলুয়ের উপর ফেলেছে। চালের বস্তা ডাল-কলাইয়ের বস্তা লঙ্কা-হলুদের বস্তা। খচখচ করে বস্তায় বেমো মেরে চাল-কলাইয়ের নমুনা বের করে দেখে। সূঁচাল-আগা

লোহার শলাকা, নালার মতন টানা-গর্ত শলাকার উপরে—এই হল বোমাযন্ত্র। মেরে দাও বোমা বস্তার উপর—নালা বেয়ে ঝুরঝুর করে কিছু মাল বেরিয়ে আসবে। বারম্বার এদিক-সেদিক মেরে পরখ করে দেখে, সর্বত্র একই মাল কি না। নমুনা হাতে নিয়ে আড়তের দালাল দরদাম করে: কত? ফাঁকাফুকো বলো না ভাই—

আঠারো সিকে—

আঁতকে ওঠে দালাল লোকটা: অ্যা, মুখ দিয়ে বেরুল কেমন করে ব্যাপারি? আঠারো সিকে মনের চাল কেন খেতে যাবে লোকে? চাল না খেয়ে সোনা খাবে, রুপো খাবে। বাজে বলে কি হবে, পুরোপুরি চার। যাকগে থাকে, আর দু-গণ্ডা পয়সা ধরে দেব। খুন করলেও আর নয়।

দরে বনল তো মুটেরা মাথায় তুলে ওপারের রাস্তাটুকু পার হয়ে গিয়ে বস্তা ধপাধপ ফেলছে আড়তের গুদামে।

সাহেব বসে বসে দেখছে। রানীর কাছে যায় নি, রানীই দেখি ঘাটে এসে দাঁড়াল। হাসি নেই মুখে, মন-মরা ভাব। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সাহেব জানে সমস্ত। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে রানী?

রানী ঘাড় নেড়ে বলে, কিছু না—

হয়েছে বই কি! তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি। লুকোলে শুনব না।

রানী হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: হবে আবার কি! সর্দারি করতে তোকে কে ডাকছে?

তারই জন্যে রানীর মনোকষ্ট, সাহেব পুড়ে যাচ্ছে মনে মনে! দুটো-চারটে ভাল ভাল কথা বলে প্রবোধ দেবে, কিন্তু তার আগে ব্যাপারটা শুনতে হয় রানীর মুখে। নয় তো আজামোজা কিসের উপর বলে? রানী যতবার ঝেড়ে ফেলে দেয়, সাহেব তত আরও খোশামুদি করছে।

বল্ না, বল আমায়। কাউকে বলব না। যে দিব্যি করতে বলবি করছি!

রানী নরম হয়ে ছলছল চোখে বলে, মাকড়িজোড়া পাচ্ছি নে। তাকের উপর পুতুলের বাক্সে রেখেছিলাম।

রাখলি তো গেল কোথা! কাকাতুয়া নয় যে উড়ে পালাবে। মনের ভুলে অন্য কোথায় রেখেছিস, দেখ ভেবে।

পুতুলের বাক্সে রেখেছিল, রানীর স্পষ্ট মনে আছে। সাহেবের কথায় তবু দ্বিধা এসে যায়। রাখতেও পারে অন্য কোথাও, এখন মনে পড়ছে না। মা যদি জানতে পারে গয়না পাওয়া যাচ্ছে না, কেটে আমায় চাক-চাক করবে। এই সেদিন একগাদা টাকায় কিনে দিয়েছে।

কচু! সাহেবের মুখে এসে পড়েছিল আর কি— তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। মেনেই নিল রানীর কথা, একগাদা টাকায় কেনা ঐ বস্তু।

বিপদের বন্ধু ভেবে রানী সাহেবের কাছে পরামর্শ চাইছে কী করি বল তো সাহেব, বুদ্ধি বাতলে দে। কখন মা খোঁজ করে বসবে, ভয়ে আমার বুক কাঁপছে।

সাহেব একটুখানি ভাবনার ভান করে বলে, ঠাকুরকে একমনে ডাক।

কে ঠাকুর?

বোকার মতন কথায় সাহেব খুব একচোট হেসে নেয়: আরে আরে ঠাকুর জানিস নে? ঈশ্বর ভগবান মা-কালী মহাদেব কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী গরুর ঘণ্টাকর্ণ—দু-দশজন নয়, তেত্রিশ কোটি ঠাকুর, ক'টা নাম করি! যে নামে ইচ্ছা নাছোড়বান্দা হয়ে পড়: ঠাকুর, মাকড়ি পাচ্ছি নে, খুঁজে-পেতে এনে দাও। কালীঘাটে মা-কালীর এলাকা—তাঁকেই বরঞ্চ ধর চেপে।

রানী বলে, মা-কালী খুঁজে দেবেন?

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, আলবৎ। ভক্ত যদি ঠিক মতো ধরতে পারে, আবদার রাখতেই হবে মাকে। আমার কি হল—রাত্রে চাল আর খাঁড়িমুসুরি ডালের কথা বললাম মা-কালীকে। ঠিক অমনি জুটিয়ে দিলেন। রান্নাটা শুধু করে নিতে হল মাকে। ডেকেই দেখ না মনপ্রাণ দিয়ে। ফল না পাস তো বলিস।

ফলটা ঠিক হাতে-হাতে নয়, সন্ধ্যা অবধি সবুর করতে হল। বড়ঘরের পাশে ছোট্ট একটু ঘর, তার মধ্যে পারুলের বাক্স-পেঁটরা—কাকাতুয়ার দাঁড়, পানের সরঞ্জাম, হাঁড়িকলসি, গুচ্ছের আজেবাজে জিনিস। সন্ধ্যায় পর এ-বাড়ির অন্য সকলের মতো পারুলও ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রানী গিয়ে জোটে তখন ঐ ঘরে। ঘরের দেয়ালে মা-কালীর পটের উপর মাথা ঠুকছে—জোর তাগাদা, গড়িমসি করলে ভক্তির চোটে পটের অধিকক্ষণ আস্ত থাকার কথা নয়। সেই শঙ্কাতেই বুঝি জানলা দিয়ে মা টুক করে ফেলে দিলেন, রানী ছুটে গিয়ে কুড়াল জিনিসটা—তাই তো রে, সেই মাকড়ি!

কী আহ্লাদ রানীর! জাগ্রত ঠাকুরের কাজ-কাজবার দেখে অবাক হয়ে গেছে। খবরটা সাহেবকে জানাতে হয়, না জানানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। কোথায় এখন পাওয়া যায় সাহেবকে?

সেই গঙ্গার ঘাটেই। বড় এক সাঙড়নৌকো ভাঁটার সময় মাঝগঙ্গার কাদায় আটকে আছে: মাঝি বাজার-হাট করতে নেমে পড়েছিল, সওদা করে ফিরল এবার। কাদা ভাঙতে নারাজ! জোয়ারের জল তোড়ে এসে

ঢুকছে নৌকো এক্ষুনি ভেসে উঠবে, পাড়ে এসে লাগবে। মাঝি ততক্ষণ ঘাটের উপর অপেক্ষা করছে। সাহেব কেমন করে বুঝে পাকড়াও করছে তাকে: গল্প বল। মাঝিমাল্লারা দূর-দূরন্তর ঘোরে, দেশবিদেশের মজার মজার গল্প শোনা যায় তাদের কাছে: হতে হতে রাজা দুয়োরানী শুয়োরানী রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্র সওদাগরপুত্র ব্যাঙ্গমাব্যাঙ্গমীদের রূপকথা। রানীও এসে পড়ে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে।

জোয়ারে নৌকো ভেসে ইতিমধ্যে ঘাটে এসে যায়। গল্প থামিয়ে মাঝি এক লাফে কাদা ডিঙিয়ে উঠে পড়ল।

রানী এইবার সুখবর জানায়: মাকড়ি পাওয়া গেছে সাহেব। কানে পরে এসেছি দেখ, সেই মাকড়ি।

খুশিতে ঘাড় নেড়ে মাকড়ি দুলিয়ে দেখাল। বলে, মোক্ষম বুদ্ধি বাতলে দিলি তুই। যেমন যেমন বলেছিলে ঠিক সেই কায়দায় চাইলাম! সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল। আরো একটা জিনিস চেয়ে দেখব। মার কাছে কদ্দিন থেকে চাচ্ছি, দেয় না। ভাবছি, মাকে না বলে যা-কিছু দরকার মা-কালীকে বলব এবার থেকে।

সভয়ে সাহেব বলে, একবার হল সে-ই ঢের। ঠাকুর-দেবতাকে বার বার কষ্ট দিতে নেই।

মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে রানী সাহেবের আপত্তি উড়িয়ে দেয়: ওঁদের আবার কি কষ্ট? নড়তে হবে না জায়গা থেকে। ইচ্ছাময়ী মা—ইচ্ছে করলেই অমনি এসে পড়বে। বেশি কিছু চাচ্ছিনে তো, চুলের ভেলভেট-ফিতে এক গজ।

ভাটার সময় আদিগঙ্গায় জল থাকে। সেই সময় ঝিঙে ও আর তিন-চারটের সঙ্গে সাহেবও কাদা ভেঙে ওপার গিয়ে ওঠে। পুরুষোত্তম সা'র চালের আড়ত, মস্তবড় টিনের ঘর। গাঙের খালের নৌকো থেকে বস্তা বস্তা চাল মাথায় মুটেরা গুদামে নিয়ে ফেলছে। মাঝখানের রাস্তাটা পার হয়ে যায়। চলছে তো চলইছে—পিঁপড়ের সারির মতো বওয়ার আর শেষ নাই। বস্তায় বস্তায় গুদামঘরের ছাদ অবধি ঠেকে যায়। ওরে বাবা, কারা খাবে না জানি গুদোম ভর্তি এত চাল।

পুরুষোত্তমবাবুকে দেখা যায় রাস্তা থেকে। ঢুকবার দরজার ঠিক পাশে জোড়া তক্তাপোশ—কাঠের হাতবাক্স সামনে নিয়ে তিনি তার উপরে বসেন। ডাইনে বাঁয়ে তার দু'জন-ঘাড় গুঁজে বসে তারা খাতা লেখে। বিশাল ভুঁড়ি, মাথায় টাক—খালি গায়ে থাকেন পুরুষোত্তম প্রায়ই, খুব বেশী তো

হাত-কাটা ফতুয়া একটা। গলায় সোনার মোটা চেন, ডান হাতে চৌকো সোনার চাকতি এবং তামা লোহা ও রূপোর একগাদা মাদুলি। হাত নাড়তে গেলে খড়বড় আওয়াজ ওঠে। নাড়তেই হয় সেই হাত অনবরত। হাতবাক্স খুলে নোটে টাকায় এই এককাঁড়ি মাঝিদের দিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই পাইকারদের কাছ থেকে টাকা-নোটের গাদা গুণে নিয়ে হাতবাক্সে ঢোকাচ্ছেন। গাঙের জোয়ার-ভাটার মতো সারা দিনমান এই কাণ্ড চলে। ওরে বাবা এত টাকা একসঙ্গে একবাক্সের ভিতর মানুষ জমিয়ে রাখে! চাল খুঁটতে আসে সাহেবরা। নৌকো থেকে গুদামে উঠবার সময়।

বস্তা গলে দু-চারটে চালের দানা পড়ে। কাঁচাচোখের ছোঁড়াগুলো পথের ধুলো থেকে একটা একটা করে খুঁটে কোঁচড়ে তোলে। পাখি যেমন করে ঠোঁট দিয়ে তুলে তুলে নিয়ে খায়। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটিও প্রচণ্ড। সকলের বড় বজ্জাত ঝিঙেটা।

ফণী আড্ডির বেটা তুই কেন এসব ছ্যাঁচড়া কাজে আসিস!

এ রকম প্রশ্নে ঝিঙে হি-হি করে হাসে: বাবার সংসারে শুধু খাওয়া-পরার বরাদ্দ। এই যা হল, নিজের রোজগার। বিড়িটা-আসটার খরচা কোথা থেকে আসে? শুধু বিড়িতে শোধ যায় না, মুখের গন্ধ মারতে এলাচ-দানা চিবুই; সৎমা বেটি মুকিয়ে থাকে—হাঁ কর তো দেখি। মুখ শুঁকে কিছু পেলে বাবাকে অমনি বলে দেবে। ভাতের বদলে সেদিন মার—

খরচা বেশি বলে ঝিঙের প্রতাপটাও বেশি। একটা দানা দেখলে তো ছোঁ মেরে নিয়ে নেমে অন্যের সামনে থেকে। অন্য কারো কিছু হতে দেবে না, রাস্তাটুকুর উপর সর্বক্ষণ যেন নৃত্য করে বেড়াচ্ছে।

কথা হল, জায়গার বাটোয়ারা হয়ে যাক তবে। একটা ডাল ভেঙে এনে রাস্তার উপরে দাগ দিয়ে নেয়—এখান থেকে এই অবধি ঝিঙের সীমানা। এই অবধি সাহেবের, এই অবধি অমুকের—। যার কপালে যা পড়ে, এলাকার বাইরে কেউ যাবে না।

বলিহারি সাহেবের কপালজোর! ভাগাভাগির পর প্রায় তখনই একটা বস্তার ছিদ্র খুলে তার লাইনের ভিতরে ঝুরঝুর করে মাল পড়ে। মুটে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য হাত চাপা দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যা পড়েছে, সে-ও এক পর্বত—পুরো মুঠোর কাছাকাছি। ঝিঙে তড়াক করে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল, অন্যগুলোও সঙ্গে আছে। সাহেব যা তুলে ফেলেছিল, কোঁচড়ে হেঁচকা টান দিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

এ কি, আপোস-বন্দোবস্ত এই যে হয়ে গেল—

সে হল ছিটেফোঁটার বন্দোবস্ত। এখন যদি হুড়মুড় করে স্বর্ণবৃষ্টি হয়, সে-ও তুই একলা কুড়োবি নাকি?

শয়তান মিথ্যেবাদী, মরে গিয়ে কালীঘাটের কুকুর হবি তোরা—।

কিন্তু মৃত্যুর পরের ভাবনা নিয়ে আপাতত কারো মাথাব্যথা নেই, মাটিতে পড়া সাহেবের চাল তাড়াতাড়ি খুঁটে তুলে নিচ্ছে। সাহেব পাগলের মতো গিয়ে পড়ল তো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে।

চেঁচামেচিতে গদির উপর পুরুষোত্তমবাবুর নজর পড়েছে। এই, শুনে যা—। বাঁহাতের আঙুল নেড়ে ডাকলেন।

আছে মোট পাঁচজন, দুঃসাহসী ঝিঙে এগিয়ে যায়। পুরুষোত্তম খিঁচিয়ে ওঠেন: আগ বাড়িয়ে এলি, তোকে কে ডাকে রে হাঁড়ির তলা? ঐ যে, ঐ ধবধবে ছেলেটা—ওকে ডাকছি।

সাহেবকে থাকেন। ঘোর কালো বলে ঝিঙেকে বললেন হাঁড়ির তল। বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে এমন তাকান পুরুষোত্তম, বুকের ভিতর গুরগুর করে। সাহেবের ডাক হল তো দিয়েছে সে চোঁচা-দৌড়—

পরের দিন কাজে আসে, পিছন দিক থেকে কে এসে চটিসুদ্ধ পা তুলে দিল সাহেবের পিঠের উপর এই ছোঁড়া—

মুখ ফিরিয়ে দেখে পুরুষোত্তম। সর্বনাশ, বাবু নিজে বেরিয়ে পড়েছেন যে! ছোঁড়া তোকে কাল ডাকলাম, গেলি নে কি জন্যে?

সাহেব ফ্যালফ্যাল করে তাকায়! পুরুষোত্তম অন্যদের দিকে ফিরে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: বড্ড স্ফূর্তি বেধেছে। আমার চাল পড়ে যায়, সেই সমস্ত তোরা নিয়ে যাস। পালা, পালা—নয় তো পুলিসে দেব।

অপমানিত জ্ঞান করল ঝিঙে—কাল বলেছে হাঁড়ির তলা, এখন এই। ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়ায়: চেঁচামেচি করেন কেন মশায়? সরকারি রাস্তা—পড়ে পেলাম খুঁটে নিলাম। আপনার গুদোম থেকে যদি নিতাম, কথা ছিল।

সরকারি রাস্তা—বটে! মুখে মুখে চোপরা করিস, এত বড় আস্পর্ধা!

দরজার ধারে লাঠি হাতে দরোয়ান বসে থাকে, রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। পুরুষোত্তম তাকে বললেন, তেড়ি দেখেছ এইটুকু ছেলের! লাঠি পিঠে পিণ্ডি পাকিয়ে দাও, ঘরে ফিরবার তাগত না থাকে! বলছে সরকারি রাস্তা। সরকার বাবা ওদের—ঠেকাক এসে সেই সরকার।

দু-হাতে লাঠি তুলে দারোয়ান লম্ফ দিয়ে পড়ে। দৌড়, দৌড়। আর তিনজন উধাও, বেপরোয়া ঝিঙে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে চেঁচাচ্ছে: দেখে নেব। পাড়ায় পাবো না কোনদিন? ইট মেরে তোমার টাক ভাঙব।

দারোয়ান তেড়ে যেতে একেবারে অদৃশ্য। পুরুষোত্তম গর্জন করেন : উঃ, এখনই হাপ-গুণ্ডা। দেখতে পেলে ঐ ছোঁড়ার ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দেবে, পাকা হুকুম আমার।

সাহেবও পালাবে, উঠে পড়েছিল ।হাত এঁটে ধরে আছেন পুরুষোত্তম। ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কেঁদে পড়ল সাহেব : আর কক্ষনো আসব না, কোনাদনও না। কান মলছি বাবু, নাক মলছি। ছেড়ে দিন।

পুরুষোত্তম হেসে ফেলেন : আসবি নে কি রে? তোর জন্যেই তো তাড়ালাম ওগুলো। এটা তোর রাজ্যপাট। দেখি, কতগুলো হল আজ।

কোঁচড় নেড়ে চালের পরিমাণ দেখলেন। হতাশ স্বরে বলেন, এই? রোদে তেতেপুড়ে মুখ যে টকটক করছে—এতে কষ্টের এই লভ্য? চিল-কাকগুলোকে এই জন্যে তাড়ালাম, এখন তুই একেশ্বর। হ্যাঁরে, থাকিস কোথা তুই? কে কে আছে?

আঙুল তুলে সাহেব ওপারে দেখায়। পুরুষোত্তম ঘাড় বাঁকিয়ে নিরিখ করে দেখছেন : কোনটা রে? ঐ তো ফণী আড্ডির বস্তিবাড়ি—আড্ডির বস্তিতে থাকিস বুঝি? নতুন এসেছিস?

নিশ্বাস ফেলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলেন, কত ঘোরা-ঘুরি ছিল। ব্যবসা জেঁকে ওঠার পর ইস্তফা পড়ে গেছে। দুর দুর, টাকার নিকুচি করেছে, রসকষ কিছু আর থাকে না জীবনে। চোখ তুলে এদিক-ওদিক দেখেছ কি বারো শত্তুর অমনি ফুসুর-ফুসুর করবে : শামশায় তাকাচ্ছেন।

একটা আধুলি হাতে গুঁজে দিলেন পুরুষোত্তম। বলেন, কাল থেকে একলা হলি, পুষিয়ে যাবে। অন্য কেউ ঢুঁ মারতে এলে দারোয়ানকে বলবি, লাঠিপেটা করে পোল পার করে দিয়ে আসবে। হুকুম দেওয়া আছে আমার।

বড় ভাল লোক, বড্ড দয়া। সাহেবের মনে এলো, বাপ হতে পারে এই মানুষটাও। নয়তো এত টান কিসের? আদিগঙ্গার উপর বাসা—পুঁটলি বেঁধে ছেলে ভাসানো কাজটা অতি সহজে এরা পারে।

গাঙে এখন ভরা জোয়ার, পোল ঘুরে যেতে হচ্ছে। পোলের মুখে দেখে ঝিঙেরা চারজন। পুরুষোত্তমকে কবে পায় না পায়—উপস্থিত তাঁর পেয়ারের মানুষ সাহেবের উপরেই কিছু শোধ তুলবে বোধহয়। কোন কায়দায় সরে পড়া যায়, সাহেব এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঝিঙে বলল, ঘরে ঢুকিয়ে মারধোর দিল বুঝি তোকে? তাই দাঁড়িয়ে আছি।

সর্বরক্ষে রে বাবা! নাক কোঁত-কোঁত করে হাঁ করে বলে দিলেই ঢুকে যায়, সম্পূর্ণ নিরাপদ। কিন্তু সত্যি কথাটা বেরিয়ে যায় ফস করে। এই বড় মুসকিল সাহেবের, সামান্য মিথ্যে কথা বলতেও পারে না—বিস্তর কসরতের পর তবে হয়তো একটা বেরুল। তার জন্যে নানান রকমে মহলা দিতে হয় মনে মনে। বাপ-মা ঠিক সত্যবাদী ছিল—ছেলে বাপ-মায়ের মতন হয়, সেই জন্য তার বিপত্তি।

সাহেব সত্যি কথাই বলল, ও-রাস্তায় একলা আমি চাল খুঁটব, ডেকে নিয়ে তাই বলে দিল।

বলেই ভয় হয়েছে। ভয়ে ভয়ে আজকের সমস্ত চাল কোঁচড় থেকে ঢেলে দেয়। চাল ঘুস দিয়ে ভাব জমাচ্ছে। বলে, তোদের তো ভালই রে, সারা বেলাস্ত রোদ-পড়া হতে হবে না। নিত্যিদিন এইখানটা এসে আমি ন্যায্য ভাগ দিয়ে যাব। সকলে মিলে আশাসুখে রোজগারে আসি—পুরুষোত্তমবাবু একচোখা, তা বলে আমরা কেন তার মতন হতে যাই?

ঝিঙে তবু প্রবোধ মানে না। নজরে পড়ে, ঠোঁট দুটো তার থরথর করে কাঁপছে। ঐরকম ডাকাত ছেলে, ভ্যাক করে কেঁদে পড়ল সহসা। কাঁদতে কাঁদতে বলে, চেহারার গুণে তোর আদর। হাঁড়ির তলা বলে হেনস্থা করল—ঐ পুরুষোত্তম শালাও তো কালো। আমি যদি ওর ছেলে হতাম, এমন কথা বলত কখনো!

চালগুলো দিয়েথুয়ে সাহেব বাসায় ফেরে। ভাগ করে নিয়ে নিক ওরা। আধুলিটা তার আছে। ভাগের ভাগ যে চাল পেত, আধুলি তার অনেক উপর দিয়ে যায়।

কিন্তু সে আধুলিও বুঝি রাখা যায় না। বাসায় পা দিতেই রানী এসে ডাকল, শোন সাহেব একটি কথা। শিগগির শুনে যা।

রানী ঝগড়া করে: ফাঁকি কথা বললি কেন সাহেব? মা-কালী কিচ্ছু নয়, একেবারে বাজে। ভেলভেট-ফিতের কথা বলছি, শখ হল জিনিসটার উপর। কত আর দাম শুনি? এদ্দিনের মধ্যে দিতে পারলেন না।

বিপদের কথা বটে! মেয়েটার কালী-পদে মতি নেওয়াচ্ছে, সেই কালীরই পশার থাকে না। সাহেবের নিজেরও পশার নষ্ট। এর পর কোন কথা বললে রানী কি আর মানতে চাইবে?

সমস্যায় পড়ে গিয়ে আপাতত সামাল দেওয়ার কথা বলে, দূর, তাই হয় নাকি রে! এত বড় পৃথিবী সৃজন-পালন করছেন, এক গজ ফিতে দিতে পারেন নি তিনি! তোরই দোষ, একমনে তেমনভাবে ডাকতে পারিস নে।

রানী তর্ক করে: পারি নে তো সেদিন মাকড়িজোড়া আদায় করলাম কেমন করে? সেদিন সে সমস্ত কথা যেমন করে বলেছিলাম, ঠিক ঠিক তাই তো বলি।

ইতিমধ্যে সাহেব অজুহাত খুঁজে পেয়েছে। বলে, মাকড়ি যা বললে হয়, ফিতে তাতে কেন হবে? মালে তফাৎ রয়েছে না? বলি, কার্তিকপুজোর যে মন্তোর লক্ষ্মীপুজোর কি তাই? আমার কথা বিশ্বাস না হয়, পারুলমাসিকে দেখ জিজ্ঞাসা করে।

জিনিসটা এতই সরল যে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় না। রানী সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিল: তবে কি হবে? ফিতের জন্যে কোন কায়দা করতে হবে, বলে দে আমায়।

বারম্বার চাচ্ছিস তো, তোয়াজটা বাড়িয়ে করাই ভাল। কথাবার্তা নয়, মন্তোর। সে মন্তোর আমার কাছে আছে।

সাহেব ছুটে গিয়ে নিজের ভাণ্ডার থেকে মন্ত্র নিয়ে আসে। এক রকমের সিগারেট বাজারে খুব চালু—কালী সিগারেট। পুরুষোত্তমবাবু খুব খান। শেষ হয়ে গেলে বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দেন বাইরে! সাহেব কয়েকটা কুড়িয়ে এনেছে। মা-কালীর ছবি বাক্সের উপর। হাতে খাঁড়া আর কাটা-মুণ্ড, গলায় মুণ্ডমালা, মাথার চুল সমস্ত পিছনটা কালো করে পদতল অবধি নেমে এসেছে। শিবঠাকুরের বুকের উপর—লজ্জায় সেজন্য টকটকে জিভ কেটে আছেন। ঠিক যেমনটি হতে হয়, একেবারে সত্যিকার মা-কালী। ছবি ছিঁড়ে সাহেব সেঁটে দিয়েছে ঘরের দেয়ালে। পরে লক্ষ্য হল, ছবি ছাড়াও স্তব ছাপা রয়েছে বাক্সের ওদিকটায়। ভারি চমৎকার। সুধামুখীকে দিয়ে কয়েকবার পড়িয়ে নিল, এখন সাহেবের আধ-মুখস্থ। বস্তুটা সামনে রেখে গড়গড় করে পড়ে যেতে পারে। রানীকে তাই শোনাচ্ছে:

করালবদনা কালী কল্যাণদায়িনী
কাতরে করুণা দান করেন জননী।
বঙ্গবাসী জনে দেখি সিগারেটে রত
শ্বাসকাস আদি ক্লেশে ভোগে অবিরত
ব্যথিত হৃদয়ে মাতা দয়া প্রকাশিল
সিগারেট রূপে এবে সুধা বিতরিল।

রানী সন্দেহ ভরে বলে, এ তো সিগারেটের মন্তর। ফিতের কথা কই ?

সিগারেট পালটে ফিতে বললেই হল। চানটান করে শুদ্ধ কাপড়ে শুদ্ধ মনে দেখ না বলে। না খাটে তো তখন বলিস।

পরের দিন চুলে ফিতে পরে বাহার করে রানী মন্ত্রের ফল দেখাতে এল।

ডাকাবুকো মন্তোর গো সাহেব। বেড়ে জিনিস শিখিয়েছ, আমি মুখস্থ করে নিয়েছি। আজকে আমি একপাতা সেপটিপিন চাইব। সিগারেট পালটে ফিতে বললে হল, ফিতে পালটে সেফটিপিন বললেই বা কেন হবে না ?

যুক্তি অকাট্য। এবং এক পয়সার একপাতা সেফটিপিন জোগানো মা-কালীর পক্ষে কঠিনও নয়। কিন্তু একনাগাড় এমনি যদি চলে, তবে তো সর্বনাশ। চললও ঠিক তাই। সেফটিপিন হল তো মাথার কাঁটা, চিরুনি, গায়ে-মাখা সাবান। যা গতিক, কালীঠাকরুনকে পুরো এক মনোহারি দোকান খুলতে হয় রানীর জিনিস যোগান দেবার জন্যে।

(মায়া-অঞ্জনের খবরটা জানা থাকত যদি! পরবর্তীকালে সকৌতুকে সাহেব কত সময় ভেবেছে। রানীর আবদার চক্ষের পলকে তাহলে মেটানো যেত। এই কাজল চোখে দিয়ে চোর অদৃশ্য হয়ে যায়। তাকে কেউ দেখে না, সে কিন্তু দেখতে পায় সকলকে। সেকালের পুঁথিগত্রে অঞ্জনের গুণপনার কাহিনী—গুরুকে বিস্তর সেবা করলে তবে তিনি এই বস্তু দিতেন। মক্কেল মালপত্র রেখেছে—মাটির নিচে হোক, বাক্স-পেঁটরার ভিতরে হোক, অঞ্জনের গুণে স্পষ্ট নজরে আসবে। নেওয়ারি ভাষায় এক পুরানো পুঁথি—পণ্ডিতেরা বলেন, হাজার বছরের মতো বয়স—যন্মুখকল্প। ছয়-মুখওয়ালা কার্তিক হলেন চোরের দেবতা—তাঁর নামের পুঁথি। মায়া-অঞ্জন তৈরির পদ্ধতিও তার মধ্যে। বলাধিকারী চৌরশাস্ত্র নিয়ে পড়েছেন তো আদ্যন্ত না দেখে ছাড়বেন না। খবর পেয়ে বিস্তর কষ্টে পাঠোদ্ধার করে যাবতীয় মন্ত্র লিখে নিয়ে এলেন। অশুদ্ধ ভাষা হলেও মন্ত্রের পাঠে তিলপরিমান হেরফের চলবে না। মায়া-অঞ্জনের মন্ত্র: ওঁ চন্দ্রস্যচ্যময়ন্দৃষ্টি দেবনির্মিতং হর হর সময় পূরয়ঃ হুং স্বাহা। উপকরণও এমন-কিছু দুর্লভ নয়। উলুক অর্থাৎ পেঁচার বসা, সিদ্ধার্থ অর্থাৎ আতপ চাল এবং কপিলাঘৃত। কপিলাঘৃত বস্তুটা জানা নেই। সমস্ত একত্র করে জ্বালিয়ে তেল বানাবেন। পদ্মসূত্রের সলতেয় নর-কপালে ঐ তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে কাজল পাড়ান, আর মন্ত্রটা এক-শ বার জপ করে ফেলুন। মায়া-অঞ্জন তৈরি হল—চোখে দিয়ে দেখুন মজাটা এবার। যা দিনকাল পড়েছে, গুণীরা দেখুন না পরীক্ষা করে।)

ধৈর্য হারিয়ে সাহেব একদিন বলে, কত আর চাইবি কালীর কাছে? ইতি দে এবারে। যখন তখন মা'কে মুশকিলে ফেলবিনে।

ভ্রূভঙ্গি করে রানী বলে, মা-কালী তো আমাদের মতন নন। সিকি পয়সা খরচা নেই মায়ের—ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা করলেই এসে যায়। তাঁর আবার মুশকিলটা কি ?

সাহেব আমতা আমতা করে : তা হলেও ভাববেন, মেয়েটা বড্ড হ্যাংলা। বিরক্ত হয়ে শেষটা দেওয়া একেবারে বন্ধ করবেন দেখে নিস।

এতদূর রানী তলিয়ে দেখেনি। মা-কালীর কাছে বদনাম হয়ে যাচ্ছে বটে ! একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে এবারে চটিজুতোর আবদার করে বসেছি সাহেব। দিয়ে দিন একজোড়া। তার পরে আর মা-কালীর নামটাও মুখে আনছি নে। ইহজন্মে নয়। কী দরকার ! মা হয়তো ভেবে বসবেন, আবার কোন মতলব আছে মনে মনে। নয়ত ডাকে কেন ?

ঘাড় দুলিয়ে জোর দিয়ে বলল, এই আমার শেষ চাওয়া। টুকটুকে লাল চটি, মাখনের মত নরম। বড়লোকের ঘরের ভাল ভাল মেয়ে-বউরা এই চটি পরে আসে। নাটমণ্ডপের নিচে খুলে রেখে মন্দিরে ঢোকে। দেখে এসো একদিন সাহেব, কী সুন্দর !

দেখতে যেতে হয় অতএব সাহেবকে। জুতোচুরির ভয়ে ভক্তেরা সবসুদ্ধ মন্দিরে ঢোকে না, একজনকে রেখে যায় জুতোর পাহারায়। ব্যাপার বুঝুন। একবাড়ি মানুষ ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই হয়ে এসেছে, মন্দিরে ঢুকে সবাই ঠাকুর-দর্শন করছে—তার মধ্যে একজনই কেবল বাইরে দাঁড়িয়ে তাক করে আছে সকলের পায়ের জুতোয়। যে যেমন কপাল করে আসে।

অবশেষে চটিজুতোও দিয়ে দিলেন মা-কালী। রানীর পায়ে ঢলঢলে হয়, জিনিসটা তবু পছন্দসই।

হল কি সাহেব, চুরি যে একের পর এক চলল ! পয়লা বার সুধামুখীর কষ্ট দেখে, তারপরে রানীর আবদারে। যে রানীকে সাহেবের বউ বলে সকলেই ক্ষেপায়। রানীও বউয়ের মতন সলজ্জ ভাব দেখায় লোকের সামনে। মায়ের জন্য চুরি, আর বউয়ের আবদার রাখতে চুরি।

ঠিক দুপুরে সাহেব চাল খুঁটছে আড়তের সামনের রাস্তায়। একেশ্বর এখন—তাড়াহুড়ো নেই, ধীরেসুস্থে খুঁটে খুঁটে তুলে নেওয়া। জুতো মশমশ করে বাবু একজন এল। কতই তো আসে পুরুষোত্তমবাবুর কাছে কাজকর্ম নিয়ে। সাহেব আপন মনে চাল কুড়িয়ে যাচ্ছে।

কে রে, সাহেব না তুই ?

বাদার জঙ্গলে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে, মাঝিদের কাছে সাহেব গল্প শুনেছে।

অমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবুলোকটা সাহেবের চুলের মুষ্টি ধরে। তাকিয়ে দেখে, অন্য কেউ নয়—নফরকেষ্ট। এত কাল পরে রাস্তার উপরে হঠাৎ উদয়। চুল এঁটে ধরে প্রকাণ্ড চড় উঁচিয়েছে—

চেহারায় নফরকেষ্ট সত্যি সত্যি বাঘ। অথবা বুনো হাতী। ছেলেমানুষ সাহেব বলে নয়, বড়রাও আঁতকে ওঠে। কিন্তু রাগে অপমানে জ্ঞান হারিয়েছে সাহেব। তড়াক করে উঠে ক্ষীণ হাত দু-খানার বিশালদেহ নফরকে এঁটে ধরেছে। খিমচি কাটে, কেঁদেকেটে অনর্থ করে: কেন মারবে আমায় তুমি—কেন? কেন?

নফরকেষ্টর হুঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে যায়। চড়ের হাত নেমে গেছে অনেকক্ষণ। মিনমিন করে বলে, চেঁচাচ্ছিস কেন রে? মারলাম আমি কখন, মিথ্যে বলবি নে। কী চেহারা হয়েছে, দেখ দিকি। না, দেখবি কি করে এখন—ঘরে গিয়ে আয়না ধরে দেখে নিস। ভাদ্দরের এই চড়া রোদে রক্ত যা ছিল সবটুকু মুখে উঠে গেছে।

সাহেব বলে, তোমার কি?

সে তো বটেই আমার কী। কথায় তোর বড্ড ধার হয়েছে সাহেব। পথে বসে বসে চাল কুড়োস—তুই কি কাঙলি-ভিখারি, হালদার-পাড়া রাস্তায় যারা সারবন্দি গামছা পেতে বসে থাকে?

মুহূর্তকাল চুপ থেকে নফরকেষ্ট বলে, এই যে উঞ্ছবৃত্তি করিস, সুধামুখী জানে?

কেন জানবে না! চাল কোন দিন কম হয়ে গেলে সন্ধ্যের আগে আবার পাঠিয়ে দেয়।

চল তো দেখি।

সাহেবের হাত ধরল নফরা। বলে, রাগ করিসনে সাহেব। তোর দশা দেখে মনে দুঃখ হল কিনা। অনেক দিন ছিলাম না—তার মধ্যে এই হাল হয়েছে, আমি বুঝতে পারি নি।

তৃতীয় ব্যক্তিটি কেউ উপস্থিত থাকলে মনে ভাবত, গৃহকর্তা প্রবাস থেকে ফিরে গিন্নির সম্পর্কে বকাবকি করছে। এবং ছেলের হাত ধরে কৈফিয়ত নিতে চলল যেন বাড়িতে।

বড়লোকি সাজপোশাক ও ভাবভঙ্গি দেখে সাহেব হাত ছাড়িয়ে নেয় না। শুধু বলল, চালগুলো সব পড়ে গেছে। দাঁড়াও তুলে নিই।

নফরকেষ্ট তাচ্ছিল্য করে বলে, থাক না পড়ে। যাদের অভাব-অনটন, তারা এসে তুলবে। ওদিকে তাকাতে হবে না। চাল আমরা দোকান থেকে নেব। একেবারে পাঁচ-দশ সের কিনে নিয়ে যাব।

হল তাই। রাস্তার চাল অভাবগ্রস্তদের তুলে নেবার সুযোগ দিয়ে নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল। চিরকালের সে লোকটা নয়—ধবধবে ডবলব্রেস্ট কামিজ পরেছে, পায়ের জুতো মশমশ করছে, চলেছেন শ্রীযুক্তবাবু নফরকেষ্ট পাল। কিম্বা তারও বড়—জমিদার রাজা কি নবাব-বাদশা কেউ একজন।

চালের ঠোঙা নিয়েছে হাতে। আর কি নেওয়া যায় সাহেব? মিষ্টান্নের দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ায়: কিছু মিষ্টি নেওয়া যাক। খুব বড় বড় রাজভোগ বের করো তো হে। ফুটবলের সাইজ—

চালের ঠোঙা আর রসগোল্লার হাঁড়ি বারান্দায় নামিয়ে রাখল। সুধামুখীর সাড়া নেয়: রাস্তা থেকে ছেলে ধরে আনলাম সুধামুখী। কী চেহারা হয়েছে দেখ।

বহুদিন পরে নফরকেষ্টর গলা পেয়ে সুধামুখী ছুটে আসে। নফরকেষ্ট নালিশ করছে: সাত ভিখারির এক ভিখারী হয়ে এই রোদ্দুরে রাস্তায় চাল খুঁটছিল। আসবে না কিছুতে। আবার কথার কী তেজ!

সুধামুখী স্নেহস্বরে বলে, পেটের দায়ে করাতে হয়, নইলে সেই বয়স কি ওর!

গামছা ভিজিয়ে এনে সাহেবের মুখ মুছে দেয়। তালপাতার পাখা নিয়ে এসেছে—

দূর! বলে সাহেব হেসে সেই পাখা কেড়ে নিল। অন্যে এসে পাখার বাতাস করবে—এতখানি আদর সে সহ্য করতে পারে না। আরও লজ্জা বাইরের একজন—নফরকেষ্টর সামনে ঘটতে যাচ্ছিল ব্যাপারটা। বেরিয়ে পড়ল! ঘাটে যাবার সেই সংক্ষিপ্ত পথ—আমের ডালে পা দিয়ে পাঁচিলের মাথায় উঠে ধ্বপ করে ওদিকে এক লাফ।

টসটস করে হঠাৎ জল পড়ে সুধামুখীর চোখে। বলে, সাহেবকে আমি কিছু বলতে যাইনি, চাল কুড়ানোর বুদ্ধিটা নিজে থেকে মাথায় এনেছে। কী করে দুটো পয়সা সংসারে এনে দেবে, তার জন্য আঁকুপাকু করে। কত মায়াদয়া ঐ একফোঁটা ছেলের!

আর চাল খুঁটে বেড়াতে হবে না। চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দৈন্যদশা ঠাহর করে দেখল। সুধামুখী বাড়িয়ে বলছে না। লজ্জিত কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে, চালের দায় আমার। পাঁচ সের এই নিয়ে এসেছি, ফুরোলে আবার এনে দেব।

আসবে তো ছ'মাস পরে। তদ্দিন বেঁচে থাকলে তবে তো?

আসব রোজই সুধামুখী, ঠিক আগেকার মতো। গাঢ় স্বরে নফরকেষ্ট বলে, কোনদিন কেথাও আর যেতে চাইনে। আসবার পথে পুরানো ডেরাটা একবার ঘুরে দেখে এলাম। নিমাইকেষ্টকে সব দেখিয়েছি, শুধু কাজের সরঞ্জামগুলো গোপন ছিল। সেগুলো গোছগাছ করে রেখে এলাম। পুরানো কাজকর্ম—এইখানে আগের মতন তোমায় বেড়ে দিয়। তোমার ঝাঁটা-লাথি খাব, আর রাঁধা-ভাতও খাব। টাকাপয়সা কিছু আমি হাতে তুলে দেব, বাকিটা তুমি কেড়ে কুড়ে নেবে। যেমন বারবার হয়ে এসেছে।

সুধামুখী সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। নফরকেষ্ট বলতে লাগল, তাঁতের মাকু দেখছে? একবার ডাইনে ছুটছে, একবার বাঁয়ে। আমারও তাই। গোড়ায় ঠিক করলাম, ভাল মানুষ নয়—টাকার মানুষই হব। দুনিয়াদারি ফাঁকা, সারবস্তু টাকা। টাকা হল না, কিছুই হল না—বয়সটা হল আর দেহের মেদ হল। ভাই এসে সুবুদ্ধি দিল। ভাবলাম, বাসায় উঠে ভাল মানুষই হইগে তবে। চাকরিবাকরি-করা বাবুমানুষ, ঘরগৃহস্থালী-করা সংসারী মানুষ। তা-ও হল না, তিতবিরক্ত হয়ে ফিরেছি। কাজ নেই বাবা। ঘেঁটুফুলে পূজোআচ্চা হয় না, ও-জিনিস বনেবাদাড়ে ভাল।

সুধামুখী সন্দেহ ভরে জিজ্ঞাসা করে, বউ এলো না কিছুতে? এত রকমে টোপ ফেলেও গাঁথতে পারলে না?

আসবে না মানে? বাসায় এসে রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে রীতিমত ডাল-চচ্চড়ি রাঁধতে লেগেছে। ধর্মপত্নী যখন, না এসে যাবে কোথায়?

সুধামুখীর দৃষ্টিতে তবু বুঝি অবিশ্বাস। চটেমটে পকেট থেকে এক টুকরো কাপড় বের করে নফরকেষ্ট বলে, বউ আসে নি, এটা তবে কি?

রুমালের মতো বস্তুটা চোখের উপর মেলে ধরল।

কৌতূহলী সুধামুখী প্রশ্ন করে, কি ওটা?

বউয়ের শাড়ির আঁচল। কেটে এনেছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

সুধামুখ। মনের গুমট কেটে গেছে, নফরার ভঙ্গি দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে: তুমি যে আর এক শাজাহান বাদশা হলে নফরকালি।

নফরকেষ্ট বলে, শাজাহান বাদশা কি করল?

বউকে ভুলতে না পেরে তার নামে তাজমহল গড়ল। দুনিয়ার মানুষ দেখতে আসে, শাজাহানকে ধন্য-ধন্য করে। তোমারও সেই গতিক। বউ সঙ্গে নেই তো শাড়ির টুকরো পকেটে নিয়ে ঘুরছ। ভুলতে পার না।

নফরকেষ্ট সগর্বে বলে, ভুলবার জিনিস নাকি? পকেটে কি বলছ—আমি বাদশা হলে মাথায় যে মুকুট থাকত, নিশানের মতো তার উপর এই জিনিস

উড়িয়ে দিতাম। গাইয়ে-বাজিয়েরা গলায় মেডেল ঝুলিয়ে আসরে নামে তো—আমায় যদি কখনো আসরে ডাকে, ঐ কাটা-আঁচল আমি গলায় ঝুলিয়ে যাব। কাঁচি ধরার কাজে নেমেছি তখন আমি ঐ সাহেবেরই বয়সি, আর এই অর্ধেক-বুড়ো হতে চললাম সত্যি বলছি সুধামুখী, এত বড় বাহাদুরির কাজ আমি করিনি আর কখনো।

বারান্দায় জলচৌকির উপর বসে নফরকেষ্ট রসগোল্লা খাচ্ছে।

সুধামুখী বলে, বউয়ের রূপের ব্যাখ্যান চিরকাল ধরে করে এসেছে। ধরবার জন্যে কত ফন্দি-ফিকির। সেই বউ খপ্পরে এসে গেল, আর তুমি পালিয়ে চলে এলে ?

বউয়ের রূপের কথায় নফর আহার ভুলে শতমুখ হয়ে উঠল। বলে, মাগীর বয়স হয়েছে, সেটা কুষ্ঠি-বিচার করে বলতে হয়। চোখে দেখে ধরতে পারবে না। সাজতে জানে বলে ! গয়না পরে সেজেগুজে সব সময় একখানা পটের বিবি। উনুনে ফুঁ পাড়ছে, তখনো পরা আছে নীলাম্বরী শাড়ি।

সুধামুখী সামনে একটি পিঁড়ি পেতে বসে শুনছে। তার দিকে চেয়ে তুলনা এসে যায়। বলে, আর এই তুমি একজন মা-গোঁসাই এখানে। ছাই মেখে বনে গেলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তিরিশ বছরের আধ-বুড়ি আমার বউ—পনের বছরের ছুঁড়ি বলে এখনো আর একবার বিয়ে দেওয়া যায়। গেরস্ত-বউ হয়েও সাজের গুণে বাইরের মানুষ টেনে ধরে—শ্বশুরবাড়ি রাত দুপুরে বেড়ায় ঘা পড়ত, বেড়া বেঁধে বেঁধে শালামশায়রা নাজেহাল। আর তুমি বাইরের মেয়েমানুষ হয়ে ঘরের লোক ক'টাকেও টেনে রাখতে পার না। রাজাবাহাদুর গেল, সেই ঠাণ্ডাবাবু বানের জলের মতো দুটো চারটে দিন ভুড়-ভুড়ানি কেটে কোন দিকে ভেসে চলে গেল। আমি যে এমন নফরকেষ্ট, ত্রিভুবনে সবাই দূর-দূর করে—আমি পর্যন্ত পাকছাট মেরে ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে পড়ি।

মিষ্টি নিয়ে এসেছে নফরকেষ্ট, তাই থেকে কয়েকটা তাকে খেতে দিয়েছে। রসগোল্লা আর একটা গলায় ফেলে কোঁৎ করে গিলে নফরকেষ্ট বলে পুরানো বন্ধু হয়ে বলছি, সাজগোছ বেশি করে লাগাও। এখনো যা আছে, সাজিয়েগুছিয়ে লোকের চোখে তুলে ধর। রূপ ভগবান দেন মানি, আবার মানুষেও দিয়ে থাকে। কবিরাজি মলমের মতো কোটায় কোটায় আজকাল রূপের মসলা। সেই মসলা হাতে-মুখে, এখানে-ওখানে লাগাও, যতখানি কাপড়ের বাইরে থাকে। আবার ওদিকে স্যাকরামশায়রা ভেবে ভেবে খেটেখুটে বছর-বছর এ-প্যাটার্নের

ও-প্যাটার্নের গয়না গড়াচ্ছেন, যতগুলো পার গায়ের উপর চাপিয়ে দাও। ব্যস, আলাদা মূর্তি হয়ে গেলে। আয়না ধরে অবাক হবে: বাঃ রে, আমিই সেই সুধামুখী নাকি? বউয়ের কাছেপিঠে থেকে রূপের কারসাজি এবার ভাল করে বুঝে এসেছি।

একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে—সুধামুখী বিব্রত হয়ে ওঠে: বলি তো সেই কথা, সাজগোজের সেই রূপসী বউ ছেড়ে চলে এলে কেন?

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, রূপসী বলে রূপসী! যে দেখে সে-ই দেবচক্ষু হয়ে যায়। এক রবিবারে কারখানার একজন গিয়েছিল আমার কাছে। বউ দেখে কানে কানে বলল, সাত জন্ম তপস্যা করলে তবে এমন চিড়িয়া মেলে। বুকের মধ্যে নেচে উঠল শুনে।

তবে?

সে দেখা তো দিনমানের—দিনদুপুরের! রাতের বেলা আলো নিভিয়ে রূপ দেখা যায় না। তখন তুমি সুধামুখী যা, সে-বউও তাই। তখন শুনতে হয় কথা। বউয়ের মুখে কথা তো নয়, আগুন। আগুনের ছেঁকায় সর্বদেহ জ্বলে পুড়ে যায়। বুঝে দেখ সুধামুখী, সারাটা দিন ফার্নেসের পাশে কাজ—রাত্রে একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিরোব, পাশে সেই সময়টা বউ এসে পড়ে। দিনরাত্রি আগুনের পাশে বাঁচব কেমন করে? চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি, বাসা থেকেও পালিয়েছি। বউটা যদি না এসে পড়ত, যে ক'টা দিন বাঁচি ভাইয়ের বাসায় টিকে থাকতে পারতাম।

নিঃশব্দে নফরকেষ্ট আর কয়েকটা মিঠাই গলাধঃকরণ করে। ঢকঢক করে জল খেয়ে নিয়ে আবার বলে, তার উপরে এক কাণ্ড! আগুনে কেরোসিন পড়ল একেবারে। নিমাইকেষ্টর শ্বশুর বাসায় এসেছে মেয়েকে দেখতে। আমার বউ যেন আর-একটা মেয়ে—'বাবা' বলে কাছে-পিঠে ঘুরঘুর করছে, ফাঁক বুঝে তারপর মোক্ষম খবর জিজ্ঞাসা করে: কত মাইনে দেন আপনারা এ-বাড়ির বড়জনকে? শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে যার সঙ্গে দেখা, মাইনেটা বরাবর ফাঁপিয়ে বলে এসেছি। নিমাইকেষ্টকেও সামাল করা আছে—মায়ের পেটের ভাই হয়ে সে ফাঁস করবে না। কিন্তু আমরা বেড়াই ডালে ডালে, বউ-মাগী বেড়ায় পাতায় পাতায়। কুটুম্বমানুষকে ধরে বসেছে। বুড়ো অত শত জানবে কি করে, বলে দিয়েছে সত্যি কথা। রাত্রে বউ দেখি একেবারে চুপচাপ। এমন তো হবার কথা নয়—ভয়ে আমার গা কাঁপছে। বোমা ফাটবে বুঝতে পারছি—আজি হোক আর একদিন-দুদিন পরে হোক। হল তাই ঠিক—

খাওয়া সমাপ্ত করে নফরকেষ্টর এইবার সাহেবের কথা মনে পড়ে। এদিক-

ওদিক তাকিয়ে বলে, ছোঁড়াটার নাম করে মিষ্টিমিঠাই আনলাম সে খেয়েছে ?

দু-হাতে দুটো নিয়ে ঐ যে বেরিয়ে গেল। স্থির হয়ে দু-দণ্ড বাড়ি বসে থাকবার জো আছে ?

অভিভাবক জনের মতো বিরক্ত কণ্ঠে নফরকেষ্ট বলে, এই রোদ্দুরে অবেলায় গেল কোথা ?

সুধামুখী বলে, কোথায় আবার ! ঘাটে গিয়ে বসে আছে।

ঘাটে কী এখন ?

ঘাট ওর শোবার ঘর, ঘাটেই বৈঠকখানা। দেখ, পয়সাকড়ি জোটে না। নইলে কত সময় ভাবি, দরজার পাশে ঐ জায়গাটুকুর উপর ছাউনি করে দিলে রাতের বেলা সাহেব দিব্যি পড়ে থাকতে পারে। ঘাটের সিঁড়িতে যা করে ঘুমোয়।

নফরকেষ্ট বলে, বটেই তো ! ঘাটে শোবে কেন ছোটলোকের মতন ? ওসব হবে না, কালই চালা তোলার ব্যবস্থা করছি।

সুধামুখী প্রীত হয়ে বলে, ভাত চাপিয়ে এসেছি, এতক্ষণ ফুটে উঠল। গিয়ে ফ্যান গালব। তোমার কথা শেষ করে ফেল, শুনে যাই। তার পরে কি হল, কি করল বউ ?

নফরকেষ্ট বলে, যা ভেবেছি, বোমাই ফাটল। লণ্ডভণ্ড কাণ্ড একেবারে। পরের দিনটা মাইনের তারিখ। দু-ভাই বাড়ি এসে যেই দাঁড়িয়েছি, বউ নিমাইর সামনে হাত পাতল : ওর মাইনেটা আমার কাছে দাও। টাকা-আনা-পয়সায় ঠিক-ঠিক বলে দিল। আমরা থ। টাকাকড়ি আঁচলে বেঁধে ঘরের দুয়োর-জানলা এঁটে নিশিরাত্রে তারপর নিজমূর্তি ধরে। মিথ্যুক, অকর্মার ঢেঁকি। ভদ্রলোকের মেয়ের মুখের সেই সব বাছা বাছা জোরদার কথা বলতে আমার লজ্জা করছে। গাদা গাদা খরচা করে এই যে জার্মান-ইংরেজ এত বড় লড়াইটা হয়ে গেল—আমি ভাবি, বউকে যদি নিয়ে যেত কামান-বন্দুক, গুলিগোলা কিছু লাগত না, কথার তোড়েই শত্রু খতম হয়ে যেত।

আঁচল মুখে দিয়ে সুধামুখী হাসছে। নফরকেষ্ট বলে, হাসবে বইকি। পরের কষ্টে লোকের মনে বড় সুখ হয় তা জানি। একটা কথা আমার নামে বারবার বলছিল, কোন কাজের ক্ষমতা নেই। ছড়া কাটছিল : কোন গুণ নেই তার কপালে আগুন। মনে মনে তক্ষুনি কিরে করে বসলাম : চলে তো যাবই —তার আগে গুণের কিছু নমুনা ছেড়ে যাব। চিরকাল যেটা মনে রাখবে। হয়েছেও তাই। তবু তো সরঞ্জাম কিছু পেলাম না, ওরই কাঁথার ডালার ভোঁতা একটা কাঁচি—

সুধামুখী গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, আমার কি হবে! শেষটা নিজের বউয়ের পকেট কাটলে!

মেয়েমানুষের পকেট কোথায়? আঁচল। টাকার নামে মূর্চ্ছা যায়। বাপের বাড়ি থেকে নোট গেঁথে গেঁথে নিয়ে এসেছে। তার উপরে আমার পুরো মাসের মাইনে। ঘরে স্বামীরত্ন ঘুরছে তাই বোধহয় বাক্সপেটরায় ভরসা পায় না, আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। বলি, রসো রূপসী, হাতের খেলা দেখাই একখানা। ঘুঁটে ধরিয়ে উনুনের উপর কয়লা চাপাচ্ছে। ধোঁয়ায় অন্ধকার। সেয়ানা বেশি কিনা—নোট-বাঁধা আঁচলের মুড়ো ফেরতা দিয়ে কোমরে গুঁজেছে। আমি বসেছি গিয়ে পাশে, কোমর থেকে আঁচল টেনে বের করেছি। কিছু জানে না। ভোঁতা কাঁচির পোঁচে পোঁচে কাপড় কেটেছি, মরি—বাঁচি তখনো উনুনে পাখা করে যাচ্ছে।

হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল নফরকেষ্ট।

সুধামুখী বলে, তবে আর যাচ্ছ না ফিরে। চুকিয়েবুকিয়ে চলে এসেছ, বুঝলাম।

যাতে আর কোনদিন না যেতে হয়, সেই ব্যবস্থা করে এসেছি।

পকেট থেকে নফরকেষ্ট ধাঁ করে বউয়ের আঁচলের কাটা টুকরো বের করে ধরে। বলে, পাড়টুকু ছিঁড়ে বাহুতে ধারণ করব! আমার ব্রহ্মকবচ।

আবার একচোট হাসি। হাসি থামিয়ে বলে, ছেলেবয়সে দিদিমা এই মোটা আমার মাদুলি হাতে বেঁধে দিয়েছিল—ব্রহ্মকবচ, ভূতপেত্নী পেঁচো-দানোর নজর লাগবে না। এবারেও তাই। বউয়ের জন্যে কালেভদ্রে যদি মন আনচান করে ওঠে, শাড়ির আঁচলের দিকে তাকালেই ব্যাধি ঠাণ্ডা—মনে পড়ে যাবে পূর্বাপর সমস্ত।

সুধামুখীও হাসতে হাসতে ভাত নামাতে গেল।

আর ওদিকে ঘাটের উপর রানী এসে সাহেবকে ধরেছে: যা বলেছিলে সত্যি-সত্যি তাই খাটল গো সাহেব। মা-কালী কথা কানে নিচ্ছেন না। বকাবকি করবে বলে তোমায় বলিনি। পরশুদিন মায়ের কাছে একশিশি তরল-আলতা চেয়েছিলাম। তোমার সেই মন্তর পড়ে সিগারেটের জায়গায় বললাম আলতা।

সাহেব জিভ কেটে বলে, সর্বনাশ করেছিস তুই। আলতা এখন রক্ত হয়ে গলা দিয়ে গলগল করে না বেরোয়!

ভীত হয়ে রানী বলে, রক্ত বেরুবে কেন গলা দিয়ে? কী করলাম?

মায়ের কাছে পায়ের আলতার হুকুম—উঃ, কতখানি সাহস রে তোর!

মা চটিজুতো দিলেন, সে-ও তো পায়ের। পায়ের চেয়ে বড় হয়েছে মাপে। আনকোরা নতুনও নয়। তবু দিয়েছেন তো তিনি। জুতো দিতে পারেন, আলতায় তবে দোষ হবে কেন?

কথা জোগানো থাকে মেয়েটার জিভের ডগায়। পেরে ওঠা দায়।

সাহেব বলে, পা ছুঁয়ে মা তো মাপ নিতে পারেন না, সেই জন্যে জুতো বড় হয়েছে। কিন্তু একবার দিয়েছেন বলে তোর নিজের একটা আক্কেল-বিবেচনা থাকবে না? চটেছেন কিনা দেখ বুঝে। এতবার এ-রকম জিনিস এল, আলতার বেলা কেন ডুব মারলেন?

রানী বলে, বেশ, আলতা বাদ দিয়ে গন্ধতেল চাইব এক শিশি। মাথায় মাখবার জিনিস, এতে কোন দোষ নিতে পারবেন না। আমার লাভই হবে—গন্ধতেলের দাম আলতার চেয়ে অনেক বেশি।

মা-কালীর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে অতএব গন্ধতেলের ব্যবস্থাও করতে হয়। কোন কৌশলে হবে, সেটা আপাতত মাথায় আসছে না। চটিজুতোর ব্যাপারে অতি অল্পের জন্য মাথা বেঁচে এসেছে। একে বিয়ে-বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল সাহেব। ফর্সা কাপড়-চোপড় পরেছে, তার উপর এই চেহারা। চেহারাটা সর্বক্ষেত্রে অদ্ভুত কাজ দেয়। কন্যাপক্ষের এক মাতব্বর ডাকলেন: ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন খোকা, আসরে গিয়ে বোসো। তাঁরা ভাবছেন, বরযাত্রী হয়ে এসেছে। বরযাত্রীদের মধ্যে গেলে সরে সরে তাঁরা পথ করে দেন: বর দেখবে খোকা? যাও না, বরের কাছে এগিয়ে বোসোগে। এঁরা ভাবছেন, কন্যাপক্ষের ছেলে। কিন্তু খোকা তো বসবার জন্য ঢোকেনি এ বাড়ি। পাতা করছে ওদিকে, রকমারি খাদ্যের সুগন্ধ আসছে। বসে পড়া যায় স্বচ্ছন্দে, লোভও হচ্ছে খুব। তবু কিন্তু ভোজে বসা চলবে না সাহেবের। সবাই যখন বসে পড়বে, তার কাজ সেই সময়টা। একজোড়া জুতোর মধ্যে পা ঢুকিয়ে সুড়ুৎ করে সরে পড়বে। সে জুতোর বাছাবাছি বিস্তর। চটিজুতো—মেয়েরা যা পরে, সেই জিনিস। চটি হবে লালরঙের এবং হাল ফ্যাশানের। মা-কালী হয়ে পড়ে ফ্যাসাদ কত। সবাই খেতে গেল, ফুটফুটে একটা ছেলে সেই সময় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে। ধরো, নজর পড়ে গেল একজনার। বাৎসল্য বশে সে গিয়ে সাহেবের হাত এঁটে ধরেছে। পায়ের দিকে চোখ গেল—মেয়েদের জুতো বেটাছেলের পায়ে। বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না। তারপর কি হবে?

ভোজ ফেলে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ ছদিক দিয়ে রে-রে করে পড়ল। পেটের চেয়ে হাতের সুখ করেই মজাটা বেশি।

হতে যাচ্ছিল ঠিক এমনিটাই।

ও খোকা, খেতে বসনি যে তুমি? যাচ্ছ কোথা? শোন, শোন—

সাহেব তো চোঁচা ছুট। সে লোকও পিছু ছুটেছে। পিছনে তাকায়নি সাহেব, তবে জুতার শব্দ পেয়েছে বেশ খানিকক্ষণ। ইঁদুরের মতন এ-গলি সে-গলি ছুটে ঘণ্টা ছই পরে সাহেব হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘাটে এসে পড়ল। এসে সোয়াস্তি, গড়িয়ে পড়ল ক্লান্তির চোটে। পায়ের চটি হাতে তুলে নিয়েছিল কিছুদূর এসে। জুতো-পায়ে ছোটা যায় না। এতক্ষণ পরে তৃপ্তি ভরে জুতোর পানে তাকিয়ে দেখে। খাসা জিনিসটা রানীকে মানাবে ভাল। পায়ে কিছু বড় হবে। বেটাছেলে সাহেব যা পায়ে ঢুকিয়ে বেরুল, সে জিনিস বড় তো হবেই মেয়েছেলে রানীর পায়ে। পায়ে পরে বেরুনো ছাড়া জুতো সরানোর নিরাপদ উপায় কি? তা-বড় তা-বড় মহাশয় ব্যক্তিরাও এই পন্থা ধরেন।

কিন্তু একবার দু'বার পাঁচবার সাতবারেও তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আবদারের পর আবদার চলল একনাগাড়ে। গতিক দাঁড়িয়েছে সেই বিধাতা-পুরুষের মতো। সে গল্প সকলের জানা। হবে না, হবে না করে জেলের বাড়ি ছেলে হল। সৎ গৃহস্থ, মিথ্যাচার ফেরেব্বাজির ধার ধারে না—সাচ্চা পথে যা আসে, তাতেই খুশি। সেই জন্যেই গরিব বড্ড। পান্তা খেতে নুন জোটে না। জেলের মা-বুড়ি বিষম ঝানু। আট দিনের দিন রাত্রিবেলা বিধাতা-পুরুষ শিশুর ললাটে ভাগ্য লিখে যান, বুড়ি সেই রাত্রে সূতিকাঘরের ছয়োর জুড়ে শুয়ে আছে। মতলব করেই শুয়েছে, ভাগ্য-লিখনের আগে একটা পাকা-বন্দোবস্ত করে নেবে। নিশিরাত্রে ছ-পহরের শিয়াল ডেকে গেল, ঠিক সেই সময়টা পাকা-চুল, পাকা-গোঁফদাড়ি কানে কলমগোঁজা, হাতে দোয়াত-ঝুলানো ভাবনাচিন্তায় কুঞ্চিত-ভ্রূ বিধাতা-পুরুষ চুপিসাড়ে এসে পড়লেন। এসে সূতিকাঘরের দোরের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন—মেয়েমানুষ ডিঙিয়ে যান কেমন করে? বুড়িও নড়বে না কিছুতে। আড় হয়ে এমনভাবে শুয়েছে—আধ ইঞ্চিটাক ফাঁক নেই, যার মধ্য দিয়ে বিধাতাপুরুষ গলে বেরিয়ে যান। সময় বয়ে যাচ্ছে, ব্যস্ত হয়ে বিধাতাপুরুষ বলেন, একটু সরে শোও বুড়িমা, কাজ চুকিয়ে চলে যাই। ত্রিভুবন-জোড়া কাজকর্ম, দাঁড়িয়ে থাকার ফুরসত নেই।

বুড়ি জো পেয়ে গেছে। বলে, তুমি বিধাতা হাড়-বজ্জাত। আজকে কায়দায় পেয়ে গেছি। আমার ছেলের কপালে ছাইভস্ম কি-সব লিখেছিলে,

সারাজন্ম তার দুঃখধান্দায় গেল। দিনরাত্তির খেটে পেটের ভাতের জোগাড় হয় না। নাতির বেলা সেটা হচ্ছে না। ভাল ভাল সব লিখে আসবে কথা দাও, তবে পথ ছাড়ব। নয়তো কাজ নেই।

বিধাতাপুরুষ বুঝিয়ে বলেন, দেখ মা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ওঁরাই হলেন ওপরওয়ালা। ভাগ্য উপর থেকে ঠিকঠাক হয়ে আসে, কেরানি হয়ে সেইগুলো কপালে লিখে যাওয়া কাজ আমার। পারো তো ওঁদের গিয়ে চেপে ধরো, চুনো পুঁটির উপর তম্বি করে কী ফল?

বুড়ি ক্ষেপে গিয়ে বলে, পাচ্ছি কোথা মুখপোড়া দুটোকে? কৈলাসে আর গোলকধামে লুকিয়ে বসে থাকে, নিচে মুখো হয় না। ঢাকঢোল পিটে পুজোআচ্চা করে কত তোয়াজে লোকে ডাকাডাকি করে—নৈবিদ্যির লোভ দেখিয়ে ভুলিয়েভালিয়ে খপ্পরে একবার আনতে পারলে হয়, তখন আর ছেড়ে কথা কইবে না। তারাও কম সেয়ানা নয়, বোঝে সমস্ত। যত যা-ই কর, কানে ছিপি এঁটে বসে আছে। অবিচার অনাচার তো কম হচ্ছে না—বাগে পেলে কৈফিয়ৎ চাইবে। সেই ভয়। সেইজন্য দেখা দেয় না।

বলে বুড়ি একেবারে চুপ। বিধাতাপুরুষ কত রকম খোশামুদি করেন, কিন্তু গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে সে। এদিকে রাতের মধ্যে মর্ত্যাধামের কাজ সারা করে ফিরতে হবে। না হলে বিষম কেলেঙ্কারি—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর তিন যুগের মধ্যে যা কখনো হয়নি।

তখন বিধাতা পুরুষ বলেন, শোন বলি ভালমানুষের মেয়ে। জেলের বেটার হাতে তো রাজদণ্ড দেওয়া যাবে না, জালই হাতিয়ার। তোমার খাতিরে খানিকটা আমি বাড়িয়ে লিখে যাচ্ছি— জাল ফেললে ভাল মাছ একটা অন্তত পড়বেই। নাতির অন্নের অভাব হবে না। লেখার প্যাঁচে এইটুকু করে যাব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু ধরতে পারবেন না।

বিধাতার মুখ দিয়ে যা বেরুল, তার অন্যথা হবে না। একটুখানি ভেবে নিয়ে বুড়ি পথ ছেড়ে দেয়। আর খলখলিয়ে হাসে আপনমনেঃ ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। যে কথা বলে ফেলছ ঠ্যালাটা বুঝবে হাঁদারাম ঠাকুর।

বড় হল সেই নাতি। নাতিকে বুড়ি গাঙে খালে জাল ফেলতে দেয় না। বলে, জাল ভিজে যাবে, গায়ে কাদা লাগবে তোর। কোথায় পাতবি রে আজকের জাল? আমি বলে দিচ্ছি—বাড়ির উঠানে।

রাত দুপুরে জালে জড়িয়ে গিয়ে রুইমাছ উঠানের উপর লেজের ঝাপটা দিচ্ছে।

পরের রাত্রে জাল কোনখানে পাতবে ? ঘরের চালে। খানিক পরে চালের উপর যথারীতি মাছের আফালি।

বুড়ি বলে দেয়, উই যে লম্বা তালগাছটা—সাঁশটাশ বেঁধে কষ্ট করে ওর মাথায় উঠে আজ জাল পেতে আসবি।

বিধাতাপুরুষ তো নাকের জলে চোখের জলে। জলে জাল ফেললে তাড়িয়েতুড়িয়ে একটা মাছ জালে ঢোকালেই হয়ে যেত! এখন নিজেকেই জলের মাছ ধরে কাঁধে বয়ে কখনো ঘরের চালে উঠে, কখনো বা গাছের মাথায় চড়ে জালে ঢুকিয়ে আসতে হয়। বুড়ো হয়ে পড়েছেন, চোখে আবছা দেখেন—বেকায়দা পা ফেলে হুড়মুড় করে নিচে না পড়েন, প্রতিক্ষণে এই ভয়। অথচ না করে উপায় নেই, দেবতার বচন মিথ্যে হয়ে যাবে তা হলে।

বুড়িরও দুর্বুদ্ধির অন্ত নেই। সুঁইকাটা ও সেঁজির জঙ্গলে ভরা একটা জায়গা—দিনের আলোয় অতি-সতর্ক হয়ে ঢুকলেও আট-দশ গণ্ডা কাঁটা ফুটে যাবে—নাতিকে বলছে, ঐ কাঁটাবনে জাল পেতে আয় দিকি। রাগে রাগে বিধাতাপুরুষ খড়ি পেতে হিসাবে বসলেন—কদ্দিন আর জ্বালাবে বুড়িটা, কত বছরের পরমায়ু। সে-ও দেখলেন, বিশ বছর এখনো। এই বিধাতাপুরুষই একদিন অঢেল পরমায়ু কপালে লিখে দিয়েছেন, এমনি করেই তারা শোধ তুলছে। নাতিটা বুড়ির বুদ্ধি শুনে অস্থানে-কুস্থানে জাল পেতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেবে, বিধাতাপুরুষ তখন জল ঝাঁপিয়ে মাছ ধরে বেড়াবেন, মাছ না পেলে জেলেদের জিয়ানো মাছ চুরি করে এনে মহিমা বজায় রাখতে হবে। বিশ বছর ধরে প্রতিরাত্রে এই কাণ্ড। গোঁয়ার জেলেগুলো টের পেলে পিটিয়ে আধ-মরা করবে। জাল হাতে নিয়ে তবু করে বেড়াতে হবে এই সব। দেবতা হওয়ার গেরো এমনি।

সাহেবেরও ঠিক বিধাতাপুরুষের দশা। রানীর কাছে কী কুক্ষণে ঐ দেবতা হল, সারাজীবনে দেবতাগিরি ছাড়ল না। কত জায়গায় কতবার দেবতা হয়েছে! দেবতা আর সিঁধেল চোর উভয়েই অন্তর্যামী। আশালতার বর হয়ে সেই যে গয়না সরাল (আসল বরেও গয়না সরায়, সাহেব স্বচক্ষে দেখেছে) —আরও একবার সিঁধ কেটে তার ঘরে ঢুকেছিল। আশালতার শ্বশুরবাড়ি—বরের সঙ্গে সেই ঘরে সে আছে। পাকা দালানে বড় কষ্টে সিঁধ কাটা—কিন্তু ঢুকে পড়ে শুধুমাত্র দেবতার কাজ করে বেরিয়ে আসে। বর বউয়ে ভাব জমিয়ে দিয়ে। ডেপুটির কাছে মিথ্যা জবাবদিহি করে, কারিগরের পক্ষে যার চেয়ে বড় অন্যায় হয় না।।

কাজ একখানা নেমে যায়, হয়তো পনের-বিশ মিনিটে। কিন্তু গোড়া

বাঁধতে হয় বিস্তর কাল ধরে। দরকারি ছাড়া বেদরকারিও কত বস্তু নজরে এসে যায়। সাহেবের ওস্তাদ পচা বাইটার নিজেরই এক ব্যাপার। পচার বুড়ি-মা হাঁপানি-কাশিতে ভুগছে, ভাল পুরানো-ঘি মালিশের প্রয়োজন। খান তিনেক গ্রাম পার হয়ে গিয়ে চকদার পুঁটে চক্কোত্তির বাড়ি—পচা বাইটা চক্কোত্তির কাছে গিয়ে পুরানো-ঘি চাইল।

চক্কোত্তি আকাশ থেকে পড়েন: আমি কোথা পুরানো-ঘি পাবো?

পচা বাইটার নাম জানেন চক্কোত্তি, দস্তুরমতো সমীহ করেন তাকে। বলছেন, পুরানো-ঘি নেই আবার বাড়ি। থাকলে তোমার কাজে একটুখানি দিতে আপত্তি কেন?

সত্যি জানেন না?

পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করছি পঞ্চানন।

পচা বলে, হতে পারে। আপনার পিতামহ রামকিশোর চক্কোত্তি মরবার সময় বলতে ভুলে গেছেন। পূবের ঘরে যে সুঁদুরের খুঁটি আছে, তার গোড়ায় খুঁড়ে দেখুন। আমার সামনে খুঁড়ুন। রামকিশোর চক্কোত্তি মেটে ভাঁড়ে পাঁচ সের ঘি পুঁতেছিলেন পুরানো-ঘি করবার জন্য। বছর চল্লিশ মাটির নিচে আছে।

সত্যি সত্যি ঘিয়ের ভাঁড় পাওয়া গেল। চল্লিশ বছর আগে খোজদারির কাজে এসে পচা বাইটা দেখে গিয়েছিল। বাড়ির কেউ জানে না, পচা এসে ঠিক ঠিক বলে দিল। তবে আর অন্তর্যামী নয় কিসে?

নফরকেষ্ট এক গাদা গয়না নিয়ে এলো। মাথার চুল থেকে পায়ের আঙুল অবধি—যেখানে যেটি পরতে হয়। বলে, যা-কিছু ছিল, বেচে খেয়ে তো বসে আছ। পরো দিকি—মানায় কেমন দেখা যাক।

নফরকেষ্টর রকম দেখে সুধামুখী হাসে: বুড়ো হয়ে গেলাম, ছেলে বড় হয়ে গেছে, এখন এই পরতে যাচ্ছি!

তা পরবে কেন! ভস্ম-মাখা সন্ন্যাসিনী হয়ে থাক। আবার বল, মানুষ আসে না: আসবে কেন শুনি? বলি, মানুষ তো এ-পাড়ায় যোগ তপস্যা করতে আসে না। সেই ইচ্ছা হলে শ্মশানে-মশানে যাবে।

কথা যা বলছে সত্যি। ভেক নইলে ভিখ মেলে না। তবু ইতস্তত করে সুধামুখী। গয়না নাড়াচাড়া করে, হাসে ফিকফিক করে। নফর কেষ্ট আগ্রহ ভরে তাকিয়ে। সুধামুখী বলে, পেটের দায়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় কিন্তু সত্যি বলছি বড লজ্জা আমার এখন। ছেলের চোখের উপর দিয়ে যাইনে। সাহেবও বোঝে, তখন সে বাড়ির ত্রিসীমানায় থাকে না।

কথায় কথা এসে পড়ে। সুধামুখী বলে, তোমায় আসল যে কথাটা বললাম, তার কিছু করলে না এখনো। রাত্রে কেন সাহেব ঘাটে পড়ে থাকবে, একটু শোয়ার জায়গা করে দাও বাড়ির মধ্যে। বড় কষ্ট ওর, কষ্ট আমারও। কোথায় কি পড়ে আছে, শোওয়ার আগে একটিবার দেখে আসি। না দেখে পারা যায় না। লণ্ঠন হাতে করে ঘাটে ঘাটে ঘুরি। এক রাত্রে খুঁজে খুঁজে আর পাইনে। শেষটা যা দেখলাম—মাগো মা, মনে পড়লে এখনো বুক কাঁপে। সিঁড়ির রানার উপর বসেছিল বোধহয়, অমনি ঘুম এসে গেছে। অথবা গুমোট গরম বলে ইচ্ছে করে বাবু গিয়ে জলের ধারে শুয়ে পড়েছে। এগিয়ে দেখি, জোয়ারের জল উঠে রানার উপরটাও প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ইঞ্চিখানেক হয়তো বাকি। আর একটু হলে সাহেবকেও নিয়ে যেত—একদিন ভেসে এসেছিল, আবার তেমনি যেত চলে। অমন আর না শোয়, কড়া করে বলে দিয়েছি—গিয়ে গিয়ে দেখেও আসি। কে জানে কোন বেপরোয়া হতচ্ছাড়া বাপের বেটা—একতিল ওকে আমি বিশ্বাস করিনে। ভয়ে কাঁপি সর্বদা। ছেলের ব্যবস্থা তুমি সকলের আগে করে দাও নফর।

নফরকেষ্ট বলে, বাঁশ দড়ি হোগলা দেখে দরদাম করে এসেছি। কাল হবে। কাল সন্ধ্যের মধ্যে সাহেববাবুর আলাদা ঘর। কিন্তু আমি যে পয়সা খরচা করে জিনিসগুলো নিয়ে এলাম, একটিবার পরে দেখাবে না?

খরচ করে ভালবেসে দিচ্ছে, কে দেয় এমন। গয়না নিয়ে সুধামুখী পরছে একটি একটি করে। সাহেবের কথার শেষ হয় না—মুচকি হেসে আবার বলে, সবই তো হল নফরকালি কিন্তু ছেলে দিনমানেই বা এমন পথে পথে ঘুরবে কেন? করপোরেশনের ইস্কুলে মাইনেকড়ি লাগে না—এক একবার ভাবি, ঐখানে জুড়ে দিলে কেমন হয়!

এবার নফরকেষ্ট এক কথায় সায় দিতে পারে না: ইস্কুলে যাবে সাহেব—ইস্কুলে গিয়ে কোন চতুর্ভুজ হবে?

সুধামুখী উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বড়ে, হাতের লেখা মুক্তোর মতো। ছাপা বই বানান করে পড়ে যায়। আমি একটু-আধটু বলে দিই, বাকি সমস্ত নিজের চেষ্টায়। কে জানে কোন বড় বিদ্বানের বেটা—যেমন সাফ মাথা তেমনি স্মরণশক্তি। ছ-মাস এক বছর যদি একটু মাস্টারের কাছে বসতে পায়, সাহেব আমাদের কী হয়ে দাঁড়াবে দেখো। বিদ্যের কত কদর, তুমিই তো বলে থাক। তোমারই ছোটভাইয়ের কাজ গদি-মোড়া চেয়ারে বসে দশ-বিশটা সই করা, দুটো-চারটে হুকুম-হাকাম ছাড়া। সেই কারখানার আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণ তোমায় সিদ্ধ হতে হয়। মাইনের বেলাও ভাইকে দেয় চারগুণ।

এইসব তুলনা এবং বিদ্যার গুণাগুণ নফরকেষ্টর ভাল লাগে না। এড়িয়ে যেতে চায়। সুধামুখীকে তাড়া দিচ্ছে: হল তোমার? হাত চালিয়ে পরো। সেই পুরানো ডেরায় যাব একবার। রুজি-রোজগারে নামতে হবে। বউয়ের টাকা প্রায় তো ফুঁকে এলো।

এই স্বভাব নফরকেষ্টর। একটা কাজ করে সেই মুহূর্তে ফলাফল দেখতে চায়। গয়না পরা হয়ে গেল। নফর ধাঁ করে খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘাড় কাত করে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। টিকলিটা সরিয়ে কপালের ঠিক মাঝখানে এনে দেয়। শেষ পোঁচড়া মেরে কুমোর যেমন এগিয়ে পিছিয়ে নিজের হাতের প্রতিমা দেখে। দেখে নফর প্রসন্ন হল: বাঃ বাঃ, তুমি নাকি মন্দ! গয়না পরে মেয়েমানুষগুলো একেবার আলাদা হয়ে যায়। আমার ঝানু বউ ষোলআনা সেটা জানে, সারা দিনমান গয়নার ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। শুয়ে পড়লে গায়ে ফোটে—রাত্তিরবেলা ঘরে এসে তাই গয়না খুলত। তখন দেখতাম। বলব কি সুধামুখী, রূপ সঙ্গে সঙ্গে সিকিখানা। পিদিম নেভালে যেমন সব অন্ধকার হয়ে যায়।

একগাল হেসে বলে, তোমারও ঠিক তাই। গয়নার বাহার খুলে দিয়েছে। কিন্তু বেশি পরে থেকো না, গিল্টি চটে ভিতরের মাল বেরিয়ে পড়বে। সারাক্ষণের গরজই বা কি—এই সন্ধ্যের দিকে ঘণ্টা তিন-চার গায়ে থাকবে। এসব হল ব্যবসার সরঞ্জাম। আমার কাঁচিখানা কাজে অকাজে কেবলই যদি চালাই, ধার ক'দিন থাকবে? আর বলে দিয়েছে, আমরুল-পাতা কিম্বা সিদ্ধ-কাঁচাতেঁতুল দিয়ে মাসে একবার করে মেজে নিতে। গয়না চকচক করবে, চেকনাই এক-পুরুষ দু-পুরুষ বজায় থাকবে।

সুধামুখী বলে, দেখতে কিন্তু অবিকল গিনিসোনা। তফাৎ ধরা যায় না।

নফরকেষ্ট বলে, গিল্টির যুগ চলেছে—দুনিয়াসুদ্ধ এই। চোখের দেখা নিয়ে ব্যাপার—কষ্টিপাথর নিয়ে কে ঠুকে দেখতে যাচ্ছে? এ বাজারে খাঁটি সোনার কাজ যারা করে, তারা হল পয়লানম্বরি আহাম্মক।

সুধামুখীও মনে মনে মেনে নেয়। আদরের মেয়েকে পারুল শখ করে মাকড়ি কিনে দিল, তা-ও গিল্টি। শুধু গয়নাই বা কেন, গয়না-পরার মানুষগুলো অবধি গিল্টি।

দরজার পাশে খাসা একটুকু জায়গা। দু-কোদাল মাটি ফেলে জায়গাটা আরও একটু না হয় উঁচু করে দেওয়া যাবে। মাথার উপরে হোগলার আচ্ছাদন।

সাহেবের শোবার জায়গা। রাজ-অট্টালিকা হার মেনে যায়। খাসা হবে, সুধামুখী বলেছে ভাল।

নফরকেষ্টর যে কথা সেই কাজ। হোগলা বাঁশ পরের দিনই এসে পড়ল। আর একজন ঘরামি মিস্ত্রি। মিস্ত্রির সঙ্গে নিজেই সমস্তটা দিন জোগাড় দিচ্ছে। যত ভাবছে, ততই খুশি হয়ে ওঠে। জল খেতে একবার সুধামুখীর রান্নাঘরে গিয়েছে, বলে, বেড়ে বুদ্ধি বের করেছ তুমি। দরজার পাশে শুয়ে থেকে সাহেব আমারও দোর খুলে দেবে। কড়া নেড়ে বাড়িসুদ্ধ লবেজান করতে হবে না। একবার একটুখানি ওঠা—তারপরে ঘুমোক না পড়ে পড়ে রাতভোর এক পহর বেলা অবধি ঘুমোক—ঘাটের লোকের মতো কেউ খিঁচোতে যাচ্ছে না।

ছাউনি সারা হয়ে গেল। নফরকেষ্ট কখনো পিছিয়ে, কখনো ডাইনে কখনো বা বাঁয়ে ঘুরে মুগ্ধ চোখে দেখছে। গয়না পরিয়ে সুধামুখীকে দেখেছিল যেমন কাল। হাঁ, সত্যিকার ঘরই বটে! বসা যায়, দাঁড়ানো যায়। —পুরোপুরি পা মেলে টান-টান হয়ে শোওয়া যায় কিনা, তারও একটা পরীক্ষা হওয়া নিশ্চয় উচিত।

সাহেব অদূরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ঘর বাঁধা দেখছে। নফরকেষ্ট ডাক দেয়: দেখিস কী রে ছোঁড়া! কলকাতার উপর এমন একখানা আস্তানা—লাটসাহেব পেলেও তো বর্তে যাবেন। মাদুর নিয়ে এসে লম্বা হয়ে পড় দিকি এইবারে।

ডাকছে সাহেবকে, কিন্তু ডাক নয়—মেঘগর্জন। গলার স্বর আর কথাবার্তার ধরনই এই। চেহারায় ও কণ্ঠে মণিকাঞ্চন যোগাযোগ হয়েছে। পারতপক্ষে কেউ সে জন্যে কাছ ঘেঁসে না। নানান কথা নফরকেষ্টকে নিয়ে—সে নাকি ডাকাত, খুনই করেছে পনের-বিশটা, তার মধ্যে বিনা অস্ত্রে হাতের থাপ্পড়েই বা কত! দেখে তাই মনে হবে বটে। এ হেন চেহারা সত্ত্বেও নিস্ফলা ফেরে না কেবল তার হাতখানার গুণেই। আহা-মরি কী একখানা হাত—অতি-সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। হাত নিয়ে নফরার বড্ড দেমাক।

নফরা বলছে, শুয়ে পড় সাহেব, দেখব। সারাদিন রোদে খেটে চেহারা আজ আরও উৎকট। শুতে বলছে, কাঁচা মাটির উপর—শুইয়ে ফেলে তারপরে কি করবে, কে জানে। ভয় পেয়েছে সাহেব, থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাধ্যপনায় নফরকেষ্ট রেগে গেল। গর্জনই এবার সত্যি সত্যি: হাঁ করে দেখিস কি! কথা বুঝি কানে যায় না? মাদুর নিয়ে চোদ্দ পোয়া হয়ে পড়! চিত হয়ে শো, কাত হয়ে শো—জায়গায় কুলোয় কিনা দেখতে চাই।

কিন্তু তার আগেই ভীত সাহেব বোঁ করে ছুট দিয়েছে। তবে রে—বলে

নফরকেষ্টও ছুটল। রোখ চেপেছে—ধরে ঐখানে এনে শোয়াবে। এখনই এই মুহূর্তে। তার যে স্বভাব—কাজ করলে ফলাফলটা চাই নগদ নগদ। সুধামুখী রান্নাঘরে তখন। ছুটতে ছুটতে সাহেব সেখানে গিয়ে পড়ে। একেবারে কোলের পাশটিতে। চোখ পাকিয়ে বাইরে তাকিয়ে সুধামুখী নফরকেষ্টকে দেখতে পায়।

ঐ তো মানুষ সুধামুখী—কালো চামড়ায় ঢাকা হাড় কয়েকখানা। রেগে গেলে তখন ভিন্ন মূর্তি। নফরকেষ্ট হেন দৈত্যব্যক্তি কেঁচো একেবারে। সুধামুখী হুমকি দিয়ে ওঠে: কী হয়েছে?

নফরকেষ্ট মিনমিনে গলায় বলে, ছোটবেলা রান্নাঘরে সেই গোল হয়ে শুত। চিরদিন কেন একভাবে কষ্ট করবে? বলছিলাম, পা ছড়িয়ে একবার শুয়ে পড় বাবা। না কুলোলে জায়গা বাড়িয়ে দিতে হবে।

সুধামুখী রায় দিল: সে আমি দেখব। সরে পড় এখন তুমি। ছেলে ভয় পেয়ে গেছে।

মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে নফর চলে যাচ্ছে, সুধামুখী ডাকল: একটা কথা শুনে নাও। এদ্দিন যা হয়েছে, চালচলন বদলে ফেল এবারে। ভদ্দর হয়ে বেড়াবে। তোমার এই ভূতের মূর্তি দেখে ছেলে ভয় পায়। আমরাই আঁতকে উঠি, সে তো ছেলেমানুষ!

নফরকেষ্টর মনে বড় লাগল। বলে, মূর্তি এমনধারা হয় কেন, সেটা তো একটুখানি ভেবে দেখবে! হোগলা এক বোঝা নিজে মাথায় করে পোলের ঘাট থেকে নিয়ে এসেছি। সারাক্ষণ তারপরে ঘরামির সঙ্গে খাটনি। এসব তো চোখে পড়বে না, মূর্তিটারই দোষ হয়ে গেল।

সুধামুখী বলে, তোমার কথাবার্তাগুলোও ঠেঙা-মারা গোছের। সেই জন্যে কেউ দেখতে পারে না। নিজের বউও না। নরম হয়ে মিষ্টি করে বলতে শেখ এবার থেকে।

রাগে নফরার ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলল। আপন মনে গজর-গজর করছে: ঘরে নবকার্তিকের উদয়—মদনমোহন বেশে ফ্লোট-বাঁশি বাজিয়ে আমায় কথা বলতে হবে।

সুধামুখী জিজ্ঞাসা করে, কি বলছ নফর?

নফরকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে, নরমশরম হয়ে খুব মিঠে সুরেই বলব এবার থেকে। মনে মনে মহলাটা দিয়ে নিচ্ছি।

ঐ যে বলে দিল সুধামুখী, সত্যিই এর পরে নফরকেষ্ট সাহেবের সঙ্গে হেসে ছাড়া কথা বলে না। নফর হেন লোকের পক্ষে আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে

কথা বলা এবং কথায় কথায় হাসির ভাবে দাঁত বের করা—সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। ওর চেয়ে দশ ঘা লাঠি খাওয়া অনেক ভাল। তবু কিন্তু হাসতে হয় এবং গলা দিয়ে মোলায়েম আওয়াজও বের করতে হয়। না করে উপায় কী?

একদিন দৈবাৎ মেজাজ হারিয়ে ফেলে। বর্ষার রাতদুপুরে ভিজে এসে তুরতুর করে কাঁপছে। দরজায় ঘা দিচ্ছে—ডেকে ডেকে সারা হল, সাহেবের সাড়া নেই। অথচ বৃষ্টির ছাট আসে বলে মাথার উপরের হোগলা ছাড়াও জায়গাটার চতুর্দিক দরমা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। খেয়াল করে নিজেই সব করেছে, কেউ বলে দেয়নি--আহা, ভিজে যায় ছেলেটা, ঘুমের মধ্যে বুঝতে পারে না! আর অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে নফরকেষ্ট ডাকাডাকি করে মরছে—জেগেও পড়েছে সাহেব, কিন্তু কম্বল আর চট গায়ে জড়িয়ে গুটিসুটি হয়ে আছে। আলস্য লাগছে, উঠতে ইচ্ছে করে না। তারপর নিতান্ত যখন দোর ভাঙাভাঙি শুরু করল, উঠে হুড়কো খুলে দেয়। নফরকেষ্ট অমনি ঠাস করে মারে এক চড়।

চড় মেরেই বিপদ বুঝেছে। শব্দ বেরুনোর আগেই সাহেবের মুখে হাত চাপা দিল। কাতরাচ্ছে: কাঁদিসনে বাপধন আমার। আমি এর শতেক গুণ মারগুতোন খেয়ে থাকি। মেরে মেরে লোকের হাত ব্যথা হয়ে যায়, তবু এক ফোঁটা চোখের জল বের করুক দিকি। সামান্য এক চড়ে গলে পড়বি তো কিসের পুরুষমানুষ তুই?

পুরুষালির গৌরবে সাহেব চোখের জলটা মুছে ফেলে, কিন্তু ফোঁপাচ্ছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, কেন মারবে আমায় তুমি? কী করেছি?

ঝোঁকের মাথায় হয়ে গেছে, বলছি তো! ঘাট মানছি। তোর বাপ থাকলে সে মারত না? ধরে নে তাই—আমি তোর বাবা। বাপের মতনই করি তোর জন্যে। শোওয়ার জায়গা ছিল না, পথে ঘাটে শুয়ে বেড়াতিস—গাটের পয়সা খরচা করে সেই সঙ্গে গতরে খেটে ঘর বানিয়ে দিলাম। মারই দেখছিস, ভাল কাজগুলো একবার তো ভেবে দেখবি! পুরুষ হয়ে জন্মেছিস, কত জায়গায় কত মার খেতে হবে। একটা চড়ে ঘাবড়ে গেলে হবে কেন?

মুখের কথায় কতদূর চিঁড়ে ভিজবে, ভরসা করা যাচ্ছে না। লেন-দেনে আসাই নিরাপদ। নফরা বলে, বেশ তো, যেমন মেরেছি রসগোল্লা খাওয়াব তোকে। সেদিন হয়েছিল, কাল সকালে আবার একদফা। যতবার মারব, ততবার খাওয়াব—এই কথা রইল। সকালবেলা দোকানে নিয়ে যাব। না

নিই তো বুক ছেড়ে তখন কাঁদিস। কান্না তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এখন মুলতুবি রেখে দে!

পরদিন বেরোবার মুখে নফরকেষ্ট সত্যিই সাহেবকে ডাকছে: চল—

মনমেজাজ রীতিমত ভাল। সাহেবের উপর বড় খুশি, চড় খাবার কথা সাহেব সুধামুখীকে বলে নি। বলে, মনে পড়ছে না? রসগোল্লা খেতে হবে যে দোকানে গিয়ে। আমায় এত ডরাস কেন বল দিকি? বাপকে যখন চিনিসনে, সে বাপ তো আমার মতোও হতে পারে। চেহারা খারাপ হলেই বাপ বাতিল করে দিবি?

হাতে ধরে টান দেয়। লোহার সাঁড়াশি ঐ হাতখানা—সাহেবের নরম কবজি বুঝি গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যায়। আদর করে ধরেছে—রাগ করে ধরলে কী কাণ্ড না জানি!

ময়রার দোকানে গিয়ে উঠল। ময়রা পিতলের গেলাসে জল দিয়ে শালপাতা বের করে। নফরকেষ্ট হাঁ-হাঁ করে ওঠে: পাতায় কী ছেলেখেলা হবে গো! ওতে ক'টা মাল ধরবে? রস গড়িয়ে বাইরে যাবে। মালসা বের কর দিকি—দু-জনের দুটো মালসা।

সাহেব সভয়ে বলে, ওরে বাবা! পুরো মালসা খেতে হবে?

নফর সদয়ভাবে বলে, তুই ছেলেমানুষ, দশ-বারোটা না হয় কমই নে আগে। এই তো দুনিয়ার নিয়ম—যত মার, তত রসগোল্লা। এই লোভেই তো বেঁচে থাকা।

ময়রাকে ডেকে বলে দেয়, ছোট মালসা দাও ছোট মানুষটাকে। আমায় বড়। রস নিংড়ে দিও না, তাহলে অর্ধেক দাম। রসগোল্লা খেয়ে নিয়ে বাড়তি রসে চুমুক দেব।

সাহেবকেই সালিশ মানে: কী বলিস তুই—অ্যাঁ? পয়সার মাল চেটে-পুঁছে খাব। বড্ড কষ্টের পয়সা রে—

ময়রা মালসা ধুচ্ছে ওদিকে গিয়ে। সেই ফাঁকে নফরকেষ্ট মনের কথাটা বলে নেয়: বয়স হয়ে চেহারা বেটপ হয়ে গেছে, একলা রোজগারের আর তাগত নেই। তুই আমার ডেপুটি হবি সাহেব? ডেপুটি বলিস কি খোঁজদার বলিস। একেবারে সোজা কাজ। ঘোরপ্যাঁচ যেটুকু, সে রইল আমার ভাগে। সুধামুখীকে বলবিনে কিন্তু—খবরদার, খবরদার! কাউকে বলবি নে, মা-কালীর কিরে। তোকে যদি কাজের মধ্যে পাই, বাপে বেটায় আমরা ধুন্ধুমার লাগিয়ে দেব। যাবি?

রসগোল্লা এসে পড়ায় পরামর্শ টা চাপা পড়ল। সময় নষ্ট না করে নফরকেষ্ট

আরম্ভ করে দিয়েছে! কী তাজ্জব কাণ্ড—সাহেব নিজে খাবে, না নফরের খাওয়া দেখবে তাকিয়ে তাকিয়ে? তাই বটে, অমন পাথুরে গতর এমনি হয় না। রসগোল্লা সোজাসুজি সে গালে নেয় না। বাহার হয় না বোধকরি তাতে। ছুঁড়ে দেয় উপরমুখে, হাঁ করে তারপর গালে ধরে নেয়। পল্লীগ্রামে নাটাখেলা দেখা আছে—কিম্বা গুঁটিখেলা? অবিকল সেই বস্তু। গোড়ায় একটা করে ছুঁড়ে দিচ্ছে, হাত এসে গেলে তখন দুটো তিনটে চারটে অবধি। শেষটা এত দ্রুত, যে নিরিখ করা যায় না চোখে। লম্বাপানা একটা বস্তু তীরবেগে খানিকটা উপরে উঠে ভেঙে এসে মুখগহ্বরে ঢুকছে, এইমাত্র বোঝা যায়। কোঁত-কোঁত করে গিলে খাওয়ার আওয়াজ—গালের মধ্যে বস্তুগুলো তিলেক দাঁড়াতে দেয় না, গিলে ফেলে পরবর্তীর জায়গা খালি করছে।

খেয়ে ঢেকুর তুলে তার উপরে ঢকঢক করে গেলাস দুই-তিন জল চাপান দিয়ে তখন সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়ে। হতাশ ভাবে বলে, নাঃ, কোন কাজের নোস তুই। পরের পয়সায় খাবি, তা-ও পেরে উঠলিনে। নিজের পয়সায় হলে তো বাবুভেয়ের মতন আধখানা কামড়ে রেখে দিতিস। খাটতে হবে তোর পিছনে—কাজ শেখাতে হবে, খাওয়াও তো শেখাতে হবে দেখছি।

রাস্তায় নেমে সেই নতুন কাজের আরও ভালো করে হদিস দিয়ে দিচ্ছে: আজকের দিনটা থাক, কাল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ব—উঁ? পয়সাকড়ি তোর আমার কাছে না থাক, হাজার হাজার মানুষ নিয়ে ঘুরছে। ধনদৌলতের দেবতা কুবের যত হাদারামকে বেছে বেছে টাকা দিয়ে দেন, মুটে হয়ে তারা পকেটে পকেটে বয়ে বেড়ায়। সেইগুলোই ভাণ্ডার আমাদের—খুশি মতন তুলে নিই। নিয়ে তারপরেই ফুর্তিফার্তি, ময়রার দোকানে রসগোল্লার মালসা নিয়ে বসা।

কিন্তু পরদিন সকালে উল্টো কাজ এসে চাপল ঘাড়ে। ইস্কুলে দেবেই সাহেবকে, সুধামুখী ঠিক করে ফেলেছে। নিজেই সেই ইস্কুলে চলে গিয়েছিল। সুধামুখীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনলে তো সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দেবে। গিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির মতো খবরাখবর জেনে এল শুধু! হেডমাস্টার বলে দিয়েছেন, হাঙ্গামা নেই, অভিভাবক ছেলে নিয়ে আসুন, ভর্তি হয়ে যাবে।

নফরকেষ্টকে বলে, তুমি নিয়ে যাও।

ওরে বাবা!

সুধামুখী গরম হয়ে বলে, পয়সা খরচ করতে হবে না—শুধু একটু একটু সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। তাই তুমি পারবে না?

করুণ অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে নফরকেষ্ট বলে, ভয় করে আমার।

কিসের ভয়?

দৈত্যসম মানুষটার ইস্কুল-পাঠশালে বিষম ভয়। শৈশবে তাকেও কিছুদিন যেতে হয়েছিল। একদিন গুরুমশায় এমন ঠেঙানি দিলেন, তারপরে আর কখনো পাঠশালা মুখো হয়নি। সেই আতঙ্ক রয়ে গেছে। খুনে মানুষ লোকে রটনা করে বেড়ায়—ভয়ডর বলতে কেবল এক পাঠশালার গুরুমশায়। ঐটে বাদ দিয়ে নফরকেষ্টকে যমের বাড়ি যেতে বল, হাসতে হাসতে সে চলে যাবে।

সুধামুখী চোখ পাকিয়ে সজোরে দিল ধাক্কা তার পিঠের উপর: যাও বলছি—

কী উপায়—চাকা গড়িয়ে দিলে গড়গড় করে চলবেই—নফরকেষ্ট সাহেবকে নিয়ে চলল। ভয়ের বস্তু ইস্কুল-পাঠশালাই কেবল নয়—সুধামুখীও বেশি। যাচ্ছে, আর গজরগজর করছে: দিগ্‌গজ পণ্ডিত হবে ইস্কুলে গিয়ে, এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে গিয়ে উঠবে!

নফরকেষ্টর সঙ্গে ছেলে ছেড়ে দিয়ে সুধামুখী নিশ্চিন্ত নয়। মানুষটার হাড়হদ্দ জেনে বসে আছে, ইস্কুলে বলে তার ইচ্ছামতো কোন একখানে নিয়ে না তোলে। নিজে চলল পিছু পিছু। ইস্কুলের কাছাকাছি এক গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নজর রাখে।

কতক্ষণ পরে দুজনে বেরিয়ে আসছে। নফরকেষ্ট হাসিতে ডগমগ। চোখ তুলে দূরবর্তিনী সুধামুখীকে এক নজর দেখে নিয়ে চাপা গলায় সাহেবকে উৎসাহ দিচ্ছে: ঘাবড়াসনে। ইস্কুল এক বেলা বই তো নয়। বিকেল আর সন্ধ্যাটা পুরো হাতে রইল। যত ভাল ভাল কাজ সন্ধ্যার পরেই। কপালে লেগে গেল তো রোজগার মুঠোয় ধরবে না। আমি তো বলি ভালই হল, দুটো পথই তোর দেখা হয়ে যাচ্ছে। কোনটায় বেশি মুনাফা এখন থেকে বুঝেসমঝে রাখবি। কলম ঘষে, না কাঁচি ধরে? বড় হয়ে যখন নিজের ইচ্ছেয় সবকিছু হবে, পছন্দমতো বেছে নিস।

সুধামুখী প্রশ্ন করে, হয়ে গেল?

নফরকেষ্ট একগাল হেসে বলে, ছেলের বাপ হয়ে এলাম। পাকা খাতায় রেজিষ্ট্রি-করা বাবা। ছেলে গণেশচন্দ্র পাল, পিতা শ্রীনফরকৃষ্ট পাল।

সুধামুখী রাগ করে বলে, তুমি বাপ হতে গেলে কোন বিবেচনায়? সাহেবের বাপ মস্ত বড়মানুষ, ছেলের চেহারা দেখে যে না সে-ই বলবে। তুমি বড় জোর সে বাপের সহিস-কোচোয়ান।

নফরকেষ্টর মুখের হাসি নিভে গেল। বলে, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করল। বাপের ঠিক নেই, সে ছেলে ইস্কুলে ভর্তি করে না। তখন বলতে তো হবে একটা-কিছু !

সুধামুখী বলে, এমনি তো মুখ দিয়ে তড়বড় করে লম্বা লম্বা কথা বেরোয়। ভাল লোকের নাম একটা বানিয়েও বলতে পারলে না ?

নফরকেষ্ট বলে, মুখে বলে দিলে হয় না, খাতার উপর সই করিয়ে নেয়। বাপের নাম বললাম—নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কি সেনাপতি মোহনলাল। তখন খোঁজ পড়ত কোথায় সেই সিরাজদৌল্লা ?—এসে সই মেরে যাক। নফরকেষ্ট পাল বলে দিয়ে সঙ্গে হাঙ্গামা চুকিয়ে এলাম। কাজটা বড় অন্যায় করেছি !

সুধামুখীকে চুপ করে যেতে হয়। এ ছাড়া উপায় ছিল না বটে। পাকেচক্রে বাপ হয়ে গিয়ে নফরের স্ফূর্তি খুব। সুধামুখী কেবলই দমিয়ে দেয়, ক্ষেপিয়ে মজা দেখে। ইস্কুলে সাহেব ধাঁ-ধাঁ করে এগিয়ে যাচ্ছে, ক্লাসের সেরা ছেলে। সগর্বে সুধামুখী বলে, এঁটো-পাতের ধোঁয়া বলতে, এঁটো-পাত কি ধূপ চন্দন বোঝ এবারে। তুমি এখনো নিজের নামে 'ফ'এর জায়গায় 'ঝ' লিখে বোসো। কোন সুবাদে সাহেব তোমার ছেলে হতে যাবে ? ওর বাপ মস্তবড় পণ্ডিত।

নফরকেষ্ট তর্কে হারবে না : ও লাইন আমি যে বাতিল করে এসেছি। আমার যে লাইন, সাহেবকে সেইখানে ফেলে তবেই বিচার হবে। হাত সাফাইয়ের কাজে নফরা পালকে কেউ যদি কোনদিন হারাতে পারে, সে আমাদের এই সাহেব। কেষ্ঠঠাকুর গোকুলে বাড়ছে।

হাত নিয়ে বড় দেমাক নফরকেষ্টর। অনেক দিন পরের এক ব্যাপার বলি, ফুলহাটায় জগবন্ধু বলাধিকারীর বাড়ি। কাজের গল্প করছে নফরা— যেমন তার অভ্যাস। ভানুমতীর ভোজবিদ্যা কোথায় লাগে নফরার সেই সব কাজের কাছে !

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে আছে। সাহেব তো আছেই। তাজ্জব হয়ে শুনছে সকলে। বলতে বলতে নফরকেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ডান হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বলে, চাঁদি রূপোয় বাঁধিয়ে রাখবার মতো এই হাত। সুড়সুড় করে লোকের পকেটে ঢুকে যায়। সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে পুকুরের মাছ জালে ছেঁকে তোলার মতন সর্বস্ব মুঠোর ভিতর নিয়ে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ত্রিভুবনের মধ্যে বের করো দিকি আমার মতন এমনি একখানা হাত।

কখন এসে বলাধিকারীও দাঁড়িয়েছেন—হাসির শব্দে টের পাওয়া গেল। হাসতে হাসতে বলেন, হাজার লক্ষ রয়েছে নফরকেষ্ট। তোমার হাত কোন ছার সে তুলনায়। টাকাটা-সিকেটা তোমার দৌড়, লাখ লাখ কোটি কোটির নিচে তাদের নজর নামে না। কৌশলও পরমাশ্চর্য—অঙ্গ ছুঁতে হবে না, যার পকেটের যত টাকা ঠিক ঠিক বেরিয়ে কারিগরের কাছে চলে যাবে।

এ হেন গুণী ব্যক্তিদের কথা সবিস্তারে শুনতে কার না লোভ হয়। উৎকর্ণ সকলে। জগবন্ধুও বললেন অনেক কথা। কিন্তু টাকাকড়ি ঘটিত গোলমেলে সব ব্যাপার। মূর্খলোকের বুঝবার নয়। এইটুকু বোঝা গেল, দুনিয়া জুড়ে ছিনতাই। ক্ষিধে ক্ষিধে করে লোক কাঁদছে—সকাল থেকে রাত দুপুর অবধি খেটেও ক্ষিধে মারবার জোগাড় করতে পারে না। আবার ভিন্ন এক দল পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ক্ষিধে নেই বলে কাঁদছে এক চামচ দুধ খেলেও পেটের মধ্যে গিয়ে পাক দেয়। ক্ষিধে কিসে হয়, সেই জন্য কান্না।

গয়নায় কাজ দিচ্ছে যাই বলো। বউয়ের কাছ থেকে মাহাত্ম্য বুঝে এসেই নফরকেষ্ট সুধামুখীকে কিনে দিয়েছে। নানা রকম তুকতাক চলে এদের মধ্যে—মন্ত্র আছে, কবচ আছে, শিকড়বাকড় আছে। ভূতপেত্নী তাড়ানোর ব্রহ্মকবচের কথা সেই বলেছিল নফরকেষ্ট, আবার উল্টো রকমের মনোমোহন—কবচও রয়েছে ভূতপ্রেত কাছে টানা যায় গুণে। আঁধার রাতবিরেতে নাগর রূপে ঘোরাফেরা করে, ভূত বই তারা অন্য কিছু নয়। কন্ধকাটা-ভূত গো-ভূত—তেমনি হল নাগর-ভূত। মনোমোহন-কবচ রাঙা সুতোয় বাম বাহুতে ধারণ করতে হয়। কাজল-পড়া অর্থাৎ মন্ত্রপূত কাজল দু-চোখে পরতে হয়। শিকড়-বাকড়েও নানা রকম বিধি। কিন্তু সকলের সেরা দেখা যাচ্ছে গয়না। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, কাজ পেতে দেরি হয় না।

পথচারীরা ইদানীং দেখছে খুব চোখ মেলে—দেখে সুধামুখী মানুষটা অথবা মানুষটার গা-ভরা গয়না, সঠিক বলা যায় না। নফরকেষ্টর টোপ ফেলে মাছ ধরার কথাটা এখনও খাটে। গয়না হল টোপ, সুধামুখী বড়শি। কালো বড়শি লোভনীয় টোপে ঢেকে দিয়েছে। সেই টোপে পাঁচটা মানুষ হয়তো দৃষ্টির ঠোকর দিয়ে সরে গেল, একটা কি গিলবে না শেষ পর্যন্ত? তা হলেই হল।

একদিন ভারি একটা শৌখীন লোক ফাঁদে পড়ে গেল। সুধামুখী যথারীতি গলির মোড়ের আবছা-অন্ধকার তার নিজস্ব জায়গাটিতে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে লোকটা গটগট করে সোজা কাছে চলে আসে। এবং পিছন পিছন নয়,

পাশাপাশি কথা কইতে কইতে গলি পার হয়ে একেবারে ঘরের মধ্যে। সুধামুখীর চেয়ে বয়সে ছোট বলেই মনে হয়। আর বাহারখানাও সত্যি দেখবার মত। দু-হাতের দশ আঙুলের ভিতর আটটা আঙুলে আংটি, বুড়ো আঙুল দুটো কেবল বাদ। কিন্তু সে ক্ষোভ পুষিয়ে নিয়েছে অনামিকা ও মধ্যমায় দুটো করে আংটি পরে। সবসুদ্ধ মিলে পুরো ডজন।

দরজার পাশের ঘরটুকুতে সাহেবের এ সময় থাকার কথা নয়, তবু কি গতিকে আজ ছিল। সুধামুখীর সঙ্গে লোকটা ঘরে গেল এসেন্সের উগ্র গন্ধে চারিদিক মাতিয়ে দিয়ে। ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে, গন্ধ তবু বাতাসে ভাসে। কী খেয়াল হল, সাহেবও উঠে পড়ে। পা টিপে টিপে এগোয়, উঁকি দেয় জানলা দিয়ে। সুধামুখী বাবুটিকে বিছানায় নিয়ে বসিয়েছে। সুতো আর পুঁতিতে রংবেরঙের কারুকার্য-করা একটা বড় পাখা—সেই পাখা হাতে সুধামুখী বাতাস করছে। রাজাবাহাদুরের কথা অনেক দিন পরে সাহেবের মনে পড়ে যায়। তাকে এমনিধারা খাতির করত। এই পাখা তারপরে আর বের হতে দেখেনি।

দুয়োর খুলে এক সময়ে সাহেব ঘরে ঢুকে পড়ে। শৌখিন বাবুটির কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার সেই আশ্চর্য ভঙ্গিতে ডাকে, বাবা—

রাজাবাহাদুর ফৌত, কিন্তু বাবা বলার কৌশলটা তারপরেও চলেছে কিছু কিছু। কাজও হয়। সুন্দর ছেলের মুখে "বাবা"—ডাক শুনে ভদ্র-লোকে মেজাজের মাথায় সিকিটা আধুলিটা গুঁজে দেয় ছেলের হাতে। হাত নেড়ে কেউ বা সরিয়েও দেয়: যা, এখন চলে যা তুই। যা দেবার এইখানে রেখে যাব। আবার এমনও আছে, কিছুই দিল না। যাঃ, যাঃ—বলে তাড়া করে।

আজকে অনেক বছর পরে সাহেবের কী রকম হল—বাবুটির গা ঘেঁষে আবদারের সুরে ডাকে: বাবা গো—

বাবু খিঁচিয়ে উঠল: এটা কোত্থেকে জুটল রে?

সুধামুখী পরিচয় দেয়: ছেলে আমার—

তোমার ছেলে আমায় কি জন্যে বাবা বলতে আসে?

সুধামুখী বলে, সকলের বাপ দেখে ওরও বোধ হয় বাবা-ডাক মুখে এসে যায়। বড়ঘরের ভালমানুষ দেখলে ডেকে বসে।

খোশামুদিতে বাবুটি ভুলবার পাত্র নয়। রাগে কাঁপছে। ভয় পেয়ে সুধামুখী কাতর কণ্ঠে বলে, ধর্ম সম্পর্কও তো পাতায় লোকে, ধর্মবাপ থাকে। ধরে নিন তাই।

রাখো চালাকি। প্যাঁচে ফেলানোর মতলব। বাবা বলিয়ে শেষটা খোরপোষের দায়ে ফেলবে—

খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরে হুঙ্কার দেয়: ছোট মুখে বড় কথা। বাপ হই আমি তোর—উ?

ঠাঁই-ঠাঁই করে সাহেবের মুখে মারছে। থামে না। মারতে মারতে মেরে ফেলে নাকি? হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সাহেব ছুটে পালায়। ছেলের পিছু পিছু সুধামুখীও ছুটল।

নিশ্চিন্তে বাবু এবারে সিগারেট ধরায়। মুখের মধ্যে ধোঁয়া জমিয়ে আস্তে আস্তে কায়দা করে ছাড়ছে। গোল গোল আংটি হয়ে ধোঁয়া উপরে উঠে যায়। বাবু দেখে তাই সকৌতুকে, আর আয়েসে পা দোলায়।

সাহেবের হাত ধরে নিয়ে সুধামুখী আবার এসে ঢুকল: দেখুন বাবু, কী অবস্থা করেছেন দেখুন একবার চেয়ে। গালিগালাজ নয়, বাবা বলে ডেকেছে। যে ডাক শুনে শত্রুমানুষ অবধি আপন হয়ে যায়—

কেঁদে ফেলে বলতে বলতে। আংটির পাথরে সাহেবের চোয়ালের উপর অনেকখানি ছড়ে গেছে, রক্ত পড়ছে। বাবু মনে মনে বেকুব হয়েছে। তাচ্ছিল্য ভরে বলল, চামড়ায় ঘষা লেগেছে একটুখানি। একেবারে ননীর পুতুল বানিয়েছ, টুসকির ভর সয় না—সেটা আমি বুঝি কেমন করে?

একটা টাকা সাহেবের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, যা বললি বললি। বার দিগর আর বাঁদরামি করবি নে। খুন করে ফেলব। চলে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—

তবু কিন্তু মানুষটির আনাগোনা বহাল হল এই থেকে। আংটির বাহার দেখে সকলের মুখে মুখে আংটিবাবু নাম। আসে খুব কম—দু-একটা গান শুনে বালিশের তলায় কিছু রেখে দিয়ে চলে যায়।

আংটিবাবুর আঘাতের দাগ অনেক দিন ছিল। রানীর কাছে, ঝিঙে ও দলবলের কাছে সাহেব দাগ দেখিয়ে দেমাক করে বেড়ায়: রাগী মানুষ কিনা আমার বাবা—মারের চোটে কেটে গেল। এ কাটা হীরের আংটির। হীরের কাচ কাটে, সামান্য চামড়া কেন কাটবে না? বাবার দু-হাতের আট আঙুলে বারোটা আংটি—সমস্ত হীরের।

তা রেগে গেল কেন, কি করেছিলি তুই?

আজগুবি প্রশ্নে অবাক হয়ে সাহেব বলে, বড়লোক মানুষ যে রাগ হবে না? যার যত টাকা, তার তত রাগ। ঘরের লোক বাইরের লোক চাকর-দাসী সকলকে মেরে বেড়ায়। আমি একেবারে আপন—আমায় তো মারবেই।

নফরকেষ্টরও কানে গেল। সাহেবকে বলে, তাই বটে! আমার হাত গাল না ছুঁতেই তেরিয়া হয়ে উঠিস, রসগোল্লা খাইয়ে সামাল দিতে হয়। ও-মানুষটা মেরে আধ-জখম করল, সেই আহ্লাদে ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছিস। ও হল কিনা আংটিবাবু, আঙুলে আংটি—আমার নেড়া-হাতে শুধুই হাড়।

বুকের ভিতর থেকে গভীর এক নিশ্বাস মোচন করে বলে, একলা তুই কেন, দুনিয়া জুড়ে এক রীতি। বড়লোকের ধামা ধরে সবাই। বিয়ে-করা ধর্মপত্নীকে টোপ ফেলে ফেলে টেনে আনলাম— যেই না শুনেছে মাইনে কম, সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী।

ব্যঙ্গের সুরে কেটে কেটে বলে, ও সাহেব, তোর রাজাবাহাদুর-বাবার শাল ছিঁড়ে কবে ফালা-ফালা হয়ে গেছে, আংটি-বাবার মারের দাগও তো মিলিয়ে এলো—আবার কোন বড়লোক বাবা ধরবি মায়ে-পোয়ে দেখ ভেবেচিন্তে।

শুনে সাহেবের রাগ হয় না, বড় কষ্ট হয়। ভয়ঙ্কর দৈত্য-দেহের ভিতর থেকে এক অসহায় ভিখারি যেন বড কান্না কাঁদছে। বলে, বড়লোক তুমিই হও না কেন! গালগল্প তো খুব—হেনো করতে পারি, তেনো করতে পারি, ধনদৌলত মুঠো মুঠো তুলে আনতে পারি—

পারি—। চকিতে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ফুলিয়ে নফরকেষ্ট বলে, আলবৎ পারি। তুই সহায় হ, পারি কিনা চোখের উপর দেখাচ্ছি। তাগত আছে, মা দক্ষিণা-কালীর দয়াও আছে—

যে দিকে কালীমন্দির, নফরকেষ্ট সেই দিকে ফিরে দু-হাত জোড়া করে কপালে ঠেকায়। বলে, আমরা নিমিত্ত মাত্র, দয়াময়ী করেন সব। বাবুভেয়ে-দের পকেটের টাকা হাত তুলে এনে দেন। কাজের মধ্যে সর্বক্ষণ মায়ের নাম স্মরণ করবি, এই একটা কথা কোন দিন ভুলিস নে সাহেব।

সাহেব বলে, কি করতে হবে, আমায় শিখিয়ে দাও।

নফরকেষ্ট খুশিতে তার পিঠ ঠুকে দিল: গোড়ায় গোড়ায় সকলকে যা করতে হয়—খোঁজদারির কাজ। এই দিয়ে হাতে-খড়ি। মক্কেল ধরে মালের হদিস দিবি, কারিগরে কাজ হাসিল করে আসবে। বিপদের ঝুঁকি নেই, খোঁজ দিয়েই তো তুই সরে পড়েছিস কাঁহা-কাঁহা তেপান্তর। ঘরে গিয়ে হয়তো বাবা ঘুমুচ্ছিস, ঘুম ভাঙিয়ে বখরা ঠিক হাতে পৌছে দিয়ে আসবে। সাচ্চা কাজকর্ম আমাদের এসব লাইনে—জুয়াচুরি-ফেরেব্বাজি নেই। নেমে দেখ্, দিন গেলে নির্ঝঞ্ঝাটে দু-তিন টাকার মার নেই।

সাহেবের থুতনির নিচে হাত রেখে মুখখানা এপাশ-ওপাশ করে দেখে।

ছবি দেখার মতন। বলে, দু-তিন টাকা কি বলছি—তোর রোজগার গুণতিতে আসবে না। রাজপুত্তুরের রূপ নিয়ে জন্মেছিস—এই নাক-মুখ-চোখ, এই গায়ের রং! রোদে রোদে চালের দানা কুড়িয়ে বিধাতার-দেওয়া এমন জিনিস তুই বরবাদ করছিলি। হায়, হায়, হায়! আর সেই পোড়া বিধাতা আমার বেলা কি করল! এমন একখানা উস্তট চেহারা—পারলে নিজের মুখে নিজেই থুতু ফেলতাম। এমন চোস্ত হাত দুটো নিয়েও নুলো হয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

দম নিয়ে আবার বলে, চেহারা দেখেই মানুষ ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে বিশ হাত ছিটকে পড়ে। কী করে কাজকর্ম হয়, বল। বলে, আমি নাকি খুনে ডাকাত। যারা বলে, তাদেরই খুন করতে ইচ্ছে যায়। ডাকাত হতে পারলে এই ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে দারোগা-কনেস্টবলের তাড়া খেয়ে ঘুরি! সেই জন্যেই এত করে বলছি, বিধাতার-দেওয়া মূলধন নষ্ট হতে দিসনে বাবা। মহাপাপ! ভাঙিয়ে খা, কাজকারবারে লাগা, রাজ্যেশ্বর হয়ে যাবি।

পরবর্তী কালে সাহেব ভাল ভাল গুরু-ওস্তাদ পেয়েছে। কিন্তু পয়লা গুরু বলতে গেলে নফরকেষ্ট। সাহেবকে সে বড যত্নে হাতে ধরে শেখায়। শিক্ষাদীক্ষা গুণজ্ঞান সমস্ত দিয়ে যাবে।

বলে, আমার বউয়ের গর্ভে ছেলে হলেও এর বেশি করতাম না। সে বড় রূপসী—ছেলে হলে তোরই মত রূপ হত। তার গর্ভের নোস, তা-ই বা জোর করে কে বলবে! আমার ঘর করতে চায় না—বাপের বাড়ি পড়ে থাকে, নানান রকম বদনাম—

তর্কাতর্কি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলে, অত হিসাবের কাজ কি—তুই ছেলে, খাতায় লেখা বাপ আমি এখন। ইস্কুলের তিনটে বাঘা বাঘা পণ্ডিত মাষ্টার সাক্ষি। বাপে-ছেলেয় আমাদের নতুন কাজকারবার। ছেলে খোঁজদার, বাপ কারিগর।

কিন্তু সাহেব সম্পর্কটা মেনে নিতে রাজি নয়। হেসে বলে, কাজকারবার কানায় আর খোঁড়ায়—

সে কেমন?

পাঠ্যবইয়ে গল্পটা আজই সে নতুন পড়ে এসেছে! কানা দেখতে পায় না, খোঁড়া হাঁটতে পারে না! কানার কাঁধে খোঁড়া চেপে বসল—দেখতে পাচ্ছে এবার, হাঁটতেও পারছে।

সাহেব বলে, আমাদেরও তাই। আমার চেহারা, তোমার হাত। দুজনে মিলে এক-মানুষ হয়ে গেলাম।

সুধামুখী টের না পায়। সে জানে, ইস্কুলে পড়ছে ছেলে। লেখাপড়া শিখে চাকরিচাকরি বিয়েথাওয়া করে সংসারধর্ম করবে—যেমন আর দশজনে করে থাকে। সুধামুখীর বাবা যেমন একজন! তাদের বেলেঘাটার গলিটুকু জুড়ে এবং পাড়ায় পাড়ায় যেমন সব শিষ্টশান্ত সংসারী লোকেরা। পড়ছে সাহেব ঠিকই, তাতে অবহেলা নেই। ইস্কুল যখন থাকে না, সেই সময়টা সে নফরকেষ্টর সঙ্গে।

নফরকেষ্ট বুঝিয়েছে: পড়ার সময়ে পড়তে তো মানা নেই। কাজকর্ম তারপরে। ভাল ভাল ঘরের ছেলেরা গাড়িজুড়ি চড়ে ইস্কুলে যায়, টিফিনে সন্দেশ খায়, ছুটির পরে বাড়ি গিয়ে খেলা। ধরে নে, আমরা তেমনি খেলে বেড়াই দু-জনে।

কিন্তু খেলার আগেও যে কিছু আছে। ভাল ঘরের ছেলে ছুটির পরে বাড়ি ফিরছে, সাহেব একবার লক্ষ্য করে দেখেছিল। মা দাঁড়িয়ে আছে সদর-দরজা অবধি এগিয়ে এসে। হাত ধরে ছেলেকে উপরে নিয়ে গেল। উপরের বারান্দায় বসিয়ে খাবারের প্লেট দেয় হাতে।

নফরকেষ্ট আগের কথার জের ধরে চলেছে: পড়বি যেমন, সংসারও দেখবি সেই সঙ্গে। চালের দানা খুঁটে খুঁটে মায়ের হাতে এনে দিতিস—ধরে নে, এ-ও তাই: চাল না এনে টাকাপয়সা খুঁটে নিয়ে আসা। খুব লাগসই গল্পটা বলেছিলি—কানায় আর খোঁড়ায় একজোট। আমি হলাম সেই খোঁড়া—ঘাড়ে তুলে মোকামে হাজির করে দিস তবে আমি কাজ করি। তুই আপাতত কানা আছিস, দু-দিনেই চোখ ফুটে যাবে। তখন কারিগর খোঁজদার একাই সব। খোঁড়াকে লাগবে না, কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিবি। দিস তাই, রাগ করব না। তুই বড় হলে সুখই আমার।

বকবক করে নফরকেষ্ট এমনি সব বলছে। সাহেবের কানেও যায় না। ঘুরতে ঘুরতে এক রাস্তায় ইস্কুলের ফেরত এক বড়লোকের ছেলে দেখেছিল একদিন। ঘণ্টা বাজিয়ে প্রকাণ্ড ঘোড়ায়-টানা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটছে—'তফাৎ যাও', 'তফাত যাও' করছে সহিস পিছনের পাদানি থেকে। ছেলে এসে পৌছল বাড়ি। গয়না-পরা ভারি সুন্দরী মা ফটক অবধি এগিয়ে এসে ছেলের হাত ধরলেন: এত দেরি কেন আজ? অনতিদূরে সাহেব—নিষ্পলক। দোতলার ঝুল-বারাণ্ডায় মা আর ছেলেকে আবার দেখা যায়। ছেলের মুখে মা খাবার তুলে দিচ্ছে। সাহেবের আসল মা-ও নিশ্চয় এমনি সুন্দর ছিল। মা মাত্রেই সুন্দর।

ফুলের বাগানের মধ্যে ঝকঝকে বাড়ি হাস্যমুখ পরমাসুন্দরী মা-জননী,

সুবেশ সুন্দর ছেলে, বিকালের রোদে-ভরা প্রসন্ন আকাশ, বড়-রাস্তায় গাড়ি মানুষের সমারোহ—সমস্ত পার হয়ে এসে সাহেব পায়ে পায়ে তাদের গলিতে ঢুকে পড়ে। নর্দামার দুর্গন্ধ নোংরা জল গলি ছাপিয়ে ওপারে পড়ছে, লাফিয়ে পার হতে হয় জায়গাটা। দুটো মেয়ের মধ্যে কি নিয়ে হঠাৎ ঝগড়া বেধেছে—আকাশ-ফাটানো চেঁচামেচি। ভদ্রমানুষরা, উজ্জ্বল পথের উপর এইমাত্র যাঁদের সব দেখে এলো—শুনতে পেলে ছি-ছি করে দু-কানে আঙুল দেবেন। কিন্তু ফণী আড্ডির বস্তির যাবতীয় বাসিন্দা কাজকর্ম ফেলে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে উপভোগ করছে। হাততালি দিয়ে স্ফূর্তি দিচ্ছে: লাগ ভেলকি, লেগে যা। এবং নারদ নারদ বলে কলহের দেবতা নারদ ঋষিকে আহ্বান করছে।

ঘোর হয়ে এলেই এক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়া। সাজগোজ সেরে মেয়েরা সব বেরিয়ে পড়ল—কেউ রাস্তায়, কেউ বা দরজায়। সাহেবও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে—খোঁজদার হয়ে মক্কেলের খোঁজ করে। ভাল কাজকর্ম যত কিছু সন্ধ্যার পর থেকেই। স্ফূর্তিবাজ লোকে টাকা খরচা করতে বেরোয় তখন। আহা, কষ্ট করে কত আর ঘুরবে—সাহেবরাই কাজটুকু টুক করে সমাধা করে দেয়। খরচা করা নিয়ে কথা—লহমার মধ্যে সবসুদ্ধ খরচা হয়ে গেল। টাকা এবং টাকার ব্যাগটাও। মানুষজন ইদানীং নতুন চোখে দেখছে সাহেব—টাকা বয়ে বেড়ানোর মুটে এক একটা। সাহেবি পোশাক-পরা মানুষটা ঐ চুরুট ফুকতে ফুকতে যায়—ব্যাগের মধ্যে টাকা। শৌখিন কয়েকটি মেয়ে সুবাস ছড়িয়ে দোকানে ঢুকল—টাকা সুনিশ্চিত সকলের সঙ্গে, কে কোথায় গোপন করে রেখেছে সেই হল কথা। কপালে চন্দন স্থূলবপু একজন থপথপ করে যাচ্ছে—এই লোক নোটের তাড়া কোমরে বেঁধে নিয়েছে ঠিক। একরকম আলো ফেলে মানুষের চামড়া-মাংস ভেদ করে ভিতরের ছবি তুলে নেয়: সাহেবের চোখেও তেমনি কোন আলো থাকত—জামা-কাপড় ভেদ হয়ে টাকাপয়সা যাতে দেখতে পাওয়া যায়!

কাজকর্ম সেরেসুরে ফিরতে রাত হয়ে যায়। নফর তো চিরকালের মার্কা-মারা মানুষ—তাকে নিয়ে কথা নেই। কিন্তু নিশিরাত্রে সাহেব তার সঙ্গে রয়েছে, সুধামুখী দেখতে পেলে মারমুখি হবে। মেজাজি স্ত্রীলোক কী যে করবে ঠিক-ঠিকানা নেই। নিজের মাথায় বসিয়ে দেয় এক ঘা, অথবা নফরার মাথায়!

কাজ নেই সাহেব, রাতে তুই বাড়ি যাস নে। আগে এঘাটে ওঘাটে আস্তানা ছিল, আবার তাই হোক।

দরজার পাশে সাহেবের হোগলার ঘর প্রায়ই এখন খালি পড়ে থাকে। ভোরবেলা ইস্কুলের মুখে বই-খাতা আনতে কেবল একবারটি যায়।

সুধামুখী ধরে ফেলে পথ আটকে দাঁড়াল: দিব্যি তো নিরালা ঘর—পুরানো রোগে কি জন্যে ধরল?

সাহেব বলে, গরম লাগে, ঘুমুতে পারি নে। গঙ্গার কী সুন্দর হাওয়া!

খাস কোথা রাত্রে? পয়সা কোথা পাস, না উপোস করে থাকিস?

সাহেব একগাল হেসে বলে, উপোস কোন দুঃখে করতে যাব? সন্ধ্যাবেলা গোগ্রাসে চাট্টি গিলে নেওয়া আমার ভাল লাগে না।

একটুখানি ঘুরিয়ে বলে, পয়সার অভাব কি পুরুষোত্তমবাবুরা থাকতে! রোজগার করে নিই।

এবং প্রমাণস্বরূপ পকেট উলটে টাকা-পয়সা সমস্ত ঢেলে দেয়: দেখ আছে কিনা। নিয়ে চলে যাও, সমস্ত নিয়ে যাও তুমি।

সুধামুখী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সাহেব বলে, ওদের আড়তে একটা কাজ নিয়েছি।

কিচ্ছু তো নিজের জন্য রাখলি নে।

অবহেলার ভঙ্গিতে সাহেব বলে, এসে যাবে আবার। পয়সা রোজগারের মতো সহজ কাজ আর নেই মা!

টাকাপয়সা তুলে নিয়ে সুধামুখী আঁচলে বাঁধল। কী ভাবল, কে জানে! ভাবল হয়তো, করুণার সাগর পুরুষোত্তমবাবু সাহেবকে আদরের চোখে দেখছেন। সাহেবের চেহারার গুণে, সাহেবের কতাবার্তা শুনে। অঢেল টাকা-পয়সা—কোন একটি অজুহাত করে দিয়ে দিলেই হল।

বই নিয়ে সাহেব ততক্ষণে ছুটে বেরিয়েছে। ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল।

বর্ষাকাল এসে পড়ল।

গরম তো কেটে গেছে সাহেব! এবারে ঘরে এসে থাক।

এখন বৃষ্টিবাদলা। হোগলার ছাউনি পচে গেছে একেবারে। জল মানায় না।

সুধামুখী নফরকেষ্টর উপর গিয়ে পড়ে: শুধু মুখে-মুখে বাপ হওয়া যায় না—

নফরকেষ্টরও তুড়ুক জবাব: লেখাতেও রয়েছে তো। ইস্কুলের খাতায় লেখা—মাস্টার-পণ্ডিতরা সাক্ষি।

বাপ হলে ছেলের সুখ-সুবিধা দেখতে হয়। ঘরের ছাউনি পচে গেছে, হোগলা দিয়ে নতুন করে ছেয়ে দাও।

নফর হা-হা করে হাসে: এই কথা! হোগলা কেন সোনা দিয়ে ছেয়ে দিলেও ছেলে আর ঘরে থাকছে না। মন উড়ু-উড়ু বাইরের টান—

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, ঘাটে মাঠে থাকতে দিয়েছিলে কেন সুধামুখী? আমি তো ছিলাম না তখন। তুমি দায়ী। আর আটকানো যাবে না, দুনিয়া চিনে ফেলছে ছেলে।

শীতকাল সামনে। এবারে কি হবে সাহেব? ঘাটে যা কনকনে শীত—ঘরে না উঠে যাবি কোথায় দেখব।

কত শীত পড়ে দেখা যাক। ডরাই নে।

সুধামুখীর কথা সাহেব কানে নেয় না। বাইরে থাকতে থাকতে এমন হয়েছে, সেই খুপরী-ঘরে পা দিতেই কেমন যেন আতঙ্ক।

ওরে সাহেব, অসুখ করবে শীতের মধ্যে গঙ্গার ঘাটে যদি পড়ে থাকিস।

সাহেব বলে, শীতকাল বলে সবাই বুঝি চাল-বেড়া দেওয়া ঘরে গিয়ে উঠেছে! রাত্তিবেলা বড়-রাস্তার ফুটপাথগুলো ঘুরে একবার দেখে এসো। এত মানুষ বাইরে বাইরে কাটাচ্ছে তো তোমার সাহেবই বা অক্ষম কিসে?

মাথায় খাসা এক মতলব এসে গেছে। তাই সাহেব অকুতোভয়। ফাঁকার মধ্যেই রাত কাটাবে সে, লেপ-বিছানা লাগবে না, অথচ ঘরে শোওয়ার চেয়ে ঢের বেশি সুখ। বলুন দেখি, কী সে ব্যাপার? হেঁয়ালির মতো ঠেকছে—

পাড়াটাই বড্ড সুখের যে! অন্য পাড়ায় হবে না। শীতকালটা আদি-গঙ্গার ধারে ধারে আরও দক্ষিণে চলে যাবে। কেওড়াতলায়। কালীক্ষেত্রের মহাশ্মশান—মায়ের দয়ায় চিতার অকুলান নেই। অহোরাত্র সারি সারি জলছে। দরাজ উঠানের উপর চিতার জায়গা, চতুর্দিক ঘিরে পাকা দালান। আগুনে আগুনে হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে আছে। তবু যদি শীত করে, কোন এক চিতার পাশে বোস গিয়ে। পরের খরচায় গনগনে কাঠের আগুন—হাত সেঁক, পা সেঁক। তার পরে শয্যা নাও আরাম করে, দালানে বা উঠানে যে জায়গায় খুশি। কেউ কিছু বলতে যাবে না।

এমন ব্যবস্থা থাকতে কোন দুঃখে সাহেব তবে হোগলার ঘরে মাথা ঢুকাতে যাবে?

সুধামুখীর সর্বক্ষণ দুঃখ, ঘরে মন বসে না—দিনে দিনে ছেলে আমার পর হয়ে গেল।

পারুল বলে, বয়স হচ্ছে কি না। বিয়ে দিলে ঠিক উল্টো হবে দেখো। কাজকর্মে বাইরে পাঠালে ছুতোনাতায় ঘরে এসে ঢুকবে।

তারপরেই পারুলের সেই পুরানো দরবার, অনেকবার যা হয়ে গেছে।

হাঁ—বলে দাও দিদি, যোগাড়-যন্তরে লেগে যাই। সামনের ফাল্গুনে দু-হাত এক করে দেবো। তুমি ছেলেওয়ালা—তোমার তো কিছু নয়। খরচা-খরচা হাঙ্গামাহুজ্জুত আমার।

বলে ফিকফিক করে হাসে: ভাল মজা হল—ছিলে দিদি, হয়ে যাবে বেয়ান। সম্পর্ক যা-ই হোক, আমি চিরকালই তোমার ছোটবোন।

সুধামুখী সস্নেহে তাড়া দিয়ে ওঠে: দূর পাগলী! একেবারে ছোট মানুষ যে ওরা। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। আমার সাহেবের হাঁড়িতে তোর মেয়ে চাল দিয়ে এসে থাকে তো নিশ্চয় তা হবে। কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

নাছোড়বান্দা পারুল বলে, ছোট তা কি হয়েছে! সেকালে কত ছোট ছোট বর-কনের বিয়ে হত। সে বড় মজা। আমাদের গাঁয়ে দেখেছি একজোড়া। কনে-বউয়ের পুতুলের মুণ্ডু ভেঙে গেছে বরের হাত থেকে পড়ে। বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে খিমচি কেটে ঝগড়া করে কেঁদে বউ অনর্থ করে। তারপরেও আবার শাশুড়ির কাছে গিয়ে নালিশ। বাড়ি সুদ্ধ মানুষ হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগে দিদি।

স্বপ্নে মেতে আছে পারুল, তাকে নিরস্ত করা দায়। সুধামুখী বলে, আসুক তো ফাগুন মাস। কিন্তু বিয়েটা কোথায় হবে শুনি? বউ নিয়ে সাহেব কোন জায়গায় উঠবে? এখানে—এই বাড়িতে? অ ঘেন্না!

পারুলও বুঝি সেটা ভাবে নি! বলে, তাই কখনও হয়—ছিঃ ছিঃ। ঠিক ওপারে চেতলায় একটা ঘর দেখে এসেছি, এক্ষুনি নিয়ে নেওয়া যায়। সাহেবের আড়তের খুব কাছে হবে, আমরাও যখন তখন গিয়ে দেখে আসতে পারব। সব দিক দিয়ে সুবিধা। নিয়ে নেবো ঘরটা?

সুধামুখীও ভাবছে আলাদা জায়গায় ঘর নেবার কথা। ভাবনাটা পেয়ে বসেছে তাকে। সে ঘর চেতলায় নয়, কাছাকাছি কোনখানে নয়—এই কালীঘাটের অনেক দূরে একেবারে ভিন্ন এলাকায়। এ পাড়ার চেনা মানুষ কখনও সেদিকে যাবে না। নফরকেষ্ট নয়, কেউ নয়। জীবনের এই অধ্যায়টা আদিগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে শুদ্ধ-স্নিগ্ধ হয়ে সাহেবের হাত ধরে মা আর ছেলে নতুন বাসায় গিয়ে উঠবে। পুরুষেরা রাত্রিবেলা মুখ ঢেকে বিবরে এসে ঢোকে। ঘরে ফিরে গিয়ে আবার সেই আগেকার মানুষ—বিবরের লীলা-

খেলা অন্ধকারে চাপা পড়ে থাকে। সারা জীবনেও ফাঁস হয় না। এমনিই তো বহু—এক-শ'র ভিতরে অন্তত নব্বুই। সুধামুখীরও বা কেন হবে না?

ঠাণ্ডাবাবুর কথা: জীবন মরতে চায় না কিছুতে, মেরে ফেলে বড় কঠিন। অঙ্কুর ইট-চাপা পড়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল—ডালে পাতায় কেমন সবুজ সুন্দর আমগাছ ঐ চেয়ে দেখ। সকালের রোদে স্নান করে পবিত্র হয়ে পাতা ঝিলমিল করছে। সুধামুখীও ঘরে ফেরার জন্য পাগল। বাপের ঘরে ঠাঁই হবে না, ছেলের ঘরে যাবে। সাহেব, তাড়াতাড়ি তুই মানুষ হয়ে যা। ছেলে, ছেলের বউ, কচি কচি নাতি-নাতনি—সুধামুখী কর্ত্রী সে ঘরের। এ-পাড়ার, এবং এই জীবনের তিল পরিমাণ চিহ্ন নিয়ে যাবে না। রানী সে ঘরের বউ হবে কেমন করে? ফুলের মতন মেয়ে রানী, বড় আদরের ধন, "মাসি" "মাসি" করে সুধামুখীর কাছে ঘোরে। তা বলে নতুন সংসারে বউ হতে পারে না পারুলের কলঙ্কের ফুল।

পারুলের কথা চাপা দিয়ে দেয়: ফাগুনের ঢের দেরি, তাড়াতাড়ি কিসের?

পুরুষোত্তমবাবুর আড়তে কতক্ষণ ধরে কি কাজ—কত টাকা মাইনে দেব না জানি। গতিক দেখে সন্দেহ আসে, সত্যিই ঐ কাজ করে কি না। আড়ত দূরবর্তী নয়, এ-পারের ঘাট থেকেই নজরে আসে। পুল পার সাহেবের খোঁজে খোঁজে একদিন সুধামুখী গিয়ে পড়ল সেখানে। ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে, নেই সাহেব। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও দেখতে পেল না। তারপর আরও ক'বার গেছে। আড়তের কাউকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না—তার সঙ্গে সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লে চাকরে সাহেব ছোট হয়ে যাবে অন্যদের কাছে, চাকরির ক্ষতি হবে।

হঠাৎ হয়তো একদিন সাহেব সুধামুখীর ঘরের মধ্যে ঢুকে খই ছড়ানোর মতো খাটের বিছানায় পয়সাকড়ি ছড়িয়ে দেয়। দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরুল। ইচ্ছা মতন তাকে পাওয়া যায় না, বসে দুটো কথা বলা যায় না। নিশিরাত্রে সুধামুখী আবার আগেকার মতন এ-ঘাট ও-ঘাট খুঁজে বেড়ায়। কার মুখে যেন শুনতে পেয়ে একদিন সে শ্মশানে চলে এলো।

সাহেবের বড় পছন্দের জায়গা, শীতের রাত কাটানোর পক্ষে সত্যি চমৎকার। দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মচ্ছব, তবু কিন্তু রাত্রি যত বাড়ে মচ্ছব, আরও যেন বেশি করে জমে। কাঁধে চড়ে চড়ে দেদার লোক এসে নামছে,—নানা অঞ্চলের নানান বয়সি পুরুষলোক স্ত্রীলোক। চিতায় চিতায় এত বড় উঠানে

ছটো হাত জায়গাও খালি নেই। যমরাজের রন্ধনশালার শতেক চুল্লি একসঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছে যেন। বিস্তর দল ঠায় বসে আছে নতুন চিতার জায়গা নেই বলে।

একটা ভারি জঁাকের মড়া এসেছে। বিশাল খাট, ফুলের পাহাড়। যে বিছানায় শুয়ে মড়াটি শ্মশানে এসেছেন, ফুলশয্যায় লোকে এমন জিনিস পায় না। জায়গা পেয়ে অবশেষে চিতা সাজিয়ে ফেলল—সে বস্তুও চেয়ে দেখবার মতো। তিন চিতার কাঠ এসেছে বেশি মূল্য দিয়ে। তার উপরে দশ সের চন্দনকাঠ ও এক টিন ঘি।

আর একটা শিশু ছেঁড়া-মাছুরে জড়িয়ে অনতিদূরে এনে নামাল। ছজনে নিয়ে এসেছে—একজন শ্মশানের অফিসে গেছে সৎকারের ব্যবস্থায়। আর একজন মৃত শিশুর মাথায় হাত দিয়ে নিঃশব্দে বসে। ছু-চোখে জল গড়াচ্ছে। খাটের মড়া ইতিমধ্যে চিতায় তুলে দিয়েছে, ফুলের গাদা এদিক-সেদিক ছড়ানো। সাহেবের কী ইচ্ছা হল—ছু-হাত ভরে ছড়ানো ফুল ছেঁড়ামাছুরের উপর রাখছে।

একজন খিঁচিয়ে উঠল : কার ধন কাকে দিস—আচ্ছা ছোঁড়া রে তুই! ইচ্ছে হয়, নিজের পয়সায় ফুল কিনে দিগে যা।

সুধামুখী এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আকুল হয়ে ডাকল, সাহেব!

রাত্রিবেলা এত মৃত্যুর অন্ধিসন্ধিতে ছেলেটা পাকচক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। সুধামুখীর সর্বদেহ শিরশির করে। ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরল : সাহেব রে—

কে যেন কাকে বলছে, সাহেব ফিরেও তাকায় না।

সুধামুখী বলে, বাসায় চল বাবা।

এবারে সাহেব কথা বলল : হাত ছেড়ে দাও—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে যা-কিছু পকেটে আছে মুঠো করে দিয়ে দিল।

আমি কি টাকা চাইতে এসেছি?

আমায় নিয়ে যেতে এসেছ। আমি যাব না।

সুধামুখী কেঁদে বলে, তোর একফোঁটা মায়ামমতা নেই সাহেব। মনে মনে তুই সন্ন্যাসী। ঘরবাড়ী ভুলেছিস। টাকা-পয়সা খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে দিস। কালকের খরচ বলে আধলা পয়সাও রাখলি নে। ভয় করে তোর রকমসকম দেখে।

নিশ্চিন্ত অবহেলায় সাহেব বলে, খরচ যেমন আছে, ভাঁড়ারও আমার অঢেল। পয়সাকড়ি গায়ে ফোটে, না সরালে সোয়াস্তি পাইনে।

মড়াপোড়ার দুর্গন্ধে সুধামুখী নাকে কাপড় দিয়েছে। নজর পড়তে সাহেব ধমক দিয়ে ওঠে: ঘেন্না করে তো দাঁড়িয়ে থাকতে কে বলেছে! কাজ হয়ে গেল, বাড়ি চলে যাও।

বলেই সে আর সেখানে নেই। প্রাঙ্গণে অগণ্য চুল্লির কোনটা দাউদাউ করছে, নিভে আসে কোনটা। সাহেব তাদের মধ্যে কিলবিল করে বেড়ায়। বহুরূপীর মতো রং বদলাচ্ছে—চিতার আলো ঝলসে ওঠে কখনো গায়ের উপর, কখনো সে আবছা অন্ধকারের ছায়ামূর্তি। এ-দলের কাছে গিয়ে কোথায় কি করতে হবে বাতলে দিয়ে আসে, ও-দলের মধ্যে গিয়ে মড়ার পরিচয় জিজ্ঞাসাবাদ করে। কোন এক চিতার পাশে বসে পড়ে হয়তো বা একটু আগুন পুইয়ে নিল। কাঠ কম দিয়েছে বলে ডোমের সঙ্গে ঝগড়া করে কোন দলের হয়ে। মড়া না সরাতেই বিছানাপত্র নিয়ে টানাটানি—একটা চেলাকাঠ তুলে ভিখারি-গুলোর দিকে তাড়া করে যায়। ভারি ব্যস্তসমস্ত এখন সাহেব।

সুধামুখী থ হয়ে দেখছে। সাহেবের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি কোনটাই ভাল লাগে না। সাহেব কেমন যেন দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু জোরজারি করা চলবে না এ ছেলের উপর, সত্যিকার দাবিও নেই। নিশ্বাস ফেলে সে পায়ে পায়ে ফিরে চলল।

সাহেবও এক সময় খুশি মতন একটা জায়গা নিয়ে শুয়ে পড়ে।

আরামের ঘুম। পয়সা রোজগারের ফিকিরে কনেস্টবল এসে লাঠির গুঁতো দেয় না। ছোঁয়াছুঁয়ির শঙ্কায় পুণ্যার্থীরাও গালিগালাজ করেন না। তবু কিন্তু এক একদিন ঘুম ভেঙে উঠে বসে সে শেষরাত্রে। শ্মশানে তখন এক অদ্ভুত অভিনব চেহারা। লকলকে আগুন নিভে গিয়ে গনগন করছে চারিদিককার চিতাগুলো। শ্মশানের বাসিন্দারা সব এদিক-সেদিক পড়ে আছে—কাঁথা-মাদুর কাপড়-চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছে, মড়ার সঙ্গে যা সমস্ত বিদায় করে দেয়। ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে হাতের খানিকটা বেরিয়ে আছে, কারো বা কোমরের একটুখানি। কারো পায়ের গোছা, কারো বা মাথার চুল। ক্ষীণ আলোয় মনে হবে মানুষ নয়, মড়ারাই চারিদিকে ছড়ানো। টুকরো টুকরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ কেউ নয়। যেন দৈত্য এসে পড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ছিবড়েগুলো ছড়িয়ে গেছে। অথবা লড়াইয়ের শেষে মৃত সৈনিক পড়ে আছে ইতস্তত। ঠাণ্ডাবাবুর কথাগুলো—সুধামুখীর কাছে অনেকবার যা শুনেছে সাহেব। অস্ত্রের লড়াই ছাড়াও অহরহ অদৃশ্য নিষ্ঠুর লড়াই চলছে—অনেককে মেরে ফেলে জন কয়েকের বিজয়োৎসব। বিজয়ীরা এই রাত্রে অট্টালিকাশিখরে উষ্ণ লেপ-গদির ভিতর মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে।

ঠাণ্ডাবাবু থাকলে আরও হয়তো বলত, মহাশ্মশান কেন—গোটা দেশটারই চেহারা দেখলে সাহেব এই নিশিরাত্রে। মড়ার দেশ। সে মড়াও আস্ত নয়—টুকরো টুকরো অঙ্গ ছড়ানো।

এক দুপুরে অসময়ে ছুটতে ছুটতে নফরকেষ্ট বস্তিবাড়ি ঢুকল। এসেই বাইরের দরজায় খিল দিয়ে দিল। ঘরের ভিতরে খাটের উপর ধ্বপাস করে বসে পড়ে।

সুধামুখী ব্যস্তসমস্ত হয়ে পিছু চলে আসে: কি হল ?

হাঁপাচ্ছে রীতিমতো। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, এক গ্লাস জল দাও আগে।

ঢকঢক করে পুরো গ্লাস খেয়ে নিয়ে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে কতকটা সুস্থির হয়েছে। সুধামুখী বলে, কে তাড়া করল—পুলিশ না পাবলিক ?

নফরকেষ্ট বলে, বাঘ। একেবারে সামনাসামনি পড়ে গিয়েছিলাম।

চিড়িয়াখানার বাঘ ডাকে, নিশিরাত্রের স্তব্ধতায় এ পাড়া থেকে সুস্পষ্ট শোনা যায়। এই কিছুদিন আগে একটা বাঘ কি গতিকে বেরিয়ে পড়েছিল খাঁচা থেকে, পথের মানুষের উপর হামলা করেছিল—

নফরকেষ্ট অধীরভাবে বলে, চিড়িয়াখানার বাঘ খাঁচায় থেকে থেকে তো বিড়ালের শামিল। এ হল আসল জন্তু, সুন্দরবনের মানুষখেকো। বন থেকে সদ্য-আমদানি।

তার পর সুধামুখীর দিকে চেয়ে সকাতরে ব্যাখ্যা করে বলে, আমার বউ।

কোথায় দেখা পেলে ?

কালীবাড়ি তীর্থধর্মে এসেছিল। বউ, নিমাইকেষ্ট আরও যেন কে কে—আমার তখন চোখ তুলে তাকাবার তাগদ নেই, এই ধরে তো এই ধরে। পাই-পাই করে ছুটেছি, খুব বেঁচে এসেছি।

ভাব দেখে সুধামুখী হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলল, সেই ব্রহ্মকবচের গুণে বোধ হয়—

নফরকেষ্ট বলে, তা সত্যি। বন আনচান-করা ব্রহ্মকবচে একেবারে আরোগ্য হয়েছে। কিন্তু বউয়ের জন্য কোন্ কবচের ব্যবস্থা করা যায় বল দিকি, আমার নামেই যাতে শতেক হাত ছিটকে যায় ? আগে যেমন ছিল।

সুধামুখী খিলখিল করে হেসে বলে, কবচ হলেও পরাতে যাবে কে শুনি ?

নফরকেষ্টও নিশ্বাস ফেলে ঘাড় নেড়ে বলে, কোন কবচই কিছু হবে না আর এখন। লোভে পেয়ে গেছে। আমাকে তো চায় না, চায় আমার মাইনের টাকা। মানুষটার উপর যত ঘেন্নাই হোক, ধরতে পারলে ঠিক সেই কারখানার চাকরিতে নিয়ে বসাবে। মুনাফা বিস্তর। মাস গেলে পুরো মাইনেটা হাতিয়ে দেবে—একটা মানুষের পেটে-ভাতে কত আর খরচা হয় বলো।

সন্ধ্যায় কাজে বেরিয়ে সাহেবকেও বলল: ঘটেছে দুপুরবেলা—এখনো কিন্তু আমার বুক ঢিবঢিব করছে। হ্যাঙ্গামের কাজে আজ যাচ্ছিনে, সোজাসুজি যদি কিছু হয়—

দিন দুয়েক পরে আবার দেখা যায়, ভীষণ ব্যাধিতে ভুগছে সে যেন। থপথপ করে পা ফেলছে বুড়োমানুষের মতো। হঠাৎ একেবারে দাঁড়িয়ে যায়। বলে, ফিরে চল, সাহেব, কাজকর্ম হবে না।

কি হল?

সেই বাঘ। ভেবেছিলাম ফাঁড়া বুঝি কেটে গেল। তা নয়, নিমাই চুপিসারে পিছন পিছন এসে আড্ডির বস্তি দেখে গেছে। আজকে যখন বেরুচ্ছি —হাওড়া থেকে অত সকালে এসে গলির মাথায় ওত পেতে ছিল। ক্যাঁক করে ধরে ফেলেছে।

বিপদটা কত বড়, সাহেবের সঠিক আন্দাজ নেই। নফরের অবস্থা দেখে তবু উদ্বিগ্ন হল: তা হলে?

শাসিয়ে গেছে, আপোসে বাসায় গিয়ে যদি না উঠি, একদিন বউ নিয়ে এসে পড়বে। কী সর্বনাশ বল দিকি। যত ভাবি, হাতে-পায়ে খিল ধরে আসে আমার। এমন অবস্থায় মক্কেল ফেলা যাবে না, বিপদ ঘটে যাবে।

পরের দিন নফর বলে, আজও এসেছিল। ভেবেছিলাম, বয়স হয়েছে, আর পাকছাট মারব না, যে ক'টা দিন বাঁচি একটা জায়গায় কায়েমি হয়ে থাকব। হতে দিল না কিছুতে। কপাল বড্ড খারাপ সাহেব, ভাবি এক হয়ে যায় অন্য। নিমাই শ্বশুরকে বলে সেই পুরানো কাজ ঠিকঠাক করে ফেলেছে, ধরে নিয়ে জুড়ে দেবে। সারা দিনমান ফার্নেসের আগুন, রাত্রে বউ। তার মধ্যে ক'দিন বাঁচব আমি বল্।

বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। ঢোক গিলে নিয়ে বলে, পালিয়ে যাব, না পালালে রক্ষে নেই। সুধামুখীকে কিছু বলিসনে এখন। কিন্তু নফরাকে। কেউ আর কলকাতা শহরে পাচ্ছে না।

নতুন কাজের নেশায় সাহেব মেতে আছে। উৎকণ্ঠিত ভাবে সে বলে, আমার কি হবে? কারিগর না হলে খোঁজদার তো হাত-পা ঠুঁটো জগন্নাথ।

সাহেবের দিকে নফরকেষ্ট এক নজরে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে: যাবি তুই? তোর যে কত ক্ষমতা, নিজে তুই জানিস নে—আমি সব চোখে দেখছি।

উৎসাহে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, চল তাই। সুধামুখীকে টাকা পাঠাব, টাকা পেলে সে ভাবনাচিন্তা করবে না। বাপে-বেটায় মিলে দিগ্বিজয় করে বেড়াব আমরা। আমি কারিগর তুই ডেপুটি, কখনও বা আমি ডেপুটি তুই কারিগর।

ঠিক সেই দিনই এক কাণ্ড ঘটে গেল। সুধামুখীর হারমোনিয়ামের গোটা দুই রীড পালটাতে দোকানে দিয়েছে, তারা আজ না কাল করছে। মহাবীর আনতে গিয়ে এইমাত্র ফিরে এলো। ঝগড়া করতে চলেছে সুধামুখী—না হয়ে থাকলে যেমন আছে ফেরত আনবে। জরুরি দরকার। আংটিবাবু কয়েকজনকে নিয়ে গান শুনতে আসবে রাত্রে, খবর পাঠিয়েছে।

সাজগোজে থাকতে হয় এই সন্ধ্যাবেলাটা। রাগে রাগে দ্রুত পা ফেলে চলেছে, নফরের দেওয়া গয়না ঝিলিক দিচ্ছে অঙ্গ ভরে। কোন দিক দিয়ে ছুটতে ছুটতে সাহেব গায়ের উপর পড়ে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগ সুধামুখীর হাতে গুঁজে দিল। চাপা গলায় বলে, অনেক টাকা—নতুন হারমোনিয়াম হয়ে যাবে। বাড়ি চলে যাও ঢেকেঢুকে নিয়ে।

কি রে, কোথায় পেলি এ জিনিষ?

কিন্তু বলছে কাকে! লহমার মধ্যে সাহেব উধাও। কোন গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়েছে। সুধামুখী ভয়ে কাঁটা। কাঁপতে কাঁপতে বাসার দিকে ফিরল।

গঙ্গার ঘাটের সদরে যাওয়া সাহেবও আজকের দিনে অনুচিত মনে করে। আড্ডির বস্তির নিজস্ব খোপে এক ফাঁকে এসে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যা-রাত্রে অনেক দিন পরে এসেছে। আলো জ্বালে নি, অন্ধকারে পড়ে রইল। আর দু-হাতে নিজের গাল চড়াচ্ছে। জীবন নাকি মরে না, অমৃত—ঠাণ্ডাবাবুর কথা। পাতা ঝিলমিল করে পাঁচিলের ধারের ঐ আমচারা সাক্ষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষকে নাকি ভালই হতে হবে শেষ পর্যন্ত, খারাপ হওয়া চলবে না। কী সর্বনাশ! এই যদি নিয়ম হয়, সাহেবের তবে কী উপায়? নিয়ম ভাঙবেই, আরও জোর করে লেগে যাবে সব গাছ-ই কি এই আমচারার মতো—পোকা ধরে পাতা ঝরে গিয়ে ডালপালা আধ-শুকনো হয়ে আছেও তো কত!

গালে চড় মেরে মেরেও বুঝি রোখ মিটল না। বই-খাতা দোয়াত-কলম আছে—এক সময় বসে অন্ধকারে কলম হাতড়ে নিয়ে খাতার উপর আঁচড় কাটতে লাগল। মনে যা সব উঠছে, লিখছে খাতায়।

কী কাণ্ড এই কতক্ষণ আগে! ট্রাম-রাস্তার উপর মস্ত বড় এক পোশাকের দোকানে সাহেব ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্ট আছে—অনেকটা দূরে, একেবারে আলাদা। কেউ কাউকে জন্মে চেনে না এই রকমের ভাব। চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় ও অতিরিক্ত রাঙা বলে কাজের সময়টা নফরের নীল চশমা চোখে। অঙ্গে ধোপ-দুরস্ত কাপড়-জামা। এ-ও তার আপিসের পোশাক —এক এক অফিসে এক এক রকম। কাজ অন্তে এ সমস্ত খুলে পাট করে রেখে আট-হাতি ধুতি পরে মহানন্দে বিড়ি ধরাবে।

বাচ্চাদের পোশাক যে দিকটায়, সেখানে বড়ঘরের এক বউ। দুর্গা-প্রতিমার মতো ঝকঝকে চেহারা, কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা। মোমের পুতুলের মতো একটা ছোট মেয়ে বউয়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে—এই মা'র মেয়ে সেটা বলে দিতে হয় না। এক ডাঁই পোশাকআশাক নামিয়ে নিয়েছে, আরও নামাচ্ছে। মেয়ের জন্য পোশাক পছন্দ করেছে মা—বিষম খুঁতখুঁতে, পছন্দ কিছুতে আর হয় না। দোকানের দুটো ছোকরা আর এই বউটি—তিনজনে হিমসিম হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণের বিস্তর রকমের চেষ্টার পরে একটি জামা অবশেষে মেয়ের গায়ে পরাল। বাচ্চা মেয়ের রূপের বাহার এক-শ গুণ হয়ে ফুটল এক পলকে। ছিল পদ্মকলি, পোশাক পরে যেন শতদল হয়ে পাঁপড়ি মেলল।

এমনি সময় সাহেব। ফুটফুটে ছেলে মুখ চুন করে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেয়ে বউ হাত নেড়ে কাছে ডাকে। শতেক পরিচয় জিজ্ঞাসা করছে: কার সঙ্গে কোথায় থাকে, কে কে আছে তার, ইস্কুলে পড়াশুনা করে কি না। সাহেবও তেমনি—বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব। নানাবিধ দুঃখের বৃত্তান্ত। বলতে বলতে জল এসে যায় চোখে। দরকার মতন এই জল নিয়ে আসা খেটেখুটে অভ্যাস করতে হয়। আর এইসব লাগসই গল্প বানানো। সাহেবের দেখাদেখি বউয়ের চোখেও জল এসে গেছে, দু-ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। কেল্লা ফতে—যা চেয়েছিল ঠিক তাই। ছেলেটার হাতে কিছু দেবে বলে বউ ব্যাগ খুঁজছে! কোথায় ব্যাগ? ব্যাগ ইতিমধ্যে লোপাট। সময় বুঝে সাহেব বাঁ-হাতের আঙুল তুলে কান চুলকে ছিল একবার। তার মানে বউঠাকরুনের বাঁ-দিকে দোকানের কাউন্টারে বস্তুটি পড়ে আছে। খোঁজদারের কাজ এই অবধি। সে শুধু জানিয়ে দেবে মাল কোনখানটায় আছে এবং

মক্কেলকে অন্যমনস্ক করে রাখবে। খবর বুঝে নফরকেষ্ট জামা দেখতে দেখতে এই দিকে এসে হাতের খেলা দেখিয়ে সরে পড়েছে। হিসাব-করা নিখুঁত কাজকর্ম, এক তিল এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

এ পর্যন্ত নির্বিঘ্ন। গোলমালটা তারপরেই। খোঁজ দেওয়ার পরেই খোঁজদার সরে পড়বে, এই হল বিধি। বউ ব্যাকুল হয়ে ব্যাগ খোঁজাখুজি করছে, সাহেব কি দেখে সামনের উপর অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে? যে জামা গায়ে পরানো হয়েছে, ছোট মেয়ে কিছুতে তা খুলতে দেবে না। বউয়ের চোখে আবার জল এসে যায়—বড্ড প্যানপেনে তো বউটা! ভাল ঘরের নরম মনের মেয়ে—কে জানে, সাহেবের আসল মা-ও হয়তো এমনিধারা রাজরানী একটি। বউ দোকানের ছোকরাকে বলছে, কী করি আমি এখন! ট্যাক্সি করে না হয় বাড়ি ফিরলাম, বাড়ি গিয়ে ট্যাক্সি-ভাড়া দেব। আমার ডলির জন্মদিন আজ। পাঁচ ফুলের ডাল-ধোওয়া জলে চান করিয়ে দিলাম—সকলের আশীর্বাদ নিয়ে হাসিখুশি থাকতে হয় এই দিনটা, আনন্দ করতে হয়। আমার ভাইয়ের মেয়ের জামা পরে এসেছে—আপনাদের দোকানের তৈরি। মেয়ে বায়না ধরল, তারও ঠিক সেই জামা চাই। ভাবলাম, যাই, কতক্ষণ আর লাগবে। সাধ করে চাইল, না পেলে মুখভার করে বেড়াবে, সে হয় না। তা দেখুন, উল্টো হয়ে গেল—ছেলেমানুষের গায়ে পরিয়ে আবার খুলে নেওয়া, ওরা তো বোঝে না। আপনারাই বা কী করতে পারেন!

ভারী গলায় বলল বউটি। সাহেব হাত দিয়ে দেখে তারও চোখ ভিজে-ভিজে। কী কেলেঙ্কারি—শুনলে নফরকেষ্ট হেসে খুন হবে। যে শুনবে, সেই ছি-ছি করবে। কাজের দরকার চোখে জল আনবে, তা বলে বেদরকারে আপনা-আপনি এসে পড়বে, এমন বেয়াড়া মন নিয়ে কাজকর্ম হয় কি করে? আর বুঝি দেখতে পারে না সাহেব, ছুটে বেরুল। এমনি করে বেরুনো ঘোরতর অন্যায়, সকলে তাকিয়ে পড়ে।

এক-ছুটে চলে গেল তাদের সেই জায়গাটিতে। নালা-পুকুর বুজিয়ে ক্ষেত-মাঠ-জঙ্গল সাফসাফাই করে নতুন রাস্তা হচ্ছে, ড্রেনের পাইপ বসাবার জন্য মাটি তুলে পাহাড় করেছে, তারই পাশে একটা নারিকেলগাছ নিশানা।

টাকায় ঠাসা ব্যাগ, নফরকেষ্টর মুখে হাসি ধরে না। ছুটে এসে সাহেব হাত বাড়িয়ে বলে, দাও—

টাকা বের করে সাহেবের সামনেই গণেগেঁথে তার খোঁজদারির বখরা দেবে, সুকর্মের পারিতোষিক হিসাবে বাড়তিও দেবে কিছু—কিন্তু তার আগেই ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব দৌড় দিল।

আবার এক অনুচিত কাজ। ব্যাগ নিয়ে পোশাকের দোকানে ঢুকে পড়েছে। নফরকেষ্টর সেই যে গল্প—নোটের তাড়া তুলে নিয়ে ধরা পড়ে গেছে; যে ধরেছে তারই পকেটে নোটগুলো ফেলেছে আবার। সাহেবও কোন রকম কায়দা করে যার ব্যাগ তাকে দিয়ে আসবে।

কিন্তু গিয়ে পড়ে তুমুল কাণ্ড। কোথায় বা সেই বউ, আর কোথায় সেই ডলি নামের মেয়ে! দোকানের মানুষজন হৈ-হৈ করে ওঠে: আবার এসেছে। এরই কাজ। ধরো ছোড়াটাকে—

রে-রে—করে ধরতে আসে। সাহেবের সুন্দর চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। একবার দেখলে আর ভোলবার জো নেই। দৌড়, দৌড়—

ভাবছে ছুঁড়ে ফেলে দেবে নাকি? লাভ নেই, পিছনে ছোটা তা হলেও বন্ধ করবে না। মাঝে থেকে টাকাগুলো নষ্ট। একরাশ টাকা, সুধামুখী নতুন হারমোনিয়াম কিনব কিনব করছে কত দিন থেকে—

আংটিবাবুরা গান শুনে অনেক রাত্রে চলে গেল। পারুলের হারমোনিয়ামটা এনে কাজ চালিয়েছে। তারপর নফরকেষ্ট যথারীতি এসে পড়ল। টুলের উপর চেপে বসে বউয়ের গল্প শুরু করে দেয়। বলে, বাঘে হামলা দিয়ে ফেরে, সেই অবস্থাটা চলছে এখন সুধামুখী। ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন সময় না-জানি টুঁটি চেপে ধরবে—

এই পর্যন্ত—। হুঙ্কার দিয়ে সুধামুখীই ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঘই বটে এই রোগাপটকা অস্থিসার রমণী। নফরকে বাঘে ধরেছে। লম্বা চুলে ফাঁপানো এলবার্ট-টেড়ি, রাত্রে এই বিশ্রামের সময় বাবু নফরকেষ্ট কিঞ্চিত বাহার করে আসে। মুঠো করে ধরেছে সেই চুল—

ছেলেকে তোমার পথে নামিয়েছ?

ঠাস-ঠাস করে চড়। হঠাৎ সুধামুখী হাউ-হাউ করে কেঁদে হাত-পা ছেড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে: ছেলে নিয়ে আমার যে কত সাধ! লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, দশের একজন হবে। সে ছেলে ঘরবাড়ি ছেড়ে শ্মশানে-মশানে পড়ে থাকে এখন।

কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করছে। বারম্বার বলে, সর্বনাশ করেছ তুমি। ছেলে আমার কাছ থেকে কেড়ে তোমার পথে নিয়ে নিলে।

চড় খেয়ে নফরারও মেজাজ চড়েছে। বলে, কাঙালি-ভিখারি মতন চাল কুড়াত—তার চেয়ে খারাপ এ পথ?

সুধামুখী উঠে বসে বলে, মন্দ পথ, অধর্মের পথ—

নফরকেষ্ট বলে, তুমি বলো ছেলে তোমার, আমি বলি ছেলে আমার—আমাদের ঘর থেকে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির বেরুবে, এই তোমার আশা? ঘেঁটুবনে চাঁপাফুল ফুটবে?

সুধামুখী বলে, ছেলে আমারও নয়, অন্য লোকের—

কথা শেষ করতে না দিয়ে নফরকেষ্ট তিক্ত স্বরে বলে, যাদের ছেলে তারা হল বড়ঘরের অসতী মেয়ে আর বড়ঘরের বদমায়েস পুরুষ। তারা আমাদের চেয়েও খারাপ। আমাদের সোজা কথাবার্তা, স্পষ্টাস্পষ্টি কাজকর্ম। তাদের বাইরে ভড়ং, ভিতরে ইতরামি—

খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে—মাথার এলবার্ট-টেড়ি ভেঙে গিয়েছে, পকেটের চিরুনি বের করে নফরকেষ্ট টেড়ি কাটতে লাগল। সুধামুখী রান্নাঘরে গেছে। ভাত বেড়ে ফিরে এসে দেখে নফরকেষ্ট নেই।

ক্ষুধার্ত মানুষটা কোনদিকে গেল—হেরিকেন হাতে নিয়ে সুধামুখী খোঁজাখুঁজি করছে। সাহেবের খোপের কাছে এসে দেখে দরজা হা-হা করছে। হয়তো বা ঐখানে পড়ে আছে রাগ করে—

কেউ নেই ভিতরে। সাহেবের ক'টা কাপড়-জামা টাঙানো থাকে, তা-ও নেই।

নজর পড়ল, খাতা খোলা রয়েছে, কলমটা এক পাশে। হিজিবিজি অক্ষর খাতার পাতায়: সাহেব লিখে গেছে আত্মগ্লানির কথা: আমি ভালো, আমার কিছু হবে না। কেন ভালো হলাম? হে মা-কালী, আমায় মন্দ করে দাও। খুব মন্দ হই আমি—

রাত্রিবেলা মেলগাড়ি হু-হু করে ছুটেছে। মাঝের জংশন-স্টেশন থেকে মধুসূদন মা-বউ আর বাচ্চাছেলে নিয়ে উঠল। জুড়নপুরে সাহেব ঘুমন্ত আশালতার গায়ের গয়না চুরি করল, এই বাচ্চা তখন বেশ খানিকটা বড় হয়ে উঠেছে। এ সময় মাস পাঁচ-ছয় বয়স।

রোগা মানুষ মধুসূদন, কিন্তু অশেষ করিতকর্মা। মানুষ তুলে দিয়ে মালপত্তর গণে গণে তুলে সর্বশেষ নিজে উঠল। কামরার চতুর্দিকে মুহূর্তকাল নিরীক্ষণ করে দেখে। মাল ও মানুষ কোথায় কি ভাবে খাপ খাওয়াবে, মনে মনে তার

নম্রা ছুকে নিল। মা-কে বলে, ঐ কোণের বেঞ্চিটা নিয়ে নিলাম আমরা। দিব্যি নিরিবিলি। চলো—

আগে আগে চলল সে নিজে। ঐ তো তালপাতার সেপাই—একে ডিঙিয়ে ওর পাশ কাটিয়ে বোঁচকাবুচকি টিনের স্যুটকেস গ্লাডস্টোন-ব্যাগ ঘাড়ে তুলে ও হাতে ঝুলিয়ে টুক টুক করে পছন্দ-করা জায়গায় এনে ফেলছে। গোটা বেঞ্চিখানায় সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়ে বলে, বসে পড় এইবার।

বউকে বলে, বাচ্চা কোলে কেন? ঐ কোণে শুইয়ে দাও। যত বেশি জায়গা জুড়ে নিতে পার এই সময়।

মালপত্র কোনটা বেঞ্চির তলে ঢুকিয়ে কোন কোনটা বাঙ্কের উপর তুলে দিয়ে লহমার মধ্যে গোছগাছ করে ফেলে। বউয়ের উপর খিঁচিয়ে উঠল: ওকি, হাত-পা গুটিয়ে অমনধারা কেন? গা-গতর ছড়িয়ে জায়গা নাও। এখন এই ফাঁকা দেখছ, এমন থাকবে না, তালতলা স্টেশনে গিয়ে বুঝবে ঠেলা। কালীপূজো গেছে কাল—পূজো দেখে কালীর মেলা সেরে মানুষজন ফিরে যাচ্ছে। কামরায় সর্ষে ফেলার জায়গা থাকবে না দেখো। বললাম যে জগদ্ধাত্রীপূজাটা কাটিয়ে যাই। মামারাও কত বলল। তা মা'র হয়েছে—একটা জায়গায় যাবার বেলা যেমন, আসার বেলাও তাই। রোখ চেপে গেলে আর রক্ষে নেই।

মধুসূদনের মা বলে ওঠেন, কর্তার ঐ অচল অবস্থা, মেয়ে দুটো পড়ে রয়েছে—মন ব্যস্ত হয় না! তোমার কি, চর্ব্য-চোষ্য খাওয়া আর রাজা-উজির মারতে পেলেই হল।

দিদিমাকে দেখতে মধুসূদনরা মামার বাড়ির গাঁয়ে গিয়েছিল, ফিরছে এখন মধুর মা নিজেই বুড়োমানুষ—তাঁর মা একেবারে থুনথুনে হয়ে পড়েছেন—কবে আছেন কবে নেই। নাতি মধুসূদনের ছেলেকে একটিবার তিনি চোখে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ সঙ্গে নিজের মেয়ে মধুর মা'কে দেখাও হয়ে গেল। মধুর বাপ পক্ষাঘাতের রোগি, নড়তে চড়তে পারেন না, তিনি রয়ে গেলেন জুড়নপুরে। আশালতা শান্তিলতা দু-বোনও বাপের সঙ্গে। সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ড্যাং-ড্যাং করে পথে বেরুনো ঠিক নয়। তা ছাড়া বোন দুটোও চলে এলে শয্যাশায়ী মানুষটাকে দেখে কে? মাত্র আটটা দশটা দিন থেকে সেই জন্যেই আরও তাড়াতাড়ি করে বাড়ি ফেরা।

বলেছে ঠিক, মধুসূদন খবরাখবর রাখে। তালতলায় কাছাকাছি জজবাড়ির শ্মশানকালী বড় জাগ্রত। কালীপূজার সাতদিন আগে থেকে শ্মশানক্ষেত্রে মেলা

বসে। পূজা অন্তে আজ সকাল থেকেই মানুষ ঘরে ফিরতে লেগেছে। পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, নৌকোয়, ট্রেনে। মেলগাড়ি তালতলা স্টেশনে না পৌঁছতেই তুমুল হৈ-চৈ কানে আসে। দাঙ্গাই বেধে গেছে হয়েতো বা প্লাটফরমের উপর।

মায়ের পাশটিতে মধুস্থদন নির্বিঘ্ন জায়গা নিয়ে বসেছে। ঝিমুনিও এসেছিল একটু। গণ্ডগোলের সাড়া পেয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে। কামরার দেয়ালে লেখা : বত্রিশ জন বসিবেক। তাড়াতাড়ি মানুষগুলো গণে নেয়। ছোট-বড়য় মিলে তেইশ। পুনশ্চ গণে নিঃসংশয় হয়, তেইশই বটে। তিন লাফে তখন দরজায় গিয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে ট্রেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গেছে। বন্যাস্রোতের মতন লোক এসে দরজার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামরার ভিতর থেকে মধুস্থদন বীর-মূর্তিতে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরেছে। বলে খুলে দিচ্ছি—চলে আস্থন। মোটমাট নয়জন। তেইশ আর বত্রিশ। তার উপরে আধখানা নয়। আধখানা কি, একটা কড়ে-আঙুল অবধি ঢোকাতে দিচ্ছিনে। আইন মোতাবেক কাজ।

কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা রক্তাম্বরধারী দীর্ঘদেহ একজন—কালীভক্ত মানুষ সেটা আর বলে দিতে হয় না—জঙ্গলবাড়ি কালীর মেলা থেকেই ফিরছেন। দরজার সামনে এসে অনুনয়ের কণ্ঠে বলছেন, যেতে হবে যে ভাই দুয়োরটা ছাড়।

মধুস্থদন বলে, জায়গা নেই, বত্রিশ পুরে গেছে।

সাধু-মানুষটি হেসে বলেন, আমায় দিয়ে তেত্রিশ হবে। হয়ে যাবে একরকম করে। আমি আর কতটুকু জায়গা নেব। হয় কিনা, দেখিই না উঠে।

মধুস্থদন ধমক দিয়ে ওঠে : দেখবে কী আবার? লেখা রয়েছে বত্রিশ।

আমি যে যাবই ভাই—

বে-আইনি করে?

রক্তাম্বর সাধু ঝকঝকে দু-পাটি দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বলেন, তুমি বুঝি আইনের বাইরে যাও না কখনও? আমি যাই। যারা আইন করে তারাও যায়।

বচসার মধ্যে মধুর মা ওদিকে ভীত স্বরে চেঁচাচ্ছেন : ওরে মধু, চলে আয় তুই। তোর তো জায়গা রয়েছে, চুপচাপ এসে বসে পড়। একবার গোঁয়াতুমি করে মাথা কাটিয়ে দিয়েছিল, কোনরকমে প্রাণরক্ষে হয়েছে—

গর্জে উঠে মধুস্থদন মায়ের কথা ডুবিয়ে দেয় : প্রাণ যায় যাবে, সে মরণে পুণ্যি আছে। লোকে বলবে অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করে মরেছে।

রক্তাম্বর ইতিমধ্যে পাদানির উপর উঠে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে কামরার অবস্থা দেখছেন।

মধুসূদন ব্যঙ্গস্বরে বলে, ঐ উঁকি পর্যন্ত। তার উপরে হবে না। আমি থাকতে নয়। দেখ না হয় একবার চেষ্টা করে। তার চেয়ে গাড়ি ছাড়বার আগে অন্য কোনখানে চেষ্টা দেখগে।

ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে তাঁকে। হঠাৎ সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। সাধুটি বাঁ-হাত আলগোছে রাখলেন মধুর গায়ের উপর। জোর করে সরিয়ে দিলেন, এমন কথা কেউ বলবে না। মন্ত্রবলে মধু আপনিই যেন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। দূরে দাঁড়িয়ে সভয়ে তাকাচ্ছে: এত শক্তি ধরে কাঁকড়ার ঠ্যাঙের মতো সরু ঐ আঙুলগুলো!

হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে কামরায় ঢুকে পড়ে মধুকে বললেন, জায়গায় গিয়ে বোসোগে। সবাই যাবে, একলা তোমার গেলে তো হবে না। এই ট্রেনে না গেলে প্লাটফরমে পড়ে সারারাত মশার কামড় খেতে হবে। পরের ট্রেন কাল দুপুরবেলা।

দরজা একেবারে মুক্ত করে দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, কষ্টেসৃষ্টে আরও বারো-চোদ্দ জনের জায়গা হয়। চলে আসুন, পয়লা ঘণ্টা দিয়েছে।

মধুসূদন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। তার দিকে চেয়ে সাধু স্নিগ্ধস্বরে প্রবোধ দেন: অমনধারা করে না—ছিঃ! খুলনা অবধি যাওয়া নিয়ে ব্যাপার। তারপরে এ কামরা তোমারও নয়, আমারও নয়। ক-ঘণ্টার মামলা, তাঁর জন্যে এমন মারমুখি কেন ভাই।

দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে এক দঙ্গল ঢুকে পড়ল। পরের লোক এসে বেঞ্চিতে বসে বসে পড়ছে, রক্তাম্বর নিজে কিন্তু জায়গা কাড়াকাড়ির মধ্যে গেলেন না। বাক্স বোঝাই জিনিষপত্র, তারই কতক ঠেলেঠুলে কায়ক্লেশে একজনের মতো একটু জায়গা হল। রক্তাম্বর বাক্সের উপর উঠে গেলেন। মধুর মা-বউ বসেছেন, তাঁদেরই প্রায় মাথার উপরে।

সমস্ত হল। কিন্তু দ্বাররক্ষী মধুসূদনেরই বিপদ এখন। মায়ের পাশে যেখানটা সে বসেছিল, ছুটোছুটি করে নতুন এক ছোকরা সেই জায়গায় এসে বসে পড়েছে।

মধুসূদন হুঙ্কার দিয়ে পড়ে: উঠে পড়ুন। আমার জায়গা এটা।

রণে পরাজিত মধুকে কে পোঁছে এখন! সেই ছোকরা খানিকক্ষণ তো কানেই শুনতে পায় না। বলে, জায়গাটা কি কিনে রেখে গেছেন মশায়?

মধুসূদন বলে, জায়গা ছেড়ে দরজায় চলে গেলাম সকলের উপকার হবে বলে।

উত্তম করলেন, পরের উপকারে পুণ্যি হয়। পরকে বসতে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে কষ্ট করুন, আরও পুণ্যি। গাড়ি এখন স্টেশনে স্টেশনে থামবে, আপনি বরঞ্চ দুয়োর আটকে লোক খেদিয়ে সারা রাত পুণ্যি সঞ্চয় করুন। বসতে যাবেন কি জন্মে?

এই নিয়ে আবার একদফা জমে উঠছে, ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধের ব্যাপার। ঠিক সামনের বেঞ্চিতে সাহেব আর নফরকেষ্ট। নফরকেষ্টর আপিসের পোশাক—ধবধবে জামা-কাপড়, চোখে নীলচশমা। সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে মধুসূদনের জায়গা করে দেয়: বসুন আপনি। সত্যিই তো, আপনার একার কিছু নয়—সকলের জন্য লড়তে গিয়েছিলেন।

মধুর মা চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে সাহেবের দিকে। দেবতার মতো রূপবান ছেলের বিনয় ও বিবেচনা দেখে গলে গেছেন একেবারে। বাধা দিয়ে বললেন, সে হয় না। জায়গা ছেড়ে দিচ্ছ, তোমাকেও তো বাছা এত পথ তাহলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। মধুর হকের জায়গা অন্য একজনে জুড়ে বসে রইল, সে তো একবার নড়ে বসে না। তুমি তবে কি জন্মে উঠতে যাবে? বসে থাক, যেমন আছ।

সাহেব হাসে। সরু সরু সাদা দাঁত। ছেলেপুলের দুধে-দাঁত ইঁদুরের গর্তে দিয়ে বলতে হয়, এর বদলে তোমার দাঁত দিও ইঁদুর: নতুন দাঁত যেন ইঁদুরের মতো হয়। সাহেবের সেই ইঁদুরের দাঁত। ক্ষুদে ক্ষুদে দুই পাটি দাঁতের অপরূপ হাসি—ঐ হাসি দেখেই মানুষের আরও বেশি করে টান পড়ে।

হেসে সাহেব বলে, বসে বসে পায়ে খিল ধরে গেছে মা, একটুখানি দাঁড়াই। শরীর টান টান করে নিই। বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। বড্ড কষ্ট যাচ্ছে কাল রাত্তির থেকে। বসে রাত কাটানো পোষাবে না আমার। শুতে হবে।

সাহেব বাঙ্কের শিকল ধরে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে এইবার কথাবার্তার ফুরসত। উপর থেকে রক্তবসন সাধুটি মধুসূদনের কপালের ক্ষতচিহ্নের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন, কী হয়েছিল ভাই?

মৃদু হেসে মধুসূদন বলে, যে দেখে সে-ই জিজ্ঞাসা করবে। লুকোবার জো নেই।

তোমার ফাটা-কপাল হাজার লোকের মধ্যে থাকলেও নজরে পড়ে।

মধুসূদন গর্বিত কণ্ঠে বলে, ফাটা কপাল নয়, জয়তিলক। কপালের উপর পাকা হয়ে লেখা আছে। সরকারি লোকের উপর চড়াও হয়েছিলাম। হাটে মানুষ গিজগিজ করছে, তারই ভিতর। বাঙালিকে ভীরু বলে—অপবাদটা খণ্ডন করলাম।

কানাইলাল-ক্ষুদিরামের পর কেউ বাঙালিকে ভীরু বলে না নিতান্ত নিন্দুক আর শত্রুপক্ষ ছাড়া। কৌতুহলে রক্তাম্বর নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসেন : সরকারি লোক হাটের ভিতর গিয়ে কি করছিল ?

হাত-মুখ নেড়ে সেই বীরত্ব মধুসূদন সবিস্তারে বর্ণনা করে। সরকারি লোক মানে চৌকিদার। হাটের মালিক যথারীতি তোলা তুলে যায়, তারপরে চৌকিদারেরা জুটে চৌকিদারি তোলে। সুপারি একটা, পানপাতা দুটো, কাঁচালঙ্কা দুগণ্ডা, চিংড়ি-পুঁটি এক এক মুঠো, মুলো একটা, পালং একআঁটি, টো-ব্যাপারি যত আছে কারও একপয়সা কারও আধপয়সা—এমনি হল রেট। হাটের সময়টা চারিপাশের গ্রামের পাঁচ-সাতটা চৌকিদার কাক-চিলের মতো পড়ে চৌকিদারি তুলতে লেগে যায়। পরে সমস্ত এক জায়গায় নিয়ে বখরা করে। এক বুড়ো সেদিন গোটা পাঁচেক অকালের বাতাবিলেবু নিয়ে বসেছে—তারই একটা ধরেছে এসে। বুড়ো দেবে না, চৌকিদারও ছাড়বে না। টানাটানি, কাড়াকাড়ি। চোকিদারের ছিল লম্বা দাড়ি—

কথার মাঝে নিজের বুক ঠুকে মধুসূদন বলে, এই যে মানুষটা দেখছ, অন্যায় কিছু চোখে পড়লেই মাথার মধ্যে চনমন করে ওঠে।

রক্তাম্বর মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করেন : কম বুদ্ধির লক্ষণ।

মধুসূদন কানেও নিল না। তেমনি দম্ভ ভরে বলে যাচ্ছে, চৌকিদারের দাড়ি ধরে পাক দিয়ে শুইয়ে ফেললাম। তারপরেই কুরুক্ষেত্তোর কাণ্ড। রে-রে—করে চতুর্দিক থেকে ছুটছে। মারগুতোন শুরু হয়ে গেল—যাকে বলে হাটুরে-মার। কিল-চড়-ঘুষি—যে যতদূর কায়দায় পায়, মেরে নিচ্ছে। মেরে হাতের সুখ করে।

চৌকিদারকে ?

উঁহু, তার কোমরে যে সরকারি চাপড়াশ। সরকারী লোক মারার তাগত কি যার-তার থাকে! মারছে আমাকে। হাটের মাঝে এক তালগাছ—রাগ না চণ্ডাল, সেই তালের গুঁড়ির উপর নিয়ে আমার মাথা ঠুকতে লাগল। আমি সেসব কিছু জানিনে, জ্ঞান হল হাসপাতালে গিয়ে।

রক্তাম্বর বলেন, কিন্তু রাগটা তোমার উপর কেন ? তুমি তো সকলের ভাল করতে গিয়েছিলে।

আজকেও তো তাই, বসবার জায়গাটা অবধি বেদখল। পরে যেটা শুনলাম—গ্রাম পাহারা দেয় বলে পাবলিকেই চৌকিদারি আদায় করতে বলেছে। অন্যায়টা আসলে চৌকিদারের নয়, প্রেসিডেন্ট-পঞ্চায়েতের। সদর থেকে চৌকিদারের মাইনে আসে, প্রেসিডেন্ট সেটা মেরে দেন। হুকুম আছে :

এলাকার ভিতর থেকে বন্দোবস্ত করে নাওগে। উল্টে চৌকিদারই প্রেসিডেন্টকে দিয়ে থাকে কিছু কিছু, নইলে চাকরি বজায় থাকে না। তা প্রেসিডেন্ট মশায় থাকেন দোতলা পাকা-দালানে, হাতের মাথায় পাই কেমন করে তাঁকে ?

একটু থেমে দম নিয়ে মধুসূদন বলে, তবে কথা একই—চৌকিদারের দাড়ি ধরে প্রেসিডেন্টের দাড়ি ধরাই হয়ে গেল। সবাই সরকারি লোক। প্রেসিডেন্ট বলে কেন, লাটসাহেবের দাড়ি—এমন কি, সমুদ্র-পারে ভারত-সম্রাটের অবধি দাড়ি ধরা হয়েছে। হয়েছে কিনা বলো ?

সম্রাটের দাড়ি ধরে এসেছে—সেই আত্মপ্রসাদে মধুসূদন চারিদিক তাকিয়ে চোখের তারা বিঘূর্ণিত করছে, আর দ্রুতবেগে পা দোলাচ্ছে।

কতক্ষণ কাটল। মেলগাড়ি সড়াক-সড়াক করে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যায়। শিকল ধরে সাহেব তেমনি ঝুল খেয়ে আছে। চোখ বুঁজে আসে ক্ষণে ক্ষণে, মাথা কাত হয়ে পড়ে।

নজর পড়ে মধুসূদনের মা চুকচুক করেন: দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছ বাছা, পড়ে যাবে যে!

লজ্জা পেয়ে চোখ মেলে সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, ঐ যে বললাম মা, কাল রাত্তির থেকেই ধকল যাচ্ছে। চোখ ভেঙে আসছে! না শুয়ে উপায় নেই দেখছি।

মা অবাক হয়ে বলেন, বসতে না পেয়ে লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোথায় শোবে তুমি ?

সাহেব হেসে নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, বসার জায়গা না থাক, শোওয়ার তো অঢেল জায়গা।

শোবারই ব্যবস্থা করে নিল সাহেব। একদিকের বেঞ্চিতে পাশাপাশি মধুসূদন আর নফরকেষ্ট, উল্টো দিকে মধুর মা, বউ আর বাচ্চা-ছেলেটা। দুই বেঞ্চির ফাঁকে মেজের কাঠের উপর সটান সে শুয়ে পড়ল। গায়ে জামা—শীতের আমেজ বলে সাহেব জামাসুদ্ধ শুয়েছে। মোটা সুতির চেক-কাটা চাদর কাঁধে ছিল, শুয়ে পড়ে গায়ের উপর চাপাল সেটা।

মধুর মা বলেন, পায়ের কাছে এ কেমন শোওয়ার ছিরি!

সাহেব বলে, আপনার পা গায়ে লাগবে, সে তো আশীর্বাদ আমার মা।

এমন সুন্দর কথা বলে ছেলেটা—পা একটু গুটিয়ে নিলেন মধুর মা। বেঞ্চির একেবারে কোণটায় বাচ্চা ঘুম পাড়িয়ে বালিশ ঘিরে দিয়েছে, তার এদিকে বউটা গুটিসুটি হয়ে পড়ে! ঘুমিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। সামনা-সামনি বসে মধুসূদনও এক-একবার ঢুলে পড়ে, নড়েচড়ে চোখ রগড়ে খাড়া

হয়ে বসে আবার। আর নীল চশমার অন্তরালে নফরকেষ্টর চোখ বন্ধ কি খোলা, বোঝার উপায় নেই।

দুলছে গাড়ি। খট-খট খটাখট। লোহার পাটির উপর দিয়ে ছুটছে খুব জোরে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে জোনাকিপুঞ্জ গাছে গাছে যেন তারা হয়ে ফুটে আছে। কিন্তু দেখছে কে এত সব! কামরার সমস্ত মানুষ, বসে হোক আর দাঁড়িয়েই হোক. চোখ বুজে রয়েছে। জগৎ-সংসার এখন আর চেয়ে দেখবে না, যেন প্রতিজ্ঞা।

হঠাৎ একবার নফরকেষ্ট ডেকে ওঠে: ওরে খোকা!

সাহেব নয়, আদি-নাম গণেশও না। এমনি সব ক্ষেত্রে নতুন নামে ডাকবার বিধি। 'খোকা' নাম বুড়ো হয়ে গেলেও চলে। বিশেষ করে, বাপের যে দাবিদার, সেই মানুষের মুখে।

চোখ খুলে মধুর মা বলেন, অকাতরে ঘুমুচ্ছে, ওকে ডাকাডাকি কর কেন?

গাড়িতে উঠবার আগে গা-বমিবমি করছিল। এখন কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করে দেখি।

মধুর মা চটে গিয়ে বলেন, বলিহারি তোমার আক্কেল! বমি যদি আসে, ডেকে তুলতে হবে না। আপনি উঠে বসবে। দেখতে পাচ্ছি, বড্ড হিংসুটে মানুষ তুমি। বসে বসে নিজের ঘুম হচ্ছে না, ওকেও তাই ঘুমুতে দেবে না। কী হয় তোমার?

নফরকেষ্ট বলে, ছেলে।

চমক খেয়ে মধুর মা তাকিয়ে পড়লেন তার দিকে: কেমন ছেলে তোমার?

সকলের যেমন হয়। পাশের মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, আপনার ছেলে যেমন ইনি।

ডেকে ডেকে ছেলেকে জ্বালাতন কর কেন? অসুখের কথা বললে, চুপচাপ শুয়ে ঘুমুতে দাও। চোখ বুজে নিজেও বরঞ্চ ঘুমানোর চেষ্টা দেখ।

ব্যাপারটা নফরকেষ্ট যেন আগে খেয়াল করেনি, বুঝে দেখ বিষম অপ্রতিভ হয়েছে। তেমনিভাবে বলে, উতলা হয়ে পড়েছি কিনা, ছেলেটার মা নেই। আপনি ঠিক বলেছেন। ডাকাডাকি করব না, আরাম করে ঘুমোক।

গায়ের উপরের চাদর জায়গায় জায়গায় সরে গেছে। নফরকেষ্ট পরিপাটি করে ঢেকে দেয়। বেঞ্চির তলায় মধুসূদনের গ্লাডস্টোন-ব্যাগ—সাহেবকে ঢাকা দিতে গিয়ে সে বস্তুটাও চাপা পড়ে যায় চাদরের নিচে।

কাল রাত্রেও গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে এক ব্যাপার। যখন যে ফ্যাশান ওঠে। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ নিয়ে বেড়ানোর রেওয়াজটা বড় বেশি আজকাল। হাতে ছু-চার পয়সা হলেই লোকে ঐ ব্যাগ একটা কিনে ফেলবে।

কালীঘাটে, এমন কি কলকাতা শহরের উপরও আর নয়—আপাতত রেলের কাজ ধরবে, নফরকেষ্টরা ঠিক করে বেরিয়েছে। অতএব সকালবেলা ছু-জনে চাঁদনির এক দোকানে গিয়ে ঢুকল।

মালে চাইনে, দামে সস্তা—এমনি জিনিস মশায়। হপ্তা পরে খতম হলেও ক্ষতি নেই। দেখতে খুব চমকদার হবে।

অভিজ্ঞ দোকানদার ঘাড় নেড়ে বলে, বুঝেছি। প্রীতি-উপহারের মাল। বাজার বুঝে সব রকম আমাদের রাখতে হয়। ঘর-ব্যাভারি থাকে প্রীতি-উপহারও থাকে। যেমন ইচ্ছা নিয়ে নিন।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগ কিনে জঞ্জালে ভরতি করছে। যথোচিত ভারী হয় না দেখে রাস্তা থেকে গোটা কয়েক পাথুরে খোয়া নিয়ে ভিতরে ঢুকাল। বাবু নফরকেষ্ট এবং তস্য পুত্র শ্রীমান গণেশচন্দ্র নগদ টাকায় টিকিট কেটে চলেছে দেশভ্রমণে। নফরের হাতে ব্যাগ, বাড়তি ছু-চারটে জিনিস চেক-কাটা চাদরে সাহেব পুঁটলি করে নিয়েছে।

গাড়িতে উঠে সাহেব জানলায় মুখ দিয়ে বাইরের শোভা দেখছে। নফরকেষ্ট ভিতরের বেঞ্চিতে। ঘুম ধরছে, ঢুলে ঢুলে পড়ছে।

পাশের লোক খিঁচিয়ে ওঠে: বালিশ নাকি আমি—গায়ের উপর দিব্যি আরামে মাথা চাপিয়ে দিয়েছেন? খাড়া হয়ে বসুন।

মার্জনা চেয়ে নফর খাড়া হয়ে বসল। কিন্তু কতক্ষণ! চোখ বুজে এবার সে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে ঢুলছে। হঠাৎ এক সময় সাহেব চেঁচিয়ে উঠল এই তো, এসে গেছি বাবা—

ছোট একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। গোটা ছুই কেরোসিনের আলো টিমটিম করছে, সেই কয়েক হাত জায়গা ছাড়া ঘন অন্ধকার চতুর্দিকে! হুড়মুড় করে ছু-জনে নেমে পড়ল। গাড়িও ছেড়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। কয়েকটা রক্তবিন্দু—দূরবর্তী হয়ে ক্রমশ তা-ও মিলিয়ে গেল।

গেট-বাবু লণ্ঠন উঁচু করে দেখে বলেন, টিকিট যে তালতলার। এঃ মশায়, এখানে নেমে পড়েছেন! তালতলার তো অনেক দেরি।

বিপন্ন নফরকেষ্ট বলে, কী সর্বনাশ! ঘুম এসে গিয়েছিল, ব্যস্তবাগীশ ছোঁড়াটা চেঁচিয়ে উঠল। রাত্তিরবেলা অত আর বুঝে উঠতে পারলাম না—

সাহেব বলে, আমি যেন পড়লাম স্টেশনের নাম—

নফরকেষ্ট গর্জন করে ওঠে: তোর বাপের মাথা পড়েছিস। পিটিয়ে তুলোধোনা করব, টের পাসনি হারামজাদা!

পরক্ষণেই সকাতরে গেট-বাবুকে বলে, পরের গাড়ি কখন স্যার?

রাতের মধ্যে নেই। কাল দিনমানে—

নফর মাথায় হাত নিয়ে পড়ে: উপায়?

গেট-বাবুর দয়াবান। বললেন, ওয়েটিংরুমের চাবি খুলে দিচ্ছে। ঐখানে পড়ে থাকুন। আর কি হবে!

ওয়েটিং-রুমে ঢুকে দরজা এঁটে দিল। প্রয়োজন ছিল না, জনমানব কোন দিকে নেই। কিন্তু গুরুবাক্য: কাজের মুখে নিজেকেও বিশ্বাস নেই। আয়না ধরে নিজের চেহারাটাও দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হবে, আমিই ঠিক নেই লোক কিনা।

দরজা-জানলা বন্ধ করে নফরকেষ্ট দেশলাইয়েই কাঠি জেলে ধরল। নামবার সময় ব্যাগ বদল করে এনেছে। কাজটা একেবারে নির্বিঘ্ন। ধরে ফেলল তো জিভ কেটে বলবে, তাই তো মশায়, বড্ড রক্ষে-হয়ে গেল। যথাসর্বস্ব আমার ব্যাগের ভিতর—কী যে মুশকিলে পড়তাম!

কাঠি একটা শেষ হয়ে গেলে আর একটা ধরায়। সাহেবকে সতর্ক করে: একটা একটা করে বের কর সাহেব। যত্ন করে নামিয়ে রাখ। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। মা-কালী কী জুটিয়ে এনে দিলেন, কিছু বলা যায় না। পলকা জিনিষও থাকতে পারে।

সাহেব বের করছে, ঝুঁকে পড়ে নফর দেখে। খাতা আর কাগজ। পুরানো বাংলা হরপে লেখা কান-কোঁড়া নানা রকমের দলিল। ভিতরে হাত ঢুকিয়ে উলটে-পালটে দেখে, কাগজ ছাড়া অন্য কিছু নেই।

হায় মা-কালী, কী লীলাখেলা তোমার! নতুন লাইনের কাজ ধরে পয়লা বউনি-মুখে এটা কি করলে? ছেলেমানুষ কত আশায় ব্যাগ খুলেছে, তার মনটাই বা কী রকম হয়ে গেল! কাগজপত্র ফেলে শুধু ব্যাগটাই যে নিয়ে নেবে—তলা উইয়ে খেয়েছে না কি হয়েছে, দেশি মুচি দিয়ে মোটা চামড়ার পটি দিয়েছে সেখানটা। এহেন মহামূল্য বস্তু পাছে কোনদিন পাচার হয়ে যায়, বড় বড় অক্ষরে মালিকের নাম-ঠিকানা ব্যাগের গায়ে।

ক্রুদ্ধ হতাশায় নফর গর্জন করে: শয়তান! হীরে-মুক্তো বোঝাই করে নিয়েছে, এমনিভাব দেখাচ্ছিল। তাই তো আরও বেশি করে আমার নজর ধরল। ভাহা বেকুব বানাল আমাদের!

সাহেব বলে, মামলার দলিলপত্তর এসব। যশোরে লোকটা মামলা করতে যাচ্ছিল। দলিল তো হীরে-মুক্তোই ওর কাছে।

ব্যাগ সুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে অনুনয়ের সুরে বলে, যাব তো ঐ দিকেই। আমি বলি, যশোরে নেমে কাগজগুলো পৌঁছে দিলেও হয়। উকিলের নাম ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে। মানুষের অকারণ ক্ষতি করে কি লাভ!

এ কথায় নফরকেষ্ট ক্ষেপে যায়: আমার দোকানে সেদিন ঐ কাণ্ড করলি—আবার তাই? কোন হতচ্ছাড়া দয়াময়ের ব্যাটা—এ লাইন তোর জন্যে নয়। ভলন্টিয়ার হয়ে পরের দুঃখ মোচন করে বেড়াগে যা।

ক্রোধের কারণ আছে সত্যি। গ্লাডস্টোন-ব্যাগ এবং দুজনের রেলভাড়া গচ্চা গেল। কাজটায় বিপদ নেই বটে, কিন্তু কপালের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। নিতান্তই জুয়াখেলার মতো।

কাল রাত্রে এই হয়েছে। আজকে আর এক রকমের খেলা। রেলের কাজের বিস্তর পদ্ধতি। মধুর মায়ের সঙ্গে নফরার এত কথাবার্তা, কিন্তু বউ অথবা মধুসূদন একটিবার চোখ মেলেনি, কোনরকম সাড়া দেয়নি। সাড়া দেবার অবস্থাই নেই—নজর ফেলে বোঝা যায়। নীল-চশমার আড়াল থেকে নফরকেষ্ট সমস্ত কামরায় একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল। তারপরে পায়ের চাপ দিল ঘুমন্ত সাহেবের গায়ে। রাস্তার কাজ, ট্রাম-বাসের কাজ, রেলের কাজ—কাজ অনুযায়ী নিয়ম-কায়দা সব আলাদা। আজকেই এই কাজের কারিগর হয়েছে সাহেব। বয়স ও চেহারার গুণে সাহেবকেই এমনি ধারা ঘনিষ্ঠ হয়ে পায়ের কাছে শুতে দিয়েছে, অন্য কাউকে দিত না। নফরকেষ্ট হলে তো কিছুতে নয়। নফরকেষ্ট চাদর গুঁজে কাজের গোছগাছ করে দিল। সেটা ডেপুটির কাজ। কিন্তু ডেপুটি না বলে এই ক্ষেত্রে সর্দার বা সেনাপতি বলাই ঠিক। নিকটে ও দূরে ভাল করে দেখে নিয়ে পায়ের চাপে সেনাপতি নিঃশব্দ হুকুম দিল: সুসময়, লেগে পড় এইবার।

ইঙ্গিত পেয়ে সাহেব গাঁট থেকে ছুরি বের করে। হরেক রকমের ছুরি সঙ্গে—চামড়া-কাটা ছুরি, টিন-কাটা ছুরি, ছাড়া কাচের টুকরো, পেরেক—তিন চারটে টাকাও। কাজের উপকরণ এই সমস্ত। টাকা রাখতে হয়—বিপদের মুখে হাতে গুঁজে দিয়ে পালাবে। সাহেবের সর্বদেহ চাদরে ঢাকা, শুধুমাত্র মুখ আলগা। সে মুখ-চোখ অঘোরে ঘুম ঘুমাচ্ছে, চাদরের নিচে দ্রুত হাতে কাজ চলছে ওদিকে। চাদর একটুকু নড়ে না। দীঘির জলের নিচে মাছ কত খেলে বেড়াচ্ছে, উপরের জলে সাড়া লাগে না যেমন। রীতিমতো কষ্ট করে শিখতে হয়, এ বস্তু অমনি আসে না। নফরকেষ্টর

সাফাই হাতের গুণগান সর্বত্র। বাপ ছেলের সম্পর্ক পাতিয়েছে—ছেলেকে উত্তরাধিকারী রূপে সেই গুণের খানিকটা ইতিমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে। ছুরিখানাই বা কী—মধুসূদনের ব্যাগ যেন চামড়ার নয়, মাখন দিয়ে তৈরি। মাখনের দলার মধ্যে ছুরি চালাচ্ছে।

গ্লাডস্টোন-ব্যাগের কাজ সমাধা হল তো পাশে রয়েছে বোঁচকাবুচকি—ঘুমের ঘোরে চাদরের নিচের হাত বেরিয়ে এসে বোঁচকার উপর পড়ে। পায়ের আঙুলে চেপে ধরে নফরকেষ্ট চাদরের কোণ তাড়াতাড়ি সেদিকে টেনে দিল। দিয়ে চাপ দিল আবার পায়ের: নির্ভাবনায় চালিয়ে যাও বাপ আমার।

নিখুঁত কাজকর্ম, তিলমাত্র ত্রুটি নেই কোনদিকে। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ—উঁহু, শেষ পরিণাম বিবেচনা করে খারাপ অদৃষ্ট বলা যাবে না। ইঞ্জিনে জোর দিয়েছে, ট্রেন বিষম দুলছে। টিনের সুটকেশটা মধুসূদন বাঙ্কের উপর রেখেছে। হুড়মুড়িয়ে সেটা নিচে এসে পড়ে—পড়বি তো পড়, সাহেবের মুখের উপরে। চোখ মেলে মধুসূদনের মা হাউমাউ করে উঠলেন: ওরে কী সর্বনাশ! খুন হয়ে গেছে পরের ছেলেটা গো!

মধুসূদন তুলে ধরল সুটকেস। সাহেবও উঠে বসল। তোবড়ানো পুরানো জিনিস, জোড় খুলে টিন হাঁ হয়ে আছে। টিনের খোঁচা লেগেছে সাহেবের মুখের দু-তিন জায়গায়। রক্ত বেরিয়ে গেছে। বাঁ-চোখের ঠিক নিচেই একটা খোঁচা—অল্পের জন্য চোখ বেঁচে গেছে।

সোরগোল। কামরার মানুষ সকলের ঘুম ছুটে গেছে। মধুর মা আহা রে, আহা রে—করছেন। চোখে জল পড়ছে তাঁর। কে-একজন ওদিক থেকে বলে ওঠে, অসাবধানে রাখে কেউ অমন! খুব তো ফড়ফড়ানি মশায়। মানুষটা খুন হয়ে যাচ্ছিল—আইনে এবার কি বলবে?

মধুসূদন বেকুব হয়েছে, তবু মুখের জোর ছাড়ে না: লোকটার দিকে চেয়ে জবাব দেয়: সাবধানেই রাখা হয়েছিল। সাধুমশায় ঐ যে সরিয়ে-ঘুরিয়ে স্বর্গে চড়লেন, উনিই গোলমাল করেছেন। তা হয়েছে কি শুনি?

সাহেবও সেই সুরে সুর মেশায়: ছড়ে গিয়েছে একটুখানি। এখন কত হয়। আমার এতে লাগে না।

মায়ের উপর মধুসূদন ধমক দেয়: তুমি অমনধারা করছ কেন মা? সব তাতে বাড়াবাড়ি। যার লেগেছে সে বলে, কিছু নয়। হলেই বা কি! ব্যাগের মধ্যে এক-ডিস্পেনসারি ওষুধ নিয়ে যাচ্ছি। হোমিওপ্যাথি ওষুধ—যার এক দাগ খাইয়ে কাটা-মুণ্ড জুড়ে দেওয়া যায়। তিন-চার বড়ি আর্নিকা খাইয়ে দিচ্ছি, ব্যথাটুকুও হবে না।

বেঞ্চির তলায় গ্লাডস্টোন-ব্যাগ টেনে বের করে। এই গোলমালের মধ্যে নফরকেষ্ট কোন সময় জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। সিগন্যালের বিলম্বে গাড়িটাও লহমার জন্যে থেমেছিল বুঝি। টুক করে সেই সময় সে নেমে পড়ল। সাহেব ব্যূহবেষ্টনীর মধ্যে। ব্যাগ টেনে এনে বেঞ্চির উপর রেখে মধুসূদন ওষুধ বের করবে। এ কি, একদিকের চামড়ায় লম্বালম্বি ফালি।

মধুর বুড়ি দিদিমা পদক-যশম দিয়ে নাতির ছেলের মুখ দেখছেন। দিয়েছেন কোমরের নিমফল, ছোটমামী কপালের পুঁটে। এই তিন দফা গয়না রুমালে একসঙ্গে বাঁধা ছিল। আরও নাকি পাঁচ টাকার নোট দুখানা। সমস্ত লোপাট।

বাঙ্কের উপরের রক্তাম্বর সাধু লম্ফ দিয়ে পড়লেন। রাগে গরগর করছেন: অ্যাঁ, ছোঁড়া তুই কোঁচড়ের ইঁদুর হয়ে কুটুর-কুটুর কাপড় কাটিস?

বাঘের মতন পড়ে সাহেবের টুঁটি চেপে ধরলেন। আক্রোশে মধুসূদনও মারছে, কিন্তু সাধুর কাছে লাগে না। দমাদম কিল মারছেন পিঠের উপর। মুষলধারে—থামাথামি নেই। বেপরোয়া ঘুসি। কামরা-ভরা লোকের হাত নিসপিস করছে—কিন্তু সাধুই মেরে চলেছেন রকমারি কায়দায়, এদিক থেকে সেদিক থেকে পাকচক্কোর দিয়ে। অন্যের এগোবার সাধ্য নেই তার ভিতরে। কাণ্ড দেখে সকলে থ হয়ে গেছে। যা রাগ, একেবারে মেরেই ফেলেন বুঝি!

তাঁকেই ঠেকাচ্ছে এখন সকলে মিলে: অত মার মারছেন, মরে যাবে যে! আপনার কী এতে বাবাজী?

যাক মরে। যাক, যাক। এরা সব মানুষ নামের কলঙ্ক, সমাজের আপদ-বালাই। মরে গেলে ধরিত্রী জুড়োয়।

কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে তাঁর: আমারও সর্বনাশ হয়েছিল এমনি গাড়ির কামরায়। পরিবারের গয়নার বাক্স নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। গয়নার দুঃখেই পরিবার শেষটা আত্মঘাতী হল। কলকে-ফুলের বীচি খেয়ে মরল। তারপর থেকে আমার এই দশা। নিকুচি করেছে সংসারের! সাধুবিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বলতে বলতে পুরানো স্মৃতিতে রাগ আবার চড়ে যায়। পা তুলে লাথি কষিয়ে দিলেন সাহেবের পিঠে।

মধুসূদনের মা আঁকুপাকু করছেন। রক্তাম্বরের উপর ক্ষেপে ওঠেন: ধর্মকর্ম কর না তুমি? চণ্ডালের রাগ যে হার মেনে যায় তোমার কাছে।

আর এক প্যাসেঞ্জার বলে, ধর্ম না কাঁচকলা! কাপালিক এরা—মারণ-

উচাটন কাজ। পোশাকে টের পাচ্ছেন না? নরবলি দেয়। কান্নায় পেয়েছে একটাকে। খাঁড়া-মেলতুক এখন কোথায় পায়—হাত-পা দিয়েই বলির কাজ সারছে।

জনকয়েক এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে রক্তাম্বরকে সরিয়ে দেয়: আর মারবেন না, উল্টে আপনিই কেসে পড়ে যাবেন, সাধু বলে আইনে ছাড়বে না। আমাদেরও রেহাই দেবে না পুলিস, সবসুদ্ধ হাতে দড়ি পড়বে। এখন ঠাণ্ডা হন। দৌলতপুরে এসে যাচ্ছে, গাড়ি অনেকক্ষণ থামবে: রেল-পুলিসের জিম্মা করে দেওয়া যাবে।

মুখ বাঁকিয়ে রক্তাম্বর বলেন, পুলিস! বলবেন না, বলবেন না—এই বয়স অবধি পুলিস আমার ঢের ঢের দেখা হয়েছে। আপনারা এ দরজা দিয়ে বেরুলেন, পুলিসের হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে আসামিও অন্য দরজায় বেরিয়ে গেল!

মধুসূদন বলে, পুলিস সাচ্চা হলেই বা ক্ষমতা কী তাদের! কোর্টে কেস তুলে দিল—দু-মাসের জেল। মজাসে সরকারি খানা খেয়ে পাকা-ঘরে বসবাস করে একদিন বেরিয়ে এল জেল থেকে। এসে তখন দুনো তাগত নিয়ে কাজে লাগে।

উত্তেজনায় ছটফট করছে সে। বলে, জেল-টেল কিছু নয়—ধরে এদের ফাঁসিতে লটকানো উচিত। তবে সমুচিত শিক্ষা হয়। ফাঁসির পরেও গলায় দড়ি বেঁধে গাছে টাঙিয়ে রাখা। রোদে শুকোক, কাকে ঠুকরে ঠুকরে খাক। অসৎকর্মের পরিণামটা চোখে দেখুক সর্বজন।

সাহেব হাপুসনয়নে—কাঁদছে। সকলের বলাবলিতে মারগুতোন আপাতত বন্ধ। তল্লাসি চলছে কাপড়চোপড় ও জায়গাটার এদিক-সেদিক।

গয়না-টাকা কোথায় রাখলি তুই?

কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাহেব বলে, আমি নিইনি। আমি কিছু জানিনে।

মধুর মা মাথা ভাঙাভাঙি করছেন: মিছামিছি তোরা মারধোর করলি। ও নেয়নি, অমন ছেলে নিতে পারে না। চেহারা দেখেও বুঝিস না তোরা—চোরের কখনো এমন দেবতার রূপ! নিয়ে থাকে তো গেল কোথা জিনিসগুলো—গিলে খেয়েছে মুখের ভিতর ফেলে?

মায়ের কথারই জবাব দেয় মধুসূদন সাহেবের উপর তড়পে উঠে: তোর সেই বাপটাকে দেখছিনে তো! গেল কোথায়? তাকে দিয়ে পাচার করলি।

মা ওদিকে বলেই চলেছেন, বউটা হয়েছে তেমনি আগোছালো—কোথায় কি রাখে, ঠিকঠিকানা থাকে না। ব্যাগে না রেখে হয়তো বা সুটকেশে রেখেছে

স্যুটকেশটা দেখ তোরা খুঁজে। আনেইনি হয়তো মোটে। তোর বড়মামীর কাছে রাখতে দিয়েছিলি—খোঁজ নিয়ে দেখবি, সেইখানে পড়ে আছে। উঃ, বাছা তুই কার মুখ দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলি রে!

চকিতে সাহেব মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকায়। কে যেন বুকের মধ্যে বলে ওঠে, দুনিয়াময় মায়ের কোল—মায়ের কোল বাদ দিয়ে পালাবি কোনখানে হতভাগা? রেলের কামরাতেও মা। এক কাঠাও ভুঁই পাবিনে মায়ের কোল যেখানটা নেই।

মধুর বউয়ের উপর দোষ পড়েছে, বউ কথা না বলে পারে কেমন করে? বলে, আমি আগোছালো মানুষ—জিনিস না হয় ফেলে এসেছি। কিন্তু ব্যাগটা যে এমন করে কেটে ফালা-ফালা করেছে, সে মানুষটা কে?

সাহেব বলে, আমি করিনি—

বেঞ্চির তলে অনেকটা দূরে এই সময় ছুরি আবিষ্কার হল। নফরকেষ্টকে আর সব দিয়েছে, ওটা দেয়নি পাশাপাশি যেসব মাল আছে, সেই কাজের সময় লাগবে বলে। দুর্ঘটনায় আর কিছু হতে পারল না। ছুরিটা হাতে তুলে ধরে মধু বলছে, কার এটা—এল কোত্থেকে?

সাহেব বলে, আমার জিনিস নয়।

মার বন্ধ করে রক্তাম্বর ফুঁসছিলেন এতক্ষণ অজগর-সাপের মতো। আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন: বটে রে! একে চোর, তায় মিথ্যুক! ছুরির বুঝি পাখনা হয়েছিল, উড়তে উড়তে তোর কাছে এসে গেছে?

বলেই এক ঘুসি। আবার দ্বিতীয় ঘুসি তুলেছেন, ছুটে এসে একজনে হাত চেপে ধরে। ঠেকানো কি যায়! মানুষটার গায়ে অসুরের বল—সে তো কামরায় ঢোকবার মুখেই সকলের চাক্ষুষ হয়েছে।

বললেন, দৌলতপুর-টুর নয়—শেষ জায়গা খুলনায় নিয়ে ফেলব। ওখানকার থানা কোর্ট সর্বত্র আমার খাতির। মধুবাবু খাঁটি কথাই বলেছে—এই বয়সে এত বড় বিচ্ছু—ছোঁড়ার ফাঁসি হওয়াই উচিত। পানসা আইনে সে তো হবার জো নেই, কদ্দুর ঠেসে দেওয়া যায় দেখি। চুল পাকবার আগে বাছাধনের বেরুতে না হয়, সেই তদ্বির করব। বেরিয়ে এসে লাঠি ঠুকঠুক করে দশ দুয়োরে ভিক্ষে করে বেড়াবে, অন্য কিছু করার তাগত থাকবে না।

খুলনা স্টেশনে ট্রেন তখনো ভাল করে থামেনি, রক্তাম্বর সজোরে সাহেবের ঘাড় ধাক্কা দিলেন: চল্—

মধুর মা ব্যাকুল হয়ে বলেন, সত্যি সত্যি যে নিয়ে চললে বাবা?

ভগবানের নাম করি, সত্যি ছাড়া মিথ্যে এ মুখে বেরোয় না। বেরোবার উপায়ই নেই।

সাহেব আর্তনাদ করছে। ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে তাকে প্ল্যাটফরমে নামিয়ে ফেললেন।

লাইনের শেষ স্টেশন। সকলে নেমে পড়ছে। সাধু ডাক দিলেন, আপনাদের কেউ কেউ চলে আসুন মশায়রা।

কোথায়?

আপাতত থানায়। তার পর যখন মামলা উঠবে, কোর্টেও দিন কয়েক। ছোঁড়াটাকে এত সমাদরে নিয়ে যাচ্ছি, সাক্ষি-টাক্ষি দিয়ে কৈবল্যধামের ব্যবস্থা করবেন তো!

যে লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে, রক্তাম্বর তারই হাত চেপে ধরেন: আপনি একেবারে সামনের উপর ছিলেন মশায়, সমস্ত চোখে দেখেছেন। আপনি আসুন।

লোকটা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, মাপ করতে হবে বাবাঠাকুর। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, থানায় ছুঁলে একশ-আঠার। চশমা খোলা ছিল সে সময়টা, একেবারে কিচ্ছু দেখতে পাইনি।

মধুসূদনকে দেখিয়ে বলে, যাবেন এই ভদ্রলোক, যার জিনিস খোয়া গেছে। গিয়ে পড়ে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আসুন। অন্যের কি দায় পড়েছে?

মধুসূদন খিঁচিয়ে উঠল: তা বই কি! আমি গিয়ে থানায় উঠলাম—স্টিমার ফেল করে বাচ্চা আর দুটো মেয়েলোক সারাদিন ঘাটের উপর পটোল-পোড়া হোক। যা যাবার সে তো গেছেই, গোদের উপর বিষফোঁড়া তুলে কাজ নেই। পা চালিয়ে চলো মা, আমাদের স্টিমারেই বুঝি সিটি দিল ঐ।

দেখা যাচ্ছে, এত লোকের মধ্যে শিক্ষাদানের উৎসাহ একজনেরও নেই। এ বলে তুমি যাও, ও বলে আপনি যান। এবং নিজ নিজ মাল ও মানুষ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে প্রত্যেকেই ব্যস্ত। বিরক্ত হয়ে রক্তাম্বর বলেন, না আসেন তো বয়ে গেল। থানা-স্টাফের মধ্যে আমার বিস্তর শিষ্যসেবক, কোর্টেও অনেক ভক্ত। আপনাদের কাউকে লাগবে না, আমার একার সাক্ষিতেই হয়ে যাবে। বাকি সাক্ষিসাবুদ যা লাগে, ওরাই সব গড়েপিটে নেবে।

মধুর মা তখনও বলছেন, কেউ যাবে না, তোমারই বা কী গরজ ঠাকুর! তোমার তো কানাকড়িও খোয়া যায়নি। ছেলের মুখের দিকে একটিবার তাকাও না। কিচ্ছু করেনি, এ ছেলে ভাল বই মন্দ করতে পারে না। ছেড়ে দিয়ে যাও।

সাহেবের দু-চোখ ভরে অকস্মাৎ জল নেমে আসে। নদীর জলে ভেসে-আসা ছেলে—মা নেই, মাকে দেখিনি কখনো। অথচ মা যেন সর্বত্র। গর্ভধারিণী মাকে না পেয়ে ভালই হয়েছে বোধহয়। ছোট বাড়ির একখানা দু-খানা কি পাঁচখানা ঘর জুড়ে খুঁটিনাটি গৃহকর্মে ব্যস্ত একফোঁটা মা নয়—তার মা চরাচর-ব্যাপ্ত। যে বাড়ির যত মা এতাবৎ সে দেখে এসেছে, সকলের সঙ্গে একাসনে এক মূর্তি হয়ে তার মা-জননী। কুয়াসামগ্ন অনন্ত সমুদ্র দেখার মতো চোর-সাহেবের মনে এক বিশাল অনুভূতির অস্পষ্ট আভাস। সাধু হিড়হিড় করে টেনে জনতার আগে আগে চললেন, সাহেব মুখ ফিরিয়ে বারম্বার মধুর মাকে দেখে নিচ্ছে।

প্লাটফরমের শেষ মাথায় টিকিটবাবু। রক্তাম্বর নিজের টিকিটটা দিলেন, আর সাহেবকে দেখিয়ে একটি টাকা গুঁজে দিলেন তার হাতে।

সাহেব বলে, টিকিট তো কাছে আমার।

সাধু হেসে ফেললেন: বটে! মুফতের কারবার নয়, লগ্নি করে কাজে নেমেছিস?

টিকিটবাবুর দিকে বলেন, জমা রইল টাকাটা। মনে করে রাখবেন, পরের কোন কেসে উশুল হবে।

ফাঁকায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সাধুর কণ্ঠস্বর মধুমাখা হয়ে উঠেছে। মুচকি হাসি মুখে। বলেন, এত মারলাম তোকে, ব্যথা লাগে নি?

সাহেবও হেসে ফেলে: মারলে তো লাগবে! শুধু তম্বি, শুধুই আওয়াজ। কামরার মেজের ধুলোবালি কিছু গায়ে লেগেছিল, আদর করে থাবা দিয়ে সেই সমস্ত যেন ঝেড়েঝুড়ে দিলেন—আমার তাই মনে হচ্ছিল।

গলা ফাটিয়ে তুই কেঁদে উঠলি—সেই সময়টা একবার সন্দেহ হল, লেগে গেল নাকি হঠাৎ?

শতকণ্ঠে সাধুমশায় তারিপ করছেন আমায় অবধি ধোঁকা ধরিয়ে দিস, বাহাদুর বটে তুই! সকলের মধ্যে সাট না থাকলে কাজ ভাল ভাবে নামে না। খাসা তোর শিক্ষাদীক্ষা—মুখ ফুটে বলতে হয়নি, বলবার ফুরসতও ছিল না, আপনা থেকেই বুঝে নিলি। জোর কান্না কেঁদেছিলি বলেই তো বিনা দ্বিধায় তোকে আমার হাতে ছাড়ল। এত সহজে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলি।

যেতে যেতে পরিচয় নিবিড় হচ্ছে।

আপনজন কে কে আছে তোর? বাপ বেঁচে আছে?

মা?

হুঁ, হুঁ, হুঁ—। মায়ের কথায় বার তিনেক হুঁ দিয়েও সাহেবের তৃপ্তি নেই। রক্তবসনধারী এই যে পুরুষটি, ইনি যেন মা হয়ে গেলেন তার।

ভাই-বোন আছে?

সাহেব এবারেও ঘাড় নেড়ে দেয়। খুব সম্ভব মিথ্যা কথা হল না। যে দেখে সে-ই বলে, সাহেব কোন বড়মানুষের ছেলে। বড়মানুষরা হামেশাই মরে না—কোন অভাবে মরতে যাবে? ঘর ভরভরতি থাকে তাদের, ছেলেপুলে কিলবিল করে। অতএব বাপ-মা-ভাই-বোন সবই তাছে তার। পরিচয় না জানুক, আছে নিশ্চয় পৃথিবীর কোথাও। এবং সুখে আছে।

রক্তাম্বর সাধু প্রশ্ন করেন, নাম কি রে তোর? বাপের নাম কি?

'খোকা' নাম নফরের মুখে একবার বেরিয়ে গেছে, নতুন-কিছু না বলে ওটাই আপাতত চালানো যেতে পারে। এবং 'সরকারি খেয়া'—অদূরে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ছে, তাই থেকে উপাধিটা মনে এসে যায়।

খোকনচন্দ্র সরকার। এক কথায় বলে, কিন্তু বাপের নামে কিছু ভাবনার ব্যাপার। অগণ্য বাপ—রাজাবাহাদুর থেকে শুরু করে নফরকেষ্ট অবধি। কমবেশি সবাই কিছু কিছু বাপের কাজ করেছে। এই পল্টনের ভিতর থেকে কার নামটা পছন্দ করে বলবে, হঠাৎ কিছু মাথায় আসে না।

জবাব না পেয়ে সাধুমশায় অন্য রকম ভাবলেন। মৃদু হেসে বলেন, পালিয়ে এসেছিস বুঝি—নাম বললেই আমি বুঝি ধরে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেব! ভয় করিস নে—আমি ঠিক উল্টো রকম ভাবছি। কী কাজ করে তোর বাপ?

এতক্ষণে ভাল একটি বাপ ঠিক করে ফেলেছে। চেতলায় চালের আড়তের মালিক পুরুষোত্তম সা। বিশাল মানুষটি, ভুঁড়ি ততোধিক বিশাল—গলায় সোনার হার, হাতে সোনার চাকতি, হাতবাক্স-ভরা কাঁড়ি-কাঁড়ি নোট। এর চেয়ে উপযুক্ত বাপ আর হয় না।

কি করে বাপ তোর?

চালের ব্যবসা।

ব্যবসাদারের গুষ্টি তবে তোরা! সাধু হা-হা করে হাসতে লাগলেন। তোর ব্যবসাটাও স্বচক্ষে দেখলাম। দেখে তাজ্জব। বেড়ে হাতখানা বানিয়েছিল! চাদরের নিচে গুটগুট করে কাজ করে যাচ্ছিস—ছুরি ধরা থেকে আঙুল ঘুরিয়ে ব্যাগের মাল বের করে পাচার করে দেওয়া—সমস্ত ব্যাপারটা ছবির মতন চোখের উপর ভাসছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, রূপো বাঁধিয়ে দিই অমন হাত। ছুক-

বাঁধা সাজানো কাজকর্ম। নির্গোলে বেরিয়েও যেতিস ঠিক—বাক্স পড়ে বিপদ ঘটাল। দোষ তোদের নয়—নিয়তি, তার উপরে কারো হাত নেই। কাজের গোছগাছ করে দিচ্ছিল সে মানুষটাও ভাল। তাক বুঝে মাল নিয়ে কেমন সরে পড়ল। পাকা লোক। দুয়ে মিলে খাসা দলটুকু গড়েছিস তোরা।

নদী-তীরে নৌকোঘাটে এসে দাঁড়ালেন। মুগ্ধকণ্ঠে সমানে তারিপ চলছে। বলছেন, হাতের চেয়েও বড় রাজপুত্রের মতো তোর এই চেহারাখানা। মরি মরি কী চেহারা নিয়ে জন্মেছিস—চোখ ফেরানো যায় না। মা-কালী যাকে দয়া করেন, চারহাত ভরে তার উপর ঢেলে দেন। এত গুণ নষ্ট হতে দিসনে, বুঝলি? মহাপাতক। কাজ দেখার পর থেকে শুধু এই কথাটাই ভাবছি। এমন কাঁচা বয়সে পুলিসের হাতে না পড়ে যাস। বয়স হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে দু-চারবার ফাটক ঘুরে এলে খারাপ হয় না– ভালই বরঞ্চ, মুখ বদলানো পুলিস এখন থেকেই যদি পিছনে ফিঙে লাগে, সব শক্তি বরবাদ করে দেবে। সেইটে ভেবেই অমন করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নইলে, চেনা নেই জানা নেই, সবে আজ পয়লা দিনের দেখা—এত কাণ্ড করবার গরজটা কী ছিল!

ভাঁটা সরে নদীজল অনেকটা দূরে নেমে গেছে। ডান-হাতটা সাধুমশায় একটুখানি তুলেছেন কি না তুলেছেন, ঘাটে-বাঁধা এ-নৌকো ও-নৌকো থেকে পাঁচ-সাত জন মাঝি ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ে ডাঙা মুখো ধাওয়া করল। কাদায় হাঁটু অবধি বসে যায় কোনখানে, কখনো বা পিছলে পড়ে যাবার গতিক —উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে তারা।

সাধু চেঁচিয়ে বলেন, অত জনে কেন রে? আসতেও হবে না। যার নৌকোয় চড়ন্দার নেই, ওখান থেকে বলে দাও। আমি নেমে যাচ্ছি।

মাঝিরা কানেও নেয় না।

সাহেবের দিকে চেয়ে সাধু বলেন, যাবি রে আমার সঙ্গে?

সাহেব তখন সেই কাদামাটির উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে। কষ্ট করে—রীতিমতো শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, কিন্তু এই কাজটুকু না হওয়া পর্যন্ত মনে যেন কিছুতে সোয়াস্তি আসে না। তার এই বিষম দোষ। কোন একটু উপকার পেলে প্রাণ কানায় কানায় ভরে যায়, উপকারীকে কায়ে-মনে সেটার জানান দিতে হবে। তাদের যে কাজ, সে পথের দস্তুর আলাদা। সুন্দর চেহারা, সাফাই হাত উপস্থিতবুদ্ধি—যাবতীয় গুণ রয়েছে, কিন্তু এই বদখত ভালমানুষিটা না ছাড়তে পারলে উপায় নেই।

প্রণাম সেরে উঠেই অনুতাপ সেই আর এক দিনের মতো মাকালীর নামে সাহেবের মনে মনে আছাড়ি-পিছাড়ি: মা-কালী, মন্দমানুষ কর আমায়। খুব

—খুব মন্দ। নফরকেষ্ট মতো নয়—ও মানুষটাও একসময় বড্ড ভাল হয়ে যায়। একেবারে নিটোল নিখুঁত মন্দমানুষ করে দাও।

সারা জীবন ধরে সাহেব তার অজানা মা আর অজানা বাপের নামে গালি-গালাজ করে এসেছে। কোন সৎ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আর সজ্জন পুরুষ—তাদের রক্ত থেকে এই দোষ বর্ত্তেছে। ভাত-কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটাবার গোঁসাই—বুড়ো হয়ে মরতে গেল সাহেব, সেদিন এই দোষের সংশোধন হয়নি।

থাক এসব। সকলকে পিছনে ফেলে এক মাঝি ছুটতে ছুটতে রাস্তার উপর উঠল। আবদারের সুরে বলে, ঝড়ু-মাঝি সেদিন এই ঘাটে রেখে গেল, আজকে আমি ফেরত নিয়ে যাব। ঘাড় নেড়ে দিন বলাধিকারীমশায়, ওদের সব হাঁক দিয়ে বলে দিই।

ভাঁটিঅঞ্চলের সুবিখ্যাত বলাধিকারীমশায়—জগবন্ধু বলাধিকারী। গাড়ির মধ্যে সারাক্ষণ সাধুমানুষ হয়ে এসেছেন। কলকাতা শহরটার বাইরে সাহেব একেবারে নতুন—তখন অবধি নাম শোনেনি, কোন-কিছুই জানে না বলাধিকারী মানুষটির সম্বন্ধে। কিন্তু ঘাটের উপরে এ হেন খাতির দেখে অবাক হয়ে যায়।

মাঝি বলছে, চরণধূলো আজ আমার নৌকোয় দিতে হবে। নয়তো মাথা খুঁড়ব পায়ে।

জগবন্ধু হেসে বলেন, ধূলো কোথায় পাব গো? এক-পা চটচটে কাদা। তাই তোমার নৌকোয় মাখাব। কি বলবে, বলে দাও ওদের ডেকে।

পুলকিত মাঝি জলের দিকে ফিরে পিছনে অন্যদের উদ্দেশে বুড়ো-আঙুল নাচায়। অর্থাৎ কেল্লা মেরে দিয়েছি আগেভাগে ছুটে এসে, তোমাদের শুধু কাদা ভাঙাই সার।

নিজের নৌকোর মাল্লাদের চিৎকার করে বলে, নিমকির ঘাটে নিয়ে নৌ ধর্, ঐখানে যাচ্ছি আমরা।

এই অঞ্চলে একসময় বিস্তর নুন তৈরি হত। নুনের কোন বড় মহাজন পাকা-ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন নুনের নৌকো চলাচলের জন্য রশি দুয়েক পথ—মাঝি সেই ঘাটের কথা বলছে। সেখানে গেলে কাদা ভেঙে নৌকোয় উঠতে হবে না।

বলাধিকারী বলেন, আবার কষ্ট করে উজান ঠেলে মরবে! গাঙখালের দেশের মানুষ কাদা ভাঙতে পারব না—পা দুখানা তবে তো মোড়ক করে লোহার সিন্দুকে রেখে দিলেই হয়।

নৌকো নিয়ে যাচ্ছে সেই নিমকির ঘাটে। ডাঙার উপরে হাঁটতে হাঁটতে এঁরা পথটুকু চলেছেন।

জগবন্ধু সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জঙ্গলবাড়ির মা ভারি জাগ্রত। কত জায়গা থেকে কত মানুষ আসে, দেখলি তো তার খানিক খানিক। আমি যাই ফি বছর। সকলের যেমন—আমিও গিয়ে মানত শোধ দিই, নতুন বছরের জন্য মানত করে আসি—

বলে হাসতে লাগলেন। মাঝি ফোড়ন কেটে ওঠে: মস্তবড় সংসার আমাদের বলাধিকারীমশায়ের। ভালমন্দ কার কখন কি হয়, সেই জন্য মায়ের বাড়ি ধন্না দিয়ে পড়েন।

সংসার না থাকুক-নিজে তো আছি। নিজের জন্য গিয়ে মানত করি।

মাঝি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আপনার আবার সংসার নেই! তল্লাটের মধ্যে এত বড় সংসার কার আছে শুনি? কার মাথায় এত দায়ঝক্কি?

জগবন্ধু বোধকরি প্রসঙ্গটা আর এগুতে দেবেন না। কথা ঘুরিয়ে নিলেন: মেলার মানুষ তিন-চার রাত্রির মধ্যে চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। নৌকোয় উঠেই মাদুর পেতে পড়ব। গাবতলির আগে আমায় কেউ ডাকবে না, তোমায় বলা রইল মাঝি। গাবতলি গিয়ে সকলে ভরপেট জলটল খেয়ে নেবে।

সাহেবকে বলেন, আকাশের উপর থেকে ভগবান নাকি দেখেন। আমারও হল তাই। বাক্সের উপর থেকে দেখেছি। বাক্সটা পেয়ে গিয়ে ভারি স্ফূর্তি হয়েছিল। চলন্ত গাড়িতে ঘুমুতে মজা—মালপত্র ঠেসান দিয়ে বসে বসেই ক'দিনের বকেয়া ঘুম উশুল করে নেব। ঢুলুনিও এসেছিল। তোদের জ্বালায় হল না। হঠাৎ দেখি, কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিস ঠিক আমার নজরের নিচে। অমন একখানা মজাদার কাজের শেষ না দেখে পারি কেমন করে? কিন্তু সেই লোকটাকে আর দেখলাম না—বাপ হয়ে যে ছেলের গায়ের চাদর গুঁজে দিচ্ছিল।

পিছন থেকে নফরকেষ্ট অমনি সাড়া দিয়ে ওঠে: আজ্ঞে, এই যে আমি—

দ্রুত সামনে চলে এসে সাহেবের মতো সে-ও বলাধিকারীর পায়ে গড় করল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত ছুঁইয়ে জগবন্ধু হেসে বললেন, খোকনচন্দ্রের যে বাপ, এমনধারা কাঁচা ব্যবস্থা তার হাতে কেন হবে?

নফরকেষ্ট সচকিত হয়ে বলে, আজ্ঞে?

ঝুঁড়িটা বড্ড একপেশে তোমার বাপু। একদিক চিটেপনা আর একদিকে

বেঢপ ঘোটা। ঠিক করে নাও, ঠিক করে নাও। কত ডাক্তার কত দিকে—পেটে কী রোগ হয়েছে, কেউ হয়তো টিপে দেখতে গেল।

জামার নিচে কোমরে মাল বেঁধে নিয়েছে, ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটির মধ্যে একদিকে সেটা সরে গিয়েছে। সলজ্জ নফরকেষ্ট সামাল করে নিল।

সাহেব বলে, কী করব আমি, বলে দিন।

বলেই তো দিয়েছি। আমার সঙ্গে চল্। গাড়িতে গাড়িতে ছ্যাঁচড়ামির কাজ ছেড়ে দে, পিটিয়ে শেষ করবে কোন্ দিন। কাল রাত্রেই তো হচ্ছিল। ক্ষমতা নষ্ট হতে দিতে নেই, উচিত কাজে লাগা!

নফরকেষ্ট বলে, ছেলে ফেলে আমিও কিন্তু যাব না বলাধিকারী মশায়।

সাহেব ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, যাওনি ঐ গাড়ির মধ্যে?

নফরকেষ্ট বলে, আমায় দু-ঘা মারলে তোর গায়ের ব্যথা কম হত নাকি কিছু?

বলাধিকারী নফরকেষ্টকে সমর্থন করেন: ঠিক করেছে। কাজের এই নিয়ম। মার কি বলছিস রে, মেরে ফেললেও দলের কেউ এসে চেনার ভাব দেখাবে না। নির্বিঘ্নে কাজ নেমে গেল, সকলে একত্র হলি—আবার তখন পুরানো সম্পর্ক।

শহরের দুটো মানুষ বলাধিকারীর সঙ্গে জলের রাজ্যে চলল।

গাবতলির হাট অদূরে। সারি সারি চালা দেখা যায়। হাটবার আজকে। সূর্য ঢলে এসেছে, জমজমাট এখন। গাঙের বাঁধ ধরে হাটুরে মানুষের পিলপিল করে যাওয়া-আসা চলছে।

বলাধিকারীর ঘুম নামে মাত্র। ডাকতে হয়নি, আপনিই উঠে পড়েছেন। হাটের দিকে আঙুল তুলে বলছেন, শীতকালে এবারে এই জমতে শুরু করল। কি করবি, জিজ্ঞাসা করছিলি না—দেদার কাজ। ধান পেকেছে, কাজের অভাব নেই আমাদের ভাঁটি অঞ্চলে। দিনের কাজ আছে, রাতের কাজ আছে—কাজের আর স্ফূর্তির দিন এখন। মানুষের দরকার অঢেল। ধান কাটার মানুষ চাই, পাঠশালা বসবে তার জন্য গুরুমশাই চাই, অসুখ হলে পয়সার গরমে এখন সকলে ওষুধপত্তোর খাবে তার জন্য ডাক্তার চাই, যাত্রার দল খুলবে তার সখী চাই—মোশানমাস্টার চাই—কত মানুষের কত কাজ! এ কি তোর শহরবাজার পেলি, কাজ-কাজ করে মানুষ যেখানে চোখের জলে বুক ভাসায়?

নৌকা ততক্ষণে হাটখোলা ধরো-ধরো করেছে। একদিকে কতক [illegible]

পত্রহীন বাবলাগাছ। বলাধিকারী বলেন, মরশুমের মুখে এখন বাবলাবনে এক নতুন হাট বসেছে—মানুষ-হাটা। গাঙের খোল থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা জায়গা সাফসাফাই করে গামছা পেতে সারবন্দি সব বসে আছে বিক্রি হবার জন্য। ক্ষেতের চাষী, গুরুমশায়, ডাক্তারবাবু গানের ছোকরা—হরেক গুণের মানুষ। বলিস তো তোকেও ওর মধ্যে বসিয়ে দিতে পারি খোকনচন্দোর। হাটুরে মানুষ এক মরশুমের দরদাম ঠিক করে নৌকোয় নিয়ে তুলবে। এ সমস্ত হল দিনমানে সদরের উপরের কাজ, আর রাতের কাজের খবর যদি চাস—

বলাধিকারী অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসছেন। নৌকার মাঝিমাল্লার ব্যাপারটা যে অজানা তা নয়! তবু এ সমস্ত অপরের কান বাঁচিয়ে বলার রীতি। এদিক-ওদিক চেয়ে অত্যন্ত গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, রাতের কাজেরও মরশুম এই। পুরো মরশুম চলছে। নিশিকুটুম্বরা সব দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে বার-দশেরার পরে। দলে দলে বলবি নে—আয়োজন বৃহৎ, সেজন্য দলে দলে। বাইরে বাইরে তাদের কাজ, আমার ছুটি এই সময়টা। ছুটি বলেই জঙ্গলবাড়ি মায়ের দর্শনে যেতে পারলাম।

একেবারে হাটের নিচে এসে পড়েছে। বলাধিকারী ফিক-ফিক করে হাসেন: বিয়ে করার বাসনা যদি হয়ে থাকে, তারও মরশুম কিন্তু এই। জামাইহাটা ঐ যে—টেড়ি কেটে ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জামাইরা সব ঐখানে এসে বসেছে। স্বয়ম্বর-সভা। তবে কনে আসে না, আসে কনের বাপ-দাদারা। ঘুরে ঘুরে তারা আলাপ-পরিচয় করবে, কনের দর তুলবে। বরপণ নয়, কন্যাপণ। দরে বনিবনাও হয়ে গেল, জামাইটাও নেহাৎ অপছন্দের নয়—কনেওয়ালা তখন গাঁয়ের ঠিকানা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে যাবে, বরকর্তা গিয়ে কনে দেখে টাকাকড়ি কিছু দাদন দিয়ে কথা পাকা করে আসবে।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলাধিকারী হেসে বলেন, কীরে, যাবি নাকি নেমে জামাইহাটায়? তোর মতন জামাই পড়তে পাবে না, চেহারায় মেরে দিবি—খুব সস্তা পণে কনে গেঁথে ফেলবি।

হাসাহাসি চলে খানিকক্ষণ। কথা হয়েছিল, হাটে নেমে মিষ্টিমিঠাই এবং টিউবওয়েলের মিঠাজল ভরপেট খেয়ে নেবে সবাই। কিন্তু ঘাটে এসে মাঝি এখন আড় হয়ে পড়েছে: গোনের আর অল্পই আছে, দেরি করলে জোয়ার এসে যাবে। রাতও হয়ে আসে এদিকে—কোনখানে নৌকো বেঁধে গোনের আশায় সেই রাত দুপুর অবধি ঠায় বসে থাকা—ফুলহাটা পৌছানো তাহলে সকালের আগে নয়। পেটে ক্ষিধে সকলের—তা বেশ, একজন কেউ নেমে গিয়ে ক্ষিধের

রসদ নিয়ে আসুক। যাবে আর ফিরে আসবে। তা বলে বলাধিকারীমশায় নন, ওঁর নামা হবে না।

জগবন্ধু হতাশ হয়ে বলেন, শুনলে তোমরা ? আদালতের বিচার হয়ে জেল দেয়, মাঝি আমায় বিনা বিচারে আটক করল। যে কেউ তোমরা নেমে গিয়ে ঘুরেফিরে আসতে পার, আমারই কেবল পাড়ের মাটিতে পা ছোঁয়ানো মানা। মনে দুঃখ লাগে কিনা বলো।

মনের দুঃখে মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন। নৌকার এই নতুন মানুষ দুটো সত্যিই বা সেইরকম ভেবে বসে—মাঝি তাড়াতাড়ি তাই কৈফিয়ৎ দিচ্ছে : হ্যাঁ, অন্যায় বলে থাকি তো ধরে মারুক সকলে। আপনি নেমে পড়লে তুলে নিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা! হাটের মধ্যে কত দেশের কত মানুষ, কত দোকানপাট। এ দোকান থেকে ডাকবে : একটুখানি বসে যান বলাধিকারী মশায়। ও দোকানি ছুটে এসে ধরবে, পা ছুঁইয়ে যান একটিবার দোকানে। অমুক এসে শলাপরামর্শ চাইবে, তমুক এসে হাত পাতবে—একটা-দুটো টাকা দিয়ে যান। শতেক জনের হাজারো রকম দায়—হাট না ভাঙা পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে দেবে না।

নিজের প্রশংসায় বলাধিকারী বিব্রত বোধ করছেন। বাধা দিয়ে বলে ওঠেন : থাক থাক, চুপ কর দিকি। এরা ভাববে, সত্যিই বুঝি আমি দরের মানুষ। টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আর কেউ নয়—তুমিই নেমে পড় মাঝি। মুড়ি-বাতাসা আর মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এসো। মিঠাজল এনো এক কলসি। দু-দুজন কুটুম্বমানুষ—মিষ্টি বেশি করে নিয়ে এসো। শহর থেকে এসেছে, পেট না ভরলে শহরে ফিরে নিন্দেমন্দ করবে।

ঘাটের উপর বোঠে পুঁতে নৌকায় কাছি করে মাঝি ডাঙায় লাফিয়ে পড়ে একছুটে বেরিয়ে গেল। টাকাপয়সা যায় যাক মানুষ মরে মরুক—সমস্ত সইবে, কিন্তু অকারণ গোন বয়ে যাচ্ছে, নৌকোর মাঝির বুকে তখন শেল বিঁধতে থাকে।

সাহেব তাকিয়ে তাকিয়ে চারিদিক দেখছে। দুচোখ ফেরানো যায় না। ছোট্ট বয়সে কালীঘাটে নৌকার মাঝিদের কাছে এমনি সব জায়গারই গল্প শুনেছে। মন উচাটন হত চোখে দেখবার জন্যে, এতদিনে ভাগ্যে তাই ঘটল। নৌকোয় নৌকায় ঘাটের জল দেখবার উপায় নেই। বিশাল নদীর ওপারে দীর্ঘব্যাপ্ত সবুজ রেখা অস্পষ্ট নজরে আসে। জনালয় নেই ওদিকে, বাদাবন। বাঘ-সাপ-কুমিরের আরামের রাজ্য।

বলাধিকারীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয় : নামটা দিয়েছে বেশ—

বলাধিকারী। ঠিক ঠিক মানিয়েছে। বলের নমুনা গাড়িতে উঠবার মুখেই একটুখানি দেখালেন—মধুসূদন মানুষটাকে পোকামাকড়ের মতন আঙুলের ডগায় খুঁটে ফেলে দিলেন যেন।

জগবন্ধু বললেন, বলাধিকারী কারও দেওয়া নাম নয়—কৌলিক উপাধি। এক বয়সে দেহচর্চা করে গায়ের বল কিছু করেছিলাম বটে। নিলাম দারোগার চাকরি—সে চাকরি হল খুনি-বদমাশ চোর-ডাকাতের নামে নীরিহ ভাল ভাল মানুষ ঠেঙিয়ে দুটো পয়সার সংস্থান করা। তার জন্য গায়ের বল চাই বইকি! কিন্তু মানুষের আসল বল বুদ্ধিবল—সে বস্তু কেউ চোখে দেখে না। আমার সেদিকটা একেবারে খাটো। কারো ঘটে যখন বুদ্ধি দেখতে পাই, মানুষটাকে খাতির করি। কপর্দকহীন মানুষ, দেখিসনি, পয়সাওয়ালা কাউকে দেখলে বেসামাল হয়ে কী রকম হেঁ, হে করে! জামাই-আদরে নৌকোয় তুলে নিয়ে যাচ্ছি তোকে নয় রে খোকনচন্দোর—তোর মগজের বুদ্ধি আর সুচতুর হাত-দুখানাকে।

এবং হাত ও মগজের গুণপনায় মুগ্ধ বলাধিকারী ঐ নৌকাঘাটেই বুঝসমঝ শুরু করে দিলেন।

নিম্নকণ্ঠে বলেন, আমাদের মাঝি উল্টো করে বোঠে পুঁতে গেল কেন?

পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝে বলে উঠলেন, তুই যে ডাঙার দেশের মানুষ, ভুলে গিয়েছিলাম। উল্টো-সোজার কি জানিস! ঠাহর করে দেখ, সব ডিঙিওয়ালা বোঠের চওড়া মাথা মাটিতে পুঁতেছে। পোঁতবার সুবিধা, চাপ দিলেই বসে যায়। আমাদের উল্টো। মুঠোর দিকটা পোঁতা, চওড়া মাথা উঁচুতে। কেন রে?

সাহেব কি জানে, আর কি বলবে! অবোধ চোখে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

বলাধিকারী বুঝিয়ে দিচ্ছেন: হাটখোলা জায়গা—কতজনে কত মতলব নিয়ে ঘুরছে। রাত্রিকাল সামনে। বোঠে উল্টো করে পুঁতে জানান দেওয়া হল, বাপু হে, আমরাও ঐ কাজের কাজি। পিছু নিও না কেউ আমাদের।

বলেন, দেবভাষায় এ-জিনিসের নাম চৌরসংজ্ঞা। সংজ্ঞা অনেক রকম আছে। মনে কর, পিছন ধরেছে একটা দল। আমাদের নৌকো মারবে, জোরে জোরে বেয়ে আসছে। অন্ধকারে মানুষ ঠাহর হয় না। কাছাকাছি এসে বলবে, এক ছিলিম তামাক দাও ও মাঝি-ভাই। কিম্বা বলবে, মাছ কিনে আনলাম, আঁশ-বঁটিখানা একবার বের করো ভাই। নৌকো মারবার মুখে এই সমস্ত বলে। কি করবি তখন, সামাল দেবার উপায়টা কি?

উপায়ের কথাটা আপাতত চাপা পড়ে যায়। জলের কলসি ও মিঠাই নিয়ে মাঝি ফিরে এলো। নৌকো ছুটিয়ে দিয়েছে, হাটখোলায় সময়ের ক্ষতিটুকু পূরণ করে নেবে।

আধখানা বাঁকও যায়নি। কে-একজন চেঁচামেচি করছে না পিছন দিকে? তেমনি একটা আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসে।

বলাধিকারী চোখের উপর দিকটায় হাত রেখে নিরীক্ষণ করেন। সন্ধ্যাবেলা চারিদিক ঘোর হয়ে এসেছে। দেখেন জেলেডিঙি যেন নদীজলের উপরে তরতর করে উড়ে আসছে।

বলাধিকারী বললেন, বোঠে তুলে ধরো তোমরা। দেখা যাক। কী যেন বলছে। নৌকো রাখতে বলছে, এমনি মনে হয়।

খানিকটা কাছে এলে বলাধিকারী একগাল হেসে ফেলেন: আরে, বংশী না? বংশীই তো বটে! মামার বাড়ি এসেছিল বোধহয়।

বংশী চেঁচাচ্ছে: আমি যাব, আমি যাব। নিজ হাতে বোঠে ধরে অভিনব কায়দায় জলের উপর মারছে। বলাধিকারীর ফুলহাটা গাঁয়ের মানুষ বংশীধর। অনুগত, এবং প্রতিপাল্যও বটে। এই গাবতবলির নিকটবর্তী সোনাখালিতে পঞ্চানন বর্ধনের বাড়ি। স্বনামধন্য ওস্তাদ পচা বাইটা। এত বড় গুণীমানুষের আপন নাতি বংশী—মেয়ের ছেলে। বাইটার মেয়ে এই একমাত্র ছেলে রেখে অনেক দিন আগে মারা গেছে।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বলাধিকারী আবার সাহেবের দিকে ফিরলেন: বোঠের মুখ দিয়ে কথা বলাচ্ছে বংশী। কি বলছে শোন।

সাহেব কান পেতে শোনে। আওয়াজ বিচিত্র বটে। সাধারণ বোঠে বাওয়ার মতো নয়।

কি বলে?

বোঠের তালে তালে বলাধিকারীই এবার মুখে বলেছেন, সাঙাত-সাঙাত সাঙাৎ-সাঙাত—তাই না? নৌকোর গায়ে জলের ছলাৎ-ছলাৎ, আর বোঠের মুখের সাঙাত-সাঙাত। সাঙাত কিনা বন্ধু। এ-ও এক চোরসংজ্ঞা। সেই যে কথা হচ্ছিল—নৌকো মারবে বলে পিছন ধরে এসে পড়েছে, রাতের অন্ধকারে কেউ কাউকে চোখে দেখছে না, তখনকার উপায়টা কি? জলের উপর বাড়ি মেরে বোঠে দিয়ে কথা বলাবি। কাঠে কথা বলানো গুণীলোক ছাড়া পারে না। সাঙাত বুঝতে পেরে তখন তোবা-তোবা করে নৌকো-মারার দল ফিরে যাবে।

পণ্ডিতমানুষ বলাধিকারী, সেকাল-একালের বিস্তর খবর তাঁর কণ্ঠাগ্রে।

প্রাচীন চৌরশাস্ত্রের কথা উঠে পড়ে। সেই সূত্রে চৌরসংজ্ঞা—অর্থাৎ, চোরে চোরে চেনা-জানার জন্য নানারকম গুপ্ত-সঙ্কেত। ভ্রম বশে এক চোর অন্য চোরের ক্ষতি না করে বসে। কিন্তু বাইরের চতুর লোকে চৌরসংজ্ঞা জেনে গিয়ে ঠিক উল্টোটাই ঘটিয়েছে অনেক সময়। রাজপুত্র বরসেনের কথা পাওয়া যায়—চার চোর দেখতে পেয়ে তিনি চৌরসংজ্ঞা করলেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করে তারপর তিনিই তাদের মূল্যবান চোরাই-মালের উপর বাটপাড়ি করলেন। রাজা বিক্রমও ঠিক এমনি করেছিলেন···

জেলেডিঙি ইতিমধ্যে পাশে এসে পড়েছে। হাতের বোঠে ফেলে বংশী বলাধিকারীর নৌকায় উঠল। বলে, খুব পেয়ে গেলাম। হাটবার দেখেই মামার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি, হাটুরে-নৌকো ধরব এখান থেকে। তা হলে হাট ভাঙা অবধি হা-পিত্যেশ বসে থাকতে হত। বাঁক ছাড়িয়ে এসে আপনাকে দেখলাম—এক নজর দেখেই বুঝেছি, বলাধিকারীমশায় ছাড়া কেউ নন। উঃ, কী টান টেনে আসতে হল।

মাল্লাদের দিকে চেয়ে বলে, গোন কিছু নষ্ট হল তোমাদের। আমি তার পূরণ করে দিচ্ছি। দাঁড়ের মুরুব্বি তামাক ধরাও তুমি এবারে। আমি খানিকটা টেনে দিই।

বুড়ো-দাঁড়ি একজন—মানুষটাকে সরিয়ে দিয়ে বংশী দাঁড়ে বসে গেল। লহমার মধ্যে সব কিছু আপন তার। সাহেবের দিকে চেয়ে পলক পড়ে না, হাতের দাঁড় উঁচু হয়ে থাকে। চোখ টিপে নিম্নকণ্ঠে বলে, কাণ্ডখানা কি, মেয়েছেলে হরণ করে কোথায় নিয়ে যাও তোমরা?

রসিকতাটা ঐ বুড়ো-দাঁড়ির সঙ্গে। বলাধিকারী খবরের কাগজ খুলে বসে ছিলেন। সাপ্তাহিক ঢাউশ কাগজ, মেলা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন। যে রকম আয়তন, এক প্রান্তে উপুড় হয়ে শুয়ে স্বচ্ছন্দে অন্য প্রান্ত পড়া যায়। কথা কানে পড়তে হেসে উঠলেন: শুনলি রে খোকনচন্দোর, তোকে মেয়েছেলে বলছে।

বংশী জোর দিয়ে বলে, যে দেখবে সে-ই একথা বলবে। আজেবাজে পাঁচি-খেঁদি মেয়েছেলে নয়—রাজকন্যে। চুল খাটো করে ছেঁটে চুড়ি ভেঙে হাত নাড়া করে বেটাছেলে সেজেছে। যাত্রার দলে পুরুষমানুষ গোঁফ কামিয়ে মাথায় পরচুলা গায়ে গয়না পরে মেয়েমানুষ হয়, তার উল্টো।

বুড়ো-দাঁড়ি এইবারে জবাব দিল: চাও তো রাজকন্যে তোমার ঘরেই তুলে দেওয়া যায় বংশী।

বলাধিকারী বলেন, ওরে বাবা! রক্ষে রাখবে বংশীর বউ। পতির ধর্মপথে

মতি যাবে, সেজন্য কপাল ক্ষয়ে গেল দেবতা-গোঁসাইর কাছে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে। তার উপরে এই উৎপাত গিয়ে পড়লে ঠাকুর-দেবতাকে না বলে সোজাসুজি সে ঝাঁটা তুলে দাঁড়াবে।

ঘরের পরিবারের কথা, বিশেষ করে নিজের পুরুষকে ভাল করবার চেষ্টা—এই সমস্ত উঠে পড়ায় বংশীর লজ্জার অবধি নেই। সাহেবের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে।

বলাধিকারী হেসে বললেন, অত করে কি দেখছ—লাইনের লোক। মাল কাঁচা এখনো, কিন্তু ভারি সরেস। আপন লোক ছাড়া ডেকে নৌকোয় তুলতে যাব কেন ?

একচোট হেসে নিয়ে বললেন, কে নয় লাইনের শুনি ? দুনিয়া সুদ্ধ চোর—ভীরুগুলোই বাইরে বাইরে ভড়ং দেখিয়ে বেড়ায়। একটা চোরের কথা কেউ যদি ভাল করে লেখে, সমাজের সকল মানুষের জীবনী লেখা হয়ে যায়। যে লেখক লিখছে, সে নিজেও কিছু তার বাইরে নয়।

দাঁড়ের মুঠো আবার সেই বুড়োর হাতে দিয়ে বংশী সাহেবের পাশটিতে চলে গেল। বলাধিকারী কাগজ পড়ছেন। পাঠে কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটে—মৃদুস্বরে দু-জনের আলাপ-পরিচয় চলে। এই যে পাশে চলে এল, কোনদিন বংশী আর আলাদা হয়নি। বুড়ো বয়সে সকলের মতো সাহেব একদিন বলশক্তি হারাল, সেদিনের আশ্রয় বংশীর বাড়িতেই। বংশী মরে গেল তো বংশীর বউ তাকে সমাদরে ঠাঁই দিল। কিন্তু এসব অনেক পরের কথা আগে বলতে যাই কেন ?

কাগজ পড়ছিলেন বলাধিকারী। কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে মুখ তুলে বংশীকে বললেন, মরে গেছে বুড়ো ?

প্রশ্নটা হঠাৎ পড়ে বংশী হকচকিয়ে যায় : কার কথা বলছেন ?

কার আবার ! পঞ্চানন বর্ধন—পচা বাইটা। যার মরার দরকার দুনিয়ার মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি। মামার-বাড়ি থেকেই তো ফিরছ ?

হ্যাঁ—বলে বংশী ঘাড় নাড়ে। বেদনার সুরে বলে, নতুন করে কী মরবে ! এককালে মুলুক চষে বেড়িয়েছে, সেই মানুষটা আজ বাইরের দোচালা ঘরে দিনরাত পড়ে আছে। বিষ-হারানো ঢোঁড়া। বাড়ি-ভরা মানুষজন—পুতের বউ দু-দুজনা, নাতিপুতি দুগণ্ডা আড়াই গণ্ডা—কিন্তু ভাতের থালাখানা রেখে যাওয়ার মানুষ হয় না বুড়োর ঘরে। কেউ যায় না সেদিকে—বাড়ির লোক নয়, বাইরের লোকও নয়। একটা মানুষ দেখার জন্য হা-পিত্যেশ করে থাকে। মরেই গেছে বাইটা—ঘরে-বাইরে সকলে সেই রকম ভেবে নিয়েছে।

বলাধিকারী তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, ভাবাভাবির কি! পুরোপুরি গেলেই তো হয়। বুকের নিচের ধুকপুকানি কোন্ লোভে আর ধরে রাখা—আবার কি বয়স ফিরবে? সেই কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাইটামশায়কে।

একটু থেমে আবার বলেন, ভাবি অনেক সময় সেকালের অত বড় গুণী-মানুষটার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের আশা আর এখন? একটা জবাবও ছিল। বলে, গুণজ্ঞান যা-কিছু আছে ষোলআনা পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিলে মুক্তি হবে না। দুনিয়ায় কিছু দিয়ে যাব। সেই নেবার মানুষের আশা করে আছি।

বংশী এবারে আগুন হয়ে ওঠে: মুখের কথা! একবর্ণ বিশ্বাস করবেন না বলাধিকারীমশায়। কতজনা এলো গেল, কাউকে ছিটেফোঁটা দেয়নি! গুরুপদ ঢালি—তাকে দেখেছেন আপনি, গোঁফ ওঠার আগে থেকে স্যাগরেদি ধরেছে, গোঁফ পেকে সাদা হয়ে গেছে এখন। হুকুমের গোলাম—উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। তবু কণিকাপ্রমাণ বিদ্যেও দিলেন না তাকে। আমি আপন লোক, মরা মেয়ের এক ছেলে—বড্ড ধরাধরিতে দশ-বিশটা পাখপাখালি বন-জানোয়ারের ডাক শেখালেন, আসল বস্তু কিছু নয়। আপনার কথার [illegible] চাই—ধানাই-পানাই বলে মুখ রাখেন। আসলে মহাকঞ্জুষ। হচ্ছেও তেমনি। আজামশায়ের (দাদামশায় বলে না এ তল্লাটের মানুষ—আজামশায়) কষ্ট দেখে শিয়ালটা কুকুরটা অবধি কেঁদে যায়।

বলাধিকারী বলেন, বাহাদুরি করে বেঁচে এসেছে, কিন্তু মরার বাহাদুরি দেখাতে পারল না। কষ্ট সেই দোষে।

সাহেব এর মধ্যে কথা বলে ওঠে: দোষ হল বয়সের। বয়স হলে কার না এমন হয়!

বলাধিকারী উত্তেজিত হয়ে বলেন, সেইটে হবার আগে মরে যাবে। বাঁচার জন্যে যেমন বিবেচনা আছে, মরার জন্যেও তাই। পচা বাইটা অর্ধেকটা জিতে আছে—বড় জাঁকজমকের জিত। বাকি অর্ধেকে বেদম হার তেমনি। একই মানুষের এমনিধারা দু-চেহারা কেমন করে হয়, কেন হতে দেয়, তাই ভাবি।

বংশী অবাক হয়ে বলে, মরা তো নিজের হাতে নয়। যমরাজ যেদিন নিয়ে নেবেন—

হুঙ্কার দিয়ে বলাধিকারী মুখের কথা থামিয়ে দিলেন: হাতে নয়—কি বলছ তুমি! মানুষ মারতে পারে নিজের হাতে, মরতেও পারে নিজের হাতে। জীবন-মরণ মুঠোর মধ্যে রয়েছে। সেজন্যে তো বাঁচোয়া। সেই হল মানুষের বড় শক্তি, মস্তবড় বলভরসা।

না বুঝে বংশী হাঁ করে থাকে। সাহেবেরও চমক লাগে—চমকে তাকায় বলাধিকারীর দিকে। নফরকেষ্টর কোনরকম হাঙ্গামা নেই—খাসা অভ্যাস। কাজের সময় কাজ, বাকি সময় ঘুমোনো। দাঁড়ানো-বসা-শোওয়া ইত্যাদি অবস্থা এবং সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা ইত্যাদি সময় নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। বসে বসেই আপাতত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। মউজ করে ঘুমুচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে নাসাধ্বনিতে পরিচয়।

হাতের খবরের-কাগজটা তুলে ধরে বলাধিকারী বললেন, খবর বেরিয়েছে, অসমসাহসী এক ছেলে দিন দুপুরে কলকাতার চৌরঙ্গির উপর সাহেবকে গুলি করেছে। হাজার মানুষ সেখানে, তাড়া করে ময়দানের মধ্যে ধরেও ফেলল। ধরেছে কিন্তু ছেলেটিকে নয়—একটা মড়া। পকেটে বিষ ছিল, ছেলেটি মৃত্যুর ঘুলঘুলি দিয়ে সরে পড়েছে পুলিসকে কলা দেখিয়ে। এই মরার ছিদ্রটুকু আছে বলেই তো নিশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায়—অসহ্য হলে ছিদ্রপথে টুক করে বেরিয়ে পড়ব।

দম নিয়ে আবার বলেন, শুধু এই একটি ছেলেরই ব্যাপার নয়। মরামরা খেলা চলছে যেন বাংলাদেশ জুড়ে। ভূপি-দার সঙ্গে ছোটবেলা এক ইস্কুলে পড়েছি। পড়া পারত না বলে পণ্ডিতমশায় মেরে ভূত ভাগাতেন। হঠাৎ দেখি ভূপি-দা দেবতা—সেই পণ্ডিত গদগদ হয়ে ভূপি-দার কথা আমায় বললেন। মরার খেলায় নামজাদা খেলোয়াড় হয়েছে বলে। আজ এমনি ব্যাপার—হাতে রিভলবার বোমা একটা কিছু থাকলেই সে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। রিভলবার মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু— মৃত্যু দিতে পারে সে-মানুষ, মৃত্যু নিতেও পারে নিজের উপর। ভূপি-দার এক বুড়ি-ঝি ছিল। আপন কেউ নয়, অনেক কাল ধরে আছে এই পর্যন্ত। শিক্ষাদীক্ষাহীন পঁচাত্তর বছরে বুড়ির কাছেও ভূপি-দা দেবতা। সেই বুড়ি-ঝির একটা গল্প বলি শোন।

বলছেন, ভূপি-দা বাড়ি নেই, বোমা আছে বাড়িতে। পুলিসে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে, ভোর হলেই সার্চ হবে গ্রামের মানুষ সাক্ষি ডেকে এনে। বুড়ির মনে এলো, ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে নিশ্চয় গোলমেলে বস্তু। কী করা যায়। জিনিস পুলিসের হাতে পড়লে বাবুর তো রক্ষে রাখবে না। মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল বুড়ির—দরদ থাকলে আসে মাথায় বুদ্ধি। বুড়ি করল কি—ভাত রান্নার যে উনুন, তার তলায় গর্ত খুঁড়ল খন্তা দিয়ে। বস্তুটা গর্তের ভিতর দিয়ে মাটি চাপা দিল উপরে। তার উপরে ছাই। রান্নাবান্না হয়ে গিয়ে উনুনে যেন ছাই জমে আছে। একবার ভেবেছিল, ছাইয়ের উপর গনগনে আগুন কিছু থাকলে কেমন। বিচার করে দেখে, রান্না তো সেই সন্ধ্যারাত্রে হয়ে গেছে, সকাল

অবধি আগুন থাকে কি করে? ভাগ্যিস দেয়নি আগুন—বোমা ফেটে তাহলে কী কাণ্ড হয়ে যেত! তৃপি-দা হাসতে হাসতে একদিন এই গল্প করেছিল। কলেজে পড়ি তখনও আমি।

এবার বলাধিকারী বংশীর দিকে চেয়ে বললেন, তোমার মাতামহ চতুর মানুষ বটে কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি। বয়সকালে বুদ্ধির খেলা খেলে বেড়িয়েছে, কিন্তু বয়স কাটিয়ে এসে উপর দিককার মুক্তির ঘুলঘুলিটা দেখতে পায় না। তাহলে এত হেনেস্তা সইত না, কবে এদ্দিন পালিয়ে বেরুত। মরা জিনিসটাই বোঝে না বাইটামশায়। ভারি ভারি কাজ হাসিল করছে—মরা তুরস্থান, একটা আঁচড় পর্যন্ত কারো গায়ে লাগে নি। না নিজের, না কোন মক্কেলের। সে বটে কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। বড়ভাইটা যেমন ছিল, ছোটভাইও প্রায় তাই। বেচা মল্লিক, শুনতে পাই, ফাঁসির দড়ি নিজের হাতে গলায় পরেছিল।

বংশী চুপচাপ এতক্ষণ। বলাধিকারীর কথাবার্তা কানে ঢুকেছে ঠিকই—অন্য কানের ছিদ্রপথে বেরিয়ে গেছে। নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিল। বলল, আজামশায় সাগরেদ চায়। আপনাকে বলেছে, আপনিই তবে আমার নামটা উত্থাপন করে দিন। আপনার খাতিরে যদি নরম হয়। নয়তো যা গতিক—সকল গুণজ্ঞান বুড়োর সঙ্গে এক চিতেয় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

কাতর হয়ে বলে, দুই মামা আমার দুই পথের পথিক—কেউ কিছু নিতে গেল না। একমাত্র নাতি আমিই তাহলে লোকত ধর্মত ষোলআনা হকদার। বলুন তাই কিনা? এদ্দিন ধরে আঁকুপাঁকু করে বেড়াচ্ছি—এবারও মামার-বাড়ি সেই মতলব নিয়ে যাওয়া। তা সে-কথার আঁচ দিতে গেলে বুড়ো তেড়ে মারতে আসে। বলে, শিয়াল-কুকুরের ডাক শিখিয়েছি—সেই তো ঢের।

বলাধিকারী হো-হো করে হেসে উঠেন: যা বলেছি, বাইটা মশায়ের নজরটা খাটো কিন্তু বুদ্ধি ঝকঝকে পরিষ্কার। গুণ-জ্ঞান তোমায় দিতে যাবে কেন? ময়লা ঘটিতে ভাল দুধ রাখলেও কেটে যায়। তুমি পেলে সে জিনিস কাজে আসবে না, পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরুবে। নাতিকে ভালরকম জানে কিনা—কুকুর-শিয়ালের ডাকগুলো দিয়েছে, অন্তটন্ত ভাবে হয়তো।

বংশীর অপ্রতিভ মুখ দেখে বলাধিকারী কথা অন্যভাবে ঘুরিয়ে নেন: গুণজ্ঞান নিয়ে কী-ই বা করবে তুমি? ছিটেফোঁটা যা আছে তাই নিয়েই তো বউয়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ কোন্দল।

বংশী বলে, বউ কিছু টের পাবে না। মেয়েমানুষ জাত, ঠকাতে কি! আবার তা-ও বলি—এখন ডাকবার সামান্য ঠুকঠাক, টাকাটা সিকেটার ব্যাপার জাতই যায়, পেট ভরে না। জাত-কামারের মত ভারী ভারী যা মারতে পারি

যদি কখনো, এক এক ঘায়ে এক-শ দু-শ ছিটকে এসে পড়ে—সেদিন ঐ বউই দেখতে পাবেন সোহাগে গলে গলে পড়ছে।

আকাশ-ছোঁয়া ঝাউয়ের সারি নজরে আসে। ফুলহাটা এসে গেল। বড়গাঙ ছেড়ে খালে ঢুকবে, মোহানার উপর নীলকুঠি। নীলকর সাহেবরা সারি সারি ঝাউগাছ পুঁতে কুঠির বাহার বাড়িয়েছিল—কত কালের সাক্ষি সুদীর্ঘ বিশাল গাছগুলো।

কুঠির কাছাকাছি এসে বলাধিকারীর মুখে আবার মৃত্যুর কথা। ঐ ভাবনায় আজ পেয়ে বসেছে। হাত তুলে সাহেবকে দেখান: ছাতের কার্নিশের সেই জায়গাটা রাত্রিবেলা দেখা যাচ্ছে না। একদিন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে দোতালার উপর তুলে ভাল করে দেখিয়ে আনব। মৃত্যুর সঙ্গে ওখানটা মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। চোখ-মুখ বাঁধা, পা বাঁধা—বিশ্ব-সংসার কিছুই আমার কাছে নেই। দু-খানা হাতের জোরে কার্নিশ ধরে ঝুলছি, দশটা আঙুলে আঁকড়ে ধরে আছি জীবনটা। বন্ধ-চোখ বলেই মৃত্যুর চেহারাটা সামনের উপর পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল। তার পরে এক সময় হাত ছেড়ে দিয়েছি। সবাই ভাবে, বাধ্য হয়ে ছেড়েছি, শক্তিতে আর কুলোয় নি বলেই। কিন্তু ধারণা ভুল। ঠিক সেই ক্ষণের অনুভূতিটা এখনো আমি স্পষ্ট ভাবতে পারি। মৃত্যুর সঙ্গে চেনা হয়ে গিয়ে ব্যাকুল আনন্দে হাত ছেড়েছিলাম—মৃত্যু কোল পেতে ধরবে বলে। পরিচয় করে না বলেই তো মৃত্যু নিয়ে লোকের অকারণ ভয়।

সাত

ঘাটে নেমে বংশী নিজের বাড়ি চলল। নৌকায় এই পথটুকুর মধ্যেই ভাব জমে গেছে সাহেবের সঙ্গে। খানিক দূরে গিয়ে ফিরে আসে আবার সাহেবের কানে কানে উপদেশ দেয়। ঠিক এই কথাগুলোই ইতিমধ্যে আরও অনেকবার হয়ে গেছে: মানুষ ভাল বলাধিকারীমশায়। মস্তবড় মহাজন। পাকসাট মেরো না, ঠাণ্ডা হয়ে থেকো। যা বলবেন, হেঁ-হেঁ করে যাবে। কাজ করতে বললে মুখের কথা মুখে থাকতে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শ্বশুরবাড়ি মেয়ে পাঠানোর সময় মা-খুড়ি-পিসি যেমন বলে দেন। বলে, সব জায়গায় বলাধিকারীর খাতির। ঐ মানুষের নজর ধরেছে, কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। আমিও রইলাম—এই গাঁয়ের মানুষ, শতেক বার দেখা হবে। সকালবেলাই যাব। সকালে না পেরে উঠি তো বিকালে।

খুলনার নৌকাঘাটা থেকেই বলাধিকারীর খাতির দেখতে দেখতে আসছে। কিন্তু বাড়ীর উঠানে এসে সাহেবের ভক্তি চটে যায়। পেট-মোটা প্রকাণ্ড আয়তনের গোলা, পিছন দিকটায় খান তিন-চার মেটে-দেয়ালের ঘর। এই মাত্র। ওর মধ্যে একটি বৈঠকখানা। তক্তাপোশ জুড়ে ফরাস—ফরাসের উপরে চাদর জোটেনি, শুধুই মাদুর। নিয়মমাফিক হাতবাক্স ফরাসের প্রান্তে—বাক্সের উপরে কাগজপত্র রেখে হিসাব লেখা হয়, ভিতরে টাকাপয়সা। পেরেক ঠুকে ঠুকে হাতবাক্সের সর্বঅঙ্গে যেন কুষ্ঠব্যাধি।

কী কাজে এসেছে একটা লোক, তক্তাপোশের প্রান্তে পা ঝুলিয়ে বসেছে। এবং রোগা লম্বাটে একজন কান-কোঁড়া খাতায় হিসাব টুকছে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য—জগবন্ধু বলাধিকারী নাম বলে দিলেন। ক্ষুদিরাম হাতবাক্স থেকে টাকা-রেজকি বের করে থাক দিয়ে লোকটার সামনে রাখে, গণে নিয়ে থলিতে ভরে লোকটা চলে যায়। অতএব গোমস্তা ও ক্যাশিয়ার হল ক্ষুদিরাম। চেতলার পুরুষোত্তম সা'র গদিতে এমনি ছিল। পাখনার কলম নিয়ে হাতবাক্সের উপর ঝুঁকে পড়ে সমস্ত দিন বসে বসে লিখত।

কুষ্ঠগ্রস্ত হাতবাক্সের মহিমা সাহেব পরে একদিন শুনেছিল ক্ষুদিরামের কাছে। মন্দ লোকের রিপোর্ট পেয়ে সদর থেকে খোদ পুলিসসাহেব একবার হঠাৎ জুতার ধূলো এই ঘরে। খাতাপত্তর দেখে বাক্স উলটেপালটে টাকাপয়সা গুণেগেঁথে দেখে—আনায়-গণ্ডায় মিল। আরে বাপু থাকেই যদি কিছু, তুই ধরবি সাহেবের পো! পুলিশের কর্তা যতই চতুর হোক, জগবন্ধু বলাধিকারীর চেয়ে বেশি নয় কখনো! হাতবাক্সটা বড় পয়মন্ত—কাঠ বদলে কবজা-পতর পালটে তালি দিতে দিতে আদি জিনিসের প্রায় কিছুই বজায় নেই। তবু ফেলা যাবে না।

জগবন্ধু বললেন, পাকশাকের ব্যবস্থা করে ফেলুন ভটচাজমশায়। ও-বেলা ভাত পেটে পড়েনি। এই দু-জনের চাল বেশি নেবেন আজ থেকে। থাকবে এখানে। কাজকর্মে লাগিয়ে দেব বলে টেনে নিয়ে এলাম। কাজলীবালাকে দেখছিনে, শুয়ে পড়ল নাকি?

সাহেব ও নফরকেষ্টর আপাদমস্তক ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বারম্বার নিরীক্ষণ করে। আগন্তুক দুটির প্রতি অঙ্গ বুঝি মুখস্থ করে নিচ্ছে। গোমস্তা ও ক্যাসিয়ার ছাড়া ভট্টাচার্যের অতএব আর কি পরিচয়—পাচক। দু-পাঁচ দিনেই অবশ্য জানা গেল, এ সমস্ত বাইরের চেহারা, ভূয়ো পরিচয়। মানুষ যা-কিছু কামনা করে সমস্ত আছে এই ক্ষুদিরামের। অশীতিপর বাপ-মা এখনো বর্তমান। ভাইরা সকলেই কৃতী। স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়েও বুঝি গোটা দুই। নিজেও ক্ষুদিরাম মূর্খ নয়—এককালে বাড়িতে টোল ছিল, সেই রেওয়াজে বাপ এই

কনিষ্ঠ ছেলেকে সংস্কৃত পড়তে দিয়েছিলেন। সকলকে নিয়ে জমজমাট একান্নবর্তী সংসার, ক্ষুদিরামই কেবল ভাঁটিঅঞ্চলে নানা জল খেয়ে এইভাবে পড়ে থাকে। সর্বস্ব ছেড়ে এসেও বংশ গরিমা ছাড়তে পারেনি, যার তার হাতের রান্না চলে না। রান্নাঘরে সেই গরজে ঢুকে পড়তে হয়।

দেখাদেখি বলাধিকারীও যান কখনো কখনো। কিন্তু ক্ষুদিরাম থাকতে হবে না, হাতা-খুন্তি কেড়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেয়। কী আর করবেন, মনোদুঃখে নিজ ঘরে ঢুকে পড়েন তখন। সে ঘর বইয়ে ঠাসা। স্ত্রী নেই, দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে মহানন্দে সংসারধর্ম করছে—ত্রিসংসারের মধ্যে বলতে গেলে আছে কেবল বই। অবসর পেলেই জগবন্ধু বইয়ের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্ত্রী থাকতে ঠাকুরদেবতারা এবং প্রচুর জপতপ ছিল। সমস্ত গিয়ে এখন তেত্রিশ কোটির মধ্যে শুধুমাত্র মা-কালীতে এসে ঠেকেছে। তা-ও যে কতখানি ভক্তির বশে আর কতটা কাজকর্মের গরজে, ঠিক করে বলা যায় না।

না, ভুল বলা হল! মেয়ে যে আরও একটি—কাজলীবালা। শুয়ে পড়ল নাকি কাজলীবালা—ক্ষুদিরামকে বলাধিকারী জিজ্ঞাসা করলেন। বলতে বলতে কাজলীবালা এসে পড়ল।

বলাধিকারী বললেন, তাড়াতাড়ি যোগাড়যন্তর করে দাও কাজলী। ভটচাজমশায় রান্না চাপাবেন।

সাহেবের দিকে চেয়ে বলেন, জানিস রে খোকনচন্দোর, এই হল কাজলীবালা। আমার মেয়ে।

কটকটে কালো রং, উদ্দাম দাঁতের ছড়া ঠোঁটের ফাঁক বেরিয়ে পড়েছে, কুৎসিত কুদর্শন। কোমল-মধুর স্বরে তার পরিচয় দিচ্ছেন। এই কণ্ঠ যেন বলাধিকারীর নয়, বুকের ভিতরে থেকে অন্য কেউ বলছে। বললেন, ছোট মেয়েটাও বিয়ে হয়ে চলে গেল, এই মেয়ে তখন ফাঁকা ঘরে এসে উঠল। ঘর আমার ভরে রেখেছে। বড্ড সৎ—

-হেসে উঠলেন: বোকা কিম্বা ভীরু—তারাই সৎ হয়। কাজলী আমার ভীরু একটুও নয়, বোকা। জীবনে এত পোড় খেয়েও বুদ্ধি কিছুতে জন্মাল না। সৎ রয়ে গেল।

কাজলী কলকল করে বলে, সামনের উপর সদাসর্বদা আপনাকে দেখি, অসৎ হই কী করে? ইচ্ছে হলেও তো পেরে উঠিনে।

রান্নার জোগাড়ে দ্রুত সে রান্নাঘরে ছুটল। হাসিমুখে ক্ষুদিরাম খুব উপভোগ

করছে। বলে, হল তো? মুখের উপর কেমন জবাবটা দিয়ে গেল? অলং বলে দেমাক করতে যান, এমন যে কাজলীবালা সে পর্যন্ত মানে না।

নিশ্বাস ফেলে বলাধিকারী বলেন, কি জানি! সৎই ছিলাম বটে একদিন। ফুল শুকিয়ে গিয়ে এখন কটুফল। ফলের চূড়োয় আধশুকনো ফুল একটু যদি থাকে, দায়ী তার জন্যে ঐ কাজলীবালা। শুকিয়ে একেবারে নিঃশেষ হতে দেয় না।

সাহেবকে এনে যখন ফেলেছেন, কাজকর্মে ঠিক লাগিয়ে দেবেন। সঙ্গী নফরকেষ্টও বঞ্চিত হবে না। দেবেন বলাধিকারী ঠিকই—দুটো দিন আগে আর পরে। সে-কাজ ধান-কাটা কিম্বা ডাক্তারি অথবা গুরুগিরি নয়, তা-ও বুঝতে বাকি থাকে না। মাঝে মাঝে সাহেবকে একান্তে ডেকে নিয়ে স্ফূর্তি দেন: শহরে দেখে এসেছিস বাঁধা নিয়মের কাজকর্ম—পাঁচটা সাতটা দশটা রাস্তার মধ্যে। এখানে এলাহি কাণ্ডকারখানা—অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো কপালে জয়পত্র এঁটে ডাঙা-ডহর ভেঙে ছুটোছুটি। তোরও একদিন জয়-জয়কার পড়ে যাবে, দিব্যচক্ষে আমি দেখছি। রোজগারের কথা ধরিনে—দোকানদার-অফিসার ফড়ে-চাষা রোজগার সবাই করে থাকে। নামযশ পাবি অঢেল—সেকালে যেমন ছিল পচা বাইটা, একালের যেমন কেনা মল্লিক। চাই কি ছাড়িয়েও যেতে পারিস ওদের। কার ভিতরে কতখানি বস্তু, কাজে না পড়লে সঠিক নিরিখ হয় না।

কাজ হবে-হবে করছেন, এমনিভাবে মাসখানেক কেটে গেল। শুয়ে বসে সাহেবের দিন কাটে না, ছোঁক-ছোঁক বেড়ায়, অধীর হয়ে এক এক সময় বলাধিকারীর কাছে গিয়ে পড়ে! নফর কেষ্টর মহৎ গুণ, ঘুম জাগরণ একেবারে তার হাত-ধরা। কাজ পড়ে গেল তো পাঁচ-দশটা অহোরাত্রি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়; কাজ নেই তো সারাদিন ও সমস্ত রাত অবিরাম ঘুমোয়। ফুলহাটায় এসে মনের সাধে সে ঘুমোচ্ছে। দুপুরের আহার শেষ হতে না হতে ঘুমে ঢলে পড়ে, মাঝে একবার রাত্রিবেলা ভাতের থালাটা সামনে এনে ঠেলেঠুলে তুলে দিতে হয়—একটু ক্ষণের ঐ বিরতি। নফরকেষ্টর সময় কাটানোর অসুবিধা নেই।

বলাধিকারী বলেন, ছটফট করিস কেন, জলে পড়ে যাসনি তো! দেখে-শুনে হালচাল বুঝে বেড়া। ছুটকো-ছাটকা যদি কিছু মেলে সেই সন্ধানে আছি। তার বেশি এবারে হয়ে উঠবে না। সামনের মরশুমটা আসতে দে না—বুঝে নেবে তোর মতন ছেলে।

চুকচুক আওয়াজ তুলে বলেন, ছটো মাসও আগে যদি পেতাম! কেনা মল্লিককে বললে সোনা হেন মুখ করে কোন একটা দলের সঙ্গে রওনা করে দিত। নতুন বলে হাতে কাজ করতে দিত না, তাহলেও ধারাটা দেখে বুঝে আসতিস। এ মরশুমে কিছু হবে না, কারিগরলোক সব বেরিয়ে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে দেখ—বুড়ো বাচ্চা আর মেয়েলোক। সমর্থ জোয়ান-পুরুষ কদাচিৎ এক-আধটা।

ঘুরে ফিরে একটা নাম কেবলই আসে—কেনা মল্লিক। কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। কেনার নামে সকলে তটস্থ। ভরা মরশুমে মল্লিকের দলবল চতুর্দিকে এখন রে-রে করে বেড়াচ্ছে। কাপ্তেন নিজেও ঘরে বসে থাকে না, আলাদা পানসি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বিজয়া দশমীর ঠিক পরের দিন। শরৎকাল দিগ্বিজয়ে বেরুনোর সময়। রাজরাজড়াদের সেই পুরোনো রীতি কেনা মল্লিক এবং তার আগে বেচারাম মল্লিক ভাঁটিঅঞ্চলে বজায় রেখে আসছে।

একদিন সন্ধ্যার পর বংশী এসে ডাকে: চল সাহেব, একটা জায়গায় ঘুরে আসিগে।

সাহেব অর্থভরা হাসি: সত্যি রে।

বংশী কিন্তু গম্ভীর। বলে, রাতে বেরুনোর কথা আমাদের মুখে শুনলেই লোকে ভিন্ন রকম ভেবে নেয়। তুমি পর্যন্ত। বিয়ে করতে যাব, সেইদিন সকালেও এক সাঙাত বলছে, সত্যি কথাটা ভাঙ দিকি ভাই—কোথায়? যেন ছনিয়ায় আমাদের অন্য কিছু থাকতে নেই—সুখসর্বস্ব যা কিছু ঐ। কাজ অন্তরম্ভা, নামটা আছে কিন্তু আমার। পচা বাইটার নাতি, সেই সুবাদে। এ নাম একবার রটলে সাত-সাগরের জল ঢেলেও ধুয়ে ফেলা যায় না।

সাহেব বলে, কী এমন বললাম যে একগাল কথা শোনাচ্ছে? কোন তীর্থিধর্মে যাওয়া হবে, তাই জানতে চেয়েছি শুধু।

বংশী বলে, ইস্কুলবাড়িতে—ছোটমামা যেখানটা আস্তানা নিয়েছে। ধর্মের জায়গা বানিয়ে তুলেছে, ফেরার সময় পুণ্যি খানিকটা জড়িয়ে আসবে দেখো।

ছোটমামা মুকুন্দ। মুকুন্দ বর্ধন—সোনাখালির পচা বাইটার কথা হয়ে থাকে, তার ছোটছেলে। মুকুন্দকে নিয়ে বংশী যখন তখন গালিগালাজ করে। বলে, পাকা মানুষ হয়েও আজামশাই ভুল করে বসলেন—পণ্ডিত বানাতে গেলেন ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে। উচিত প্রতিফল তার। জন্মদাতা পিতার নামে নাক সিঁটকায়। সোনাখালির এমন ঘরবাড়ি ছেড়ে ইস্কুলে পড়ে থাকে। বর্ধনকুলের মুষল।

সাহেব বলে হিরণ্যকশিপুর বেটা প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপু পাপী দৈত্য, প্রহ্লাদ মহাভক্ত। বাপে বেটায় ধুন্ধুমার—

বংশী লুফে নিয়ে বলে, ঠিক তাই। ছোটমামার ঐ মতিগতি, তার উপর জুটল এসে ছোটমামীটা। সে এক পোঁটাচুন্নির বেটি পদ্মবিলাসী। গায়ে একটু চিকন ছটা, সেই দেমাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পথ হাঁটে। পাপের ছোঁয়া লেগে না যায়। ঘরের বউ পুরুষকে কোথায় বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবে—সে-ই আরো বেশি করে বিগড়ে দিল ছোটমামাকে।

একলা মুকুন্দকে নয়, ঐ সঙ্গে তার বউকে জুড়ে বংশী নিন্দেমন্দ করে। পচা বাইটার নামে সাহেবের আগ্রহ, তার সব কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতে চায়। বাইটার ঘরসংসারের যাবতীয় কথা। গুণী মানুষটা বয়স হয়ে গিয়ে এত কষ্ট পাচ্ছে। যার জন্য বলাধিকারী বুড়োকে মরতে বলেন। মরেছে কি বেঁচে আছে, উঁকি দিয়ে দেখে না বাড়ির লোক। তেষ্টায় চিঁ চিঁ করছে, জলটুকু এগিয়ে দেবার পিত্যেশ নেই। বড়ছেলে মুরারি জমিদারি সেরেস্তার নায়েব। জমিদারের কাজ এবং নিজেদের যে সম্পত্তি আছে তাই নিয়ে হিমসিম খেয়ে যায়। বড়বউয়ের এক গাদা ছেলেপুলে, কাঁধের উপর সংসারের যাবতীয় দায়ঝক্কি। কিন্তু বাঁজামানুষ ছোট ঠাকরুনের ঝক্কি-ঝামেলা নেই, ফুলেল তেল মেখে পতর তুনিয়ে বাহার করে বেড়াবে—

এককোঁটা মেয়ে সুভদ্রা বউ হয়ে এল, পচা বাইটা তখনও শক্তসমর্থ। মুকুন্দ একটা পাশ দিল সেবার। বাইটার ছেলে হয়ে হেন কাণ্ড করে বসল, লোকে তাজ্জব বনে গেছে। পাশ-করা বরের বউ হয়ে সুভদ্রারও মাটিতে পা পড়ে না। আর কিছুকাল পরে বউ খানিকটা সোমত্ত হয়ে বরের কানে বিষমন্তোর দেয়ঃ তুমি বিদ্বান হলে, কিন্তু বাড়ির নিন্দে গেল না। চোরের বাড়ি বলে মানুষ আঙুল দেখায়। সকালবেলা চক্ষু মুছে উঠে চোর-শ্বশুরের মুখ দেখতে হয়। বাইরের কোথাও কাজকর্ম দেখ। দু-জনে বাসা করে ধর্মভাবে থাকা যাবে।

সত্যি সত্যি এই বলেছিল কিনা, ধর্ম জানেন। কিন্তু লোকে বলে। সুভদ্রার নাক-সিঁটকানো দেখে বিশ্বাস হয় তাই। গোড়ার দিকে ফিস-ফিসানি। বয়সের সঙ্গে গলা চড়তে চড়তে ক্রমশ রুদ্রমূর্তি। দিশা না পেয়ে মুকুন্দ কুলহাটার ভাগনে বংশীর বাড়ি এসে উঠল। বাইটার নাতি, এবং সেই পথের পথিক বলে বংশীরও অল্পসল্প নাম হতে শুরু হয়েছে। লোকে বলে, বাইটার বেটা লেখাপড়া শিখে নতুন কায়দার কাজ ধরবে। পীঠস্থানে এসে পড়েছে—মাথার উপরে বলাধিকারী, পেছনে বংশীধর। অতএব

তাড়াতাড়ি সে মাইনর ইস্কুলের এই মাষ্টারি কাজ জুটিয়ে নিয়ে বংশীর বাড়ি ছাড়ল। কলঙ্ক মোচন করল। সেই থেকে আছে। স্বামী-স্ত্রী ধর্মবাসা বানিয়ে একত্রে থাকবে, আজও সেটা ঘটে উঠেনি। গোড়ায় পনের টাকায় ঢুকেছিল, এখন শোনা যায় পঁচিশ। ইস্কুলের মাইনের কথা ঠিকঠাক বলবার জো নেই—খাতায় লেগে হয়তো পঞ্চাশ। যত বড় সাধু মাস্টার হও, এটুকু করতে হবে। সবাই করে সকলে জানে। যে ইন্সপেক্টরকে দেখাবার জন্য করতে হয়, সে ভদ্রলোকও জানেন নিশ্চয়। এই মাইনেয় ধর্মবাসা হয় না। ছোটবউ অগত্যা চোর-শ্বশুর এবং নায়েব-ভাসুরের ভাতেই পড়ে আছে। মরমে মরে থেকে দু-বেলা দুই থালা অন্ন কোন গতিকে গলাধঃকরণ করে যাচ্ছে।

সন্ধ্যারাত্রে বংশী এসে বলল, বড় সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, এখানে দু-জনে বসে ভুটুরভুটুর করে কি হবে? সে তো রোজই আছে। ইস্কুল-বাড়ি যাচ্ছি তুমি চল।

সাহেব বলে, মতলব কি, বউয়ের তাড়ায় আবার ক-ব-ঠ শুরু করবে নাকি? সুবিধেও রয়েছে, তোমার ছোটমামা নিজে মাষ্টার—

সে কি আর এই বয়সে! সময় থাকতে তুমি যা-হোক খানিকটা করে নিয়েছে।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু বউ বলছে লেখাপড়া না হোক, ভাল হওয়া নাকি সব বয়সেই চলে। বলি, এমনি তবু দু-চার পয়সা আসে, ভাল হয়ে গেলে খাব কি শুনি? মেয়েমানুষ জাত, হিসেবজ্ঞান নেই—আদাজল খেয়ে ঘাড় লেগেছে। তা ভাবলাম একটা দিনেই কিছু আর ভাল হয়ে যাচ্ছিনে, দেখেই আসি না কেমন। খানিক পথ গিয়ে মনে হল, একলা না গিয়ে দোসর নেওয়া ভাল—একা না বোকা। তোমার কাছে চলে এসেছি।

বংশীর ভাব দেখে না হেসে পারা যায় না। হেসে উঠে সাহেব বলে, কী ব্যাপার ইস্কুলবাড়িতে?

একলা পড়ে থাকে ছোটমামা—দিনমানে ইস্কুল, সন্ধ্যার পরে কি করে? কিছুদিন থেকে তাই পাঠ ধরেছে। গীতা-পাঠ হত গোড়ায়, সে কটোমটো জিনিষ শোনার মানুষ হয় না। গীতা ছেড়ে আজ ক'দিন রামায়ণ ধরেছে। খুব জমেছে নাকি, নিত্যিদিন বউ সেখানে যায়। আমায় যেতে বলে। আজকে বড্ড শাসিয়ে গেছে—

বিরস মুখে বলে, সীতা বনে গেলেন রামের পেছন ধরে। কলির সীতায়

উল্টো করমাল, তার পিছন ধরে আমায় গিয়ে রামায়ণে বলতে হবে। আসরে না দেখতে পেলে বাড়ি ফিরে আজ মুণ্ডু থেঁতো করবে, সতীলক্ষ্মী বলে গেছে।

অগত্যা সাহেবকে উঠে পড়তে হয়। বলে রামায়ণ গান দিয়ে গৃহস্থ ভূত তাড়ায় শুনেছি। আমার মতন জ্যান্ত ভূত সেইখানে নিয়ে চললে বংশী—

বংশী বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল, এই কথায় হেসে: সে বসে এক সময় ছিল ক্ষুদিরাম ভটচাজের গান। ইঁদুরে-খাওয়া হারমোনিয়াম আছে একটা, তার বাজনা। বাজনা বলে আমায় দেখ, গান বলে আমায়। ইদানীং আর শুনিনে। রামায়ণ নো রামায়ণ—ওঝার মন্তোরও তার কাছে লাগে না, ভূতের ঠাকুরদা বেহ্মদত্যি অবধি পৈতে ছিঁড়ে বাপ-বাপ করে পালাবে। ছোটমামার পাঠ তেমন নয়—শুনেছি খুব মিষ্টি। আমার বউ একটা দিন গিয়েই জমে গেল। সন্ধ্যে হলেই ঘরবাড়ি ফেলে ছুটে গিয়ে পড়বে।

সাহেব থমকে দাঁড়িয়ে বলে, এই দেখ, ভয় ধরিয়ে দিলে। আমিও যদি জমে যাই—শখ করে এক দিন গিয়ে রোজ রোজ যেতে হয় যদি। বলা যায় না কিছু—শেষটা হয়তো ভস্ম মেখে সোঁদালফলের মতো ছড়া ছড়া জটা ঝুলিয়ে সাধু হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। সে নাকি বড় কষ্ট—ভক্তদের ঘি-দুধের সেবায় যা-কিছু রক্ত হল, মশা-ছারপোকায় তার ডবল টেনে নেই। খাস কালীঘাটের আসল সাধুর মুখে শুনেছি।

হেসে ওঠে সাহেব, সে হাসিতে বংশী যোগ দিল না। বলে, সাধু হলে একটা দিক বড় বাঁচোয়া। এক দিন দেখি, থানার বড়বাবু ঘাড় নিচু করে ছোটমামার গীতাপাঠ শুনছে। হিংসা হচ্ছিল—মামার কাছে কেঁচো হয়ে বসেছে, আমার কাছে সেই মানুষ বাঘ। কষ্ট ছোটমামার যা-ই হোক, চৌকিদার-দারোগার চোখ-রাঙানি নেই। ঐ লোভে এক এক সময় সাধু হতে ইচ্ছে করে।

আসরের একটা কোণ নিয়ে দু-জনে বসে পড়ল। মুকুন্দ মাস্টারের অভিপ্রায় ছিল, সৎপ্রসঙ্গ করে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের বনিয়াদ গড়বে। কিন্তু সন্ধ্যার পর পড়া মুখস্থ না করে কোন ছেলে পাঠ শুনতে আসবে? গার্জেনেরও ঘোরতর আপত্তি: লেখাপড়া করে আখেরের ব্যবস্থা করুক এখন, ধর্মকথা শোনার সময় অনেক পরে—বুড়ো হয়ে পড়লে। আসর তবু দিব্যি জমেছে। ছেলে না পাঠিয়ে ছেলের মা-বাপ মাসি-পিসিরা আসে। যাদের ছেলেপুলে পড়ে না, তারাও সব আসে। মরশুম পড়ে বাড়ির জোয়ানমরদেরা বাইরের কাজে চলে যাবার পর ভিড় অতিরিক্ত রকম বেড়েছে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকেও এসে জোটে। জলচৌকির উপরে পাঠের আসন। সামনে পিতলের রেকোয় সিঁদুর

ও আম্রপল্লব দিয়ে ঘটস্থাপনা হয়েছে। পাঠের আগে ও পরে সেই ঘটের সামনে গড় হয়ে বিড়বিড় করে সকলে কামনা জানায়: কাজকর্ম খুব ভাল হয় যেন ঠাকুর, থলি-ভরা টাকা নিয়ে ঘরের মানুষরা সুভালাভালি ঘরে চলে আসে। যত দিন তারা না ফিরছে তল্লাটের মানুষ কোন রকম ধর্মকর্ম বাদ দেবে না। তাদের পাপে এদের পুণ্যে কাটকাটি। ভক্ত শ্রোতা পেয়ে মুকুন্দও প্রাণ ভরে লেগে যায়।

বংশী ফিসফিসিয়ে বলে, ঐ দেখ আমার বউ। ঘোমটার ফাঁকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। আড়ে লম্বায় চৌকো মাপের ঐ যে বউটা। অবাক হবার কি আছে—আমি সরু বলে বউয়ের বুঝি মোটা হতে নেই। আঃ, আঙুল দিয়ে দেখিও না, রেগে যাবে।

থতমত খেয়ে সাহেব হাত নামিয়ে নেয়: তা বটে! ভূতপেত্নি বাঘ আর স্ত্রীলোককে আঙুল দেখাতে নেই। ভুলে গিয়েছিলাম।

বংশী হেসে ফেলল: কি জানি বাবা, বাঘ ভূতপেত্নি সামনাসামনি দেখিনি। কিন্তু ঐ যে দেখছ গদগদ হয়ে পাঠ শুনছে, বাড়ির উঠোনে পা দিলেই মারমূর্তি! গাছের কুল পাড়ার মতো আমায় যেন আষ্টেপিষ্টে ঝাঁকায়।

হাসির ছলে প্রথম দিন সাহেব যা বলেছিল, সত্যি বুঝি তাই খেটে যায়। খাসা পাঠ মুকুন্দর, প্রাণ কেড়ে নেয়। খানিকটা বুঝি নেশা ধরে গেল, প্রায়ই সে আসে। বংশীই বরঞ্চ পাকসাট মারতে চায়, ঠেলেঠুলে সে-ই আনে বংশীকে। আসর সুদ্ধ লোক ঘন ঘন সাহেবের দিকে তাকায়। তার চেহারার গুণে। গুণ নয়, অভিশাপ—চেহারাটার উপরে অত মানুষের নজরগুলোর অবিরাম খোঁচাখুঁচি। অস্বস্তি লাগে। তবে এখানে এই আসরে বসে একটা নতুন উপলব্ধি—পাঠ আরম্ভ হতেই ভিন্ন লোকে চলে যায় সে যেন। অন্যে কি করছে, খেয়াল থাকে না।

রাম-বনবাসের জায়গাটা হচ্ছে সেদিন। সাহের তদ্গত হয়ে শুনছে। রামচন্দ্রের মতন তারও বনবাস। কোন রাজবাড়িতে জন্ম হল তার—সাতমহল অট্টালিকা, অগুণতি দাসদাসী, হীরা-মাণিকের ছড়াছড়ি—সমস্ত কেড়েকুড়ে নিয়ে পুরী থেকে নির্বাসন দিল। বারো বছর পার হয়ে গেছে, দুই বারো হতে যায়—ফেরার দিন কই আসে না। কোন দিনই আসবে না। ঠিকানাই জানে না কোথায় তার অযোধ্যাপুরী। ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগের মধ্যে নিশিরাত্রে

চুপি চুপি পুঁটলিতে পুরে গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিল। ঘুমে অচেতন পুরবাসা, কেউ কিছু জানলই না—কেমন করে আকুল হয়ে রামের পিছন ধরে ছুটবে? পুত্রশোকে রাজা দশরথ কাঁদতে কাঁদতে মারা গেছেন—অথবা আপদ চুকিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ি-ঘোড়া হাঁকাচ্ছেন, তাই বা কে বলতে পারে!

বংশী হঠাৎ গায়ে ঠেলা দেয়: কী হচ্ছে সাহেব? সাহেব নামটা চালু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বলছে, এই সাহেব, চোখ মুছে ফেল। চল, বাড়ি যাই।

সম্বিত ছিল না সাহেবের। জাগ্রত হয়ে বুঝতে পারে, দু-চোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। কেলেঙ্কারি! সকলের দৃষ্টি তার দিকে!

ধড়মড় করে উঠে পালিয়ে যাবে, কিন্তু মুকুন্দ মাস্টারও দেখে ফেলেছে। পাঠের মধ্যেই হাতের ইসারায় তাকে বসতে বলল। নিরুপায় হয়ে বসতে হয়। অধ্যায়টা শেষ করে মুকুন্দ বই বন্ধ করল। বলো আজকে এই পর্যন্ত।

হরিধ্বনি দিয়ে শ্রোতারা উঠে পড়ে। সাহেবও উঠেছিল সকলের সঙ্গে, মুকুন্দ মানা করে: আমার ঘরে চল একটুখানি। নিয়ে এস বংশী, আলাপ করি। বলাধিকারীমশায়ের ওখানে আছ, সেটা শুনেছি। ক-দিন থাকবে এখানে ভাই?

'ভাই' বলে ডাকলেন অমন মান্যগণ্য মানুষটি। কম্পাউণ্ডের একদিকে খোড়োঘরে মুকুন্দ মাস্টারের বাসা। অদূরে ঐ রকম আরও খান দুই ঘরে পুরানো দপ্তরি রজনী বউ-ছেলেপুলে নিয়ে থাকে। পাঠের আসর ইস্কুলের বড়-বারাণ্ডায়।

সাহেবকে সামনে বসিয়ে মুকুন্দ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। বলে, সাধুসন্তের চেহারার মধ্যে পুণ্যের জ্যোতি ঠিকরে বেরোয়। তোমার সেইরকম ভাই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। ভাবের মানুষ, ভক্ত মানুষ সংসারে বড় কম। পাঠের আসরে এসো তুমি যে ক'টা দিন আছ।

ঐ চোখের জলের কাণ্ড—তারই সঙ্গে মিলেছে চেহারা। লজ্জা—কী লজ্জা! গ্রাম সুদ্ধ মানুষ—তাই বা কেন, কত গাঁয়ের কত মানুষ আসে, সকলে দেখে গেল। ফুলহাটায় থাকাই তো চলে না এর পর। পুরুষ-মেয়ে আঙুল দিয়ে দেখাবে: ঐ যে—দেখ, দেখ, সেই ছিঁচকাঁদুনে ছোঁড়াটা।

নানা কথায় রাতটা কিছু বেশি হয়ে গেছে। মুকুন্দ উনুন ধরাবে এবার। বলে, চিঁড়ে ফুরিয়ে গেছে, নয়তো হ্যাঙ্গামে যেতাম না। যাক গে, চাল ফুটিয়ে ফ্যানসা-ভাত ঘুটে নিই। কতক্ষণ লাগবে!

বংশী বলে, নিজে কেন হাত পুড়িয়ে খাও ছোটবাবা? আমি থারাপ, আমার,

আজামশায় খারাপ—আমাদের ভাত না-ই খেলে। রজনীরা পাশে আছে, ওর বউ চাট্টি রেঁধে দিতে পারে না?

মুকুন্দ বলে, রজনী নিজে থেকেই বলেছে কতবার। এমনি তাদের পাঁচ-ছটা ছেলেপুলে, তার উপর আমি গিয়ে ঝামেলা বাড়াতে চাইনে।

ফেরার পথে বংশী বলে, অর্ধেক দিনই উপোস ছোটমামার। আজ ঠিক ঝাঁঝালো ক্ষিধে, গরজ করে তাই উনুন ধরাতে গেল। রজনী দপ্তরির সঙ্গে হলে খাও না খাও বাঁধা খরচা দিয়ে যেতে হবে। সেই জন্যে এগোয় না, কষ্ট করে হাত পুড়িয়ে খায়।

কঞ্জুষ বুঝি?

দায়ে পড়ে হতে হয়েছে। পেটে না খেয়ে দুঃখধান্দা করে পয়সা বাঁচায়—বাসা করে ছোটমামীকেও পাপের সংসার থেকে উদ্ধার করে আনবে। সে আর এ জন্মে নয়। দেহ থাকলে অসুখবিসুখ আছে, লোকালয়ে থাকতে দায়বেদায় আছে। টাকাটা সিকিটা পয়সাটা জমিয়ে জমিয়ে যা করল, এক ঝোঁকে সব লোপাট। বছর আষ্টেক তো হয়ে গেল, রাই কুড়িয়ে বেল আর হয় না। ভেবেচিন্তে দুটো পয়সা রোজগার বাড়াবে, সে ইচ্ছেও তো নয়। সাঁজের বেলাটা পুথি না পড়ে তিনটে ছেলে পড়ালে কোন না দশটা টাকা আসে! আলাদা ধাঁচের মানুষ—মাথা খারাপ, বলাধিকারী বলেন। নিজের মাথা নিয়ে চুপচাপ থাকলে কথা ছিল না, পুঁথিপত্তর শুনিয়ে আরও যে দশটা ভাল মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। আমার বউয়ের তাই করছে। 'ভাল হও ভাল হও' দিনরাত বউ কানের কাছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে। আগে অমন ছিল না, ছোটমামার পাঠ শুনে শুনে হয়েছে।

এর পর সাহেবের নিজের কথা উঠে পড়ল। বংশী বলে, আজামশায়ের গুণজ্ঞান আছে, তার বেটা ছোটমামাও দেখছি গুণ করে ফেলতে পারে। ভিন্ন রকমের গুণ—উল্টো দিকে। আমার বউকে করেছে। তুমি বিদেশি মানুষ, বলাধিকারী আশায় আশায় কোন মুলুক থেকে টেনে এনে বাড়ির উপর ঠাঁই দিয়েছেন—তোমার চোখেও জল বের করে ছাড়ল।

লজ্জায় রাঙা হয়ে সাহেব চাপা দিতে চায়: না না, উনি কি করলেন! পাঠ শুনে কেমন হয়ে গেল—জেগে জেগেই যেন দুঃখের স্বপ্ন দেখলাম একটা—

বংশী প্রবল ঘাড় নেড়ে বলে, পাঠ তো আমিও শুনলাম। আগেও কত দিন শুনেছি। আমার তো কই লঙ্কার গুঁড়ো চোখে ঠেসেও একফোঁটা জল বের করা যায় না। ছোটমামা তবে খাঁটি কথাই বলেছে—ওদেরই ভাবের মানুষ

তুমি। ভক্ত মানুষ। বলাধিকারীর আশায় ছাই। ভুল মানুষ নিয়ে এসেছেন।

সাহেব সভয়ে বলে, খবরদার বংশী, বলাধিকারীমশায়ের কানে না যায়। হাসবেন, ঠাট্টা করবেন। তাড়িয়ে দেবেন হয়তো দূর-দূর করে। তোমার ছোটমামার এই পোড়া ইস্কুলে আর আসব না।

মাথা নেড়ে জোর দিয়ে বলে, কোন দিন আর আসছি নে। সর্বনেশে জায়গা। যা বললে—গুণই সত্যি। মনটা ভিজিয়ে জোলো করে দেয়। বুড়ো-বুড়িরা হাঁ করে শুনছিল, তাদের পোষায়—পুঁথি শুনবে, তারপর বাড়ি ফিরে বসে বসে ঝিমোবে।

মুখে এই বলল, মনে মনেও সাহেব সর্বক্ষণ নিজেকে এবং অজানা বাপ-মায়ের নামে ধিক্কার দিচ্ছে। বাপ অথবা মা—দুয়ের মধ্যে একজন। কথায় কথায় কেঁদে ভাসানো নিশ্চয় একের স্বভাব। বাপই হয়তো। নির্দোষ অবোধ সন্তান বিসর্জনের ব্যাপারটা কোমলপ্রাণ বাপ হয়তো জানত না কিছু, শয়তানী মা চুপিচুপি আত্মকলঙ্ক ভাসিয়ে দিয়েছে। দিয়ে সতী হয়েছে দশের মাঝে। অথবা হতে পারে, প্রসবকালে অচেতন মায়ের অজ্ঞাত দানব বাপ নিজের দায়দায়িত্ব নিশ্চিহ্ন করে গেছে—মা তারপরে কেঁদেছে কত। আজও হয়তো কাঁদে। এত বড় ভুবনের মধ্যে কোন কিছুই দিল না তারা, পিতৃমাতৃ-পরিচয়টুকুও নয়—উত্তরাধিকার শুধুমাত্র সেই অপরিচিত অপদার্থ মানুষের প্যাচপেচে কাদার মতো মন। প্রতি পদে যা নিয়ে অপদস্থ হতে হচ্ছে।

নেশা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। দিনে দিনে বেড়েই চলল। খাতিরও বাড়ছে—মুকুন্দ ভাই বলে, সাহেব ডাকে ছোড়দা। সন্ধ্যা হলেই মন উসখুস করে আসরে গিয়ে বসবার জন্য। হঠাৎ এর মধ্যে বংশীর বউ ভেদবমি হয়ে কহিল হয়ে পড়ল। বংশীর যাওয়া বন্ধ। ঘোমটার মধ্য দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গতিবিধি দেখবার মানুষটা নেই, কোন দায়ে আসরে হাত-পা কোলে করে বসে থাকবে? সাহেব যায় একা একা।

বংশীর কাছেও সে কথা স্বীকার করতে লজ্জা। আজেবাজে বলে কাটান দেয়। বলে, হাটে গিয়েছিলাম। কোন হাটে রে? দিশা না পেয়ে ভুল এক গাঁয়ের নাম করে দেয়, ঐ বারের হাট সে গাঁয়ে নয়। ধরে ফেলে বংশী হেসে খুন। সন্ত্রস্ত হয়ে সাহেব বারবার বলে, বলবে না কাউকে, দোহাই! বলাধিকারীমশায় টের না পান।

আসরে বিশ গণ্ডা চোখের উপর জানাজানি হয়ে পড়ছে, আসরের বাইরে ভিন্ন সময় এখন সে ছোড়দার কাছে গিয়ে বসে। এক একদিন অপরাহ্ণে

ইস্কুলের ছুটির পর খালধারে বেড়ায় দু-জনে। কায়দা পেলেই সাহেব মহাগুণী পচা বাইটার কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু আদায় হয় না কিছুই। মন্ত্রগুপ্তির মতো মুকুন্দ বাপের কথা চাপা দিয়ে ভগবান নিয়ে পড়ে। বেড়ানোর মুখেও ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনে যেতে হয়। নিতান্ত যে খারাপ লাগে, তা নয়।

ঘরে ফেরার সময় সাহেব অনুশোচনায় ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সারাপথ মনে মনে মা-কালীর পায়ে মাথা খোঁড়ে: অনেক দূরে তুমি আছ মাগো, তবু কি আর দেখতে পাচ্ছ না? বলাধিকারীমশায়ের অনেক আশা আমার উপর, সব বুঝি বরবাদ হয়ে যায়। সর্বনেশে ধার্মিক ঐ ছোড়দা—কোনদিন তার কাছে যেন না আসি। চোখ দুটো খুঁড়ে ফেললেও এক কোঁটা জল যেন না বেরোয়। মন্দ করে দাও আমায় মা-জননী—যার চেয়ে মন্দমানুষ কোনদিন কোথাও হয়নি।

বংশী বলেনি কিছু। বলাধিকারীর তবু টের পেতে বাকি নেই। বৈঠকখানা-ঘরে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য আর সাহেব—সেইখানে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়লেন: মুকুন্দ মাস্টারের কাছে বড্ড যে আনাগোনা! ব্যাপার কি?

পাকা লোক ওকিবহাল হয়েই বলছেন, অস্বীকার করে লাভ নেই। তাচ্ছিল্যের ভাবে সাহেব বলে, পাঠ করেন নেহাৎ মন্দ নয়। কাজকর্ম নেই, সন্ধ্যাবেলা বসেছি গিয়ে দু'এক দিন।

ঘৃণা ভরে বলাধিকারী বলে উঠলেন, বোকা ছাগল! ছাগলের মতন সুরও রেখেছে একটু। এক একটা মানুষ হয় এই রকম। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলেন, ভূত নয়, ভগবান। দুটোর মধ্যে বড় বেশি তফাৎ নেই। হায় রে হায়, পচা বাইটার মতো গুণীর বেটা শেষকালে ভগবানের কিল খেয়ে মরছে!

সাহেব ফস করে বলে বসল, হয়তো বা বাইটামশায়ের পরিণাম দেখে। পাপের শাস্তি—বলেছিলেন একদিন মাস্টারমশায়।

'ছোড়দা'—সাহেবের মুখে এসে গিয়েছিল আর কি। মাস্টারমশায় বলে সামাল দিল। বলাধিকারীর গায়ে যেন আগুনের সেঁক লাগে। খিঁচিয়ে উঠলেন: পাপ-পুণ্যের কথা এর মধ্যে আসে কিসে? বুড়ো হয়ে কোন মানুষটা বিছানা নেবে না, জোয়ান-যুবোর মতো পাকচক্কোর মেরে বেড়াবে, বল দিকি সেই কথাটা! মুকুন্দ ঐ যে মহান্ত হয়ে সদাচারে আছে, লম্বা লম্বা বচন ঝাড়ে

আড়কাটির মতন জোরের ভালোর দলে টানছে—বুড়ো হলে তারও ঠিক বাইটার গতি। গীতা-রামায়ণে ঠেকিয়ে দেবে না।

ক্ষুদিরাম হেঁট হয়ে খাতায় একটা যোগ দিচ্ছিল, ঘাড় তুলে এইবার বলে, দল ভারি করার ব্যাপার আসলে। গাঁজার নেশা একলা জমে না। চুরি বলুন সাধুগিরি বলুন, সব নেশার ঐ এক নিয়ম। খুলনা শহরে পাদ্রি সাহেবরা রাস্তার মোড়ে টুলের উপর দাঁড়িয়ে চেঁচায়: পাপের চাপে নরকে তলিয়ে যাবে, শিগগির আমাদের খোঁয়াড়ে চলে এসো। কাঠমোল্লাদেরও ঐ কথা। যাবেন কোথা? অজজি পাড়াগাঁয়ে পটুয়ারা পট দেখিয়ে পালা শুনিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়—মরার পরে যমদূতেরা ঢেঁকির পাড় দিয়ে অসতী নারীকে চিঁড়ে কুটছে, ঘানিগাছের মধ্যে চোর-ডাকাত পিষে তেল বের করছে—সেখানেও সেই পুণ্যের জয় পাপের ক্ষয়।

বলাধিকারী ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, যে-বাড়ি ভিক্ষে করতে গেছে সেই মানুষটাই হয়তো শঠতা-বঞ্চনায় টাকার পাহাড় জমিয়েছে। তার পরিণাম কিন্তু পটে লেখে না।

ক্ষুদিরাম সহাস্যে বলে, তা-ও আছে। শাস্তি নয়, পুরস্কার। ফকির-বোষ্টম অতিথি-ভিখারি অন্ধ-আতুরকে দিয়েছে বলে বৈকুণ্ঠধামে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে হীরা-মুক্তো খাওয়াচ্ছে তাকে। বুঝলেন মশায়, ভালোর দলের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না। ওদের তোড়জোড় টাকাকড়ি সাজ-সরঞ্জাম অনেক।

পচা বাইটার কথাটা ঘুরছে ক্রমাগত বলাধিকারীর মনে। বললেন, বাইটামশায়ের শাস্তি পাপের দায়ে নয়, বুদ্ধির দোষে। যা-কিছু রোজগার বিষয়আশয় ঘরবাড়িতে লগ্নি করে ফেলল। তা-ও বেনামি—সরকার কবে কোনটা বাজেয়াপ্ত করে বসে, সেই ভয়ে। কিন্তু বিষ না-ই থাকুক কুলোপানা চক্কোরে দোষটা কি ছিল? ভাব দেখাবে, এত খরচখরচা করেও আছে এখনো অঢেল। সেই মেজাজে চলবে। রাত্রে দুয়োরে খিল দিয়ে দুটো পাঁচটা টাকা নিয়ে টুংটাং করে নখে বাজিয়ে যাবে—কবাটের বাইরে নিশ্বাস বন্ধ করে বাড়ির লোকে গণবে দু-শ পাঁচ-শ টাকা। পরের দিন সকালে দুয়োর খুলতে না খুলতে দেখবে চরণ-সেবার জন্ত কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। টাকা না-ই বা থাকল, টাকার ঝাঁঝ থাকলেও কাজ চলে যায়। এইটুকু কেন যে ঘটে এলো না বাইটার! মুকুন্দ বর্ধনের এই দুর্গতি শেষ বয়সে, যদি না হাতে-গাঁটে পয়সা জমিয়ে রাখে। সে আর হয়েছে! অন্তভক্ষ্য-ধনুর্গুণ—দিনে চলে না এখনই এই জোয়ান বয়সে।

সাহেব এই ক-দিনই সেটা বুঝেছে। মুকুন্দর জন্ত মায়া পড়ে গেছে মনে মনে। বলে, আড়কাটি যদি বলেন, সে মাস্টারমশায় নয়—আমি। আমিই ওঁকে ভাগিয়ে নিয়ে আসব ভালোর পথ থেকে। নয়তো সত্যি সত্যি উনি মারা পড়বেন।

ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম বলে, পাঁড় নেশাখোর বাপ্ পেরে উঠবে না। কাজলী-বালাকে পারা গেল ? আর, এই যে ইনি—

বালাধিকারীর দিকে চেয়েও হয়তো অনুরূপ কিছু বলত। তার আগেই বালাধিকারী বলেন, পাঁড়-সাধু আমিও ছিলাম রে। অমন-চারটি মুকুন্দ-মাস্টার গুলে খেতে পারতাম। সত্যমেব জয়তে জপ করতাম, সত্য ছাড়া এক চুল এদিক-ওদিক হব না—সঙ্কল্প ছিল আমার। আপনার তো সবই জানা ভটচাজমশায়। সোনার পাথরের বাটি নাকি হয় না, কাঁঠালের আমসত্ত বললে নাকি লোকে হাসে—আমি কিন্তু তাই হয়ে ছিলাম। সাধু-দারোগা। এদেশ-সেদেশ আমায় ঐ নামে বলত। বলত—আর এখন বুঝতে পারি, হাসত টিপে টিপে। গরব করত কেবল আমার স্ত্রী। সেই গরবের দায়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল তাকে।

গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলাধিকারী চুপ হয়ে গেলেন।

আট

তখন জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট না হয়ে লোকে দারোগা হতে চাইত। (এবং খোদ জমিদার না হয়ে কোন একটা মহালের নায়েব, হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার) দারোগা মানে শাহান-শা সেই এলাকার। খাওয়ার ব্যাপারে যে কোন বস্তুর বাঞ্ছা হোক, বেড়াতে বেড়াতে হাটে গিয়ে কনেষ্টবলকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেওয়া। কারো ঘাড়ে একটি বই দুটো মাথা নেই যে দাম চাইবে। পরার ব্যাপারে তাই। সর্বব্যাপারেই। সদরে যাবেন হয়তো দারোগাবাবু, খবর দেওয়া হয়েছে, একলা মানুষটির জন্ত পুরো সতরঞ্চি খালি রেখে শেয়ারের নৌকো থানার ঘাটে এনে বেঁধেছে। শোনা গেল, দুপুরের গুরুভোজনের পর নিদ্রা দিচ্ছেন দারোগাবাবু। ডেকে তুলে খবরটা দেবে, এত বড় তাগত কারো নেই। গোন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর পরে সমস্ত পথ উজানে গুণ টেনে মারতে হবে, ছাইয়ের নিচে ঠাসাঠাসি মানুষগুলো গরমে গলে জল হয়ে যাবার যোগাড়। তবু না মাঝিমাল্লা না প্যাসেঞ্জার—মুখে কেউ

রা কাড়ে না। নিস্তব্ধ ধ্যানমূর্তি সব—কথাবার্তার আওয়াজ ডাঙার উপর গিয়ে দারোগাবাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়।

জগবন্ধু দারোগাই কেবল সৃষ্টিছাড়া। হাটে বাজারে নিজে কখনো যান না। বাইরের মানুষ পাঠিয়ে সওদা করেন, দারোগার লোক বুঝতে পারলে পাছে কেউ কম দাম নেয়। কোথাও যেতে হলে বিনা খবরে ঘাটে এসে শেয়ারের নৌকোয় অপর দশ-জনের পাশে ছেঁড়া-মাদুরে বসে পড়েন। যেমন চিরদিন হয়ে আসছে—দায়ে-বেদায়ে কেউ হয়তো হাসি-হাসি মুখ করে ভেট নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—জগবন্ধু দারোগা এই মারেন তো মারেন। মানুষটাকে থানার সীমানা পার করে দিয়ে তবে সোয়াস্তি। পুলিসের মানুষ হয়ে এমন পরমহংসের স্বভাব, কোন আহাম্মক সেটা বিশ্বাস করে? ভাবছে, ভেটের পরিমাণ যথোচিত হয়নি বলেই রাগ। দুনো তেদুনো আয়োজন নিয়ে আসে আবার, তাড়া খেয়ে চলে যায়।

ইতর-ভদ্র ক্রমশ বিরূপ হয়ে ওঠে। অমুক কাজের তদ্বির এই রকম দিতে হয়, তমুক কাজের তদ্বিরে ঐ রকম—একটা অলিখিত নিয়ম চলে আসছে। সকলেই মোটামুটি সেটা জানে। কালাপাহাড়ের মতো বনেদি নিয়মকানুন ভেঙে ফেলেছে ধর্মধ্বজী দারোগা। ভেঙে আর কোন নিয়ম বহাল হল, ঘুণাক্ষরে জানা যাচ্ছে না। হতবুদ্ধি জনসাধারণ। পাশাপাশি থানা-গুলোর রাগ—বিশেষ করে একেবারে পাশে ঝিনুকপোতার বড়বাবু অনাদি সরকারের। এই নিয়ম-রীতি সর্বত্র যদি চালু হয়ে যায়, শুখো মাইনের কয়েকটি টাকা ছাড়া কিছুই আর লভ্য থাকবে না। ঐটুকুর জন্যেই কি ঘর-বাড়ি ছেড়ে চোর-ডাকাত ঠগ-বোম্বেটে ঠেঙিয়ে নোনা রাজ্যে পড়ে আছে? জগবন্ধুর নিজ থানায় অন্য যে সব কর্মচারী, তারা অবধি বিরক্ত। সাহস করে বড়বাবুর মুখের উপর কিছু বলতে পারে না।

আজকের দিনের সুবিখ্যাত কেনা মল্লিকের বড়ভাই বেচারামের দিন-কাল তখন। চালনা-বন্দরের নিচে থেকে দরিয়া পর্যন্ত দলবল নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে বিচরণ করে বেড়ায়। জগবন্ধু বলাধিকারীর বিদঘুটে চালচলতি বেচারাম একেবারে বিশ্বাস করে না। বলে, দূর! কড়া দেবতা শনিঠাকুর কিম্বা খাণ্ডারণী মা-কালী অবধি পুজো পেলে বর দিয়ে যান। পুজো দিয়ে ঠাণ্ডা করছি, দাঁড়াও।

বিপন্ন কারিগরের ধরে বসে: সকলের মাথার উপরে তুমি কাপ্তেন মশায়। মানুষটা জলে ডাঙায় বেয়াড়া রকম চোখ ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে কাজ হবে কেমন করে?

বেচারাম কথা দিল : এনে দিচ্ছি ওটাকে মুঠোয় ভরে। বন্দোবস্ত হয়ে যাক। তারপর যেমন ইচ্ছে খেলিয়ে নিয়ে বেড়িও।

জগবন্ধুর ছোটমেয়ের বিয়ে। থানার লাগোয়া কোয়ার্টার, বিয়ে সেইখান থেকে হবে। সামুদ্রিকাচার্য ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বাসা অতি নিকটে—একখানা মাঠের এপার-ওপার। বাড়ির দরজায় প্রাচীন এক সাইনবোর্ডে উপাধি সহ ভট্টাচার্যের নাম লেখা। হাত-দেখা স্ফোটক-বিচার শান্তিস্বস্ত্যয়ন তান্ত্রিক-কবচ এবং আরও বিস্তার পণ্যের ফিরিস্তি ছিল, অনেক বছরের রোদবৃষ্টি খেয়ে অস্পষ্ট অবোধ্য হয়ে গেছে, কাছে গিয়ে নজর খাটিয়েও এই ক'টির বেশি পড়তে পারা যায় না।

থানার পরম সুহৃৎ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে থানার লোকের পাশে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে—সে লোক চাই কি খোদ বড়বাবু হোন, অথবা মুন্সি বা থানার কোয়ার্টারে জল-তোলা চাকর। ভট্টাচার্যের বাসায় সকাল-সন্ধ্যা মানুষের ভিড়—ভাগ্য-গণনার ব্যাপারে আসে যৎসামান্য, প্রায় সকলেই অন্য দশ রকমের দায়গ্রস্ত মানুষ। থানার কাছে তাদের হয়ে দরবার করতে হবে, সেই জন্যে এসে ধরেছে। পরের দুঃখে বিগলিতপ্রাণ ক্ষুদিরামও অমনি লেগে পড়ে যায়। বরাবর এই নিয়মে চলে এসেছে, কেবল হতচ্ছাড়া এই সাধু-দারোগা বাগ মানে না কিছুতে।

ভাঁটিঅঞ্চলের যেখানে যত থানা, আশেপাশে এই ধরনের একজন দু-জন সুহৃৎ থাকে। থাকে তাই ইতরজনের সুবিধা। কেউ ডাক্তারি করে, কেউ ঠিকেদার, কেউ ইস্কুলের মাস্টার, কেউ বা একেবারে কিছুই না। থানার বিয়েথাওয়া-অন্নপ্রাসনে কোমরে গামছা বেঁধে দিন নেই রাত নেই খাটাখাটনিতে লেগে পড়ে। অথবা থানার বাবুদের বুড়োহাবড়া কোন আত্মীয় টেঁসে যাবার দাখিল—সুহৃদমশায়ের কোমরের গামছা সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে উঠে যায়। আপনজনেরা ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে—শ্মশানবন্ধুর যথাযোগ্য সাজ নিয়ে এই ব্যক্তি রাত্রি জেগে সতর্ক প্রহরায় রয়েছে, বুকের ধুকধুকানিটুকু থামলেই হরিধ্বনিতে থানা মাত করে সকলকে ডেকে তুলে মড়া খাটিয়ায় চড়াবে। দেরি করিয়ে দিচ্ছেন বলে ধৈর্য হারিয়ে বিড়বিড় করে গালও পাড়ে মুমূর্ষুর উদ্দেশে : কী মায়া রে বাবা! এত কাল ধরে ভোগসুখ করলি, তবু লালসার নিবৃত্তি নেই! খাবি খেয়ে খেয়ে কেন খামোকা কষ্ট পাচ্ছিস, দেবচক্ষু হয়ে পড় এবারে। ভোগান্তি আর সহ্য হয় না, একটা কাজ নিয়ে কাঁহাতক দিবা-নিশি এমন পড়ে পড়ে থাকা যায়।

এমনি সুহৃৎ একজন ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য। জগবন্ধু পাত্তা দেন না বলে তাঁকে এড়িয়ে খিড়কির পথে কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ে। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীর পিতামহ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ—সেই ধারা খানিকটা চলে আসছে। স্বামী-মেয়ে ছাড়াও একদঙ্গল ঠাকুর-দেবতা তাঁর সংসারে। থানার মতো জায়গাতেও কালী মহাদেব গণেশ লক্ষ্মী রাধাকৃষ্ণ সঙ্কীর্ণ একটু তাকের উপরে গাদাগাদি হয়ে নিয়মিত নিত্যসেবা পেয়ে আসছেন। ক্ষুদিরাম টোলে পড়ে নানা শাস্ত্র শিখে এসেছে, জমিয়ে নিতে অতএব দেরি হয় না।

ভুবনেশ্বরী বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে ধরেন: বলুন ভটচাজ্জিমশায়, কি দেখতে পান?

ক্ষুদিরাম কল্পতরু এ সময়টা। আয়ু থেকে আরম্ভ করে ধনদৌলত স্বামী ও মেয়েদুটোর সুখশান্তি—সংসারে যা কিছু কামনার বস্তু থাকতে পারে, একনাগাড়ে মুষলধারে বর্ষণ করে। এত প্রাপ্তির পরেও ভক্ত না হয়ে কেমন করে পারবে! ক্রমশ এমন হয়ে দাঁড়াল—কোন তিথিতে কি খেতে নেই ক্ষুদিরাম পাঁজি দেখে বলে দেবে, ভুবনেশ্বরী বঁটি পেতে তবে আনাজ কুটতে বসবেন।

এমনি চলছিল। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ করে জগবন্ধুর সঙ্গে এবারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়ে গেল। বরের কোষ্ঠি কনের কোষ্ঠি মিলিয়ে ক্ষুদিরাম যোটক-বিচার করল, গণ-রাশি হিসাব করে শুভকর্মের দিনক্ষণ ঠিক করে দিল। পাকাদেখার দিন পাত্র-আশীর্বাদ করে এলো জগবন্ধুর সঙ্গে পাত্রের বাড়ি গিয়ে।

নদী-খালে বান ডেকে সারা অঞ্চলে ডুবে গিয়েছিল। জল সরে গিয়ে এখন অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা। জেলে খবর দিয়ে আনা হয়েছে, মন তিন-চার পোনামাছের সরবরাহ দেবে। কিন্তু বায়না নিতে তারা আগুপিছু করে! বানের জলের সঙ্গে মাছও বেরিয়ে গেছে। জালে যদি মাছ না পড়ে তখন যে জাত যাওয়ার ব্যাপার।

বলে, যার পুকুরে হুকুম হবে, হুজুরের নজরের সামনে দড়াজাল নামাব, যতক্ষণ যে ভাবে বলেন টেনে যাব। কিন্তু চুক্তির বাঁধাবাঁধির মধ্যে যেতে ভরসা পাইনে।

ক্ষুদিরামকে পেয়ে ছোট-দারোগা চোখ টিপে টিপ্পনী কাটে: শুনেছেন ভটচাজমশায়? দিনে দিনে কী অরাজক অবস্থা হল, বুঝুন একবার! জেলের পুত থানার উপর দাঁড়িয়ে বলে কিনা বায়না নেবো না। কালী বিশ্বাসের আমল হলে ঐ কথার পরে উঠে আর বাড়িঘরে যেতে হত না, রোদের

মধ্যে চোদ্দ-পোয়া হয়ে বেলান্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হত। দৃশেধর্মে চোখে দেখে সামাল হত।

জগবন্ধুর ঠিক আগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ কালী বিশ্বাস ছিলেন বড়বাবু। তুলনাটা তাঁর সঙ্গে। কিন্তু ছোটবাবু যত যা-ই বলুক, হেন অবস্থায় ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মরে গেলেও হাঁ-না কিছু জবাব দেবে না। কোন কথা কার কানে কি ভাবে হাজির হবে—কথা খুব ওজন করে বলতে হয়। একেবারে না বলাই ভাল। ছোটবাবু বোঝে সেটা, উত্তরের প্রত্যাশা করে না। একজন কাউকে সামনে রেখে মনের গরম খানিকটা বের করে দেওয়া।

বলছে, ঘাড় নেড়ে যাবার সাহসই হত না, বাপ-বাপ বলে বায়না নিত, সাগর সেঁচে মাছ এনে দিত। হেঁ-হেঁ, সে হল কালী বিশ্বাস—লোকে তো কালী বিশ্বাস বলত না, বলত কলি বিশ্বাস। নরদেহে সাক্ষাৎ কলিঠাকুর।

ক্ষুদিরামকে মধ্যস্থ মেনে বলে, সেই দেখেছেন আর এ-ও দেখুন। দেখে দেখে চক্ষু সার্থক করুন। কলি উল্টে সত্যযুগের উদয় আমাদের থানার উপর। কী করব—আমরাও সব হাত-পা গুটিয়ে ধ্যান-নেত্র হয়ে বসে আছি। আমরা অধার্মিক লোক, আমাদের কথা ছাড়ুন। কিন্তু আপনি হেন কৰিত-কর্মা ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে মাছের কথা আপনাকেও একবার বলা হল না। সকলকে বাদ দিয়ে যজ্ঞি হবে, চৌকিদার-দফাদার বেটারা করে দেবে। করুক তাই। শেষ অবধি দক্ষযজ্ঞ— চক্ষু মেলে মজা করে দেখে যাব আমরা।

কথা ঠিক বটে। এসব কাজে চিরকাল ক্ষুদিরামকে হাঁকডাক করতে হয়। এবারে দফাদার-চৌকিদারের ডাক পড়েছে। অপমান বই কি! ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম ছোটবাবুর কথা স্বীকার করে নেয়। এবং সম্ভবত অপমানের জ্বলুনিতেই ছিটকে বেরিয়ে পড়ে।

দ্রুতপদে মোড় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে সুঁড়িপথে অদৃশ্য হয়। ঘুরে এসে খিড়কির পথে টিপিটিপি জগবন্ধুর কোয়ার্টারে ঢুকে পড়ল। যে পথে বারবার ভুবনেশ্বরীর কাছে আসা-যাওয়া। - জগবন্ধুকে অভয় দিয়ে বলে, মাছের চিন্তা নেই বড়বাবু। আমার দায়িত্ব রইল।

হেসে বলে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করে আকাশের বেয়াড়া গ্রহগুলো অবধি বাগিয়ে নিয়ে আসি, আর জলের ক'টা মাছ তুলতে পারব না! পুকুরে কতকগুলো দেখে রেখেছি, পনের-বিশ সের করে এক-একটা মাছ—চার মন তো নস্যি। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা জাল-দড়ি নিয়ে এসে পড়বে, নিজে আমি সর্বক্ষণ সঙ্গে থাকব।

কাজকর্মের মধ্যে ক্ষুদিরামকে জড়াবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিরুপায়

অবস্থায় এখন জগবন্ধুকে রাজি হতে হল। আশ্বস্ত হলেন। বললেন, বাজার হিসাবে যা ন্যায্য দাম, পুকুরওয়ালারা কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে। সিকি পয়সার তঞ্চকতা না হয়। এ দায়িত্বও আপনার উপর।

যে আজ্ঞে, তাই হবে।

হাসতে হাসতে ক্ষুদিরাম আবার বলে, আমি আজকের মানুষ নই বড়-বাবু। এ থানায় কতজনাই তো এসে গেলেন, এমন ধনুক-ভাঙা পণ কারো দেখিনি।

আমার তাই। পরের দয়া নিয়ে কিম্বা পরকে ফাঁকি দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব না। মেয়ের তাতে কল্যাণ হবে না।

ক্ষুদিরাম গদগদ হয়ে উঠল: আহা, হাটের মধ্যে ঢোলসহরৎ করে বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে। দশেধর্মে শুনুক। ক'জনে বোঝেন এতখানি—ক্ষমতা হাতে পেলেই তো গরিব মারবেন। আপনি আমায় ডাকেন নি বড়বাবু, অসুবিধার কথা কানে শুনে উপযাচক হয়ে ছুটেছি। পরসেবা, বিশেষ করে সজ্জনের সেবা মহাপুণ্য। আমার চিরকালের নেশা বড়বাবু। এক বয়সে মাসের পর মাস রাত জেগে অঞ্চল পাহারা দিয়ে বেড়াতাম, আমি ছিলাম দলপতি। আপনার আগে কালী বিশ্বাস ছিলেন এখানে! অতি খচ্চর। ট্যারা চোখ, বাঁ-হাতের ছ'টা আঙুল—খুঁতো মানুষগুলো হয় ঐ রকম। আমার সঙ্গে বনত না! দারোগা আছে, চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভয় করবে—সত্যপথের পথিক, আমি কেন খাতির করতে যাব? বলুন।

সত্যের পথিক পরসেবী মানুষটির সম্বন্ধে জগবন্ধু কিন্তু উল্টোটাই শুনেছেন। আবার এ-ও শুনেছেন, অতিশয় কাজের মানুষ। আগের কথার জের ধরে ক্ষুদিরাম বলে, দাম দিলে নেবে না কেন বড়বাবু? কালী বিশ্বাস দিত না। ঐ আসনে বসে ক'জনে বা দেয়! না পেয়ে পেয়ে সেইটেই নিয়ম বলে ধরে নিয়েছে। জলে বাস করে কুমির ক্ষেপানো তো ভাল কথা নয়।

জগবন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলেন, যত শয়তান জুটে সরকারের নামে কলঙ্ক দিয়েছে। চোর ধরবার চাকরি, কিন্তু আমাদের চেয়ে বড় চোর কোথায় আছে?

·

চারখানা গ্রামের মধ্যে গোটা আষ্টেক পুকুর ঠিক করে রেখেছে ক্ষুদিরাম। বিয়ের দিন সকালবেলা জেলেরা দড়াজাল নামাল। মাছ ধরার নামে বিস্তর লোক জুটে যায়। সকলের চোখের সামনে জাল টানছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব

থেকে পশ্চিম নানা রকমে নানান কায়দায় টানে। চার-চারটে গ্রাম মুড়ল, মাছের একখানা আঁশ পর্যন্ত ওঠে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে ক্ষুদিরাম। এবং খবর পেয়ে বলাধিকারীও।

জেলেরা বলে, জানতাম আমরা ভটচাজমশায় জলের উপরটা দেখে তলার খোঁজ বলে দিতে পারি। ভাতভিত্তি যে আমাদের। কথাটা বলেছিলাম, মিলিয়ে দেখে নিন এবার। শুধু-শুধু নাজেহাল হলাম।

বেইজ্জতি ব্যাপার। দধি-মৎস্যাদির আয়োজন করিব, আপনারাও করিবেন—'লগ্নপত্রের এই চিরকালের বয়ান। বিয়ের ভোজে মাছ বাদ—বিধবারা মাছ খায় না, তেমনি একটা অলক্ষুণে যোগাযোগ মনে এসে যায়। নিমন্ত্রিতেরাই বা কি বলবে? এত বড় থানার উপর বসে থেকে অঞ্চল চুঁড়ে মাছ মিলল না, এ কি বিশ্বাস হবার মতো কথা!

কী হল ভটচাজমশায়? শুনেছিলাম, অত্যন্ত দক্ষ লোক আপনি, কাজে নেমে কখন হারেন না—

মুখ চুন ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের, তা বলে মুশড়ে পড়বার পাত্র নয়। বলে, হেরে গিয়েছি কি করে বলি। মাঝরাত্রে লগ্ন—বারোটার পর। বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী বিয়ের পরেই না হয় ভোজে বসবে। উচিতও তাই। কাজের আগে কেউ খেতে চায় না। সে খায় কলকাতা শহরে। খেয়ে পানের খিলি মুঠোয় ট্রাম ধরতে ছোটে।

জগবন্ধু ভরসা পান না। বলেন বিকাল পর্যন্ত বেয়ে স্রেফ ঝাঁঝি আর পাটাশেওলা তুলে বেড়াল। কোথায় কে মাছ জিইয়ে রেখেছে—এই তিন-চার ঘণ্টায় চার মণ মাছ হয়ে যাবে? হবার হলে দিনমানেই হত।

ক্ষুদিরাম অবিচলিত কণ্ঠে বলে, দেখাই যাক।

জেলেরা তো বাড়ি চলে গেল। পারবেও না তারা—সারাদিন যা খেটেছে, নড়ে বসবার তাগদ নেই। কারা যাচ্ছে এবারে মাছ ধরতে?

জিভ কেটে হাতদুটি জোড় করে ক্ষুদিরাম বলে, ঐটি জিজ্ঞাসা করবেন না বড়বাবু। সঠিক আমিও জানিনে। একটু-আধটু যা জানি, বলা যাবে না আপনার কাছে। তবে ভার দিলে কাজ তুলে দেবে, মনে করি। কী হুকুম হয়, বলুন। সময় নেই, বুঝতে পারছেন।

জগবন্ধু গুম হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। বলেন, উপায় নেই, যা করবার করুন গে। কিন্তু আমার কথা, দাম ষোলআনা দেবে তারা। রাত্রিবেলার খাটনি—ষোলআনার উপরেও কিছু নেবে।

অবস্থাটা চট করে ভেবে নিলেন। কি ভাবে কোথা থেকে মাছ এলো এই

দাঙ্গাবাগিরি মেয়ের বিয়ের মুখে একটা দিন না-ই বা করলেন! শাস্ত্রের উক্তি, মূল্য দিলেই দ্রব্যের দোষ শোধন হয়। হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দেবেন তিনি। সকলের মুকাবেলা।

দ্বিধাভরে বলেন, সারাদিনে লবডঙ্কা। অন্ধকারের মধ্যে কেমন করে কি হবে আমি কোন ভরসা দেখছিনে ভটচাজমশায়।

ক্ষুদিরাম একগাল হেসে বলে, দস্যিদানোর কাজ অন্ধকারেই খোলে ভালো। তৈরি হয়ে আছে সব। বলে কি জানেন বড়বাবু, পুকুরের মাছ তো হাতের মুঠোর জিনিস—হুকুম হলে বাদা থেকে বাঘের দুধ দুয়ে এনে দিই। সেই দুধে দিদিমণির বিয়ের পায়স হবে। অন্য রাঁধাবাড়া হয়ে যাক, মাছ এসে পড়লেই কুটে ভেজে চড়িয়ে দেবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সাঁ করে বন্দোবস্তে বেরিয়ে গেল।

প্রহরখানেক রাত। বড় একদল বরযাত্রী এসে উঠল নৌকোঘাটা থেকে। জগবন্ধু আবৃত্তিকে বসেছিলেন, খানিকটা সেরে কুটুম্বদের আদর-অভ্যর্থনায় ছুটলেন। বরের আসর গমগম করছে।

এমনি সময় ক্ষুদিরামের আবির্ভাব। ফিসফিস করে বলে, একটু ইদিকে আসবেন বড়বাবু।

সশঙ্কে জগবন্ধু বলেন খবর কি?

কি আবার! মাছ। বলেছি তো, হারিনে আমি কোন কাজে। একটিবার এসে চোখে দেখুন।

দু-হাত দু-দিকে প্রসারিত করে বলে, মাছ নয়—এই বড় বড় রাজপুত্তুর। দেখে যান।

একটুখানি ফাঁক কাটিয়ে জগবন্ধু হেরিকেন-লণ্ঠন হাতে ক্ষুদিরামের পিছু পিছু চললেন। থানার সীমানাটা ছাড়িয়ে বাদামতলায় অন্ধকারে মাছ এনে গাদা করে গেছে। এনেছে বেশিক্ষণ নয়—লেজের ঝাটপটি এখনো দু-চারটের।

একটা মাছের কানকোয় হাত ঢুকিয়ে ক্ষুদিরাম তুলে ধরল ভাল করে দেখানোর জন্য। মাছের ভারে মানুষটাই যেন নুয়ে যাচ্ছে। হেরিকেন উঁচু করে জগবন্ধু দেখে নিলেন, দেখে ভারি প্রসন্ন। রাজপুত্র বলে বর্ণনা দিল—লালচে রঙের সুপুষ্ট রুইমাছ, পুচ্ছ লাল, উপমা কিছুমাত্র বেমানান নয়। মাছ যেন জিইয়ে রাখা ছিল কোন খানাখন্দে, হুকুম পাওয়া মাত্র তুলে দিয়ে গেল।

ক্ষুদিরাম বলে, রান্নার দিকটাও আমি দেখছি। আপনি একবার চোখে দেখে গেলেন, দেখে খুশি হলেন—ব্যস!

জগবন্ধু সবিস্ময়ে বলেন, সমস্তটা দিন জাল টেনে টেনে মরল, এত মাছ কোন পুকুরে ছিল তাই ভাবছি।

জেলে-বেটাদের কথা আর বলবেন না! বক্র হাসি হেসে ক্ষুদিরাম বলে, হাটে হাটে হাতে কেটে ট্যাংরা-পুঁটি বেচে বেড়ায়, কতটুকু মানুষ ওরা—দুনিয়ার খবর কী জানবে! সে জানেন এক অন্তর্যামী ভগবান, আর ঐ দস্যিদানোগুলো। ডাকতে হাঁকতে বরাবর ওরাই এসে পড়ে, থানার লোকের কোন দায় ঠেকতে হয় না। এবারে নতুন নিয়ম করতে গিয়েই মুশকিল হল। সে যাক গে। শেষ রক্ষে হয়ে গেছে—এখন আর ভাবনা কি?

দেখছি না তো তাদের কাউকে। মাছ ফেলে দিয়েই পালাল। আমার যে নগদ টাকা হাতে হাতে দেবার বন্দোবস্ত।

ক্ষুদিরাম বলে, আপনার সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়াবে, তবেই হয়েছে! পাইতক্কের মধ্যে অতবড় বুকের পাটা কারো নেই। তবে আমি আগে থেকে চুক্তি করে নিয়েছি, দাম কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে হবে। এ বিষয়ে আবদার শোনা হবে না। ভাববেন না বড়বাবু। আপোষে না নিতে চায় তো মানুষ চিনিয়ে দেব আমি—কনেস্টবল-চৌকিদারে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে থানার উঠানে এনে ফেলবে, বাপের সুপুত্তুর হয়ে দাম নিয়ে যাবে। শুভকর্মের মধ্যে এ নিয়ে মাথা গরম করবেন না, খুশি মনে কন্যা-সম্প্রদান করুন গে। আমি রান্নার তদারকে যাচ্ছি।

এই ছাড়া কী ব্যবস্থাই বা হতে পারে এখন! জগবন্ধু কড়া হয়ে বললেন, দাঁড়িপাল্লা ধরে মাছের সঠিক ওজন দিয়ে নিন এক্ষুনি! জলের মাছ জল-মরা বলে পাঁচ-দশ সের বাদ—এসব ধানাই-পানাই আমার কাজ করতে যাবেন না। পোয়া-ছটাক অবধি হিসাব করে দাম কষে ফেলুন। তারপরে কোটা-বাছা, তারপরে রাঁধাবাড়া। এই কাজটা শেষ করে তবে আপনি নড়বেন।

হুকুম দিয়ে জগবন্ধু চললেন। মনে মনে প্রবোধ নিচ্ছেন: অত দেখতে গেলে হয় না। বাজার থেকে কতই তো কেনাকাটা করি, কোন সূত্রে কোন বস্তুটা এল তাই নিয়ে কে খোঁজাখুঁজি করতে যায়? ন্যায্য পরিমাণ দাম দিয়ে দিলেই বিবেকের কাছে দায় থাকল না।

সূত্র জগবন্ধুকে খুঁজতে হয়নি, পরের দিন থেকে আপনাআপনি প্রকাশ পেতে লাগল। বুধবার, অর্থাৎ মেয়ের বিয়ের তারিখ যেদিন, রাত্রিবেলা পুকুরের মাছ

চুরি হয়েছে। সে পুকুর একটি দুটি নয়—এজাহারের পর এজাহার আসছে, গোণাগুণতি ছাড়িয়ে যাবে এমনি গতিক। এবং শুধুমাত্র এই থানায় নয়, পাশের থানা ঝিনুকপোতার এলাকার ভিতরেও। সর্বনেশে কাণ্ড করেছে বেটারা—যেখানে যত ভাল পুকুর, সর্বত্র জাল ছেঁকে বেড়িয়েছে।

ঝিনুকপোতার বড়-দারোগা অনাদি সরকার হাসিমস্করা করছে, খবর কানে এসে গেল। লোকজনের মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে বলে, জগবন্ধু দারোগার কন্যাদায়—ব্যাপার সামান্য নয়। নিজের এলাকায় কুলালো না, তা মুখের কথাটা বললে আমিই সংগ্রহ করে দিতাম। তাতে বুঝি ইজ্জতে বাধে—তারও বড়, পয়সা খরচ হয়। তার চেয়ে রাতের কুটুম্ব পাঠিয়ে সোজাসুজি কাজ হাসিল করে নিয়ে গেল।

নিঃসাড়ে যেন মন্ত্রবলে কাজ সেরে গেছে। প্রতি পুকুরে জলের মধ্যে বোঝা বোঝা পালা—অর্থাৎ গাছের ডালপালা ও কঞ্চি ইত্যাদি। হঠাৎ এসে কেউ জালের খেওন না দিতে পারে। জাল ফেলবার আগে পালা তুলে ফেলে সমস্ত পুকুর সাফসাফাই করে নিতে হবে। জলে নেমে পড়ে তাই করেছে, তারপরে জাল নামিয়েছে আট-দশখানা গাঁয়ের পনের-বিশটা পুকুরে। সন্ধ্যার পরে মাত্র তিন-চার ঘণ্টা সময়ের ভিতর। লগ্নের মুখেই মাছ এসে পড়ল। বাছাই-করা সারের সার মাছ—ক্ষুদিরাম ভট্টচার্যের উপমায়, রাজপুত্তুর। কতগুলো জাল নিয়ে কত মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল রে বাবা! এত বড় কাণ্ড টুঁ শব্দটি নেই—পাকা হাতের পরিপাটি কাজ। সকালে উঠে ডাঙার উপর পালা এবং পুকুরপাড়ে জাল ঝাড়ার চিহ্ন দেখেই মাছ-চুরির ব্যাপরে মালুম হল। ভদ্র মানুষজন দলের মধ্যে অবশ্য নিন্দে-মন্দ করে, কিন্তু মনে মনে চমৎকৃত হচ্ছে।

এক পুকুরের মালিক বলল, পুকুর ঠিক উঠোনের উপর বলেই জালের শব্দ একটুখানি কানে গিয়েছিল। কিন্তু বেরুতে গিয়ে দেখে, বাইরে থেকে শিকল আঁটা। শিকল এঁটে বন্দী করে মাছ ধরেছে। চেঁচানি দিল একটা। ঝটিতি বউ এসে মুখ চেপে ধরে: ঘরের মধ্যে ঢুকে গলা দুইখণ্ড করে দিয়ে যাবে। এক হাত মুখে চাপা দিয়েছে, আর এক হাত দরজায় খিল হুড়কো একের পর এক এঁটে দেয়। কথা বের হতে দিল না ঘর থেকে।

ঝিনুকপোতার দারোগা বলে বেড়াচ্ছে, সর্বপক্ষী মাছ খায়, নামটি কেবল মাছরাঙার!

সেই আসরে কে-একজন নাকি টিপ্পনী কেটেছে: মাছরাঙা তো চেলা-পুঁটি খায় বড়বাবু, বলাধিকারী খান তিমি। মাছের রাজা তিমি খেয়ে খেয়ে উনি তিমিঙ্গিল হয়েছেন।

বন্ধু লোকেরা আছে—তাদের কাজ ও-থানার কথা এ-থানায় এসে বলে যাওয়া। যত শোনেন, জগবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। এতদূর তরিয়ে দেখেন নি। এখন যে মুখ দেখানোর উপায় থাকে না আপন-পর কারো কাছে। ধর্মের কাছেই বা জবাবদিহি কি ?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য নির্বিকার। বলে, এই দেখুন, মুখ দেখানোর মুশকিল কি হল ? অনাদি সরকার এত বলে বেড়াচ্ছে, তার বউয়ের গলার নেকলেশটা লক্ষ্য করে দেখেছেন ? খুকির বিয়ের নেমন্তন্নে নেকলেশটা পরে এসেছিল। শুধুমাত্র দারোগাগিরি করে হীরে-বসানো এমন জিনিস দেওয়া যায় ? বলুন। পুকুরচুরি করে ওঁরা সব জিনে যাচ্ছেন, এ তো পুকুরের কটা মাছ। তা-ও লোকগুলো নিজের বুদ্ধিতে করেছে, আপনি কিছু বলতে যান নি। আবার তা-ও বলি, তড়িঘড়ির কাজকর্ম—বলে-কয়ে অনুমতির নেবার সময় কোথা ? পায়তারা কষতে গেলে কিছুই হত না। তবে হ্যাঁ, ধর্মের ঐ কথাটা যা বললেন—!

একটু দম নিয়ে বলে, ধর্ম কিছু আর পালিয়ে যায় নি একটা-দুটো দিনের মধ্যে। ধর্ম এখনো রাখা যায়। পুকুরে মাছ পোষে বিক্রি করে দুটো পয়সা পাবে বলে। পয়সা পেলেই চুকে-বুকে গেল। এই কথাটা আপনি তো গোড়া থেকে বলে আসছেন।

জগবন্ধু অধীর হয়ে বলেন, পুকুরওয়ালাদের ডেকে আপনি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিন ভটচাজমশায়। আজকে যদি হয়ে যায়, কাল অবধি সবুর করবেন না।

সেইমাত্র একটা একহাজার শেষ হল ছোট-দারোগার কাছে। লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, ক্ষুদিরাম ডেকে এনে জগবন্ধুর সামনে হাজির করল।

লোকটা কোঁত-কোঁত করে কাঁদে : ছা-পোষা গৃহস্থ বড়বাবু, বেটারা সর্বনাশ করে গেছে। মাছগুলো বুক-বুক করে রেখেছিলাম—একসঙ্গে বেচে দিয়ে বিঘে দুই ধানজমি করব।

কি পরিমাণ গেছে, আন্দাজ করতে পারো ?

লোকটা বলে, জলের মাছ—সঠিক বলি কেমন করে। চান করবার জো ছিল না, গায়ে ঠোক্কর দিত। একেবারে ছেঁকে তুলে নিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বিরক্ত হয়ে বলেন, তবু বলবে তো একটা কিছু ?

তাড়া খেয়ে লোকটা বিড়বিড় করে দ্রুত হিসাব করে নেয় : গুণে গুনে সেবারে একশ বাছাই রুই ছাড়লাম। অর্ধেকও যদি মরেহেজে গিয়ে থাকে—

ক্ষুদিরাম প্রশ্ন করে ওঠে : কত বড় হয়েছিল ?

সের পাঁচেক করে ধরে নিন। যাকগে যাক, আরও কিছু ছাড় করে দিয়ে গড়ে চার সের করেই হল—

রুই ছাড়া অন্য মাছও কিছু থাকবে তো পুকুরে! কাতলা মৃগেল বাটা সরপুঁটি—

আজ্ঞে হ্যা, ছিল বই কি! অঢেল ছিল।

লোকটা চলে গেলে ক্ষুদিরাম বলল, নিন, তো! শুধু রুইমাছই পাঁচ মন। তাছাড়া কাতলা মৃগেল—আরও শত শত রকমের। অঢেল ছিল সেসব।

বলাধিকারী আঁতকে উঠলেন: কী সর্বনাশ! আমাদের তো মোটমাট চার মন। তার কতজন ভাগিদার। ডাহা মিথ্যেকথা বলে গেল লোকটা।

ক্ষুদিরাম হেসে বলে, এই লোক বলে কেন—যার কাছে বলবেন, হিসাব এমনিধারাই দেবে। এখন এই। আর ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঁচটা টাকাও যদি কাউকে দিয়েছেন, এজাহারের ঠেলায় ছোটবাবু অস্থির হয়ে যাবেন, সরকারি খাতা হু-হু করে ভরাট হয়ে যাবে। পুকুর ডোবা খানাখন্দ যার একটা আছে, কেউ আর বাদ পড়ে থাকবে না।

ছি-ছি! জগবন্ধুর মুখে বাক্য নিঃসরণ হয় না।

ক্ষুদিরাম বলে, আরও আছে বড়বাবু। হাতে-হাতে ক্ষতিপূরণ মানে চুরির দায় ঘাড় পেতে নেওয়া হল। ভেবে দেখবেন এদিকটা! চোরাই মাছে বিয়ের ভোজ হয়েছে, ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির হয়ে গেল।

স্তম্ভিত জগবন্ধু। বলেন, কী জগৎ! সত্যি কথা, সৎ কাজকর্মের ধার দিয়েও কেউ যাবে না!

ক্ষুদিরাম নিরীহ ভাবে বলে, বিদ্যাসাগরমশায় একা করে গেলেন।

কী করলেন তিনি—অমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি?

দ্বিতীয় ভাগে লিখে গেলেন—'সদা সত্য কথা বলিবে। আরও বিস্তর ভাল ভাল কথা লিখলেন—'রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিও না।' ছেলেপুলে না দৌড়ে কি ছায়ায় বসে বসে আফিংখোরের মতো ঝিমোবে? ঐ বয়স থেকেই বুঝে নিয়েছে, বইয়ে থাকে এ সমস্ত—বানান করতে হয় মানে শিখতে হয়, কাজে খাটাতে নেই। যেদিকে তাকাবেন এই। সত্য নিয়ে কারও শিরঃপীড়া নেই। এক-আধজন যদি দৈবাৎ মেলে, গবেট বলে তামাসা করবে তাকে লোকে।

আজও বলধিকারী ক্ষুদিরামকে বলে থাকেন, প্রথমপাঠ আপনার কাছেই পেয়েছি ভটচাজমশায়। গুরুমান্য আপনার প্রাপ্য। চমক লেগেছিল বড্ড সেদিন। ন্যায়নীতি কোন এক কালে নিশ্চয় ছিল। কিন্তু রকমারি সমাজ-পদ্ধতির সঙ্গে এটির বিলয় ঘটেছে। একশ'র মধ্যে নিরানব্বুই জনই যা

মানে না, তাকে আর ধর্ম বলা যায় কি করে? ইতিহাসের মাটি খুঁড়ে বিলুপ্ত বহু জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় লাগে, জীবনধারণের কাজে আসে না। ন্যায়ধর্মের যা সম্পূর্ণ বিপরীত, সেই রীতিগুলোই সমাজ আজকে ধরে রেখেছে।

ক্ষুদিরাম ছোট্ট একটু প্রতিবাদ কার: শতের মধ্যে নিরানব্বুয়ের হিসাবটা ঠিক হল না বলাধিকারীমশায়। হাজারে ন-শ নিরানব্বুই বলাও বেশি হয়ে-যায়।

বলাধিকারী বলেন, সত্য-ন্যায়ের একটা পাতলা পোশাক শুধু ঢাকা দেওয়া। সেই পোশাকের নিচের চেহারাটা সবাই জানে। নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম থেকেই বুঝতে পারে। বাইরে অবশ্য চাই ওটা, তবে পোশাকটুকু অতি-জীর্ণ হয়ে এসেছে। আর বেশি দিন থাকছে না।

এসব এখানকার কথা। বলাধিকারী ও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মধ্যে হাস্য-পরিহাস চলে এমনিভাবে। সেদিনের জগবন্ধু আলাদা মানুষ। অন্য কোন উপায় না দেখে চার মন মাছের দাম হিসাব করে তিনি ক্ষুদিরামের হাতে দিলেন। দাম শোধ না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। টাকাটা দিয়ে, থানার বড়বাবু হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের হাত জড়িয়ে ধরলেন: আশাসুখে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। অজান্তে অন্যের উপর জুলুম হল, আঙুল ভেঙে তারা শাপ-শাপান্ত করবে, কিছুতে এটা সহ্য হচ্ছে না। ধর্মভার আপনার উপরে—পাইপয়সা কারো কাছে ঋণ না থাকে দেখবেন।

ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে অভয় দেয়: যারা মাছ ধরেছে, পুরা টাকা তাদের হাতে পৌছে দেব। কার পুকুরের কত মাছ তারাই জানে, ঠিকমতো বাঁটোয়ারা করে দেবে। একটা জিনিস জানবেন, চুরি করুক যা-ই করুক ধর্ম রেখে কাজ করে তারাই। ছ্যাচড়ামি ঘেন্নার বস্তু। কথা দিল তো কিছুতে তার নড়চড় হবে না। আমার কাছে কথা দিয়েছিল, বড়বাবুর মানের হানি হয় কিছুতে সেটা হতে দেব না। তাই করল কিনা বলুন। যে ভাবেই হোক, কাজ ঠিক তুলে দিল।

মূল্য যথাযোগ্য স্থানে গিয়ে পড়বে, এত কথাবার্তার পরেও জগবন্ধুর পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না। সান্ত্বনা: তিনি অন্তত মূল্য শোধ করে দিয়েছেন। এবং মনে মনে কঠোর সংকল্প করলেন, এমন অনিশ্চিত সন্দেহ-সংকুল কাজের মধ্যে কোনদিন আর যাবেন না। মরে গেলেও নয়। যা হল এইখানেই শেষ।

তবু কিন্তু শেষ হয় না। মাসখানেক পরে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি এল। থানার সেই কোয়ার্টারে। হাটবার সেদিন। চাকর সঙ্গে নিয়ে জগবন্ধু

নিজে হাট করে আনলেন। রাত প্রহরখানেক। রান্নাঘরে ভুবনেশ্বরী রান্নাবান্না করছেন, খোলা দরজায় টুপ করে কি এসে পড়ল পিছন দিকে। আর একটু হলে গায়ের উপর পড়ত। মানকচুর পাতায় কলার ছোটো দিয়ে সযত্নে বাঁধা পুঁটলি।

খুলে দেখে অবাক। কচুপাতায় মাংস বেঁধে ছুঁড়ে দিয়ে গেছে।

জগবন্ধু বাইরের ঘরে গল্পসল্প করছিলেন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে। ভুবনেশ্বরী ডাকিয়ে আনলেন: দেখ, কী কাণ্ড!

পাড়াগাঁ জায়গায় মাংস এমনি বিক্রি হয় না। একজন কেউ উদ্যোগী হয়ে পাঁঠা-খাসি মারে। যার যেমন প্রয়োজন—কেউ চার আনা, কেউ আট আনা, কেউ বা এক টাকার মতন ভাগ নিয়ে নেয়। জগবন্ধু তাই করবেন। সুস্পষ্ট খাসি একটা ঠিক করে এসেছেন—রাত্রিবেলা মাছ ইত্যাদি হোক, দিনমানে কাল খাসির ঘাড়ে কোপ পড়বে। কিন্তু কোন সব অলক্ষ্য আত্মীয়জনেরা রয়েছে, জামাই-সমাদরের এতটুকু খুঁত তারা হতে দেবে না। এই রাত্রে ছাগল কেটে মাংসের ব্যবস্থা করেছে। হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না, এতদূর স্বজন তারা।

ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করেন, কে দিয়ে গেল বল তো?

আবার কে! বিয়ের মাছ যারা দিয়েছিল। এমন নিঃসাড়ে এসে ফেলে দিয়ে যাওয়া ঐসব গুণী লোক ছাড়া পারবে না।

ভুবনেশ্বরী বলেন, মাংস রাঁধতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না। কিসের মাংস, কে জানে? চোখে দেখে তো চিনবার জো নেই—শিয়াল কুকুর কেটেও দিয়ে যেতে পারে।

জগবন্ধু বললেন, আমারও ঠিক সেই মত। এ মাংস জামাইয়ের পাতে দেওয়া যাবে না। কুকুর-শিয়ালের নয়, সেটা বলতে পারি। তার চেয়েও খারাপ। কার ঘরে ঢুকে সর্বনাশ করে এসেছে। মাংস আস্তাকুঁড়ে ফেলে দাও তুমি।

এতদূর করলেন না অবশ্য ভুবনেশ্বরী। এখন চাপিয়ে দিয়ে মাংস রান্না হতে রাত তো পুইয়ে আসবে। রেখে দেওয়া যাক, কাল দিনমানে দেখে-শুনে রান্নাবান্না করা অথবা কাউকে দেওয়া—যা হোক কিছু করবেন।

পরের দিন রোদ উঠবার আগেই জানা গেল, জগবন্ধুর অনুমান খাঁটি। ডাকের রানার রাখহরি পুঁইয়ের বুড়ি-মা লাঠি ঠুকতে ঠুকতে আধক্রোশ পথ ভেঙে থানায় এসে কেঁদে পড়ল: দারোগাবাবু আমার রাঙি ছাগলটা চুরি গেছে কাল রাত্রে। গোয়ালের একটা পাশ ছাগলের জন্য শক্ত করে ঘিরে দিয়েছি—সকালে দেখি, ঝাঁপ খোলা, ছাগল নেই। কেঁদো কি শিয়ালে নিয়েছে ভাবলাম।

তারপর দেখি কচুপাতায় বাঁধা মাংস। আর রাণ্ডিকে কেটেকুটে গৃহস্থর ভাগ রেখে গেছে।

হাপুসনয়নে কাঁদছে বুড়ি। ছাগল নয়, যেন পুত্রশোকের কান্না। চুরি-করা খাদ্য-বস্তুর ভাগ গৃহস্থকে দিলে পাপ অর্শায় না, চৌরশাস্ত্রের বিধান এই। আর গৃহস্থকে কোনপ্রকারে যদি সেই বস্তু খাওয়ানো যায়, উল্টে তখন পুণ্যলাভ। রাণ্ডির মাংস চোর তাই রাখহরির বাড়িতেও কিছু দিয়েছে।

যথারীতি এজাহার লিখিয়ে বুড়ি ফিরে যাচ্ছে। কান্না দেখে জগবন্ধু বিচলিত হয়েছেন। একটা কনেস্টবল দিয়ে বুড়িকে ডাকিয়ে আনলেন।

বুড়োমানুষ কষ্ট করে পুষেছিলে, কত দাম হতে পারে তোমার ছাগলের?

সরল সাদাসিধে স্ত্রীলোক, কথায় কোন ঘোরপ্যাচ নেই। বলে, ব্যাপারি এসে ন-সিকে বলেছিল শীতকালে। দিইনি। বলি, এত ছোট খাসি না-ই বেচলাম। বড় হোক।

জগবন্ধু তিনটে টাকা তার হাতে দিলেন। বিবেক-দংশন অনেকটা শীতল হল।

বুড়ি অবাক হয়ে গেছে। থানার মানুষ হাত উপুড় করে টাকা দিচ্ছে! সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চার যুগের মধ্যে বোধকরি এই প্রথম। এবং স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে ত্রিভুবনের মধ্যে শুধুমাত্র এই থানায়।

বিস্ময়ের ধকল খানিকটা সামলে নিয়ে বুড়ি বলে, দাম আপনি কেন দেন বড়বাবু? আপনার কোন দায় পড়ল?

আমতা-আমতা করে জগবন্ধু অকস্মাৎ এক কৈফিয়ৎ খাড়া করে ফেলেন: ছেলের অকালমৃত্যুর জন্য ব্রাহ্মণ এসে রাজা রামচন্দ্রকে গালি পাড়ে। শম্বুক বধ করে তবে নিষ্কৃতি। নিয়মই তাই। যার রাজত্বে বসবাস, প্রজার অমঙ্গলের দায় তারই উপর বর্তায়। থানার উপর বসে মাস মাস সরকারের মাইনে খাচ্ছি—মল্লুকের চোরডাকাত যতদিন না শাসন হচ্ছে, লোকের ক্ষতিলোকসান ন্যায়ত ধর্মত আমাদেরই পূরণ করা উচিত।

বুড়ির এত সমস্ত বোঝার গরজ নেই। টাকা ক'টি আঁচলের মুড়োয় গিঁট দিয়ে পরমানন্দে চলে গেল।

বাসায় গিয়ে জগবন্ধু স্ত্রীকে বললেন, মাংস আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে বলছিলাম। দিয়েছ নাকি?

রাখহরির মা'র খাসি-চুরির বৃত্তান্তটা ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরীর কানেও পৌঁছে গেছে। বললেন, ফেলিনি ভাগ্যিস। রেখে দিয়েছি, এইবার চাপাব।

জগবন্ধু কঠিন কণ্ঠে বললেন, না। খুঁড়ে মাটি চাপা দেব। কাক-কুকুরের মুখেও না যায়।

আবার কি হল? ভুবনেশ্বরী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন: সন্দেহ তো মিটে গেছে। ছাগলেরই মাংস—বুড়ির পোষা খাসির। পুরো খাসির দামও তুমি দিয়ে দিলে—

জগবন্ধু বললেন, ঠিক ঐ জন্যেই। এ যাত্রা জামাই মাংস খাবে না, মাংসের নামগন্ধও উঠবে না বাড়িতে। কাল কিম্বা পরশুও যদি তুমি মাংস রাঁধতে বসো, ওধারে ছোটবাবুরা থাকে—খবর চেপে রাখতে দেবে না। বলবে, বুড়ি হৈ-হৈ করে পড়েছিল বলে মাংস সাঁতলে সাঁতলে কদ্দিন রেখে দিয়েছে।

এত করেও কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ রইল না। পুঁইপাড়ার এক বেওয়া স্ত্রীলোক মাঝে মাঝে ভুবনেশ্বরীর কাছে মজা-সুপুরি বেচতে আসে। তার মুখে ভুবনেশ্বরী প্রথম শুনতে পেলেন। পরে অন্যখানেও শুনলেন। রাখহরি পুঁই বলেছে, জগবন্ধু দারোগার জামাই এসেছে, খবর আগে টের পাইনি যে! মাকে তা হলে বলে দিতাম, রাণ্ডি ছাগল গোয়ালে না রেখে নিজের কাছে নিয়ে শোয়। ঘরের দুয়ারে হুড়কো দিয়ে সর্বক্ষণ যেন জেগে বসে থাকে। খবর পাইনি, সমঝে দিতে পারিনি—দারোগার ভূত-প্রেতগুলো খাসি নিয়ে ঠিক সেই জামাইয়ের ভোগে লাগাল।

রাখহরি পুঁই যাদের ভূতপ্রেত বলছে এবং ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দত্যিদানো বলেছিলেন, অদৃশ্য থাকলেও নিতান্ত অজানা সেই তারা এখন। বেচা মল্লিকের দলবল। বেচারাম নাকি জাঁক করে বেড়াচ্ছে: একদিন বাগানের এক কাঁদি মর্তমানকলা পাঠিয়েছিলাম, কাঁদি ধরে উঠানে ছুঁড়ে দিল। এবারে যে গাঁয়ে গাঁয়ে পুকুর তোলপাড়, মানুষের গোয়ালে খাসি-পাঁঠা থাকবার জো নেই।

জগবন্ধু যত শোনেন, ততই অস্থির হয়ে উঠছেন। আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেন, মাছের দাম হিসাব করে সমস্ত মিটিয়ে দিয়েছেন?

আলবৎ!

প্রশ্ন করে শুনে নিতে হল, ক্ষুদিরাম সেজন্য মর্মাহত হয়েছে। বলে, টাকা-আনা-পাই পর্যন্ত হিসাব শোধ। এখন আর বলতে দোষ কি—বেচারামের নিজের হাত দিয়েই।

খাসির দামও আমি দিয়ে দিয়েছি। বুড়ি নিজ মুখে যা বলল, তারও কিছু বেশি ধরে দিলাম। সেই বেচারাম তবে আবার এসব রটায় কেন?

দুর্জন লোক, সাচ্চা কাজকর্ম বরদাস্ত করতে পারে না। এমনধারা বড় একটা দেখে না তো চোখে। কানেও শোনে না। আমাদের ভাটিঅঞ্চলে নিতান্ত আজব ব্যাপার।

আজকের দিনে হলে জগবন্ধু সজোরে সায় দিয়ে উঠতেন : শুধু ভাঁটিঅঞ্চল কেন, যেখানে মানুষ আছে সেখানেই। কিন্তু সেদিনের সাধু-দারোগা আলাদা মানুষ। বিবেচনার ভুলে দুজনের নাগালের ভিতর গিয়ে পড়েছেন, মনে মনে শতেকবার সেজন্য কানমলা খাচ্ছেন। তুমিও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য চিজটি বড় কম নও। যোগসাজস তোমার সঙ্গেও। জেলেদের সম্ভবত টিপে দিয়েছিলে— সারাদিন চেষ্টাচরিত্র করে জাল নিয়ে তারা ডাঙায় উঠল আমাকেই জালে আটকাবার জন্যে।

কিন্তু মনের এই কথা মুখে প্রকাশ করা চলে না। সৎপথে চলেন বলে দেশসুদ্ধ শত্রু। তার মধ্যে এই মানুষটা সুহৃদ রূপে সামনে ঘোরাফেরা করে, তাকে বিগড়ে দিয়ে আরও একটা শত্রু বাড়ানো কাজের কথা নয়। সতর্কভাবে খোশামুদির স্বরে জগবন্ধু বলেন, আপনার চোখ দুটোয় কিছুই এড়াবার জো নেই ভটচাজমশায়। মনের কথা বলি একটা। সারাক্ষণ সেই যে জাল বেয়ে একটি ঝেঁয়া-পুঁটি অবধি পড়ল না, হতে পারে জেলেদের শয়তানি। হতে পারে, ইচ্ছে করে ছেঁড়া জাল নামিয়েছিল। অথবা টানবার সময় জলে ভার বাঁধেনি, জাল উপরে-ভাসিয়ে এনেছে।

কথা না পড়তে ক্ষুদিরাম ঘাড় নেড়ে বসে আছে : সবই হতে পারে বড়বাবু। হতে পারে কি, নিশ্চয় তাই। বেচারাম কলকাঠি টিপছিল দূর থেকে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবল একটুখানি। খাপছাড়া ভাবে বলে, তার দিকটাও দেখতে হবে বইকি! দোষ আমাদেরও বলাধিকারীমশায়। এতদূর আমরাই জমিয়ে তুলেছি।

বলাধিকারী অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন। ক্ষুদিরাম বলে, মাছের দাম যদি না দিতাম, খাসি মেরে তবে আর মাংস দিতে আসত না। মাংসের দামও দিয়েছেন, আবার কি এসে পড়ে দেখুন। যতবার ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, ততবার একটি করে চাপান দিয়ে যাবে। থানার মালিক আপনি—আপনার মেয়ে-জামাই-এর নাম করে কিছু যদি ইচ্ছে করে দিয়ে যায়, আপনি তার দাম শোধ করতে ব্যস্ত। বেচারাম সেটা অপমান জ্ঞান করে। নতুন নয়, বরাবরের নিয়ম এই তার। অগস্তিসাহেবের মতো বাঘা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘোল খাইয়েছে—নিতে হল তাঁকে বাধ্য হয়ে।

জগবন্ধু চমকে উঠে বললেন, ঘুস নিলেন অগস্তি?

বেচারাম বলে ভেট—যতক্ষণ তার রাগের কারণ না ঘটে। খুব মান্য করেই দেয়। আপনারা ঘুস মনে করলে সে কি করবে বলুন।

অগস্তিসাহেবকে যারা জানে, ঘুষ হোক আর ভেটই হোক সে দরবারে গিয়ে পৌঁছেছে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। শীতকালে হাকিমরা তখন মফস্বলে গিয়ে তাঁবু ফেলতেন। খোদ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বড়-মেজ-ছোট সকল রকমের হাকিম। শাসন-বিচার হত উকিল-মোক্তারের আরজির-সওয়াল বাদ দিয়ে। আমলারাও অনেকে যেত হাকিমের সহযাত্রী হয়ে। বড্ড মজা সেই দিনগুলো। আহারাদির নিত্য-নূতন রাজসূয়ো আয়োজন—এক পয়সা খরচা নেই সেই বাবদে। আশেপাশের যাবতীয় জমিদার-তালুকদার গাঁতিদার-চকদার সিধা পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে সকাল-বিকাল। এই নিয়ে পাল্লাপাল্লি—অমুক এই সাইজের গলদাচিংড়ি দিয়ে গেছে তো অঞ্চল ঢুঁড়ে দেখ, তার চেয়ে বড় কোথায় মেলে। এমনি ব্যাপার। কোন আমলা এবারে কোন হাকিমের সঙ্গে যাবে, তাই নিয়ে দস্তুরমতো তদ্বির চলত সদরে।

বেচারামও বরাবর ভেট পাঠিয়ে আসছে। দুনিয়ার উপর এক কাঠা জায়গাজমি নাই, ইজ্জত তবু জমিদারেরই। তার আয়োজনই সকলের চেয়ে বিপুল। দুর্জন লোক বলে তার সঙ্গে কেউ প্রতিযোগিতায় যায় না।

অগস্তি এলেন জেলার কর্তা হয়ে। বিষম নামডাক, বাঘে-গরুতে জল খায় তাঁর প্রতাপে। পৌষমাসে ফুলহাটার অনতিদূরে মাঠের মধ্যে তিনি তাঁবু ফেললেন। সদরের গোটা অফিসটাই যাচ্ছে—বড় তাঁবু ঘিরে পাঁচ-সাতটা ছোট তাঁবু।

যথানিয়মে বেচারামের সিধা গিয়ে পড়েছে। দূর-দূর—করে হাঁকিয়ে দিলেন অগস্তি জিনিষপত্র কিনেকেটে এনে খাবে, রায়তের কাছ থেকে একটা দেশলাইয়ের কাঠি পর্যন্ত কারও নেওয়া চলবে না।

চারজন লোক গিয়েছিল, ফিরে এসে কাপ্তেনের সামনে ধামাঝুড়িগুলো নামাল। অবমানিত বেচারামের মুখের উপর দাউদাউ করে যেন আগুন জ্বলে। এলাকার মধ্যে বসে ভেট ফিরিয়ে দেয়—তার-ই চিরকালের অধিকারে হস্তক্ষেপ। হোক তাই, কিনেকেটে এনেই খাওয়াদাওয়া করুক।

সরকারি লোক যে দোকানে যায়, মাল নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে গণ্ডগোল —মাল বেচে কোন বিপদে পড়বে। সরিয়ে ফেলেছে। তিন ক্রোশ দূরের বড় গঞ্জ থেকে চাল-ডাল আনিয়ে তাঁবুর লোকের রান্নাবান্না হল। তিন-চার দিন চলে এই ভাবে, তারপরে সেখানেও বন্ধ। পুরো একদিন শুধুমাত্র পুকুরের জল খেয়ে অগস্তিসাহেব সদরে চলে যান। কী নাকি জরুরী ব্যাপার সেখানে, এস-ডি-ও আসছেন অগস্তির জায়গায়।

আমলারা ব্যাকুল হয়ে গিয়ে পড়ে: আমাদের উপায় কি করে যাচ্ছেন হুজুর, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে থাকব কেমন করে?

মেজাজ হারিয়ে অগস্তি খিঁচিয়ে ওঠেন : কি দিচ্ছে, তোমরা কি নিলে সদর থেকে আমি কি দেখতে আসব এখানে? খবরদার, আমার কানে কখনো যেন না পৌছয়! তাহলে রক্ষে রাখব না।

আমলার চোখ তাকাতাকি করে : পথে এসো বাপধন। বেচারামও শুনল—আমলাদেরই কেউ গিয়ে বলে থাকবে। আগেরবার চারজনকে পাঠিয়েছিল, এবারে তার ডবল—আট জন। ধামা-ঝুড়ি মাথায় দিনদুপুরে হৈ-হৈ করে তারা ভেট নিয়ে চলল।

জগবন্ধু দারোগার ব্যাপার কিন্তু এই জায়গাটুকুর মধ্যে নয়, আরও বহু দূর গড়িয়েছে। সদর অবধি। ক্রমশ সেটা প্রকাশ পেতে লাগল। সদরে পুলিসসাহেবের কাছে বেনামি চিঠি যাচ্ছে : দারোগা পাইকারি হারে উৎকোচ লইতেছে, যত চোর-ডাকাত তাহার শিষ্যসাগরেদ, প্রজাসাধারণ বিপন্ন—

দুর্গম ভাঁটিঅঞ্চলে এটা নতুন ব্যাপার নয়। নিয়মই বরঞ্চ এই। দুর্জনদের হাতে রেখে খানিকটা তোয়াজ করেই কাজকর্ম চলে। ভাবখানা হল—তোমায় আমি বেশি ঘাঁটাব না, তুমিও উৎপাত বেশি করবে না। নিতান্ত নিয়মরক্ষায় যেটুকু লাগে—সরাসরি ইজ্জত এবং আইনকানুনের মর্যাদা মোটামুটি বজায় রাখবার মতো। এসব বৃত্তান্ত সদরে একেবারেই যে না পৌছয় এমন নয়। কিন্তু কেউ মাথা গলায় না। গলাতে গেলে সেই মাথার কাঁধ থেকে নেমে পড়ারই অধিক সম্ভাবনা। ঝঞ্চাট এড়িয়ে জানিনে-জানিনে করে কাজকর্ম চলে যায়।

এবারে অভিনব ব্যাপার। চিঠির মারফত সবিস্তারে খবর আসছে। একটা চিঠি গুটিয়ে পাকিয়ে ঝুড়িতে ফেলতে না ফেলতে পুনশ্চ চিঠি। ধাপধাড়া জায়গাতেও পোস্টাপিস বসিয়ে সরকার এই সর্বনাশটি করিয়েছেন। এক পয়সা, খুব বেশি তো দুটো পয়সার মাশুলে খবর কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক চলে যায়। বেচা মল্লিকের কাজ নয়—সে এত লেখাজোখার ধার ধারে না। রঙ্গক্ষেত্রে অন্যেরা এসে পড়েছেন। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকার জাতীয় লোকেরা।

—দারোগার জন্যই প্রজাদের ধনসম্পত্তি সহ বাস করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ জগবন্ধুর মেয়ের বিয়ের উল্লেখ : শিষ্যসাগরেদ পাঠাইয়া একরাত্রে এই অঞ্চলের যাবতীয় পুকুরের মাছ তুলিয়া আনিল। তাহাতেই দায় উদ্ধার হইল। মাছ চুরির এজাহার পড়িয়াছে, সেই তারিখের সহিত দারোগার কন্যার বিবাহের তারিখ মিলাইয়া দেখিলেই হজুরের বোধগম্য হইবে। ইহার পর অধিক তদন্তের কি আবশ্যক থাকিতে পারে?

ক্রুদ্ধ বেচা মল্লিকও এদিকে হৈ-চৈ লাগিয়েছে। হাঁকডাক করে বলছে, আধলা পয়সা ঘুস নেবে না বড় মুখ করে বলত। সেই মুখ রইল কোথা? বলি কালী-দুর্গা কেষ্ট-মহাদেবের চেয়ে দারোগা কিছু বড়-দেবতা নয়। তাঁরা অবধি বিনা ঘুসে নড়ে বসে না—পুজোআচ্চা সিন্নি-মানত ঘুসেরই রকমফের। পুজো পেয়ে তুষ্ট হয়ে তবে একটা কাজ করে দেন। আর জগবন্ধু দারোগা, তোমার অত ডাঁট কিসের হে? অবিশ্যি, পুজোর কায়দাটা বুঝে নিতে হয় ভাল করে—কি ফুলে কি মন্ত্রে কি রকম নৈবেদ্যে কোন দেবতার পুজো। বাঁধাধরা এক নিয়মে সকল পুজো হয় না। সংসারের যত-কিছু গণ্ডগোল ঠিক জায়গায় ঠিক পুজোটি বসাতে পারে না বলেই।

কাপ্তেনের হাসাহাসি নানা সূত্রে জগবন্ধুর কানে আসে। বাদার হরিণ মেরে ঝিনুকপোতা থানায় কোন মক্কেল দিয়ে গেছে। দারোগা অনাদি সরকার সেই উপলক্ষে জগবন্ধুকে আহারের নিমন্ত্রণ করলেন। খেতে খেতে তিনিও বললেন কথাটা। যথাযথ দরদ দিয়ে বললেন: নোংরা কথাগুলো আপনার নাম ধরে বলে বটে, কিন্তু ঝোঁকটা সমগ্র পুলিস-সমাজের উপর এসে পড়ে। চুপচাপ থেকেই আসকারা পাচ্ছে, রীতিমত শাসন হওয়ার দরকার।

সহানুভূতি ও দুঃখে টগবগ করে ফুটছেন তিনি। কিন্তু জগবন্ধু লক্ষ্য করেছেন ঠোঁটের আড়ালে হাসিটুকু। হাসি যেন বলছে, কি হে ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির, আমাদের কথা লোকে ঠারেঠোরে বলে, তোমায় নিয়ে যে জগঝম্প পেটাচ্ছে আকাশ-পাতাল জুড়ে।

ক্ষেপে যাচ্ছেন জগবন্ধু। ভালো থাকতে গিয়ে এই পরিণাম। ভালোকে মন্দের খোয়াড়ে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে যেন মানুষের সোয়াস্তি।

ক্ষুদিরামকে একদিন বললেন, শুনেছেন?

ক্ষুদিরাম বলে, রেখেঢেকে তো বলে না, কেন শুনব না বলুন? এক্তিয়ারের মানুষ নয়; মুখে চাবি আঁটারও জো নেই।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সম্বন্ধেও জগবন্ধু ইতিমধ্যে অনেক জেনেছেন। পরগাছা বিশেষ—যে যখন দারোগা হয়ে থানায় আসে, তাকেই আঁকড়ে ধরে। এই থানায় আসার প্রথম দিনটা মনে পড়ে। জগবন্ধু এলেন, কালী বিশ্বাস কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন। ক্ষুদিরাম ঢুকবার পথে দাঁড়িয়ে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করল। সে-ই যেন গৃহকর্তা, জগবন্ধু অতিথি। কালী বিশ্বাসের দিকে চেয়ে একটা সাধারণ বাক্যের কার্পণ্য তখন। নতুন দারোগার মনস্তুষ্টি হবে বলে কালী বিশ্বাসের ট্যারা চোখ নিয়ে রসিকতাও করে একটু: বিশ্বাসমশায় তাকালেন চোরটার দিকে—চোর ভাবে, গাছের উপরের পাখি

দেখছেন কথাবার্তাও তাই, ভাজেন ঝিঙে তো বলেন পটল। কালী বিশ্বাসের কানে না যায়, লজ্জিত জগবন্ধু তাড়াতাড়ি এটা-ওটা বলে কথা চাপা দিলেন। অথচ জানা গেল, ঐ কালী বিশ্বাসের দিনেও ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য দারোগার প্রধান আমাত্য এবং সর্বকর্মে দক্ষিণহস্ত। টাকার জন্য করে, তা নয়। ক্ষুদিরামের বাড়ির অবস্থা ভালো, টাকার কোনো স্পৃহা নেই। আরও একটা কথা সবাই বলে, মানুষটা বিশ্বাসঘাতক নয়। যাকে যখন সুহৃৎ বলে মেনে নেবে, প্রাণ ঢেলে দেবে তার কাজে। স্বভাবই এই রকম বিচিত্র।

এমনি ভাবে আর চলে না। জগবন্ধু ঠিক করলেন, ক্ষুদিরামের হাতের পুতুল না হয়ে কাপ্তেন বেচামল্লিককেই দাজাস্থজি। -এই প্রতিজ্ঞা। মুখে চাবি আঁটার জো নেই, ক্ষুদিরাম বলে। জেলের ঘরে চাবি এঁটেই বেচারামের মুখ বন্ধ করে দেবেন। সুযোগও চমৎকার জুটে গেল— দুঃসাহসিক ডাকাতি।

নয়

দুঃসাহসিক ডাকাতি। গাবলতির যে হাট দেখে এসেছি, তার অদূরে মাঝনদীর উপর। হাটবার, নদীর এপারে-ওপারে হাজার হাজার হাট-ফিরতি মানুষ জড় হয়েছে। তারই মধ্যে সকলের চোখের উপর কাজ সমাধা করে সরে পড়ল—এত দক্ষতা আর এমন সাহস কাপ্তেন বেচারাম, নিতান্ত পক্ষে তার বাছাই শিষ্যসাগরেদ, ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব না। যে না সে-ই বলবে এই কথা।

মুশকিল হল, গাবতলি জায়গাটা জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে না। ঝিনুকপোতার এলাকায়—অনাদি সরকার সেখানকার বড়-দারোগা। অনাদি উৎসাহ দেখাবে না, সেটা বেশ জানা আছে। ভয় করে বেচা মল্লিককে। তা ছাড়াও অন্যবিধ গোপন কারণ আছে অনুমান করা যায়।

গাঙের উপর জমিদারি কাছারি। কাছারির ঘাটে ডিঙিনৌকো বেঁধে জন দশেকের একটা দল নেমে পড়ল। অনেক দূর উত্তরের ডাঙাঅঞ্চলের ঘর তাদের, বাদাবনে চাক কাটতে গিয়েছিল। দুই ক্যানেস্তারা মধু পাইকারকে মেপে দিয়ে দেশে ফিরছে। নৌকোয় জলের কলসি একেবারে খালি, জলের অভাবে দুপুরে রাঁধাবাড়া হয়নি। তেষ্টার জলও নেই। রাজকাছারিতে এসে অতিথি হল তাই।

বলে, আপনাদের কোন দায় ঠেকাতে হবে না নায়েবমশায়। চাল-ডাল আনাজপত্তর সমস্ত নৌকায় আছে। গাছতলায় শুকনো ডালপালা দু-চার খানা কুড়িয়ে নেব। কাছারির মিঠে-জলের পুকুরের বড্ড নাম, ঐ জলের নামে উঠে পড়েছি। কোন একটু আচ্ছাদন দেখিয়ে দেন, খান আষ্টেক ইট সাজিয়ে উনুন বানিয়ে দিই। চাট্টি চাল ফুটিয়ে খেয়েই চলে যাচ্ছি আমরা।

এইটুকু প্রার্থনা না শোনার হেতু নেই। একেবারে গাঙের কিনারে চালাঘর, বাবুদের নিজস্ব হাঙরমুখো পালকিখানা থাকে যেখানে। সেই ঘরের এক প্রান্তে রান্না চাপিয়েছে। ভাত কেবল ফুটে উঠেছে—রান্নাবান্না ফেলে হুড়মুড়িয়ে সকলে ডিঙিতে উঠে পড়ল। চক্ষের পলকে ডিঙি খুলে দেয়। ইটে উনুনে ভাত ফুটতে লাগল টগবগ করে।

গাঙের উপর সেই সময়টা বড় এক সাঙড়-নৌকা ধান-বোঝাই করে হাটে গিয়েছিল, ফিরে যাচ্ছে। এর অনেক পরে জগবন্ধু দারোগা নিজে কাছারিবাড়িতে এসেছিলেন। ঘটনার আদ্যোপান্ত স্বকর্ণে শুনবার জন্য। আত্মপরিচয় দেননি, কে না কে এসে পড়েছে। দারোয়ান রামকৃপাল গল্পটা বলল—মামলা উঠলে লোকটা আদালতেও সাক্ষি দিয়েছিল। চালাঘরে রান্না চাপিয়েছে, রামকৃপাল কলকের আগুন নিতে এসেছে তাদের উনুনে। সাঙড়-নৌকো দেখেই তড়াক করে উঠে সবসুদ্ধ ঘাটে ছুটেছে—

রামকৃপাল জিজ্ঞাসা করে, কি হল গো?

দলের কর্তাব্যক্তিটি জবাব দিল ঐ নৌকোয় ব্যাপারি যাচ্ছে, মানুষটা অত্যন্ত পাজি। এক গাদা টাকা কর্জ নিয়ে পলাপলি খেলছে। কাল রাত্তির থেকে তক্কে-তক্কে আছি। পালাচ্ছে কি রকম, চেয়ে দেখ না—

কথা এই ক'টি—তাও কি শেষ করে বলল! বলতে বলতে লম্ফ দিয়ে পড়ল ডিঙির উপর। ছয়খানা বোঠে ঝপঝপ করে পড়ে। আলগোছে জল ছুঁয়ে—কিম্বা জল একেবারে না ছুঁয়েই বাতাসে উড়ে চলছে বুঝি ডিঙি।

জগবন্ধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেই কর্তা মানুষের চেহারা জিজ্ঞাসা করেন। লম্বা দশাসই জোয়ানপুরুষ কিনা?—হ্যাঁ। উপর ঠোঁটে শ্বেতি আছে কিনা? জবাবে রামকৃপাল একবার বলে হ্যাঁ, একবার বলে না। মোটের উপর প্রমাণ হয় না কিছুই। শ্বেতির দাগ থাকলেও বেচা মল্লিক হতে পারে। অনেক ছলাকলা ওদের ঠোঁটের সাদার উপর রং চাপিয়ে গাত্রবর্ণের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া দশাসই লম্বা মানুষ বেছে বেছে নিয়েই তো দল, বেচা মল্লিক ছাড়াও দশাসই জোয়ানপুরুষ বিস্তর আছে। তবে কাজকর্মের ধারা দেখে প্রত্যয় আসে, কাপ্তেন বেচা স্বয়ং হাজির ছিল সেদিন ঐ ডিঙিতে।

এপার-ওপার দু-পার দিয়েই হাটের ফেরত মানুষজন যাচ্ছে। হাজার দেড় হাজার মানুষ তো বটেই। চোখের সুমুখে এত বড় কাণ্ডটা চলেছে, পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে সব। সাঙড়ের কাছাকাছি হয়েছে ডিঙি, মাঝে তবু হাত দশেক ফাঁক। সবুর না মেনে—সে এক তাজ্জব কাণ্ড!—ডিঙি থেকে তিড়িং তিড়িং করে এরা সাঙড়ের উপর পড়ছে। বানের যেমন এ-গাছ থেকে ও-গাছ লাফ দিয়ে পড়ে। কতক আগ-নৌকায়, কতক ছাইয়ের উপরে, কতক বা পাছগলুয়ে। কী শিক্ষা গো বাবুমশায়! পলকের মধ্যে ঘটে গেল, পাড়ের উপর আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে।

ভর সন্ধ্যায় তোলপাড় পড়ে গেল। ফাঁকা নদীর উপর তখনো বেশ আলো, সুমুখজ্যোৎস্না বলে আলো বহুক্ষণ থাকবে। ডাঙার উপর থেকে সমস্ত স্পষ্ট দেখা যায়। রামকৃপাল দেখছে, সেই হাজার মানুষ চোখ মেলে দেখছে। ডাইনে বাঁয়ে ধাক্কা মেরে সাঙড়নৌকোর মাল্লাগুলোকে টপাটপ জলে ফেলে দিল। ডালের উপর উঠে এক-হাতে যেমন পেয়ারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে সেইরকম। তারপরে আওয়াজ পাওয়া যায়, দমাদম কুড়াল মারছে ছইয়ের ভিতরে। ব্যাপারটা সঠিক বোঝা যায়নি গোড়ায়। কেউ ভাবছে, কুড়াল পেড়ে নৌকোর কাঠে, নৌকো কেটে চেলা-চেলা করছে। কেউ ভাবে, মানুষের মাথায় পড়ছে—যে ক'জন আটকে পড়ছে, খুলি চুরমার করে দিচ্ছে তাদের। পরে আসল বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। নৌকোর মধ্যে লোহার সিন্দুক—মোটা শিকলে গুড়োর সঙ্গে বাঁধা, ধানবিক্রির যাবতীয় টাকা সেই সিন্দুকে। লোহার উপর কুড়ুল মেরে মেরে শিকল কাটছে। সহজে কাটবার বস্তু নয়—দশ-বারো কোপ পড়ার পরে মূল-ব্যাপারি বলরাম সাঁই ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। শিকল বুকে জড়িয়ে ধরে লম্বালম্বি হয়ে পড়ল তার উপর। পাড়ের মানুষ যা-ই ভাবুক, মানুষের মাথায় সত্যি সত্যি কুড়াল চালানো যায় না। বেচারাম লুঠেরা বটে, কিন্তু খুনি নয়। মানুষ খুন করা মহাপাপ ওদের নীতিশাস্ত্র মতে। কাজের মধ্যে দৈবাৎ খুন হয়ে গেলেও নিন্দে রটে যায় খুনি বলে, সমাজে সে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে টাকাকড়ি সোনারূপো মানুষের অর্জিত বস্তু, খোয়া গেলে কোন-একদিন পূরণ হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রাণ ফেরত আসে না। যে বস্তু দেবার ক্ষমতা নেই, তাই তুমি হরণ করবে কোন বিবেচনায়

বলরাম শিকল আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে তো কুড়াল ফেলে লাঠি ধরল এবার এরা। পিঠের উপর দমাদম মারছে। তিলেক নড়াচড়া নেই বলরামের—ধানের বস্তার উপর লাঠি পিটে ধুলো ঝাড়ছে যেন। এই ঘটনা পরে একদিন বেচারামই বলাধিকারীর কাছে বলেছিল। মার খেতে পারে বটে বলরাম

লোকটা ! নির্বিকারে মার খাওয়া দেখে মনে হয় কুম্ভযোগ করে দেহের খোলে বাতাস পুরে ফেলেছে। ফুটবলের মতো। এত বড় তাগদ তো খান বওয়াবয়ি করে মরে কেন? শুধু এই গুণের জন্যই অনায়াসে তাকে কোন একটা দলে ঢুকিয়ে নেওয়া যায়। এইসব কথা মনে হয়েছিল তখন ক্যাপ্তেন বেচা মল্লিকের।

নদীর উত্তর তীরে এদিকে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেছে। যত হাটুরে নৌকো এই মুখো বয়ে আসছে। হাটখোলা অবধি খবর হয়ে গেছে—সে ঘাট থেকে বিস্তর নৌকো খুলে দিয়েছে, দাঁড়-বোঠে বেয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটেছে, এসে ঘিরে ধরবে। এতক্ষণে সাহস পেয়ে এ-পার ও-পারের অনেক বীরপুরুষ ঝপাঝপ জলে পড়ে সাঁতার কেটে এগোচ্ছে। সময় নেই, মুহূর্ত আর দেরি সইবে না—

বেচারাম কোন দিকে ছিল—মারে কিছু হয় না তো ছুটে এসে খ্যাচ করে শড়কি বসিয়ে দিল বলরাম ব্যাপারির হাতের চেটোয়। ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটে, শিকলের উপরের হাত আপনি আলগা হয়ে যায়। তখন আর কি! শিকল চুরমার হয়ে গেছে, মরদেরা ধরাধরি করে সিন্দুক ডিঙিতে নিয়ে ফেলে। নৌকোর উপরে নিয়ে বেড়ায় বলে সিন্দুক আয়তনে ছোট। তবু ডিঙি কাত হয়ে জল উঠে গেল খানিক। কাজ হাসিল করে মরদেরাও লাফিয়ে পড়েছে। হাতে হাতে বৈঠা—ঝপাঝপ বৈঠা মেরে সকলের চোখের উপর ডিঙি ছুটে পালাচ্ছে।

পাড়ের মানুষ উদ্দাম হয়ে ধর্—ধর্ করে চেঁচায়। বোঠে-দাঁড়ের তাড়নায় আর সাঁতারু মানুষের দাপাদাপিতে জল তোলপাড়। বিশ-পঁচিশটা নৌকা এসে নানান দিকে ঘিরে ধরেছে। ফাঁকা নদী, আড়াল-আবরু নেই। দুই তীরে মানুষ গিজগিজ করছে—ডাঙায় উঠতে হবে না যাদুমণিরা, যাবে কোন দিকে?

এমনি সময় দুড়ুম-দাড়াম—বন্দুকের দেওড়। বন্দুকও রয়েছে সঙ্গে। থাকবে তো বটেই। হাটের জনতার মুখোমুখি এসে কাজে নেমেছে, আয়োজনে খুঁত রেখে আসেনি। দেশি কামারের লোহা-পেঠা বন্দুক, বুলেট হল জালের কাঠি। রাইফেল অবধি কত সময় হার খেয়ে যায়। পুলিস ধুন্দুমার লাগিয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাঁটিঅঞ্চলে এখনো এই বস্তু প্রচুর। মানুষ মারা নিয়ম নয়, তাই বলে বিপদের মুখে হাত বাড়িয়ে এসে ধরা দেবে এমন অহিংস প্রতিজ্ঞা নিয়েও বেরোয় না কেউ বাড়ি থেকে। যত নৌকা তাড়া করে এসেছে, বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে দাঁড় তুলে দাঁড়াল। যারা সাঁতরে আসছিল, পাক খেয়ে উল্টো মুখো ঘুরল। পাড়ের মানুষ এত যে জকার দিচ্ছিল, নিঃশব্দ তারা এখন। যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে, বন্দুক তাদের দিকে তাক করে না বসে।

এক ফালি চাঁদ কখন আকাশে উঠে গেছে, নদীজল ঝিলমিল করছে। জ্যোৎস্নায় তরঙ্গ তুলে ডাকাতের ডিঙি পলকের মধ্যে অদৃশ্য।

ধরিত্রীর শিরা-উপশিরার মতো গাঙ-খাল। খালেরই বা কত শাখা-প্রশাখা ধানক্ষেতের মধ্যে, পতিত জলা ও জঙ্গলের মধ্যে, মানুষের বসতির আনাচে-কানাচে। তারই কোন একটায় ঢুকে পড়েছে, আবার কি! ধরা অসম্ভব। ধরতে যাওয়াও গোয়ার্তুমি। কোথায় কোন অন্তরালে ওত পেতে আছে—যে-ই না কাছে গিয়েছে, দিল ঘাড়ে লাঠির বাড়ি। কিম্বা শড়কির খোঁচা।

জগবন্ধু বলাধিকারী কাছারির দারোয়ান রামকৃপালের মুখ থেকে এই সমস্ত শুনে এসেছেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরে কারো কাছে প্রকাশ করেন না। ক্ষুদিরামকে বাজিয়ে দেখছেন। কাছাকাছি এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, বহুদর্শী সুহৃদের পরামর্শ চাইছেন যেন তিনি: কী করা যায় বলুন ভটচাজমশায়, আমাদের কি কর্তব্য?

ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দেয়: একেবারে কিছু নয়—বেশ খানিকটা সর্ষের তেল নাকে ঢেলে ঘুমান। কী দরকার বলুন ব্রণ চুলকে ঘা করবার? বুঝুকগে অনাদি-দারোগা, যার এলাকায় ঘটেছে।

জগবন্ধু জেদ ধরে বলেন, কপালক্রমে সুযোগ এসে গেছে, এ আমি ছাড়ব না। দলসুদ্ধ শিক্ষা দিয়ে দেব, অকথা-কুকথা রটানোর শোধ তুলব। যতই হোক, বিদেশি মানুষ আমি। আপনি অনেককাল ধরে আছেন, অঞ্চলের নাড়িনক্ষত্র সমস্ত জানা। আপনাকে সহায় হতে হবে, সেইজন্যে বলছি। অনাদি সরকারকে বিশ্বাস করা যায় না, কেস গোলমাল করে দিতে পারে। নির্ঘাৎ সেই চেষ্টা করবে। যাতে না পারে, আমাদের দেখতে হবে সেটা।

ক্ষুদিরাম বলে, সেটা হবে কিন্তু বিড়াল কাঁধে নিয়ে ইঁদুর-শিকারের মতো। বিড়াল ঠেকাতেই জ্বালাতন হয়ে উঠবেন। দরকারটা কি, বুঝিনে। বেচা মল্লিক রেগে গিয়ে এটা-ওটা হয়তো বলছে, কিন্তু মানুষটা আসলে খারাপ নয়। মন বড় দরাজ। মেয়ের বিয়ের দিন তার কিছু পরিচয় দেখলেন। আমি গিয়ে শরণ নিলাম, লোকজন লাগিয়ে রাত্তিরবেলা দায় উদ্ধার করে দিয়ে গেল। রাজাবাদশার মেজাজ। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথাও শুনুন তবে।

ক্ষুদিরাম তখন খুলনা শহরে। গ্রাম ছেড়ে শহরের উপর আস্তানা নিতে বাধ্য হয়েছে। বাপ চেষ্টাচরিত্র করে আদালতের সেরেস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

চাকরি করে, আর সকাল-সন্ধ্যা জ্যোতিষের চর্চা করে। নামও হয়েছে কিছু। শোনা গেল, কাপ্তেন বেচা মল্লিক কী একটা কাজে খুলনায় এসেছে।

ক্ষুদিরামেরই এক মক্কেল খবরটা এনে দিল। অনেক দিন থেকেই মল্লিকের কাছে যাবার ইচ্ছা। সুযোগ পেয়ে ক্ষুদিরাম তার বাসায় গিয়ে পড়ল।

কপাল-ভরা চন্দন, নগ্ন দেহে ধবধবে সুস্পষ্ট উপবীত। একজনের পরিচয় বলে দিল, সামুদ্রিকাচার্যমশায়—

বেচা মল্লিক তাড়াতাড়ি পদধূলি নেয়। জিনের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ-করা নোট একখানা ক্ষুদিরামের হাতে দিল।

ক্ষুদিরাম তটস্থ হয়ে বলে, এ কী! টাকার জন্য আসিনি আপনার কাছে।

বেচা মল্লিক বলে, ব্রাহ্মণের পায়ে শুখো প্রণাম চলে না। নিয়ে নিন, ফেরত দেবেন না।

দেবদ্বিজে ভক্তিমান, সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ কথাটুকু অনুনয় কি তর্জন বোঝা যায় না। নোটখানা ক্ষুদিরাম ভয়ে ভয়ে গাঁটে গুঁজে ফেলল।

বাড়ি ফিরে দেখে এক-শ টাকার নম্বরি নোট (এক-শ টাকার তখন অনেক দাম, এখনকার সঙ্গে তুলনা করবেন না)। ভুল করে দিয়েছে নিশ্চয়। হন্তদন্ত হয়ে ক্ষুদিরাম আবার ছুটল।

বেচা মল্লিক দেখে বলে, কম হল এবারে, তা জানি। এর পরে এসে উপযুক্ত মর্যাদা দেবো। হাতও দেখাব তখন।

কম কি বলছেন? নোট এক-শ টাকার।

তাই নাকি? দু-পকেটে দুই রকমের নোট। বড়খানা তবে আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। অসুবিধা হবে খুব—কিছু কেনাকাটার গরজ ছিল, এবারে আর হবে না।

ক্ষুদিরাম বলে, নোট ফেরত দিতে এসেছি। ছোট যা আছে, তাই না হয় একটা দিয়ে দিন আমায়।

আপনার অদৃষ্টে গেছে একবার হাত থেকে বেরুলে মল্লিক সে জিনিস আর ছোঁয় না। বাড়ি চলে যান ঠাকুর ভ্যানর-ভ্যানর করবেন না।

সেই উগ্র কণ্ঠ। ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

বলাধিকারীকে বলছে, মল্লিক লোকটার মনে যেন আলাদা আলাদা দুই কুঠুরি। ভালোয় মন্দয় মিশাল সাধারণ দশজনার মতো সে নয়। ভালো যখন, অতখানি কালো কেউ হয় না। অশ্বত্থের মতো ছায়া দিয়ে রাখবে, গায়ে আঁচ

পড়তে দেবে না। মন্দ হল তো আসল কালকেউটে। মেরে একেবারে সাবাড় করতে পারেন তো করুন। খুব ভালো সেটা, লোকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু খবরদার, ঘাঁটা দিয়ে রাখবেন না। আপনি আমায় ভালবাসেন বড়বাবু, মা-ঠাকরুনও বিশেষ খাতির করেন। সকলের মুখ চেয়ে মানা করছি।

কথাটা মনে ধরেনি, বলাধিকারীর মুখ দেখে বলা যায়। ক্ষুদিরাম নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনাকে আমি কি বুদ্ধি দিতে পারি! পূর্বাপর দেখুন সমস্ত ভেবে। যা করবেন সাথেসঙ্গে আছি, কেনা-গোলাম বিবেচনা করবেন আমায়।

জগবন্ধু যত ভাবছেন, জেদ আরও চেপে যাচ্ছে। আর একটা খবর বলেননি ক্ষুদিরামের কাছে। কারো কাছে প্রকাশ করে বলবার নয়। এমন কি ভুবনেশ্বরীর কাছেও বলতে ইচ্ছে করে না। সদরে ডি-এস-পি ও এস-পি'র কাছে বিস্তর বেনামি চিঠি গেছে তাঁর বিরুদ্ধে—এসব পুরানো কথা। এখন জানা গেল, কলকাতায় ইন্সপেক্টর-জেনারেল অবধি চলে গেছে চিঠি। যদু-মধুর দ্বারা এত দূর হয় না, দস্তুরমতো পাকা লোক পিছনে। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকারই সম্ভবত! এতকাল মনের আনন্দে এক-একটা থানা সরোবরে হংস হয়ে মৃণাল তুলে খেয়ে এসেছে, দলের ভিতর একটা বক এসে পড়ে বাঁধা-নিয়মের ভণ্ডুল ঘটিয়ে দিল। জগবন্ধু বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছেন, এনকোয়ারির তোড়জোড় হচ্ছে ঐসব চিঠির অভিযোগ সম্পর্কে। সেই অবধি যদি গড়ায়, ফল যে রকমই হোক—মান-প্রতিপত্তি আর ধর্মপথের অহঙ্কার নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবেন না আর তিনি। উপরওয়ালার সন্দেহ অঙ্কুরে বিনাশ করবেন বেচা মল্লিককে জেলে পুরে। মেয়ের বিয়ের সময় যে ভুল করেছেন, সেই কলঙ্ক ধুয়েমুছে যাবে। অদৃষ্ট সুযোগ করে দিয়েছে এই সঙ্গিন সময়টায়। এ সুযোগ নষ্ট হতে দেবেন না।

আরও একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ল। গাবতলি জায়গাটা ঝিনুকপোতার বটে, কিন্তু বলরাম ব্যাপারির বাড়ি জগবন্ধুর এলাকার মধ্যে পড়ে। পথঘাটের খোঁজ নেওয়া হল। অতিশয় দুর্গম গ্রাম—দূরও বটে। গাঙ-খাল নেই যে নৌকা চেপে যাবেন। ডাঙার পথও নেই। ধান কেটে-নেওয়া দিকচিহ্নহীন ক্ষেত—ক্ষেতের সরু আলপথ এবং খানিকটা বা গরু-চলাচলের পথ ধরে বিস্তর কষ্টে যেতে হয়।

বলরামের পাত্তা নেই সেই ঘটনার পর থেকে। ফেরারি। সাভড়-নৌকো মাঝি বিহনে ভাসতে ভাসতে বাঁকের মুখে চড়ার উপর উঠে গেছে, পাটার উপর বলরাম আহত হাত চেপে ধরে আর্তনাদ করছে, এমনি সময় হাট-ফিরতি কোন এক আত্মীয়জন দেখতে পেয়ে তাকে নৌকায় তুলে নিয়ে চলে গেল।

হাঙ্গামা চুকেবুকে যাওয়ার পর জমিদারি-কাছারির পাইক-বরকন্দাজ নৌকার খোঁজ করে কাছারির নিচে এনে নোঙর করে রাখল। পরের দিন ঝিনুকমারির ছোটবাবু এবং সিপাহিরা তদন্তে এসে মাল্লা একটিকে পেয়ে গেল। কিন্তু আসল জন—বলরাম ব্যাপারিই গায়েব। ডাকাতি তার উপরে যেন হয়নি, সে-ই যেন ডাকাত।

তা-ও ঠিক নয়। ডাকাত এসে একদফা লুঠেপুঠে নিয়ে গেছে, তার উপরে আবার দ্বিতীয় দফা ডাকাতির আতঙ্ক। থানা-পুলিস অনেক বড় ডাকাত, বেচা মল্লিক কোথায় লাগে। ডাকাতির পদ্ধতিটা কিছু স্বতন্ত্র। যে মাল্লাটাকে পেয়ে গেছে, খোদ অনাদি সরকার সমারোহে চলে গেলেন তার বাড়ি। ঘোড়ার পিঠে গিয়েছিলেন। ঘোড়ার খোরাকি সহিসের খরচা সিপাহির বারবরদারি এবং বড়বাবুর প্রণামি—একগণ্ডা হাঁস বিক্রি করে দায় মেটাতে হল। একটা দিনেই শেষ হল না, চলবে তো এই এখন। ভিটেমাটি বন্ধক পড়বার গতিক। সামান্য এক মাল্লামানুষ নিয়ে এই মূল-ব্যাপারিকে পেয়ে গেলে কী কাণ্ড করবে ভেবে হৃৎকম্প হয়। টাকাকড়ি গেছে—ব্যবসায়-বাণিজ্য করে সামলে উঠলে হয়তো একদিন। হাতখানা জখম হয়ে গেছে, তা-ও সারবে। কিন্তু পুলিসের কবলে পড়লে যা-কিছু আছে সে তো যাবেই, তার উপরে কাজকর্ম ছেড়ে থানা-আদালত করে বেড়াও কমপক্ষে এখন দুটি বছর। একলা বলরাম ব্যাপারি নয়, অঞ্চলের যাবতীয় মানুষের মোটামুটি মনোভাব এই। চাপাচাপি কর তো যমালয়ে যেতে রাজি আছে, থানার পরে কদাপি নয়।

জগবন্ধুরও জেদ চেপেছে। চুপিচুপি বলরামের গাঁয়ে চললেন। সঙ্গে ক্ষুদিরাম ও দুটি কনেস্টবল। সামান্য সাধারণ লোক যেন, সাদা পোশাক সকলের। ঘোড়া নিলেন না—ঘোড়ায় চেপে দারোগাবাবু চলেছেন, সাড়া পাড় যাবে। মড়ক লাগলে যেমন হয়, মুখে মুখে ছুটবে দুঃসংবাদ। বলরাম যেখানেই থাক, টের পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে।

কত কষ্টে যে পৌঁছলেন, সে জানেন জগবন্ধু দারোগা আর তাঁর অন্তর্যামী। কনেস্টবল দুটো দীঘির পাড়ে ঘাসের উপর ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল। ক্ষুদিরামের কাঁধে লাঠি। লাঠির মাথায় তালি-দেওয়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আজেবাজে খাতা ও ছাপা কাগজপত্র সেই ব্যাগে। গ্রামে এসে বলরামের বাড়িরও খোঁজ হয়েছে। দুজনে ঢুকে পড়লেন।

বলরাম সাঁইয়ের বাড়ি এটা?

একটি লোক ছুটে এসে করজোড়ে দাঁড়াল। পরিচয় পাওয়া গেল, সম্পর্কে বলরামের মামা।

কিছুদিন আগে সেটেলমেন্টের মাপজোপ হয়ে গেছে। ক্ষুদিরামের কাঁধের ব্যাগ খুলে কিছু কাগজপত্র নেড়েচেড়ে জগবন্ধু বললেন, জরিপের লোক আমরা, বলরাম সাঁইয়ের খোঁজে এসেছি। তোমায় দিয়ে হবে না তো মাতুল মশায়, বলরামকে ডাকো। তার কাছে দরকার।

মামা বলে, কোথায় বলরাম, আমরা কেউ জানি নে। তাকে পাওয়া যাবে না।

একটা ছাপা কাগজ তুলে নিয়ে পেন্সিলের টানে জগবন্ধু খচখচ করে কয়েক ছত্র কাটলেন। লিখলেনও কি খানিকটা। মামা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জগবন্ধুই বলে দিলেন, পর্চা থেকে নাম কাটা গেল। কেউ তোমরা ক্ষেতখামারে যাবে না। ধান যা আছে, মলে ডলে জমিদারি-কাছারির গোলাজাত হয়ে থাকুক। বুজরাতের আগে বোঝাপড়া হবে না।

বাড়ির বাচ্চাগুলো অবধি ঘিরে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রীলোকেরা অন্তরালে। মামা বলে, কেন, আমাদের ধান কাছারিব গোলায় কি জন্য উঠবে? জমির খাজনা-সেস হাল সন অবধি শোধ। ধারদেনা ভাগ্নে আমার বরদাস্ত করতে পারে না।

জগবন্ধু বলেন, সে বুঝলাম, কিন্তু ভাগ্নেই তো ফৌত। আমাদের আপিসে খবর হল, ডাকাতে কেটে দুই খণ্ড করে গাঙের জলে ফেলে দিয়েছে। তদন্তে এসেও তাই দেখছি। পর্চার নাম না কেটে কি করি। জমির ধান আপাতত উপরের মালিকের জিম্মায় থাকবে! ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয়ে কাগপত্রের সংশোধন হোক, তারপরে জমির দখল।

চাষা-মানুষের জমি তো দেহের অঙ্গ। ভিতরে যারা উৎকর্ণ হয়ে আছে, ছটফটানি লেগে গেছে তাদের মধ্যেও। একবার সেদিক থেকে ঘুরে এসে মামা সকাতরে বলে, ভুল খবর পেয়ে এসেছেন বাবুমশায়রা। কাছারি থেকেই রটাচ্ছে হয়তো। ভাগ্নে আমার আছে।

জগবন্ধু গম্ভীর হয়ে বলেন, দেখাও তবে। স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত রায় উল্টাতে পারি নে।

মামা ছুটোছুটি করে দুখানা জলচৌকি এনে দিল। বলে, যাবেন না হুজুরগণ, একটুখানি বসুন।

জগবন্ধু স্মিতদৃষ্টিতে ক্ষুদিরামের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলেন, অসুখ ধরেছে। কি বলেন ভটচাজ?

ক্ষুদিরাম বলে, গেল তো গেল, ফেরবার নাম নেই।

শলাপরামর্শ হচ্ছে সকলের সঙ্গে। বিচার-বিবেচনা হচ্ছে। দেরি বলেই ভরসা। এক কথায় কেটে দেবার হলে তাড়াতাড়ি ফিরত।

ঠিক তাই। ফিরে এসে মামা লোকটা আমতা আমতা করে: থানায় টের পাবে না তো হুজুর?

জগবন্ধু সাহস দিচ্ছেন: কী আশ্চর্য! তোমরা ভাবো সরকারি লোক হলেই বুঝি এক-দেহ এক-দিল? ঠিক উল্টো। সরকারের হাজার-লাখো ডিপার্টমেন্ট—আদায়-কাঁচকলায় পরস্পর। ঘুস খেয়ে খেয়ে থানার ইঁদুরগুলোর অবধি ঐরাবতের সাইজ। ওদের উপর টেক্কা মারব বলেই তো এসেছি। আমাদের কাগজপত্র নির্ভুল হয়ে থাক, আর থানাওয়ালারা বেকুব হোক, অপদার্থ বলে বদনাম রটুক, সেইটেই তো চাচ্ছি আমরা।

বিস্তর বলাবলি এবং বহু রকমের প্রতিশ্রুতির পর মামা বলে, আসুন তবে হুজুরগণ। এ বাড়ি নেই, খানিকটা দূর হবে—

পাড়ার মধ্যেও নয়—ভিন্ন পাড়ায় একজনের গোয়ালঘরে কাঠকুটো রাখার মাচা, তার উপরে বলরাম গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে। পাড়াগাঁয়ে চলিত পাতা-মুঠোর চিকিৎসা—নানা রকম পাতা ও শিকড়বাকড় বেটে ঘায়ের উপর লাগিয়ে ন্যাকড়া বেঁধে রেখেছে। এ চিকিৎসায় সারে না যে এমন নয়—

জগবন্ধু অমায়িক স্বরে প্রশ্ন করেন, কেমন আছ বলরাম? হাত সারল ভাল করে?

গায়ে জ্বর খুব। ন্যাকড়া খুলে ঘায়ের অবস্থাও দেখলেন। দেখে শিউরে ওঠেন: কী সর্বনাশ! হাসপাতালে না গিয়ে বড় অন্যায় করেছ বলরাম। এক পয়সা তো খরচা নেই। সরকার হাসপাতাল বানিয়ে দিয়েছে লোকে যাতে মাংনা চিকিচ্ছে পায়।

ন্যাকড়া তুলতে গিয়ে কিছু আঘাত লেগে থাকবে। বলরাম উঃ-আঃ—করছে। জবাবটা মামাই দিয়ে দেয়: ঘা চিকিচ্ছে হয়ে তারপরে কি বাড়ি ফিরতে দিত হুজুর? থানা-পুলিশ হাকিম-আদালত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেরে ফেলত। হাতের যন্ত্রণার চেয়ে ঢের ঢের বেশি যন্ত্রণা। গেরোর ফের—নয়তো ভালমানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে বড়দলের বন্দরে ফিরছে, পথের মাঝে এমনধারা হতে যাবে কেন?

ক্ষুদিরাম ইতিমধ্যে সরে পড়েছে। বন্দোবস্ত তাই। ক্লান্ত সেই দুই পথিক দীঘির ধারে পুঁটলি মাথায় শুয়েছিল, তড়াক করে উঠে পুঁটলি খুলে পাগড়ি-পোশাক পরে দস্তুরমতো কনেস্টবল। ক্ষুদিরামের পিছন পিছন হুড়মুড় করে সেই গোয়ালঘরে তারা ঢুকে পড়ল।

মামা বলছে, ডাকাতের হাতে সর্বস্ব খুইয়ে এক অঙ্গে জখম নিয়ে ফিরে এল, এর পর আবার যদি পুলিসের হাতে পড়ে প্রাণটুকুও থাকবে না। পুলিসে না টের পায় সেইটে দয়া করবেন হুজুর।

জগবন্ধু এইবার আত্মপ্রকাশ করলেন: আমিই পুলিস। প্রমাণ-স্বরূপ কনেস্টবল দুটিকে দেখিয়ে দিলেন। ভাগ্নে ও মামা যুগপৎ আর্তনাদ করে উঠল, নৌকোয় ডাকাত পড়বার সময় যেমনধারা করেছিল। দ্বিতীয় আক্রমণ এবার।

মামা সাঁ করে ছুটে বেরিয়েছে। বলরামও নেমে পড়ল মাচা থেকে। জখমি হাতটা অন্য হাতে চেপে ধরে জগবন্ধুর পায়ে মাথা কুটছে: বড়বাবু আমায় রক্ষে করুন। আপনি ধর্মবাপ।

জগবন্ধু কিছুতে শান্ত করতে পারেন না। এমনি সময় মামাও ঢুকে পড়ে পায়ের উপর দণ্ডবৎ। হকচকিয়ে গেলেন জগবন্ধু। উঠে পড়তে দেখা গেল পাঁচটা রূপোর টাকা পদতলে সাজানো রয়েছে।

জগবন্ধু ভ্রূকুটি করলেন: কী এ সব?

এই নিয়ে ক্ষমা দিয়ে যান। ভাগ্নে হাসপাতালে যাবে না বড়বাবু, এমনি এমনি ভাল হয়ে যাবে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জগবন্ধু টাকা তুলে ছুঁড়ে দিলেন তার গায়ে। ব্যাকুল হয়ে মামা দিব্যিদিশেলা করে: এই পাঁচের উপর যদি আধেলা পয়সাও ঘরে থাকে তো বাপের হাড়। বাপের নাম নিয়ে দিব্যি করলাম বড়বাবু, বিশ্বাস করুন। কড়ার রইল, আরও পাঁচটা টাকা শ্রীচরণে নিবেদন করে আসব। এই মাসের ভিতরেই। কথার যদি খেলাপ হয়, মাস অন্তে শুধু ভাগ্নে কেন আমায় অবধি হাতে-দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবেন। ফাটকে হোক, হাসপাতালে হোক, যেখানে খুশি পুরে দেবেন—কথাটি বলব না।

জগবন্ধু কঠিন হয়ে বলেন, লক্ষ টাকা গণে দিলেও হবে না। শত্রুরা যাই রটাক, লোভ দেখিয়ে আমায় কেউ সত্যপথ থেকে টলাতে পারবে না। কথা দিচ্ছি, এতটুকু ঝামেলা পোহাতে হবে না তোমাদের, একটি পয়সা খরচ হবে না। সরকার সমস্ত দেবে; তার বাইরে যদি কিছু লাগে, আমি দেব নিজের পকেট থেকে। হাসপাতালের বড়-ডাক্তার চিকিচ্ছে করবে, তাজা মানুষ হয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ফিরবে বলরাম। আর বেচা মল্লিকের ক্যাপ্তেনি ঘুচিয়ে নাকে-খত দেওয়াব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। লোকের হাড় জুড়োবে। যা করবার, আমরাই সব করব সরকারের তরফ থেকে,—তুমি শুধু সাক্ষি দিয়ে আসবে বলরাম। প্রধান সাক্ষি বলরাম সাঁই। একটি কথাও মিথ্যে বলতে হবে না, গড়েপিঠে সাক্ষি বানাতে আমি দিইনে। সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল, সেই কথা কটা বলে তুমি খালাস।

মাপ হল না কিছুতে। বাড়িতে মড়াকান্না পড়ে গেল। ডুলিতে তুলে দুই পাশে দুই সিপাহি দিয়ে বলরামকে খুলনা সদরের হাসপাতালে নিয়ে চলল।

জগবন্ধুর জেদ চেপে গেছে। মামলার তদ্বির ষোলআনা নিজের হাতে রেখেছেন। আদালতের দেয়ালের টিকটিকিটা অবধি হাঁ করে আছে, যথোচিত বন্দোবস্তে হাঁ বন্ধ হয়ে গেলে মামলা ফাঁসাতে উঠে পড়ে লাগে। সে সুযোগ হতে দেবেন না বলাধিকারী। সরকার বাদি, সেজন্য পাবলিক-প্রসিকিউটার আছেন। অধিক সতর্কতা হিসাবে ঝানু মোক্তার হারাধন হালদারকে বলরামের তরফে মোক্তারনামা দেওয়া হল। সে খরচা জগবন্ধু যোগাচ্ছেন। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, বেচারামকে অঞ্চল-ছাড়া করবেনই এবার, অসৎ কাজে চিরকালের জন্য যাতে ইস্তফা দেয় তাই করে ছাড়বেন।

এই হারাধন মোক্তারের বাসায় কাজলীবালাকে পেলেন। সে এক স্বতন্ত্র গল্প। ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে হারাধন বলেন, পুরানো ঝি ফিরে এসেছে—বাড়তি এটাকে কদ্দিন বইতে পারি বলুন। ছুড়ে ফেলে দিলে কে ঠেকায়—কিন্তু আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডাও তো সেই সঙ্গে বরবাদ। যাবেই বা কোথা, বয়সটা খারাপ হয়ে মুশকিল হয়েছে। হতভাগী ইচ্ছে করে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে। এক একটা মানুষ থাকে এই রকম সৃষ্টিছাড়া।

গল্পটা এগুচ্ছে। আর জগবন্ধু একবার পান একবার জল একবার বা তামাক—এমনি সব ফরমাস করছেন। কাজলীবালা সামনে আসুক এই সমস্ত কাজে। আসছেও তাই। জগবন্ধু সেই সময় বারবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। কুদর্শন নিরক্ষর এই মেয়ে কালোকোলো রোগা দেহটার মধ্যে এত তেজ কেমন করে ধরে রেখেছে, তাই যেন নিরিখ করে চোখে দেখতে চান। বাইরের চেহারায় চিহ্ন মেলে না, তাই এমন বারম্বার ডাকছেন।

মোক্তারমশায় বলছেন, এক একটা মানুষ এই রকম, গোঁয়ার্তুমি করে আখের নষ্ট করে। নিজের হিত বোঝে না। এ-ও বোধ হয় পাগলামির মধ্যে পড়ে। পাগলের ডাক্তার আছেন এ শহরে, তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করে দেখতে হবে।

হারাধন চোখ তুলে এক একবার জগবন্ধুকে দেখছেন। তাঁকেও বুঝি ঐ পাগলের দলে ফেলতে চান। সেটা খুব মিথ্যা হবে না। কাজলীবালা পাগল হলে তিনিও তাই। এত কালে সত্যি সত্যি একটা দলের মানুষ পাওয়া গেল, মনে হচ্ছে।

কাজলীবালার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু ঘরে নেয় না। একবার গিয়ে পড়ে ঝগড়াঝাটি করে চলে এসেছে। বাইরের এক মেয়েলোক সেই সংসারের কর্তা। কাজলীবালা মরে গেলেও যাবে না আর সেখানে। খুলনায়, ঠিক শহরের উপরে নয়—পার্শ্ববর্তী গাঁয়ে বোন-ভগ্নিপতি থাকে, তাদের কাছে রয়েছে। ভগ্নিপতি ঘরামির কাজ করে। বোনও লোকের বাড়ি গাই দোয় ধান ভানে চিঁড়ে কোটে, যখন যেটা দরকার পড়ে করে দেয়। কষ্টের সংসার চলে এমনি ভাবে। কাজলীবালাও বসে থাকবার মেয়ে নয়—বোনের ছেলেপুলেগুলোর ভার নিয়েছে, আবার বোনের সঙ্গে জুড়িদার হয়ে বাইরের কাজেও যায়।

সেকালে বিস্তর নিমকির কারখানা ছিল ভাঁটি অঞ্চলে। ভৈরবনদের অসংখ্য বাঁক ঘুরে নুনের নৌকোর খুলনায় পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যেত। সেই জন্য, শোনা যায়, রূপ সাহা নামে এক সওদাগর অনেক অর্থব্যয়ে খাল কেটে সোজাসুজি ভৈরবে এনে মিশিয়ে দিলেন। কেটেছিলেন সরু এক খাল—কিন্তু জলস্রোত সোজা পথ পেয়ে ধেয়ে চলল, ভৈরব এদিকটা মজে এল ক্রমশ। সেই খাল আজ বিশাল এক নদী, এ-পার ও-পার দেখা দুষ্কর। কীর্তিমান রূপ সাহার নামে রূপসা এ নদীর নাম

রূপসা যেখানটা ভৈরবে এসে মিশল সেই সঙ্গমের উপর প্রাচীন প্রকাণ্ড বাগান একটা। বাগানের ভিতর লম্বা-চওড়ায় সমান মাপের চৌকো পুকুর—পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জলটুঙি অর্থাৎ পাকাদালান জলের উপরে। সাঁকো বেয়ে জলটুঙিতে যেতে হয়। শৌখিন বাগান ছিল, এখন কিছু নেই, গাছপালা কেটেকুটে নিয়ে গেছে—পরিত্যক্ত নির্জন জায়গা। পাড় ভেঙে ভেঙে পুকুরও এখন রূপসার সঙ্গে এক হয়ে গেছে—জোয়ারের টইটুম্বুর, ভাটায় কাদা বেরিয়ে পড়ে—এখানে ওখানে অল্পসল্প জল। বাসা থেকে সামান্য দূরে জায়গাটা—পুকুরের আটকা জলে কাজলীবালা মাছের সন্ধান পেয়েছে। ফ্যাসা-চাদা-কুচো-চিংড়ি জাতীয় সামান্য মাছ! ভাঁটার শেষে বোনের ছেলেটাকে নিয়ে চলে যায় পুকুরে। মাসি আর বোনপো কাদা ভেঙে ভেঙে গামছা ছাকনা দেয়।

এক সকালবেলা গিয়েছে অমনি। জলটুঙির সাঁকোর ধারে কী একটা বস্তু চকচক করছে—তুলে নিল ছোঁ মেরে। গয়না একটা গলায় পরবার। নেকলেশ এর নাম, পরে জানা গেল।

হাতের মুঠোয় নিয়ে চলেছে সুঁড়িপথ ধরে। এদিকে সেদিকে চালাঘরে ভাড়াটে পরিবার—খাস শহরের উপর থাকবার সঙ্গতি নেই, সেই সব লোক একটাকা দু-টাকা ভাড়ায় এই অঞ্চলে থাকে। যাচ্ছে কাজলীবালা ও

বোনপো—এক ঘরের গিন্নি ডাকলেন, কাজলী নাকি? শোন্, কাল তোরা এসে ঘরের ডোয়া গেঁথে দিয়ে যাবি, এলি না কেন রে?

কাজলী বলে, দিদি চিঁড়ে কুটতে গিয়েছিল রায়বাহাদুরদের বাড়ি। ধান ভিজিয়ে ফেলেছিল তারা, চাকর পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেল।

গিন্নি—ফুল্টিঠাকরুন বলে সবাই—করকর করে ওঠেন: আমরা বুঝি মাংনা খাটতাম রে! আজকে আসবি, অবিশ্যি করে কিন্তু আসবি। বলবি গিয়ে তোর বোনকে—। হাতের মুঠোয় কি রে কাজলী? দেখি, দেখি—বাঃ, দেখতে তো খাসা!

বস্তুটা দু-হাতে ছড়িয়ে ধরে ফুল্টিঠাকরুনের কণ্ঠ মধুর হল: রথের বাজারে দেখছিলাম এই জিনিস। কিনব কিনব করে ভুলে এলাম। পিতলের জিনিস, কাচ বসানো। করে কিন্তু ভাল। তুই কি করবি কাজলী? আট আনার পয়সা দিচ্ছি, দিয়ে দে। নাতনীটাকে পরাব।

পুরো একটা আধুলি—আচমকা এমনি লম্বা মুনাফার কথায় কাজলীবালা দোমনা হল। দেবো কি দেবো না ভাবছে। বোনপো বলে, বাড়ি চল মাসি—

কাজলীবালা বলে, দিদিকে একবার দেখিয়ে এক্ষুনি দিয়ে যাব। থাকো তুমি ঠাকরুন, এক ছুটে এসে দিয়ে যাচ্ছি।

ছুটই হয়তো দিত। দেখে, ওদিককার বেড়ার অন্তরাল থেকে নিরু-বউ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ফিসফিস করে বলে, ও কাজলী, কি করে পেলি? দেখি একবার জিনিসটা।

হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে লুব্ধ কণ্ঠে বলে, পিতল হোক যাই হোক, বড় খাসা জিনিস। আমায় দে কাজলী, দুটো টাকা দিচ্ছি।

আঁচলে টাকা বাঁধা, নগদ টাকা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার হাঁ বললেই খুলে দিয়ে দেবে। কাজলীবালা ইতিমধ্যে মন ঠিক করে ফেলেছে, বোনকে না দেখিয়ে দেবে না।

নিরু-বউ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, তিন টাকাই দিচ্ছি। তাই আছে আমার কাছে। বড্ড পছন্দের জিনিসটা। সোনা তো কেউ দিল না জীবনে, পিতল হোক কেমিকেল হোক তাই পরে সাধ মেটাই। ও কি, চললি যে ফরফর করে! শোন্ পাঁচটা টাকাই দেবো। আমার সর্বস্ব।

কাজলীবালা বলে, দিদিকে না জানিয়ে দিতে পারব না বউদি।

নিরু-বউ কাতর হয়ে বলে, আর নেই, সত্যি বলছি কাজলী। ছেলের মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে পারি। থাকলে দিয়ে দিতাম।

চোখ ছুটো তার যেন জলজল করছে গয়নার দিকে তাকিয়ে।

একআনা ছু-পয়সা করে জমিয়ে এই দাঁড়িয়েছে। যে মাসুষের ঘর করি, জানিস তো তোরা—ঐ একআনা ছু-পয়সার জন্যেও এক-শ গণ্ডা কৈফিয়ৎ। জিনিসটা দিস আমায়। গলায় চিরকাল মাছুলির বোঝা বয়ে গেলাম। কবে কখন মরে যাই, তার আগে গয়না বলে পরে নিই কিছু। তা সে যেমন গয়নাই হোক।

কাজলীবালার মনটা বড় নরম, চোখ ছলছল করে আসে। বলে তোমাকেই দিয়ে যাব বউদি। বোন-ভগ্নিপতির হিল্লেয় থাকি, তাদের না বলে কি করলে রাগ করবে।

বোন তখন বাড়িতে নেই। রাহারাড়ির চিঁড়ে কোটা কাল শেষ হয়নি, সকালেই বোধহয় ঢেঁকিশালে গিয়ে পড়েছে। অনেক বেলায় ফিরল। ফিরে এসেই প্রথম কথা: কোথায় নাকি পড়ে পেয়েছিস তুই—বেশ ভাল একটা গয়না?

ভাল জিনিস কি ফেলে কেউ কখনো? পিতলের ঝুটো-গয়না—তবে দেখতে ভাল। তুমি কোথায় শুনলে দিদি?

গিয়েছিলাম ফুল্টিঠাকরুনের কাছে। ডোয়া গাঁথা আজও হবে না, সেই কথা বলতে। পাড়ার মধ্যে রৈ-রৈ পড়ে গেছে। বের কর তো দেখি কেমন।

নেকলেশ এনে কাজলীবালা বোনের হাতে দিল। বোন বলে, ঝুটো বলে তো মনে হয় না। এত লোকের গরজ তবে কেন? এখন কিছু করে কাজ নেই। মানুষটা আসুক, সে-ই বা কী বলে শোনা যাক।

মানুষটা, অর্থাৎ ভগ্নিপতি শস্তুরাম। সারাক্ষণ চালের উপর বসে কাজ করে ছুপুরের পর ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি এল। বৃত্তান্ত শুনে খাওয়ার কথা মনে থাকে না, হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কাজলীর উপর খিঁচিয়ে ওঠে একবার: একটু যদি ঘটে বুদ্ধি থাকে! ফুল্টিঠাকরুনকে কেন দেখাতে যাস? তাকে বলা মানে তো খুলনা শহরে ঢোলসহরৎ করে জানান দেওয়া। দামি জিনিস যদি হয়, এ-কান সে-কান হতে হতে খাঁটি মালিকের কানে পৌঁছে যাবে। সে লোক তো হায়-হায় করছে, ছুটে এসে পড়বে তক্ষুনি। যার জিনিস সে নিয়ে যাবে, না দিলে পুলিস আসবে। কলা খেও তুমি তখন। এসব জিনিস হাত চিত করে নাচিয়ে আনে কেউ!

বকাবকি চলছে, কাজলীবালা তার মধ্যে চমক খেয়ে আর একটা কথা ভাবে। গয়না হারিয়ে ফেলেছে, সেই অসাবধান মালিকটির কথা। সত্যি যদি

দামি জিনিস হয়, সে তো পাগলিনী হয়ে বেড়াচ্ছে। আহা, টের পেয়ে যাক সেই মানুষ, গয়না ফেরত নিয়ে গলায় পরুক। কাজলীবালা যদি খোঁজটা পেত, ছুটে নিয়ে যার জিনিস তাকে দিয়ে আসত।

গোটা খুলনা শহর না হোক, যা ছড়িয়েছে সে-ও বড় কম নয়। সন্ধ্যাবেলা নীলু স্যাকরা চলে এসেছে। শম্ভুরামের সঙ্গে চেনা—অল্প কিছুদিন আগে শম্ভুরাম তার বাড়ির ঘর ছেয়ে দিয়ে এসেছে। বলে, বাড়ি আছ শম্ভুরাম? দেখি একবার জিনিসটা।

শম্ভুরাম আকাশ থেকে পড়ে: কোন জিনিসের কথা বলছেন, বুঝতে পারিনে তো।

নীলু হি-হি করে হাসে: বুঝতে ঠিকই পারছ বাপু। আজ সকালে যা কুড়িয়ে পেয়েছ। আমাকে দেখানোয় গণ্ডগোল নেই। বলি, মাটিতে পুঁতে রাখবার জিনিস তো নয়। গয়না পরে বউও তোমার ডোয়ামাটি লেপতে যাবে না। পারলে লোকে নানান রকম রটাবে। ব্যবস্থা কিছু করতেই হবে—তা আমি লোকটা কি দোষ করলাম? সোনা-রূপোর কাজ আমার—টিপিটাপে এমনি বন্দোবস্ত করব, কাক-পক্ষী জানতে পারে না।

শম্ভুরাম ভেবেচিন্তে দেখছে। করতে হবে কিছু, তড়িঘড়ি করে ফেলতে হবে। বাড়ি বয়ে এসেছে, কি বলে শোনা যাক।

নেকলেশ বের করে দেখাল। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে নীলু স্যাকরা মিইয়ে যায়, রেখে দাও, দিনমানে একসময় এসে ভাল করে দেখা যাবে।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে শম্ভুনাথ বলে, কি দেখলেন?

সোনা যদি হয়, তবে মরা-সোনা। না কষে সঠিক বলা যাচ্ছে না। পাথর নিয়ে এসে দেখব।

ঘণ্টা কয়েক পরে গভীর রাত্রে দরজায় টোকা। শম্ভুরামের নাম ধরে ডাকছে। ঘুম ভেঙে শম্ভুরাম ধড়মড় করে উঠল। মুখ শুকিয়েছে। কিন্তু সে-ভাব না দেখিয়ে শান্তভাবে গিয়ে দরজা খোলে। শম্ভুরামের বউও উঠে পড়ে দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়েছে। পিছনে গা ঘেঁষে কাজলীবালা।

কে ডাকে?

হরি, হরি—সে-ই নীলু স্যাকরা যে। আর-একদিন দেখবে বলে অবহেলা ভরে উঠে চলে গিয়েছিল, রাতটুকু পুইয়ে নতুন দিনও পড়তে দিল না।

সঙ্গে সুবেশ এক ভদ্রলোক। নীলু বলে, চেনো এঁকে? গৌরীপতিবাবু। ওঁকে ধরে নিয়ে এলাম।

জহুরী গৌরীপতি, মণি-রত্নের কারবারি। অতবড় মানুষটা নিশিরাত্রে শম্ভুরামের ঘরের দাওয়ায়। গয়নার কাচ ক'খানার ব্যাপারেই এসেছেন উনি। ঝুটো কাচ নয় তবে, গৌরীপতির এলাকার ভিতরের কিছু! শম্ভুরামের অতএব দেমাক দেখানোর সময় এইবার।

গৌরীপতি বলেন, বের করো একবার, দেখি।

জিনিস বাড়ি নেই বাবু। বিস্তর মানুষ আসছেন যাচ্ছেন, সেইজন্যে সরিয়ে দিলাম।

এই কষ্ট করে এলাম। দেখ দিকি।—গৌরীপতি গজর-গজর করছেন: নিজের কোট থেকে কোথায় সরাতে গেলে?

শম্ভুরাম চুপচাপ আছে।

গৌরীপতি বলেন, তা-ও বটে, আমি কি জন্যে জিজ্ঞাসা করতে যাই, আমায় কেন বলতে যাবে? তবে একটা কথা—গৌরীপতি এই একজনই, ষোলআনা ন্যায্য দাম আমি ছাড়া কেউ দেবে না। যেখানে সরিয়ে থাকো, সম্ভব হলে একবারটি এনে দেখিয়ে দাও। বড়-রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছি, গাড়িতে গিয়ে বসছি আমরা। গাড়িতে নিয়ে দেখাতে পার, অথবা খবর দিলে আবার এখানে আসব।

হেলাফেলার গয়না নয়, এবারে সঠিক বোঝা গেল। গৌরীপতির মতো মানুষ এই রাত্রে তা হলে গাড়ি হাঁকিয়ে আসতেন না। কাচগুলো সম্ভবত হীরে। স্যাকরার পো ঘুঘুলোক—এখানে উদাসীন ভাব দেখিয়ে গৌরীপতির কাছে চলে গিয়েছে। বাড়িতে নেই সেটা মিছে কথা। তবে বাক্সপেটরার ভিতরে নেই। চালের মধ্যে গুঁজে রেখেছে ভিতর দিক দিয়ে। চোর-ডাকাত কিম্বা পুলিস অথবা গয়নার মালিক এসে যত খোঁজাখুঁজি করুক, মই দিয়ে চালে উঠে ছাউনির কুটো সরিয়ে দেখতে যাবে না।

গৌরীপতিকে ডেকে নিয়ে এলো রাস্তার উপরের গাড়ি থেকে। টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিনি দেখলেন। কষ্টিপাথর নীলুর হাতে, কিন্তু পাথর ঠুকতে গেলেন না তিনি। বললেন, জানাজানি হয়ে যাচ্ছে। জিনিস ধরে রেখো না হে। ন্যায্য দাম যা হওয়া উচিত, তার উপর কিছু বেশি করে বলছি আমি। দিয়ে দাও।

শম্ভুরাম তাকিয়ে আছে। হীরের দামের তো লেখাজোখা নেই। গৌরীপতি ফিস ফিস করে নীলুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করেন। নীলু ঘাড় নাড়ল।

গলা খাঁকারি দিয়ে গৌরীপতি বললেন, তিন-শ সাড়ে তিন-শর বেশি হওয়া উচিত নয়। আমি পাঁচ-শ দেবো। এক-শ টাকার করকরে নোট পাঁচখানা। এক্ষুনি দেবো—নগদ নগদ!

ঘরের চালের উপর সারাদিন খাটাখাটনি করে শম্ভুরাম রোজ পায় একটাকা পাঁচসিকে। সেই মানুষ আপাতত একটি লাটবেলাট! হীরের দাম শোনা যায় তো অঢেল। এমন হীরেও আছে, একখানার মূল্যে রাজার রাজত্ব বিকিয়ে যায়। শম্ভুরাম গম্ভীরভাবে গৌরীপতির কথা শুনে গেল।

নীলু স্যাকরা বলে, দিয়ে দিচ্ছ তা হলে?

উঁহু। শম্ভুরাম ঘাড় নাড়ল: আর একজন এসে ছ-শ টাকা দর দিয়ে গেছে।

কোন আহাম্মক আছে, ছ-শ টাকা বলবে এই জিনিসের দাম? টাকা তো খোলামকুচি নয়।

নীলু বলে, আছে বাবু এক রকমের লোক, দর তুলে মাথা খারাপ করে দিয়ে যায়। সত্যি সত্যি কেনে না। চোখে দেখে গিয়ে সেই লোক আবার থানার এজাহার দেয়, অমুক জিনিসটা আমার চুরি হয়ে গেছে। কত রকমের ছ্যাঁচড়া মানুষ আছে দুনিয়ার উপর।

আবার বলে, শম্ভু মানুষটা বড় ভাল। আমার বিশেষ চেনা। তারই উপকারের জন্যে টেনে এনে কষ্ট দিলাম বাবু। কদর বুঝল না। আর কি হবে, চলুন—

কিন্তু গৌরীপতির যাওয়ার তত মন নেই। এক-পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বলেন, পছন্দের ব্যাপার তো—হতেও পারে। চোখে ধরলে তখন আর মানুষের হিসাবজ্ঞান থাকে না। আমি না-হয় দিচ্ছি সেই ছ-শ টাকা। এসেছি যখন, শুধু-হাতে ফিরব না।

শম্ভুরামও মনস্থির করে ফেলেছে। এক ধাপ্পায় যখন এক-শ টাকা উঠে গেল, না-জানি কত এর দাম! আরও সে চটে গেছে নীলু স্যাকরার ভয়-দেখানো কথায়। কাঁচা-ছেলে কেউ নয় রে বাপু—পুলিসের বাবাও সন্ধান পাবে না, গয়না এমনি জায়গায় সেরেছে।

নিয়ে নাও টাকাটা—

শম্ভুরাম সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে না। যে-মানুষ আগে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। এই দামে দিতে হয় তো তাঁকেই দেব।

গৌরীপতি চটে উঠলেন এবার: খুলনা শহরে আমার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে—নামটা কি শুনি?

নাম বলতে পারব না আজ্ঞে। সেই রকম কথা তাঁর সঙ্গে। কথা ভাঙব না।

বেশ, আমি যদি তার উপরে আরও পঞ্চাশ ধরে দিই।

নীলু স্যাকরা চোখ বড়-বড় করে বলে, রাগের বশে এটা কি করলেন বাবু। জিনিস কেনা কি লোকসান দিয়ে মরবার জন্যে?

গৌরীপতি কানেও তুললেন না। বলেন, সাড়ে-ছয় পেয়ে যাচ্ছ। কি বল এবার?

শম্ভুরামের মাথার মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে। আরও এখন চেপে থাকার দরকার। দাম নিশ্চয় অনেক বেশি। অনেক—অনেক—অনেক—

বলে, তা হলেও একবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমি খবর দেবো আপনাকে।

চলে যাবার মুখে গৌরীপতি বলেন, পুরো সাত-শ যদি দিই?

তিনিও তো উঠতে পারেন—সেই আগের মানুষ? আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু—

দরজা বন্ধ করে এলো। এর পরে ঘুম আসে না চোখে, কেউ শুতে যায় না। শম্ভুরামের বউ হেসে মাথার উপরের ফুটো চালের দিকে চেয়ে বলে, যাক রে বাবা। দু-দুটো বর্ষা জলে ভাসছি, এবারে ছাওয়া ঘরে শুয়ে বাঁচব।

ঘরামি মানুষ শম্ভুরাম—দশজনের ঘর মেরামত করে বেড়ায়, অথচ নিজের ঘরের চালে ফুটো নেই। বউ বলে বলে হয়রান। জবাব দেয়: আগে খাওয়া, তারপরে তো শোওয়া। পরের চালে উঠে উঠে খোরাকির জোগাড়টা হয়, নিজের চালে উঠতে গেলে সেটা যে বাদ পড়ে যাবে। দু-দিকের দুই হাঙ্গামা—একলা মানুষ সামাল দিই কেমন করে? বউয়ের আজ সকলের আগে সেই কথাটা মনে এলো, বর্ষার রাত্রে জল বাঁচানোর জন্যে বিছানাপত্র একবার এখানে একবার ওখানে টানাটানি করতে হবে না। হোক না বৃষ্টি ঝুপঝুপ করে, একঘুমে রাত কাবার।

বলছে তাই, নতুন ছাউনির ঘরে আরাম করে ঘুমিয়ে বাঁচব রে বাবা।

শম্ভুরাম বলে, ঘর ছাইতে কে যাচ্ছে?

তবে কি মাঠে থাকব? রুয়ো-আটন খসে খসে পড়ে যাবে এবারের বর্ষায়।

শম্ভু উল্লাস ভরে বলে, ঘর ভেঙে দালান হবে। সাত-শ আট-শ—সে যে একগাদা টাকা!

কাজলীবালা এদের মধ্যে একটি কথাও বলে না। সে-ও জেগে। সে ভাবছে, এই মূল্যবান জিনিসটা যে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে, তার অবস্থা। সকলে গঞ্জনা দিচ্ছে তাকে হয়তো। গল্প শুনেছে, কোন এক বউ জলে ঝাঁপ দিয়েছিল গয়না হারানোর দুঃখে।

পরের দিন শম্ভুরাম কাজে গেল না। ঘরামিগিরি করবে কি—বড়লোক এখন। দাম অর্ধেক-হাজারের উপরে উঠে গেছে, পুরো হাজার ঠিক উঠবে। চাই কি বেশিও উঠতে পারে—কতদূর উঠবে, কিছুই এখন বলা যায় না। শম্ভুরামের এক পরম বন্ধু খানিকটা লেখাপড়া জানে—তার কাছে বুদ্ধি নিতে গেল। বাড়ি ডেকে নিয়ে এসে চুপিচুপি দেখাল তাকে জিনিসটা। সে একেবারে আকাশে তুলে দেয়। কলকাতার সাহেব-জুয়েলার্সের বানানো জিনিস, নাম খোদাই তাছে সেই ফার্মের। ছ্যাঁচড়া কাজ করে না সে ফার্ম, বড়মানুষ ছাড়া সেখানে যায় না। ভালো রকম যাচাই করে দেখে তবে জিনিস ছেড়ো, এই এক জিনিসে কপাল ফিরে যাবে। কলকাতায় চলে যাও না হে—শহরের রাজা কলকাতা। কালোবাজার, সাদাবাজার, সাচ্চা কারবারি, ঝুটো কারবারি—সব রকম সেখানে।

সারাদিন ভাবনা-চিন্তা, শলা-পরামর্শে কেটেছে। কলকাতায় যাওয়াই ভালো। অসংখ্য খদ্দের—উচিত মূল্য মিলবে। বন্ধুটিও সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে। তার আগে এ-জায়গার সবচেয়ে বড় দোকান স্বর্ণভবন—পায়ে পায়ে শম্ভুরাম সেখানে চলে গেল। তারাই বা কি বলে শোনা যাক।

কি চাই ?

মালিকমশায়ের সঙ্গে কথা বলব একটু।

কর্মচারীটি চকিত হয়ে আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে। এই ধরনের মানুষ—ছেঁড়া জামা, তালি-দেওয়া জুতো, তৈলহীন রুক্ষ চুল, নাপিতের পয়সার অভাবে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—কিন্তু মানুষটা ছেঁড়া জামার পকেটে হয়তো সাত রাজার ধন নিয়ে ঘুরছে। নগদ পাঁচ-দশ টাকা হলেই দিয়ে চলে যাবে।

সসম্ভ্রমে সে আহ্বান করল : এই যে—পাশের ঘরে। চলে আসুন।

মালিকমশায় বৈষ্ণবদাস খুব খাতির করে বসালেন : জিনিস আছে বুঝি ?

শম্ভুরাম বলে, কুড়িয়ে পেয়েছে বাড়ির একজন।

হেসে বৈষ্ণবদাস বলেন, কুড়িয়ে পেয়েছে কি অন্য কোন ভাবে এসেছে তাতে আমার গরজ কি ? দামের সেজন্য ইতরবিশেষ হবে না। এনেছেন ?

সঙ্গে নিয়ে ঘোরাঘুরি করবার জিনিস নয়—গর্বভরে শম্ভুরাম বলল, দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে হবে আমার বাড়ি। তাই সকলে দিচ্ছেন।

বটে! বাড়ি কোথায় আপনার ? কারা সব গিয়েছে ?

শহরের সেরা যাঁরা, তাঁদেরই দু-তিন জন। হেজিপেজিরা গিয়ে কি করবে ?

বৈষ্ণবদাস গম্ভীর হয়ে বলেন, দর কি রকম বলে ?

শম্ভুরাম বলে, বলুনগে যা খুশি। আমি দু-হাজারের নিচে নামতে পারব না মশায়।

সবিস্ময়ে বৈষ্ণবদাস চোখ তাকিয়ে পড়লেন : এমন জিনিস ?

দেখতে প যদি যান দয়া করে। সাহেববাড়ির জিনিস—হীরেই তো আট দশখানা।

রাত্রে ভাল ঠাহর হয় না। কাল ভোরবেলা আমি বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। কতটুকু আর পথ! তার আগে মাল যেন বেহাত না হয়। এই কথা রইল।

বুড়োমানুষ বৈষ্ণবাস ভাল করে সকাল না হতেই হন্তদন্ত হয়ে শম্ভুরামের বাড়ি হাজির হয়েছেন। কিন্তু নেকলেশ সরে গেছে—চালের কুটোর মধ্যে নেই সে জায়গায়। মাথায় হাত নিয়ে বসেছে শম্ভুরাম। বউ কপাল চাপড়াচ্ছে।

কাজলীবালাও নেই।

আগের দিন শম্ভুরাম যখন স্বর্ণভবনে গেছে, এদিকে এক রহস্যময় ব্যাপার। কাজলীবালা বাড়ির গলিতে ঢুকছে, মুখের উপর ঘোমটা-ঢাকা অচেনা একজন হাতছানি দিয়ে ডাকল।

তুমি কাজলীবালা তো ? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, শুনে যাও।

কাজলীবালা অবাক হয়ে বলে, আমি তো জানি না আপনাকে—

ঘোমটা এখন কমেছে কিছু। অপরূপ সুন্দরী, কাজলীর দিদির বয়সি হবেন। বড়ঘরের বউ নিশ্চয়—ভালভাবে থাকেন, ভরভরন্ত গড়ন।

কাজলীবালা বলে, আপনি আমায় চিনলেন কি করে ?

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বউ বলে, গরজ বলেই চিনতে হয়েছে। নেকলেশ কুড়িয়ে পেয়েছ নাকি তুমি, অনেকের মুখে তোমার নাম।

আরও একটি খদ্দের—সন্দেহ নেই। ভাগাড়ে মরা-গরু পড়লে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জাহির করতে হয় না—কাক-শকুন-শিয়ালের মধ্যে আপনি খবর পড়ে যায়। তেমনি সব এসে খোঁজাখুঁজি করছে।

কাজলীবালার স্বর কঠিন হয়ে উঠল। বলে, বিক্রি করব না। গোড়ায় সামান্য জিনিস ভেবেছিলাম, তখন এত বুঝে দেখেনি। পরের জিনিস বিক্রি করে টাকা নেওয়া—সে তো চুরি। গরিব-দুঃখী আছি, চোর কেন হতে যাব ? যার জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে দেব।

বউ বলে, সে মানুষ পাবে কোথায় খুঁজে ?

তারই বেশি গরজ। কানে পড়লে খোঁজে খোঁজে চলে আসবে—এই যেমন আপনি এলেছেন। খবরের কাগজে ছেপে দিলে নাকি অনেকের চোখে পড়ে। পয়সা থাকলে তাই করতাম।

বউ শিউরে উঠে বলে, ওসব করতে যেও না, কখনো না। যার জিনিস তাকে খুঁজে পাবে না। পণ্ডশ্রম। সে মানুষ ধরা দেবে না।

কেন?

কি জানি—। বউ ইতস্তত করে যেন এক মুহূর্ত। বলে, হয়তো প্রকাশ হতে দিতে চায় না ঐ জায়গায় সে গিয়েছিল। গয়না হারানোর অন্য কোন গল্প রচনা করে দিয়েছে ইতিমধ্যে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখে তাকিয়ে কাজলীবালা বলে, আপনি জানলেন কি করে?

অনুমান—

কাতর হয়ে বউ বলে উঠল, চারিদিকে বড্ড চাউর হয়ে যাচ্ছে, ওটা আমায় দিয়ে দাও। বিক্রি করতে চাও না, দামও আমি দেবো না। কাপড়চোপড় কিনো, মিষ্টিমিঠাই খেও, সেইজন্য কিছু ধরে দিচ্ছি।

যা ভেবেছিল—খদ্দেরই ইনি। কিছুমাত্র আর সন্দেহ নেই। চালাক খদ্দের—সস্তায় নেবার জন্য কায়দা করে ভিন্ন ভাবে কথা বলছে।

কাজলীবালা বিরক্তভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, কথা একই, বিক্রির রকমফের। আমি দেবো না।

তবে ফেলে দিয়ে এসো গাঙের জলে। আমায় না দাও, দু-জনে এক সঙ্গে গিয়ে জলে ফেলে আসি।

মহিলাকে অগ্রাহ্য করে কাজলীবালা ঘাড় ফিরিয়ে ফরফর করে সুঁড়িপথে ঢুকে পড়ল। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্দিকে খবরটা চাউর হয়ে যাচ্ছে, শম্ভুরামও সেজন্য বিচলিত। বন্ধুকে নিয়ে কলকাতা রওনা হবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—সেটা কাল কিম্বা পরশু, তার ওদিকে নয়। রাত থাকতেই কাজলীবালা নেকলেশ চুপিসারে বের করে নিয়ে থানায় চলল। সকলের মাথার উপর সরকার বাহাদুর—তাঁদের জিম্মায় দিয়ে নিশ্চিন্ত। খবরের-কাগজে ছেপে কিম্বা যেভাবে হোক, মালিকের খোঁজ করে দিনগে তাঁরা। পরের জিনিষ বাড়ি এনে কাজলীবালা মহাপাপ করেছিল, সেই পাপের মোচন হয়ে গেল।

সেটা হয়তো হল, কিন্তু কাজলীবালার ছাড় হয় না। এই চেহারা, এই পোশাক—তার মুঠোর ভিতরে এমন দামী জিনিসটা! থানাওয়ালারা তোলপাড়

লাগিয়েছে : কোথায় পেয়েছিস, বল্ সত্যি কথা। এমন জিনিসটা হারিয়ে ফেলে মালিক লোকটা থানায় এজাহার দিল না বললেই অমনি বিশ্বাস করব? কোন মুলুক থেকে চুরি করে এনেছিস, তাই বল্। সাঁড়াশি দিয়ে পেটের ভিতরের কথা আমরা টেনে বের করতে জানি। নিজের ইচ্ছেয় কদ্দূর কি বলিস, শুনে নিই আগে—সে পথ তারপরে তো আছেই। সরকার মাইনে দিয়ে এমনি-এমনি থানার উপর পোষে না আমাদের।

পুলিসের একটা দল কাজলীবালাকে নিয়ে শম্ভুরামের বাড়ি চলল। মজার গন্ধ পেয়ে পথের মানুষও জুটেছে। এমনিতরো আরও কিছু জিনিস মেলে কিনা দেখবে তল্লাসি করে। কাজলীবালা আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে : ও দিদি, ও দাদাবাবু, আমায় আটকে রাখবে। মারধোর দেবে। জামিনের ব্যবস্থা কর, জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আন। জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে জমা দিতে গিয়েছি—আমি তো মন্দ কিছু করিনি।

শম্ভুরাম শুনতে পায় না, কানে বোধ হয় ছিপি-আঁটা। শম্ভুরামের বউ বলছে, আমরা কিছু জানিনে হুজুরমশায়রা। বোন একরকম বটে, কিন্তু আমার সংসারের কেউ নয়। রীতিচরিত্রের দোষে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে—না খেয়ে ভিখারির হাল হয়ে এসেছিল, দয়া করে ঠাঁই দিয়েছি। দেওয়া খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। দিন আনি দিন খাই, ঝঞ্ঝাটঝামেলায় যেতে পারব না। যা ইচ্ছে আপনারা করুন গে।

আবার তাকে থানায় নিয়ে তুলল। যা গতিক, বাড়ি রেখে গেলেও ঝেঁটিয়ে বের করে দিত। কাজলীবালা হাপুস নয়নে কাঁদছে। হারাধন মোক্তার কি কাজে এই সময়টা থানায় গিয়েছেন। কী ব্যাপার, মেয়েটা কাঁদে কেন? করুণা হল মোক্তার মশায়ের। বললেন, জামিন হয়ে আমি সইসাবুদ করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে চল্।

হারাধন তারপর নিজে শম্ভুরামকে বলেকয়ে দেখছেন। কাজলীর নাম শুনলেই বোন-ভগ্নিপতি মার-মার করে ওঠে। অত্যন্ত স্বাভাবিক। এত বড় মুনাফা ফসকে গেল মেয়েটার দুর্বুদ্ধির জন্য। ঘরামি শম্ভুরামের জীবনে তাহলে আর চালের উপর উঠতে হত না, পায়ের উপর পা রেখে বাবুমানুষের মতো দিব্যি দিন কেটে যেত।

বলে যাচ্ছেন হারাধন হালদার—বলাধিকার তগ্গত হয়ে শুনছেন। নানান ফরমাসে বারম্বার সামনে ডাকেন মেয়েটাকে। তালপাতার সেপাই—আঙুলের টোকায় বোধকরি মাটিতে লুটাবে। সেই মেয়ের মনের এমন বল অত টাকার লোভ অবহেলায় ঝেড়ে ফেলে দিল।

হারাধন-মোক্তার বলেন, সাহেব-বাড়ির গয়নার শেষ গতিটা শুনবেন না? সেই নেকলেশ অনাদি সরকারের বউয়ের গলায়। সরকারমশায় তখন সদর থানায়। প্রোমোশান পেয়ে তারপরে আপনারই পাশে ঝিনুকপোতায় চলে গেলেন। ঝিনুকপোতার বড়বাবু। তাঁর বউয়ের গলায় উঁকি মেরে দেখবেন, হীরের নেকলেশ ঝিকঝিক করছে। আপনার ছোট মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নে তিনিও তো গিয়েছিলেন—আপনি না দেখে থাকেন, বাড়ির মধ্যে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁরা ঠিক দেখেছেন।

সরকারি নিয়মানুযায়ী কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল—মূল্যবান নেকলেশ পাওয়া গিয়াছে, মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দর্শাইয়া লইয়া যাউন। নোটিশ লটকে দেওয়া হল সমস্ত সদর জায়গায়। মাসের পর মাস যায়। একটা মানুষ এসে হুঁ-হাঁ করল না।

কী করা যায়?

কোর্ট হুকুম দিল, নিলামে তোলা হোক বস্তুটা। বিক্রির টাকা সরকারে জমা হবে। এইবারে অনাদি সরকারের তদ্বির। সে যে কী ব্যাপার, বর্ণনায় বোঝানো যাবে না? সমুদ্র-মন্থনে জলের আলোড়ন হয়েছিল—অনাদি সরকার জল-স্থল-অন্তরীক্ষ তোলপাড় করে তদ্বিরের ব্যাপারে। যে তদ্বিরের শক্তিতে বি, এ, এম, এ, পাশদের টপাটপ ডিঙিয়ে ঝিনুকপোতার মতো থানায় সে বড়বাবু। অনাদি বলল, শখের জিনিষটা পায়ে হেঁটে একবার যখন থানায় উঠেছে, ফেরত যেতে দিচ্ছিনে।

যা বলল, ঠিক তাই। যথারীতি নিলাম হয়ে সর্বোচ্চ ডাক আড়াই-শ টাকায় শৈলবালা দেবী জিনিষটা পেলেন। শৈলবালা হলেন অনাদি সরকারের বাড়ির পুরানো রাঁধুনী—ভাল কাপড়চোপড় পরিয়ে টাকা হাতে দিয়ে তাকে নিলাম ডাকতে পাঠাল। এছাড়া আরও দুটি খদ্দের ছিলেন, ডাকাডাকি করে দর বাড়ালেন। দুজনেই মহিলা। মহিলা ছাড়া এই বাজারে নগদ টাকা বের করে গয়না কিনতে যাবে কে? তাঁরা হলেন উমাশশী ভড় আর বীণা চক্রবর্তী। উমাশশী অনাদির বাড়ির চাকরানি, আর বীণা চক্রবর্তী হলেন অনাদির পরম অনুগত জমাদার হেমন্ত চক্রবর্তীর বউ। বীণা ডাক পেলেও বস্তুটা অনাদির বাসায় আসত।

কেস তো কিছুই নয়—কাজলীবালা জামিনে মুক্ত ছিল, এইবারে সম্পূর্ণ ছাড় হয়ে গেল। অধিকন্তু সদাশয় হাকিম নেকলেশের মূল্য থেকে দশ টাকা তাকে দিতে বললেন। হারাধন মোক্তারের উপর কৃতজ্ঞতার অবধি নেই—জামিন হওয়া থেকে শেষ অবধি মামলা চালানো তিনিই করেছেন। টাকা এনে

কাজলীবালা তাঁর হাতে দিল। কিন্তু মোক্তারি ফী এবং আনুষঙ্গিক খরচ-খরচায় পাওনা তো বিস্তর—দশটা টাকায় কি হবে? পুরানো ঝি দেশে চলে যাওয়ায় কাজলীবালা তার জায়গায় কাজ করেছে—সেই কয়েক মাসের মাইনে যোগ দিয়েও অনেক বাকি থেকে যায়! পুরানো ঝি এসে গেছে, কাজলীবালাকে দরকার নেই—কিন্তু পাওনা আদায়ের কি হবে, তাই ভেবে হারাধন ইতস্তত করছেন।

ছোটমেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর থেকে জগবন্ধুর বাসা ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনি তবু কাজকর্মে বাইরে বাইরে থাকেন, ভুবনেশ্বরীর একলা ঘরে মন টেঁকে না। কথাটা হারাধন মোক্তারের কানে গেছে। তিনি তাই প্রস্তাব করলেন: দরকার থাকে তো আপনি নিয়ে যান বলাধিকারীমশায়। এমনি ভাল, ঝিয়ের কাজ ভালই করবে। আমার প্রাপ্যটা দিয়ে যান, মাইনে থেকে মাসে মাসে শোধ করে নেবেন।

না—। বলে জগবন্ধু সজোরে ঘাড় নাড়লেন। বলেন, ঐ জাতের মেয়েকে ঝি করে রাখব এত বড় শক্তি আমার নেই, বড়বউয়েরও নেই—

পরক্ষণে বলে উঠলেন, রাখব, রাখব। ঝি মানে তো মেয়ে। মেয়ে ক'টির বিয়ে হয়ে গেল—কাছেপিঠে আর এক মেয়ে ঘুরেফিরে বেড়াবে। বোঁচকাবিড়ে বেঁধে নে কাজলীবালা, নিজের বাসায় যেতে হবে।

হাসপাতালে নিয়ে তুলেছে বলরামকে। হাকিম এসে জবানবন্দি নিয়ে গেলেন। কাপ্তেন বেচারামের নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেল। হুলিয়া অমন কতবার বেরুল। ইচ্ছে হল তো হঠাৎ একদিন বেচরাম গটগট করে আদালতে ঢুকে হাকিমের সামনে নমস্কার করে দাঁড়ায়। নিজের পরিচয় দেয়। দু-চার কথার পরেই হাকিম চেয়ার দিতে বলেন আসামিকে। মহাশয়-লোক কাপ্তেন মল্লিক, খাসা কথাবার্তা। অপরাধ শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় না। তদ্বিরে অতি নিখুঁত বন্দোবস্ত, ছাড়া পেয়ে সে বেরিয়ে আসে। বুড়ো হয়ে তো মরতে চলল, এতকালের মধ্যে জেলে গিয়েছে দু-বার কি তিনবার। অথচ এই বেচারামের অনেক চ্যাংড়া সাগরেদও পাঁচ-সাত-দশবার ঘুরে এসেছে। দু-তিনবার কাপ্তেন যা গিয়েছে—তা-ও নাকি নিতান্ত শখের যাওয়া। বউয়ের উদ্বেগ ঠাণ্ডা করবার জন্য। বড়বউ মাথার দিব্যি দিয়েছিল: শরীরগতিক খারাপ হয়ে যাচ্ছে, জিরান নাও কিছুদিন। একটা মরশুম চুপচাপ বসে থাক। এত সব দায়দায়িত্ব—বাড়িতে থেকে জিরান নেওয়া অসম্ভব। লোকে তা হতে দেবে না। অতএব রাজকীয় আশ্রয় নিতে হয়। সেকালের রাজারা

গুণিজন প্রতিপালন করতেন। একালেও করেন। উঁচু পাঁচিলের ঘেরে লাল ইটে-গাঁথা ঝকঝকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছেন গুণীদের আহার ও বিশ্রামের জন্য। বার দুই-তিন সেখান থেকে বেচারাম দেহ মেরামত করে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু এবারে আর তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। নিখোঁজ বেচারাম। দেহঘটিত অস্বাস্থ্য নেই, বড়বউ নিশ্চয় কিছু বলেনি। তা বলে জগবন্ধু শুনছেন না। সুযোগ যখন মিলেছে, দল ধরে উৎপাত করবেনই তিনি। যত রকমে পারেন, চেষ্টা করেছেন। ঝিনুকপোতার অনাদি সরকার সঙ্গে সঙ্গে আছেন বটে, থাকতে হয় তাই আছেন—তাঁর তরফের চাড় কিছু দেখা যায় না। জগবন্ধুকে সদুপদেশ দেবার চেষ্টা করেন: আমাদের হল সরকারী চাকরি, আপন নিয়ে চাকা ঘুরে প্রমোশান। কাজ করলে যা, না করলেও তাই। চাকরি রক্ষে করতে যেটুকু হৈ-চৈ-এর দরকার, তাই করুন মশায়। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে আখেরে পস্তাবেন।

জগবন্ধু কানে নেন না, ঘৃণায় রি-রি করে সর্বদেহ। ঘুসেল লোক এরা, বউয়ের গলায় হীরে নেকলেশ পরিয়ে তাই আবার জাঁক করে দেখায়। সরকারের বদনাম এই সব অসৎ অফিসারদের জন্য। অনাদির সাহায্যের পরোয়া না করে একাই লড়ে যাবেন তিনি! বেচারামের খোঁজ হয়নি, তবে সাথী-সাগরেদ কয়েকটা ধরা পড়েছে। বেচারামের অনুপস্থিতিতে এই ক'জনকে নিয়ে বিচার চলবে। বলরামটা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে কাঠগোড়ায় দাঁড়ানোর অপেক্ষা। চেষ্টা হচ্ছে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলবার। হাসপাতালে দোতলার আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে সতর্ক প্রহরায়।

জগবন্ধুর পক্ষে একনাগাড়ে ছেড়ে থাকা চলে না—থানা আর সদর করে বেড়াচ্ছেন। ক্ষুদিরাম সদরেই পড়ে আছে। মানুষটা এদিক দিয়ে বড় সাচ্চা। কাজ একটা ঘাড় পেতে নিলে তখন আর তঞ্চকতা করবে না। রূপকথার দৈত্যের মতো—দৈত্য, তুমি কার? কাল ছিলাম অমুকের, এখন তোমার। হুকুম হলে বিনা প্রশ্নে সেই মনিবের ঘাড় ভেঙে এনে দেবে। ক্ষুদিরাম তাই। বেচা মল্লিকের বিপক্ষে মামলা সাজানোর যা সব কল-কৌশল খাটাচ্ছে, বাঘা-বাঘা উকিলের তাক লেগে যায়। উকিল হাঁ হয়ে থাকে।

ক্ষুদিরাম মুচকি হেসে বলে, আদালতের আমলা ছিলাম যে! আদালত-বাড়ির টিকটিকিটাকে জিজ্ঞাসা করুন না—টিকটিক করে সে-ও মামলায় যুক্তি দিয়ে দেবে।

এজলাসে রীতিমতো একটা জাঁকালো মামলা উঠেছে অনেকে দিনের পর। কিন্তু আশায় ছাই—খানিকটা সুস্থ হয়ে বলরাম হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে!

ক্ষুদিরাম হায়-হায় করে জগবন্ধুর থানায় এসে পড়ল। কোর্টে দাঁড়াবার আতঙ্কে দোতলার বারাণ্ডা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালাল, অথচ বেচা মল্লিকই কোন কৌশলে নিয়ে বের করেছে, সঠিক বলবার জো নেই।

মূল-আসামি ফেরারি, তার উপরে মূল-সাক্ষি পলাতক। এত কষ্টে গড়ে-তোলা মামলার পরিণাম যা হবে, বুঝতে বাকি থাকে না। কপালে ঘা দিয়ে জগবন্ধু হন্তদন্ত হয়ে সদরে ছুটলেন। হাকিমের কাছে অবস্থা নিবেদন করে লম্বা সময় নিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর থানায় ফিরবেন, না বলরামদের সেই গাঁয়ে সোজাসুজি গিয়ে উঠবেন, তোলাপাড়া করেন মনে মনে। হবে না কিছুই ---'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ' এই নিয়মে খোঁজাখুঁজি করা শেষবারের মতন।

সদরে এসে জগবন্ধু হারাধন মোক্তারের বাসায় ওঠেন। কী একটু আত্মীয়তা আছে বুঝি তাঁর সঙ্গে। চুপিচুপি হারাধনকে বলে নৌকাঘাটের অভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন জগবন্ধু। এই অবধি জানা। তারপরে আর কোন সন্ধান নেই।

মূল-আসামি এবং মূল-সাক্ষি গায়েব, তার উপরে সরকার-পক্ষের যিনি প্রধান তদ্বিরকারক, তিনিও নিরুদ্দেশ হলেন। আনাদি রটাচ্ছেন: গা-ঢাকা দিয়েছেন ভদ্রলোক ইচ্ছা করে। এ রকম হবে, আগেই জানতাম। সেই জন্য খুব বেশি গা করিনি।

বলাবলি হচ্ছে: মানুষটি রাঘববোয়াল তো! অন্যের সঙ্গে বিশ-পঞ্চাশে হয়ে যায়, ওঁর গর্ত ভরাট করতে পাহাড়-পর্বত লাগে। মেয়ের বিয়ের সময় দশেধর্মে দেখছে। এবারের এত তোড়জোড় আর ছুটোছুটি—সে কেবল দর বাড়ানোর জন্য। বন্দোবস্ত একদিনে সারা, বেচা মল্লিকের সঙ্গে দরে পটে গেছে। এখন আর জগবন্ধু দারোগাকে পাবে কোথা? চুক্তিই যে তাই।

পাওয়া গেল জগবন্ধুর থানা থেকে একবেলার পথ এই ফুলহাটা গ্রামে। নীলকুঠির ভাঙাচোরা অট্টালিকায়, অট্টালিকার ছাতের উপরে।

চলো একদিন দেখে আসা যাক কুঠিবাড়ির ভিতর গিয়ে।

দশ

একদিন সাহেব আর নফরকেষ্ট নীলকুঠিতে ঢুকে পড়ল। কত বাহার ছিল এই জায়গার! ফুলহাটা ইণ্ডিগো-কনসারনের নাম সমুদ্র পার হয়ে চলে গিয়েছিল। বিশেষ বিশেষ পালপার্বনে আশপাশের সকল কুঠি থেকে সাহেব-মেমরা এসে জমত, আমোদস্ফূর্তি হত। নাচ হত বলে তক্তার মেজে নিচের হলঘরটায়।

তক্তা উই ধরে নষ্ট হয়ে গেছে, কতক বা লোকে খুলে নিয়ে এ-কাজে সে-কাজে লাগিয়েছে। কিম্বা উনুনে পুড়িয়েছে। বড় বড় বট-অশ্বত্থ তেঁতুল ও আমগাছ, ডালে ডালে জড়াজড়ি। দিন-দুপুরেই রাত দুপুরের মতো লাগে।

যেতে যেতে নফরকেষ্ট সহসা থমকে দাঁড়ায়, চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে পড়ে: ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দেহখানা পাথর করে ফেললাম। কাজ নাকি নেই। হায় রে হায়, এ রকম আহা-মরি জায়গা থাকতে কাজ খুঁজে পাইনে।

তাকিয়ে আছে অট্টালিকার দিকে নয়, অট্টালিকার লাগোয়া প্রাচীন দীঘির দিকে। কুঠির-দীঘি যার নাম। ঘাটের চিহ্নমাত্র নেই, কসাড় জঙ্গল চতুর্দিকে। হঠাৎ দেখে ভ্রম হবে—দীঘিই নয়, পতিত মাঠ একটা। গরু ছেড়ে দিলে বোধকরি মাঠের উপর চরে খাবার জন্যে নেমে পড়বে।

নফরকেষ্ট বলে, ছিপে মাছ ধরব এখানে।

মাছ ধরতে জান তুমি ?

মাছ কেন, মানুষ অবধি ধরিনি ? সুধামুখী জানে সব, তুইও কি আর জানিসনে ! অমন যে বেয়াড়া বউ, টোপ গেঁথেই তো তাকে হিড়হিড় করে টেনে আনলাম।

ফাঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, ডাঙায় তুলে—থুড়ি, শহরে এনে তুলে তখন পস্তাই। মাছ নয়, মেয়েমানুষও তো নয়—কামট। কামট জানিসনে—কুচ করে অঙ্গ কেটে নেয়, সাড় হবে জল থেকে ডাঙায় উঠে পড়লে তখন। ভয় হয়ে গেল। রোজ রাত্রে শোবার সময় ভাবতাম, সকালে উঠে যদি দেখি একখানা হাত কি পা কিম্বা মুণ্ডুটাই কেটে নিয়েছে। ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি হাত বুলিয়ে দেখতাম, সবগুলো অঙ্গ ঠিক আছে কিনা।

জঙ্গলের ভেতর গুঁড়ি মেরে মেরে দীঘির একেবারে কিনারা অবধি চলে গেল! তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। দামে এঁটে গিয়ে জল বড় চোখে পড়ে না। তার মধ্যে যা দেখবার দেখে নিয়ে সাহেবকে বলে, হয়ে গেছে।

কি ?

ভারী ভারী সোলমাছ। পোনা ছেড়েছে। সোল-মারা ছিপ বানিয়ে নেবো। কাউকে কিছু আগেভাগে বলবিনে। খেয়েদেয়ে সকলকে দেখিয়ে শুয়ে পড়ব, তারপরে টিপিটিপি বেরুব দু-জনে। সোল ধরা বড্ড সোজা রে—জলের রাজ্যে অমন হাঁদারাম মাছ আর একটা যদি থাকে! তোকে শিখিয়ে নিতে একটা বেলাও লাগবে না।

ঢোক গিলে নিয়ে বলে, অন্য কাজে যেমন হয়েছে—আমায় ছাড়িয়ে উপরে চলে যাবি। অনেক উপরে। আমি তাতে খুশিই।

শেওলার ভিতরে এক এক জায়গায় সোলের পোনা কিলবিল্ করছে। ভাসে মুখ তুলে, পলকে ডুবে যায়, আবার ভাসে—এই খেলা। এক ধাড়ির যত পোনা সমস্ত এক জায়গায়, ধাড়ি মাছ পাহারায় আছে। কিন্তু হলে হবে কি—পোনা ছাড়ার পর ধাড়ি লোভী ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। টোপ সামনে পেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, তক্ষুনি গিলবে।

মাছ হোক আর না-ই হোক, সাহেব পরোয়া করে না। নিশাকালে সকলকে চুরি করে বেরুনোটাই লোভের ব্যাপার। বেরিয়ে এসে কুঠি-বাড়ির জঙ্গলে ভাঙা অট্টালিকায় জন্তুজানোয়ারের আস্তানার পাশে কাঁটাঝিটকে-কালকাসুন্দে ভাঁট আশশ্যাওড়া সন্তর্পণে সরিয়ে সরিয়ে লম্বা ছিপ হাতে পাড়ের উপর নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা। প্রাচীন মহীরুহেরা ডালে ডালে আকাশ ঢেকে আছে। নীচের স্তূপীকৃত অন্ধকারের উপরে জোনাকির ফিনকি ফুটছে। তেঁতুলগাছের চূড়ায় পেঁচা ডেকে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। তক্ষক ডাকে নাচঘরের কড়িকাঠের কোটরে। বাদুড় উড়ে উড়ে দীঘির এপার ওপার করছে। বড় মজা, বড় চজা!

সাহেব মেতে উঠল। নফরকেষ্টর সঙ্গে তলতাবাঁশের ঝাড়ে ঝাড়ে ঘুরে পছন্দসই ছিপ কাটে। হাটে গিয়ে সুতো-বড়শি পছন্দ করে কিনল। টোপ সংগ্রহ করে। নফরকেষ্ট বারম্বার সামাল করে দেয়: কারো কাছে বলবিনে কিন্তু সাহেব। মাছ হলে রাত্রিবেলা ডেকে জাঁক করব। না হলে তো বেকুব—লোকের ঠাট্টাতামাসা কেন সইতে যাব?

রাত দুপুর। আলো নেই, জনমানবের শব্দসাড়া নেই। বড় সোলমাছ গাঁথে এই সময়। তলতাবাঁশের ছিপ বেধড়ক লম্বা—আঠার-বিশ হাত অন্তত। সুতো খুব মোটা—সোলো সুতা নাম হয়েছে সোলমাছ ধরার জন্য বিশেষ ধরনে পাকানো এই সুতোর। বড়শিও রীতিমতো মোটা। ভাঁড় ভরতি টোপ জোগাড় করে রেখেছে—ক্ষুদে-বেঙ। একটা করে বেঙ বড়শিতে গেঁথে ছুঁড়ে দিচ্ছে যতখানি দূরে যায়। জলের উপর দিয়ে তরতর করে আলগোছে টেনে নিয়ে আসে কাছের দিকে। নাচিয়েই যাচ্ছে বেঙ, আরাম-বিরাম নেই। হাত টনটন করছে, মাছ কিছুতে লাগে না, কি হল? বিড়বিড় করে চলতি ছড়া বলে মাছ ডাকছে: আমার নাম ইলসে, টপাস করে গিলসে:

অনেকক্ষণ ধরে এমনি করতে করতে হুড়ুম করে দূরের জলে আকালি। দয়া হল তবে মাছের বেটার, টোপ নজরে পড়ল? হাতের টনটনানি কোথায় উপে যায়—মত্ত হস্তির জোর ডান-হাতখানায়। টোপ ছুঁড়ে দেয়, কাছে টেনে টেনে আনে। ফেলছে আর তুলছে। জীবন্ত বেঙ চাই—একটা বেঙ যেই

মরে গেল, ফেলে দিয়ে নতুন একটা গাঁথে। চলে এমনি? হঠাৎ বাঘের আক্রমণের মতো দামের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠে বড়শি সুদ্ধ বেঙ গিলে ফেলল। অসহ্য পুলকে সাহেব দু-হাতে টান দেয়। সুতো ছিঁড়বার শঙ্কা নেই—কিছুতেই না। খলখল করে মাছ আসে টানের সঙ্গে। আসতে কী চায়, কী জোর সোলমাছের গায়! এই কিন্তু হয়ে গেল—এই জায়গায় কিম্বা আশে-পাশে আজ আর মাছ উঠবে না। যত মাছ সামাল হয়ে গেল। গরজও নেই, চলে যাবে সাহেব এইবার।

খানিকটা দূরে ডাইনের জঙ্গল থেকে মানুষের গলা। আরে, বংশীর গলা যে—মাছ মারতে সে-ও জঙ্গলে ঢুকে আছে। বলে, উঠে গেল ডাঙায়?

এক অপরিচিত কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে বাঁয়ের দিক থেকে। কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না—বংশীর দেখাদেখি সে মানুষটাও বলে উঠল, কতবড় মাছ রে বাবা, দত্যিদানোর মতো হুল্লোড় লাগিয়েছে—

সোলমাছ পোনা ছেড়েছে, ধরবার এই মহেন্দ্রক্ষণ—ব্যাপারটা নফরকেষ্ট একলাই দেখেনি। ডাইনে-বাঁয়ের এই দুটি এবং দীঘির চতুর্দিকে জঙ্গলের অন্ধকারে আরও কত জনা ঘাপটি মেরে আছে. ঠিক কি! কথা বলা মাছুড়ের পক্ষে অপরাধ, মরে যাবে তবু টু শব্দটি হবে না। কথাবার্তায় মাছ সরে যায়। সে ক্ষতি একলা তোমার নয়, যত এসে ছিপ হাতে বসেছে সকলের। বংশী এবং বাঁ-দিকের লোকটা দীর্ঘক্ষণ বসে বসে নিরাশ হয়ে উঠি উঠি করছে, এমনি সময় সাহেবের মাছ ধরার আওয়াজে দেহমন দাউ দাউ করে উঠল। ঈর্ষায় জলেপুড়ে মাছুড়ের নিয়ম ভেঙে সশব্দে বলে, উঃ, কত বড় মাছ!

বংশী এবং সেই লোকটা ছিপ গুটিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সাহেবের কাছে সত্যিই মাছ দেখতে এল: দেখি গো, দেখি। ওজনে কী দাঁড়াবে, মনে হয়?

বংশী বলে, কপাল বটে তোমার সাহেব! খাসা মাছখানা গেঁথেছ। বিস্তর পুরানো—সাহেব-মেমরা দীঘির জলে ঝাঁপাঝাঁপি করত তাদের গায়ের তেল-সাবান খেয়েই এই চেহারা।

উঠবে নাকি, না দেরি আছে তোমার? নফরকেষ্টর উদ্দেশে সাহেব ডাক দেয়। দু-জনে একসঙ্গে বেরিয়েছে—দীঘির পাড়ে পৌছানোর পর আর তখন সম্পর্ক নেই। যে যার পছন্দমত জায়গা নিয়ে নিল।

সাহেব পুনশ্চ ডাকে: আমি চললাম, যাবে তো এসো। নফরকেষ্টর জবাব নেই। ছোঁড়াটাকে আজকেই ছিপ ধরালি—হাতে মাছ ঝুলিয়ে সে এবার ড্যাং-ড্যাং করে বাসায় ফিরবে, নফরা পিছু পিছু শূন্য হাতে যায় কোন্ লজ্জায়!

চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও এখন সাড়া দেবে না। মাছ না পেলে সকাল অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেঙ নাচাবে।

যেতে যেতে বংশী সঙ্গের মানুষটির পরিচয় দেয়ঃ তুষ্টচরণকে দেখনি তুমি সাহেব! এই ফুলহাটার লোক। গাঁয়ে থাকে না, আজকেই এলো। বলাধিকারীমশায় কেবল তো আশা দিয়ে ঘোরাচ্ছেন—তুষ্টুকে বলেছিলাম, নিয়ে আয় দেখি জুত মতন একটা কাজের খবর।

পয়লা দিনই মাছ পেয়ে সাহেবের স্ফূর্তি ধরে না। রোজই আসে। নফরকেষ্টকে বরঞ্চ এক এক রাত্রে ঘুমে পেয়ে যায়। সে আসে না, সাহেব একলাই আসে তখন। একটা হেরিকেন হয়তো হাতে করে এলো। দীঘির পাড় থেকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে দেয়। খুব জোর কমিয়ে—আলো আছে কি না আছে। আলোর রেশ বাইরে না আসে—জলের মাছ কিম্বা জঙ্গলের মাছুড়ে কেউ বুঝতে না পারে।

রাত্রিবেলার কাজটা হল ভালই। দিনমানে আছে মুকুন্দ মাস্টার। মুকুন্দের সঙ্গে ভাব আরও জমেছে—সাহেব বলে ছোড়দা, মুকুন্দ বলে সাহেব-ভাই।

ইস্কুলের এক ছুটির দিন দুজনে বেলাবেলি বেরিয়েছে। যাবে হাটখোলা অবধি। হাটের দিন নয়, কিছু চাল-ডাল নুন-তেল কেনাকাটা আছে মুকুন্দর নিজের জন্য। সাহেব বলে, চলুন না, আমি কাঁধে বয়ে আনব।

মুকুন্দ কিন্তু-কিন্তু করে। সাহেব অভিমান ভরে বলে, তবে আর ছোট ভাই কিসের? ওটা মুখের কথা আপনার। ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে ঘাড়ে চালের বস্তা—লোকে দেখে কি মনে করবে?

এর উপর আপত্তি চলে না। যেতে যেতে সাহেব আবার বলে, দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা যত-কিছু এমনি পথের উপরে ছোড়দা। আপনার আসরে আর যাব না, যাবার উপায় নেই, নিন্দে হচ্ছে।

মুকুন্দ বুঝল অন্য রকম। মরমে মরে গিয়ে বলে, জানি সাহেব-ভাই। এত সদাচারে থাকি, পিতৃপাপের তবু প্রায়শ্চিত্ত হল না। জন্মের উপর কারো হাত নেই, এটা মানুষ বুঝে দেখে না।

সাহেব হেসে ফেলেঃ তাই বুঝি বললাম! পাপ যদি কিছু থাকে, সে সদাচারের। মনে-প্রাণে ভালো আপনি—আপনার আসরে হরবখত বসে আপনার পাঠ শুনে শুনে আমিও নাকি ভালো হয়ে যেতে বসেছি, সেই নিন্দের রটনা।

মুকুন্দ আশ্চর্য হয়ে বলে, নিন্দে তো মন্দের নামে রটে। ভালো যদি হও, তাই নিয়ে নিন্দে হবে কেন?

আপনারা ভালো কিনা ছোড়দা, আপনাদের কাছে মন্দের নিন্দে। আমরা মন্দরা ভালোর নিন্দে করি। দল হল দুটো—ভালোর দল আর মন্দের দল। আপনি ভালোর দলে বলে মন্দর নিন্দে কানে যায়। শুনে ভাবেন, এই বুঝি সমস্ত। আপনাদের ধারণা দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ ভালো হবার জন্য পাগল, নিজেদের দিয়ে বিচার করেন। একপেশে বিচার। ইচ্ছাসুখে উভয়দলে পড়বারই মানুষ আছে।

পরক্ষণে সংশোধন করে নিয়ে বলে, ভুল হল ছোড়দা। আরও একটা দল আছে, গুণতিতে তারাই ভারী। মন্দকে বাপান্ত করে ভালের গুণ গায়। মনে মনে বলে ঠিক উল্টো : কাজের মানুষ মন্দরা, ভালোগুলো অপদার্থ।

মুকুন্দ সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে : নতুন নতুন কথা বলছ সাহেব-ভাই।

থাকি যে বলাধিকারীমশায়ের কাছে। ভালো পথ মন্দ পথ—দু-দিকের হদ্দমুদ্দ দেখা আছে তাঁর। আপনারা একচক্ষু হরিণ হয়ে একটা পথই দেখেন শুধু। ভিন্ন পথের হলে গালি দিয়ে ভূত ভাগাবেন। নিজের বাপ বলেও রেহাই নাই।

পচা বাইটার নিন্দায় সাহেব ক্রুদ্ধ হয়েছে, এতক্ষণে সেইটে ফুটে বেরুল। বলে, বাপের লজ্জায় মাথা কাটা যায়, বাপের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে বৈরাগী হয়েছেন আপনি—আবার কতজন আছে বাবা-বাবা করে দুনিয়াময় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এত ঘেন্না করেন—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কতটুকু জানেন আপনি সেই বাপ-মানুষটার ?

বিরক্ত হয়ে মুকুন্দ সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় : তবে তো চোর হতে হয়। চোর না হয়ে চোরকে জানব কি করে ?

পাশাপাশি হেলতে দুলতে যাচ্ছিল দুজনে, হঠাৎ সাহেব দ্রুত পা চালাল।

মুকুন্দ ডাকে : রাগ করলে নাকি সাহেব-ভাই ? বাপ আমার— আমি যেটুকু জানি, তুমি তো তা-ও জান না। তোমার রাগের কারণটা কি ?

জবাব না দিয়ে সাহেব গতিবেগ আরও বাড়িয়ে দিল। মুকুন্দ অনেকটা পিছনে।

বটে ! ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে মুকুন্দ হেসে ফেলে : খোঁড়া-মানুষ ভাবলে নাকি আমায়—ধরতে পারব না ?

লহমার মধ্যে মুকুন্দ সাহেবের পাশে চলে এলো। সগর্বে বলছে, ইস্কুলে পড়বার সময় দৌড়ে ফার্স্ট হতাম আমি ; কোন ছেলে আমার সঙ্গে পারত না। অনেকদিন অভ্যাস নেই—তা হলেও নিতান্ত হ্যাক-থুঃ করবার নয়। দেখলে তো ?

বিনাবাক্যে এবার সাহেব দৌড় দিল—হাঁটনা নয়, পুরোপুরি দৌড়। মুকুন্দরও রোখ চেপে যায় কেমন। মাইনর-ইস্কুলের মান্যগণ্য শিক্ষক, সে কথা মনে রইল না। আবার যেন ছাত্র হয়ে একশ গজের রেস দৌড়াচ্ছে। সাহেব প্রতিযোগী—তাকে হারিয়ে দিতে হবে। হারিয়ে প্রাইজ নেবে। তীর-বেগে দৌড়াচ্ছে। সাহেবও মরীয়া, তবু তাকে হার মানতে হয়। দৌড়াতে জানে বটে মুকুন্দ, বিস্তর আগে চলে গেছে।

অকস্মাৎ সাহেব এক কাণ্ড করে বসল। চোর—চোর—বলে চিৎকার: টাকা চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে চোর—

এই সময়টা এক বিদেশি যাত্রা-দল মাঠ ভেঙে রাস্তার উপর উঠল। জন কুড়িক হবে। সাহেবের চিৎকারটা বোধকরি তাদের দেখেই। রে—রে—করে দলসুদ্ধ ছুটে আসে। হতভম্ব মুকুন্দ আগেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। ধান-কাটার মানুষ তখনো মাঠে। গরু-ছাগল নিয়ে রাখালদেরও ঘরে ফিরবার সময় এই। দেখতে দেখতে লোকারণ্য। চোরের উপর জনতার কিছু প্রাথমিক কর্তব্য থাকে, সেই লোভে এত লোক কাজকর্ম ফেলে ছুটেছে। অল্পসল্প সে ব্যাপার হয়েও থাকবে ইতিমধ্যে। আরও হত—সাহেব এসে পড়ে হি-হি করে হাসে: ঠাট্টা রে ভাই, সত্যি-চোর কেন হতে যাবেন! চোর বলে ছোড়দাকে চমক দিয়ে দিলাম।

তা-ও কি শুনতে চায়? আশাভঙ্গ হয়ে লোকে তখন সাহেবের উপর মারমুখি: মিথ্যে বলে ঠেকিয়ে দিচ্ছ, চালাকির জায়গা পাও না! বেশ তো, উনি চোর না হলেন—ওঁর মারটা তুমিই খেয়ে দাও তবে।

রক্ষে হল, চাষী-রাখালের কয়েক জন চিনতে পারল মুকুন্দকে: আরে মাস্টারমশায় যে! উনি কখনো চোর হতে পারেন—ছিঃ ছিঃ!

কেন পারবেন না, হতে বাধাটা কি? হাত-পা থাকলে যে কেউ যা-খুশি হতে পারে। লোকটা যাত্রা দলে ভীম-রাবণ সেজে প্রতি আসরে লড়াই করে বেড়ায়—কিছুতে নিরস্ত হবে না। বলে, হাত দুটো নুলো আর পা দু-খানা খোঁড়া—তারাই শুধু পারে না। তাই তো করতে যাচ্ছিলাম—সবাই মিলে বাগড়া দিচ্ছ, হবে কেমন করে?

মজা নেই, ভিড় সরে গেল ক্রমশ। দু-জনে নিঃশব্দে চলেছে। এক সময় মুকুন্দ বোমার মতো ফেটে পড়ে: কী রকমের ঠাট্টা হল শুনি?

সাহেব অবিচল কণ্ঠে বলে, পিতৃনিন্দা মহাপাতক, চোর হয়ে সেই পাপেই একটুখানি শাস্তি নিলেন। যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন। বেয়াড়া মন আমার—মমতা এসে গেল যে—প্রায়শ্চিত্তটা পুরোপুরি হতে পারল না।

রাগ করে মুকুন্দ আর একটা কথা বলে নি সমস্ত পথের মধ্যে।

বলাধিকারী একদিন সাহেবকে ডেকে মাছ ধরার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সাহেব বর্ণনা দেয়। শুনে বলাধিকারী পিঠ ঠুকে দেন: এ-ও দিব্যি রাতের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তোদের। আলোর সঙ্গে শত্রুতা। এই কায়দাগুলোই ভাল করে রপ্ত করে রাখ, আসল কাজে দরকার পড়বে। মরশুমের সময় রাত্রি হলেই বিনি আলোয় ঘুটঘুট করে ঘুরতে হবে, বুঝলি?

এক রাত্রে সাহেব অমনিধারা ছিপে বেঙ নাচাচ্ছে। ঠাণ্ডাহিম এক বস্তু পায়ের পাতায় উঠল। সড়সড় করে সরছে। সাপ তাতে সন্দেহ নেই। অনড় একটা কাঠের খুঁটির মতন সাহেব দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্বাসটাও বুঝি বইছে না। মানুষ বুঝলেই গর্জে উঠে ফণা তুলে দেবে ছোবল। দীর্ঘ দেহটা ধীরে ধীরে পার করে নিয়ে সাপ চলে গেল। আবার সেই সময় একটা আওয়াজ পাওয়া গেল জলে। মাছ এসেছে, এখন কিছুতে জায়গা ছেড়ে নড়া যায় না। যেমন ছিল ঠিক সেইরকম দাঁড়িয়ে বেঙ ছুঁড়ে দেয় দূরে, কাছে টেনে আনে। আবার ছুঁড়ে দেয়, আবার টেনে আনে কোন-কিছুই হয়নি যেন, মিনিটখানেক মাত্র চুপচাপ ছিল। বহুক্ষণ এমনিধারা বেঙ নাচিয়ে মাছ ধরে নিয়ে শেষরাতের দিকে বাসায় ফিরল।

এই খবর কী করে জগবন্ধুর কানে গেছে। কেউটেসাপ পায়ের উপর উঠেছে, একচুল তবু নড়ে নি। মুগ্ধ বিস্ময়ে একটুখানি তাকিয়ে থেকে সাহেবের মাথায় তিনি হাত রাখলেন। বলেন, তাজ্জব হলাম রে সাহেব। লেগে থাক, খুব বড় হবি তুই। দেহের উপর আর মনের উপর যার পুরো আধিপত্য, বড় চোর সে-ই কেবল হতে পারে। বড় সাধু হবার জন্যেও ঠিক এই উপদেশ। চোর হোস আর সাধুই হোস, সাধন-পথের খুব বেশি তফাত নেই।

আরও অনেক কথা বললেন এইদিন। চোরের সমাজে দুটো পাপের ক্ষমা নেই—মিথ্যাচার আর নারীঘটিত অপরাধ। দল থেকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়াবে. গায়ে থুতু দেবে দলের লোক। সর্বকালের এই বিধি। সমরাদিত্য-সংক্ষেপের সেই যে গল্প: চৌরগুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিচ্ছেন—চুক্তি হল, কদাপি সে মিথ্যা বলবে না। কিন্তু গুরুবাক্য না মেনে দৈবাৎ সে মিথ্যা বলে বসেছে। তারপর যে-ই মাত্র ঘরে ঢোকা, হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

বলাধিকারীর কথা দৈববাণীর মতো ফলেছিল। সাহেব কত বড় বড় কাজ করল জীবনে। ভুড়নপুরের আশালতার কবলে পড়েছিল এরই কিছুকাল পরে।

সাপের চেয়ে অনেক সাংঘাতিক ব্যাপার। সাপে পেঁচিয়ে ধরলে শুধুমাত্র নিশ্বাস চেপে নিঃসাড় হয়ে থেকে বিপদ কাটে, ঘুমন্ত রমণীর কবল কাটিয়ে বেরুনোর জন্য সাড়া জাগিয়ে চঞ্চল হয়ে কাজ করতে হবে। সেই রমণী যেমনটা চায়, তারই সঙ্গে মিল রেখে। এবং সেই সঙ্গে চৌরকর্মও সারতে হবে। কেউটেসাপ কোন ছার এর তুলনায়! সাহেব তাই নিখুঁতভাবে করেছিল ওস্তাদ পচা বাইটার শিক্ষায় আর মহাজন জগবন্ধু বলাধিকারীর আশীর্বাদের জোরে।

যাক সে কথা। ছিপ নিয়ে কুঠির দীঘিতে আসা সাহেবের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। যত রাত বাড়ে, মন চনমন করতে থাকে, বাসার কামরায় চুপচাপ পড়ে থাকতে পারে না। রীতরক্ষার মতো নফরকেষ্টকে একবার দু-বার ডাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

একদিন আরও বিষম কাণ্ড। অদূরে অন্ধকার নাটাবাগানের দিকে কচরমচর করে কি যেন চিবাচ্ছে—শব্দটা কানে এল সাহেবের। একঝোঁক বাতাস এলো সেই দিক থেকে—বাতাসে দুর্গন্ধ। দীঘির পাড় ছেড়ে চলে যেতে পারে না—চলতে গিয়ে গাছপালা নড়বে, শব্দ হবে একটুখানি নিশ্চয়। অনেকক্ষণ সেই একটা জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে একসময় বেরিয়ে এলো। এবং পরের দিন শোনা গেল, গোবাঘার ভুক্তাবশেষ খানিকটা নাটাবাগানে পড়ে আছে। তবু কিন্তু সেই পরের রাত্রেও যেতে হবে। মস্তবড় দায়িত্বের কাজ যেন, কামাই দেবার উপায় নেই।

ক্বচিৎ কখনো মস্করার ব্যাপারও ঘটে। মস্করা যাঁরা করেন, তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না, বাতাসে অদৃশ্যরূপে থাকেন। সাহেব এত সমস্ত জানত না, তিলমাত্র সন্দেহ হয় নি। তেমনভাবে লক্ষও করেনি একটা দিন ছাড়া। সেই রাত্রে বড্ড বেশি ঘটতে লাগল। বড়শিতে বেঙ গেঁথে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে সাহেব যথারীতি টেনে টেনে আনছে। ছর্‌র্‌ করে অদ্ভুত একটা শব্দ—তার পরে বেঙ আর নেই, খালি বড়শি। একবার দু-বার হলে না হয় বলা যেত বড়শি থেকে বেঙ খুলে পড়ে গেছে। যতবার গেঁথে ফেলছে ঐ এক ব্যাপার! সে রাত্রে কিছুই হল না, পণ্ডশ্রম। বড় আশ্চর্য লাগে।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য বিচক্ষণ বহুদর্শী লোক। দূর-আকাশের অদৃশ্য অজ্ঞাত গ্রহনক্ষত্র নিয়ে কাজকারবার, সেই মানুষ এই ব্যাপারের হয়তো কিছু হদিশ দিতে পারবে। হল তাই। সাহেবের মুখে শুনে ক্ষুদিরাম চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে পড়ে: কী সর্বনাশ, এর পরেও ছিলে তুমি সেখানে, নতুন বেঙ গেঁথে গেঁথে ফেলতে লাগলে? অন্য কেউ হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরুত। তা-ই

উচিত। বেঙ নিয়ে মজা করতে করতে, ধরো, তোমার মুণ্ডখানা ছিঁড়ে দীঘির দামের নিচে ঠেসে শেষ মজাটা করলেন। ওঁদের কি—মতলব একটা এসে গেলেই হল।

সেই রসিকবর্গের কিছু পরিচয় না শুনে নিয়ে সাহেব নড়বে না। ক্ষুদিরাম অবাক : কী আশ্চর্য, খবর রাখ না এদ্দিন এখানে আছ? গুণতিতে ওঁরা তো একটি-দুটি নন—জানাও নেই সকলের কথা। কেউ জানে না। কুঠির দীঘি আর পাড়ের পুরানো তেঁতুলগাছটার যদি বাকশক্তি থাকত তারাই সব বলতে পারত। এক মাতাল সাহেব এখানকার এক কাওরা মেয়ের সঙ্গে প্রণয় জমিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল। বিলেত থেকে মেমসাহেব এসে পড়ল। সাঁতারের নামে সাহেব তাকে দীঘিতে ডুবিয়ে মারতে গেল। মেমটাও তেমনি দুঁদে, গায়ে অসুরের মতো বল। নিজে গেল, গলা জড়িয়ে ধরে সাহেবটাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে করে। মেয়ে নিয়ে আরও একটা ব্যাপার আমার চোখের উপরেই ঘটল। বেচা মল্লিকের প্রণয়িনী মুক্তাময়ী। ভাল ঘরের পরম রূপসী মেয়ে—কী দেখে মজল জানিনে। পরিণাম হল, দুর্গাপূজোর পদ্ম তুলতে গিয়ে লোকজন দেখল, মুক্তাময়ী মড়া হয়ে ভাসছে। পেট ফুলে ঢোল। আরও কত আছে, ক'টাই বা বাইরে প্রকাশ পায়! অপঘাতে গিয়ে তাঁরাই এখন জমিয়ে আছেন, ফুর্তিফার্তি করেন রাতবিরেতে।

সাহেব বলাধিকারীর কথা তোলে। কুঠিবাড়ির ভাঙা অট্টালিকায় তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। বলে, অল্পের জন্য বেঁচে এসেছেন। মেরে ফেলে তাঁকেও তো ঐ রকম দামের ভিতর চালান দিত।

ক্ষুদিরাম ঘাড় নাড়ে : ক্ষেপেছ? অমন গুণীজ্ঞানী মানুষ কেন মারতে যাবে? বেঁচেবর্তে থেকে এখন কত কাজ দিচ্ছেন! বেচারাম কি বোকা? বোকা হলে অত বড় কাপ্তেন হওয়া যায় না। মরবার তো কতই কায়দা ছিল, সেই মুখ-বাঁধা অবস্থায় ধাক্কা দিতে পারত ছাতের উপর থেকে, টু শব্দটি হত না। ঝুলিয়ে রাখতে যাবে কি জন্য?

হেসে বলে, একদিন সঙ্গে করে নিয়ে জায়গাটা দেখাব। চোখে দেখলে বুঝবে।

মুচকি হেসে বলে, আমি ছাড়া অন্য কেউ পারবে না। খোদ বলাধিকারী-মশায়ও না। চোখ-মুখ বাঁধা তাঁর সেই সময়। তার পরেই তো অকুস্থল থেকে সরিয়ে দিল।

সাহেব একদিন নফরকেষ্টকে চেপে ধরে : রেলগাড়ির রোজগারের ভাগ পেলাম কই?

নফরকেষ্ট বলে, পাচ্ছিস বই কি! দরকার হলেই তো পাস। হরবখত এই যে হাটে গিয়ে এটা-ওটা কিনিস, মিষ্টিমিঠাই খাস—খরচা আমিই তো দিয়ে থাকি। বল সেটা—আমি, না অন্য কেউ?

আবার বলে, এখন কোন্ খরচের দরকার বল্। চেয়েই দেখ একবার, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাস কিনা।

সাহেব জেদ ধরে বলে, ওসব জানিনে। নিত্যিদিন কেন চাইতে যাব? কেন হাত পাতব তোমার কাছে? ভিক্ষে নয়, যা আমার ন্যায্য বখরা, হিসাব-পত্তর করে মিটিয়ে দাও। চুকে গেল।

নফরকেষ্ট আহত স্বরে বলে, আমি হাতে করে দিলে সেটা বুঝি ভিক্ষে হয়ে গেল? এত বড় কথা বলতে পারলি তুই! মাথার উপরে বড় যারা থাকে, তাদের সঙ্গে বখরা করতে হয় না। গরজের সময় বুঝেসমঝে তারা দিয়ে দেয়।

কী কারণে সাহেবের মেজাজটা আজ চড়া। ভ্রূভঙ্গি করে বলে, মানুষ তো ডেপুটি—কারিগরের সঙ্গে সঙ্গে পোঁ ধরে বেড়ানো তোমার কাজ। মাথার উপরে কে তোমায় চড়িয়ে দিল শুনি? বড়ই বা হলে কিসে? ও সমস্ত না দেবার ফিকির। টাকা গেঁথে গেঁথে তুমি ঠিক পালানোর মতলবে আছে। ফিরে টোপ ফেলে ফেলে বেড়াবে, এতকাল যেমনধারা করে এসেছ।

নফরকেষ্ট ক্ষিপ্ত হয়ে যায়: মাথার উপর আমি কি নতুন চড়েছি, বড় কি এই আজকে থেকে? কাঁকি-মেকির বড় হওয়া নয়, বাপ হই তোর—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম। দু-দিনের বাচ্চা, সুধামুখীর আঙুলের মধু চুকচুক করে খাচ্ছিলি, তখন থেকেই বাপের দাবিদার। সুধামুখী জানে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করিস। আর জিজ্ঞাসা করবি কর্পোরেশন-ইস্কুলের মাস্টারমশায়দের। তাঁরা তো মরে যাননি। মরলেও খাতাখানা রয়েছে—আপিসের এই মোটা কালো খাতা। পড়ে দেখিস, বাবা তোর কে? মুখে না বললেই উড়ে গেলাম আর কি! টের পাসনি ছোঁড়া, মামলা করে হাকিমের কাছ থেকে 'বাবা' বলবার রায় নিয়ে আসব।

রাগের বশে আবোল-তাবোল বকে যায় নফরকেষ্ট। সাহেব চুপ করে শোনে। তারপর প্রবীণোচিত ভঙ্গিতে বলে, হাকিমের রায়ে কি বাপ হওয়া যায়? কত আসল বাপই দেখগে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে বাপ হয়ে থাকার কায়দা জানে না বলে। আমার এত কষ্টের কারিগরি বখরা যদি বাপ সেজে গাপ করে ফেল, তোমার সঙ্গে কোন কাজে আর আমায় পাবে না। থাকবই না একসঙ্গে। চোখের উপর বলাধিকারীমশায়ের ব্যবস্থাটা দেখ। কাজ

একখানা নেমে গেলে হিসাবের পাইপয়সা অবধি সঙ্গে সঙ্গে হাতে গুঁজে দেবেন। কাজের মধ্যে শুধু কাজেরই সম্পর্ক। দশরকম ধানাই-পানাই করলে বিশ্বাস নড়ে যায় তখন, কাজের কোন জোর থাকে না।

বলাধিকারীই মধ্যবর্তী হয়ে সাহেবের প্রাপ্য হিসাব করে তাকে দিয়ে দিলেন। এই কাজে তাঁর জুড়ি নেই। সামান্য কয়েক টুকরো সোনা আর রূপো এদের—এত তুচ্ছ জিনিস বলাধিকারীর মতো মহাজন আঙুলে স্পর্শ করেন না। এনে ধরতেই সাহস করবে না অন্য কেউ। সাহেবকে কী চোখে দেখছেন, তার কথায় দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। কিন্তু নফরকেষ্ট ভেবে পাচ্ছে না, সাহেবের হঠাৎ কী এত টাকার গরজ পড়ে গেল। সে গরজ এমনি যে নফরকেষ্টর হাত দিয়ে খরচ হলে হবে না। মরে গেলেও নফরের কাছে তা প্রকাশ করা চলবে না। ফড় নামে যে জুয়াখেলা, তারই দু-তিনটে দল হাটে হাটে খেলতে আসে। ফড়ে জিতে সেই টাকা খরচ করে আসবার এবং ফড়ে হেরে মনোদুঃখে নিবারণেরও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা না আছে এমন নয়। মনে দুর্ভাবনা, তেমনি কোথাও জমে পড়ল নাকি সাহেব?

টাকাকড়ি নিয়ে সাহেব ভাঁটিঅঞ্চলের সব চেয়ে বড় হাট বড়দলে চলে গেল। এবং তারই কয়েকটা দিন পরে চোখে পড়ে, হাতবাক্স খুলে বলাধিকারী তাকে পয়সা দিচ্ছেন।

নফরকেষ্টর সর্বদেহ হিম হয়ে যায়। ছেলের বাপের বোধকরি এমনিটাই হয়ে থাকে। যে শঙ্কা করেছে, মিথ্যা নয় তবে তো! সাহেবকে এক সময় একান্তে ধরে ফেলল: কিসের পয়সা দিলেন বলাধিকা ?

সাহেব বলে, দেখে ফেলেছ? তোমায়, আর বোধহয় মা-কালীকেও লুকিয়ে কিছু হবার জো নেই। শুধু আমায় কেন, বলাধিকারী এমনি অনেক জনকে দিয়ে থাকেন। নইলে মহাজন কিসের! দাদনের পয়সা, কাজকর্ম করে শোধ হবে।

কিন্তু সেদিন যে এতগুলো টাকা গণে নিলি। টাকা আনা আর পয়সা অবধি হিসাব করে।

সাহেব হি-হি করে হাসে: টাকা-আনা-পয়সা সমস্ত লোপাট। থলিটা অবধি। বড়দলের হাটের মধ্যে কোথায় পড়ে গেল, হাটুরে মানুষ নিয়ে নিয়েছে। বেশি নয়, চার গণ্ডা পয়সা—শুধু-হাতে থাকতে নেই, বলাধিকারীমশায়ের কাছ থেকে তাই নিয়ে নিলাম।

মনের কথা নফরকেষ্ট স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারে না। বললেই তো বচসা বেধে যায়। অন্য দিক দিয়ে গেল: আমি সামনের উপর থাকতে চার আনার জন্যেও অন্যের কাছে হাত পাতবি?

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে যাকগে, আমি একটা মানুষ—আমার আবার মান-অপমান! কিন্তু সুধামুখী বলে আর-একজন বর্তমান রয়েছে, তার সঙ্গে দেখা হবেই। আজ না-হোক কাল না হোক, হবে তো একদিন দেখা! বুক ফুলিয়ে ছেলে নিয়ে বেরুলাম, ছেলের ভালমন্দ কিছু দেখিনি সুধামুখী যখন বলবে, কী জবাব আমার তার কাছে?

কালীঘাটে ফণী আড্ডির বস্তিতে সুধামুখী দাসীর নামে মনিঅর্ডার। পাঠাচ্ছে নফরকৃষ্ণ পাল, বড়দল নামক পোস্টাপিসের শিলমোহর। জেলা খুলনা, কষ্টেসৃষ্টে পড়া গেল একরকম। কিন্তু জায়গাটা কোথায়, সঠিক কেউ হদিস দিতে পারে না। নফরকেষ্ট গিয়ে সেই অঞ্চলে জুটেছে। সাহেবকেও সে নিয়ে বের করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেই বড়দল জায়গায় দু-জনে যদি একত্র থাকে, তবু অনেকখানি নিশ্চিন্ত। পুলিসের খাতায় দাগি বটে, কিন্তু আসলে নফরা মানুষটি ভালো। সরল, স্নেহময়—এবং পাহাড়ের মতো দেহ থাকা সত্ত্বেও করুণার পাত্র। কী এমন সম্পর্ক মানুষটার সঙ্গে। তবু দেখ, সুধামুখীর অচল অবস্থা বুঝে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কুপনে অনেক কথা লেখা যায়, টাকার সঙ্গে ফাউস্বরূপ চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা ডাকের কর্তারা করে দিয়েছে। কিন্তু এই কুপনখানার শুধুমাত্র নফরকৃষ্ণ পালের নাম, আর টাকার অঙ্ক। নিজের কথা না-ই লিখল, 'সাহেব ভাল আছে'—কথা কটা লিখতেও এত কিসের আলস্য?

আর একটা জিনিস অবাক করেছে। কুপনে-লেখা অঙ্কটা শুধুমাত্র টাকায় নয়—আনাও টাকার সঙ্গে। কোন-একটা হিসাব করেছে বুঝি তার সম্বন্ধে—টাকা—আনায় পুরোপুরি হিসাবশোধ। পয়সার মনি অর্ডার চলে না, পয়সা পাঠাতে পারেনি সেজন্য।

ভেবেচিন্তে সুধামুখী একখানা পোস্টকার্ডে চিঠি লেখে খুলনা জেলার বড়দল নামক পোস্টাপিসে নফরকৃষ্ণ পালের নামে:

সাহেব কেমন আছে, সেই সংবাদ অতি অবশ্য জানাইবে। টাকা চাহি না। মা-কালীর পাদপদ্মে পড়িয়া আছি, তৎপ্রসাদাৎ যেভাবে হউক কাটিয়া যাইবে। সাহেবকে লইয়া পত্র পাঠ মাত্র চলিয়া আইস, তাহার জন্য পাগলিনীপ্রায় হইয়া আছি—

পারুল এল এমনি সময়। বলে, নফরকেষ্টর নিন্দে করতে দিদি। টাকা-কড়ি কেড়েকুড়ে রেখে তবে নাকি তার ভালবাসা বজায় রাখতে হয়। সে কথা

কত মিথ্যা, বোঝ এইবারে। মনি অর্ডার করেছে—বিদেশে গিয়ে চাকরে বর যেমনধারা বউয়ের নামে টাকা পাঠায়।

চিঠি লেখা বন্ধ করে সুধামুখী কলম রেখে দিল। কলকণ্ঠে পারুল বলে ওঠে, বরকে বুঝি লিখছিলে? ওমা আমার কী হবে, প্রেমপত্তর পোস্টকার্ডে লেখে নাকি কেউ?

সুধামুখী বলে, প্রেমপত্তরে পাঠ কি দিলাম শুনবি নে? হাড়মাস-কালি করা নফরকালি আমার—

যাও। একগাদা টাকা পাঠাল, ঐসব তুমি লিখতে যাচ্ছ! পাঠ শুনে কি হবে, কাজের কথা কি লিখেছ, তাই একটু পড়ো—

হাসতে হাসতে বলে, ছোটবোনের যেটুকু শোনা যায়, তেমনি করে রেখে-ঢেকে বলো। সুবিধা আছে—ছোট-বোন নিজে পড়তে পারবে না।

নিশ্বাস পড়ল সুধামুখীর। ধ্বক করে মনে পড়ে যায়, সেই কতকাল আগে বেলেঘাটার বাড়ির ছোটবোনগুলোর কথা। বর যেন তার জগৎ-পারের অজানা মৃত্যুলোকে নয়—সুদূর বিদেশে নিরুদ্দেশে আছে, সেখান থেকে মনিঅর্ডার করেছে হঠাৎ। সুধামুখী বরকে চিঠি লিখতে বসেছে, একটা বোন সকৌতুকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে—দেখবে একটুখানি প্রেমপত্র। সে আমলে বান্ধবীদের বাড়ি কত এমন দেখেছে, তার জীবনে হবারই বা কী বাধা ছিল? হল না।

নিশ্বাস ফেলে চিঠিখানা তুলে নিয়ে সুধামুখী বলে, মাত্র এইটুকু লিখেছি শোন—

শুনে পারুল অবাক হয়ে বলে, টাকা চাও না—এটা তুমি কি লিখলে দিদি? কত বড় দায়ের সময় টাকাটা এসে গেল। নইলে কী হত বল দিকি, জনে জনের কাছে হাত পেতে বেড়াতে হত। আর এমন দায়বিপদ লেগেই তো আছে আজকাল।

সুধামুখী বলে, লিখেছি বলেই বিশ্বাস করবে, তবে আর কী প্রেমের মানুষ! পাঠিয়েছে তো নিজে গরজ করে, চাইতে হয়নি। আবার যদি ইচ্ছে হয়, চাইনে লিখলেও পাঠাবে। মানা শুনবে না।

দু-চোখে হঠাৎ ঝরঝর করে জল নামে: প্রাণের টানে কেউ কিছু দিয়েছে, এ-জিনিস আমার কাছে নতুন। একেবারে নতুন। তোকেই বলছি বোন—মান-অভিমানের এই-চিঠি লেখা—খেলিয়ে রসিয়ে আরও খানিকটা ভোগ করব বলেই। এ আমি কোনদিন পাইনি। মনি অর্ডারের মতলব নফরকেষ্টর নিরেট মাথায় এসেছে, আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না। সাহেব ছাড়া অন্ত কেউ নয়। সাহেব আছে ওর সঙ্গে, ভাল আছে—বড় সান্ত্বনা এইটে আমার।

পারুল উঠে গেলে চিঠিটুকু শেষ করে ফেলল :

এক কাণ্ড হইয়াছে। কাল সকালবেলা তোমার সেই মেমসাহেব বউ এখানে আসিয়া উপস্থিত। তোমার ভাই নিমাইকৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়াছিল। তোমাকে ধরিবার জন্য। না পাইয়া আমার উপর যত রাগ ঝাড়িল। আমিও কম দজ্জাল নহি। খুব শক্ত শক্ত শুনাইয়া দিয়াছি। লজ্জা থাকিলে আর কখনো আসিবে না······

সকালবেলা দেওর আর ভাজ সুধামুখীর ঘরের সামনে উঠানের উপর এসে দাঁড়ায়। বউটা সত্যি সত্যি রূপসী। মেমসাহেবের তুলনা দিত নফর-কেষ্ট—তাদের মতন শ্বেতকুষ্ঠ রোগীর চেহারা নয়। এর রং যেন দুধে-আলতায়। গোবরে পদ্মফুল ফোটে—একেবারে সেই ব্যাপার।

নিমাইকেষ্ট বলে, দাদা কি শুয়ে আছেন ?

আবার কৈফিয়তের ভাবে বল্লে, গঙ্গাস্নানে এসেছি। বউদি বললেন, আসা গেছে যখন এদিকে—

নফরার বউ শেষ করতে দেয় না। তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, এসেছি মানুষটাকে ধরতে। কোথায় পালায় আজ দেখি। ঠাকুরপো একদিন এসে ঘাঁটি দেখে গিয়েছিল। আঁস্তাকুড়-আবর্জনায় পা দিয়েছি গঙ্গাস্নান তো করতেই হবে। ফিরে গিয়ে করব। থুঃ-থুঃ—

সুধামুখী বলে, পথের উপরটা নোঙরা করবেন না, মানুষ চলাচল করে। থুতু ফেলতে হয়, ওধারে গিয়ে ফেলে আসুন।

বউ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, তোমার মুখে ফেলবে।

নিমাইকেষ্ট শশব্যস্ত হয়ে ওঠে : আহা, এর উপরে চটছ কেন বউদি, এ কি করবে ? দোকান পেতে আছে, মানুষ ঘরে এলে কি দোর এঁটে দেবে ? দোষ দাদার, চাকরি-বাকরি ঘর-সংসার কোন-কিছুই মনে ধরল না তার—

রূপসী বউ বলে চলেছে, বছরের পর বছর নাকে-দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে—ভাবতাম, সে-মোহিনী না-জানি কেমন ! নাকের দড়ি গলায় তুলে দিলেই তো চুকেবুকে যেত, এ-দুর্ভোগ আমাদের ভুগতে হত না।

ফণী আড্ডির বস্তিবাড়িতে হেন দৃশ্য একেবারে অভিনব। ভিড় জমে উঠেছে। সুধামুখী শান্ত স্বরে বলল, ঘরে আসুন, এখানে নয়।

ঐ ঘরে ? হোক তাই। একেন পাপ, শতেন পাপ। গঙ্গাস্নান করতেই হবে—যে জাহান্নমে যেতে হয় চলো। আমরা গিয়ে বাবুর ঘুম ভাঙাব।

শব্দসাড়া করেই ঘরে ঢুকল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বউ বলে, কোথা ?

হি-হি করে সুধামুখী হাসে, হাসিতে ভেঙে যেন শতখান হচ্ছে। বলে, এই সকালে অদ্দুর থেকে আসা—শেষরাত্রে বেরুতে হয়েছে। আপনাদের সব কষ্ট মিছে হয়ে গেল।

নিমাইকেষ্ট প্রশ্ন করে, দাদা আসেন নি ?

নেই তো শহরে। আসবে কবে ? থাকলে ঠিক আসত।

উৎকট প্রতিহিংসায় পেয়ে বসেছে সুধামুখীকে। মণিঅর্ডারে কুপনখানা বের করে এনে দেখায়। নফরকৃষ্ণ পাল, মাথায় টাকার অঙ্ক।

বলে, বাইরে আছে। টাকাকড়ি পাঠায় মাসে মাসে।

নফরার বউ বোমার মতো ফেটে পড়েঃ আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের নোয়ার জোর যদি থাকে, ফিরবে সে একদিন। ফিরে এসে আমার কাছেই যাবে। ডাকিনী-হাকিনী তুই কদ্দিন গুণ করে রাখতে পারিস, দেখে নেবো।

সুধামুখী খলখল করে হাসেঃ সে-ও যে উল্টো ভাগা-কবচ পরে বসে আছে। নোয়ার জোর খাটাতে দেবে না—

সচকিত হয়ে নিমাইকেষ্ট জিজ্ঞাসা করে, তাগা কি ?

পেত্নী-শাকচুন্নির যার উপর নজর পরে, ওঝায় মন্তর পড়ে তার হাতে সুতো পরিয়ে দেয়। তাকে বলে তাগা, অপদেবতা সেই মানুষের কাছে ঘেঁষতে পারে না। আপনার বৌদির আঁচল কেটে এনে পাড়টুকু নফরকেষ্ট হাতে পরে থাকে—তাগারই মতন কাজ দেয় নাকি। যেই একটু টানের ভাব দেখা দিল, তাগার দিকে তাকাবে। যার শাড়ি, সেই মানুষটাকে মনে পড়ে যায়। মন তখন শতেক হাত ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।

রাগে নফরার বউ'র কথাই বেরোয় না ক্ষণকাল! সামলে নিয়ে বলল, বাড়ি চলো ঠাকুরপো।

সুধামুখী সোজাসুজি তার মুখে তাকিয়ে বলে, আমাকেই দুষে গেলে, কিন্তু নিজের কথাটাও একদিন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো। নিজের চরিত্র, আলাপ-ব্যবহার। তুমি মেয়েমানুষ, আমি মেয়েমানুষ, সেইজন্যে বলছি। রূপ দিয়ে টানা যায় হয়তো. কিন্তু বেঁধে রাখা যায় না। এবারে যখন এলো—চাকরি ছেড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে যেন আগুনের চুল্লি থেকে ছুটে পালাচ্ছে। ছুটে এসে যেখানে একটু ঠাণ্ডা ছায়া পায়, সেখানে গড়িয়ে পড়ে। সে-জায়গা নোঙরা কি ফুল-বিছানো, খতিয়ে দেখবার হুঁশ থাকে না।

নিমাইকেষ্টরা চলে গেল। সেই একটা জায়গায় সুধামুখী ঝিম হয়ে বসে আছে। কতক্ষণ আছে এমনি বসে, পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখে পারুল।

পারুল বলে, নফরকেষ্টর বউ এসেছিল নাকি? টের পাইনি—তাহলে চোখে দেখে যেতাম। ওরা বলাবলি করছে, বড্ড রূপের বউ নাকি?

সুধার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, তোমায় গালমন্দ করে গেল দিদি?

চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, সুধামুখী বুঝতে পারেনি। পাশে বসে পারুল আঁচলে মুছে দিল। বলে, তোমায় কি বোঝাব দিদি। গালমন্দ অঙ্গের ভূষণ তো আমাদের। ওতে মন খারাপ করলে চলে না।

সুধামুখী একটু হাসল। বলে, গাল দিয়ে নতুন কথা কি শোনাবে? বলছিল, থুতু দেবে আমার মুখে। ওদের আর কতটুকু ঘৃণা! বিশ্বাস কর্ ভাই পারুল, নিজের মুখে যে নিজে থুতু দেওয়া যায় না, পারলে আমিই থুতুতে সারামুখ ভরে দিতাম।

পারুলের কথা যোগায় না। নিঃশব্দে বসে রইল। সুধামুখী আবার বলে, এক সময়ে সহমরণের প্রথা চালু ছিল। স্বামী মরলে বউকে সেইসঙ্গে চিতায় পোড়াত। চেঁচিয়ে দাপাদাপি করছে হয়তো, কিন্তু চতুর্দিকের ঢাক-ঢোল উলু-শাঁখ আর সতীমায়ের জয়ধ্বনির মধ্যে সে চেঁচানি কারো কানে যায় না—

পারুল শিউরে উঠে বলে, কী পাষণ্ড ছিল সেকালের মানুষ—

সুধামুখী বলে, দরদী দয়ালু মানুষ তারা, চিতায় পুড়িয়ে কয়েক মিনিটে শেষ করে দিত! সে রীতি বাতিল হয়ে গিয়ে এখন তুষানলের ব্যবস্থা। জীবন ভোর ধিকিধিকি জ্বলে-পুড়ে মরা। চোখের সামনে ঘরে ঘরে হাজার হাজার মেয়ে স্বামীপুত্র শ্বশুর-শাশুড়ি নিয়ে ঘরকন্না করছে। আনন্দে হাসে, দুঃখে ব্যথায় চোখের জল ফেলে। তাই দেখে আমারও যদি কোনদিন নিশ্বাস পড়ে থাকে, সে দোষ আমায় দিবিনে—দোষ সেই বিধাতাপুরুষের, বিধবা জেনেও যে দেহ ভরে যৌবন বইয়ে দেয়, মনের মধ্যে ঝড় তোলে। সেকালে আত্মরক্ষার বড় উপায় ছিল ঈশ্বর আর পরজন্মে অবিচল বিশ্বাস। আজকে আমাদের চোখ-মন খোলা থেকেই বিপদ হয়েছে—দুনিয়ার সব সমাজের সকল রকম রীতি-নীতি আপনাআপনি কানে এসে পৌঁছয়। পুরানো বিশ্বাসের বর্ম পরে টিকে থাকার উপায় নেই। হাজারো দিন সহ্য করে কোন একটা মুহূর্তে হঠাৎ যদি একবার অনিয়ম হয়ে গেল, সে দোষের খণ্ডন নেই। পিছন-জীবনের কথা ভাবি। ভাল বংশের বিদ্বান বাপের মেয়ে আমি। আজকের এমনি দিনের অবস্থা কখনো স্বপ্নেও ভেবেছি! বাঁচবার আমি অনেক চেষ্টা করেছি পারুল, হবার উপায় নেই। অক্টোপাসের মতো আটখানা হাতে আঁকড়ে ধরে অনিয়ম আমায় ঠেলতে ঠেলতে পাতালের নিচে নামিয়ে দিল।

বলেই চলেছে সুধামুখী। যার কাছে বলছে সে মানুষের কতটুকু বিদ্যা-বুদ্ধি দৃকপাত নেই।

বলেই, অনেক পুরানো পচা অভিযোগ এইসব। কিন্তু পুরানো বলেই মিথ্যা হয়ে যায় না। আমি একজনকে জানি—ঠিক আমারই অপরাধ তার। কাশী থেকে প্রসব হয়ে এসে গর্ভের মেয়েকে পালিত বলে নিজের কাছে রেখেছে। তারপরে পড়াশুনো করে একটা পাশ দিয়ে টাইপ করা শিখে নিয়ে অফিসের টাইপিস্ট। এক কামরা ঘর ভাড়া করে থাকা আছে মা আর মেয়ে, এক বুড়ি পিসিও আছেন তাদের সংসারে। আত্মীয়স্বজনে সমস্ত জানে—তারা চোখ-টেপাটেপি করে, কিন্তু বয়ে গেল। আমি একদিন গিয়ে ওদের সুখের সংসার দেখেছিলাম।

বলতে বলতে সুধামুখী ভেঙে পড়ে। আবার কান্না। বলে, আমার সেই একদিনের খুকুকে যদি থাকতে দিত, পুড়তে জলতে আসতাম না কক্ষনো পারুল। আমি অন্য মানুষ হতাম, মেয়ের মা হয়ে থাকতাম।

পারুলেরও চোখ ভরে জল আসে। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কী হয়েছে! মেয়ের মা না থেকে ছেলের মা হয়েছে। সাহেবের মা। আমার রানীকে নিয়ে নিলে ছেলে মেয়ে তুই-ই হবে তখন।

নানান পোস্টাপিসের বিস্তর শিলমোহরের আঘাত খেয়ে সুধামুখীর পোস্টকার্ড মাসখনেক পরে আবার ফিরে এল। বড়দলে নফরকৃষ্ণ পাল নামে কেউ নেই। মস্তবড় হাট—হাটের দিনে পাঁচ-সাত হাজার লোক জমে। নফরকেষ্ট যদি সেই হাটুরের একজন হয়, সে মানুষের খোঁজ কেমন করে হবে?

—

জগবন্ধু বলাধিকারীকে শেষ করে ফেলবে, এমন ইচ্ছা বেচা মল্লিকের নয়। ঠগ-ফাঁসুড়ের মতো এরা মানুষ মারে না। দৈবাৎ কেউ মারা পড়লে সমাজে নিন্দা রটে, অক্ষম অপদার্থ বলে সকলে নিচু চোখে তাকায়। তার উপরে বলাধিকারীর মতো গুণীজ্ঞানী ধর্মভীরু মানুষ। তবে বাগে ফেলে কিছু শিক্ষা দেবার ইচ্ছা।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ভুয়োভূয়ঃ সামাল করে দিয়েছে: সাত চোরের এক চোর হয়ে চলাফেরা করবেন বড়বাবু। সাপের গায়ে খোঁচা দিয়েছেন। নানান ফিকির ওদের, গণ্ডা পঞ্চাশেক চোখ।

আছেন জগবন্ধু সদাসতর্ক। সদর থেকে ফিরছেন। সঙ্গে পরম বিশ্বাসী সেই সিপাহি দুটি। আর একটি বড় সহায় রয়েছে পিস্তল—কাপড়ের নিচে!

কেউ সরকারি পোশাকে নয়—সিপাহি দুজনকে মনে হচ্ছে কোন জমিদার-কাছারির পাইক-বরকন্দাজ। জগবন্ধুকেও গলাবন্ধ জিনের কোট, সাদা উড়ানি এবং খাটো মাপের ধুতিতে সেই কাছারির নায়েব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। যাতায়াত নৌকোয়। তিন জনে গাঙের ঘাটে এসে নৌকো খুঁজছেন।

আলাদা নৌকো ভাড়া করবেন না। বিশাল সাওড়নৌকো হাটের অত লোক থাকা সত্ত্বেও সকলের চোখের উপর মেরে দিল, সে গাঙের উপর দিয়ে আলাদা নৌকোয় যাবেন কোন সাহসে? ঠিক করেছেন, গয়নার নৌকোয় যাবেন তাঁরা। গয়নার নৌকো অর্থাৎ শেয়ারের নৌকো—অনেক যাত্রী একসঙ্গে যায় এইসব নৌকোয়—ভাড়া দূর হিসাবে এক আনা থেকে চার আনা। যার যেখানে গরজ নেমে চলে যায়, নতুন মানুষও ওঠে পথের মাঝে। কমপক্ষে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন চড়ন্দার—নিতান্তই সাধারণের একজন হয়ে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে চলে যাবেন। বেশি মানুষ বলেই নিরাপদ।

খান আষ্টেক গয়নার নৌকো? ভাটা ধরেছে নদীতে, ছাড়বার সময় হল। মাঝিরা তারস্বরে চড়ন্দার ডাকাডাকি করছে। ঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বার কয়েক চক্কোর দিয়ে জগবন্ধু একটা নৌকো ওর ভিতরে পছন্দ করে ফেললেন। সবচেয়ে বেশি লোক সেই নৌকোয়—মেয়েলোক প্রচুর, বাচ্চা-ছেলেপুলেও আছে। অন্য সকলে ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে, এ নৌকোর মাঝি ডাঙার উপর দাঁড়িয়ে। কে-একজন তামাক কিনতে গিয়েছিল—হাঁক দিয়ে বলছে, ছুটে আয়, ছুটে আয়। যাত্রী আর তুলছে না, ঐ মানুষটা এসে পড়লেই ছেড়ে দেবে।

কারণ অবশ্য বোঝা যাচ্ছে—এত ভিড় কেন এই নৌকোটায়, মাঝির এমন দেমাক কেন। গেরুয়া আলখাল্লা-পরা এক ছেলেমানুষ বৈরাগী গোপীযন্ত্র বাজিয়ে হরিনাম গান করছে পাছ-নৌকোয় বসে। গানের সুরে যেন মধু গলে পড়ে। মানুষের গাদাগাদি বৈরাগীকে ঘিরে। গান শুনবার লোভেই যত মানুষ এই নৌকোয় উঠতে চাচ্ছে। সব গয়নার নৌকোর ভাড়া একই রকম, এমন মধুর হরিনাম এবং তজ্জনিত পুণ্য এই নৌকোয় উপরি লাভ। চড়ন্দার সেইজন্য এত ঝুঁকেছে। কিন্তু যেতে চাইলেই অমনি তো নৌকোয় তোলা যায় না। বড় বড় ভয়াল নদী সামনে, পয়সার লোভে অগুন্তি বোঝাই দিয়ে মাঝনদীতে শেষটা ভরাডুবি ঘটাবে নাকি? মানুষ দেখে দেখে কে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে তুলছে। বেশির ভাগই কাছাকাছি যাবার মানুষ। বড়-নদীতে পড়বার আগে তারা নেমে গিয়ে নৌকো ভারমুক্ত হবে, এই বোধকরি অভিপ্রায়। চাষাভুষো শ্রেণীর প্রায় সমস্ত।

জগবন্ধু সঙ্গী দু-জন নিয়ে মাঝির কাছে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মাঝি। বুঝেছে জমিদারের লোক। জমিদারের এলাকার নিচে দিয়ে সদাসর্বদা আনাগোনা, মাঝি মাত্রেই সেজন্য খাতির করে। বলে, যাবেন তো তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন নায়েবমশায়। দেরি করবেন না। আর নয়তো পরে ঐসব নৌকোয় যেতে পারবেন।

চলেছে সেই গয়নার নৌকো—চলেছে। নামতে নামতে জন দশ-বারো চড়ন্দার রইল শেষ অবধি। বাচ্চা কোলে বউমানুষও একটি আছে। বৈরাগী বড্ড জমিয়েছে—কৃষ্ণলীলা চলেছে। বিপ্রলব্ধা রাই দুঃখ আর অভিমানের দহনে ছটফট করছেন, সেই জায়গা।

বড়-গাঙে এবার। সুতীব্র স্রোত আর পিঠেন বাতাস পেয়ে নৌকা তীরের বেগে ছুটছে। গান শুনতে শুনতে ধর্মপ্রাণ জগবন্ধু তদগত হয়ে পড়েছেন, চোখের কোণে প্রেমাশ্রু—

কী কাণ্ড লহমার মধ্যে! চড়ন্দারেরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জগবন্ধুর উপর। দাঁড়িরাও দাঁড় ফেলে তাদের সঙ্গে এসে জুটেছে। সকলের আগে দু-পাশের সিপাহি দুটোকে লাথি মেরে মাঝনদীতে ফেলল—সাঁতার দিয়ে কূলে উঠতে পারে তো আপত্তি নেই। কিন্তু জগবন্ধুকে ছেড়ে দেবে না। টুঁটি চেপে ধরেছে তাঁর। চোখ আর মুখ বেঁধে ফেলল কাপড় দিয়ে। দেখতে পান না আর কিছু। এমন শক্ত বাঁধনে বেঁধেছে, খুলে দিলেও বোধকরি বহুক্ষণ ঐ দুটো ইন্দ্রিয়ের সাড় হবে না। এবারে হাত দুটো পিছমোড়া দিয়ে বাঁধে, চোখ-মুখের বাঁধন খোলায় একটু যে চেষ্টা করবেন সে উপায় রইল না। চোখ বাঁধার মুহূর্তটিতে বড় সিঁদুরকৌটা-পরা বউটাকে এক নজর দেখতে পেয়েছিলেন—কৌতুকের হাসিতে মুখ ভরে গেছে তার। আর সেই যখন চেঁচানি দিলেন, ভক্তপ্রবর বৈরাগী সঙ্গে সঙ্গে গানের গিটকিরি দিয়ে উঠল। চড়ন্দার কজন জগবন্ধুর মুখে কাপড় গুঁজে দ্রুতহাতে বাঁধাছাঁদা করছে, আর স্বরলয়ে সুললিত দোয়ারকি করে চলেছে। খোল-কত্তালও ছিল নৌকোর পাটার নিচে, বের করে এনে তুমুল বাজনা শুরু করল সেই সঙ্গে। মাতামাতি ব্যাপার—তার ভিতরে জগবন্ধুর আর্তনাদটুকু একেবারে তলিয়ে গেল। প্রতিক্ষণ তিনি ভাবছেন, সিপাহিদুটোর মতো তাঁকেও দেবে এইবার এক ধাক্কা। সাঁতরে জলের উপর ভাসবেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে সুযোগ হবে না। নদীতলে ভবের খেলার ইতি।

কিন্তু জগবন্ধু সামান্য ব্যক্তি নন, একটা থানার বড়বাবু। সিপাহিদের মতো অত সহজে তাঁর রেহাই নেই। নৌকো জোরে ছুটিয়ে দিল। গীতবাদ্য শুরু।

দাঁড় তো আছেই, তার উপরে বোঠে পড়ছে অনেকগুলো। দাঁড়ে-বোঠেয় মিলে জলের উপর আলোড়ন তুলে নৌকো এই যেন একবার আকাশে উঠে যায়, আবার তখনই পাতালে নামে।

হঠাৎ মনে হয়, বড়-গাঙে নেই আর, সরু খালে ঢুকে পড়েছে। পাড়ের জঙ্গল গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এ কোথায় নিয়ে চলল—চোখ-বাঁধা অবস্থায় জগবন্ধু আকাশপাতাল ভাবছেন।

এগারো

মাছ ধরায় বড় স্ফূর্তি সাহেবের। কিসে বা নয়? দিনকে দিন সে স্ফূর্তি বেড়েই চলছে। কত কায়দাকানুন কত রকম বুদ্ধি খেলানো। নফরকেষ্ট ইদানীং বড় একটা যায় না। মেজাজ আলাদা, একটা কাজ বেশি দিন ধরে থাকা পোষায় না তার। একাই যায় সাহেব, নফরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়। বংশীর সঙ্গে প্রায়ই জঙ্গলের মধ্যে দেখা হয়ে যায়। দু-একবার তুষ্টু ডোমকেও দেখেছে।

ছিপ বড় হতে হতে আস্ত এক তলতাবাঁশে দাঁড়াল। ছিপের মাথা দীঘির অনেক দূর অবধি যায়। এত বড় ছিপ অন্য কারো নয়। টোনের সুতো পাকিয়ে গাবের জলে ভিজিয়ে নিয়েছে, আড়াই-পেঁচি জোড়া-বড়শি তার সঙ্গে পুঁটলি-করা। মাছ তো মাছ, এ হেন ছিপে কুমির গেঁথে তোলাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। আর, আশ্চর্য সাহেবের কান দুটো। কত দূরে হিঞ্চেকলমির দামের নিচে কিম্বা হোগলার বনে ক্ষীণ একটু শব্দ—মাছ কি অন্য-কিছু নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়ে সেখানে ছিপ ফেলবে।

সকালবেলা বলাধিকারী ঘুম ভেঙে উঠলে কাজলীবালা ঝুড়িতে মাছ ঢেলে এনে দেখায়: কাল রাত্রের এইগুলো—

চেহারা কী মাছের! কালো কুঁদ। ভাঙাচোরা ঘাটের ইটের গায়ে যেমন, মাছের গায়েও তেমনি যেন যুগযুগান্তরের শেওলা জমেছে। সেকালের নীলকরদের আমল থেকেই বোধকরি বছর বছর পোনা ছেড়ে পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ঘরসংসার করছিল, সাহেব এতদিনে জল থেকে টেনে টেনে তুলছে।

বলাধিকারী বলেন, কোথায় সাহেব?

কাজলীবালা বলে, ফিরেছে ভোররাত্রে। খুব আহ্লাদ হয়েছে তো—ডেকে তুলে দেখায়: চেয়ে দেখ বুনডি (বোনটি), মাছ তো নয়—দত্যি-দানো। ঘুমুচ্ছে এখনো ঠিক।

বলতে বলতে সাহেবই এসে উপস্থিত। একা নয়—এত সকালেও বংশী তার সঙ্গে। এবং আরও একজন—সেই তুষ্টু ডোম।

সাহেব বলে, ইচ্ছে তো ছিল ঘুমোবার। ঘুমোতে দিল কই! কাল সন্ধ্যায় তুষ্টু গাঁয়ে এসেছে। দীঘি থেকে ফিরল না, সোজা এইখানে এসে বসে আছে।

বলাধিকারীর দিকে চেয়ে বলে, আপনার কাছে এসেছে। খবর বলবে।

বংশী পরমোৎসাহে বলে, ভাল একখানা ফসলের ক্ষেত—

সাহেব বলে, হুকুম দিয়ে দেন, দেখে আসি। ফসল কিছু তুলে এনে দিই।

বলাধিকারীর সেই স্তোক-দেওয়া কথা: হবে, হবে। ধৈর্য ধরে থাক, জলে পড়ে যাস নি তো। ছুটকো কাজে বিপদ বেশি, হুট করে যেতে নেই।

সাহেব অধীর কণ্ঠে বলে, বিনি কাজে হাঁটুতে কনুয়ে মরচে ধরে গেল যে। হাত-পা নাড়তে গেলে এর পরে কড়কড় করে উঠবে, ভেঙে যাবে।

বলাধিকারী তাচ্ছিল্যের ভাবে বলেন, তুষ্টু আনল খবর, সেই খবরের উপর বেরুতে চাস?

তুষ্টুর মুখে নজর পড়ে বলাধিকারী শিউরে ওঠেন! আরে সর্বনাশ! সাংঘাতিক কেটে গেছে তো! কেমন করে কাটল তুষ্টু?

ইট মেরেছিল মনিবঠাকরুন।

জগবন্ধু চুকচুক করেন: চোখটা খুব বেঁচে গেছে। ঘা অমনভাবে থাকতে দিসনে, অষুধপত্তর কর কিছু। চক্ষু বিনে জগৎ অন্ধকার।

কিন্তু চোখের জন্য তুষ্টু আপাতত উদ্বিগ্ন নয়। আগের কথা ধরে আহত কণ্ঠে বলে, আমার কথায় বেরুনো যাবে না—আমি কি ঝুটো খবর এনে দিই বলাধিকারীমশায়?

ঝুটো কে বলছে? কিন্তু অমন আজামোজা খবরে লাভ তেমনি কিছু হয় না। বিপদই হয়। খবর জোগাড়ের পদ্ধতি আছে রীতিমতো। কঠিন কাজ। খবর এক ভাবের একটা এসে গেল—তার পরে ঠিক কোন খবরটা চাই, তার পরেই বা কি—ধাপে ধাপে এমনি সাজিয়ে যেতে হয়। খবর সাজানো যদি ঠিকমতো হয়, কারিগরের যদি খানিকটা হুঁশ আর হাত থাকে কাজ নিগোলে নেমে যাবে। সেই জন্যে দেখতে পাও না ভালো খুঁজিয়ালের দেমাক কত! খোঁজ পৌঁছে দিয়ে নবাব-বাদশার মতো ঘরে শুয়ে নাক ডাকছে—বমালের একখানা বখরা আগেভাগে তার নামে আলাদা করে রেখে তারপর ভাগাভাগি।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বেলা একআনাতেও হবে না, বাড়তি আরও আধআনা। কাজের গুণে খুশি হয়ে দেয়। এর জন্য শিক্ষা তো আছেই, সকলের বড় গুণ হল মাথা খেলানো। ভালোমন্দের যতটুকু সেখানে ঘটতে পারে, ভটচাজমশায় ছক ধরে সব বলে দেয়।

তুষ্টু নাছোড়বান্দা : ভটচাজমশায় না হল, আপনি একবার অবধান করুন। যে দেশে কাক নেই, সেখানে বুঝি রাত পোহায় না!

তবু নয়। তুষ্টুকে অগ্রাহ্য করে বলাধিকারী আবার সেই মাছ মারার প্রসঙ্গ তুললেন। সাহেবের দিকে ফিরে বলেন, যা কাণ্ড আরম্ভ করেছিস সাহেব, আর কিছু দিন পরে শেওলা-ঝাঁঝি ছাড়া থাকতে দিবি না দীঘির জলে।

রসান দেয় বংশী : আর যা কান-চোখ-নাক-বুদ্ধি-সাহস সাহেবের, কাজে একবার নেমে পড়লে লোকের ঘরেও হাঁড়িকলসি ছাড়া অন্য কিছু থাকতে দেবে না।

হাসাহাসি খানিকটা। হাসিমুখে সাহেব প্রশংসা পরিপাক করে নেয়। তুষ্টু কেবল গুম হয়ে আছে।

সাহেব বলে, কুঠিবাড়ির বাগবাগিচা দেখলাম তো ঘুরে ঘুরে। দীঘির অন্ধিসন্ধি নাড়িনক্ষত্র দেখে নিয়েছি। মূলবাড়িটা কিন্তু আজও দেখি নি বলাধিকারীমশায়।

বংশী বলে, ঢোক নি দালানকোঠায়?

কাজলীবালা তাড়াতাড়ি বলে, না ঢুকে ভাল করেছে। ভেঙেচুরে যা হয়ে আছে। কেউটে-কালাজ বাঘ-শুয়োর কোন জন্তুটা যে নেই ওখানে, কেউ জানে না।

সাহেব হেসে বলে, তার জন্যে ভেবো না বুনডি। আমি এক জন্তু— গেলেই আমাদের মুখ-শোঁকাশুঁকি হবে, যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। ভয়ে যাই নি, সে কথা নয়। বলাধিকারীমশায়কে নিয়ে একসঙ্গে যাবার বাসনা। জায়গা দেখতে দেখতে আর ওঁর কথা শুনতে শুনতে যাব। উনি আমায় ভরসা দিয়ে রেখেছেন।

বলাধিকারীর দিকে তাকিয়ে বলে, একলা যাইনি কোন-একদিন আপনার সঙ্গে যাওয়া হবে বলে। চোখ বেঁধে নিয়ে ফেলল হঠাৎ সেই জায়গায়। সেই গল্প আপনার মুখে শুনতে শুনতে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠব। ভাঙা ছাতে গিয়ে দাঁড়াব। আগেভাবে দেখা হয়ে গেলে গল্পের সে রস পাবো না। আশায় আশায় ধৈর্য ধরে আছি। নইলে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের সঙ্গেও চলে যাওয়া যেত। আমি গরজ করি নি।

শোন হে, সাহেব কি বলছে শোন তোমরা। বড় প্রীত হয়েছেন বলাধিকারী। বলেন, কবিমানুষ না হলে এমন বলতে পারে না। বিদ্যেসাধ্যি ভাল রকম থাকলে সাহেব বসে বসে পদ্য লিখত। না-ই লিখুক কাগজে, মুখে মুখে ঠিক পদ্য বানায়। গাঁয়ে গাঁয়ে এমন কত আছে—সাহেব আমাদের কবি চোর।

হাসতে হাসতে বলেন, এই যা-সব বলল—পদ্যই। ছন্দ-মিল না-ই থাকল, ভাবের কথা। সিঁধ কেটে এক চোর মহারাজ ভোজের প্রাসাদে ঢুকেছে। বিদ্বান সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তখন চৌরবিদ্যা শিখে চুরি করত। গুণের মানুষ অনেক থাকত তাদের মধ্যে। এই চোর হল কবি। ভোজরাজাও কবি। চোর একেবারে তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে—

অন্য কথা এসে পড়ে। সেকালে একালে তুলনা। বলেন, পূর্বাপর ভেবে দেখি আমি। একই ধারা চলে আসছে—চেহারাটা কিছু বদলেছে একালে। বিদ্বান বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত মানুষ আজও অনেকে জাঁদরেল চোর। সামান্য সাধারণ যারা সিঁধকাঠি নিয়ে বেড়ায়, ছিঁচকে-চোর তারা। চোরের মধ্যে ছোটজাত। দেশের যারা মাথা সমাজের যারা নেতা, দু-শ টাকা তাঁরা ছুতে যান না—লাখ লাখের কারবারি। নৈকষ্য-কুলীন তাঁরাই, চোরের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ।

গল্প বুঝি ফেঁসে যায়। সাহেব মনে করিয়ে দিল: রাজা ভোজের ঘরে চোর ঢুকে আছে কিন্তু বলাধিকারীমশায়।

বলাধিকারী বলতে লাগলেন, ভোজরাজা মস্তবড় কবি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, গবাক্ষে বসে কবিতা লিখছেন চাঁদের সম্বন্ধে! সিঁধ কেটে চোর ঢুকেছে সেখানে। রাজাকে দেখে অন্ধকার কোণে লুকিয়ে পড়ল। রাজা এক লাইন লিখছেন, আর আবৃত্তি করছেন সেটা। চোর তার চৌরকর্ম ছেড়ে মুগ্ধ হয়ে শুনছে। এক জায়গায় এসে আটকে গেল, লাগসই কথা হাতড়ে পান না রাজা। চোর কবিলোক, আত্মবিস্মৃত হয়ে সে পরের লাইন আবৃত্তি করে উঠল ছন্দ-অর্থ যথাযথ মিলিয়ে।

কে ওখানে—কে, কে? বিষম হৈ-চৈ, রাজবাড়িতে চোর ঢুকেছে। হাতকড়া দিয়ে চোরকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। পরদিন বিচার। বড় কঠিন শাস্তি তখনকার দিনে—সরকারি খরচায় খানাপিনা ও বাসের ব্যবস্থা নয়। শূলে চড়াত চোরকে, অথবা হাত কেটে দিত। শাস্তির বদলে রাজা দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন পাদপূরণের পারিশ্রমিক। কবিসম্মান দিলেন।

ঠিক হল, আজকেই—আজ বিকালে কুঠিবাড়ির অট্টালিকায় যাবেন সকলে।

সাহেব ও বংশী যাবে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকেও বলা হবে। জগবন্ধু নিয়ে যাবেন সকলকে। তাঁর জীবনের উপাখ্যান পুঁথিপুরাণের ঠিক উল্টো—পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়। তাঁর মুখেই সব শোনা যাবে।

নদী থেকে একটা খাল ঢুকে পড়েছে গ্রামবসতির ভিতর। খাল মজে আসছে দিনকে দিন। মরা-ভাঁটিতে এমনও হয়, নিতান্ত ডিঙিনৌকো কাদায় আটকে পড়ে। খালের কিনারে অতিকায় আম-কাঁঠাল বট-তেঁতুলের ছায়ায় জঙ্গলে-ঢাকা ভাঙাচোরা অট্টালিকা—অতীতের নীলকুঠি। কুঠি বানানোর আগে থেকেই ঐসব গাছ, চেহারা দেখে সংশয় থাকে না। নৌকো ও গরুর গাড়ি বোঝাই দিয়ে আঁটি আঁটি নীল এনে ফেলত। ওজন হত কাঁটা খাটিয়ে। গোমস্তা ওজন টুকে রাখত খেরো-বাঁধা প্রকাণ্ড খাতায়। বড় বড় চৌবাচ্চার ভিতর নীলের আঁটি নিয়ে ফেলত। কপিকলে খালের জল তুলে চৌবাচ্চা ভরত, নীল পচান দেওয়া থাকত জলের মধ্যে। সমস্ত এইসব গাছের তলায়। অনতিদূরে কাছারিঘর—রাবিশে ভরতি হয়ে একেবারে অগম্য এখন। ঐখানে ফরাসের উপর খাতার হিসাব দেখে কুটির দেওয়ান খাজাঞ্চিকে বলে দিত—আঙুলে টুংটাং টাকা বাজিয়ে দাম শোধ করে নিয়ে যেত ক্ষেতেলরা। গাছগুলো চেয়ে চেয়ে দেখেছে। নীলকর সাহেবেরা হাঁটুভর কাটা ভেঙে ক্ষেতে ক্ষেতে চাষ দেখে বেড়াত, দিনে দিনে তারপর লাটবেলাট হয়ে উঠল এক একজন। তেতলা অট্টালিকা উঠল। সাগর-পারের নীলনয়না মেমসাহেবও দু-চারটি থেকে গেছে ভাঁটিঅঞ্চলের এই দুর্গম পাড়াগাঁ জায়গায়। সমস্ত জলুষ তারপরে অস্তগত হল একদিন। মানুষজন কতক মরেহেজে গেল, কতক বা এখানে সেখানে ছিটকে পড়ল বেমালুম হয়ে। মহাবৃদ্ধ গাছগুলো পাতা ঝিলমিল করে সমস্ত দেখেছে।

জগবন্ধু দারোগাকে নিয়ে নৌকো সরু খালে ঢুকে পড়েছে। পাড়ের জঙ্গল গায়ে এসে লাগে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় আকাশপাতাল ভাবছেন তিনি। নৌকো বেঁধে অনেকে এইবার ধরাধরি করে কাঁধের উপর তাঁকে তুলে নেয়। নিয়ে চলল কোথায় না জানি। ধপাস করে এনে ফেলে ইটে-বাঁধানো জায়গার উপর। ভারী বস্তু দূর-দূরন্তর থেকে বয়ে এনে কাঁধ ফেলে লোকে যেমন সোয়াস্তি পায়। সেকালে শ্রান্ত মুটেরা বোধকরি নীলের বোঝা এমনি এনে ফেলত। কাঁটাঝোপ জায়গাটায়, জগবন্ধুর সর্বাঙ্গ ছেড়ে গেল। জোড়-হাতে ভর দিয়ে কোন গতিকে উঠে তিনি জবুথুবু হয়ে বসলেন। অনেকগুলো গলা পাওয়া যাচ্ছে। নৌকোর সবগুলো মরদ এসেছে, বাড়তিও বুঝি ছিল এখানে।

সকলকে নিয়ে বলাধিকারী এইবার অট্টালিকার সামনে রোয়াকের উপর উঠলেন। বললেন, এমন কসাড় জঙ্গল তখন হয়নি। কয়েকটা কাঁটাঝিটকের গাছ—সেই কাঁটা গায়ে বিঁধছিল। লোক চলাচল কিছু ছিল, বেচা মল্লিকের খাস যে দল, তাদের ওঠা-বসার আড্ডা এখানে। বিচারের জন্য আমায় এনে ফেলল। ঠিক কোনখানটি বলুন দিকি ভটচাজমশায়। আমার চোখ বাঁধা তখন। পৈঠা থেকে উঠেই রোয়াকের এই জায়গা, আমার মনে হয়। আপনি সঠিক বলতে পারবেন।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য ঘাড় কাত করে বলে, হ্যাঁ জায়গা এখানেই।

সাহেবের দিকে চেয়ে হেসে ক্ষুদিরাম বলল, আমিও ছিলাম দলের মধ্যে বসে। একটা কথা বলিনি, কথা শুনলেই বলাধিকারীমশায় টের পেয়ে যাবেন। সিঁদুর-পরা যে মেয়েলোক উনি নৌকোয় দেখে এলেন—ভাল ঘরের মেয়ে, নামটাও ভাল—মুক্তাময়ী। দৈবচক্রে দলে এসে পড়েছিল। বিষম সাহসী, ঘরবাড়ি ছেড়ে নৌকোয় নৌকোয় বেচা মল্লিকের সঙ্গে ঘুরত। সর্বনেশে নিয়তি তার. ভাবলে আজও কষ্ট হয়। সেই মেয়ে একদিন চালান হয়ে গেল—রটনা আছে, দীঘির ধাপের নিচে—রাতে রাতে যেখানে মাছ ধরে বেড়াও তুমি সাহেব। প্রণয়ের শেষ পরিণাম। সে এক ভিন্ন উপাখ্যান। আর সেই যে গেরুয়া-পরা মধুকণ্ঠ বৈরাগী—এখনো সে কাপ্তেন কেনা মল্লিকের সঙ্গে কাজকর্ম করে। একটা হাত নেই বলে হাত-কাটা বৈরাগী নাম হয়েছে। ভক্ত মানুষও বটে, ভগবৎ-কথায় দরদর করে অশ্রু পড়ে। এমনি সব রকমারি মানুষ দলের মধ্যে রেখে কাজ হাসিলের সুবিধা হয়। এসব তোমায় শেখাতে হবে না—কাঁটার মুখ ঘষে ধার করতে হয় না, তুমিই নিজেই একদিন শিখেবুঝে নেবে সাহেব।

জগবন্ধু বিচার বসল এখানে, এই রোয়াকের উপর। চোখ-মুখ-হাত বেঁধেছে কিন্তু কান দুটো খোলা রেখে দিয়েছে—আসামি স্বকর্ণে বিচার শুনতে পাবে।

কোন ব্যবস্থা উচিত হবে, মতামত নিচ্ছে সকলের।

কেউ বলছে, সড়কি মেরে এ-কোঁড় ও-কোঁড় করো। কেউ বলে, মেলতুক দিয়ে চামুণ্ডার নামে বলি দাও—মহাভোগে মা প্রসন্ন হোন। আবার কেউ বলছে, মাটির নিচে পুঁতে ফেল—পচে গোবর হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, বাইরে একটুকু গন্ধ আসবে না। মানুষটা যে দুনিয়ার উপর ছিল, কোনদিন নিশানা হবে না তার।

প্রতিটি প্রস্তাব জগবন্ধু শুনে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁকে শোনাবার জন্যেই বলা।

শেষটা ভারী গলায় একজন বলে—পরে জেনেছেন, কাপ্তেন বেচারাম সেই মানুষটা—বেচা মল্লিক বলল, এটা কি বলছ—মানুষে টের পাবে না, তবে আর শাস্তিটা কি হল! কত থানাই তো আছে—থানার উপরে দারোগাও এই নতুন আসেনি। মানিয়েগুছিয়ে চিরদিন কাজকর্ম হয়ে আসছে। শয়তান এই লোকটা। মেয়ের বিয়ের সময় ইজ্জত বাঁচিয়েছিলাম, বিনি খবরে জামাই এসে পড়লে ছুটোছুটি করে তারও সুরাহা করে দিই: উপকার মনে না রেখে উল্টে ফেউ হয়ে পিছনে লেগে আছে। নেমকহারামির পরিণামটা লোকে জানবে না, শিক্ষা হবে তবে কিসে?

বেচারাম চুপ করল। নিস্তব্ধতা থমথম করছে। হুঁকো দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে কেউ, গুড়ুক টানার আওয়াজ শুধু। শাস্তিটা কোন পদ্ধতিতে হবে, তামাকের সঙ্গে তারই বোধহয় ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

আবার একজন বলে ওঠে, ফাঁসিতে লটকে দেওয়া যাক তবে। গাছের ডালে ঝুলুক। কোম্পানি বাহাদুর তিতুমীরের মানুষদের যেমন করেছিল। কাকে ঠুকরে ঠুকরে চক্ষু দুটো খেয়ে ফেলবে আগে। রোদ্দুরে ধড় শুকিয়ে কাঠ হবে। তাবৎ লোক দলে দলে এসে দেখবে।

ফড়ফড় করে অবিরত হুঁকোর টান। যে যা ইচ্ছা বলে যেতে পারে, কিন্তু শেষ কথা বেচারামের। হুঁকো নামিয়ে এইবারে সেটা উচ্চারিত হবে। বলল, নরহত্যা মহাপাপ, ওস্তাদের নিষেধ। সে কাজ ঠগীদের, আমাদের নয়। দেবী চামুণ্ডা তাদের উপর সেই ভার দিয়েছেন, মানুষ মেরে তারা দেবীর কাজ করে দেয়। আমরা আলাদা।

মুহূর্তকাল থেমে আবার বলে, তবে যদি কেউ নিজের ইচ্ছেয় মারা পড়ে, আমরা তার কি করতে পারি? তাই একটা মতলব ঠিক করলাম। দারোগার মরণ-বাঁচন তারই নিজের এক্তিয়ারে থাকবে, মরে তো আমরা সেজন্যে দায়ী হব না। অথচ মরবেই নির্ঘাৎ, বাঁচবার কোন উপায় নেই।

জগবন্ধু বলাধিকারীর মুখ বেঁধেছে চোখ বেঁধেছে, তবু যদি হাত দুটো ছাড়া থাকত কানের ছিদ্র আঙুলে আটকে দিতেন। বিচার তা হলে শুনতে হত না। যেটা ওরা করতে চায়, হঠাৎ অজান্তে ঘটে যেত। এমন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হত না! কী মতলব করেছে, তারাই জানে। চোখ ঠারাঠারি হয়ে থাকবে নিজেদের মধ্যে। নিয়ে চলল এইবারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে—

আজ জগবন্ধুও সেই পথে সিঁড়ি বেয়ে সাহেবদের উপরে নিয়ে চললেন। ঘরদোর প্রায় সমস্ত ভাঙা, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে তত বেশি অসুবিধা হয় না।

সাহেব বলে, এ যে রাবণের সিঁড়ি। শেষ নেই। যেন স্বর্গধামে উঠে যাচ্ছি।

বনাধিকারী বলেন, আমার ঠিক উল্টোরকম মনে হচ্ছিল সেদিন। সিঁড়ির শেষ যেন না হয়। এ জায়গায় আসিনি তার আগে, গ্রামটাও জানতাম না। হাত-বাঁধা দড়ি টেনে একজন আগে আগে উঠছে, পিছন পিছন ঠেলে দিচ্ছে ক'জনা। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। চোখে দেখবার উপায় নেই, প্রতিক্ষণে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল, ছাতে উঠে পড়লাম। ছাদে তুলে নিয়ে—তারপর কোন মতলব করেছে, ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে না কি করবে, কাপ্তেন কিছু তো বলল না! দেবী চামুণ্ডার কাছে মনে মনে মাথা খুঁড়ছি: এত অঘটন ঘটাও তুমি মা, একটা করে এই ধাপ উঠছি উপর দিকে ধাপ একটা সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়ে যায়। অনন্ত কাল উঠেও কখনো ছাদে পৌঁছব না। মা-চামুণ্ডার উপর পুরো ভরসা না করে, নিজেও যতটা পারি ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলেছি। জীবনের মেয়াদ কোন না বিশ মিনিট আধ ঘণ্টা বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে এই কৌশলে।

উপরের লোকটা, হাতের দড়ি ধরে যে টানছে, বিরক্ত ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে: বলি সারা-রাত্তির লাগাবে নাকি এই কটা সিঁড়ি উঠতে? আপসে না যাবে তো বলো, কোমরে কাছি বেঁধে তুলে দিই।

মুখ তো জবর রকমে বেঁধে দিয়েছে, তবু আমায় জবাব দিতে বলছে। জবাব না পেয়ে চটেমটে গেল বোধহয়। ঠিক কাছি না বাঁধলেও প্রায় তার কাছাকাছি বটে—নিচের মানুষে উপরের মানুষে বল লোফালুফি করতে লাগল যেন আমায় নিয়ে। ধাঁ ধাঁ করে উঠে যাচ্ছি। কত উঁচুতে নিয়ে তুলল রে বাবা—হাত বাড়ালে আকাশে ঠেকে যাবে, এমনিতরো মনে হচ্ছে। অবশেষে থামল এক সময়। পা বুলিয়ে বুলিয়ে বোঝা গেল, সমতল জায়গা। ছাদে এসে গেছি। মনের মতলব কাপ্তেন বলবে এইবারে।

সেদিন চোখ বেঁধে ধাক্কাধাক্কি করে নিয়ে এসেছিল। আজকে জগবন্ধু খোলা চোখে সেই ছাদে উঠে এসে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্দিক দেখাচ্ছেন। দেখ অবস্থা তোমরা, এক-মানুষ সমান উলুঘাস—গরু-বাছুর ছাতে উঠে চরে খেতে পারে না, ঘাসের তাই এমন বাড়বৃদ্ধি। যজ্ঞডুমুরের ডাল ঘিরে গয়না পরার মতো কত ফল ধরে আছে—ভাল কথায় যার নাম যজ্ঞডুমুর। দেয়ালের ভিতর শিকড় ঢুকিয়ে বটের চারা মাথা তুলছে—বটফল কাকে মুখে করে আনে, বীজ পড়ে গাছ হয় শুকনো ইট-চুন-সুরকির ভিতরেও। জীবন কোথায় যে নেই—যা-হোক একটু আশ্রয় পেলেই ডালপালা মেলে ধরবার জন্য মুখিয়ে থাকে জীবন।

শক্ত ঠেলে কূল পান না।

সে রাত্রে এই ছাতে জগবন্ধুকে তুলে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ, লোকগুলো জিরিয়ে নিচ্ছে। একটা অতি-কষ্ট বজ্র তারপরে অনুমতি চাইল লো কাপ্তেন এবারে—

কাপ্তেন বেচারাম ভরাট গলায় বলে, হাতের দড়ি খুলে পা দুটো বেঁধে কেল ঐ দড়িতে। আলসের ওধারে নিয়ে ঝুলিয়ে দাও।

সেই ব্যবস্থা হতে লাগল। জগবন্ধুকে সোজাসুজি ডেকে বেচারাম এবার বলে, ও সাধু-দারোগা, শুনে নাও। মানুষ আমরা মারিনে। ওস্তাদের মানা, কাজেরও বদনাম হয়। এত শত্রুতা করেছ, দুটো হাত তবু ছাড়া রইল। ছাতের আলসের মাথা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাকে। বাদুড় ঝুলে থাকে, চামচিকে ঝুলে থাকে, তুমি কেন পারবে না হে? তাদের চেয়ে অক্ষম কিসে? কপালে থাকলে পথ-চলতি মানুষ ঘাড় উঁচু করে দেখে উদ্ধার করবে। শক্ত করে ধরে থাক, হাত সরে না যায়। কতগুলো সিঁড়ি ভেঙে কত উঁচুতে উঠেছ, আন্দাজ আছে তো? পড়ে গেলে ছাতু-ছাতু হয়ে যাবে কিন্তু। সে মারার জন্য ধর্মের কাছে আমরা দায়ী হব না।

গল্প হতে হতে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে জগবন্ধু হেসে ওঠেন: আর এই ভট্টাচাজমশায়ের ব্যাপার দেখ। এত বড় বন্ধুলোক সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে রয়েছেন, অথচ একটি কথা বলছেন না আমার দিক হয়ে। সুহৃদের যন্ত্রণা চুপচাপ চোখে দেখে যাচ্ছেন।

ক্ষুদিরাম বলে, বিপদ কোথায় হল, যন্ত্রণাই বা কিসের? আপনার উদ্ধারের জন্য শলাপরামর্শ করেই আমরা নেমেছি। কাপ্তেন থেকে চুনোপুঁটি অবধি সকলে। চোখ বাঁধা বলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, কথাগুলো কেবল শুনে যাচ্ছেন। মুখে রুক্ষ কঠিন কথা, কিন্তু মুখের উপরে হাসি।

সাহেবকে ক্ষুদিরাম বলে, বেচারাম নিজে আমায় বলল, দারোগাবাবুকে এনে ফেল দলের মধ্যে। এমন সাচ্চা মানুষটা অপথ-বিপথ ঘুরে নষ্ট হয়ে যাবেন, সেটা ঠিক হবে না। ঘনিষ্ঠতা তখন থেকেই। সদরের পথে সুবিধা হয় না তো অন্দরে আগে পশার জমালাম।

সাহেব বলে, সাচ্চা মানুষ সৎপথেই তো ছিলেন, নষ্ট হবার কথা এলো কিসে?

ক্ষুদিরাম বলে, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের কথা জানিনে, কিন্তু যাকে সৎপথ বলছ সেই পথ ধরে থাকলে এ-যুগে সকলে আঙুল দিয়ে দেখায়—

সাহেব বলল, আঙুল দেখিয়ে বলে, মহৎ মানুষ—আদর্শ মানুষ—

শুনিয়ে শুনিয়ে তাই হয়তো বলে। কিন্তু মুখ টিপে হাসে। মনে মনে বলে

হাঁদারাম সাহেব বলে, এ একের যে আলাদা মতিগতি। মানুষকে মিথ্যাবাদী শঠ ফেরেব্বাজ ... এটা গালি হয় না আজকের দিনে। শুনে কেউ অবাক হয় না, ঘৃণা করে না। কেননা নিয়মই এই দাঁড়িয়েছে—শতকরা সাড়ে নিরানব্বুয়ের এই নিয়ম। বাকি যে আধজন রইল, ধর্মধ্বজী বলে হাসতে হাসতে তাদের আঙুল দিয়ে দেখায়! বাড়ির বুড়োহাবড়া মানুষ সম্পর্কে একটা প্রশ্রয়ের হাসি থাকে, সেই রকম। ক'দিন আর আছেন, যা করছেন করুনগে যান। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যা মুছে যাচ্ছে, তাকে অবহেলা করাই ভালো। কিন্তু বলাধিকারীমশায়ের মতো মানুষকে ওরা তেমন হতে দেবে না—

বলাধিকারী বললেন, ভটচাজমশায় যখন তখন আমার জপাতেন, তাঁর যে একটা স্থির উদ্দেশ্য ছিল ধরতে পারি নি। "সদা সত্য কথা বলিবে" "চুরি করা বড় দোষ"—এমনি সব সাধুবাক্য একফোঁটা বয়স থেকে ছেলেদের আমরা পড়াই বানান করে মানে শেখে তারা। কিন্তু মন অবধি কি পৌছায়, সত্যি কোন কাজে আসে কী জীবনে? যে মাস্টার পড়ান, তিনিও একবর্ণ বিশ্বাস করেন না। এই সমস্ত শোনাতেন আমায় ভটচাজমশায়।

বলাধিকারী আবার বলেন, কত দিনের কত সব কথা! কোন এক কালে এসবের জীবন্ত অর্থ হয়তো ছিল, আজকে একেবারেই নেই। পাপ বলতে চাও বলো, কিন্তু এ বড় দুরন্ত পাপচক্র। একটা মানুষের সাধ্য কি চক্রের বাইরে থাকতে পারে? পুরানো যুগের মৃত্যু না-ও যদি স্বীকার করো, শতসহস্র ক্ষতে মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছে সে যুগ। ধুঁকছে, কোন অঙ্গের তিলপরিমাণ অংশে সুস্থ নেই। বৃহৎ বনস্পতি ভূশায়ী হয়ে পচে গলে যাচ্ছে, তার দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেল, আপত্তি করব না। কিন্তু বাঁচিয়ে তুলে আবার পত্রসঞ্চার ঘটাবে, নিতান্তই পণ্ডশ্রম সেটা। এমনি চেষ্টা যে করতে যায়, বোকা বলে সে হাস্যাস্পদ হয়। যে বস্তু জীবনের বাইরে চলে গেছে, শতকরা একজনকেও ধারণ করছে না—জোর করে বললেই সেটা ধর্ম হয়ে যায় না।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের দিকে চেয়ে হাস্যমুখে বলাধিকারী বলেন, এমনি সব বলতেন আপনি, মনে পড়ে?

ক্ষুদিরাম ঘাড় কাত করে স্বীকার করে নেই। বলে, সাচ্চা মানুষের সর্বক্ষেত্র দরকার। আমাদের কাজকর্মে তো বেশি করে লাগে। চোরের সমাজে সকলের বড় গুণ, সাধু হতে হবে। বলাধিকারীমশায়ের উপর কাপ্তেনের তাই অত রোখ। ফলও এখন দেখছে সর্বজনা। বলাধিকারীমশায় গ্যাট হয়ে ঘরে বসে থাকেন—কত কত কাপ্তেন কাজকর্ম নিয়ে পায়ের কাছে ধর্না দিয়ে এসে পড়ে। মহাজন-খলেদারের অন্ত নেই—গণ্ডা গণ্ডা নানান দিকে ফ্যা-ফ্যা

করে বেড়াচ্ছে। আর বলাধিকারীমশায় দেখ, কাজ ঠেলে কূল পান না। নেবো না নেবো না করে মাথা ভাঙলেও রেহাই দেবে না।

বলাধিকারী বলেন, ইষ্টমন্ত্র সকলের আগে এই ভটচাজমশায় আমার কানে দিলেন। সেই নাম জপ করে চলেছি। এ পথের দীক্ষাগুরু—ওঁকে ভাই সকলের বড় মান্য নিই।

জগবন্ধু হাত ছেড়ে দিয়ে যদি পড়েই যান, সে কারণে বেচারামের দল ধর্মের কাছে দায়ী হবে না। ধর্ম তরিয়ে ধুপধাপ সিঁড়ি বেয়ে সকলে নিচে চলে গেল। ছাতের আলসে ধরে জগবন্ধু ঝুলতে লাগলেন। খপর রাখে, রীতিমতো জিমনাস্টিক-করা মানুষ তিনি। রাখবে না কেন—ক্ষুদিরামই রোজ সকালবেলা তাঁকে নিয়মিত ব্যায়াম করতে দেখেছে। হাতের বদলে পা দুটো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে, পায়ের সাহায্য নিয়ে কৌশলে ছাতের উপর যাতে উঠে আসতে না পারেন। ঝুলতে লাগলেন বলাধিকারী সেই অদ্ভুত অবস্থায়।

এক হাতে একটুখানি ঝুলে থেকে অন্য হাতে মুখের বাঁধন খোলা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখেছেন। অসম্ভব। সে বাঁধন ছুরি দিয়ে না কাটলে হবে না। তা ছাড়া একখানা হাতের উপর এত বড় দেহের ভার—গেলেন বুঝি এই পড়ে—হাত ত্রিশেক নিচে। দুটো হাতে তাড়াতাড়ি আলসে চেপে আপাতত আত্মরক্ষা করলেন। ঝিঁঝির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে অনেক দূরের ভূমিতলে, তক্ষক ডাকছে পরিত্যক্ত বাড়ির অন্ধিসন্ধিতে। নৌকো ভাসিয়ে দস্যুদল এতক্ষণ চলে গেল কাঁহা-কাঁহা মুলুক। উজ্জ্বল সিঁদুর-পরা সেই দুর্বৃত্ত রূপসী হয়তো খলখল করে হাসছে, মধুকণ্ঠী বৈরাগী কর্মসিদ্ধির আনন্দে আরও মধুর ভক্তি-রসের গান ধরেছে। কত রাত্রি এখন না জানি—কতক্ষণে রাত পোহাবে! পথের মানুষ দৈবক্রমে উপরমুখো তাকিয়ে আজব কাণ্ড দেখবে—লাউয়ের মাচায় ফলন্ত লাউ যেমন ঝোলে, একটি মানুষ তেমনি ছাতের আলসে ধরে ঝুলে আছে।

কিন্তু দুটো হাতেও তো দেহভার রাখা যায় না, হাত টনটন করছে। মরীয়া হয়ে জোড়া-পায়ের একটা দোলন দিতে কার্নিশ পায়ে ঠেকল। আলসের খানিকটা নিচে দিব্যি উঁচু কার্নিশ। পা-দুটোর আশ্রয় হল, খানিকক্ষণ তবে যুঝে থাকা যাবে। জগবন্ধু ঝুলছেন না আর এখন—আলসের মাথা দু-হাতে আঁকড়ানো, পা কার্নিশের খাঁজে, ধনুকের মতো দুমড়ে রয়েছেন। জীবনকে যেন প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আছেন কার্নিশ আর আলসের মাঝের জায়গাটুকুতে। কিন্তু কতক্ষণ আর! মা-চামুণ্ডা, তাড়াতাড়ি রাত পুইয়ে সকাল করে দাও মানুষ ঘুম ভেঙে বেরিয়ে চলাচল শুরু করুক।

পোহাল রাত অবশেষে। চামুণ্ডার দয়ায় তাড়াতাড়ি পুইয়েছে, তা নয়। বরঞ্চ উল্টো। মা যেন রাতটাকে টেনে টেনে বেধড়ক লম্বা করে সন্তানের ধৈর্য্যের পরীক্ষা করলেন। কাকপক্ষী ডাকছে, মানুষের কথাবার্তাও একটু বুঝি কানে পাওয়া যায়। রোদ চড়ে উঠল, সেঁক লাগছে গায়ে। হে মা-কালী, মানুষজনের উঁচুমুখো নজর তুলে দাও, কেউ না কেউ দেখে ফেলুক।

কি নিয়ে তর্ক করতে করতে জনকয়েক একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আবার ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। নিরাশ হয়ে পড়লেন জগবন্ধু। জীবন আঁকড়ে ধরা আছে কয়েকটা মাত্র আঙুলের ডগায়। প্রাণপণে ধরে আছেন—কিন্তু কতক্ষণ আর! হাত দুটো খসে যাবে কোন মুহূর্তে। গলা ফাটিয়ে মানুষের উদ্দেশে শোনাতে চান: শোন, শুনছ গো তোমরা? পা-ফেলে-চলা মাটিটুকুই সব নয়, মাথার উপরেও আছে। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখ।

হায় রে, বাঁধা-মুখে আওয়াজ বেরোয় না। মানুষ ঘুরবে ফিরবে সারাদিন, দিন গিয়ে সন্ধ্যা হবে, রাত্রি হবে। আকাশমুখো কেউ তাকাবে না।

এমনি অবস্থায় নতুন দৃষ্টির যেন উন্মেষ হচ্ছে। সদাচার ও সাধুতার কথা মুখে বলা ভাল। কিন্তু জীবনে যারা সত্যি সত্যি প্রয়োগ করতে যায়, আহাম্মক বই তারা কিছু নয়। সৃষ্টিছাড়া হতে গিয়েই এই বিপত্তি। আর একবার বাঁচার সুযোগ যদি পাওয়া যেত, নতুন পথ ভেবে দেখতেন। কিন্তু সে আশা আকাশকুসুম বই কিছু নয়।

পিছনের অনেকগুলো দিন দ্রুত মনের উপর দিয়ে ছুটেছে—শিশু থেকে এই জোয়ানযুবো হয়েছেন, তার বহু ঘটনা। হঠাৎ মনে হল, ঝুলছেন না তিনি, শূন্যলোকে ভাসছেন রাজা ত্রিশঙ্কু হয়ে—স্বর্গেও নেই, মর্ত্যেও নেই। গভীর কালো তরঙ্গিত ছায়া নিম্নদেশে। হু হু করে পড়ে যাচ্ছেন তিনি সেখানে—আবর্তময় ভয়াল ছায়ানদীতে। ধারাস্রোত প্রবল এক পাক দিয়ে উল্কার বেগে নিয়ে চলল তাঁকে, লহমার মধ্যে পারবারে পৌঁছে দিল। পুরানো দিনের চেনা কণ্ঠধ্বনি অনেক কানে আসে, যেসব মানুষ বেঁচে নেই বলে জানেন। কিন্তু কঠিন ভাবে চোখ বাঁধা বলে দেখা যায় না কোন-কিছু। মুখ বাঁধা বলে ডাকতে পারেন না কারও নাম ধরে। পা বাঁধা বলে দাঁড়িয়ে কাছে যাবেন, সে উপায় নেই। হাত দুটোই শুধু খোলা আছে, আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন সেই হাত বাড়িয়ে দিলেন তাদের ধরবার অভিপ্রায়ে……তারপর আর কিছু মনে পড়ে না, খানিকটা সময় এর পরে একেবারে ফাঁকা। চেতনা অসাড় করে দিয়ে ডাক্তার অপারেশন করে, চেতনা ফিরে পেয়ে রোগি কিছুতে আর মাঝের অবস্থা মনে করতে পারে

না। জগবন্ধুরও ঠিক তাই—হাত ছেড়ে দেবার পরে অনেকখানি সময় মুছে রয়েছে তাঁর মনে, জীবন থেকে বেরিয়ে চলে গেছে।

মরেননি বলাধিকারী। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ঘড়ির হিসাব করেছিলেন। সর্বসাকুল্যে ঘণ্টা ছয়েক ছিলেন বোধকরি ঝুলন্ত অবস্থায়। কিন্তু কষ্টটা ছয় কিম্বা ছ-শ বছরের।

তেতলার ছাতে এনে তুলেছিল, ছাতের উপর ঐ যে চিলেকোঠা—। জগবন্ধু চিলেকোঠার আলসে দেখিয়ে দিলেন সাহেবদের। ক্ষুদিরাম সেই সময়টা মুখে হাত চাপা দিয়ে খিকখিক করে হাসছে। জগবন্ধুকে জানানো হয়েছিল: আলসের বাইরে দিকে তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছে—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত নিচে মাটি। আসলে ঝুল খাচ্ছিলেন তিনি চিলেকোঠার আলসে ধরে। কার্নিশে পা রেখে ধনুকের মতন দুমড়ে ছিলেন, সরলরেখায় থাকলে পা থেকে ছাত দেড়-হাত দু-হাতের বেশি নয়। একটা বাচ্চা ছেলেও সেটুকু নিরাপদে লাফিয়ে পড়তে পারে। অথচ আতঙ্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যমযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। মরার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থেকেও হাজার বার মরণ হয়ে গেল। হাত অবশ হয়ে পড়ে গেলেন একসময়—পতন মাত্র হাত দেড়েক নিচু ছাদে। গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, তবু কিন্তু অচেতন হয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। চোখ মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। আরও অনেকক্ষণ পরে সম্বিত পেয়ে চোখ মেলে চারিদিক দেখেন। কাপ্তেন বেচারাম কৌতুক করে গেছে—এত বড় বেকুবি কারো কাছে প্রকাশ করে বলার নয়।

সে দিনের এই মনোভাব। এখন লজ্জা ভেঙে গিয়ে বলাধিকারী হাঁকডাক করে সকলকে সেই বিচিত্র উপলব্ধির কথা বলেন: চোখের উপর মৃত্যুর স্পষ্ট চেহারাটা ভাল করে দেখে নিয়ে জীবন্তের মধ্যে ফিরে এসেছি আবার মৃত্যুভয় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি। অভিজ্ঞতা চাক্ষুষ বলেই প্রত্যয় আমার দৃঢ়। জীবন উত্তাল উদ্বেগময়, মৃত্যু শান্ত নিরুত্তাপ নিরুপদ্রব। মৃত্যুতে নয়, মৃত্যু-ভয়েরই যন্ত্রণা। সে ভয়ের কিছুমাত্র ভিত্তিভূমি নেই।

বারো

ধুঁকতে ধুঁকতে জগবন্ধু থানায় ফিরে দেখলেন, সাধুতার আরও পুরস্কার অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। সরকারের সুনাম ও প্রজাসাধারণের কল্যাণ বিবেচনা করে ডি-আই-জি সাসপেণ্ড করেছেন তাঁকে। তদন্ত হবে অভিযোগগুলোর

সম্পর্কে। চাকরি বজায় থাকবে কিনা তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। আপাতত ছোটবাবুকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ।

জগবন্ধু হেসে বলছেন, পাপের জয় পুণ্যের ক্ষয়—তার একেবারে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। আজকে উল্টো পথে চলে প্রতিষ্ঠা শতগুণ বেড়ে গেছে। বৃত্তিটা আমার গোপন কিছু নয়—মুখ ফুটে না বললেও জানতে কারো বাকি নেই। ছেলেছোকরারা তামাক খায় বুড়োদের আড়াল করে, বুড়োরা চোখে দেখেও না দেখার ভান করে। এখানেও ঠিক তাই। পুরানো ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা মোটামুটি বাতিল করে দিয়ে বাইরে আমরা একটু আবরু রেখে চলি এই পর্যন্ত।

কিন্তু জগবন্ধু যা-ই ভাবুন, ভুবনেশ্বরী একেবারে অবিচল। ধার্মিক পরিবারের মেয়ে তিনি—পিতামহ সিদ্ধপুরুষ। পুরোপুরি তেত্রিশ কোটি না হলেও সেই বাড়িতে বিগ্রহের সংখ্যা গুণতিতে আসে না। শিশু-বয়স থেকে এই ঠাকুরদেবতার মাঝখানে মানুষ তিনি। জগবন্ধুর চিরকাল পড়াশুনোর অভ্যাস—দারোগার চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও অভ্যাসটা ছাড়তে পারেন নি। বিয়ের পরে এক সময় ঝোঁক চাপল পুলিসের চাকরি ছেড়ে মাস্টারি করবে কোথাও। নিষ্পাপ নিরীহ পুণ্যকর্ম। ভুবনেশ্বরী নিরস্ত করলেন তাঁকে: এই চাকরি খারাপ হল কিসে? বহুজনকে রক্ষা করবার পবিত্র দায়িত্ব। মূর্খ লোভী প্রবঞ্চকেরা জুটেছে বলেই পুলিসের দুর্নাম। শিক্ষিত সজ্জনদেরই অতএব দলে দলে গিয়ে পড়া উচিত। চাকরি ছেড়ে সরে আসা কাপুরুষতা।

ভুবনেশ্বরীর কথায় বল পেতেন জগবন্ধু। চাকরি হল জনসেবা, মাইনেটা খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার সম্বল—এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। চুরি-ডাকাতি যে আজকেই ঘটছে, তা নয়। ঋগ্বেদে পর্যন্ত চোরের কথা। বাইবেলেও চোর-জোচ্চোরের প্রসঙ্গ। তাদের মনস্তত্ত্ব বিচার করা উচিত সহৃদয়তার সঙ্গে। শুধুমাত্র শাসনে এ বৃত্তি উৎখাত হবার নয়—তা হলে ইতিহাসের আদিযুগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তখনকার দিনে অতিশয় কড়া শাসন—চোরকে শূলে চড়াত, হাত কেটে দিত জলজ্যান্ত মানুষটার। সন্দেহের বশে প্রাণ হনন করাও হত। এই রকম অবিচারের বিরুদ্ধে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে মনু সতর্ক করে দিচ্ছেন: ন্যায়বান রাজা বমাল সমেত না পেলে কোন চোরের মৃত্যুদণ্ড দেবেন না, চোরাই মাল ও সরঞ্জাম সব হাতে-নাতে ধরলে তবেই চরম সাজা দেওয়া যেতে পারে। শাসনের কড়াকড়ির ফলে বরঞ্চ উল্টো-উৎপত্তি হয়ে দাঁড়াল—চোরের ইজ্জত বাড়ল, সংঘ গড়ে উঠল চোরেদের। চৌর্যধর্মের শাস্ত্র হল—চৌরচর্যা, ষন্মুখকল্প। খণ্ডিতভাবেও পুঁথিপুরাণ আছে—বিলুপ্ত

হয়ে গেছে আরও অনেক। বিরাট বিপুল মহাবিদ্যা। চৌরকর্মের অধি-দেবতাটিও সামান্য পুরুষ নন—দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি স্কন্দ বা কার্তিকেয়। প্রাচীন শাস্ত্রমতে চৌরপদ্ধতির প্রবর্তক তিনিই। বাংলাদেশের পুঁথিপত্রে আর এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী যাঁর—'নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।' নিজে তিনি ভক্তদের চুরিবিদ্যা শিখিয়ে বেড়ান। চৌরশাস্ত্রের সকলের বড় ঋষি বোধ হয় ভগবান কনকশক্তি। অপর এক জাঁদরেল শাস্ত্রকার মূলদেব। (নিজেও মহাগুণী তস্কর—শুধুই শাস্ত্র-বচন নয়, কায়দাগুলো হাতে-কলমে প্রয়োগের শক্তি ধরেন।) শাস্ত্রের ভাষ্যকার ভাস্করনন্দী। চৌষট্টি কলার একমত রূপে এই বিদ্যা বন্দিত হতে লাগল। দশকুমারচরিতে রয়েছে, সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও রাজকুমারের শিক্ষা সম্পূর্ণ হল না যতক্ষণ না চৌরশাস্ত্র সম্যক অধিগত হচ্ছে।

ইজ্জত কত চোরের! রৌহিনেয় জাঁক করছে—তার বাপ ঘুঘু-চোর, মা-ও তাই। পিতৃকুল মাতৃকুল কোনটাই হেলফেলার নয়। চোরসমাজে অতএব নৈকষ্যকুলীন বলতে হবে তাকে। বাপ পাখির মতন মুহূর্ত করে যে-কোন ঘরে ঢুকে যেতে পারে, আর রৌহিনেয় নিজে বিশেষ করে নানা পাখি ও পশুর ডাক আয়ত্ত করেছে চৌরকর্মে যার সদাসর্বদা দরকার পড়ে। এ হেন কৃতী পিতা শয্যায় মরে পড়ে আছেন, বিধবা মা সেই অবস্থায় রৌহিনেয় উপর কুলধর্মের ভার দিচ্ছেন কপালে সপ্তশিখার প্রদীপ ঠেকিয়ে। রাজার মৃত্যুর পর রাজ-পুত্রের যেমন অভিষেক হয়। রাজগণের মধ্যে সকলের বড় রাজচক্রবর্তী চোরের মধ্যেও তেমনি চোরচক্রবর্তী। পুঁথিতে পুঁথিতে চৌরচক্রবর্তীর বিচিত্র দিগ্বিজয়-কথা। কতরকম মন্ত্রতন্ত্র, নীতি-নিয়ম। আয়ুর্বেদের মতো গাছ-গাছড়ারও ব্যবহার। বহুকাল ধরে গুণীদের কাজের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের ফলে রীতিমতো একটা পদ্ধতি দাঁড়িয়ে গেছে। জগবন্ধু গোড়ার দিকে কৌতুকের মন নিয়ে অবহেলার ভাবে পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। যত পড়েন অবাক হয়ে যান। প্রাচীন নিয়মকানুনগুলো আজকের দিনেও চলে আসছে অক্ষয় অব্যয় হয়ে। আমাদের পরিচিত সংসারের গায়ে গায়ে যেন এক বিচিত্র জগতের আবিষ্কার। আমাদের দিনমনের জগৎ, তাদের নিশিরাত্রির জগৎ। গতানু-গতিক পথে এর মূলোচ্ছেদ হবে না। রোগই যদি বলতে হয়, সেই রোগের মূল ধরে টান পাড়তে হবে। সেই ব্রত বক্সাধিকারীর।

কিন্তু যত দিন যায়, কাজের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে... ক্রমশ বুঝতে পারছেন। সারাদিন ক্যাশিয়ার চোর তাড়িয়ে অবসর সময়ে খাতার মধ্যে বসে যত কিছু পড়াশুনা ও গবেষণা করতে পারো, কিন্তু হাতে-কলমে

কিছু নেই। জটিল শাসনযন্ত্রের তুচ্ছাতিতুচ্ছ এক একটা নাট-বল্টু ছাড়া কিছুই নন তাঁরা। ঝিনুকপোতার দারোগার এ বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা : বলেছে কে বাপু মূলোচ্ছেদ করতে? বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে ঠোকাঠুকি—কখনো লড়াইয়ে নেমে পড়ি, কখনো সন্ধিস্থাপন করি। ওরা করে খাচ্ছে, আমরাও করে খাচ্ছি—দিব্যি তো আছি। উচ্ছেদ হয়ে গেলে সরকার কি পুষবে আমাদের তখন?

একা ঝিনুকপোতা কেন, সব থানাওয়ালাই ভাবে এইরকম। সকলের থেকে আলাদা হতে গিয়েই জগবন্ধু ঘোর বিপাকে পড়ে গেছেন।

তদন্ত চলল অনেকদিন ধরে। সত্যপথের পথিক জগবন্ধু অবস্থা বিবেচনায় শুধুমাত্র সততার উপর নির্ভর করে থাকতে পারলেন না, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ছুটাছুটি করছেন। এবং ডাইনে-বাঁয়ে টাকা ছড়াচ্ছেন। দারোগা হওয়া সত্ত্বেও টাকা করতে পারেন নি, সামান্য সঞ্চয় দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। ভুবনেশ্বরীর মুখের হাসি কিন্তু একদিনের তরে মলিন হল না। নিজ হাতে একটা একটা করে গায়ের গয়না খুলে দিচ্ছেন—দু-হাতে শাঁখা এবং বাঁ-হাতে লোহাগাছি মাত্র রইল তাঁর। সাসপেণ্ড হবার সঙ্গে সঙ্গে থানার কোয়ার্টার ছাড়তে হল। কিন্তু মোকাম ছাড়েন নি, তদন্তের সাক্ষিসাবুদ জোগাড়ে অসুবিধা ঘটবে। এবং ভুবনেশ্বরীও সেটা হতে দেবেন না—লোকে হাসিতামাসা করবে লেজ গুটিয়ে পালাল বলে। পাপ যখন নেই, কিসের ভয়? নানারকম কুৎসা আসত ভুবনেশ্বরার কানে। রাগ করতেন না তিনি, হাসতেন : সত্য প্রকাশ হবে একদিন সূর্যের আলোর মতো অন্ধকারের এইসব পেঁচার তখন নিশানা পাওয়া যাবে না।

দোষের প্রমাণ হল না তদন্তে। বলাধিকারী কিন্তু সত্যের জয় বলে স্বীকার করেন না। প্রচুর ঘুষঘাষ দিয়ে সাক্ষ্য বানচাল করা হয়েছিল, জয় যদি বলতে হয় শুধুমাত্র সেই কারণে। তা সত্ত্বেও উপরওয়ালাদের আস্থা হয়নি, দেখা গেল। থানা থেকে সরিয়ে তাঁর উপরে একটা ছোট চৌকির ভার দেওয়া হয়েছে।

ভুবনেশ্বরীকে জগবন্ধু বলেন, এবারে যাবে তো?

ভুবনেশ্বরী উদাস কণ্ঠে বলেন, রায় দিয়ে দিয়েছে। আর এখন বাধা কি? লেজ গুটিয়ে পালানো আর কেউ বলবে না।

জগবন্ধু [illegible] সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ জায়গা থেকে সে জায়গা—বদলি তো সকলেরই হয়ে থাকে। পুলিসের চাকরির দস্তুরই এই।

ভুবনেশ্বরী একটু হাসলেন : থানা থেকে চৌকিতে।

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, কে-ই বা জানতে যাচ্ছে? আমরা তো বলছি নে কাউকে!

জগবন্ধুও সায় দিলেন: চলে যাবার পরে জানল তো বয়েই গেল। আর ফিরব না এখানে।

যাবার বন্দোবস্ত হচ্ছে—অনেক দূরে কোন ধাপধাড়া জায়গার চৌকিতে। এক সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখলেন, কাজলীবালা পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। জগবন্ধুকে দেখে হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়ল: মা কেমনধারা করছে, দেখ এসে।

ভুবনেশ্বরী মাটিতে পড়ে এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মুখে ফেনা উঠছে। কী বলতে গেলেন স্বামীকে দেখে। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও বলতে পারলেন না। দু-চোখে জল গড়াচ্ছে। তারপরেই পূর্ণঅচেতন হলেন।

উঠানে কলকে-ফুলের গাছ। কলকে-ফুলের বীচি বেটে খেয়েছেন তিনি। শিলের উপর বাটনার কিছু অবশিষ্ট পাওয়া গেল। বড় বিষাক্ত জিনিস। বমি করিয়ে উগরে ফেলার অনেকরকম চেষ্টা হল। মাছ-ধোওয়া আঁশ-জল খাইয়ে দেখলেন। আরও নানাবিধ মুষ্টিযোগ। কিন্তু মৃত্যু ফসকে না যায়, সেজন্য অনেকটা খেয়ে নিয়েছেন তিনি। কিছুতে কিছু হল না। দূরের কোন চৌকিতে যাবার কথা—অনেক অনেক দূর চলে গেলেন। দুনিয়াতেই আর ফিরবেন না।

ভুবনেশ্বরী চোখের জলে যে কথা বলতে গিয়ে পেরে উঠলেন না, তা-ও জগবন্ধু বুঝতে পারেন এখন। সিদ্ধপুরুষ পিতামহের রক্ত তাঁর দেহে, শৈশব থেকে সততা ও পুণ্যের সংসারে বড় হয়েছেন। জীবনভোর যা-কিছু জেনেবুঝে এসেছেন, হঠাৎ একদিন সমস্ত অলীক ও অর্থহীন হয়ে উঠল। চেনা ভুবন একেবারে অন্ধকার—বাসের অযোগ্য। স্বভাব বশে কবে মৃত্যু আসবে, ততদিন সবুর সইল না। সকলের অজান্তে এমন কি কাজলীবালাও চোখ ফাঁকি দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে চলে গেলেন। নিদারুণ ঘৃণায় পৃথিবী ছাড়লেন।

প্রথম পর্ব শেষ

নিশিকুটুম্ব

(দ্বিতীয় পর্ব)

(উপন্যাস)

এক

কয়েকটা দিন পরে বলাধিকারী ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে পথের উপর পেলেন। কোন দিকে গিয়েছিল, এখন বাসায় ফিরছে। সঙ্গে মক্কেল দু-তিনজন। বিয়েথাওয়ার ব্যাপারে তারা কোষ্ঠি-বিচার করতে এসেছে, হলদে তুলট-কাগজের পাকানো কোষ্ঠি হাতে। সেইসব কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।

জগবন্ধুকে দেখে ক্ষুদিরাম মুখ ফিরিয়ে হাঁটার জোর বাড়িয়ে দিল। দেখতে পায়নি, এমনিতরো ভাব। জগবন্ধু একরকম ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলেন, চিনতে পারেন না বুঝি ভটচাজ মশায়? চিনবার কথাও নয়। থানা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তার উপরে আপনার আসল যে মক্কেল সে-ও চলে গেল।

থতমত খেয়ে ক্ষুদিরাম বলে, ক'দিন ছিলাম না বড়বাবু। আজকেই বাসায় গিয়ে দেখে আসতাম।

জগবন্ধু বললেন, বড়বাবু কেন বলছেন আমায়?

ক্ষুদিরাম কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলে, এ থানার না হলেও অন্য কোথাও বটে তো!

কোনখানে নয়। কাজে ইস্তফা দিয়েছি। একটা কথা বলব আপনাকে ভটচাজ মশায়। চলুন একটু ওদিকে—

চোখে-মুখে কি দেখতে পেল ক্ষুদিরাম—সঙ্গীদের বলে, বিকালে এসো তোমরা। এখন আমি পেরে উঠব না। বড়বাবুর সঙ্গে জরুরি কথাবার্তা।

লোকগুলো সরে যেতে জগবন্ধু বলেন, বেচা মল্লিকের কাছে আমায় নিয়ে চলুন। আজ হয়ে ওঠে তো কাল অবধি দেরি করব না।

ক্ষুদিরাম হেন ব্যক্তিরও চমক লাগে। মুখে একটু সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেল। বলে, ইতর চোর-ডাকাত ওরা, পাপী, সমাজের শত্রু—

যেন মুখস্থ করে রেখেছে জগবন্ধুর নানান দিনের বলা বিশেষণগুলো। জো পেয়ে সবগুলো একত্র করে ছুঁড়ে মারল। জগবন্ধু গায়ে মাখেন না। এমন অনেক শোনার জন্য তৈরি তিনি এখন। বললেন, বেচারামকে আপনি একদিন আমার কাছে আনতে চেয়েছিলেন। থানার বড়বাবু ছিলাম বলে রাজি হইনি। আজ আমি শুধুই জগবন্ধু বলাধিকারী। আপনি নিয়ে চলুন, পায়ে হেঁটে তার কাছে চলে যাচ্ছি। বাধা ছিল সরকারি চাকরি—তার চেয়েও বড় বাধা আমার স্ত্রী। দুটো বাধাই সরে গেছে। মুক্তপুরুষ আজকে আমি।

জগবন্ধু কেমনভাবে হাসতে লাগলেন। ক্ষুদিরামের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, পলকহীন চোখে সে তাকিয়ে রইল।

জগবন্ধু বলেন, চুপ করে রইলেন কেন ভটচাজ মশায়? কবে নিয়ে যাবেন? দুনিয়াসুদ্ধ শেয়ানা, একলা আমি বোকা হয়ে কেন থাকব? ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাই।

জগবন্ধুর মনের সেই অবস্থায় ক্ষুদিরাম বাদ-প্রতিবাদ করে না। বলল, মল্লিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দু-চারদিনের মধ্যে আপনার বাসায় যাব।

গিয়েছিল তাই। জগবন্ধু তখন অনেক সামলে উঠেছেন। হাসছেন সহজভাবে।

ক্ষুদিরাম বলে, নিয়ে যাচ্ছি বটে—কিন্তু পেরে উঠবেন না। সকলে সব কাজ পারে না। আমার কী হল—নিজে আমি হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করেছি, বাপ-মা-ভাই সবাই চেষ্টা করছে। পরিবারের কত কান্নাকাটি—আপনার কাছে মিথ্যে বলব না বলাধিকারী মশায়, টানও খুব পরিবারের উপর। এত করেও ভাল থাকতে পারলাম না। আপনারও তেমনি—চেষ্টা যত যা-ই করুন, মন্দ হতে পারবেন না। যার যেদিকে টান, যার যাতে জমে। আফিঙের ডেলা মুখে ফেলে কেউ ঝিম হয়ে থাকে, বড়-কলকে না টেনে কারও মউজ হয় না, আবার পানের মধ্যে সিকি টিপ জরদা দিয়ে বারদুয়েক পিক ফেলে কেউ এলিয়ে পড়ে। বুঝলেন না, নেশারই রকমফের সমস্ত।

জগবন্ধু হেসে বলেন, এইসব বলেছেন নাকি বেচা মল্লিকের কাছে?

তাকে কিছু বলতে হয় না। এত লোক চরিয়ে বেড়ায়, নিজেই সব জানে। তার কথাগুলো আমি বলছি।

জগবন্ধু হতাশভাবে বললেন, তবে আর সেখানে গিয়ে কি হবে?

ক্ষুদিরাম বলে, যেতে হত না, মল্লিকই এসে পড়ত। বলে, সাধুলোকেরই দরকার আমাদের কাছে। অমন সাধু একজন পাই তো মাথায় করে রাখব। ছুটে আসছিল, আমি ঠেকিয়ে দিলাম। সাত-তাড়াতাড়ি চাউর হতে দিই কেন? ও-লাইনে আপনি যাবেন—আমি কিন্তু এখনো বিশ্বাস করিনে বলাধিকারী মশায়। যে-কেউ আপনাকে জানে, বিশ্বাস করবে না।

ক্ষুদিরামের নিজের কথা সেইদিন বলাধিকারী শুনলেন। পরবর্তীকালে চোর-ডাকাত কতই তো দেখলেন—অনেকে প্রয়োজনে পড়ে হয়, পেটের দায়ে। নেশায় পড়েও হয় বিস্তর—আফিঙ-গাঁজার ঐ তুলনা দিল, কোথায় লাগে এ নেশার দুরন্ত দুঃসাহসিকতার কাছে! ক্ষুদিরামের ভাই—

মানুষ যত কিছু বাসনা করে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের ছিল সমস্ত। এখনো আছে। উঁচু বংশগরিমা। পিতামহ ও প্রপিতামহ দিকপাল পণ্ডিত—তাঁরা চতুষ্পাঠী চালাতেন। চতুষ্পাঠী এখনো রয়েছে বাড়িতে। বাপ সংস্কৃত ছাড়া ইংরেজিতেও এম-এ পাশ করেছিলেন সেই আমলে। অঞ্চলের মধ্যে তিনিই বোধহয় প্রথম। এক বয়সে কালেক্টরিতে মোটা চাকরি করতেন। ভাইরাও সকলে নানাদিকে কৃতী। ক্ষুদিরাম সকলের ছোট। ঠিক হল, ভাল সংস্কৃত শিখে বাড়ি থেকে সে চতুষ্পাঠী চালাবে, পিতামহ ও প্রপিতামহের কীর্তি বজায় রাখবে।

পড়াশুনোয় ভালই, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি কাজকর্ম আলাদা রকম। বাড়ির সঙ্গে তাই খাপ খাইয়ে থাকতে পারল না, ক্ষুদিরামের সমস্ত থেকেও নেই। ভাঁট-অঞ্চলে পড়ে রয়েছে। অনেকদূর পৈতৃক গাঁয়ে-ঘরে বাপ-মা ভাই-ভাজ এবং নিজের স্ত্রী জমিয়ে সংসারধর্ম করছে—ক্ষুদিরাম যায় না সেখানে, এমন নয়। যায়, খুব কম—রাত্রিবেলা লুকিয়ে চুরিয়ে গ্রামের উপর ওঠে, গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। একদিন দু-দিন রইল তো সর্বক্ষণ সেই ঘরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকে। দরজায় তালা ঝুলছে। বাড়ির বড়রা ছাড়া সবাই জানে, শূন্য ঘর—মানুষ নেই সেখানে। ফেরারি আসামীর অবস্থা। ফিরবার সময়েও রাত্রিবেলা অতি সন্তর্পণে রওনা। চেনাজানা কারো নজরে পড়ে না যায়। অনেকদিনের অদর্শনে ক্ষুদিরাম মানুষটাকে ভুলে গেছে সকালে, মরার শামিল ধরে নিয়েছে।

সেই বয়সটায়—অল্পদিন বিয়ে হয়েছে তখন—ক্ষুদিরাম আর এক মানুষ। বাড়ির চতুষ্পাঠীতে কাব্য ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্র পড়ে। বড় পরোপকারী ছেলে, কারো বিপদের কথা শুনলে ঝাঁপিয়ে পড়বে সকলের আগে। গ্রামবাসীর চোখের মাণিক ক্ষুদিরাম।

একবার খুব চুরি হতে লাগল। অল্প বয়সের ছেলেদের নিয়ে ক্ষুদিরাম রক্ষি-বাহিনী গড়ল। দিনমানে লাঠি খেলে, কুস্তি ও দৌড়ঝাঁপ করে, রাত জেগে চোর পাহারা দেয়। বাহিনার কর্তা সে-ই। সারারাত্রি গান গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। সে কী কাণ্ড! চোর তো চোর, বাঁশবনে পেঁচার ডাক—পহরে পহরে শিয়ালের ডাক অবধি বন্ধ হয়ে গেল তাদের গানের ঠেলায়। নটবর গুণীন বলত, শেওড়াগাছের ভূতপেত্নীরা অবধি গ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালিয়েছে।

এইসব বলাবলির কারণেই হয়তো বা রক্ষীবাহিনী অকস্মাৎ চুপ হয়ে গেল। পথে বেরিয়েছে না বাড়িতে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে বোঝা যায় না। ক্ষুদিরাম বলছে, চোর তাড়ানো নয়—ধরেই ফেলব চোরগুলো। বারোমাস তিরিশ দিন পথে

পথে গান গেয়ে বেড়ানো কিছু সম্ভব নয়। তার চেয়ে চোর ধরে ধরে চালান দিয়ে ফেললে উৎপাতের শেষ।

সেই বন্দোবস্ত হয়েছে। ঝোপেঝোপে ঘাপটি মেরে থাকে সারা গ্রামে ছড়িয়ে। উঁচু ডালের উপরে কেউ কেউ দূরের পানে নজর ফেলে বসে থাকে।

একটা দল তারপরে সত্যি সত্যি ধরে ফেলল। জন আষ্টেকের মাঝারি দলটা। মূল-কারিগর থেকে মুটিয়া অবধি—গাঁয়ের উপর যারা উঠেছিল, একটাকেও আর ফিরতে দেয়নি। বাড়ির উঠানে হাতে-দড়ি দিয়ে সকলকে মেইকাঠের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। সারা দিনমান অঞ্চল ভেঙে দেখতে আসে, আর রক্ষিবাহিনীর কাজের তারিফ করতে করতে চলে যায়।

সেই থেকে একেবারে সব চুপ হয়ে গেল। চোর বুঝি মুলুক ছেড়ে পালিয়েছে। গতিক এমন—শোবার সময় লোকে দরজার খিল আঁটতে ভুলে যায়। রক্ষিবাহিনী রাতের পর রাত শূন্য গ্রাম পাহারা দিয়ে বেড়ায়। লোক কমতে লাগল—দিনের বেলা কুস্তির আখড়াতেও লোক আসে না। উদাস ভাব সকলের: কি হবে এসে, গায়ের তাগত বাড়িয়ে প্রয়োগ হবে কার উপর? চোর কোথায়?

কেউ বলে, ক্ষুদিরাম-ভাই, রক্ষিবাহিনী ভেঙে দিয়ে দাবা-পাশার বন্দোবস্ত করো, একসঙ্গে বসে তবু খানিক আড্ডা জমানো যাবে।

ক্ষুদিরামও তাই দেখছে। বাহিনী আর টিকিয়ে রাখা যায় না। ভগবান এমনি সময় মুখ তুলে চাইলেন। চোর উঠেছে আবার গাঁয়ে। সিঁধেল নয়, ছিঁচকে। এক বাড়ির বৈঠকখানা থেকে পিতলের গাড়ু হেরিকেন-লণ্ঠন ও বাঁধানো হুঁকো নিয়ে গেছে। হোক ছিঁচকে, চোর তো বটে! মাছ বলতে রুই-কাতলা যেমন, মৌয়া-পুঁটিও তেমনি। গ্রামখানা একেবারে বয়কট করেছিল—আবার যখন নজর ধরেছে, ছিঁচকে থেকেই ক্রমশ বড়রা দেখা দেবে।

মেতে উঠল ছেলেরা। রক্ষিবাহিনী আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চোরেও লাগল। রীতিমতো পাল্লাপাল্লি এবারে। চতুর চোর—বিশাল গ্রামখানা একেবারে যেন নখদর্পণে। নিত্যিদিনের ঘরগৃহস্থালীর মধ্যে তিলেক কেউ বেসামাল রয়েছে, এবং বাহিনীর লোক সেই সময়টা হয়তো ভিন্ন পাড়ায়—চোরে বুঝি অন্তরীক্ষে বসে খড়ি পেতে টের পায়, টুক করে তারই মধ্যে এসে কাজ সেরে চলে গেল।

এই চলছে। দলের মাথা ক্ষুদিরাম—তাকেই দেখিয়ে দেখিয়ে যেন কাজ। একদিন তাদেরই বাড়িতে। রান্নাঘরের তালা ভেঙে ঢুকে যাবতীয় এঁটো-বাসন নিয়ে গেছে। এমন অবস্থা করে গেল পরের দিন কলাপাতা কেটে ভাত খেতে হয়। ক্ষুদিরাম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—তারই অপমান সোজাসুজি। নিজেদের হাতে

সম্পূর্ণ না রেখে অতঃপর থানায় হাঁটাহাঁটি করে। তিনটে কনস্টেবল মোতায়েন হল, রক্ষিবাহিনীর সঙ্গে বন্দুক নিয়ে তারাও পাহারা দেয়।

কী হবে! সামনে আসে না চোর, সামনে পেলে তবেই তো বন্দুক। নাজেহাল করে মরছে। এক রাত্রে আবার ঐ ক্ষুদিরামের বাড়িতেই তুমুল চেঁচামেচি। চোর পড়েছে নাকি। মেজভাই দোর খুলে বাইরে বেরিয়েছিল—দেখে, রান্নাঘরের দাওয়ায় গুটিসুটি কী-এক বস্তু। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি একটা তিথি, তার উপর বাদামগাছ বড় বড় পাতা মেলে জায়গাটায় ঘুরঘুট্টি আঁধার জমিয়েছে। মেজভাই গোড়ায় চোর বলে ভাবেনি—চোর তো রান্নাঘরেই যা করবার করে গেছে আগে। ভেবেছে শিয়াল। রান্নাঘরে পাকা কাঁঠাল—গন্ধে গন্ধে শিয়াল দাওয়ায় উঠে পড়েছে। আধেলা-ইঁট একটা হাতের কাছে পেয়ে ছুঁড়ে মারল শিয়াল তাড়ানোর জন্য। নিরিখ করেও মারেনি—কিন্তু ইট গিয়ে লাগল ঠিক সেই ছায়াবস্তুর উপরে। নতুন থালাবাটি কেনা হয়েছে—ঝনঝন করে একগাদা দাওয়া থেকে গড়িয়ে উঠানে পড়ল। পিণ্ডাকার ছায়া-বস্তুও মুহূর্তে দুটো পা বের করে দৌড় দিয়ে পালাল।

হৈ-হৈ পড়ে গেল। রক্ষিবাহিনার কয়েকজন কাছাকাছি ঘুরছিল, তারা ছুটে এসেছে। বমাল নিয়ে নিঃশব্দে আজও সরে পড়ত, স্বভাবের তাড়ায় মেজভাই বেরিয়ে পড়ায় রক্ষে হয়েছে। ইঁটের ঘায়ে জখম হয়েছে চোর। রক্ত-পাত হয়েছে—দাওয়া থেকে বাইরের অনেক দূর অবধি চাপ চাপ রক্তের দাগ।

দলপতি ক্ষুদিরাম-ভাইকে তো চাই। চোর খুঁজতে লাগো তোমরা, তাকে ডেকে নিয়ে আসি। পশ্চিমপাড়ায় আছে সেখানকার দলটার সঙ্গে।

একজনে ছুটল। পশ্চিমপাড়ার দল বলে, আমাদের সঙ্গে নয়। সে তো উত্তর পাড়ায় শুনেছি।

রক্ত-চিহ্ন ধরে ধরে কেয়াঝাড়ের মধ্যে ঢুকে চোর পাকড়াল। একখানা পা বিষম জখম। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এই অবধি এসে আর পারেনি। কেয়াপাতার কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে বসে পড়েছে। বসে বসে হাঁপাচ্ছে।

অ্যাঁ ক্ষুদিরাম-ভাই, চোর তবে তুমি? নিজের বাড়ি চুরি করতে উঠেছিলে—কী সর্বনাশ।

তাজ্জব কাণ্ড! গ্রামময় সাড়া পড়েছে। পাড়া ভেঙে সব দেখতে আসছে। পুরুষলোক মেয়েলোক—এমন কি নিশিরাত্রি হলেও ছেলেপুলে অবধি ভিড় জমিয়েছে। মানী ঘরের ছেলে ক্ষুদিরাম, টোলে-পড়া বিদ্বান, গ্রামের সকল সৎকর্মে অগ্রণী—ভিতরে ভিতরে মানুষটা এই!

মেজভাই হাহাকার করে উঠল : আমার ভাই চোর !

রক্ষিবাহিনী ছোকরা ভেবে ভেবে দেখল, ইদানীং যত এই রকম ছ্যাচড়া চুরি হয়েছে, ঠিক সময়টা দলপতির উদ্দেশ মেলে নি। চাপাচাপি করতে হল না—ঘাড় নেড়ে ক্ষুদিরাম স্বীকার করে নেয়, কাজগুলি তারই বটে।

কপালে করাঘাত করে বুড়ো বাপ আর্তনাদ করে ওঠেন : কিসের অভাবে তুই চোর হতে গেলি ?

অভাব কেন হতে যাবে ? একটা জিনিসও সে বিক্রি করে নি, পানাপুকুরে সমস্ত ফেলে দিয়েছে।

নিঃসঙ্কোচে এমন সহজভাবে বলে যে বিশ্বাস হওয়া শক্ত। দলের ছোঁড়ারাই পানাপুকুরে নেমে পড়ল। ক্ষুদিরামের নির্দেশ মতো ডুব দিয়ে দিয়ে জিনিস তুলে আনে। বিস্তর পাওয়া গেল। ছোটখাটো দু-দশটা পাওয়া যায় নি—পাঁকের নিচে হয়তো পুঁতে আছে, কিংবা অন্য দিকে সরে গেছে ফেলবার সময়।

অতি প্রিয় দু-একটি সাগরেদ এসে বলে, চোর শাসনের জন্য কী খাটনি খেটেছে ক্ষুদিরাম-ভাই। চোর শেষটা তুমিই হয়ে গেলে। এ যেন সাপ হয়ে ছোবল দেওয়া, ওঝা হয়ে ঝাড়ানো—

ক্ষুদিরাম হাসিমুখে নিরুত্তরে উপভোগ করছে।

ব্যাপার যখন এই, থানায় ধন্না দিয়ে কনেস্টবল এনে বসাতে গেলে কেন ?

কাজ দেখে কনেস্টবলগুলো হাঁ হয়ে যাবে ভেবেছিলাম। থানায় বাবুদের গিয়ে বলবে, তারাও চলে আসবে। গাঁয়ের খাতির হবে পুলিশের কাছে।

ভেবেছিল একরকম, শেষ অবধি ঘটে গেল উল্টো। ফোঁস করে ক্ষুদিরাম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মুখের উপর লজ্জার ক্ষীণ একটা হাসি। সে লজ্জা চোর হওয়ার জন্য নয়, ধরা পড়ার বেকুবির জন্য।

মায়ে-বাপে কথাবার্তা শুনতে পাওয়া গেল। মা বললেন, বউমা এখানে নেই কী ভাগ্যি ! তা বলে কানে যেতে কি বাকি থাকবে—কতজনে কত রকম রসান দিয়ে বলবে। বয়সটা খারাপ···ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে না বসে, আমার সেই ভয়।

কাপড় কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া, ঘরের আড়ায় ও নিজের গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলে পড়া, কলসি গলায় বেঁধে পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া ইত্যাদি নানা প্রণালী তখনকার কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে চালু। মায়ের মনে সেই ভয়ে ঢুকছে। ক্ষুদিরামও শিউরে ওঠে। বিয়ে এক বছরও হয় নি এখনো। বাপের বাড়ি আছে বউ, বছর পুরলে পাকাপাকি ঘর করতে আসবে। বার-তিনেক অল্পস্বল্প যা দেখা, তার মধ্যেই নতুন বউ ঘরের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

সকলের এক প্রশ্ন : এমন কাজ কি জন্য করতে গেলে? আরে, হিসাবপত্র করে বুঝেসমঝে করল নাকি কিছু? না করে পারে না, এমনি তখন অবস্থা। চোর তাড়ানোর জন্য এত কষ্ট—সেই চোর সত্যি সত্যি গ্রামছাড়া হয়ে গেল। ভাল জিনিস পড়ে মরুক, একটা আধলাপয়সা তুলে নেবারও লোক নেই। গৃহস্থবাড়ি সন্ধ্যাবেলা সব শুয়ে পড়ে, সকালবেলা চোখ মুছতে মুছতে ওঠে, রাত্রিগুলো একেবারে চুপচাপ, ঘুমের মধ্যে একবার পাশমোড়া দেবারও আবশ্যক হয় না কারো। রক্ষিবাহিনী নিয়ে মড়ার রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনি মনে হয় ক্ষুদিরামের। এত করে গড়েতোলা রক্ষিবাহিনীরও যায়-যায় অবস্থা —ছেলেরা ঘর থেকে বেরুতে চায় না, কী হবে মিছামিছি ঘুরে ক্ষুদিরাম-ভাই—

ক্ষুদিরাম ফাঁক বুঝে তখন নিজেই চুরি করে বসল। চোর এসেছে, চোর এসেছে—কলরব পড়ে গেল চতুর্দিকে। রক্ষিবাহিনী দেখতে দেখতে জেঁকে উঠল, মেঘ কেটে গেল সকলের মনের। গৃহস্থ-মানুষের চোখে ঘুম হরেছে, খুট করে কোন দিকে এতটুকু শব্দ হলেই আলো জেলে উঠে বসে। অমুক বলছে, তার দরজায় ঘা দিয়ে গেছে নাকি কাল। তমুক বলছে, সিঁধকাঠির কয়েকটা ঘা তার দেওয়ালে পড়তেই লাঠি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল, সেইজন্যে রক্ষে হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে কার একটা ফুটো ঘটি নিয়ে বুঝি পানাপুকুরে ফেলেছে—মানুষটা থানায় গিয়ে মালের লিষ্টি জানিয়ে এলো। সেই সব মাল চোখেও দেখে নি তার চোদ্দপুরুষ। চোর নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা—সঠিক চিনতে পেরে নামও বলে দিচ্ছে কেউ কেউ : অমুক গাঁয়ের এই জন। বলছে আবার ক্ষুদি-রামের কাছে এসে। রক্ষিবাহিনী চালনা করতে দলের ছেলেদের ফাঁক কাটিয়ে বন্দুকধারী কনেস্টবলদের প্রায় চোখের উপরে টুক করে কাজ সেরে আসা—বুড়ো বাপ-মা ভালো-মানুষ ভাইরা অথবা অবোধ কিশোরী বউ কারো পক্ষে এ জিনিসের মজা বোঝবার কথা নয়। চোর ধরতে ধরতে নিজেই শেষটা চোর হয়ে পড়ল। হয় এমনি। থানার চৌহদ্দির মধ্যে এত চোর, সে বোধ হয় এই কারণেই।

চোরাই মাল সবই প্রায় ফেরত পাওয়া গেল, তা ছাড়া প্রাণপাত করে চির দিন দশের কাজ করে এসেছে—এইসব বিবেচনায় ক্ষুদিরামকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া হল না, ব্যাপারটা চাপা দিয়ে দিল সকলে মিলে। কিন্তু এর পরে আর গাঁয়ে-ঘরে থাকা চলে না। বাপ অবসর নিয়েছেন, তা হলেও খাতির খুব। আদালতে একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে ক্ষুদিরামকে সহরে পাঠালেন। চোখের আড়াল হয়ে থেকে লোকে ক্রমশ এই সমস্ত ভুলে যাবে, চাকরে-মানুষ হয়ে

আবার এক সময়ে সকলের সঙ্গে যথাপূর্ব মেলামেশা করবে—এই প্রত্যাশা। হল না, একখানা কুঠরির মধ্যে দশটা-পাঁচটা বসে বসে কলম-পেষা পোষায় না ক্ষুদিরামের। দুধের স্বাদ যে পেয়েছে, ঘোলে তার মন উঠবে কেন? কাপ্তেন বেচা মল্লিকের খুব নাম শোনা যায় আদালতে, ফৌজদারি নথিতে তার রকমারি কীর্তি-কাহিনী। বেচারাম সদরে এলে তার সঙ্গে ক্ষুদিরাম দেখা করল, চেনা-জানা নিবিড় হল। চাকরি ছেড়ে তারপরেই সে ভাঁটি অঞ্চলে আস্তানা নিল পুরোপুরি।

বলাধিকারী বলেন, বড়বউ আত্মঘাতী হল, রেলের কামরায় আমি সকলের কাছে বলেছিলাম। সাহেব, তোর মনে পড়বে। বলেছিলাম, গয়নার দুঃখে মারা গেল। গয়না গিয়েছিল সত্যিই—তদন্তের খরচা যোগাতে দু-হাতে দু-গাছা শাঁখা বই অন্য কিছু ছিল না। দুঃখে পড়ে মারা গেছে—অতি-বড় দুঃখ না হলে আমায় ঐ অবস্থায় একলা ফেলে চলে যেতে না। কিন্তু ক-টুকরো সোনা-দানা হারিয়ে প্রাণ দেবার মেয়েলোক সে নয়। সে যা হারাল, দুনিয়ার যাবতীয় সোনারূপো, হীরে-মাণিকের চেয়ে তার দাম বেশি। তার দুঃখ আমিই কেবল জানি। অভিশাপ লেগে দেব-দেবীর স্বর্গচ্যুতি হল, পুরাণে পড়ে থাকি। বড়বউয়ের জীবনে হঠাৎ একদিন তাই ঘটে গেল।

বলতে বলতে বলাধিকারী মুহূর্তকাল স্তব্ধ হলেন। যারা শুনছে, তাদেরও কথা সরে না। নিশ্বাসটা অবধি সন্তর্পণে ফেলে।

ম্লান হেসে বলাধিকারী বললেন, আরও একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম রে। স্ত্রী মারা গিয়ে, সংসারধর্ম ছেড়ে সাধু-বিবাগী হয়েছি আমি। ঠিক উল্টো—সাধু নয়, চোর।

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলল, চোর কোথা, সাধুই তো আপনি।

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যও সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করে ওঠে: সাধু বই কি! সাধু-দারোগা থেকে সাধু-মহাজন। চেষ্টা কি করেন নি চোর হতে? পেরে উঠলেন না। ইচ্ছেয় হয় না কিছু। আমারও দেখুন। নিজে হদ্দমুদ্দ দেখেছি, তার উপর বাড়িসুদ্ধ উঠে-পড়ে লেগেও সাধু বানাতে পারল না।

সাহেবকেই লক্ষ্য করে দরাজভাবে পরিচয় দিচ্ছে: মহাজন, অর্থাৎ মহৎ জন—ষোলআনা মানেটা বলাধিকারী মশায়ের উপরেই খেটে যায়। এমন খাঁটি-সাধু পাই-তকের ভিতর নেই। কারিগরে খেটেখুটে এসে বমাল ফেলে নিশ্চিন্ত—বখরার আধপয়সা অবধি হিসাব হয়ে ঠিক ঠিক ঘরে গিয়ে পৌছবে। মর-শুমের মুখে গাঁ-গ্রাম ছেড়ে প্রাণ হাতে করে সব বেরিয়ে পড়ে—জানে, নিজেরা

যদিই বা মারা পড়ে, বাড়ির বউ ছেলেপুলে মরবে না বলাধিকারী মশায় বর্তমান থাকতে। কতই মহাজন কত দিকে—

বাধা দিয়ে বংশী তিক্তস্বরে বলে ওঠে, মহাজন কে বলে তাদের? ও-নামে ঘেন্না দিও না। তারা থলেদার। এক থলেদার আছে নবনীধর ধাড়া—গুরুপদ ঢালির চেনা মানুষ। সেই যে গুরুপদ—আমার আজামশায়ের সাগরেদি করতে করতে নতুন গোঁফ উঠে সেই গোঁফ এখন পেকে সাদা হয়ে গেছে। ধারার কথা বলে গুরুপদ। মালপত্তরের দাম তার মুখস্থ—দেখতে হয় না, ভাবতে হয় না। রুপোর হাঁসুলি বারো-আনা, দা-কুড়াল-বটি-খন্তা দু আনা করে, কাঁসার বাটি গেলাস এক-এক সিকি, পিতলের গামলা ছ-আনা—

ক্ষুদিরাম বলাধিকারীকে বলে হতে পারবেন অমন? দেখেছেন তো চেষ্টা করে—আরও দেখুন—পারবেন না।

সাহেবের নিজের কথা মনে এসে যায়। সত্যি বটে, ইচ্ছেয় কিছু হয় না। মা-কালীকে কত করে ডেকেছে মন্দ করে দেবার জন্য কিছুদিন নিশ্চিন্ত—মন্দ হয়ে দিব্যি মন্দ-মন্দ কাজ করে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ এক মোক্ষম সময়ে এমন কাজ করে বসল, বড় বড় পুণ্যবানেরই যা পোষায়।

ভ্রূভঙ্গি করে সাহেব বলে ওঠে, ফাঁকির কাজ করবেন বলাধিকারী মশায়! তবেই হয়েছে! ক্ষমতাই নেই।

বলাধিকারী দুঃখের ভান করে বলেন, কাজলীবালাও ঠিক এই বলেছিল।

তারপরে ক্ষুদিরাম একদিন বলাধিকারীকে কাপ্তেন বেচা মল্লিকের কাছে নিয়ে গেল। বেচারাম তটস্থ। কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে পাকা, বলাধিকারী এই ফুলহাটায় এসে আস্তানা নিলেন। ফলাও তেজারতি কারবার—টাকা কর্জ দেন খতে হ্যাণ্ডনোটে, ধান বাড়ি দেন, সোনা-রুপো ও জমাজমি বন্ধক রাখেন।

এ সমস্ত বাইরের আবরণ। কিন্তু ঘরের কাজলীবালা কেন সমস্ত কথা জানবে না? ডেকে নিয়ে একদিন বলাধিকারী বললেন, তুমি চলে যাও কাজলীবালা, আমার কাছে থাকা চলবে না।

কাজলীবালা অবাক হয়ে বলে, কী দোষ-পাপ করলাম বাবাঠাকুর?

বলাধিকারী বলেন, বড় পবিত্র মেয়ে তুমি। ভাল থাকতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছ। দোষ-পাপ যাকে বলো, সে পথ আমিই বেছে নিলাম। তুমি সামনের উপর থাকলে মনে সর্বদা খচখচ করে বিঁধবে, সোয়াস্তি পাব না। তোমার কিছু নয়—আমার দোষ-পাপের জন্যেই তোমায় তাড়াচ্ছি।

তুমি করবে দোষ-পাপ, তবেই হয়েছে! কাজলীবালা উড়িয়ে দিল একেবারে।

জড়িয়ে ধরে বলল, জুতো মারো, ঝাঁটা মারো তোমার পায়েই পড়ে থাকব বাবা। ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলে আবার ফিরে আসব। মা চলে গেছেন, আমি গেলে দেখাশুনো করবে কে?

জগবন্ধু সদুঃখে তাই বলেন, এতকাল লাইনে আছি, দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ দোষঘাট করছে—আমি নাকি অক্ষম অপদার্থ, ঐসব কখনো করতে পারিনে। বড়বউ সারাজীবন বলে গেছে, কাজলীবালা এসেও তাই বলে, তোমরাও বলো যখন-তখন। সাধু-হওয়ার দুর্নাম সারা জন্মে ঘুচানো গেল না।

ক্ষুদিরাম বলে, আমি মোক্ষম কথা বলে দিয়েছি—যার যাতে নেশা ধরে যায়। নেশা জোর করে তাড়াতে গেলে আরও বেশি করে জড়িয়ে যায়। আমাদের গাঁয়ের একজন মদ ছাড়তে গিয়ে আফিং ধরল। এখন এমনি হয়েছে, চোখ বুজে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুলি ফেলে যেতে হয় মুখে। অনুপান হল আড়াই সের ঘন-আঁটা দুধ আর সেরখানেক রসগোল্লা। মদের পিতামহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারও তাই। সাধু-দারোগা থেকে সাধু-মহাজন—আরও চেষ্টা করুন, চিমটে-কম্বল নিয়ে ষোলআনা সাধু হয়ে বনে চলে যেতে হবে।

তুষ্টুরাম নাছোড়বান্দা। গুরুপদ ঢালিকে ধরে এনেছে। সেই প্রথম বয়স থেকে যেমন পচা বাইটার সাগরেদি করে আসছে। আজামশায়ের সাগরেদ হিসাবে বংশীর সঙ্গে পরিচয়—বংশীর বাড়ি উঠেছে। বয়স হয়েছে গুরুপদর —বয়সের জন্যে পুরো মরসুমের দিনে সে বাড়ি বসে রয়েছে। তুষ্টুর টানাটানিতে চলে এলো দলের সঙ্গে একটানা মাসের পর মাস পেরে না উঠুক, ছুটো এক-আধখানা কাজে অসুবিধা হবে না। এবং কাজ যদি সত্যি-সত্যি নামানো সম্ভব হয়, গুরুপদ হেন প্রাচীন বহুদর্শী লোক উপস্থিত থাকতে সর্দার অন্য কে হতে যাবে? বথরার উপরে এত বড় সম্মানের আশা পেয়েই তুষ্টুর ডাকে এক কথায় গুরুপদ চলে এসেছে।

কিন্তু কিছুই হবে না, যতক্ষণ না জগবন্ধু বলাধিকারী ঘাড় নেড়ে 'হাঁ' বলে দিচ্ছেন। মা-কালী হলেন ইষ্টদেবী। আর দেব-সেনাপতি কার্তিকঠাকুর চোরেরও সেনাপতি হয়ে অলক্ষ্যে আগে আগে চলেন। দেব-দেবীর নিচেই, ভাঁটি অঞ্চলের এরা মনে করে, বলাধিকারীর স্থান। কপালের উপর অদৃশ্য এক চোখ আছে বুঝি—তাই দিয়ে আগেভাগে বলাধিকারী দেখতে পান। তিনি যে কানেই নিতে চান না, তার কী উপায়?

তুষ্টুরাম জনে জনের কাছে দরবার করে বেড়াচ্ছে। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যকে গিয়ে ধরল: দিনক্ষণ দেখে তুমি একবার পাক দিয়ে এসো। ভটচাজ-বামুনের

চোখে দেখে এসে বলো, ডোবের বেটার চোখের উপর বলাধিকারী মশায়ের বোধহয় ভরসা হয় না। তুমি বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মত হয়ে যাবে।

আস্পর্ধার কথা শোন একবার। ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হয়ে যায়। তুষ্টু যেখানে পয়লা খুঁজিয়াল, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য সেই কাজের উপর চোখ দিতে যাবে! অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি হয়ে গাঁথনিটা তুষ্টু করে এলো, ক্ষুদিরামের তার উপর চুন টানার কাজ। যদি শোনা যায়, সে-বাড়ির মক্কেল ঘরের মেজেয় মাদুর পেতে সোনার মোহর শুকোতে দিয়েছে, তেমন ক্ষেত্রেও তো যাওয়া চলবে না। রুজি-রোজগারের লোভ থাকতে পারে, তা বলে ইজ্জত মেরে কদাপি নয়।

তবে অতিশয় অনুগত ও আজ্ঞাবহ এই তুষ্টুরাম। বিস্তর কাজকারবারের সাথী—সে-লোকের মুখের উপর এত সব বলা যায় না। তুষ্টু হাত-পা ধরাধরি করছে: খোল পাঁজি ভটচাজ মশায়, দিন বের করো একটা—

ক্ষুদিরাম বলে, দিন এখন কোথা রে? মলমাস চলেছে।

চলবে কদ্দিন?

নামের মধ্যেই তো মাস শুনলি—মলমাস, মলদিন নয়। সেটা দু-মাস না ছ-মাস পাঁজি দেখে হিসাবকিতাবের ব্যাপার। বলছিস যখন, তা-ই না-হয় করে দেখব এক সময়।

তুষ্টু বলে, মাসের হিসাব কি করবে তুমি? দিনের হিসাব করো। কিম্বা তার চেয়েও ছোট—ঘণ্টার হিসাব। লোহার সিন্দুকের টাকা কাঠের বাক্সে এসে নেমেছে। পরের টাকা মুফতের টাকা—এর পরেই তো পাখনা মেলে উড়বে। যা করতে হয় তড়িঘড়ি—

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হল তুষ্টুরাম: তোমার ঐ মলমাসের হিসাব কবে বাক্স ভাঙতে গেলে দেখবে খোপে আর তখন পয়সা-টাকা কিছু নেই—একটা হত্তুকি।

কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ক্ষুদিরাম। না-ই বা গেল সেখানে, খবরটা নিতে বাধা কি? খোঁজদারি কাজ যাদের, দরকারে লাগুক বা না লাগুক, তল্লাটের সকল খবর নখদর্পণে রাখতে হয়। কোন্ গাইটার কি বাছুর হল, কোন্ ডালে ক'টা আম ফলল, সম্ভব হলে তা-ও।

বলে, সন্ন্যাসীপদ দত্তর বাড়ি মাহিন্দার তো তুই?

মরসুমের সময়টা জোয়ানপুরুষ দু-পাঁচ টাকার গোনা মাইনে নিয়ে গৃহস্থ বাড়ি পড়ে আছে, এটা বড় লজ্জার কথা। অকর্মণ্যতার পরিচয়। তুষ্টুরামের কপালে তাই ঘটল এবার। সম্পূর্ণ নিজের দোষে—মনে পড়লে ঠাই-ঠাই করে নিজের গালে চড়াতে ইচ্ছে করে।

দশেরার রাত্রে লোক বাছাইয়ের তারিখটায় আকণ্ঠ তাড়ি গিলে পড়ে ছিল
ঠাৎ মনে পড়ে ব্যাকুল হয়ে হাঁটতে লাগল। হাঁটা নয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা।
কিন্তু গেরো খারাপ—

নেশার ঘোরে পথ গোলমাল হয়ে যায়। সকাল অবধি তামাম অঞ্চলে
হেঁটে বেড়িয়েছে, আসল ঠাঁই খুঁজে পায় নি। শেষটা হাটের চালার মধ্যে শুয়ে
নাক ডেকে মনের সাধে ঘুমোতে লাগল। কাপ্তেনের কাছে পরে কত কান্নাকাটি
—তখন আর কোন্ লোকটাকে বাদ দিয়ে নেওয়া যায়? মানুষ আজকাল মশা-
মাছির মতন—গন্ধে গন্ধে এসে পড়ে—ভিড় ঠেলে কূল পাওয়া যায় না। তুষ্টুরাম
নিজের দোষেই বাতিল এ বছর।

কৈফিয়ৎ দিচ্ছে তুষ্টু: বাতিল করে দিয়ে তারা সব বেরিয়ে গেল।
জলাধিকারী মশায়ের কাছে বুদ্ধি নিতে যাই—কি করি এখন? ধার-কর্জে ডুবু-
ডুবু। বেরুতে পারলাম না—এখন আবার ধার চাইতে গেলে তো 'মার' 'মার'
করে তেড়ে আসবে। কিন্তু পেট তো বুঝবে না—পেটের পোড়ার কি উপায়?
জলাধিকারী বলে দিলেন, গৃহস্থবাড়ি গিয়ে মাহিন্দারি কর। তাঁর কথায় একটা
কাজ ধরে নিলাম।

খাতিরের মানুষ বংশীকে সঙ্গে করে এনেছে সুপারিশ করতে। বংশী বলে,
মন্দটা কি হচ্ছে? দুটো-তিনটে মাস দিব্যি রাজার হালে কাটালি। চারবেলা
কষে খেয়েছিস, চিবোতে চিবোতে যতক্ষণ না চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। হাত
পেতে মাস-মাস মাইনে নিয়েছিস। নিয়ে-থুয়ে ঝড়তি-পড়তি যা রইল, সেগুলো
এইবার টেনে আনবার ফিকির।

ক্ষুদিরাম শশব্যস্তে বলে ওঠে, অ্যাঁ, ফসলের ক্ষেত বলছিলি—সে কি ওই
সন্ন্যাসীপদর ফসল?

বংশী বলে, নয় তো কি তুষ্টুরাম বাবু গতর নেড়ে অন্য বাড়ি খোঁজদারি
করতে গেছে? এতকাল দেখেও মানুষটাকে চেনোনি?

ক্ষুদিরাম হাত ঘুরিয়ে বলে, ও-ফসল ঘরে আসবে না। তুষ্টুরামের খোঁজ
যখন—গোড়াতেই বুঝে নিয়েছি, সেইজন্যে গা করিনি। সাঁতালি পর্বতে
লখিন্দরের লোহার বাসর—সন্ন্যাসীপদর বাড়ি তার চেয়েও শক্ত। বাড়ির সামনে
মস্তবড় ফোকরওয়ালা কাঁঠালগাছ, সে ফোকরে মানুষ ঢুকে বসে থাকতে পারে।
পিছনে পাচিলের গায়ে চইগাছ জড়িয়ে উঠেছে। বল্ তা হলে তুষ্টুরাম সে বাড়ির
সন্ধিসুদ্ধ দেখা আছে কিনা। হেঁ-হেঁ বাপু অন্তর্যামী ভগবানের চোখ যেখানে
পৌঁছয় না আমার চোখ সেখানেও।

তুষ্টু ডোম ঘাড় কাত করে সসম্ভ্রমে মেনে নেয়। ক্ষুদিরাম বলে, আমলার

তেপান্তর বিল পার হয়ে যেতে হয়—যেতে হবে ডোঙায় কিম্বা ছোট্ট ডিঙিতে। বিলের মধ্যে ডোঙার পই—পইয়ে প্রায়ই তো জল থাকে না। নেমে পড়ে তখন হাঁটু সমান কাদা ভেঙে ডোঙা টেনে ঘাটে নিয়ে চলো। সে-ও এক হিসাবে ডোঙায় যাওয়া—ভিতরে চড়ে নয়, মাথা ধরে টানতে টানতে। আমি বাপু বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, অত ধকল সামলাতে পারব না। দল হয়ে যারা সঙ্গে যেতে চায় তাদেরও হুঁশিয়ার করে দাও—ভূমধ্যসাগরের মধ্যে সে একটা দ্বীপ। তাড়া খেয়ে সাগরে তবু ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, জামলার বিলের প্রেমকাদা পা দুটো আঠার মতন এঁটে ধরবে।

তুষ্টু ডোম বেজার হয়ে বলে, কথা না শুনেই তুমি রায় দিয়ে বসলে ভটচাজ মশায়। ফসলটা সন্ন্যাসীপদর, কিন্তু ক্ষেত আলাদা, সন্ন্যাসীর বাড়ির উপরে নেই। তা হলে কে বলতে যেত? ফালতু কথা তুষ্টুরামের মুখে বেরোয় না। ফসল চালান হয়ে গেছে তিলকপুর রাখাল রায়ের বাড়ি। লোহার সিন্দুকে বাঘা বাঘা তালা এঁটে রাখত, এখন রাখাল রায়ের ফজবেনে কাঠের ছাপবাক্সে গিয়ে পড়েছে। তিলকপুরের খটখটে রাস্তা—পা থেকে তোমার চটিও খুলতে হবে না। স্বর্ণসিন্দুর-পাঁজিপুঁথির ব্যাগটা নাও না একটিবার ঘাড়ে তুলে। এত করে বলছি—

বলাবলি সত্ত্বেও ক্ষুদিরামের পাশ-কাটানো কথা: আচ্ছা, দেখি তো—

গুরুপদ শুনে রাগে গরগর করে: এসে যখন পড়েছি যাবই তিলকপুর। ঢুঁ মেরে দেখে আসব। যে দেশে কাক নেই, সেখানে বুঝি রাত পোহায় না! বলি, ক্ষুদিরাম ভটচাজ ক'টা জায়গায় আর খোঁজদারি করে, তার বাইরে বুঝি চুরিচামারি বন্ধ? না যায় তো বয়েই গেল। আমরা চলে যাব। তুমি যাবে, আমি যাব, বংশী যাবে। নতুন মানুষ ঐ দু-জন ঘোরাফেরা করছে—বলে দেখো, তারা যদি যায়। মেলা লোকের কী গরজ—দল যত বাড়াবে বখরা তত কম।

তুষ্টু তবু ইতস্তত করে: ক্ষুদিরাম চুলোয় যাক, আসল হলেন বলাধিকারী। তাঁকে দিয়ে 'হাঁ' বলানো দরকার। তবে সবাই বল পাবে। তাঁর অমতে বড় কেউ যেতে চাইবে না। এত খাতিরের বংশী—সে মানুষও গাঁইগুঁই করবে দেখো। নতুন ঐ ফুটফুটে ছোকরা—বলাধিকারীর নেকনজর তার উপরে। দেখি সাহেবকে বলে. নিজেও সে কাজের জন্য ছটফট করছে। বলাধিকারীকে বলে সে যদি মতটা আদায় করতে পারে।

দুই

বনাধিকারীর বড় ভাল মেজাজ। বলেন, ওসব থাক এখন, পরে শোনা যাবে। পাঠ শুনবে তো বল। মুকুন্দ মাস্টার ইস্কুল-ঘরে আসর বসায়। আমার এখানেও আজ পুঁথি-পাঠের আসর।

পুঁথি বের করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে পরম যত্নে রাখা। সন্তর্পণে এক-একখানা পাতা খুলছেন। তালপাতার উপর গোটা গোটা প্রাচীন হরফে লেখা। বলছেন, এ-ও এক পুরাণ—বিস্তর পুরানো পুঁথি। এত পুরানো, বেসামাল হলে তালপাতা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে। এখনো বাংলা পুঁথি—সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃতেও পুঁথি আছে এমনি।

বললেন, তবে কিন্তু বিষয় আলাদা। মুকুন্দর পুঁথিপত্রে পুণ্যবান মানুষদের ধর্মকর্মের কথা, আমার পুঁথিতে চোরের কথা। মুকুন্দ মাস্টারের বাপ যেমন, তেমনি এক মস্ত মানুষের উপাখ্যান।

সুর করে দুটো লাইন পড়ে গেলেন :

চোর-চক্রবর্তী কথা শুনতে মধুর।
যে কথা শুনলে লোকে হয় তো চতুর॥

হেসে বলেন, কাজের খবর এসেছে, বেরোবার জন্য তোমরা ছটফট করছ। খানিকটা চতুর হয়ে নাও চোর-চক্রবর্তীর কথা শুনে।

কথকতার মতো পাঠ হচ্ছে, ব্যাখ্যা হচ্ছে, অন্য বৃত্তান্তও এসে যাচ্ছে প্রসঙ্গ-ক্রমে। কখনো সুর, কখনো শুধুমাত্র কথা। সকলের সেরা যে রাজা তিনি হলেন রাজ-চক্রবর্তী। চোর-চক্রবর্তী তেমনি সকল চোরের মাথার উপর। রাজ-চক্রবর্তী যেমন একজন মাত্র নয়, শক্তি ও প্রতিভার গুণে কালে কালে অনেক জন হয়েছেন, চোর-চক্রবর্তীও তেমনি।

এই জনের নাম হল খরবর। মহাসম্ভ্রান্ত বাপ—বিজয়নগর রাজসভার পাত্র উগ্রসেন। এমনি হত তখন। সমাজের সর্বস্তর থেকে গুরুর কাছে চৌরশাস্ত্রের পাঠ নিতে যেত। চৌষট্টি কলার একটি, এই বিদ্যা বাদ রেখে শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে বলা চলবে না। দেবাদিদেব মহাদেবের ছেলে স্কন্দ চৌরশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক। রাজার ছেলে, দেখা যাচ্ছে, সকল শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েও কায়মনে চৌরশাস্ত্র শিখেছেন। খরবরেরও তাই। কাব্য শিখেছেন, জ্যোতিষ শিখেছেন,

আরও বিবিধ শাস্ত্রে পারঙ্গম। অবশেষে 'উত্তম-অধম চৌরবিদ্যা' কৌতুকভরে শিখে ফেললেন। অদ্বিতীয় হলেন। দেশের চোর-সমাজ সসম্ভ্রমে তাঁকে চোর-চক্রবর্তী বলে মেনে নিল।

বংশী মাঝখানে ফোড়ন কেটে ওঠে: যে রকম কাপ্তেন কেনা মল্লিক।

বলাধিকারী হাসেন: এই কথা বলতে যেও দিকি তোমার আজামশায়কে। টের পাবে। মল্লিককে চোর বলেই স্বীকার করে না পচা বাইটা। হ্যাক-থু করে। বেচারাম-কেনারাম ওদের দুটো ভাইকেই। বলে, ডাকাত হয়তো খানিকটা। তাই বা কিসে—ডাকাতের ডাক হাঁক নেই। দো-আঁশলা ওরা। দিনকাল খারাপ, ঝুটো জিনিসের জয়জয়কার।

বললেন, এ কালের চোর-চক্রবর্তী কেউ যদি থাকে, সে পচা বাইটা। কাজের কৌশলের দিক দিয়ে বলছি। এখন জবুথবু বুড়ো-মানুষ—কিন্তু দিন ছিল তার, গল্প শুনে তাজ্জব হতে হয়। গুরুপদ দেখে থাকবে কিছু কিছু। তাও ভরভরন্ত যৌবনকালের নয়—বয়স হয়ে গিয়েছিল, তা হলেও ছিল ছিটেফোঁটা। বংশী তো কেবল কানেই শুনেছে।

আবার জগবন্ধু পুঁথিতে চলে গেলেন। চম্পাবতী নগরের চোরেরা দল বেঁধে খরবরের কাছে এসে পড়ল। রাজার বড় অত্যাচার—চোর উৎখাত করবার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছে। বিচার-আচার নেই, যাকে পাচ্ছে ধরে নিয়ে শূলে-শালে দিচ্ছে।

চোর-চক্রবর্তী হয়েছেন খরবর, শুধু নিজ-হাতের বাহাদুরি দেখিয়েই হবে না। শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন রাজধর্ম। চোর-চক্রবর্তীরও তেমনি কর্তব্য আছে—কিছু উল্টো রকমের: চোরের পালন, গৃহস্থের শাসন। যত চোর যেখানে আছে, দায়-বিদায়ে এসে পড়ে। তাদের কথা শোনেন তিনি, অসুবিধা দূর করে কাজকর্মের সুব্যবস্থা করেন। সেজন্য প্রাণ দিতেও পিছ-পা নন—

মাঝখানে ভিন্ন কথা এসে পড়ল। গুরুপদ বলে, গুরু নিন্দে করব না—চোর-চক্রবর্তী বাইটা মশায়ের ভিন্ন স্বভাব। বড় স্বার্থপর—নিজের খেলাটাই শুধু দেখিয়ে গেল, বুড়োথুত্থুড়ে মানুষ। কবে শুনব মরে গেছে। গুণজ্ঞান যত কিছু নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে। দুনিয়ার উপরে একছিটে থাকবে না।

ক্ষুদিরাম গদগদ হয়ে বলে, সেদিক দিয়ে ইনি আছেন—এই বলাধিকারী মশায়। পুঁথি পড়ে চোর-চক্রবর্তীর গুণব্যাখ্যান করছেন—নিজে মানুষটা কী? সত্যি কথা মুখের উপর বলব। মরশুমে মানুষজন বেরিয়ে পড়েছে, ব্রতগুলো সংসারের খবরদারি একটা মানুষের ঘাড়ে। কত রকমের দায়-দরকার নিয়ে দিনিরাত্তির মানুষের আসা-যাওয়া। এর ছেলের অসুখ, ওর কলসির চাল

ফুরিয়েছে, ওর ঘরের চালের ফুটো নেই, পুরুষের খবর না পেয়ে ও-বাড়ির বউটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—চতুর্ভুজ নারায়ণের এক গণ্ডা হাত নিয়ে রমারম পয়সা-টাকা ছড়িয়ে যাচ্ছেন, শিবের পঞ্চমুখ নিয়ে যাকে যা বলতে হয় বলে যাচ্ছেন। আর মজাটা হল, লেখাজোখার মধ্যে কিছু পাবে না, সমস্ত ঐ একটা মাথার ভিতরে ভাবতে গিয়েই আমাদের মাথা ঘুরে আসে।

জগবন্ধু ক্রোধের ভান করে বলেন, দেখ, পুঁথি-পাঠে বারম্বার বাগড়া দিচ্ছ। সব পাঠের ফলশ্রুতি থাকে, এ পুঁথিরও আছে। কিন্তু এমন হলে ফল ফলবে না। আমার পণ্ডশ্রম।

বংশী বলে, ছোটমামা ধর্মের পুঁথি-পুরাণ পড়ে—কানে শুনলে পুণ্যি; মরার পরে স্বর্গবাস। চোরের পুঁথির ফলাফল আবার কি?

নেই? শোন তবে—। পাঠ করে জগবন্ধু একটু শুনিয়ে দেন:

চোরচক্রবর্তী নাম রহে যেই ঘরে।
চোরে না দেখিবে চক্ষে তাহার বাড়িরে॥

হেসে বলেন, মুকুন্দর পুঁথি-পুরাণ মহৎ বস্তু। ফলশ্রুতি বিরাট—অনন্ত পুণ্য আর অক্ষয় স্বর্গবাস। সবই কিন্তু ভবিষ্যতের পাওনা। মরে যাওয়ার পরে। আরও অসংখ্য সদাচারের মতো। যেমন ধরো বিধবার নির্জলা একাদশী —দেহের খোলে যতদিন প্রাণ আছে, কাঠ-কাঠ উপোস দিয়ে যাও; পরজন্মে বৈধব্য ভুগতে হবে না। এ জন্মের কষ্ট সেই জন্মে উশুল হবে—আমৃত্যু মাছ-ভাত। কিন্তু চোরের পুঁথির ফল হাতে-হাতে ষোলআনা নগদ—চোর আসতে পারবে না চোরচক্রবর্তীর নাম যেখানে। না পড়ে পুঁথিখানা শুধুমাত্র ঘরে থাকলেও ফল আছে—

এই পুঁথি যেই জন ঘরেতে রাখিবে।
তার ঘরে চোর চুরি করিতে নারিবে॥

খুব হাসছেন বলাধিকারী। নড়ে-চড়ে আবার শুরু করলেন: চোরেরা হাহাকার করে পড়ে খরবরের কাছে। শরণাগত-রক্ষণ বীরের কর্তব্য। চম্পাবতীর রাজাকে অতএব সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে। সর্বসমক্ষে চোর-চক্রবর্তী প্রতিজ্ঞা নিলেন:

চম্পাবতী পুরীখান করিমু বিকল।
তবে চোরচক্রবর্তী নাম হইবে সফল॥
নগরিয়া লোক সব করিমু ভিখারী।
কেমতে রাখিবে রাজা আপনার পুরী॥

আজেবাজে চোর নয়—চোরচক্রবর্তী নিজে যাচ্ছে তো রীতিমত জানান

দিয়ে কাজে নামবে। রাজাকে চিঠি দিল: তোমার পুরীতে গিয়ে তোলপাড় করব, ক্ষমতা থাকে ঠেকাও।

শাস্ত্রমতে চোরের দেবতা কার্তিকেয় হলেও, বাঙালী চোর মা-কালীকে মানে বেশি। ঠগ-ডাকাতের ইষ্টদেবী তিনি, সেখান থেকে চোরের রাজ্যে এসে পড়েছেন। মা-কালী করেনও খুব চোরের জন্য। চুরিবিদ্যার কায়দাকানুন হাতে ধরে শিক্ষা দিয়েছেন, পুঁথিপত্রে রয়েছে। কালী আগে আগে পথ দেখিয়ে মক্কেলের বাড়ি পৌঁছে দিলেন, তারও বিবরণ আছে।

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম।
চরণে পড়লু মাতা আইস এই ধাম॥

কালী তখন স্বপ্নে দেখা দিলেন: আছি আমি সহায়, অলক্ষ্যে সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

কালীর বরে থরবর চম্পাবতীতে খুশি মতন পাকচক্কোর দিচ্ছে। সওদাগরের বেশ নিয়েছে। গোয়ালিনী ধাপ্পা দিয়ে ভরপেট দই খেয়ে উদ্গার তুলে সরে পড়ল। নাপিতকে ঠকিয়ে বিনি পয়সায় ক্ষৌরকর্ম করাল। তাঁতিকে ফাঁকি দিয়ে দামি দামি কাপড়-চাদর গাপ করল। পুরীর বাড়ি বাড়ি চুরি—

রাত্রে চুরি করে চোর, দিনে যায় নিদ।
প্রভাতে উঠিয়া দেখ সর্বঘরে সিঁধ॥

সিঁধ সকলের ঘরে, তিন রকমের বাড়ি শুধু বাদ। যাঁরা পণ্ডিত ও বিদ্বান, যাঁদের দানধ্যান আছে আর যাঁরা ভক্ত মানুষ—এমন লোকের বাড়ি চোর কথনো উৎপাত করবে না। চোর নীতিশাস্ত্রের নিষেধ:

ব্রাহ্মণ সজ্জন দাতা বৈষ্ণব তিনজন।
ইহার ঘরে চুরি না করিহ কখন॥

এমনি কয়েকটা বাড়ি বাদ দাও। সকালবেলা শয্যা ছেড়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে পাবে—কি দেখবে? আজেবাজে চোর হলে উপমা দিয়ে বলতাম, দেখবে চম্পাবতী পুরীর সর্বাঙ্গ জুড়ে গলিত ক্ষত। কিন্তু চোর-চক্রবর্তী পাকা হাতের গুণে চম্পাবতীর ঘরে ঘরে রাত্রের মধ্যে যেন ফুল উঠেছে। সিঁধগুলোর বাহার এমনি।

· · ·

গল্প ছেড়ে সিঁধের প্রসঙ্গ চলল কিছুক্ষণ। জানার গরজ সকলেরই—বলাধিকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করে নেয়। ভাল সিঁধ হল রীতিমত শিল্পকর্ম। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখতে হয়। বস্তুটা আজকের নয়। হাজার দুয়েক বছর আগেও সাত রকম উৎকৃষ্ট সিঁধের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পদ্মব্যাকোষ অর্থাৎ

ফুটন্ত পদ্মফুলের মতো সিঁধখানা। ভাস্কর অর্থাৎ সূর্যের মতো গোলাকার। বালচন্দ্র অর্থাৎ কাস্তের আকারের চাঁদের মতো। বাপী অর্থাৎ পুকুরের মতো চৌকোণা। বিস্তীর্ণ কিনা অনেকখানি চওড়া। স্বস্তিকের চেহারার সিঁধ পূর্ণকুম্ভের চেহারার সিঁধ। মোট এই সাত।

সিঁধ মানে সুড়ঙ্গ। অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে সগরপুত্রেরা সিঁধ কেটে সরে পড়লেন। কাটতে কাটতে একেবারে পাতাল অবধি! বেই বিশাল সিঁধ সর্বকালের আদর্শ হয়ে আছে। সিঁধ কেটে বিদ্যার ঘরে সুন্দর ঢুকে পড়ল, সে-ও বেশ চমৎকার সিঁধ। এই কিছুদিন আগে খবরের কাগজে একখানা উৎকৃষ্ট সিঁধের বিবরণ বেরিয়েছিল। পাঁচিলে গেঁথে তারের জালে ঘিরে লড়াইয়ের বন্দীদের আটক রেখেছে—শান্ত্রীর দল দিনরাত পাহারায়। ঘরের ভিতর থেকে এরা মাসের পর মাস ইঁদুরের মতন সুড়ঙ্গ কেটে যাচ্ছে। সারা রাত ধরে কাটে, দিনমানে তার উপর বিছানা বিছিয়ে দেয়। শিবিরের ঘেরের মধ্যে চাষবাস হয়—সুড়ঙ্গের মাটি সেই চাষের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রেখে আসে। মাস ছয়েক পরে বাইরে ফুটো বেরিয়ে পড়েছে। ইঁদুরেরই মতন গর্ত দিয়ে তখন ফুড়ফুড় করে পালিয়ে যায়।

জায়গা বিশেষে সিঁধ কাটার কায়দা আলাদা। কার্তিক ঠাকুর নিজেই তার হদিশ দিয়েছেন। ঝামা-ইটের গাঁথনি হলে একখানা করে ইট খসাবে। আমা-ইট হলে কাটবে। দেওয়াল যদি মাটির হয়, জলে ভিজিয়ে নরম করে নেবে। কাঠের দেয়াল হলে উপড়াবে। আন্দাজমোজা সিঁধ হলে হবে না, কাটবার আগে দেয়ালের উপর রীতিমত মাপজোপ করে নেবে যে দেহখানা ঢুকবে তার অনুপাতে। সিঁধকাঠি যেমন, সঙ্গে একগাছি শক্ত সুতোও থাকবে অতি অবশ্য। সুতোর অনেক কাজ। সিঁধের মাপ নেওয়া ঐ তো হল। দরজায় ভিতর থেকে হয়তো খিল দেওয়া আছে—সুতোর মাথায় বড়শির মতো কিছু বেঁধে কোন-এক ফুটো দিয়ে দরজার গায়ে গায়ে দাও নামিয়ে। বড়শি খিলে আটকে আস্তে আস্তে উপর-মুখো টানো। খিল খুলে আসবে ছিপে মাছ গেঁথে ডাঙায় তোলার মতো। মেয়েমানুষের গয়নাও, কাছে না গিয়ে, খুলে আনা যায় এই কায়দায়। আরও আছে। রাত্রিবেলা অন্ধকারের মধ্যে আনাচেকানাচে বসে কাজ—সাপে কাটতে পারে হেন অবস্থায়। ঐ সুতোয় তাগা বেঁধে তখন ওঝার বাড়ি যেতে পারবে। তাই ঘটে গেল চতুর্বেদবিশারদ শর্বিলক যখন সিঁধ কাটতে বসেছে। আঙুলে সাপে না কিসে কামড় দিল। সুতো নিয়ে যায় নি, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান বলে গলায় পৈতে। পৈতে খুলে চট করে আঙুল বেঁধে ফেলল। নাস্তিক অনেকে আজকাল উপবীত ত্যাগ করেন—

কিন্তু উপবীতের শুধু মাত্র এদিক দিয়েও কত দরকার, ব্রাহ্মণপুঙ্গবেরা দেখুন একবার ভেবে।

সিঁধ হয়ে গেল আর অমনি তুমি ঢুকে পড়বে, হেন কর্ম কদাপি নয়। সেকাল একাল—সর্বকালের ওস্তাদের মানা। ভিতরের মানুষ জেগে না ঘুমিয়ে —সেই পরখ সকলের আগে। প্রতিপুরুষ অর্থাৎ নকল মানুষ সিঁধে ঢোকাবে —চৌরশাস্ত্রের আচার্যেরা বলছেন। ঢুকিয়ে এদিক-সেদিক নাড়বে। চোর ধরবার জন্য কেউ তৈরি থাকে তো অন্ধকারে এঁটে ধরবে সেই বস্তু। বেকুব হবে।

গুরুপদ অবাক হয়ে বলে, আমাদেরও অবিকল সেই জিনিস। লাঠির মাথায় কেলে-হাঁড়ি বসিয়ে সিঁধের মুখে ঢুকিয়ে দিই। সে হাঁড়ি একটুখানি ঢুকে গিয়ে পিছিয়ে আসে, আবার এগোয়। মানুষই যেন মানুষের চুল-ভরা কাল মাথা। হাঁড়ি নির্গোলে বার-কয়েক ঘুরে-ফিরে এলে তারপরে মানুষের যাওয়া।

বলাধিকারী বলেন, শুধু এই একটা কেন, শর্বিলকের অনেক পদ্ধতি আজও হুবহু চলে। ঘরে ঢুকেই সে দরজা খুলে দিল—দরকার হলে স্বচ্ছন্দে পালাতে পারবে। পুরানো দরজা খুলতে গিয়ে আওয়াজ উঠতে পারে, তাই সাবধানে জল ঢেলে জোড়ের মুখ ভিজিয়ে দিল। তোমরা করো না? বলো সে কথা। ঘননীল পোশাক নিয়েছে শর্বিলক। চোরের পোষাক আজও সেই। চারুদত্ত নাটকে দেখা যাচ্ছে 'কাকলী' নামে একরকম মৃদুস্বর যন্ত্র চোরের হাতে। তাই বাজিয়ে সে ভিতরের মানুষের সাড়া নেয়। হাত-কাটা বোষ্টম নামে একজন কেনা মল্লিকের সঙ্গে ঘোরে, ব্রেচারামের সঙ্গেও সে ছিল। একখানা হাতে, আহা-মরি একতারা বাজায়। ঢিল ফেলা, দুয়োর-জানলা নড়ানো এ-সব হল মোট কাজ। মিষ্টি বাজনায় মক্কেল মানুষটার মন ভরে যায়, জেগে থাকলেও ছুটে বেরিয়ে তাড়া করতে ইচ্ছে করে না। এমনি কত! চোরের পুঁথি এমন একখানা-দুখানা নয়—পুঁথিপত্রে নিয়মও অগুণতি। মিলিয়ে মিলিয়ে আমি দেখাতে পারি, সেই হাজার হাজার বছরের কায়দা-কানুনই মোটামুটি এখনো চলে আসছে।

চোর-চক্রবর্তীর কথা। রাত্রে বাড়ি বাড়ি সিঁধ দিচ্ছে, সকালে উঠে মানুষ-জন অবাক। সকলেরই এক দশা, কে কার জন্য হা-হুতাশ করে!

কিন্তু খরবর তৃপ্ত নয়। আসল মক্কেলই বাকি এখনো—যাঁর নাম করে চম্পাবতী এসেছে। রাজবাড়িতে ঢুকবে এবার। কালীরও কথা পেয়েছে— 'বাহ রাজঘরে আমি থাকিব সজ্জিত' অমন জায়গায় চুরির বস্তুটাও নিশ্চয় সকলের বড় হবে—

চোর বলে ধন লইয়া আমি কি করিব।
রানী চুরি করি আমি কলঙ্ক থুইব ॥

রাজবাড়ি নিশুতি। রাজা-রানী পাশাপাশি পালঙ্কে শুয়ে, খরবর নিপুণ হাতে রানীকে কাঁধে তুলে নিল। নিয়ে গেল পুরীর প্রান্তে গরিবের ঘরে—ধান ভেনে, চিঁড়ে কুটে দিন চলে তাদের। তারাও ঘুমে বিভোর। সেই ঘরের বউটা তুলে নিয়ে রাজ-রানীকে শুইয়ে দিল সেখানে। বউকে রাজার পালঙ্কে নিয়ে এলো।

হৈ-হৈ পড়ে যায়। ঘুম ভেঙে রাজা দেখেন, পাশে রানী নেই, কুৎসিত এক প্রেতিনী। ওঝা ডেকে ঝাড়ফুক করে প্রেত-শান্তি হচ্ছে। আর ওদিকে চিঁড়াকুটি লোকটা দেখছে তার কুঁড়েঘরে স্বর্গ থেকে দেবীর আবির্ভাব। লোকজন ভেঙে এসে পড়েছে। ঢাকঢোল বাজিয়ে মহা আয়োজনে পুজোর যোগাড় হচ্ছে। খবর পেয়ে রাজাও এসে পড়লেন—

বলে যাচ্ছেন বলাধীকারী। শ্রোতারা হেসে খুন। গল্পের আরও আছে, অনেক সব ঘটনা।

—চোর ধরবে কোটাল, পুরী তোলপাড়। খরবর নাস্তানাবুদ করে সেই কোটালকে। কোটালের মেয়ে লীলাবতীর নতুন বিয়ে হয়েছে, জামাই হয়ে খরবর কোটালের বাড়িতেই উঠল। কোটাল সর্বত্র খুঁজবে নিজের বাড়ি বাদ দিয়ে। খুঁজলেই বা কি—এমন কায়দা-কৌশল, মেয়ে নিজেই তো বর ভুল করে বসে আছে। লোক-লজ্জায় শেষটা কোটালকে দেশান্তরী হতে হল মেয়ে-বউর হাত ধরে। যাকে পায় তাকেই জব্দ করে বেড়াচ্ছে খরবর—'যে কথা শুনিলে লোক হয় তো চতুর।'

ছেলে-ভুলানো কাহিনী, কিন্তু বড়দেরও ভাল লাগে। সর্বসমাজে সব বয়সের মানুষই আসলে ছেলেমানুষ—গল্পের জন্য ছোঁক-ছোঁক করে। শ্রোতা বুঝে তুমি কেমনভাবে বলবে, সেই হল কথা। হেসে এরা সব লুটোপুটি যাচ্ছে, বড্ড জমেছে।

হঠাৎ থেমে গিয়ে বলাধিকারী বলেন, বিশ্বাস হয় না—কেমন?

ঘুমন্ত মানুষ কাঁধে করে এত পথ নিয়ে গেল। দু-দুজন—রাজবাড়ি থেকে একটি, চিঁড়াকুটির বাড়ি থেকে একটি। কেউ কিছু টের পেল না—রাত পোহালেও বহাল মানুষটা পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। যে শুনবে, সেই ঘাড় নাড়বে: এমন কখনো হতে পারে না।

তারপর বলাধিকারী নিজেই বোঝাচ্ছেন, 'রাজার মন্দিরে গিয়ে সিঁধালি

ভেজাইল'—নিদালির উপরে কাজ হচ্ছে, খেয়াল রেখো। বাড়িতে হাজির হয়েই খরবর সকলের আগে নিদালি করেছে।

সাহেব বলে, নিদালি যত যা-ই করুক, ঘুমই তো মোটের উপর। জেগে না উঠে পারে না। চোরের হাতে মরণকাঠি-জীবনকাঠি থাকলেও না-হয় বুঝতাম। রানীকে কাঠি ছুঁইয়ে বাঁচিয়ে দিয়ে এলো রূপকথার মতন—

বলাধিকারী সহাস্যে বললেন, ঘুম পাড়িয়ে মানুষ-চুরি বিশ্বাস হয় না তোমাদের?

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, পুঁথিপত্রে অনেক আজগুবি লেখে।

বলাধিকারী বললেন, সাহেব নতুন কিছু বলছে না—সবাই ঠিক এই বলবে। আমিও বলে বেড়াতাম যদ্দিন না পচা বাইটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, বাইটার মুখে তার কাজকর্মের কথা শুনলাম। বুড়োথুখুরে বাইটা মশাই—কবে আছে, কবে নেই। আমায় খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বলেই হয়তো। আমার কাছে মিথ্যে ধাপ্পা দিয়েছে, বিশ্বাস করব না।

বংশী অবাক হয়ে বলে, আজামশায় মানুষও চুরি করেছে? আমরা তো কই শুনি নি।

দরকার হলে তা-ও সে পারত। কিন্তু মানুষ নিয়ে কী মুনাফা—মানুষের গায়ে যা থাকে, সেইগুলোই শুধু নিয়ে নিত।

হাসেন বলাধিকারী। বললেন, মানুষ-চুরিতে মুনাফা তো নেই-ই, উল্টে নানান ঝামেলা। নিদালির ঘোর এক সময় না এক সময় কাটবে, জেগে উঠে গোলমাল করবে। সেইজন্য ধীরে-সুস্থে নিখুঁতভাবে সর্বাঙ্গ ন্যাড়া করে নিয়ে তারপরে মক্কেল-রমণীটা ফেলে চলে যায়। আম খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে দেবার মতন। মক্কেলই হতে দেয় তাই। ডানহাতের আঙুলের আংটি মণিবন্ধের চুড়ি-কঙ্কণ, বাহুর অনন্তবৈঁকি—সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল তো বাঁ-হাতটা আবেশে এগিয়ে দেবে কারিগরের দিকে।

ভালবেসে—সোহাগ করে? জুত মতন প্রসঙ্গ পেয়ে এইবার নফরকেষ্টর কথা ফুটল। সে খি-খি করে হাসে।

বলাধিকারীও লঘুভাবে বলেন, একটা নিশির নিশিকুটুম্ব—চোখেই তো দেখল না মেয়েটাকে, ভালবাসা জন্মে কিসে? গরজ তো ভালবাসার নয় যে মাল নগদ-মূল্যে বাজারে চলবে, তাই কেবল হাতড়ে নিচ্ছে। নইলে যা অবস্থা তখন—নাকের খরকেকাঠি খুলে নিচ্ছে, নাক কেটে বোঁচা করে নিলেও সে রমণী আপত্তি করবে না। নিদালির এমনি মহিমা।

নিদালির কথা শোনে সবাই—স্বাস্তের কুটুমের বড় সহায়। কালের হাওয়ায়

এবং তেমন পাকা ওস্তাদের অভাবে লোকে ইদানীং আস্থা হারাচ্ছে। কিন্তু অতিশয় প্রাচীন পদ্ধতি। বৈদিক আমলেও ছিল—অবস্বাপনিকা। মন্ত্র পড়ে ঘুম পাড়ানো। রেওয়াজটা চলে এখনো—মক্কেলের উঠানে গিয়েই কারিগর আগেভাগে মন্তর পড়ে নেয়। সংস্কৃত নয়, গ্রাম্য-বাংলা কথা। মন্তর পড়ে, বাইটা একদিন শুনিয়েছিল আমায়। গোড়ার এক-আধ লাইন মনেও আছে: নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি, নাকের শোয়াসে তুললাম মঞ্চপের ধূলি—

পড়ে গেলেই হল না, প্রক্রিয়া আছে সেই-সঙ্গে। মঞ্চপ হল মণ্ডপ—ঘর। নাকের শ্বাসে ধুলো টেনে তুলতে হবে। মন্তরের কথা কিংবা প্রক্রিয়ার চেয়ে আমি কিন্তু মনে করি পড়াটাই আসল। বাইটা পড়ল, যেন বালি-খোলায় চড়বড় করে খই ফুটছে। মুখ-চোখের রকম আলাদা—

হেসে নফরার কথায় জবাব দিলেন: তা-ও না হয় চেষ্টা করতাম, কিন্তু তোমার সামনে সাহস হয় না। এমনিই তো জেগে জেগে ঘুম—নিদালি করলে আর সে-ঘুম তোমার ভাঙানো যাবে না।

সামনের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলাধিকারী আবার বলেন, মক্কেলের উপর মন্তরের কি গুণ, সঠিক আমি বলতে পারব না। কিন্তু যে পড়ে তার বুকে বল জাগে, মনে প্রত্যয় আসে। সেই যে এক পুরানো গল্প—গুরুর কাছ থেকে মন্ত্রপূত লাঠি পেয়ে গেল, লাঠি মুঠোয় ধরলে মানুষটা অজেয়। এদেশ-সেদেশ বৃত্তান্ত চাউর হয়ে গেল। রোগা লিকলিকে সেই মানুষ পালোয়ানের আখড়ায় হামলা দিয়ে পড়ে—বগলের লাঠি আস্তে আস্তে নিয়ে নিচ্ছে। পালোয়ানের কাকুতি-মিনতি: রক্ষে কর, রক্ষে কর। লাঠি কঠিন মুঠিতে ধরে বেদম পিটছে। অসহায় দুর্বল ভেড়ার মতো মার খেয়ে যাওয়া ছাড়া তাদের উপায় নেই। গুরু মরবার সময় অনুতাপের বশে ব্যাপারটা ফাঁস করে গেলেন: মন্তর ভাঁওতা, নিতান্তই সাধারণ লাঠি একটা। সেই লাঠি, সেই মানুষ সবই রইল, কিন্তু গুণ আর খাটে না এর পরে। এ-ও তেমনি। ওস্তাদ কানে দিয়েছে, সেই মন্তর পড়ে কারিগর অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা পেয়ে যায়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে। কাজের তো অর্ধেক হাসিল এইখানে।

দম নিয়ে বলাধিকারী বলতে লাগলেন, কেন হবে না বলো দিকি, অসম্ভব কিসে? সম্মোহনের ব্যাপার দেখেছ নিশ্চয়—হিপনটিজম্। মানুষটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল—তারপর যা বলছে, তা-ই সে করে। তেমনি খানিকটা। মন্তর ছাড়াও কত রকমের ব্যবস্থা। আবহাওয়া বুঝে হিসেব করে নিয়েছে—রাত্রের মধ্যে কোন্ সময় ঘুমটা এঁটে আসবে। উঠানে ঢিল ফেলে, জানালায় দরজায় ঘা দিয়ে পরখ করে দেখেছে। নিশ্বাসের শব্দ বুঝে নিয়েছে ঘরের মানুষের।

সিঁধের মুখে প্রতিপুরুষ ঢুকিয়ে দেখেছে। আরও আছে—এক রকমের ডাল-পাতা শুকিয়ে রাখা—ঘরে গিয়ে সেই বস্তু ধূপের মতো জালিয়ে দেবে। মক্কেলের নাকে-মুখে কিছু ধোঁয়া যাওয়া চাই। সেই পাতারই বিড়ি বানানো আছে—কারিগর কাজ করছে, আর বিড়ি টেনে অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে মক্কেলের নাকে। এমনি তো শতেক বন্দোবস্ত, কিন্তু সকলের উপরে কারিগরের হাত দুটো। হাত বেতালা চললে সমস্ত বরবাদ। আঙুল বেয়ে আনন্দ যেন চুইয়ে-চুইয়ে পড়ছে মক্কেলের প্রতি রোমকূপে। কতক্ষণ আর যুঝবে হেন অবস্থায়? তখন এমনি গতিক—যা তুমি চাইবে, এমন কি চাওয়ার আগেই, দেবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

ইঙ্গিতময় হাসি হেসে নফরকেষ্ট বলে ওঠে, এতখানি যদি হল, ছাইভস্ম দেড়খানা গয়না নিয়েই শোধ যাবে কেন?

শিউরে উঠে বলাধিকারী জিব কাটলেন: ছি-ছি, এমন চিন্তা লহমার তার মনে আসবে না। মহাপাতক। নিশিকালী উন্মত্তকালী সহায় থাকবেন না। বিচারবুদ্ধি হারিয়ে হাতও বেসামাল হবে, ধরা পড়বে কুমার কার্তিকেয়র অভিশাপে।

বলেন, সাধুসন্ন্যাসীরা কামিনীকাঞ্চনে নিস্পৃহ। চোর সে হিসাবে আধা-সন্ন্যাসী। কাঞ্চনই চাই, কিন্তু কামিনী একেবারে পরিত্যাজ্য। যুবতী কামিনীর সঙ্গে চোরে এক শয্যা নিয়েছে—ঘটনার এই অবধি শুনে সতীসাধ্বীরা আশঙ্কিত: কি সর্বনাশ, কী না জানি ঘটে এর পর! বুদ্ধিমানের ঘাড় নড়ে ওঠে: অসম্ভব, এই কখনো হয়! কোন চোরে বাহাদুরির আজগুবি গল্প রটিয়েছে। কিন্তু পচা বাইটার নিজ মুখে শোনা—ঠিক এমনিটাই ঘটেছিল তার হাতে। এখনো আবার ঘটতে পারে—

সাহেব লুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে; পারে তাই ঘটতে?

বলাধিকারী বলেন, বাইটা বলে তাই। বুকের ধুকপুকানিটুকু ধরে রেখেছে নাকি সেই লোভে। ক্ষেত্র পেলে খাঁটি জিনিস কিছু ছাড়বে। মরবার আগে—নিজের ক্ষমতায় আর হবে না, শিষ্য-সাগরেদের খেলা চোখ মেলে দেখে যাবে দু একখানা। বলে বাইটা, আর নিশ্বাস ছাড়ে।

গুরুপদর দিকে তাকিয়ে বললেন, আর তোমরা বলো স্বার্থপর বুড়ো, কৃপণের জাসু। গুণজ্ঞান নিজের সঙ্গে নিয়ে মরবে। বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো যায় না—ক্ষেত্র না জুটলে তাই অবজ্ঞা করতে হবে বাইটাকে।

আজ ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য নয়, সাহেবের কাছে এসে তুষ্টুরাম ধর্না দিয়ে পড়ল।

সঙ্গে বংশী আর গুরুপদ। তুষ্টু বলে, বলাধিকারীর নেকনজর তোমার উপর, তুমি ধরে পড় সাহেব। খবর আমার সাচ্চা, নইলে এত করে বলতাম না।

গুরুপদ আগুন। আশায় আশায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে সেই থেকে বংশীর অন্ন ধ্বংস করে যাচ্ছে। হাত-পা কোলে করে মানুষ কাঁহাতক ধৈর্য ধরতে পারে! বলে, তোমাদের ভাব বুঝি নে। থলেদার যেন দুনিয়ার উপর নেই। ক্ষুদিরাম খুঁজিয়াল বাদ হল তো জগবন্ধু থলেদারও বাতিল। থলেদার আমি এনে দেবো। কত পড়ে ফ্যা-ফ্যা করছে।

সাহেব আহত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলে, বলাধিকারী মশায় থলেদার নন—মহাজন।

গুরুপদ আরও ক্ষেপে যায়: খেয়ে খেয়ে পেট মোটা হয়ে এখন মহাজন। ব্যাঙাচির লেজ খসে কোলাব্যাঙ। পেটের ক্ষিদে মরে আছে, কাজের আর চাড় নেই। মজাই তো তাই। তামাম মুলুক চুঁড়ে পাহাড়প্রমাণ মাল এনে দিলাম—হিসাবের বেলা থলেদার বলবে, মোটমাট সাড়ে দশ টাকা হল, তোমার ভাগে এই এগারো আনা। কারিগর মরে, থলেদার কেঁপে ওঠে। বুড়ো বয়সে একটু ভগবানের নাম করব—তা কি করি, পেটের দায়ে ছ্যাচড়া কাজে আবার আসতে হল।

তুষ্টু ঘাড় নেড়ে সমর্থন করে: আমারও ঠিক তাই। ধার-দেনায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে বসে আছি। তাগিদের চোটে ঘেন্না ধরে যায়। বলি, দুত্তোর, সন্ন্যাসী হয়ে বনে যাওয়া ভাল। বনে গিয়ে ভগবানের নাম করিগে।

খপ করে সে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে: তিলকপুরে আজকেও ঘুরে এলাম। দেখে আরও উতলা হয়েছি। মুফতের পয়সা পেয়ে রাখাল রায় দু-হাতে উড়াচ্ছে। নোনায়-খাওয়া পাঁচিলে মিস্ত্রি-মজুর লাগিয়েছে, ছাত দিয়ে নাকি জল পড়ে—ছাত খুঁড়ে নতুন করে পেটাচ্ছে। ছাত-পেটানো মুগুরের ঘা আমার বুকেই যেন পড়তে লাগল।

জোয়ানপুরুষ তুষ্টু ডোম বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল। বলে, বুঝলে সাহেব, যা-কিছু এক্ষুনি। দেরিতে ভেস্তে যাবে।

বংশী জুড়ে দেয়: বলাধিকারী মশায় একটিবার ঘাড় নেড়ে দিন, মালপত্তর পাদপদ্মে এনে ফেলি।

তুষ্টু আবার বলে, এত বড় ঘা-খানা কপালে নিয়ে ঘুরছি! ঘা বেড়েছে, সমস্ত রাত্রির টাটানি। তাই নিয়ে চলে গেছি রাখাল রায়ের হালচাল দেখতে।

সাহেব কি ভাবছিল। তুষ্টুর দিকে চমকে তাকায়। কপালের একটা পাশ পেঁচিয়ে ন্যাকড়ায় বাঁধা। রাজা যেমন কাত করে মুকুট বসিয়ে যাত্রার আসরে আসে।

সাহেব বলে, তুষ্টু, তোমার কপাল কেমন করে ফাটল, সেটা কিন্তু ভাল করে শোনা হয় নি।

তুষ্টু নিরীহভাবে বলে, বিধাতাপুরুষ ফাটাল।

এমন কথায় হাসি না এসে পারে না। সাহেব বলে, সে কি রে! বিধাতা এসে ইট মারল? সেদিন যে বললে তোমার মনিব-গিন্নি?

কথা সেই একই। ইটখানা বিধাতাপুরুষের, গিন্নির হাত দিয়ে এসে পড়ল।

দার্শনিক মানুষের মতন কথা। হেসে উঠে সাহেব বলে, বিধাতাপুরুষ ত্রিভুবন সৃষ্টি করে বেড়ান, হঠাৎ তিনি নুলো হয়ে গেছেন—ইট মারবার জন্য গিন্নিকে ডাকতে হয়?

তুষ্টু বলে, কার কোন্ ঘরে জন্ম, সেটা তো ষোলআনা বিধাতার এক্তিয়ার। জন্মের দোষে ইট খেতে হয়। মেরেছে মন্দা বউ বটে, কিন্তু আসল মার বিধাতাপুরুষের। ডোমের ঘরে যিনি জন্মটা দিলেন।

ঘটনা শোনা গেল সবিস্তারে। সন্ন্যাসী দত্তের বাড়ি তুষ্টুরাম মাহিন্দার। সন্ন্যাসী মারা গেছে, তার শ্রাদ্ধ। ভিতর-উঠান বাইরের উঠান সাফ-সাফাই হয়েছে। সামিয়ানা খাটানো হবে। কুড়াল নিয়ে তুষ্টু বাঁশঝাড়ে গেছে বাঁশ কেটে আনতে। এনেছেও অনেকগুলো, সকাল থেকে এই করছে। একলা টেনে-হিঁচড়ে ঝাড় থেকে বাঁশ বের করা কত খাটনির কাজ, সে যারা করে তারাই শুধু বুঝবে। দুপুর গড়িয়ে গিয়ে কষ্টটা বড্ড বেশি লাগছে এখন।

তুষ্টুরাম বসে পড়ল বাঁশঝাড়ের ছায়ায়। নারকেল-খোসার নুড়িতে আগুন ধরিয়ে তামাক সেজে নিয়েছে। তামাক টানছে পা ছড়িয়ে বসে—আর যে যে বাঁশটা ফেলা হয়েছে, কুড়ালের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠকঠক করে বাঁ হাতে ঘা মারছে তার উপর। অর্থাৎ বাড়ি বসে শুনুক তারা, ঝাড়ে গিয়ে তুষ্টু বিষম কাজ করছে। অবিরত বাঁশ কেটে যাচ্ছে। খেটে খেটে লোকটা নাজেহাল হয়ে গেল।

আয়েশ করে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এমনি সময়ে বোঁ করে ইট এসে পড়ল কপালে। ঠিক বাঁ চোখটার ওপরে। রক্তের ধারা বয়ে গেল।

মন্দাকিনী স্বামীর শোকে উন্মাদিনীপ্রায়, তা বলে সে রমণী কাজ ভোলবার বান্দা নয়। অনেকক্ষণ থেকে বাঁশ বাড়ি আসছে না—শুধু কুড়ালের আওয়াজ। মনে কেমন সন্দেহ হল, পা টিপে টিপে গেল চলে বাঁশঝাড় অবধি। গিয়ে দেখে তুষ্টুরামের কাণ্ড।

কপালের রক্ত হাতে মোছে তুষ্টু। মুছে মুছে পারা যায় না। ধারায় পড়ছে মুখের উপর দিয়ে। তুষ্টু গরম হয়ে বলে, ইট মারলে কেন ঠাকরুন?

মন্দাকিনী অবিচল কণ্ঠে বলে, কি করব তবে, কি করতে বলিস তুই? হাতে মেরে ছোঁয়াছুঁয়ি করব নাকি রে হারামজাদা? অবেলায় তার পরে চান করে মরি! হবিষ্যি করে করে এমনিই আধমরা—এর উপরে নিউমোনিয়া ধরলে তো রক্ষে পাস তোরা সকলে।

শুনতে শুনতে হঠাৎ সাহেব গর্জে উঠল: যাব রে তুষ্টু। কাজ না হোক, গিন্নিকে একবার চোখে দেখতে হবে। সেইজন্যে যাব।

আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল। তুষ্টুর হাসির তোড়ে গর্জন জমল না। হেসে হেসে বলছে, যাই বলো, জাতে ছোট হয়ে ভালই আছি। বিধাতাপুরুষকে দোষ দিই না—বেশ ভালই করেছে। সুবিধা কত ছোটজাতের! আমি সকলের ভাত খেতে পারি, আমার কাছে ভাত চেয়ে কেউ খরচার দায়ে ফেলবে না। মজা করে রাঁধা-ভাত খেয়ে বেড়াব, আমায় কেউ রাঁধতে বলবে না। আর এই মারধোরের কথা যদি বলো, মন্দাঠাকরুনের মতো ধড়িবাজ ক-জনা? ছোঁয়াছুঁয়ির ভয় সন্ন্যাসী দত্তেরও ছিল—কিন্তু সে কেবল মুখেই তড়পাত। ইট মারার বুদ্ধি মাথায় ঢোকে নি তার কোনদিন।

শীতের সন্ধ্যা। জগবন্ধুর উঠানের সামনে জামতলায় চারজনে গোল হয়ে বসেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। সাহেব ডাকে: এক ছিলিম টেনে গরম হইগে চলো।

সাহেব দাওয়ায় থাকে, সেখানে চলল। তামাকের সরঞ্জাম সেখানে। তুষ্টু-রামের সুখের কাহিনী শেষ হয় নি। ফিকফিক করে হাসছে। আগের কথার জের ধরে বলে, ছোঁবে না, ঘরে উঠতেও দেবে না আমাদের। উঃ, জাতে ছোট হয়ে কত রকমে যে রক্ষে হয়েছে! যাহিন্দারি এদ্দিন ধরে, তা ঝাঁট দিতে হয় না, জল আনতে বলে না, বাসন ছুঁতে দেয় না। জলচল নবশাখ হলে মন্দাঠাকরুন ছেড়ে কথা কইত! তেমন মেয়েমানুষই নয়। সমস্ত কাজ চাপান দিত একটা মানুষের ঘাড়ে। এ বেশ দিব্যি ছিলাম—বাইরে বাইরে কাজ, গৃহস্থের চোখের আড়ালে। এক দিনের বাঁশকাটা ধরেছে। সব দিনের সব কাজ ধরতে পারলে ইট তবে একখানা-দুখানা নয়—পুরো একপাঁজা খতম হয়ে যেত।

তিনজনে দাওয়ায় ওঠে, তুষ্টুরাম নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল। সাহেব বলে, কী হল? এক্ষুনি চলে গেলে হবে না। উঠে এলো। আরও শুনতে হবে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ আছে।

চাঁচতলায় আরও খানিকটা এগিয়ে এসে তুষ্টু বলে, এইখান থেকে বলছি, দাওয়ায় উঠব কেমন করে?

সাহেব তাকিয়ে পড়তে তাড়াতাড়ি বলে, ঐ যে হল। জাতে ছোট—

সাহেব বলে, ছোট হোক বড় হোক তবু একটা জাতের ছায়ায় আছ তুষ্টু, আমার যে তা-ও নেই। আমার দাওয়ায় উঠতে মানাটা কিসের ?

উঠানে নেমে হাত ধরে হেঁচকা টানে তুষ্টুকে দাওয়ায় এনে তুললে। বলে, পৈঁঠায় কাঁটা দেওয়া নেই, দেখলে তো ? উঠে পড়লে কেউ আটকাতে পারে না।

তামাক সাজতে সাজতে তুষ্টুর দিকে চেয়ে আবার বলে, জাতই নেই মোটে আমার। এক বলতে পারো মানুষজাত। সেদিক দিয়ে অবশ্য সুবিধা। তোমার চেয়েও ঢের সুবিধা আমার—বামুন থেকে মুচি যে-কোন জাতের মধ্যে গরজ মতন ডুব-সাঁতার দিয়ে উঠতে পারি।

হেঁয়ালির মতো কথাবার্তা—জাত-বেজাতের বিরুদ্ধে আজকাল লম্বা লম্বা বচন শোনা যায়, তেমনি কিছু হবে হয়তো। গুরুপদ অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কাজের মধ্যে এখন জাতকুল কিসের ? বলি, তুষ্টুর ঘরে আর সাহেবের ঘরে বিয়ের সম্বন্ধে নয় তো ! কাজের কথা হোক।

তিন

কাজ তিলকপুরে। সামান্য সাত-আট ক্রোশ পথ। আদ্যপান্ত আবার ভাল করে শোনা গেল। মক্কেল রাখালপতি রায়। বোনাই সন্ন্যাসীপদ মরে যেতে বোন-ভাগনে সঙ্গে করে তিলকপুরে নিজের বাড়ি এনেছে। বোন নিয়ে এসেছে একক্কাঁড়ি টাকা। খবর খুব পাকা। পারার ব্যাধি আর টাকার গরম মানুষে চেপে রাখতে পারে না, ফুটে বেরোয়। রাখালের আগেকার কথাবার্তা আর এখনকার হাঁকডাক—কানে পড়লেই তফাত ধরা যাবে। আজকেও তুষ্টুরাম তিলকপুরে চলে গিয়েছিল।

এই সন্ন্যাসীপদ লোকটা ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বিশেষ জানা। খলিফা লোক —ভাল বিষয়-আশয়, তার উপরে বন্ধকি কারবার। সোনা-রূপো রেখে টাকা কর্জ দিত। টাকা শোধ করে বন্ধকি কারবার। সোনা-রূপো রেখে টাকা কর্জ দিত। টাকা শোধ করে বন্ধকি মাল ছাড়িয়ে নেবার নিয়ম একটা আছে বটে, কিন্তু সুদ লাফিয়ে লাফিয়ে আসলের ঘাড়ের উপর চড়ে। দেখতে দেখতে মালের দামের দুনো তেদুনো হয়ে যায়। মালিক আর নিতে আসবে কেন ? এমনি সোনা-রূপো অঢেল সন্ন্যাসীর ঘরে।

বয়স হয়েছিল, মন্দাকিনী সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার। ভারী সংসার, কিন্তু নিজের ছেলেপুলে নেই। এই এক দুঃখ ছিল সন্ন্যাসীপদর। অনেক কাল দেখে, অনেক টালবাহনা করে বড়বউ বর্তমান থাকতেই রাখালের বোনকে বিয়ে করে আনল। মন্দা-বউ মান রেখেছে বটে—বংশরক্ষার মতো ছেলে হয়েছে একটা এই পক্ষে। অমূল্য। সন্ন্যাসী আর মন্দাকিনীতে বয়সের বিস্তর ফারাক। হাঁপানির অসুখ বেড়ে সন্ন্যাসীর হঠাৎ যায়-যায় অবস্থা। বুড়োবয়সের পেয়ারের বউ বলে মন্দাকিনীকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। ভাইকে বিপদ জানিয়ে কেঁদে-কেটে সে চিঠি লিখল।

বোনের এত বড় বিপদে রাখাল কেমন করে স্থির থাকে? পত্রপাঠমাত্র ছুটল। মন্দাকিনী মাথা-ভাঙাভাঙি করে: কী হবে ও দাদা? ও-মানুষ চলে গেলে জগৎ অন্ধকার। কী করব আমি, এ পোড়া সংসারে কেমন করে থাকব? মরব আমিও—এক চিতেয় সহমরণে যাব।

রাখাল হেন পাটোয়ারি পাকা মানুষটারও চোখ বুঝি সজল হয়ে আসে। মন্দাকিনীকে ধরে তুলে চোখ মুছে দেয়: ভেঙে পড়িস নে বোন। অমূল্য রয়েছে—তার মুখ চেয়ে বুক বাঁধ। এসে যখন পড়েছি, এ অবস্থায় যদ্দুর যা সম্ভব ত্রুটি হবে না।

বড়বউ অর্থাৎ মন্দাকিনীর সতীন শাশুড়ি, জা-জাউলিরা—কুটুম্বর আবির্ভাবে বাড়ির মধ্যে যে যেখানে ছিল, ছুটে এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যে সামনের উপর কেউ নয়—যে কয়েকটা দুয়োর-জানলা, সবগুলোর আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। ফিসফিস করছে কখনো বা। একটা অতিমৃদু হাসি খেলে যায় রাখালের মুখে। বোনের মাথায় হাত রেখে অভয় দিচ্ছে: ভয় কিসের? এমন শাশুড়ি, এমন সব জায়েরা—পর্বতের আড়ালে রয়েছিস তুই। আর আছেন বড়বউ-ঠাকরুন—লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বোন তোরা, দেখে চক্ষু জুড়ায়। আমি পর-অপর বই তো নই—আমি এর মধ্যে থেকে কি করব? বিপদ শুনে এসেছি, একদিন দু-দিন থেকে চলে যাবো।

সন্ন্যাসীপদর ভাইরা সব এসে রাখালের পায়ে ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে। রাখাল বলে, চলো ভায়ারা, রোগির ঘরে দেখে আসি। মনে তোমাদের কি হচ্ছে, সে কি আর বুঝিনে! আমার ভাই ছিল না—বোনেদের একটি গেছে, আজও তার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে বুকের মধ্যে চড়চড় করে ওঠে। এক মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ—এ যে কত ব্যথা, যার গেছে সে-ই শুধু বুঝবে।

রোগির উপর ঝুঁকে পড়ে রাখল ডাক দেয়: দত্তজা, চিনতে পার? আমি রাখাল, তিলকপুরের রাখালপতি।

রোগি চোখ মেলে। চোখের মণি বিঘূর্ণিত হচ্ছে। দেখে ভয় করে।

রাখাল পুনরপি বলে: দত্তজা, ঠিকেদারের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে এসেছি। তোমার কাছে কবে তারা আসবে? তারিখ বলে দাও।

বাদাবন কাটার ঠিকেদার নিয়োগ হয় এই সময়টা সরকারি তরফ থেকে। সে কাজে টাকার দরকার, ভাল সুদে টাকা ধার করে তারা। টাকাও নিরাপদ। সন্ন্যাসীপদ ইতিপূর্বে রাখালকে ধরেছিল তেমনি কোন কোন ঠিকাদারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে। বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে, মুমূর্ষুকে রাখাল মিছামিছি বলল। সন্ন্যাসীপদ সংজ্ঞালাভের এমন মোক্ষম অষুধ আর হয় না। তবু কিন্তু সাড়া নেই। পিটপিট করে একবার চোখ বুজল।

অন্তরালে গিয়ে মন্দাকিনী বলে, কি রকম দেখে এলে দাদা? ফাঁকি দিয়ে ভুলিও না।

রাখাল বলে, বুক বাঁধ রে বোন, নাবালক অমূল্যর ভবিষ্যৎ ভেবে। বিচার-বুদ্ধি হারাসনে। দুনিয়ার উপর কেউ চিরকাল থাকতে আসে নি। দত্তজা বোধহয় চললেন। আমিও একদিন যাব, যাবে সকলেই।

সন্ন্যাসীপদর সোহাগিনী বউ—সংসারের চাবিকাঠি মন্দাকিনীর আঁচলে বাঁধা। সেই জন্য বাড়িসুদ্ধ সকলের রাগ! কিন্তু সে রাগ মনে মনে চাপা আছে—সন্ন্যাসীর নাসারন্ধ্রে যতক্ষণ শ্বাস বইছে, মন্দার কেউ কিছু করতে পারবে না। শ্বাস বন্ধ হলে তখন অবশ্য ভিন্ন কথা।

গলা অত্যন্ত নামিয়ে রাখাল বলে, কপাল সত্যিই যখন পুড়ছে, আমি বলি কি, এখন অবধি তোর মুঠোয় সংসার—ভালমন্দ সাধ মিটিয়ে খেয়ে নে যে ক'টা দিন হাতে পাস, দু-দুটো পুকুর মাছে ঠাসা—জেলে ডেকে জাল নামিয়ে দে, ভারী ভারী রুই-কাতলা তুলে ফেলুক, ছ্যাচঁড়া-মুড়িঘন্ট, কালিয়া-কোপ্তা জন্মের মত খেয়ে নে।

তাই চলল। কুটুম্ব বড়ভাই এসেছে—জেলেরা দুই পুকুরে জাল নিয়ে পড়ল। তার উপর রোজ রাত্রে একটা করে পাঁঠার ঘাড়ে কোপ পড়ছে। সন্ন্যাসীর সেজ ভাই স্ত্রীর কাছে রাগে রাগে টিপ্পনী কাটে: কায়দায় পেয়ে দেদার খেয়ে নিচ্ছে। মোটা পয়সা মারবে বলে এদ্দিন ধরে বড়দা মাছ পুষে রেখেছে, পুকুরে কাপড় চাকনাও দিতে দেয় না—সেরে যদিও ওঠে টের পাবে তখন। মাছ তোলার মজা বেরিয়ে যাবে। উঠবেই বড়দা-সেরে, ওকে নিয়ে যাবে যমরাজের এতখানি তাগত নেই।

সেরে উঠবার কিন্তু কোন লক্ষণ নেই। অনেকবার পিছলে বেরিয়ে এসেছে, এবারে যমরাজ দৃঢ়সংকল্প। ডাক্তার-কবিরাজ জবাব দিয়ে গেল। ভাইরা তবু

ভ্রূক্ষেপ করে না : অমন তো কতবার জবাব দিয়েছে। বিনিঅষুধেই তারপর খাড়া হয়ে উঠল। একবার তো চিতার খরচার জন্য আমগাছ কেটে চেলা করে ফেলা হল। সেরে উঠে সেই গাছ কাটা নিয়ে ধুন্দুমার। হাতে মারতে কেবল বাকি রেখেছিল আমাদের।

অতএব শাশুড়ি সতীন দেওর ও জা-জাউলিরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। রোগির ঘরে একা মন্দাকিনী। আট বছরের ছেলে অমূল্য মামা রাখালের সঙ্গে শুচ্ছে কয়েকটা দিন।

নিশিরাত্রে মন্দাকিনী এসে গায়ে ঝাঁকি দেয় : ওঠো, দেখে যাও দাদা কি রকম করছে। ভয় করছে বড্ড আমার।

রাখাল ঘরে গিয়ে এক নজর দেখেই বলে শ্বাস উঠেছে

মন্দাকিনী হাউহাউ করে কাঁদে, ও দাদা কী হবে আমার।

সন্ন্যাসীপদর খাটের খুরোয় মাথা কুটছে। ধরে ফেলে রাখাল খিঁচিয়ে ওঠে : আচ্ছা হাঁদা মেয়েমানুষ তো তুই। এমন করে লাভটা কি শুনি? যে মানুষ চলে যাচ্ছে তারই শুধু মন খারাপ করে দেওয়া।• মাথা কুটলে যম ছেড়ে যাবে না তোরই কপাল ফুটো হবে।

কানে কানে ফিসফিস করে উপদেশ ছাড়ল : সিঁদুর-পরা মাছ-খাওয়া ঘুচে গেল, তা হলেও বেঁচে থাকতে হবে। তার উপরে অমূল্য—মায়ে-পোয়ে অন্তত চাট্টি ডাল-ভাত খেয়েও যাতে বাঁচতে পারিস, সেই উপায় করে নে। গোড়ার দিনে আমায় বলেছিলি, পোড়া-সংসারে কেমন করে থাকব—বড় খাঁটি কথা। শাশুড়ি-সতীন-দেওরেরা যা এক-একখানা চিজ—দত্তজা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝেটিয়ে বিদায় করবে। এক্ষুনি একটা বন্দোবস্ত করে নিতে পারিস, তবে রক্ষে।

চতুর্দিকে আর একবার দেখে নিয়ে রাখাল ইঙ্গিতে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেয়। বলে, যদ্দুর যা পেরে উঠিস, গুছিয়ে নে। এক্ষুনি—এই একটা ফাঁক পেয়েছিস। মায়েপোয়ে চিরকাল তা হলে ডাঁটের উপর থাকবি—এখন যেমনধারা আছিস। কাঁদবার অনেক সময় পাবি বোন, গোছগাছ সারা করে ধীরে-সুস্থে এর পরে যত খুশি কাঁদিস।

স্বামীর বিছানার পাশে মন্দাকিনী বড় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। ভাইয়ের পাকা বুদ্ধির কথায় সম্বিত পেয়ে সন্ন্যাসীপদর কোমরের ঘুনসিতে হাত চালিয়ে চাবি খুলে নিল। এই খাটেরই শিয়রের খানিকটা অংশে সিন্দুক বানানো, বড় তালা ঝুলছে। সন্ন্যাসীপদ সিন্দুক চেপে বরাবর শুয়ে আসছে—তালা খুললেও ডালা তুলবার উপায় নেই। কিন্তু আজকে হাঙ্গামা নেই—ঘরের ভিতরের ছাতা-লাঠি-লণ্ঠনের মতোই অচেতন মানুষটি। ঠেলে দিল তাকে এক পাশে। সন্তর্পণে

ডালা তুলে হাতড়ে হাতড়ে পাওয়া যায়—নগদ টাকা এমন কিছু নয়, সোনা-রুপো বেশি। সন্ন্যাসীপদ সোনা-রুপো কিনে সঞ্চয় করত, কাগজের নোট বিশ্বাস করত না।

রাখাল বলল, তোর এখন মাথার ঠিক নেই মন্দা। আমার কাছে দে ওগুলো, সেরে সামলে রেখে আসি।

কিন্তু দেখা গেল, শোকাচ্ছন্ন হলেও মন্দাকিনী কিছুমাত্র হুঁশ হারায় নি। বলে, কুটুম্ববাড়ি তো খালি-হাতে এসেছ, তুমি কোথায় রাখবে দাদা? যতক্ষণ মানুষটার ধড়ে প্রাণ আছে, ওর জিনিস আমি ঘরছাড়া হতে দেবো না। জিনিস এই ঘরের মধ্যেই থাকবে। এত বাক্সপেঁটরা আমার—তারই কোন একখানে কাপড়চোপড়ের মধ্যে গুঁজে রেখে দেবো।

এর উপরে কি বলবে আর রাখাল! একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, সেই মুখে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি ভাল দেখায় না। মাল সরিয়ে মন্দাকিনী নিজের একটা পোর্টম্যান্টোর ভিতর রাখল। রেখে যথারীতি খাটের সিন্দুকের তালা এঁটে সন্ন্যাসীপদকে পূর্বস্থানে সরিয়ে কোমরের ঘুনসিতে চাবি যেমন ছিল পরিয়ে দিল আবার।

সন্ন্যাসীপদ মারা গেল সে রাত্রে নয়, পরের দিনও নয়, তার পরের দিন। সর্বক্ষণ অবিরত শ্বাস টেনেছে। যমরাজ চোখের সামনে দেখা দেন না, মানুষের প্রাণবায়ুও অদৃশ্য। তবু সুনিশ্চিত এই কদিন উভয়পক্ষে টানাটানি চলেছে। এবং যমই জিতলেন এবারে। মরা স্বামীর পায়ের উপর মন্দাকিনী আছাড় খেয়ে পড়ে। পাড়ার মেয়েছেলেরা ধরে তুলে এক-একবার বসিয়ে দেয়, ধড়াস করে পড়ে গিয়ে আবার মাথা কোটে। সখেদে সকলে মুখ-তাকাতাকি করে: সতীসাধ্বী স্বামী-শোক সামলে উঠতে পারবে না। মরব মরব ইদানীং তো বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে—ওকেও আবার ক'দিনের মধ্যে চিতায় তুলতে হয় কিনা দেখ তাই।

এবারে আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃতের কোমর থেকে চাবি খুলে সর্বসমক্ষে খাটের সিন্দুক ও বড় ছাপবাক্স খুলে ফেলা—সন্ন্যাসীপদ যার মধ্যে যাবতীয় গয়না-টাকা ও হিসাবপত্র রাখত। মন্দাকিনীর প্রায় অচেতন অবস্থা, ক্ষণে ক্ষণে আর্তনাদ করে উঠছে—তাকে এদিকে আনা গেল না। কান্নার মধ্যেই একবার বলে, আসল মানুষটা ফাঁকি দিয়ে গেছে—উচ্ছিষ্ট ছাইভস্ম কি পড়ে আছে, আমি তা দেখতে যাব না। চোখ মেলে দেখতে পারব না। দেখুকগে গরজ যাদের।

পাড়ার গিন্নি-বউ মন্দাকিনীর দশা দেখে চোখ মোছে। সিন্দুক খুলে ওদিকে শাশুড়ি-সতীন-দেওরেরা গালে হাত দিয়ে বসেছে। ঝিমিয়ে ছিল

মন্দাকিনী—হঠাৎ কিছু চাঙ্গা হয়ে মাথা-ভাঙাভাঙি লাগিয়েছে আবার, পাড়ার সকলে থামাতে পারছে না। এই অবস্থার মধ্যে তাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না।

শোকের অবস্থা চলল একনাগাড়ে মাসাবধি। বোনের অবস্থা দেখে রাখালও চলে যেতে পারেনি। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর সন্ন্যাসীর মাকে বলল, মন্দা বড্ড কাহিল হয়ে পড়েছে—দেখতে পাচ্ছেন মা। অনুমতি দেন তো সঙ্গে করে আমি তিলকপুর নিয়ে যাই। দিনকতক রেখে খানিকটা তাউত করে আবার রেখে যাব।

শাশুড়ি তিক্তকণ্ঠে বলে, রেখে যাবে আবার কেন? এত পয়সাকড়ি—সন্ন্যাসী দেখছি সবই ফুঁকে দিয়ে গেছে। খাবে কি এখানে পড়ে থেকে? বোন-ভাগনে সঙ্গে করে নিয়ে যাও তুমি। চিরকাল ধরে তাউত করগে, কোনদিন এমুখো যেন না হয়।

রসিয়ে রসিয়ে তুষ্টু সবিস্তারে বলে যাচ্ছে। একজন মানুষ মারা গেল, কত বড় দুঃখের ব্যাপার—কিন্তু বলার ভঙ্গীতে শ্রোতারা হেসে লুটোপুটি খায়। সাহেব বলে ওঠে, খাসা গল্প বানাতে পারো তুমি তুষ্টু। বলছ এমনভাবে, যেন নিজে হাজির থেকে চোখের উপর সব দেখেছ। কথাবার্তার খুঁটিনাটি কানে শুনে মুখস্থ করে এসেছ।

বংশী বলে, চোখে দেখা বইকি! সন্ন্যাসীপদর শ্রাদ্ধ অবধি সে বাড়ির মাহিন্দার ছিল। শ্রাদ্ধের সময়ের দাগ ঐ চোখের উপর রয়েছে।

তুষ্টুরাম বলে, কানেও প্রায় সমস্ত শোনা। মাহিন্দারি কাজটা তো খতম হয়ে গেল। নতুন মরশুমের বিস্তর বাকি, ঘরে বসে বসে কি করব? দিনরাত তক্কেতক্কে থাকতাম, ছুটো কাজ একটানা গুছিয়ে তোলা যায় যদি। ষোলআনা গুছিয়ে এসে তবেই না খোসামুদি করে বেড়াচ্ছি!

শেষ পর্যন্ত জগবন্ধু নিমরাজি হলেন: কী করা যায়! তেজি ঘোড়া বেঁধে রাখলে অবিরত পা ঠোকে। সাহেবের ঠিক সেই ব্যাপার। নানারকম চমকদার কাজের গল্প শুনে শুনে তার ধৈর্য থাকে না, একখানা করে সে দেখাবেই। তার উপরে উপসর্গ—গুরুপদকে লোভ দেখিয়ে এনে হাজির করেছে। নানান ছুতোয় আমার সঙ্গে সে ঝগড়া বাধায়, ঝগড়া করে শক্ত শক্ত কথা বলে গায়ের ঝাল মেটায়। যাও তোমরা, দেখাই যাক কি করে এসো। এইটুকু বলতে পারি, তুষ্টুরামের খবরে ভুল নেই।—

তুষ্টুরাম আনন্দে থই পায় না। বলাধিকারী তবে নির্বিকারী ছিলেন না। অন্য সূত্রেও খবরবাদ নিয়েছেন। খোঁজদারির প্রশংসা অমন মানুষটার মুখে!

বলাধিকারী বলেন, কোরবান শেখ রাখাল রায়ের বাড়ির নগদি। তার কাছে আলাদাভাবে শুনে নিলাম। খুঁটিনাটি তেমন না হলেও মোটের উপর একই বস্তু পাওয়া গেল। রাখালের বাড়ি মন্দাকিনীর গুরুঠাকুরের অধিক আদরযত্ন। সে রত্ন খালি-হাতের মানুষকে কেউ দেয় না—বোন না হয়ে গর্ভধারিণী মা হলেও না। কোরবানকেও একটু বখরা দিতে হবে কিন্তু। সামান্য—ধরো, আধ পয়সার মতো।

দু-তরফের পাকা খবরের 'পর ইতস্তত কিসের? কাজে ঝাঁ দেবার জন্য সকলে পাগল। সাত-আট ক্রোশ পথ হয়তো দুপুর নাগাদ বেরিয়ে সন্ধ্যা হতে হতেই গাঁয়ে গিয়ে উঠবে। তিথিটা চমৎকার, কৃষ্ণপক্ষের শেষ—সঙ্গে সঙ্গেই কাজের আরম্ভ, চুপচাপ সময়ক্ষেপ করতে হবে না। বহু রকমের সে কাজ—সকলের আগে বাড়ি-ঘরদোর বাড়ির মানুষজন জীবজন্তু পাকচক্কোর দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরখ করে নেওয়া। এই সবেই সময় যায়—গৌরচন্দ্রিকায় খুঁত না থাকলে আসল কাজে এক দণ্ডের বেশি লাগে না।

কাজে কবে বেরুচ্ছি, বলে দিন এবারে বলাধিকারী মশায়।

বলাধিকারী সহাস্যে বলেন, খবর তো আনলি তুষ্টু, গাঁয়ের মধ্যে দু-দুটো বন্দুক সে খবর কিন্তু জানিস নে।

বংশী চমৎকৃত হয়ে গুরুপদর গায়ে ঠেলা দেয়: বোঝ

দৃষ্টি কত দিকে বলাধিকারীর! এই সব গুণেই মানুষটা এত বড়, সকলে এমন মান্য করে।

বলাধিকারী বংশীর ভাব লক্ষ্য করেছেন। বলেন, কিছু না, কিছু না। এ হল যেমন দাবাখেলার উপর-চাল। খেলুড়ের নজর গেছে গেছে, কিন্তু পাশে যে লোক দেখছে হঠাৎ সে একখানা মোক্ষম চাল বলে দিল। কাঁচা মানুষ তোমরা প্রায় সবাই। সাহেব আনকোরা নতুন। তুষ্টুরাম যা করে, সেটা বলা যায় বমাল-বওয়া মুটের কাজ। গুরুপদ বয়সে বেড়েছে, কিন্তু হাতও পেকেছে এমন কথা কেউ বলবে না। বংশীকে তার আজামশায় কেবল তো কুকুর-ডাক, শেয়াল ডাকই শেখান। গাঁয়ে বন্দুক থাকতে সেখানে তোমাদের না ওঠাই ভাল।

চৌকিদারের কাছে একটা বন্দুক, আর চকদার অবিনাশ সামন্ত সম্প্রতি লাইসেন্স করে বন্দুক কিনে এনেছেন। অবিনাশের জন্য কিছু নয়, জগবন্ধুর সঙ্গে দহরম-মহরম আছে ভদ্রলোকের। ভাবনা চৌকিদারের সরকারি বন্দুকটা নিয়ে।

বলেন, দারোগার হলে কিছুই ভাবতাম না। অধমের গরিবখানায় তাঁদের সদাসর্বদা চরণ পড়ে। ক্ষমতা ধরেন তাঁরা, বন্দোবস্তেও তাই সহজে আনা যায়। একটা বখরার ওয়াস্তা—কোরবান শেখের মতো। বন্দুক তখন বুকের সামনে

উচিয়ে ধরেও দেওড় করবে না। চৌকিদারের সামান্য চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা নেই —বুকে তাই বল পায় না, থর্ম-থর্ম করে মরে।

ভেবেচিন্তে অবশেষে চৌকিদারের বন্দুকের ব্যবস্থাও হল। ঐ অবিনাশকে দিয়ে। অবিনাশের এক খুড়ো হলেন ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—যত চৌকিদারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অবিনাশের তখনও বন্দুকের লাইসেন্স হয় নি—মনে পড়ল, চৌকিদারের বন্দুক নিয়ে খুড়ো-ভাইপোকে একদিন জামলার বিলে পাখি মারতে দেখেছিলেন। এখনই বা কেন তাই হবে না?

চিঠি লিখে জগবন্ধু বংশীর হাতে দিলেন: তিলকপুর তুমি একটিবার ঘুরে এসো। জামলার বিলে খুব কাঁকপাখি পড়ছে। সামন্তদের খুড়ো-ভাইপোকে নেমন্তন্ন করে পাঠাচ্ছি। সমস্ত দিন শিকার হবে রাত্রে ফিস্টি আমার এখানে মক্কেলের বাড়িখানা তুমিও একটাবার দেখে এসো।

কায়দায় পেয়ে বংশী গুরুপদকে বলে নেয়, নিন্দে করছিলে যে বড়! কারিগর মেরে টাকা করে—সে মহাজন আর যেই হোক বলাধিকারী মশায় নয়। বলি, এত বড় একটা ফিস্টি তো মাংনা হচ্ছে না—ক্ষেতের ফসল কোথায় কি, মবলগ খরচা করে বসে রইলেন। হুঁশ করে নিজে থেকেই করছেন এত সব। কাজের কী দরাজ ব্যবস্থা বুঝে নাও, কাজের মুখে তখন আর টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন না।

গুরুপদও প্রসন্ন মুখে বলে, বন্দুক হাতানোর বুদ্ধিটা বেড়ে হয়েছে। একবার কী গেরো! সোনাদানায় মিছরি সর্দারের বাড়ি কাজে গিয়ে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পড়ে গেলাম! মনে পড়লে গা কাঁপে এখনো। শিকার-টিকার বুঝিনে বাবা—ফুলহাটায় বন্দুক এসে পৌঁছল, সেইটে চোখে দেখে তবে পা বাড়াব।

অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা ধরেন বলাধিকারী। সেটা অবশ্য এই নতুন দেখা যাচ্ছে না। মাঝে একটা দিন বাদ দিয়ে অবিনাশ সামন্ত পাখি-শিকারে এসে পড়ল। পিছু পিছু চৌকিদার। বিলের এত জলকাদা ভাঙা একটামাত্র বন্দুকের লভ্যে পোষায় না। প্রবীণ প্রেসিডেন্ট মশায় কষ্টের ভয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন, তাঁর অনুমতি আদায় করে অবিনাশ চৌকিদারকে সঙ্গে এনেছে।

দুপুর না হতেই ওঁরা নেমে পড়লেন জামলার বিলে, কালী-কপালিনীর নাম স্মরণ করে এরা চলল তিলকপুরের দিকে। যাবার আগে বলাধিকারীর সঙ্গে এক জায়গায় হয়েছে, কাজের ছকটাও মোটামুটি তিনি বেঁধে দিচ্ছেন।

নফরকেষ্ট রোখ ধরে: আমি যাব কিন্তু। আমায় বাদ দিলে হবে না।

বলাধিকারী দরাজ অনুমতি দিলেন: যাবেই তো। না বলছে কে? এ

তল্লাটে একেবারে নতুন তুমি। কেউ চেনে না। তোমায় না, সাহেবকেও না। কাজের পক্ষে সেটা বড় ভাল। ঠিক এই লাইনের না-ও যদি হও, আনাড়ি লোক নও তুমি। রেল-গাড়িতে তোমার পালানোর কায়দা দেখে বুঝেছি। তবে আর কি—পাঁচজন হলে, পঞ্চপাণ্ডব মিলেমিশে দল গেঁথে নাও এবারে।

নিতান্তই ছুটো কাজ। এবং দল নয়—দল অনেক বড় জিনিস, বিস্তর বিচার-ব্যবস্থা ও আয়োজন তার জন্য। পাঁচটি প্রাণীর সঙ্কীর্ণ সামান্য দল একটু। কিন্তু সামান্য হলেও কাজের বিভাগ বড় দলেরই মতন। দলের মাতব্বর চাই একজন। গুরুপদ পুরানো লোক—ক্যাপ্তেন বল সর্দার বল তাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হল, তার কথার উপর সকলে চলবে। শিয়াল-ডাক কুকুর-ডাক বিড়াল ডাক নানান ডাকের ওস্তাদ বংশী পাহারাদার হলে উচিত হবে। তুষ্টু তো খোঁজদার আছেই। নফরকেষ্ট যখন যাচ্ছে, সে হল ডেপুটি। বাকি রইল সাহেব —নতুন হলেও হেলাফেলার লোক নয় সে। জমাদার বলে পদ আছে, কাজের সঠিক সংজ্ঞা নেই। কোন কাপ্তেন বলে, সে পদ সর্দারেরও উপরে। আবার কেউ বলে নিচে।

ভেবেচিন্তে বলাধিকারী রায় দিলেন: এ কাজের জমাদার হলে তুমি সাহেব।

এই ভরা মরসুমে সরঞ্জাম সমস্ত বাইরে, কাঠি দুখানার বেশি জোটানো গেল না। একটা ফলা ত্রিকোণ—মাটির দেয়াল কাটা যায়। আর একটার মাথা চতুর্ভুজের মতো, পাকা দেয়াল খুঁড়তে লাগে। কাপড়ের নিচে উরুর সঙ্গে সর্দার গুরুপদ দু-রকমের কাঠি বেঁধে নিল। কাঠি নেবার কায়দা এই। লোকের নজরে পড়ে না। হালকা জিনিস বলে হাঁটা এবং প্রয়োজন হলে দৌড়ানোর কিছুমাত্র অসুবিধা নেই।

আর খুঁজেপেতে নফরকেষ্ট আবিষ্কার করল খাপসুদ্ধ ছোরা একখানা। ভোঁতা মরচে-ধরা জিনিস। নফরা বলে, তাই সই। আসল সাপ না-ই হল, বেতের সাপ দেখিয়ে কাজ হবে। খুনে লোকের চেহারাখানা আছে, যা হাতে ধরব তাই অস্তোর।

এখন একসঙ্গে বেরুচ্ছে—রাস্তায় পড়েই আগুপিছু হবে, এপথ-সেপথ ধরবে। কাজের তাই নিয়ম। কারো নজরে না আসে, সন্দেহের ভাঁজটুকু না পড়ে দলের উপর।

সত্যিই বেরুল তবে। এখন যা করেন কালী করালী। জীবনের প্রথম কাজের মুখে সাহেব একমনে কালী-নাম করছে। চোর-চক্রবর্তীর পুঁথিতে যে কালী-বন্দনা:

নিশিকালী মহাকালী উন্মত্তকালী নাম—
চরণে পড়িলাম মাতা, আইস এই ধাম

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য রান্নাঘরে ফিস্টির আয়োজনে ব্যস্ত। শৌখিন রান্না কাজলীবালাকে দিয়ে হবে না। কোটনা-কোটা বাটনা-বাটা ইত্যাদি আগের কাজগুলো করিয়ে রাখছে এখন। মালমশলা এসে পড়লে পৈতে কোমরে গুঁজে নিজ হাতে খুন্তি নিয়ে পড়বে। নিশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই। অথচ কী আশ্চর্য ব্যাপার—টনক নড়ে গেছে ঘরের ভিতর থেকেই। ছুটতে ছুটতে ঠিক সময়টিতে তেমাথার পথ আটকে দাঁড়ায়।

শুনে যাও ও সর্দার, আমারও একটা বখরা রইল কিন্তু।

সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার দাবি জানিয়ে যাচ্ছি জমাদার। বলাধিকারী মশায়কে বাতলে দিও। কারিগরের সুপারিশ না হলে মহাজনের বখরা বসানোর এক্তিয়ার নেই।

সর্দার গুরুপদ খিঁচিয়ে ওঠে: কোন কাজটা করলে তুমি, কিসের বখরা? বেহদ্দ খোশামুদি করেছি, তখন রা কাড়লে না। লজ্জা করে না বলতে?

সমান তেজে ক্ষুদিরামও কলহ করে: বৈঠকখানার ফরাস ছেড়ে রান্নাঘরে উনুনের মুখে বসেছি—কিসের জন্য শুনি?—আমার পিতৃকুল উদ্ধার হবে বলে? এটাও দলের কাজ।

এই এক ব্যাপার। মাংনা কেউ কুটোগাছটি নাড়বে না—কম হোক বেশি হোক বখরা আছে সকলের। কাজ অনুযায়ী রকমারি হিসাব! মাথা খারাপ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু অলিখিত আইন অনুযায়ী নির্গোলে ন্যায্য বখরা মিটিয়ে দিতে বলাধিকারীই শুধু পারেন। করে আসছেন বরাবর।

জামলার বিলের দুর্গম কাদায় বলাধিকারী সারাক্ষণ শিকারী দুজনের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। হল খারাপ নয়। কাঁকপাখিই গণ্ডা দুয়েক—ছোটখাট জিনিবও কিছু পড়েছে। বেলা পড়ে আসতে বিল থেকে উঠে বাসায় ফিরলেন। চৌকিদার কিছু জরুরি কাজ সেরে ভিন্ন পথে অনেক পরে এসে পৌছল। থানা অবধি চলে গিয়েছিল সে – কয়েকটা ভাল পাখি থানার বড়বাবু ছোটবাবুকে ভেট দিয়ে এসেছে। ফিরবার সময় অমনি দুটো বোতল গঞ্জ থেকে কিনে গামছায় জড়িয়ে নিয়ে এল। থাকা বলাধিকারীর—রাত্রে পক্ষি-মাংসের ফিস্টি—ফিস্টির কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে।

স্ফূর্তির আসর সন্ধ্যে থেকে। বাইরের আরও দু-চারটি জোটানো হয়েছে। হারমোনিয়াম ও ডুগিতবলা এসেছে, গাওনা-বাজনা হবে। বাড়তি লোকের

দরকার অতএব চৌকিদার গঞ্জের আবগারি দোকানে বসেই কিছু করে এসেছে কিনা কে জানে। শৈশবে কিছুদিন যাত্রার দলে ঘুরেছে, সখীর গান হঠাৎ স্মরণে এসে গেল। শুঁক-শুঁক করে বারকয়েক নাক সিঁটকে বলে, জুত হচ্ছে না। বলি, ঘুঙুর-টুঙুর আছে? নেই তো বয়ে গেল,—কুচ পরোয়া নেই।

ঠোঁটের উপর দুটো আঙুল চেপে ঘুঙুরের মতো খানিকটা আওয়াজ বের করে, আর নাচে।

মাঠ পার হয়ে তিলকপুর গাঁয়ে পা দিয়েই বড় বড় তিন তেঁতুলগাছ। যে পথেই যাও, ঐ জায়গার নিরিখ থাকল। তেঁতুলতলায় সবাই হাজির হবে।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশের মানুষটাও চিনে নেওয়া মুশকিল। তুষ্টুর অপেক্ষায় উদ্গ্রীব হয়ে আছে। খোঁজদার মানুষ—মক্কেলের বাড়ি অন্তত একটা পাক দিয়ে তবে আসবে এখানে, মক্কেলের শেষ খবর এনে দেবে। কাজের ঠিক আগে, একটু সাজ-গোজের ব্যাপারও আছে—সে খানিকটা যাত্রা-থিয়েটারের মতন। ছুটো কাজ বলে কাড়াকাড়ি নেই তেমন—রীতরক্ষা কোন প্রকারে। সমস্ত সমাধা করে তৈরী হয়ে আছে। ঘোড়দৌড়ের আগে ঘোড়ার যেমন চনমনে ভাব সেই অবস্থা।

এসেছে তুষ্টুরাম। ঝাঁকবাঁধা প্রশ্ন—তূণ থেকে যেন তীরের পর তীর ছুঁড়ে যাচ্ছে। সর্দারের দায়িত্ব প্রশ্ন করা এবং উত্তর আদায় করে নেওয়া।

বাড়ির লোক গণে এসেছ আবার? ক জন মোটমাট? মেয়ে কত, বেটাছেলে কত, বাচ্চা কত? অতিথি-কুটুম্ব এলো কেউ বাড়িতে? বাড়ির লোক বাইরে পড়ে নেই? গুরুতর রকমের রোগপীড়ে হয়নি কারও?

না, কিছুই নয় সেসব। যেমনটি দেখে এসেছিল, আজকেও অবিকল তাই। খাওয়া-দাওয়া সেরে কতক শুয়ে পড়েছে। বাড়ির কর্তা রাখাল হুঁকো টানতে টানতে গোয়ালের গরুবাছুর তদারক করছে, দুলেবাছুর আটকানো হয়নি বলে ধমকাচ্ছে বড়ছেলে নিশির উপর। এই অবস্থায় দেখে এসেছে তুষ্টুরাম। আরও তো কতক্ষণ গেল—শুয়ে পড়েছে। টিপিটিপি এগুলো উচিত এইবারে।

তেঁতুলতলা থেকে বেরিয়ে পড়ে পাঁচটা প্রাণী।

নীতিনিয়ম কয়েকটা শুনে রাখবেন নাকি সুবুদ্ধি পাঠক? ভবসংসার বড্ড কঠিন ঠাঁই—কখন কোন্ পথ ধরতে হয়, কেউ বলতে পারে না। শুনুন। রোগী থাকলে সে বাড়ি কদাপি ঢুকবেন না। গুরুর নিষেধ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকর্মে যেমন চৌরকর্মেও ঠিক তেমনি গুরু ধরতে হয়। গুরু বলুন, অথবা ওস্তাদ।

গুরুর কৃপা ভিন্ন বড় কিছু হওয়া যায় না। বহুদর্শী গুরু পইপই করে মানা করেন রোগির বাড়ি ঢুকতে। ডাক্তার-কবিরাজের আনাগোনা—হয়তো বা বাড়ির লোকে বুক ছেড়ে কেঁদে উঠল, হায়-হায় করে পাড়াপড়শি ছুটে আসবে, চোর আপনি বেড়াজালে আটক পড়ে যাবেন তখন। ভ্রষ্টা মেয়ে যে বাড়ি সেখানেও যাবেন না। প্রেমিকরা নিশিরাত্রে আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে বেড়ায়। সাতচোরের এক চোর—সিঁধেল-চোর কোন ছার তাদের কাছে! লম্পট ছেলে-ছোকরা থাকলে সেখানেও না—রাতের মধ্যে সেই ছোঁড়া এক সময় না এক সময় সুট করে বেরিয়ে পড়বে। প্রেমের দাপটে সাপ-বাঘের ভয় ঘুচে যায়—বিল্বমঙ্গলের পবিত্র কথা যাঁদের জানা আছে, সহজে তাঁরা বুঝবেন। এমন মক্কেলের ঘরে ঢুকে কারিগরের পক্ষে স্থির মনে কাজকর্ম অসম্ভব। বিস্তর ধৈর্য ও বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন এক-একখানা কাজ নামাতে। এতই যদি সোজা হত, লোকে চাকরিবাকরি অথবা ব্যাপারবাণিজ্যের ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে সিঁধকাঠি নিয়ে সরাসরি লক্ষ্মীঠাকরুনকে হরণের পথ ধরত।

নেই তো তুষ্টুরাম এমনিধারা হাঙ্গামা? খুঁটিয়ে দেখে এসেছে—দেখেশুনে বুঝে-সমঝে বলছ?

চার

তুষ্টুরাম আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ গ্রামপথ। রাখাল রায়ের বাড়ির সামনে এসে গেল। পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। খবর ঠিকই দিয়েছে—পাঁচিলের গায়ে ভারা-বাঁধা। আজকেও বোধ হয় কাজ করে গেছে, ভারার এদিকে-ওদিকে ইটের টুকরো ছড়ানো।

পাঁচিলের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজা খুলে ভিতর-উঠানে ঢুকতে হবে। বিধি হল, টিপিটিপি একজন পাঁচিল বেয়ে উঠে ওপাশে নেমে পড়ে খিল খুলে দেবে। ভারা-বাঁধা অবস্থায় পাঁচিলে ওঠার কাজটাও সহজ হয়েছে।

প্রাচীন চোরশাস্ত্রে এক রকম পাতার কথা রয়েছে, পাতা ছুঁয়ে চোরে দরজা খুলত। আর এক রকম মায়ামন্ত্র—কৃষ্ণাক্ষর নামে শাস্ত্রে বিদিত—পাঠমাত্রেই দরজা আপনি হাঁ হয়ে যাবে, আঙুল ঠেকাবারও প্রয়োজন হবে না। বলাধিকারী মশায় পড়ে শোনান এই সব। হায় রে হায়, পোড়া যুগের মূর্খস্য মূর্খ আমরা সমস্ত-কিছু হারিয়ে বসে আছি।

নফরকেষ্ট গোড়াতেই গোলমাল ঘটিয়ে বসল। নতুন মানুষ এইজন্য নেয়

না। দরজায় সত্যি সত্যি খিল দেওয়া, অথবা শুধুমাত্র ভেজানো রয়েছে, পরখ করে দেখতে গিয়েছিল। মহিষের মতো মানুষটা, হাতির মতো গায়ের বল। ভেবেছিল অতি ধীরে একটুখানি নেড়ে দেখবে—নাড়াটা বে-আন্দাজি রকম জোরদার হয়ে গেল। এই মানুষটাই ভিন্ন ক্ষেত্রে হাতের সূক্ষ্ম কাজ দেখিয়ে অবাক করে দেয়, বিশ্বাস করা শক্ত।

জরাজীর্ণ দরজা। তুষ্টুর খবরে ত্রুটি ছিল না—সমস্ত পাঁচিল, এবং কোঠাবাড়িটুকুও নড়বড়ে। বোন-ভাগনে এসেছে—তারা যাতে আরামে থাকতে পারে, এবং তার চেয়েও বড় কথা—যে বস্তু সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তাই যাতে নির্বিঘ্নে থাকে, তাড়াতাড়ি সেজন্য মেরামতির রাজমিস্ত্রি লাগিয়েছে। দরজার কিছুই বড় নেই—ধাক্কাটা এমন-কিছু জোরের না হলেও খিল ভেঙে দুই পাল্লা দুই দিকে দড়াম করে খুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে, কোথায় ছিল রাখাল রায়—লম্ফ দিয়ে উঠানে এসে পড়ল।

বাড়িতে টাকা এসে পড়ে মানুষটার চোখের ঘুম হরে গেছে। আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে, কে? কারা তোমরা? ছেলেকে ডাকছে: ওঠ রে নিশি শিগগির বেরো। কারা সব ঢুকে পড়ল—

নির্গোলে অহিংস মতে কাজ সেরে বেরুবে, গণ্ডগোল হয়ে গেল। অবস্থা রীতিমত ঘোরালো। চুরিতে এসে ডাকাতি। কাজ হোক তবে সেই নিয়মেই। সর্দার গুরুপদ ছুটে এসে পায়ের সিঁধকাঠি খুলে এলোপাথাড়ি মারছে—বাড়ির মুরুব্বি ঠেঙিয়ে মালের খোঁজ আদায় করা। তা মার খেতে পারে বটে রাখাল। দেহখানা পাকানো দড়ির মতো—রক্তমাংস রসকষের বালাই নেই। যে বস্তু আছে, ঘা মেরে দেখা গেল, হাড়ও নয়—লোহার মতো কোন কঠিন বস্তু। লোহার সিঁধকাঠি তার ওপর পড়ে ঠং করে যেন বেজে ওঠে। আবার তৈলাক্ত পাঁকাল মাছের মতো। পাঁচ-দশ ঘা খেতে খেতে সড়াৎ করে হাত পিছলে দৌড়।

পিছনে পিছনে তুষ্টু ছুটেছে। বাড়ির মানুষ বাইরে যেতে দেওয়া মারাত্মক ব্যাপার। মানুষ তো মানুষ—কাজ চলছে সেই সময়টা বাড়ির গরু-ছাগল কুকুর বিড়াল অবধি বাইরে যাবে না। তুষ্টুর সঙ্গে ছুটে কেউ পারে না। কিন্তু গ্রহ আজ নিতান্তই খারাপ। গোয়ালের পাশে গোবরের গাদা—পা হড়কে তুষ্টু পড়ে গেল। গোবরে মাখামাখি। ওরে বাবা রে, মেরে ফেলল রে—চীৎকার করে রাখাল দৌড়চ্ছে। ক্ষমতা এ ব্যাপারেও আছে। পলকের মধ্যে বিলীন।

সে চীৎকারে পুত্র নিশির পাত্তা নেই—মন্দাকিনী দালানের দোর খুলে বেরুল। তুষ্টুরায়ের মনিবঠাকরুন। অস্ত্রাগারে তুষ্টুরাম—আজকে আর পরোয়া

নেই, পাহাড়প্রমাণ অস্ত্র। ইট মেরেছিল ঠাকরুন—এসো না এগিয়ে, তাল তাল গোবর ছুঁড়ব, রাতদুপুরে চান করে মরবে।

কিন্তু তার আগেই রণক্ষেত্রে নফরকেষ্ট রুখে দাঁড়াল। চুরিতে নেমে ডাকাতির কাজ রীতিমত। নফরার ভুলের জন্য এত ব্যাপার—কাজটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে যাবার জন্য মন্দাকিনীর সামনে একটানে খাপের ছোরা বের করে ধরল: গয়নাগাঁটি যা আছে দিয়ে দাও। নয়তো এ-কোঁড় ও-কোঁড় হয়ে যাবে।

ঈশ্বর জানেন, একটা লাউ কি বেগুন অবধি এ ছোরায় এ-কোঁড় ও-কোঁড় হয় না। নিতান্তই বেতের সাপ। এই ক'দিন নতুন হাঁড়িতে ঘসে ঘসে চকচকে করেছে। তাতেই কাজ দিল। দৈত্যসম মানুষটার কাছে ছোরার ধার পরীক্ষার জন্য কে এগোবে?

নফরকেষ্ট হুঙ্কার দিল: গয়না খোল বলছি।

মন্দাকিনী কেঁদে পড়ল: মেরো না, ধর্মবাপ তোমরা। বিধবা-বেওয়া মানুষ —আমার গয়নাগাঁটি সাধআহ্লাদ সেই এক মানুষের সঙ্গে ঘুচে গেছে।

গুরুপদ আজ ফেলনা মানুষ নয়—দলের সর্দার। কাজ দেখাতে কোন দিক থেকে অতএব ছুটে এসে পড়ল। বলে, বেওয়া-বিধবার গলায় কি ওটা চিকচিক করে? ফেলে দাও, দিয়ে দাও। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবে না—ছুঁড়ে দাও বলছি।

ছেলের মায়ের শুধু-গলায় থাকতে নেই যে বাবা—

পুত্রের অমঙ্গল শঙ্কাতেই বোধকরি আঁচলের বেড় দিয়ে গলার মবচেন ঢেকে দিচ্ছিল, তুষ্টু চিলের মতন পড়ে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিল। নিয়ে কাজের যেমনধারা দস্তুর—ডেপুটি নফরকেষ্টর দিকে ছুঁড়ে দেয়। মন্দাকিনী হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। যে ছেলের কল্যাণে গলার হার, খোলা দরজায় সে-ও বেরিয়ে এসেছে। হার না হয়ে ঐ অমূল্যর মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিলেও মন্দা বোধ করি এমন নিদারুণ কান্না কাঁদত না।

খরদৃষ্টি নফরকেষ্ট বলে, থান-কাপড়ের নিচে থেকে হাত দুটো বের করো দিকি বিধবাঠাকরুন।

হাতে কি বাবা?

ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য হামেশাই যেমন বলে, সেই ধরনের কথা নফরার মুখে এসে গেল: হাত চিতিয়ে ধরো, ভাগ্যফল বলে দিই।

জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ—চেনহার গেছে, রুলিজোড়াও না যায়, সারাক্ষণ তাই হাত ঢেকে আছে। শনির দৃষ্টি এড়ায় না, উদ্যত ছোরার মুখে হাত বের করে ধরতে হয়। কতই যেন টানাটানি করছে রুলি খোলবার

অন্ধ। কাতর চোখে চেয়ে বলে, খোলে না যে বাবা। কি করি—কি করব আমি এখন?

নির্বিকার নফরকেষ্ট সহজ উপায় বাতলে দিল: হাত টান-টান করে ধরো, পোঁছা পেড়ে কেটে দিই। টুকরো হাত ফেলে দিয়ে মাল নিয়ে নেবো।

তুষ্টুরাম যেন মুকিয়েই আছে। প্রস্তাব পড়তে না পড়তে মন্দার দুটো হাত সামনে টেনে ধরল—অর্থাৎ লাগাও পোঁচ এবারে। বলির মুখে পাঁঠা যেমন পাছাড় ধরে কামারের মেলতুকের সামনে। আর নফরকেষ্টও পলকে চেহারা বদলে ভিন্ন এক মানুষ। রাঙা রাঙা চোখ দুটো আয়তনে ডবল হয়ে গেছে। বিঘূর্ণিত হচ্ছে। চাপা গর্জনে বলে, গলা দিয়ে টু-শব্দ বেরিয়েছে কি পোঁচটা হাতে না হয়ে গলায় উঠে যাবে।

অমূল্য পাথর হয়ে দেখছিল, তার দিকে কারো লক্ষ্য হয় নি। বালকের কচি গলায় হঠাৎ আকাশ-ফাটা কান্না: ও মা, মাগো—

পাখির পাখনার মতো ছোট ছোট হাত দুটো মেলে উড়েই যেন এসে পড়ল নফরকেষ্ট আর মান্দার মাঝখানে। আকুল হয়ে বলছে, ও মা, পালাও। শিগগির পালিয়ে যাও, কাটবে।

কাজের ধান্দায় সাহেব কোন দিকে ছিল। তার সেই চিরকালের রোগ—মা-মা কান্নায় বুকের মধ্যে আর্তনাদ ওঠে। কত চেষ্টা করেছে, রোগ কিছুতে নিরাময় হল না। এত বড় মহাগুণী হয়েও যার জন্য বুড়ো বয়সে দুটো পেটের ভাতের জন্য বংশীর দুয়ারে পড়ে থাকতে হত। কোথায় ছিল সাহেব, পাগল হয়ে ছুটে এসে নফরাকে দিল বিষম এক ধাক্কা। মন্দাকিনী সেই ফাঁকে হাতের রুলি-সহ নির্বিঘ্নে দালানে গিয়ে দড়াম করে দরজায় হুড়কো এঁটে দিল।

কাজটা করে ফেলেই সাহেবের হুঁশ হয়েছে। অনুতাপ আর লজ্জায় মরে। মোক্ষম সময়টা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এত লোকসান ঘটিয়ে দিল, এমন লোকের মঠ-আশ্রম বানিয়ে পর-হিত করে বেড়ানোই উচিত—রাতের কাজে আসা ঝকমারি। যে না সে-ই এই কথা বলবে।

অপরাধ করেছে, প্রায়শ্চিত্তও সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বেছে নিল। অমূল্যটা বাইরে—বাঘ ছাগশিশুর উপর যেমন পড়ে, গর্জন করে তেমনি তার টুঁটি চেপে ধরে। মারছে—কিল-চড়-ঘুসি বৃষ্টিধারার মতো পড়ছে। লাথিও এক-একবার। বুক ছেড়ে অমূল্য কেঁদে ওঠে।

কাঁদ রে ছোঁড়া, যত পারিস কাঁদ। গলা ফাটিয়ে ফেল।

হিড়হিড় করে সাহেব দালানের কাছে টেনে নিয়ে যায়। ভিতরে মন্দাকিনী হুড়কো দিয়ে আছে। সেই মুখো হাঁক পাড়ছে: কান্না বাকি গো ঠাকরুন?

শুনতে পাও না, পিটছি তোমার ছেলে ? কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাচ্ছি। ছেলে চাও তো গয়না খুলে ছুঁড়ে দাও।

অমূল্যও সমান তালে চেঁচাচ্ছে : ও মা, মেরে ফেলল আমায়—

কিছু নড়াচড়া যেন দালানের ভিতরে। আশায় আশায় সাহেব তাকায়।

না—কিছুই না। দালানের কাছে চকিতের মতো এসে আবার সরে গেছে। অত কাঁচা মেয়েমানুষ মন্দাঠাকরুন নয়।

ঘুমিয়ে পড়লে নাকি পাষণ্ডী মা ? সাড়া না পেয়ে সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে গালিগালাজ শুরু করে : মাগুলো এই রকমই। রাক্ষুসী ওরা সব—ছেলে মরে, নিজেরা গয়না ঝিকঝিকিয়ে ঘোরে। থুঃ-থুঃ—

পরের দিন নৌকোয় যাচ্ছিল সাহেব আর নফরকেষ্ট। সাহেবকে নফরকেষ্ট টেনেটুনে নিয়ে চলেছে—ভাঁটি-অঞ্চলের পাট চুকিয়ে কালীঘাটের পুরানো জায়গায় নিয়ে তুলবে। সোনার রুলি বেহাত হওয়ার দুঃখ তখনো মনে খচখচ করছে। সেই কথা উঠে পড়ে। নফরা বলে, দয়াময় হয়ে দয়াটা দেখালি বটে ! ধাড়ি মা'কে ছাড়িয়ে দিয়ে বাচ্চা ছেলের উপর মারধোর। বলিহারি বিচার তোর !

সাহেব হেসে বলে, তোমার যেমন ভোঁতা ছোরা, আমরাও তেমনি ভোঁতা মারধোর। রেলের কামরায় বলাধিকারী আমায় মারলেন, সেই সময় কায়দাটা শিখে নিয়েছি। শিক্ষা সার্থক। ছেলেটা নিজেও ভাবল, ভয়ানক মার খাচ্ছে। ছেলেমানুষের কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু তুমি হেন ঝানু মানুষটাও ভড়কে গিয়েছ। অথচ দেখ, মা বেটী কী পাজি—

বলতে বলতে সাহেবের কণ্ঠে যেন আগুন ধরে যায়। বলে, পেটের সন্তান মরে তো মরে যাক, নিজেদের গয়নাগাঁটি সুখ-শান্তি সম্মান-ইজ্জত বজায় থাকলেই হল। বাঘের বেলা বাপে বাচ্চা খায়, মানুষের বেলা মা—ঐ মন্দা-ঠাকরুনের মতো মায়েরা—

কোন এক নিষ্ঠুরা মা অবোধ শিশুর গলা টিপে একদিন জলে ছুঁড়ে দিয়েছিল, মন্দাকিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাকেও খানিক গাল দিয়ে সাহেব মনের আক্রোশ মেটাল।

এ সমস্ত কথাবার্তা পরের দিনের—নফরা আর সে যখন ফুলহাটা থেকে সরে পড়ছে। আজকে এখন তো ধুন্ধুমার রাখাল রায়ের বাড়ি। মারতে মারতে অমূল্যকে শুইয়ে ফেলল, তারস্বরে সে চেঁচাচ্ছে, তবু দেখ মা-জননীর প্রাণ গলে না। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি আবার ?

এদিকে এই। তালপাতা কেটে রেখেছে গোয়াল ছাওয়ার জন্তে বোধহয়। একটা পাতা নড়ে উঠল। ঝড়-বাতাস নেই, গাছের উপরের পাতা নড়ে না, মাটিতে গাদাকরা শুকনো তালপাতার একটা নড়ে কেন ?

যা ভেবেছ তাই—মানুষ। রাখালপতি রায় ভোগো সমেত তালপাতা মাথায় চাপিয়ে বসে আছে। মুরুব্বি মানুষটাকে পাওয়া গেল এতক্ষণে।

তবে রে বুড়ো ! আমরা হুড্ডহুড্ড করে মরি, তালপাতা মুড়ি দিয়ে মজা করে দেখছ তুমি ?

রাখাল বলে, হুঁ, মজা ! কেন্নো আর শুয়োপোকা গায়ে কিলবিল করে ওঠে, এর মধ্যে মজাই তো দেখবেন আপনারা ! মার-গুতোন দেবেন না, যেমন যেমন হুকুম হয় করছি।

মারব না। বোনের যা সমস্ত গ্রাস করেছে, উগরে দাও। ফুল-বিল্বিপত্রে তোমায় পুজো করে যাব।

সেই রটনা বুঝি ? গরিবের বাড়ি সেইজন্য পায়ের ধুলো পড়ল ? বোনের ব্যবহারে রাখাল কত যে মর্মাহত, এই নিদারুণ বিপদের মধ্যেও গলার স্বরে প্রকাশ পায় : মন্দার জিনিস গ্রাস করবে, তত বড় মুখের হাঁ ত্রিভুবনে কারো নেই। বেকবুল যাচ্ছি নে মশায়রা, গেলেও তো মানবেন না। গচ্ছিত রেখেছে সামান্য কিছু—নিতান্তই যৎসামান্য।

অধৈর্য নফরকেষ্ট খাপের ছোরা ধাঁ করে খুলে রাখালের সামনে একপাক ঘুরিয়ে বলে, ধানাই-পানাই ছেড়ে কোথায় কি আছে বের করে দাও। বের করো শিগগির, নয় তো গলা কাটব।

রাখাল বলে, গলা কেটে কিছু পাবেন না মশায়রা, গলার মধ্যে নেই, যথাধর্ম বলছি। আসুন—

আগে আগে গিয়ে গোলার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। তুষ্টুর হাতে কয়েকটা মশাল—নারকেল-তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে কাঠির মাথায় জড়ানো। এই বস্তুও সরঞ্জামের মধ্যে পড়ে। চুরির কাজে তেমন না হলেও ডাকাতিতে একেবারে অত্যাজ্য। অধিক আলোর প্রয়োজনে মশাল জালাতে হয়। মানুষের গায়ে গুঁজে ধরে ভয় দেখিয়ে এই তুষ্টুরামই খোঁজ আদায় করেছিল একবার। খড়ের চালের উপর জলন্ত মশাল ছুঁড়ে দিয়ে গৃহস্থকে সেই দিকে ব্যস্ত রেখে রাতের কুটুমরা পালিয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে অনেক।

চালের কাছাকাছি হাত দেড়েক মাপে চৌখুপি দরজা। একটা মশাল জেলে তুষ্টুরাম ভিটের উপর উঠে দরজার মুখে ধরে। গোলার গলায় গলায় ধান। ধানের ভিতর রাখাল হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

অধীর হয়ে তুষ্টু তাড়া দিয়ে ওঠে : হল কী ?

রাখাল সকাতরে বলে, আছে বাবা, মিছে কথা বলিনি। রাত্তিরবেলা চোখে ঠাহর হয় না তেমন—'

কোথায় ছিল সাহেব, গোলার ভিটের তুষ্টুর পাশে উঠে পড়েছে। তুষ্টুকে বলে, মশাল উঁচু করে ধরো। মুরুব্বিমশায় ঠাহর করতে পারছে না, খুঁজে দিয়ে আসি।

হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে যায় তুষ্টু। ঐ তো সঙ্কীর্ণ একটুকু দরজা—ইঁদুরের বাক্সকলে যাওয়ার মতো হচ্ছে। সাহেব গ্রাহ্যও করে না, ফুড়ুত করে ঢুকে গেল। বলে, ভাঁওতা দিচ্ছ না তো ? টাকাকড়ি ধানের গোলায় কেন রাখলে ?

রাখাল বলে, সেরেস্থরে রাখতে হয় বাবা। সিন্দুকে রাখা যায় না আপনাদের দশজনার ভয়ে।

বলেই বুঝি খেয়াল হল, নিন্দেমন্দ হয়ে গেল এদের। তাড়াতাড়ি সামলে নেয় : দশজনা বলতে তো সবাই—আপন-পরে তফাত নেই। অন্যের কথা কি—নিজের ছেলেটা পর্যন্ত। কোন্‌খানে কি রেখেছি, শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। ঝগড়া-কচকচি ঠেঙাঠেঙি—জন্মদাতা পিতা বলে রেহাত করে না। তিতবিরক্ত হয়ে গেলাম বাবা। আপনারা নিয়ে চলে যান, এর পরে হারামজাদা ছেলে অত্যাচারের ছুতো পাবে না।

দু-জনের চারখানা হাত মিলে ধান হাতড়াচ্ছে। বিড়বিড় করে সাহেব সর্বক্ষণ শাসায় : মিছে খাটনি যদি খাটাও, ধানের নিচে জ্যান্ত গোর দিয়ে যাব। নয় তো গোলার দরজায় তালা আটকে মশালের আগুন ধরিয়ে দেবো বাইরে থেকে।

না বাবা, মিথ্যে নয়—। বলছে আর দ্রুত হাতে ধান ঠেলে গর্ত করছে এদিক-সেদিক। সন্দিগ্ধভাবে বলে, বারো আঙুল এক বিঘতের ভিতরেই থাকবার কথা। শয়তানের বেটা শয়তান ঐ নিশিটা কিছু করল নাকি ? তাই বা কেমন করে—গোলার চাবি সর্বক্ষণ আমি কোমরে নিয়ে ঘুরি।

না, মানুষটা সত্যবাদী। ধান হাতড়াতে হাতড়াতে ন্যাকড়ার বল অবশেষে হাতে ঠেকে। খানিকটা ন্যাকড়া গোল করে পাকিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা—দড়ি ধানের নিচে গভীর দেশে চলে গেছে। নিশানা এই বল—দড়ি ধরে ধান সরাতে সরাতে চলে যাও গোলার তলার দিকে। রাখাল আর সাহেব তাই করেছে। দড়ির শেষ বেরিয়ে গেল, পিতলের ঘটির কানার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। দড়ি টেনে ঘটি উপরের দিকে আনে। কী ভারী !

ঘটির মধ্যে কি ভরেছ বুড়ো—লোহালক্কড় ?

ঘটির মুখ-বাঁধা। খুলে দেখা যায়, কাঁচা-টাকা আধুলী সিকি দুয়ানি আনি এবং পয়সা। তাই এত ভার। রাখাল কৈফিয়ৎ দেয় : কাগজে নোট হাতে এলেই ভাঙিয়ে ফেলি। স্বদেশিবাবুরা সাহেবদের থাকতে দেবে না। তাদের নোটের কাগজে তখন ঘুঁড়ি বানিয়ে ছেলেপুলেরা ওড়াবে।

মাথায় জড়ানো গামছাটা খুলে সাহেব ঘটির বস্তু ঢালছে। কোমরে বেঁধে নেবে। দস্তুর এই। কাজের মধ্যে কখন কি দশা—হয়তো জল ঝাঁপাতে হল, হয়তো বা গাছের মাথায় চড়ে বসতে হল। মাল দেহের সঙ্গে আঁটা রইল—মানুষ বজায় থাকে তো মালও থাকবে।

গামছায় বাঁধতে বাঁধতে বিরক্তি ভরে সাহেব বলে, আধ-পয়সা পাই-পয়সা রাখনি যে বড় ?

তুচ্ছ কথা রাখালের কানে যায় না। সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে বলে, হাড়-বজ্জাত আমার ঐ বোন। দালান সারানো দেখিয়ে বিস্তর ভুজং-ভাজাং দিয়ে সামান্য কিছু বের করেছি। চেটেপুঁছে নিয়ে যেও না বাবা, কিছু প্রসাদী রেখে যাও।

হেন অবস্থার মধ্যেও সাহেবের হাসি পেয়ে যায়। বলল, প্রসাদী নিলে তো বিপদ। ছেলে ঠেঙানি জুড়বে। জন্মদাতা পিতা বলে খাতির করবে না।

জানতে দিলে তো ? সে জেনে রইল, সবই আপনারা নিয়েথুয়ে গেছেন। কিছু যদি দয়া করে যান, সে জিনিস আমি জীবন থাকতে বের করব না। মরার সময়েও না।

খানিকটা নরম হয়েছে অনুমান করে রাখাল পুনশ্চ বলে, দয়া কিছু হবে দয়াময় ?

সহসা তীক্ষ্ণ ভয়াল চিৎকার পাঁচিলের বাইরে : মাছি ঘন—। পাহারাদার বংশী হাঁক পেড়ে সকলকে জানান দিচ্ছে :

মাছি ঘন, মাছি ঘন—

গোলার দরজার মুখে তুষ্টুরাম মশাল ধরে আছে, মশাল মাটিতে ছুঁড়ে দিল। নেভে না। কুড়িয়ে নিয়ে বাইরের কলসিতে ঢুকিয়ে দেয়। অন্ধকার। উঠানে তবু একটু চিকচিকানি, গোলার ভিতরে একেবারে নীরন্ধ্র।

সেই অন্ধকারের মধ্যে সাহেব দেখে, রাখালের কোটরগত চোখের মণি দপ্ করে জ্বলে উঠল। ধানের গাদার উপরে টলতে টলতে গিয়ে গোলার সঙ্কীর্ণ দরজা আটকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাহেবের কোমরের গামছা টেনে খসানোর জন্য। দন্তহীন মাড়ি মেলে উৎকট হাসি হাসছে।

বলা নেই কওয়া নেই, সাহেব দু-হাতে দু-মুঠো ধান নিয়ে রাখালের চোখ

নিরিখ করে মারল। এই নিয়ম—একেবারে যা ভাবে নি তাই করতে হয়। হকচকিয়ে যায় মানুষ। ঘোর কাটিয়ে সুস্থির হয়ে রাখাল আবার ধরতে যাবে তার আগে সাহেব লাফ দিয়ে পড়েছে। পুরানো বাতিল ইটের গাদা সেখানটা, তার উপরে গিয়ে পড়ল। হাঁটুতে বিষম লেগেছে, ছড়ে গেছে খানিকটা, উঠে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু দাঁড়ানো তো নয়, হাঁটাও নয়—ছুটতে হল সেই অবস্থায়।

ধর্, ধর্—পালিয়ে যায়।

তিলকপুরের মানুষ হৈ-হৈ করে ছুটছে। ডাকাত পড়েছে রাখাল রায়ের বাড়ি। হুড়কোর বাঁশ লাঠি টর্চ হেরিকেন দা-কুড়াল যা পেয়েছে, হাতে তুলে নিয়েছে। রাখালের ছেলে নিশি বংশীর চোখ এড়িয়ে কোন্ ফাঁকে পাড়ায় বেরিয়ে খবর দিয়েছে। বড় ভাগ্য, বন্দুক দুটো চলে গেছে ফুলহাটায়। বলাধিকারীর কতখানি দূরদৃষ্টি, আর একবার তার পরিচয় হল। সকলের দুটো করে চোখ, তাঁর বোধ হয় অদৃশ্য তৃতীয় নেত্র কপালের উপর—আগেভাগে সমস্ত দেখতে পান। তুষ্টুরামও খানিকটা ভেবে এসেছে বিপদআপদের কথা। মশাল এনেছে, আবার দেখা গেল পটকাও আছে কয়েকটা গামছার ঝুলিতে। গোটা-দুই ছেড়ে দিল পর পর। পাঁচিলের দরজা পর্যন্ত যারা এসে পড়েছিল, দুড়দাড় করে তারা পিছিয়ে যায়। অন্য কেউ না হোক, তুষ্টুরাম বেরুতে পারত এই ফাঁকে। কিন্তু হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল।

মানুষ দেখে সাহস পেয়ে মন্দাকিনী এইবারে দালান থেকে বেরুল। মায়ের কর্তব্যবোধ চাড়া দিয়ে উঠেছে। গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে: আমার অমূল্যকে মেরে ফেলল গো, সর্বস্ব লুটেপুটে নিল।

জালুয়ার তলার কালি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তুষ্টুরাম সারা মুখে মেখেছে। চোখদুটো পিটপিট করছে তার ভিতর। পাগড়ির মতো করে মাথায় উড়ানি জড়িয়েছে মুখের অনেকটা ঢেকে দিয়ে। এমনি সাজ মোটামুটি সকলেরই। মুখোস না নিলেও চেহারা কিম্ভূতকিমাকার করতে হয়, চোখে দেখে যাতে কেউ চিনে ফেলতে না পারে।

মনিবঠাকরুনের মারমূর্তি দেখে কী রকম যেন হল—চনচন করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়। দু-একটা পটকা তখনো ঝুলিতে—কিন্তু পালানোর কথা ভুলে উল্টোমুখো রোয়াকের উপর লাফিয়ে উঠে মন্দাকিনীর চুলের ঝুঁটি ধরল।

কেমন লাগে?

বলে ফেলেই মনে মনে জিভ কাটল। সর্বনাশ, কথা বলে ফেলেছে, রাগের

বশে সেই মুহূর্তে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। লোক অচেনা হলে দায়ে-বেদায়ে এক-আধটা কথা বললেও বলতে পারে গলায় ভিন্ন আওয়াজ তুলে। চেনা মানুষের কাছে একেবারেই বোবা। পুরানো লোক হয়ে তুষ্টুরাম এত বড় বেকুবি করে বসল। রাগ না চণ্ডাল—স্বর বিকৃত করে বলতে হয়, রাগের বশে সে খেয়ালও ছিল না।

চুলের মুঠি ছেড়ে সাঁ করে সে ছুটল। যাবে কোথা, বেরুবার পথ নেই। মন্দাকিনী ওদিকে চেঁচামেচি করছে: তুষ্টু, তুই—তোর এই কাজ? নুন খেয়ে এত বড় নেমকহারামি—হায় কলির ধর্ম!

একবার এদিক একবার সেদিক তুষ্টুরাম ছুটোছুটি করছে। আর গাল চড়াচ্ছে শতেক বার। পাঁচিল ঘেরা বাড়ি--পিছন দিকে খিড়কির দরজা, সেদিকেও মানুষ জমেছে। কেলেঙ্কারি আজকে। নফরকেষ্ট দিয়ে শুরু—চুরি করতে এসে ডাকাত হতে হল। তুষ্টুরাম তার উপরে পরিচয়টা পরিষ্কার জানান দিয়ে দিল। ঘিরে ফেলেছে, দলসুদ্ধ লোপাট হবার দশা।

নতুন মানুষ সাহেব ওদিকে কী বুদ্ধি করেছে—দেখ, তাকিয়ে—দেখ একবার। পাঁচিলের উপর রাজমিস্ত্রিদের ভারা, পিলপিল করে তার উপরে উঠে পড়ল। ওঠার কায়দাও চেয়ে দেখবার মতো। গাছে ওঠা দেয়ালে ওঠা ঘরের চালে ওঠা—কারিগর-সমাজে কথা চলিত আছে, মাটির উপরে পায়ে হেঁটে চলাচল করো, ঐ সমস্ত জায়গায় কানে হেঁটে উঠতে হবে। সাহেব সেই কায়দায় উঠে পড়ল টিকটিকি কাঠবিড়ালি যেমন উঠে যায়। মানুষ জমে গিয়ে লোকারণ্য সামনেটায়। সকলের মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে সাহেব, সকলের চোখের উপর। তারার আবছা আলোয় মুখ চেনা যায় না, কিন্তু তাল-নারিকেলের মতোই খাড়া মানুষটা দেখা যাচ্ছে। দূরের দিকে যারা আছে, সাহেব সকলকে ডাকছে গলা ফাটিয়ে: চলে এসো, কাছে এসে শোন সকলে, দলের জমাদার আমি বলছি—

গামছায় বাঁধা টাকাপয়সা কোমর থেকে খুলে হাতে নিয়েছে। বলাবলি কিছু নয়—সাহেব একমুঠো নিয়ে ছুঁড়ে দিল মানুষজনের দিকে। গোড়ায় হকচকিয়ে গিয়েছিল—কুড়ানোর জন্য তারপরে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। যত লোক এদিক-সেদিক ছিল, রে-রে করে ছুটেছে পাঁচিলের গায়ের ভারা এবং ভারার উপরের মানুষটা নিরিখ করে। কুড়ানো শেষ হয়ে যায়, সাহেব তত আবার মুঠো মুঠো ছড়ায়। টর্চের আলো ফেলেছে, হেরিকেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে—ডাকাত যে এক এক করে চোখের উপর দিয়ে পালাচ্ছে সেদিকে নয়। ঘাস-বনের মধ্যে টাকাপয়সা পড়েছে, আলো নিয়ে তাই খুঁজছে। হরির-লুটের

মতো এক এক মুঠো ছড়িয়ে দেয়, আর নজর ফেলে দেখে নেয়—বেরিয়ে পড়ল কিনা সকলে, গেলই বা কতদূর।

কথা বলে ওঠে আবার। কণ্ঠ একেবারে আলাদা—সাহেব নয়, ভিন্ন এক মানুষ বলছে যেন। রীতিমতো এক বক্তৃতা। বলে, চোরের সেরা চোর রাখাল রায়। কুটুম্ববাড়ির সর্বস্ব মেরে এনেছে। বোন-ভাগনেকে পথে তুলে দেবে দু-দিন বাদে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাচ্ছে, সকলে মিলে ভাগযোগ করে খাব। তবে কেন তোমরা পিছনে লাগতে এসেছ?

কানে শুনে যাচ্ছে এই পর্যন্ত। ঘাড় তুলে তাকানোর ফুরসত কোথা? নিজ নিজ কর্মে সকলে ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি কে কত কুড়িয়ে তুলতে পারে। একজন চেঁচিয়ে ওঠে: আমার কপালে শুধুই পয়সা—তামার উপরে উঠতে পারলাম না। মোটা মোটা মাল ছাড় দিকি ভাই, লম্বা হাত করে ফেল। রাত্রে চোখে কম দেখি—সাফাই জায়গায় ছুঁড়ে দাও।

যেমন ইচ্ছে বলুক, সাহেবের হাতের মাপ আছে। ছড়াচ্ছে অল্প অল্প করে ভিতরে-উঠানের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে। তুষ্টুরাম বেরিয়ে পড়েছে। নফরকেষ্টও বেরুল নিঃশব্দ একটি ছায়ার মতন। মন্দাকিনী আর রাখাল যেন ওদিকে পাল্লা দিয়ে চেঁচাচ্ছে: পালিয়ে যায়, ধরো ধরো, বেড় দিয়ে ধরে ফেল।

কেবা শোনে কার কথা! গৃহস্থবাড়ি কুকুরের মুখে এক এক কুচি মাংস ছুঁড়ে যাবার নিয়ম, যতক্ষণ না চোরের কাজ হাসিল হয়। মানুষের বেলাতেও সাহেব সেই নিয়ম খাটিয়ে যাচ্ছে!

বাইরের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ নিশিকে দেখে রাখাল গর্জন করে উঠল: তুই হারামজাদা সকলের সঙ্গে পয়সা কুড়োতে লেগেছিস—লজ্জা করে না?

নিশিও সমান তেজে বাপের কথার জবাব দেয়: বলি, পাড়ার মানুষ জুটিয়ে আনল কে? সকলে ভাগ কুড়াচ্ছে, আমি বুঝি বোকা হয়ে হাত গুটিয়ে থাকব?

যুক্তি অমোঘ। বয়স এবং লজ্জায় না বাধলে—কী জানি, রাখালও হয়তো গিয়ে পড়ত। কিন্তু গুরুপদ মানুষটার কী হল বল দেখি। সর্দার হয়ে কাজের মধ্যে শুধু করেছে—দুর্বল বৃদ্ধ রাখালের আগাপাস্তালা লোহা পেটানো। গণ্ডগোল জেঁকে উঠবার পর আর তাকে দেখা যায়নি। হয়তো বা সে-ও তালপাতা মুড়ি দিয়ে পড়েছে কোথায়। সাহেব এদিকে পালাবার পথ খালি করে দিয়েছে, বুঝতে পারেনি দলের সর্দার।

অধীর হয়ে সাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি ইঙ্গিত দিয়ে চেঁচায়: জাল গুটাও সর্দার, জাল গুটাও। এক্ষুনি—

সর্বত্র নজর হানা দিয়ে অবশেষে দেখতে পায়, পাঁচিলের একেবারে গা ঘেঁষে দুই হাত দুই পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে টিপিটিপি চলেছে একটি প্রাণী। গুরুপদ সন্দেহ নেই, পচা বাইটার সাগরেদ বলে যার দেমাক।

মজা-নদীর ধারে কসাড় জঙ্গল—এই বড় সুবিধা। ছুটোছুটি করে কোন রকমে জঙ্গলে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। তাক বুঝে তারপর গ্রাম ছেড়ে মাঠে নামবে। ভারার উপরে দাঁড়িয়ে সাহেব দেখতে পাচ্ছে, তীরবেগে ছুটেছে ছায়াগুলো। অদৃশ্য হয়ে গেল। এইবারে তার নিজের—বাঁশ বেয়ে সড়াক করে মাটির উপর যেন পিছলে পড়ল। পড়বি তো পড়—একেবারে পয়সা-কুড়ানো দলটার মধ্যে। দু-একজন চোখও একটু তুলেছে—তাদের সেই চোখের সামনে গামছার অবশিষ্ট টাকাপয়সা দুই হাতে দু-দিক দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। চোখগুলো সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে আবার। পলক ফেলতে যেটুকু সময় সাহেব আর নেই।

আরও পরে এক সময় জনতার হুঁশ হল। কুড়ানো প্রায় শেষ তখন। কর্তব্য-বুদ্ধির তাড়ায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে : এই যাঃ, গেল কোনদিকে রে ?

কেউ উত্তর দিক দেখায়, কেউ বলে দক্ষিণে। নজর তখনো মাটিতে—শেষ পয়সাগুলো খুঁটে নিচ্ছে। এইটুকু হয়ে গেলে কোমর বেঁধে লাগবে। আচমকা সকলের মাঝখানে এমনভাবে নেমে পড়বে, কে ভাবতে পেরেছে ?

রাত ঝিমঝিম করছে। শিয়াল ডেকে উঠল বহু দূরে। বার বার তিনবার। তারপর এদিকে সেদিকে আরও শিয়ালের ডাক। মজা-নদীর ধারে জঙ্গলের ভিতর থেকেও যেন ডাকল কয়েকবার। সব শিয়ালের এক রা, ধুয়া একবার উঠে গেলেই হল। প্রথম তিন ডাক মাঠ-পারের তেঁতুলতলা থেকে। ডাকের আন্দাজ নিয়ে নানান দিক থেকে অন্য শিয়াল সেই তেঁতুলতলায় জুটেছে। ডেকেছে শিয়াল নয় বংশী—পশুপাখির ডাকে যে ওস্তাদ। ছুটেছেও শিয়াল নয়, দলের অন্য চারজন। পালানোর মুখে যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছিল, পাহারাদার বংশী আবার সকলকে একত্র করেছে। নিয়ম এই। [নিয়মটা বড় বেশি চাউর হয়ে যাবার পর হালে কিছু কিছু নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। একটা হল, শিয়াল ডাকার বদলে গাছের মাথায় চড়ে আকাশমুখো টর্চ জেলে ধরা। চোর খুঁজতে যারা বেরিয়েছে, তারা মাটিতে খোঁজাখুঁজি করে, আকাশে তাকায় না। দলের লোকই শুধু নজর তুলে দেখবে কোন্ দিকে আলো।]

মজা-নদীর কিনারা থেকে শেয়াল ডেকে সাহেব বংশীর জবাব দিয়েছে। ঠিক তার পনের-বিশ হাতের মধ্যে একই সঙ্গে আর একজনের ডাক। তুইরাম।

এত কাছাকাছি, কিন্তু অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখেনি। ডাকের আন্দাজে সাহেব গিয়ে তার হাত ধরল।

চলো তুষ্টু—

তুষ্টুরামের দুঃখ হয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আমি যাব না। যেদিকে দু-চোখ যায়, বেরিয়ে পড়ব। কোন্ মুখে বলাধিকারী মশায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াই? আনাড়ি কাঁচালোক বুঝতে পেরেই তাঁর অমত ছিল। যা-কিছু তুমি তো একলাই করলে সাহেব। পাঁচিলের মধ্যে বেড় দিয়ে ফেলেছিল, তুমি বাঁচালে। বেঁচে গেছি, তাও বলা যায় না। সর্বনাশটা আমিই করলাম। চিনে ফেলেছে, হনুমানের লেজের আগুন সহজে ওরা নিভতে দেবে না।

বলতে বলতে তুষ্টু কেঁদে ফেলে। জোয়ান মানুষটার কান্না দেখে সাহেবের কষ্ট হয়। তিরস্কার মুখে আসে না, তুষ্টুর গলা জড়িয়ে ধরল। বলে, ভাবনা কিসের, বলাধিকারী আছেন কেন তবে? বাহাদুরি বটে তোমার তুষ্টুরাম! টাকাপয়সার মুনাফা আজকে কাণাকড়িও নয়, কিন্তু মস্তবড় মুনাফার কাজ তুমি করে এলে। মন্দাঠাকরুনকে থাপ্পড় কষিয়ে এলে। মানুষকে শেয়াল কুকুরের মতো ইট মেরেছিল, তার পাল্টা-শোধ। মরদমানুষের কাজই তো এই। শোধ এমনি নিজের হাতে দিতে হয়—বড়লোকের আদালতে বড়লোকদের কিছু হয় না। মুখের ঐ রেখাটুকু—কী করবে, চাপতে পারো নি, আপনি এসে গেল। আমরা হলাম মুখ্যুসুখ্যু চোর-ছ্যাঁচোড় মানুষ—মনে একরকম মুখে অন্য পেরে উঠিনে। সেসব ভালোরা পারে।

যেতে যেতে আবার বলে, মা বটে দেখলাম। মা-নামে ঘেন্না ধরিয়ে দিল। মা নয়, মেয়েলোকই নয় ওর চোদ্দপুরুষে। ডাকিনী বাঘিনী হাকিনী—মায়া করে মেয়েলোকের রূপ ধারণ করেছে।

সান্ত্বনা দিতে দিতে তুষ্টুর গলা জড়িয়ে তেঁতুলতলা নিরিখ করে চলল। সেখানে রৈ-রৈ পড়ে গেছে। বংশীকে দুষছে: নিশি রায় বেরিয়ে গিয়ে লোক জুটিয়ে আনল, কিচ্ছু জানো না—চোখ বুঁজে পাহারা দিচ্ছিলে নাকি? রাগটা কিন্তু নফরকেষ্টর উপরেই সকলের বেশি। এই মারে তো সেই মারে: কাঠ-গোঁয়ার একটা। গোড়াতেই কাঁচিয়ে দিলে। এ কাজে বুদ্ধি লাগে। সে জিনিস এক-কৌটাও নেই মাথার মধ্যে—ঝুড়িখানেক গোবর।

হাত বেড় দিয়ে সাহেব নফরকে ঠেকায়। সর্দার হিসাবে গুরুপদর কণ্ঠ বেশি প্রবল, তার উপরে সাহেব খিঁচিয়ে উঠল: সবচেয়ে বড় দোষ তোমারই। দেয়াল কাটার জন্য কাঠি, তাই দিয়ে মানুষ ঠেঙাতে লাগল। কাঠি কেড়ে নেবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল—সর্দার বলে মান্য দিয়ে

বসেছি, তাই পারলাম না। বুড়োমানুষটাকে অমন করে মারলে, কী দোষ করেছে শুনি?

গুরুপদ নির্বিকার কণ্ঠে বলে, দোষ না করুক, টাকা করেছে। সেইজন্য মারি। এদ্দিন ছিল না, ডাকাত কেন—একটা ছিঁচকে-চোরও ওর বাড়ি থুতু ফেলতে যেত না।

কারো মন ভাল নেই। তোড়জোড় করে এসে ডাহা বেকুব হয়ে ফেরা। কতদূর যে গড়াবে, তা-ও বলা যাচ্ছে না। বিরক্ত স্বরে বংশী এর মধ্যে বলে, চিরকালের নিয়মই তো চলছে—নতুনটা কি হল? ডাকতে মক্কেল ঠেঙায়, মনিব চাকর ঠেঙায়, জমিদার রায়ত ঠেঙায়, মাস্টার ছাত্র ঠেঙায়, বর বউ ঠেঙায়, বাপ-মা ছেলে ঠেঙায়। তুমি আমাদের এক দয়ারাম গোঁসাই—পিঁপড়ে মেরো না। ছারপোকা মেরো না, মশা মেরো না: ছোটমামা ঠিকই ধরেছিল—ভাবের মানুষ তুমি, ভক্ত মানুষ। ঐ লাইনে যাও। চেহারাখানা আছে, হবে দু-চার পয়সা।

গুরুপদ বলে, আজেবাজে কথা ছেড়ে কোন্‌খানে গিয়ে উঠছি সেইটে ভাবো দিকি এখন। বলাধিকারী মশায়ের ফিষ্টির জের এখনো বোধহয় চলছে, বন্দুক নিয়ে অবিনাশ সামন্ত মোতায়েন আছে। সেখানে জুত হবে না। খালি হাতে মহাজনের কাছে যাবই বা কোন লজ্জায়? ঘরবাড়ি ছেড়ে কদ্দিন ধরে পড়ে আছি—আমি এই ডাইনের পথ ধরলাম।

ডাইনে মোড় নিয়ে গুরুপদ ঘরমুখো হল। সর্দার হিসাবে বিদেশি মানুষ সাহেব ও নফরার উপর কিছু উপদেশ ছেড়ে যায়: তোমাদের কে চেনে, তোমরা সরে পড় এইবেলা। যদি দেখ হাঙ্গামাহুজ্জুত হল না, নতুন মরসুমে কাজ ধরতে এসো। একলা তুমিই এসো সাহেব—নফর যেন না আসে, ওকে দিয়ে কাজ হবে না।

তুষ্টুরাম বলে আমিও চললাম—

বংশী অভয় দিচ্ছে: ঘাবড়াস কেন তুষ্টু? সদর হল বিশ ক্রোশ পথ। গাঙখাল ঝাঁপিয়ে সদরের আইনকানুন এতখানি পথ পৌঁছয় না। তা যদি হত, আমার দাদামশায় অতকাল ধরে রাজত্ব করতে পারতেন না। যা-কিছু করেন দারোগাবাবু—কত দূর কি করবেন, তারও হদিস পাওয়া যাবে বলাধিকারী মশায়ের কাছ থেকে।

সাহেব বলে, ভয় নয় তুষ্টুরামের, লজ্জা। কিন্তু লজ্জার কি হল? জোয়ান-মরদের যা করা উচিত, তুষ্টু সেইরকম করেছে। ঠাকরুন থাপ্পড়টা খেল, মানুষটা কে জানতে পারবে না—এই বা কোন বিচার? আমি বলি, বেশ করেছ তুমি তুষ্টু।

তুষ্টুরামের কোন কিছুই যেন কানে যায় না। থপথপ করে চলেছে। নিজের মনে বলে ওঠে, কাঠ কাটতে সব বাদাবনে যাচ্ছে। কাঠুরে হয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়ি। বড়-শিয়ালে মুখে করে নেয় তো আপদ চোকে।

বড় শিয়াল অর্থাৎ বাঘ। কাজে হেরে অবসাদে এখন ভেঙে পড়েছে। বাঘের মুখে যেতেও রাজি। হারাধনের ছেলেগুলোর মতো দলের লোক যে যার পথে সরে পড়েছে।

কেবল বংশী দেমাক করে: আমার ঘর আছে, বউ আছে, ছেলে আছে। আমি কোন চুলোয় যেতে যাব? কী দরকার! মক্কেলের বাড়িতেই ঢুকি নি, কেউ দেখে নি, নিশানদিহি হবে না আমার।

বলছে, বউ জানে সোনাখালি মামার বাড়ি গেছি। মামার বাড়িই তো ছিলাম এতক্ষণ। গণ্ডগোল বুঝলে বড়মামা নিজে গিয়ে হলপ পড়ে সাক্ষি দেবে।

অতএব বংশীও নিজের বাড়ি সৎ-গৃহস্থ হতে চলল।

সাহেব আর নফরকেষ্ট দুজনে এইবার খালের মোহানায় এসে গেছে। জঙ্গলের ভিতর থেকে কুঠিবাড়ির ছাত অস্পষ্ট দেখা যায়।

নফরকেষ্ট হঠাৎ সাহেবের হাত এঁটে ধরে: ওদিকে নয় রে, আমরাও বাড়ি চলি।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, আমাদের আবার বাড়ি!

হ্যাঁরে রে, হ্যাঁ! বস্তি-জায়গা, খারাপ মেয়েমানুষের বাস। কিন্তু বাড়ি আমাদের ভাল। টাকা থাকলে ভালবাসা, দয়ামায়া উপে গিয়ে টাকাটাই সকলের বড় হয়ে যায়। ভাগ্যিস টাকা নেই। সেজন্যে, দেখলি তো, মন্দাঠাকরুন মা আবার সুধামুখীও মা।

সুধামুখীর কথায় গদগদ হয়ে ওঠে: দুটো নাম একসঙ্গে তুলতেও ঘেন্না করে সুধামুখী হল জাত-মা। গর্ভের মেয়েটাকে নুন খাইয়ে মেরেছিল, গড়াতে গড়াতে শেষটা ঐ বস্তি-বাড়িতে উঠল। সন্তান-শোকে লোকে পাগল হয়ে যায়, সুধামুখীও তাই। সাহেব, তুই কোনদিন তাকে ছাড়িস নে।

বলতে বলতে কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে দস্যু-মানুষটার। বলে, কালীঘাটে ফিরে যাই আবার। শহরের মানুষ শহরে কাজের ধাঁচ বুঝি। নোনাজল, ধান-বন, বাদার-জঙ্গল আমাদের ধাতস্থ হয় না। তার উপরে গুরুপদ যা বলে গেল, সেটাও ভাবতে হবে বই কি। এক্ষুনি এই পথে সড়ে পড়ি।

সাহেব গোঁ ধরে বলে, তুমি যাও, আমি থাকব।

নফরকেষ্টরও জেদ: তোমায় রেখে কক্ষনো আমি যাব না। মায়ের ছেলেটা

নিয়ে চলে এসেছি, সুধামুখীর হাতে হাতে হাজির করে দিয়ে তবে খালাস। তাই-ই বা কেন? আমার নিজেরও বুঝি দাবি থাকতে পারে না তোর উপর!

বিস্তর দিন দেশ-ছাড়া, শহর মন টেনেছে, সেখানে কল টিপলে আলো, কল ঘোরালে জল, রাতদুপুরে সুধামুখীর গালিগালাজ। সেখানে পথের মোড়ে হঠাৎ সহোদর ভাই ও সুন্দরী বউ হয়ে দেখা দেয়। নফরাকে আর আটকে রাখা যাবে না।

গতিক বুঝে সাহেব চুপ করে যায়। নদী কূল ধরে চুপচাপ দু-জনে অনেকটা দূরে চলে গেল।

সাহেব বলে, হেঁটে হেঁটেই কালীঘাট চললে?

যাই তো গাবতলী অবধি। সেখানে গয়নার নৌকো পেয়ে যাবো।

কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন, নৌকো আগেই পেয়ে গেল। চরের উপর কাদার মধ্যে নেমে নফরকেষ্ট হাত তুলেছে, নৌকোর লোকই তখন চেঁচায়: খুলনা যাবে তো উঠে এসো। দুই টাকা দু-জনার। যাক গে যাক, দেড় টাকা দিও। পাইকারি দর।

সাক্ষির দল নিয়ে খুলনার সদরে মামলা করতে যাচ্ছে কাছারির গোমস্তা। যাচ্ছে জমিদারের খরচায়, এই দেড় টাকা উপরি রোজগার। গরজটা সেইজন্য।

বলে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। টানের মুখে নৌকো রাখা যায় না। পা ঝুলিয়ে বোসো। ভাল ভাল মহাশয়-ব্যক্তিরা যাচ্ছেন। গাঙের জলে ভাল করে ধুয়ে তারপরে পা তুলবে। তোমরা যাবে কদ্দুর?

কলকাতা শহর। খুলনা থেকে রেলের টিকিট কাটব।

কী করা হয় মহাশয়দের?

নফরকেষ্ট বলে, ছুরি-কাঁচির কারবার।

পাঁচ

জোয়ার ধরে নৌকো তরতর করে চলল। মোকদ্দমায় সাক্ষি দিতে যাচ্ছে, এখন তো প্রতিজনে এক-এক লাটসাহেব। যতক্ষণ না কাঠগড়ায় উঠে তাদের কথাগুলো বলা হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণে এই গোমস্তা-মশাই তাদের চিনতে পারবে না। সাক্ষিরা বোঝে সেটা বিলক্ষণ। মুহূর্তকাল স্থির হয়ে বসতে দিচ্ছে না। তামাক হয়ে গেল তো পান, পান হল তো আবার তামাক। গোমস্তা নিজ হাতে সেজে সেজে এগিয়ে ধরে। মুখে অবিরত খোশামুদি ও রসিকতার কথা।

সাক্ষিদের দাঁত একটু যদি ঝিকঝিক করল, গোমস্তা অমনি ফেটে পড়ে হাসিতে। নৌকোর ছইয়ের নিচে এমনি সব চলছে।

সাহেবরা শেষ প্রান্তে কাড়ালের উপর। সবুর সইছে না নফরকেষ্টর: পোড়া আবাদ রাজ্যের এলাকা ছেড়ে বেরুতে পারলে বাঁচি রে বাবা। নামধাম যোগাড় করে জল-পুলিসের মোটর-লঞ্চ গাঙে খালে তক্কে তক্কে ঘুরবে। সাহেবকে নিয়ে রেলগাড়িতে উঠতে পারলে যে হয়!

হাসিখুশিতে মন ভুলিয়ে রাখছে। সাহেবকে বলে, কাজকারবারের কথা জিজ্ঞাসা করল—জবাবটা কি দিলাম শুনলি তো? সাধু-মহাজনের বাড়ি থেকে এসেছি, মিথ্যে কথা এখন মুখ দিয়ে বেরোয় না।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, মিথ্যে নয়?

নফর বলে, বুঝতে পারলি নে—আ আমার কপাল! বললাম ছুরি-কাঁচির কারবার। কাঁচির কারবারি আমি তো চিরকাল। ছুরির কারবারে এই নতুন বটে!

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ছ'-টা জিভ চেপে বলেছিলাম, শুনতে 'চ'-এর মতন। বোঝ এখন, কী দাঁড়াল!

গাবতলির হাটখোলা। সারি সারি হাটের চালা দেখা যায়। বেলা পড়ে এসেছে।

সাহেব জেদ ধরল: গাবতলি নেমে ভাত খেয়ে নেবো। ক্ষিদেয় পেটের নাড়ি পটপট করছে।

নফরকেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলে, আচ্ছা বায়নাদার তুই বাপু! পথের মাঝখানে ভাত রেঁধে কে বাতাস দিচ্ছে। টানের মুখে নৌকো রাখা যাচ্ছে না, শুনলি তো! একটা রাত্তির চিঁড়ে-মুড়ি, ছাঁচ-বাতাসা খেয়ে পড়ে থাক · খুলনায় নেমেই ভাত। বাঁধা হোটেল রয়েছে—ভাত-মাছ, ছ্যাচড়া-মুড়িঘণ্ট অষ্ট ব্যঞ্জন সাজিয়ে খাইয়ে দেবো দেখিস।

কিন্তু অবুঝ সাহেব শুনবে না। বলে, দোকানে চাল-ডাল কিনে নিয়ে একটা চালার নিচে ফুটিয়ে নেবো। নৌকো না রাখতে পারে, যাক চলে ওরা। খেয়েদেয়ে গয়নার নৌকোয় চার-ছ আনা দিয়ে যেতে পারব।

মাঝির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে, ঘাটে ধরো একটু মাঝি। কেউ না নামে, আমি একলা নেমে যাই। ভাত না হলে আমার চলবে না।

যে-ই না বলেছে, যেন বোলতার চাকে ঘা পড়ল। হুঁশ হল, ক্ষিধে সকলেরই পেয়েছে। ছইয়ের নিচে সাক্ষিরা রে-রে করে উঠে: সবাই নামব আমরা, সবাই ভাত খাব। না খাইয়ে অর্ধেক মেরে কাঠগড়ায় তুলতে চাও? উল্টো-পাল্টা কথা বেরুবে তা হলে কিন্তু।

সাহেবের দিকে গোমস্তা একবার ভ্রুকুটি করে দরাজ হুকুম দিয়ে দেয় : বাঁধো নৌকো। মামলা খারিজ হয় হোক গে, ধীরে-সুস্থে যবে হয় হাজির হওয়া যাবে। মচ্ছবের কোন অঙ্গে খুঁত না থাকে।

হাটখোলার ঘাটে ডিঙি বেঁধে রান্নাবান্না হচ্ছে। এক-চালার ভিতরে তিনটে মাটির ঢেলা বসিয়ে সাহেবদের আলাদা উনুন। চাল-ডাল, নুন-তেল-ঝাল এসেছে। একসঙ্গে ঘুঁটে খিচুড়ি হবে। জুটো পদ্মপাতাও পাওয়া গেল ছাঁচ-বাতাসের দোকানে। পদ্মপাতায় খিচুড়ি ঢেলে হাপুস-হুপুস খেয়ে নিয়ে ক্ষিধে শান্ত করবে! উনুনের সামনে বসে নফরকেষ্টরও ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে এখন।

কিন্তু মুশকিল করল উনুনে। জ্বলে না, কেবলই ধোঁয়ায়। ফুঁ পেড়ে পেড়ে নফরা নাজেহাল। সাহেব বলে, শুকনো কাঠ খানকয়েক কুড়িয়ে আনি। এক ছুটে এনে দিচ্ছি।

গেল তো গেল, ফেরবার নাম নেই।

কাঠ কুড়াতে গিয়ে সাহেব ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। খোঁজাখুঁজি করে নফরকেষ্ট যাতে না ধরতে পারে। চলেছে সোনাখালি গাঁয়ে—পঞ্চানন বর্ধনের বাড়ি যেখানে। বংশীয় আজামশায়—সুবিখ্যাত পচা বাইটা। একালের চোর-চক্রবর্তী—বলাধিকারীর মতো মানুষও যার কথায় শতমুখ হয়ে ওঠেন। ক্ষিধে-ক্ষিধে করে গাবতলির ঘাটে নৌকো ধরানো—মূলে তার এই মতলব। নফরকেষ্টকে ঘৃণাক্ষরে জানতে দেয়নি, জানলে কোনক্রমে ছাড় হত না। হয়তো বা নিজেই পিছন ধরত। বাইটার যা মেজাজ শোনা গেছে, দল বেঁধে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায়।

সোনাখালি বংশীর মতে ক্রোশখানেক পথ। পথের মানুষ যাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে-ও বলে এক ক্রোশ। ডাল-ভাঙা ক্রোশ বলে থাকে—সেই বস্তু নিশ্চয়। একটা ডাল ভেঙে নিয়ে রওনা হলাম—ডালের পাতা শুকাল, তখনই ধরা হবে ক্রোশ পুরেছে এইবারে। আবার মনে হচ্ছে, এ পথ দীনবন্ধু-দাদার দধিভাণ্ড। গল্পে আছে, দীনবন্ধু-দাদা এক খুরি দই দিয়ে গেলেন, শত শত লোক পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে যাচ্ছে! খুরি যতবার উপুড় করে তত আবার ভরতি হয়ে যায়, কমে না। সেই গাবতলির ঘাট থেকেই এক ক্রোশ চলছে—বেলা ডুবে সন্ধ্যা হয়ে আসে, জিজ্ঞাসা করলে এখনো সেই এক জবাব : ক্রোশখানেক এখান থেকে।

এক সময়ে অবশেষে সোনাখালি এসে গেল, পঞ্চানন বর্ধনের কিন্তু খোঁজ হয় না। এত বড় ডাকসাইটে মানুষ, অথচ যাকে বলছে সে-ই হাঁ করে থাকে।

সোনাখালি বলে কেন, তল্লাটের ভিতরেই ও-নামের মানুষ নেই। চিনতে কি তাহলে বাকি থাকত?

অন্ধকারে এক বাড়ির উঠানে গিয়ে পড়েছে। দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে পাটটাকুর নিয়ে মুরুব্বি মানুষটা কোষ্টা কাটছে। মুখ তুলে বাঁ-হাতটা কানের পাশে নিয়ে সে বলে, অ্যাঁ, কী নাম বললে—পঞ্চানন বর্ধন, আমাদের সোনাখালির?

সেই বাঁ-হাত ঘুরিয়ে মাথার উপর বার কয়েক টোকা দিয়ে বলে, ও হয়েছে। পঞ্চানন নয় তিনি, পচা। বর্ধন নয়, বাইটা। পচা বাইটা পঞ্চানন হয়েছে বুঝি! পয়সা করেছে, দালানকোঠা দিয়েছে—দশানন শতানন হলেই বা কে ঠেকায়? উল্টো পথে চলে এসেছ বাপু। দক্ষিণ মুখো ফেরো, ওরা দক্ষিণ পাড়ার লোক। পঞ্চানন নয়, বোলো পচা বাইটা। বরঞ্চ বড় ছেলের নাম ধরেই জিজ্ঞাসা কোরো, মুরারি বর্ধন মশায়ের বাড়ি যাব। সেখানে বাইটা বলে বোসো না কিন্তু—খবরদার, খবরদার! বে-ইজ্জতি হবে। বাপ বাইটা, ছেলে বর্ধন।

সে বাড়ি কদ্দুর?

এক ক্রোশ।

অতএব সাহেব দক্ষিণমুখো পুনশ্চ এক ক্রোশ ভাঙতে চলল।

মানুষটা সন্দিগ্ধকণ্ঠে পিছন থেকে ডাকে: শোন, শুনে যাও। পচা বাইটার কাছে কি তোমার?

সাহেব নিরীহভাবে বলে, কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরছি। বর্ধনমশায়ের নাম শুনলাম। যদি একটা কাজে লাগিয়ে দেন।

ব্যাপার নতুন কিছু নয়। ধান কাটার মরশুম, তার জন্য বিস্তর জনমজুর লাগে। এবং ধান পেয়ে অবস্থা সচ্ছল হওয়ার দরুন ছেলেপেলের বিদ্যাশিক্ষার জন্য হঠাৎ পাঠশালা স্থাপনের প্রয়োজন হয়, অসুখবিসুখ ডাক্তার-কবিরাজের খোঁজ পড়ে। বাদাবনে ঢুকে কাঠ ও গোলপাতা কাটবারও সময় এই, এবং আরও কিছু পরে চাকের মধু ভাঙবার। ডাঙা অঞ্চলের বিস্তর লোক কাজের চেষ্টায় এই সময়টা নাবালে নেমে আসে। হাটে গিয়ে বসে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে।

কী কাজ করবে তুমি?

বাছাবাছি নেই, পয়সা পেলেই হল। ভিক্ষের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! যা-কিছু পাই, লেগে পড়ব।

গৃহস্থমানুষ আমিও, কাজ কি আমার কাছে নেই? রাখালের কাজ করবে তো বলো, এক্ষুনি বহাল করে নিই। ছোট ছেলেটা করত, নতুন পাঠশালা হয়ে

সে এখন পাঠশালায় বসতে লেগেছে। গায়ে ফুঁ দেওয়া কাজ। গরু-বাছুরে মিলে তেরোটা, আর ছাগল দুটো। গাই দোওয়া হয়ে গেল—এক কাঁসর পান্তা আচ্ছা করে ঠেসে নিয়ে টিকিটিকি তুমি গরু-ছাগলের পিছন ধরে বেরুলে। কারো ক্ষেতে গিয়ে না পড়ে। সাঁজের বেলা গোয়ালে তুলে সাঁজাল ধরিয়ে জাবনা মেখে দিয়ে—বাস্‌ ছুটি। মাস-মাইনে চৌদ্দ সিকে, দেশে-ঘরে ফেরবার সময় ধান এক সলি—তার উপর তিন বেলা পেটে খেয়ে যদ্দুর উশুল করে নিতে পার, তাতে কেউ 'না' বলবে না।

সোনার চাকরি—সন্দেহ কি! রাত্রিবেলা কোথায় এখন হুড্ড-হুড্ড করে বেড়াবে! যা গতিক—এক ক্রোশ ভেঙে দক্ষিণপাড়া পৌঁছতে সকাল হয়ে যাবে হয়তো। সাহেব এক কথায় রাজি। বলে, রাখালির উপরেও পারি আমি। লেখাপড়া শেখা আছে খানিকটা ইংরাজিতে নাম দস্তখত পর্যন্ত পারি।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে সেই লোক বলে, বটে, বটে এত গুণ তোমার! তা হলে গোমস্তার কাজটাও নিয়ে নাও না কেন সকালবেলা। গোমস্তাগিরি সারা করে কলম রেখে, পান্তা-টান্তা খেয়ে রাখালিতে বেরুবে। ধান বাড়ি দেওয়ার ব্যবসা আমার। কত ধান কে কর্জ নিয়ে গেল, কার নামে কি পরিমাণ উশুল পড়ল, সেই উশুলের মধ্যেই বা সুদ কত, আসল কত—এ সবের নির্ভুল হিসাব রাখা গোমস্তার কাজ। মাইনে তিন টাকা, আর খাওয়া অমনি তিন বেলা। কিন্তু একলা একটা মানুষ তুমি—তিন বেলার জায়গায় ছ-বেলা খাবে কেমন করে? খেতে চাও কোন আপত্তি নেই। দুই চাকরির মাইনে দাঁড়াল চোদ্দ সিকে আর তিন—একুনে সাড়ে ছয়। ওরে বাবা, লাটসাহেব পেলেও তো বর্তে যান।

নিশ্চিন্তে আহার-আশ্রয়, মাস মাস মাইনের টাকা। রাত্রিবেলা আসল কাজকর্ম—সেই সময়টা পুরো অবসর থাকছে। আর কী চাই। খোশামুদি করে সাহেব কথা আরও পাকা করে নেয়: কপাল ভাল আমার, ভাল জায়গায় এসে পড়েছি।

লুফে নিয়ে মানুষটা বলে, ভাল বলে ভাল! এসেছে পাটোয়ার-বাড়ি—রাতে ঠাহর করতে পারছ না। বাইটারদের শুনে খেতে পারি। আমার নাম দীননাথ পাটোয়ার। পচা বাইটা যখন পঞ্চানন, আমি হতে পারি মহারাজ রাজবল্লভ। হইনে কেন জানো? এখন লোকে একডাকে চেনে, তখন চিনতেই পারবে না। 'মহারাজ রাজবল্লভ' লিখে কপালের উপর সেঁটে বেড়াতে হবে সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে।

তালপাতার চাটকোল এগিয়ে দিল পাটোয়ারমশায়: বোস—

দাওয়ায় উঠে সাহেব মুখোমুখি বসল। আলাপ-পরিচয় হচ্ছে। একবার উঠে গিয়ে গোয়ালের গরু-ছাগল দেখে এলো—হুঁচাল-শিং দামড়াটার মাথায় হাত বুলিয়ে ভাব-সাব করে এলো খানিকটা। রাত পোহালেই চাকরি—দু-দুটো চাকরি একসঙ্গে।

প্রহরখানেক বেলায় গরু নিয়ে বেরিয়েছে। গরু তাড়িয়ে দক্ষিণপাড়ার দিকে গেল। এপাড়া-ওপাড়ায় এমনি কিন্তু পথ বেশি নয়। মাঝখানে বাঁওড় একটা—সেজন্য জলকাদা বাঁচিয়ে রাস্তাপথে অনেকখানি বেড় দিয়ে যেতে হয়। পচা বাইটাকে এক নজর অন্তত না দেখে সোয়াস্তি পাচ্ছে না। খোঁজে খোঁজে বাড়ির সামনে চলে এলো। ভিতর-বাড়িতে পাকা-দালান দু-তিন কুঠুরি আর বাহির-ভিতর মিলিয়ে কাঁচঘর যে কতগুলো, গুণতিতে আসে না। লোকে বলে, চোরের যত বড় রোজগারই হোক বাড়িতে কখনো দালানকোটা হবে না। জোর করে দালান দিতে গেলে পুলিশের হাঙ্গামা কি পারিবারিক দুর্ঘটনা কিম্বা অপর কোন বাধা মাঝখানে পড়ে আয়োজন পণ্ড করে দেবেই। পচা বাইটার বেলা কেবল নিয়মটা খাটল না। একটা কথা এই হতে পারে, দালান-কোঠার সঙ্গে পচার সম্পর্ক কি? একটা রাতও সে পাকা ছাতের নিচে শোয়নি, বাইরের দোচালা খোড়োঘরে তাকে চালান করে দিয়েছে।

সকলের অলক্ষ্যে চারিদিক ঘুরে দেখে সাহেব আপাতত ফিরে গেল। প্রহর দেড়েক রাত্রে ছুটেছে আবার দক্ষিণপাড়ায়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফুড়ুত করে ঘরে ঢুকল। পচা বাইটার সামনাসামনি।

টেমি জ্বলছে। উবু হয়ে বসে পচা ভড়ফড় করে হুঁকো টানছে। আশি বছরের উপর বয়স। তেমাথা মানুষ বলে কথা আছে—এক মানুষের তিন মাথা পাশাপাশি—অবিকল তাই। দুটো হাঁটু দু-দিকে, মাঝখানে পাকাচুল-ভরা আসল মাথাটুকু।

বাপ মারা যাচ্ছেন—ছেলেরা কেঁদে বলে, কেমন করে সংসার চলবে বলে যাও। বেশি বলবার তাগত নেই, মাত্র দুটো কথা বলে গেলেন তিনি: নিত্য মাছের মুড়ো খেও, তেমাথার কাছে বুদ্ধি নিও। পিতৃ-উপদেশে ছেলেরা পুকুরের যাবতীয় রুই কাতলা ধরে ধরে মুড়ো খায়, তেমাথা পথে গিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকে বুদ্ধি নেবার জন্য। এমনি করে ফতুর হয়ে যাবার দাখিল। হঠাৎ এক বুড়োথুত্থুড়ে বিচক্ষণ মানুষের দেখা পেয়ে গেল। তিনি বললেন, তেমাথা আমিই হে। যখন বসি, দুই হাঁটুর ভিতর মাথা হয়ে পড়ে মোট তিন হয়ে যায়। কাতলা নয়, চুনোমাছ কুচোচিংড়ি খেতে বলেছে—গ্রামে

আসে যে মুড়ো গণ্ডা গণ্ডা খাওয়া হয়ে যায়। তার মানে, দিনকাল বুঝে কঞ্জুষ হয়ে চলবে।

পচা বাইটাও তেমনি এক তেমাথা মানুষ।

চোখ বুঁজে আয়েশে হুঁকো টানছিল, পায়ের শব্দে পিটপিট করে তাকায়: কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?

সাহেব বলে, বিদেশি লোক, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি। দীননাথ পাটোয়ার মশায়ের বাড়ি উঠেছি। তিনি একটু কাজ দিয়েছেন।

দীননাথটা কে হল আবার?

চুপচাপ পচা বাইটা ভাবে। বয়সের দরুন বিভ্রম এসেছে হয়তো। কিন্তু এমন কিছু নয়। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, ও, সুখময় পাটোয়ারের বেটা দীনে। একরত্তি মানুষটাকে নিয়ে তুমি আজ্ঞে-হুজুর মশায় করতে লেগেছে—বুঝি কেমন করে?

সাহেব সবিনয়ে বলে, আজ্ঞে একরত্তি তিনি কেমন করে হলেন? গাল দুটো জুড়ে কান অবধি এই মোটা গোঁফের তাড়া—

পচা বাইটা অধীর হয়ে বলে, পেট থেকেই যদি গোঁফ নিয়ে পড়ে, তাই বলে বয়সে বুড়ো বলতে হবে? সাতানব্বুই সালে সেই যে বড় বুড়ি হল, সে আর ক'টা দিনের কথা! সেইবারে দীনের জন্ম। সুখো পাটোয়ার রাত দুপুরে জল ঝাঁপিয়ে নেত্য-দাইয়ের বাড়ি যাচ্ছে, আমি মানা করে দিলাম—নেত্যকে পাওয়া যাবে না। চকসদার পুঁটে চক্কোত্তির বউয়ের প্রসব-বেদনা উঠেছে, বিকাল থেকে নেত্য সেইখানে পড়ে আছে। দাই বিনেই ছেলে হল ভোররাত্রে। ঐ দীনে।

বাংলা বারো-শো সাতানব্বুই সালে বড় বন্যা হয়। লোকের বড় সুখ—

গল্প শোনার মানুষ পেয়ে পচা বাইটা শুরু করে দিয়েছে: উঠোনের উপর এক-হাঁটু এক-বুক জল। লোকের সুখের অন্ত নেই সেই ক'টা দিন। ছাঁচতলায় মাছের আফালি—ঘরের দাওয়ায় জলচৌকি পেতে মনের আনন্দে মাছ ধরে। ঘোলা জলের আবর্ত—তার মধ্যে মাছ খুব খায়, টানে টানে উঠে আসে। চাষবাসের কাজে ভুঁইক্ষেতে যেতে হচ্ছে না—মাছ মারো, খাও আর ঘুমোও। কলসির চাল বাড়ন্ত হবে এবং বন্যার জল সরে গিয়ে ক্ষেতের পচা ধানচারা বেরিয়ে পড়বে একদিন। সে হল পরের কথা। তখনকার ভাবনা ভেবে আজকে সুখ মাটি করা কেন?

সেদিনের গল্প এই অবধি। পরে ঘনিষ্ঠ হয়ে সাহেব গল্পের গূঢ় অংশটুকুও শুনেছে। এক একখানা কাজ নামাবার আগে অনেকদিন—এমন কি এক বছর

দু-বছর ধরে খোঁজদারি করে বেড়াতে হয়। চকদার চক্কোত্তি মশায়দের বাড়ি এবং আরও কয়েকটা জায়গায় খোঁজদারি চলছিল কিছুকাল ধরে। ডাঙার কাজে হাঁটাহাঁটি করে বেড়াতে হয়। কিন্তু বন্যার কারণে শুধুমাত্র দাওয়ায় বসে মাছ ধরা নয়, এসব কাজেও সুবিধা এসে গেছে। ডাঙাই নেই, হাঁটি কোথা এখন? ডোঙা একেবারে মক্কেলের ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে সিঁধ কাটা চলে। ভগবান যখন এতই সদয়, বানের জল থাকতে থাকতে কাজগুলো সমাধা করে ফেলবে। কিন্তু পুঁটে চক্কোত্তির বাড়ির কাজে বাগড়া পড়ল। নেত্য-দাইকে নিয়ে এসেছে, সকলে রাত জাগছে। সেই খবরটাই দিয়েছিল দীনুর বাপ সুখময় পাটোয়ারকে।

কলকে উপুড় করে পচা ঠকাস করে ঘা দিল মাটিতে। তামাক পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। দু-চোখ এতক্ষণে স্পষ্টভাবে মেলে সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে: পাটোয়ার বাড়ি-তো অনেকখানি দূরে। তোমাদের এ বয়সে অবিশ্যি কিছু নয়। তবু যে রাত্তিবেলা চলে এলে, বাঞ্ছাখানা কি শুনি?

মনোগত বাঞ্ছা প্রথম দেখাতেই বলে ফেলতে সাহস হয় না। ভাব বুঝে নিতে হবে আগে। সাহেব বলে, নাম শোনা আছে অনেক। গাঁয়ের উপর এসে পড়েছি, তাই ভাবলাম দেখাশোনা করে আসা যাক। উঠবেন না, উঠতে হবে না। কলকেটা আমায় দেন দেখি, আমি সেজে দিই।

বুড়োকে উঠতে দেয় না: কলকে একরকম হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সাহেব তামাক সাজতে বসে।

ছোকরার খাতির দেখে পচার কণ্ঠ কিছু প্রসন্ন: নাম শুনেছ আমার—কার কাছে শুনলে? কি শুনেছ, কেবলই তো নিন্দেমন্দ—হ্যাঁ?

হাঁটুর মাঝ থেকে উৎসাহ ভরে একটুখানি ঘাড় তুলেছে তো ঘাড়ের কাঁপুনি। কাঁপুনির চোটে কথাই বেরোয় না। আবার যথাস্থানে ঘাড় রেখে বলে, আত্মীয় কুটুম্ব আপনপর মরে গেলেও আজ আমার নাম করতে চায় না। নিজের ছেলে দুটোই তাই, অন্যের কথা কী বলব। বাপের নামে বেটাচ্ছেলেদের লাজ লাগে, লাজে মাথা কাটা যায়।

একবার কেশে গলা সাফ করে নিয়ে বলতে লাগল: কালে কালে রেওয়াজ বদলায়—বুঝলে? আমাদের বয়সকালে কাদিনথের খুব চলন। বিয়ে করে এলাম—মা নথ দিয়ে বউয়ের মুখ দেখলেন। বউ দেখি মুখ ভার করে বেড়ায় —কী না, নথের চক্কোর ছোট, ভাতের গ্রাস নথের ফুটো দিয়ে মুখে ঢোকে না, টান্না দিয়ে নথ সরিয়ে ভাত খেতে হয়। শেষটা নথ ভেঙে অনেক বড় করে

গড়ে দিতে হল। গলায় হাঁসুলি পরে—প্রায় সেই মাপের। আর এখন তো নথ পরা উঠেই গেছে একেবারে। নাক ফুটিয়ে মেয়েলোকে গয়না পরতে চায় না।

শুধু গয়না বলে কেন, হালচাল সব দিক দিয়ে বদলেছে। বোম্বেটে কথাটা সংক্ষেপে করে হল বেটে। তাই থেকে বাঙাল রীতির উচ্চারণ বাইটা। পচার প্রথম বয়সে বাইটা কথার ভারি কদর ভাঁটি-অঞ্চলে। পচা বাপ-পিতামহের বর্ধন উপাধি ছেঁটে বাইটা জুড়ে নিজ নামের উল্লেখ করত। এখন বাইটা নামে লোক নিচু চোখে তাকায়। দুই ছেলে বড় হয়ে আবার বর্ধন হয়েছে—শ্রীযুক্ত বাবু মুরারিমোহন বর্ধন ও শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দমোহন বর্ধন। কিন্তু পিতৃনাম শতেক চেষ্টা সত্ত্বেও, বাইটা মুছে পঞ্চানন বর্ধনে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। সেইজন্যে মনোভাব, বাপ মানুষটাই ভবধাম থেকে মুছে গেলে মন্দ হয় না।

আত্মকথা বলতে বলতে পচা বাইটা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনুপস্থিত দুই ছেলেকে সম্বোধন করে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ওহে শ্রীযুত বাবুরা, তোদের বাবুয়ানিটা নিয়ে এলো কে? জমি, ঘরবাড়ি, আওলাতপশার সবই এই বাইটার রোজগারে। এখন হয়েছে—মানুষটা আমি চলে যাই, বাকিগুলো ষোলআনা বজায় থাকুক। কলিকাল নয়তো বলেছে কেন? দুটো ছেলেই মায়ের রীতচরিত্র পেয়েছে। বেশি হল ছোটটা—সাধু হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে ফুলহাটায় পড়ে থাকে। রাহু কেতু দুটোর দৃষ্টি কি না তার উপরে—ছোট বয়সে মা কানে মন্তোর দিত। বয়সকালে বউ হয়ে যে এলো, সে-ও দিচ্ছে।

রাগের চোটে লম্বা লম্বা দম নিয়ে কলকের তামাক শেষ করে ফেলল। সাহেব তন্মুহূর্তে সেজে দেয় আবার। পর পর তিন-চার ছিলিম চলল। কেউ আসে না সেকালের এক-ডাকে-চেনা মানুষটার কাছে। মানুষ পেয়ে পচা বর্তে গেছে, সাহেবের সবিনয় কথাবার্তা বড় ভাল লাগছে। শেষের ছিলিমটা কয়েক টান টেনে পচা ছুঁয়ে রাখে না, সাহেবের হাতে এগিয়ে দেয়: খাও—

সাহেব বাঁ-হাতের উপর ডান-হাত ধরে তটস্থ ভাবে হুঁকোটা নিয়ে বেড়ার গায়ে ঠেশান দিয়ে রাখল।

পচা বলে, সামনে না খাবে তো আবডালে গিয়ে খাও। হাত্‌নের ওদিকটায় নিয়ে দু-টান টেনে এসো। তামাকটা ভাল, মিছে পুড়িয়ে নষ্ট কোরো না।

এ কথার ভালমন্দ কোন জবাব না দিয়ে একটু চুপ করে থেকে সাহেব বলে, আপনার কাছে এসেছি একখানা-দুখানা গল্প শুনব বলে।

গল্প? গল্পটল্প আমি জানি নে। আমার কাছে গল্প আছে, কে বলল তোমায়?

কোটরগত চক্ষুদুটো যথাসম্ভব বড় করে পচা বাইটা সাহেবকে দেখছে। কী রূপের ছেলে মরি মরি! দেখে চক্ষু শীতল হল। এককালে পচা বাইটা

অঞ্চল তোলপাড় করে বেড়িয়েছে। গল্পে আর কী থাকে, সে জিনিস গল্পের চেয়ে ঢের ঢের আজব। কিন্তু মন্ত্রগুপ্তি—একটা কথাও ফাঁস করতে নেই। যতদিন কাজের ক্ষমতা থাকে, তার মধ্যে তো নয়ই। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় শেষটা, সেরেসামলে ঢেকে ঢুকে জীবন কাটিয়ে একদিন অবশেষে চোখ বোজে। কোন দেশের ছোঁড়া তুমি, ঢাকা ধরে টান দিতে এসেছ।

সাহেবের দিকে তাকিয়ে পড়ে কিছু নরম হয়ে পচা বলে, কিসের গল্প শুনতে চাও? ভূতের বাঘের—?

সাহেব হেসে বলে, আর একটা জিনিস বাদ রাখলেন কেন? সেই গল্প বলেন যদি ছুটো-পাচটা—

[ভাঁটি-অঞ্চলের ছেলেপুলের তিন রকমের গল্পের ঝোঁক। বাঘের গল্প, ভূতের আর চোরের গল্প। :এই তিন ব্যাপার নিয়েই সদাসর্বদা চলাচল—রাজা-রানী-রাজকন্যা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।]

সাহেব বিশদ করে বলে, এই আপনাদের আমলে যা-সমস্ত হত। আপনার মতন ডাকসাইটে গুণী মানুষ সদরে হাকিমের কাছে গিয়ে একবার করলেন—তদ্বির করে পায়ে পায়ে গিয়ে যেন ফাটকে ঢুকে পা—জিনিসটা আমার কেমন-কেমন লাগে।

পচা বাইটা রীতিমতো বিচলিত হয়ে উঠল: কে বলল তোমায়? এত সব খবর জোটালে তুমি কোথা থেকে?

সাহেব বলে, ফুলহাটায় ছিলাম অনেকদিন। আপনার নাতি বংশীর সঙ্গে ভাব—সে-সব বলত। সকলে নিন্দেমন্দ করে বলছেন, বংশী তো দেখলাম আজামশায়ের কথায় পঞ্চমুখ।

পাঁচটা মুখে হুক্কাহুয়া করে, তার উপরে বিশ্বাস করে তুমি এত পথ ছুটে এসেছ? যাও তুমি, বিদেয় হও।

বেজার মুখে বুড়া বলে যাচ্ছে, বংশী আবার একটা মানুষ! কী বোঝে সে, আর কী বলবে? দাও-দাও করে আমায় জ্বালিয়ে মারে। না পেরে শেষটা শেয়াল-কুকুরের ডাক ধরিয়ে দিলাম। নরদেহ হলেও আসলে তো ঐ। যা শালা, জাতকর্ম করে বেড়াগে—

মুখে হাসির চিকচিকানি দেখে সাহেব কিছু সাহস পায়। বলে, আপনার আর এক সাগরেদ গুরুপদও বলে আপনার কথা।

গুরুপদ গিয়ে জুটেছিল? ওটা একেবারে মুখ্যু, এমন কথা বলিনে। কিন্তু যেটুকু গুণজ্ঞান তার শতেক গুণ দেমাক। সেজন্ত কিছু হল না। ঐ যে আমার একবারের কথা বললে, তার জন্যে গুরুপদরও দায় আছে। আমার

কাটক হলে গুরুপদ এদিককার কাজকর্ম ছেড়ে কেনা মল্লিকের সঙ্গে জুটেছিল। সেখানে তো শুনি নৌকোর উপরে দাঁড়ে বসিয়ে রাখত, আর কোন কাজ দিত না। বয়স হয়ে গিয়ে এখন আর দাঁড়ের কাজও পারে না।

সইয়ে সইয়ে সাহেব টান দিচ্ছে, বেরুচ্ছেও কথা। বলে, গুরুপদকে সর্দার ধরে আমরা একটা কাজে গিয়েছিলাম এর মধ্যে।

শিউরে উঠে চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে পচা বলে, আরে সর্বনাশ! বেরিয়ে এসেছ ভালোয় ভালোয়—এমন তো হবার কথা নয়। ওস্তাদের আশীর্বাদের জোর বলতে হবে। ওস্তাদ কে তোমার বাপু?

সাহেব মুখ চুন করে বলে, সে ভাগ্যি আর হল কোথায়? কার দয়া পাব—আশায় আশায় তল্লাট ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছি। পাকেচক্রে জগবন্ধু বলাধিকারী মশায়ের কাছে গিয়ে পড়েছিলাম। তিনি তো গুরু-ওস্তাদ নন, মহাজন।

পচা বলে, ওস্তাদ না-ই হোক, তা-বড় তা-বড় ওস্তাদের কান কেটে দিতে পারে সেই মানুষ।

দেখা গেল, বলাধিকারী যেমন পচার কথায় মেতে ওঠেন, পচারও ঠিক সেই ভাব বলাধিকারীর নামে। কিন্তু পয়লা দিন আর অধিক নয়। মানুষটা রগচটা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বংশীর কাছে অনেক শুনেছে। তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়, ধৈর্য ধরে চেপে বসে তবে যদি কিছু আদায় হয়। তক্ষুনি ওঠে না তা বলে। নিরীহ গোছের ছাড়া-ছাড়া গল্প হল কয়েকটা। হয়তো বা পচার নিজেরই, কিন্তু বলল পরের নাম করে। যথেষ্ট হয়েছে, থাক এখন এই পর্যন্ত।

চলল এইরকম। তাড়াতাড়ি গোয়ালের কাজ সেরে নাকে-মুখে কোন গতিকে দুটো ভাত গুঁজে সাহেব চুপিসারে পাটোয়ার-বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির লোকে জানে, সারাদিন খাটাখাটনি করে ছোঁড়া সকাল সকাল শুয়ে পড়েছে। ওদিকেও জমে আসছে—পরের বেনামি গল্প হতে হতে এখন স্পষ্টাস্পষ্টি পচার নিজের কথা। সংসারসুদ্ধ লোকের উপর পচার রাগ—ছোটছেলে মুকুন্দর উপর সকলের বেশি। বাপের নাম পরিচয়ের লজ্জা, সেজন্য বাড়ি ছেড়ে বেরুল। কালেভদ্রে যখন বাড়ি আসে, উঠানের উপর রামায়ণের আসর বসায়। বাপের কাছেও ধর্মকথা শোনাতে যায়, এত বড় আস্পর্ধা। হুবহু মায়ের স্বভাব পেয়েছে—সেই রমণী যতকাল বেঁচে ছিল, কায়দায় পেলেই ভাল লোক হবার জন্য মাথা খুঁড়ত বাইটার কাছে। নানান ফন্দি আটত।

ছয়

নিধিরাম নাথের বাড়ি চুরি। ভাঙা কুড়েয় পড়ে থাকে লোকটা। কুষ্ঠব্যাধি—পচে গলে এক এক অঙ্গ খসে পড়ছে। একটা কবিরাজী পাঁচন কিনে খাওয়া সঙ্গতিতে কুলায় না। সেই লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে থানায় এসে চুরির ফর্দ দেয়। ফর্দ শুনে বড়বাবু-ছোটবাবু, মুন্সি-বরকন্দাজ থানাসুদ্ধ সকলের চক্ষু কপালে ওঠে। থান থান সোনার মোহর, ঘটি-ভরা রূপোর টাকা। বিধবা বোন থাকে সংসারে, সদরের উপর তার বেনামে ফলাও কাপড়ের ব্যবসা। মালিক বোন অবধি তার বিন্দুবিসর্গ খবর রাখে না। ত্রিসংসারের মধ্যে ধন-সম্পত্তির খবর জানে একমাত্র কুটে-নিধিরাম।

আর জানত চোরে, যাদের ভয়ে এতদূর সামাল-সামাল করে বেড়ায়। ঠিক এসে তুলে নিয়ে গেছে। এজাহার দিতে এসে নিধিরাম ঢিবঢাব করে বুক থাবড়ায়: নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকি আমি—কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। রোগের কষ্টে আপন ঘরে শুয়ে ছটফট করি, রাতের মধ্যে ঘুম হয় না। বলি, খুব ভাল, যক্ষি হয়ে মাল আগলাচ্ছি, চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাত বাড়াতে হবে না। বলব কি বাবুমশায়রা, চোর যেন মাটির গন্ধ শুঁকে শুঁকে জায়গার নিরিখ করেছে। ইঞ্চি ধরে মাপ করে এসেছিল—যেখানটা মাল, ঠিক সেইটুকু গর্ত খুঁড়েছে। এক বিঘত এদিক-ওদিক নেই। তারই হাত তিনেক দূরে আমি বেহুঁশ হয়ে আছি।

থানায় তখন বটুকদাস রাউত—অত বড় ঘড়েল দারোগা হয় না। বটুকদাস বলেন, ঐ তিনটে হাত ঠেলে তোকেও কেন গর্তে ফেলে কবর দিয়ে দিল না? চিরকাল ধরে ঘুমুতিস।

নিধিরাম হাউহাউ করে কেঁদে উঠল: সেইটে হলে বেঁচে যেতাম বড়বাবু। খালি ঘরে কেমন করে থাকব! মোটে ঘুমুইনে—সে সময়টা কী কালঘুমে যে ধরল আমায়।

পিছনের জানলায় আড়চোখে একটু দেখে নিয়ে বটুকদাস কথার মাঝখানে হঠাৎ বলেন, সেই থেকে তো উপোসি রয়েছিস—কিছু খেয়ে নে, ওদের বলে দিচ্ছি। তারপরে সব শোনা যাবে।

পচা বাইটা নিজের নামেই বলে এখন। হাকিমের কাছে গিয়ে কাজের

ব্যাপার নিজেই স্বীকার করেছিল, সেই গল্প উঠেছে। সাহেব কৌতূহলে প্রশ্ন করে, সত্যিই তো। কুটে-নিধে মাটির নিচে মাল রেখেছে, টের পান তা কেমন করে?

সেকালের অনেক তুকতাক বলাধিকারীর কাছে শোনা আছে। মায়া-অঞ্জন—চোখে লাগিয়ে নিজে তো অদৃশ্য, সেই সঙ্গে দুটো চোখে এমন জোর আলো এসে যায়, পাতালের তলে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় মাল লুকানো থাকলেও নজরে পড়ে যাবে। মৃচ্ছকটিক নাটকে আছে মন্ত্রপূত বীজ—ঘরে ঢুকে মেঝের উপর বীজ ছড়িয়ে দিন, মাটির নিচে মাল পোঁতা থাকে তো খইয়ের মতন ফটফট করে বীজ ফুটে যাবে। মাল না থাকলে যেমনকার বীজ তেমনি। কথারত্নাকরে একরকম শিকড়ের উল্লেখ আছে—বাক্স-পেঁটরায় শিকড় বুলিয়ে মালের হদিস পাওয়া যায়। দশকুমারচরিতে যোগচূর্ণ আর যোগবর্তিকার কথা পাওয়া যায়। যোগচূর্ণ মায়াঅঞ্জনেরই রকমফের—চোখে লাগাতে হয়। যোগ-বর্তিকা জ্বালিয়ে দিলে গৃহস্থের চোখে ধাঁধাঁ লাগবে, চোর দেখতে পাবে না। কিন্তু সেই আলোয় সব বমাল চোরের নজরে পড়বে।

এসব সেকালের পুঁথিপত্রের ব্যাপার। মানুষ এখন তুকতাক শিকড়-বাকড় মানতে চায় না। হাল আমলের কায়দাটা কি? সাহেব জিজ্ঞাসা করে: সত্যিই কি মাটির গন্ধ শুঁকে নিধিরামের মালের খবর বুঝে নিলেন?

গল্প অবধি পচা উঠেছে বটে, কিন্তু এমনি সব প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। অথবা চুপচাপ গম্ভীর হয়ে পড়ে। আজকে একটা মোক্ষম তুলনা দিল হঠাৎ। সেই তুলনা সাহেবের সারাজীবন মনে থেকে গেল।

বাইটা হেসে বলল, অন্তর্যামী আমরা—তা বুঝি জানো না? আকাশের দেবতা অন্তর্যামী, আর ভবসংসারে সিঁধেল চোর। চোখে সব দেখতে পাই, টের পাই সমস্ত।

বর্ণে বর্ণে সত্য, পরবর্তীকালে সাহেব খাটিয়ে দেখেছে। দরকারে লাগুক আর না লাগুক, অঞ্চলখানা নখদর্পণে রাখতে হয়। আশালতার গয়না চুরি করল, মধুসূদনের তারপরে তড়পানি: বাড়িটা আমাদের না চোরের? বাঁশতলায় দাঁড়িয়ে কেষ্টদাস শুনে এসে বলেছিল। হাসির কথা—জানে না, সেইজন্য বলে। আইন মতে স্বত্ব তোমার বটে, কিন্তু দৈবাৎ কোন এক নিশীথে পুরোপুরি অধিকার নিশিকুটুম্বর হয়ে যায়। বাড়ির খুঁটিনাটি খবর অনেক বেশি জানে সে তোমার চেয়ে। মানুষজন গরুবাছুর গাছগাছালি খানাখন্দ সমস্ত। নিজের জিনিস—সেই দেমাকে তুমি কখনো অতশত খুঁটিয়ে জানতে যাও না।

আরও আছে। তুমি শুয়ে পড়লে, তারই মধ্যে কত-কিছু পরিবর্তন হয়ে

গেছে। দরজার মুখে হয়তো শেয়াকুলের কাঁটা, বেরুতে গিয়ে কাঁটায় জড়িয়ে পড়বে। অথবা নোংরা বস্তু কিছু—পা হড়কে রাতদুপুরে নরক-ভোগ। তার উপরে কাঁচা ঘুমের মধ্যে উঠে পড়েছ, ঘুম লেগে রয়েছে চোখে। সতর্ক সক্ষম চোরের সঙ্গে পারবে তুমি? আধিপত্য তারই তখন। মুখে তড়পালে কি হবে!

নিধিরামের সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলেই বটুক দারোগা বুঝেছেন, পচা বাইটার পাকা হাত রয়েছে এই কাজে। আগেভাগে ঘাঁটা দিয়ে লাভ নেই, তাতে বরঞ্চ সতর্ক করে দেওয়া হবে। বড় মাছ ধরবার যে কায়দা—বেড়জাল দূরে দূরে নামিয়ে দিয়ে ক্রমশ আঁটো করে নিয়ে আসা। অত্যন্ত চুপিসারে সেই আয়োজন চলছে।

এমনি সময় অভাবিত সুযোগ এসে গেল। কাজের মধ্যে গুরুপদও ছিল সুযোগ করে দিল সে-ই। এমন একখানা কাজ নামিয়ে এসে ধরাকে সরা দেখছে সে এখন। মাথায় মুকুট পরে অকস্মাৎ যেন রাজচক্রবর্তী হয়ে বসেছে—দুনিয়ার কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। কুটে নিধের বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। এয়ারবন্ধুদের মধ্যে বলে, কাজ করা বুঝি কেবল পয়সার জন্যে? পয়সা তো মাথায় মোট বয়েও রোজগার হয়। পয়সা আমাদের কাজের উপরি-লাভ। পাই তো ফেলে দেব না, না পেলেও হা-হুতাশ করব না। ইঁদুরের মতন ঘরের মধ্যে ঢুকে—কুটে-নিধে রোগের কষ্টে দিনরাত ছটফট করে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে কাজ হাসিল করা হল—এইসবই তো আসল। মাটি খুঁড়ে সোনার মোহর না উঠে যদি হাঁড়িকুড়ির চাড়াই খানকয়েক উঠত, কী আসে যায়! যে শুনেছে ধন্য ধন্য করছে—খোদ মক্কেল নিধেটাই বা কি বলে কানে শুনতে হবে না? না-ই যদি শুনব, কষ্ট করা কেন তবে?

অথচ গুরুপদ মক্কেলের ঘরে ঢোকে নি, বাড়ির উঠান অবধিও আসতে হয় নি তাকে। সে শুধু পাহারাদার। তা-ও পয়লা-দোসরা নয়, তিন নম্বরের পাহারাদার। বাড়ির চতুঃসীমার বাইরে তার ঘোরাঘুরি। কোন লোক বাড়ির দিকে আসছে দূরে থাকতেই গুরুপদ সাড়া দিয়ে জানাবে। তাকে পার হয়ে আরও দু-জন। সেই মানুষটার এত দেমাক!

কুটে-নিধি থানায় এজাহার দিতে গেল। গুরুপদ থাকতে পারে না, অলক্ষ্যে তার পিছন ধরে চলেছে।

এয়ারবন্ধুরা অবাক হয়ে যায়: সাহস বলিহারি তোর! গাঁ ছেড়ে গঞ্জের থানায় পুলিশের খপ্পরের মধ্যে গিয়ে উঠলি!

গুরুপদ বলে, অঞ্চল জুড়ে যশ গাইছে, তাতে ঠিক মন ভরল না। পথ ঘাটের কথা কানে যাচ্ছে, থানার সরকারি লোকে কি বলে শুনতে চাই।

কথা শুনবার মতলব নিয়ে গুরুপদ থানার দালানের পাশে জানলায় কান দিয়ে দাঁড়াল। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমশ সাহস বেড়ে যায়— জানালার কবাট একটুখানি ঠেলে দিয়ে কান ভিতর দিকে আরও বাড়ল। চতুর বটুকদাস দেখতে পেয়েছেন। নিধিরামকে বলেন, খেয়ে নে তুই কিছু, তারপরে আবার শোনা যাবে। সিপাহিদের চোখ টিপে দিলেন, দুজনে দু-দিক দিয়ে গিয়ে গুরুপদর দুটো হাত চেপে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে বটুক দারোগাও গিয়ে পড়েন।

সমস্ত বীরত্ব কর্পূরের মতো উবে গিয়ে গুরুপদর কাঁদো-কাঁদো অবস্থা। বলে, গঞ্জে কেনাকাটা করতে এসেছি, আমি কিছু জানিনে বড়বাবু। চেনা মানুষটা থানায় এসে উঠল—ভাবলাম, কি বলছে একটুখানি শুনে যাই।

বটুকদাস হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: তুড়ুমে নিয়ে তোল ওকে।

তুড়ুম যন্ত্রণা দেবার যন্ত্র—দুখানা জোড়া কাঠে অর্ধচন্দ্রের আকারে খাঁজ কাটা। আসামীর পা খাঁজে ঢুকিয়ে পেষণ করে। বাপ বাপ বলে পেটের কথা ছিটকে বেরোয়।

তুড়ুমের কাছে এসে গুরুপদর আর্তনাদ: আমি চুরি করিনি। বাপ-পিতামহ-চোদ্দপুরুষের নামে কিরে করছি। তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে কিরে করছি।

বটুক দারোগা হুকুম দিলেন: শুইয়ে ফেল তুড়ুমের উপর।

বীর গুরুপদ দারোগার পা দুটো জড়িয়ে ধরে: রক্ষে করুন ধর্মবাপ। আমি করিনি, পচা বাইটা—

দারোগার কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে অতি মোলায়েম। কনস্টেবলকে হুকুম দিলেন: গুরুপদবাবুর জন্য মিষ্টিমিঠাই নিয়ে এসো। আসুন গুরুপদবাবু, আমার ঘরে বসে খাবেন।

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বুঝে নিয়ে বটুক-দারোগা সদলবলে পচা বাইটার বাড়ি রওনা হলেন। শেষরাত্রে পৌঁছে নিঃশব্দে ভোরের অপেক্ষায় আছেন। টের না পায়, তাহলে সরে পড়ার চেষ্টা করবে। ঢেঁকিশালে ঢুকে ঢেঁকির উপর পা ঝুলিয়ে বসে পড়লেন—

সেখানেও আশ্চর্য ব্যাপার অপেক্ষা করে আছে। সবেমাত্র বসেছেন, পচা বাইটা যেন পাতাল ফুঁড়ে উদয় হয়ে বলল, আপনি ঢেঁকিশালে এসে বসলেন— লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে বড়বাবু। গরিবমানুষ হলেও ঘরদুয়োর আছে তো এক-আধখানা।

অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে বটুক দারোগা আরও বেশি রকম রেগে উঠলেন : খানাই পানাই করে আমায় ভুলাতে পারবে না। প্রমাণ পকেটে নিয়ে এসেছি!

পচা বলে, এই দেখুন, ভোলাতে কে চায় আপনাকে? গুরুপদ যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। থানায় গিয়ে আমিই একরার করতাম, তা এই দেখুন অবস্থা। পা দেখাচ্ছি, অপরাধ নেবেন না বড়বাবু। প্রমাণ না দিলে চোরের কথা বিশ্বাস করবেন কেন?

ডান-হাঁটুর কাপড় তুলে দেখাল। ফুলে ঢোল। কী সব তেল লাগিয়েছে, অতিশয় দুর্গন্ধ। পা ফেলতে পারছে না মাটিতে। টিপে না দেখে দারোগার তবু প্রত্যয় হয় না। গায়েও জ্বর।

কি হয়েছিল রে?

বন্ধুলোকের কাছে যেন খোলাখুলি গল্প করছে—পচা বাইটা বলে, বিস্তর পেয়ে গেলাম, কুটে মানুষের ঘরের মেজেয় রাজার ভাণ্ডার কে ভাবতে পারে বলুন। স্ফূর্তির চোটে পথ তাকিয়ে দেখিনি, খানায় গিয়ে পড়লাম। ভাই-বোন দুটোয় আঙুল মটকে শাপশাপান্ত করছে। তারই খানিকটা ফলে গেল। পায়ের হাড়গোড় চুরমার হয়েছে বলে ঠেকে। সেই থেকে ঘরে আছি, তাড়শে জ্বর! আজকে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল, না উঠে তো পারি নে। এই দু-পা আসতেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

কাতর হয়ে পড়েছে সত্যি। দু-হাতে ডান-পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়েছে। একটু দম নিয়ে বলে, লোকে ভয় দেখাচ্ছে বড়বাবু, খোঁড়া হয়ে চিরকাল পড়ে থাকবি। প্রাণে বেঁচে থাকব, কাজকর্ম কিছু হবে না—তার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। সদরে বড় ডাক্তারকে একবার দেখাতে পারলে হত—কিন্তু একে মুখ্যমানুষ আমি, তার উপরে গরিব।

পচা বিরস মুখে তাকিয়ে থাকে। খোঁড়া পা নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে থাকবে, অথবা পা পচে গিয়ে অক্কাই পেয়ে যাবে, এমন উপাদেয় কথা বাইটার স্বমুখে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না। ফোলা হাঁটু আরও খানিকটা টিপে দেখে তবে দারোগা নিঃসন্দেহ হলেন।

বললেন, থানায় চলে আয়। ওখানে গিয়ে যা করবার করব। গরুর-গাড়িতে যত্ন করে নিয়ে যাব, কষ্ট হবে না।

থানায় যেতে পচার আপত্তি নেই, কিন্তু গরুর-গাড়িতে নয়। পথ খারাপ, চাকা খানাখন্দে গিয়ে পড়বে, ঝাঁকিতে জীবন থাকবে না।

বটুক-দারোগা প্রস্তাব করেন : পালকিতে বেহারার কাঁধে চেপে চল্ তা হলে!

পচা বাইটা রাজি হয়েও বলে, বেটাদের পালকিগুলো যেন এক-একটা পায়রার খোপ। মুশকিল হল বড়বাবু, আমি তো গুটিসুটি হয়ে যেতে পারব না। পায়ে লাগবে।

বড়-পালকির ব্যবস্থা করছি তোর জন্যে। বিয়ের বর যে রকম পালকি চেপে যায়। ষোল বেহারা হুমহাম কার নিয়ে যাবে। তোদের বিয়ে তো পায়ে হেঁটে। পালকি চাপা বাকি ছিল—সেই সুখটা এদ্দিনে হয়ে যাচ্ছে।

থানায় নিয়ে এসে সাক্ষিসাবুদের সামনে যথারীতি একরারনামা লেখাপড়া হল। চুরির যাবতীয় বৃত্তান্ত পচা গড়গড় করে বলে যায়, জেরা করতে হয় না। বুড়ো আঙুলে নিজেই কালি মাখিয়ে এগিয়ে ধরে: নিয়ে আসুন।

দলিলের উপর টিপসই দিল পচা, আঁকাবাঁকা অক্ষরে নামসইও করল।

বমাল?

পচা মুখ টিপে হাসল এবার। বলে, বমাল চলে গেছে মহাজনের কাছে। যা আমাদের নিয়ম। তার পরের খবর জানি নে, জানবার কথাও নয়।

মহাজনটা কে বলে দাও তা হলে।

পচা বলে, নিজের উপরে ষোলআনা এক্তিয়ার, যদ্দুর খুশি বলতে পারি। নিজের বাইরে সিকিখানা কথাও পাবেন না বড়বাবু। বলতে পারেন, গুরুপদও দলের মানুষ। সব দলেই ওরকম ঘরভেদী বিভীষণ থাকে একটা-দুটো। যে অবধি বলবার সম্পূর্ণ বলে দিয়েছি, এ ছাড়া আর কিছু নেই। যা করতে হয় করুন এবারে আপনারা।

দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলে একেবারে চুপ হয়ে গেল। খুন করলেও এর উপরে বেরুবে না, নিঃসন্দেহ সকলে। কিছু সলা-পরামর্শ চলে নিজেদের মধ্যে। বটুক বলেন, ঠিক আছে। পালের গোদটা তো সামনের উপর থেকে সরে যাক। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করে দিই। মহাজন-ডেপুটিগুলোকে বের করে ফেলতে তখন আর দেরি হবে না।

ষোল বেহারার পালকিতে তুলে পচাকে ঘাটে নিয়ে গেল। সেখান থেকে পানসিতে খুলনার সদরে—সিবিলিয়ান ম্যাজিস্ট্রেট রিচার্ডসনের এজলাসে।

কতকালের কথা, কিন্তু আজও লোকে রিচার্ডসনের নাম করে। পাগলা সাহেব, কিন্তু মানুষটা বড় ভাল। মস্ত বনেদি ঘরে নাকি জন্ম। নিমকির সাহেব, জুট-কনসারনের সাহেব, পুলিস সাহেব ইত্যাদি নিয়ে এক খুলনার উপরেই সাহেব-মেম আট-দশটা। রিচার্ডসনের কারো সঙ্গেই তেমন মেলামেশা নেই। ঘেন্না করে তাদের। বলে, ছোট বংশে জন্ম—চেহারা মানুষের, কিন্তু

বিলাতি ঘোড়া-ভেড়াই ওগুলো। কোন একটা চাকরি দেবার সময় রিচার্ডসন সকলের আগে জাত-কুল জিজ্ঞাসা করে নেয়। কুলীন-সন্তান—বিশেষতঃ মুখ্য-কুলীন হলে সে মানুষের নির্ঘাৎ চাকুরি।

কাছারির আমলা-কর্মচারীর অসুখে সাহেব চিকিৎসার ব্যবস্থা দিত। অসুখ যাই হোক, ওষুধ একটি মাত্র…শ্রীফল অর্থাৎ বেল। মাথা ধরেছে—বলে, শ্রীফল খাও। কাশি হচ্ছে—বলে, শ্রীফল খাও! পেট নামছে—বলে, শ্রীফল খাও। পরের দিন। জিজ্ঞাসা করবে: খেয়েছিলে শ্রীফল, আছ ভাল?

ঘাড় নেড়ে বলতেই হবে শ্রীফল খেয়ে নিরাময় হয়েছে।

আর ছিল—শড়কি-বন্দুকে অগ্রাহ্য করে বড় বড় দাঙ্গার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত, কিন্তু কাকের ডাক সইতে পারত না। কাক ডাকলে পাগল হয়ে উঠত। কাছারির সামনে শিরিষগাছের উপর কাকে কা-কা করে উঠেছে তো এজলাসের ভিতর মামলা করতে করতে রিচার্ডসন আর্তনাদ করে: খুন করল গো, তাড়াও—তাড়াও—। নথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে কাঁপতে কাঁপতে খাসকামরায় ঢুকে দরজা এঁটে দেয়। তিনটে চারটে মানুষ সেইজন্য বহাল হল—লাঠি ও লগি নিয়ে তারা ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কাছারির সময়টা কোন গাছে কাক এসে বসতে না পারে।

আরও কত, বলতে গেলে মহাভারত হবে। গাইগরু কিনেছে সাহেব, কেনার সময় দুধ দশ সের দেখে নিয়েছে। কুঠিতে এসে গরু তিন-চার সেরের বেশি দেয় না। সাহেব রেগে খুন। গরুর পিঠে এবং যে গোয়ালা গাই দুইছে, তার পিঠে ছড়ির ঘা।

গোয়ালা বলে, আর আসব না—গরু দুধ না দিলে আমি কোথায় পাই? খাস বেহারা তখন বুদ্ধি বাতলে দেয়: হাঁড়িতে আগে-ভাগে দুধ রেখো, সেই হাঁড়িতে দুয়ে সাহেবের সামনে ভজিয়ে দিও। তারপরে আর কে দেখতে যাচ্ছে, তোমার দুধ ফেরত নিয়ে যাবে তুমি।

তাই। দুধ মেপে দশ সেরের জায়গায় হল বারো সেরের উপর। রিচার্ডসন গর্বভরে বুকে থাবা দেয়: দেখলে? ছড়ির ঘায়ে দুধ বেরিয়ে গেল। গোয়ালাকে দু-টাকা বখশিস সঙ্গে সঙ্গে।

পনের দিন অন্তর বিলাতের ডাকের জাহাজ ছাড়ে কলকাতা থেকে। সেই তারিখের দিন চারেক আগে থেকে রিচার্ডসনের চিঠি লেখা শুরু হত। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, লিখেই যাচ্ছে। খাসকামরায় বসে বসে লিখছে, এমনি সময় মামলার রায় নেবার জন্য আমলা এসে উপস্থিত। রিচার্ডসন বলে, নথি পড়ে যাও আমি সব শুনছি।

পড়তে পড়তে একসময় আমলা চুপ করল। রিচার্ডসন বলে, কি হল, থেমে গেলে কেন ?

শেষ হয়ে গেছে হুজুর।

ঘাড় না তুলে হুজুর রায় দিল : তিন মাস ফাটক, দশটাকা জরিমানা।

আশ্চর্য হয়ে আমলা বলে, খাজনার মোকর্দমা যে হুজুর—

খিঁচিয়ে উঠে রিচার্ডসন বলে, দেওয়ানি না ফৌজদারি আগে থেকে বলবে তো সেটা। আছ কি জন্যে সব ? ফাটক জরিমানা কেটে ডিসমিস লিখে নাওগে যাও।

এমনি বিস্তর গল্প রিচার্ডসনের নামে। বটুক দারোগা পচা বাইটাকে তার কাছে পাঠালেন। থানার ছোটবাবু ও কয়েকজন সিপাহি সঙ্গে এসেছে, বটুক নিজে আসেন নি। পচার সঙ্গীসাথী ও বমাল বের করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছেন তিনি, এই সময়টা থানা ছাড়লে তদ্বিরের গোলমাল হয়ে যাবে।

রিচার্ডসন একরারনামা পড়ল। বাংলাটা ভাল শিখেছে, বলেও ভাল। আদ্যোপান্ত মনোযোগ করে পড়ে বলে, সই তোমার ?

আজ্ঞে।

যা লিখিত আছে, সমস্ত সত্য ?

পচা বাইটা অম্লানবদনে বলে, কি লিখেছে আমি বিন্দুবিসর্গ জানি নে। সই করতে বলল, করে দিলাম। পা ভেঙে বিছানায় মাসাবধি শুয়ে আছি, এর উপরে মারধোর সহ্য করার ক্ষমতা নেই হুজুর।

রিচার্ডসন দলিলটার দিকে চোখ রেখে বলে যায়, নিধিরাম নাথের বাড়ির চুরি তোমারই কাজ, সরলভাবে স্বীকার করে যাচ্ছ তুমি—

পচা বলে, বহুত দয়া যে চুরির কথা লিখেছেন। ছ-মাস ছ-মাসের জেল। ডাকাতি আর সেই সঙ্গে একটা দুটো খুনের কথা লিখে দিলে তো ফাঁসিই হয়ে যেত হুজুর।

মুহূর্তকাল পচার মুখে চেয়ে থেকে খামখেয়ালি ম্যাজিস্ট্রেট বলল, কিছুই হবে না, বেকসুর খালাস তুমি।

খানিকটা ইতস্তত করে পচা বলল, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, হাজতে পাঠাবেন হুজুর আমায়। তৈরি হয়েই এসেছি।

কিন্তু রিচার্ডসনের মেজাজ দরাজ এখন। বলে, দোষের যখন প্রমাণ নেই, হাজতে কেন পুরব ? মহান বৃটিশ-আইন বলে, এক-শ দোষী মুক্তি পেয়ে যাক কিন্তু একজন নির্দোষীর অঙ্গে হাত না পড়ে। আমার জাতি এই কারণে এত

বড়। দারোগাদের আমি সতর্ক করব, সন্দেহের উপর মানুষকে ভবিষ্যতে কষ্ট প্রদান না করে। তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত পঞ্চানন, যথা ইচ্ছা চলে যাও।

সঙ্গের ছোট-দারোগা রাগে গরগর করছে, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মোলায়েম কণ্ঠেই বলতে হয়। বলে, ওঠ্, গিয়ে পানসিতে, তা ছাড়া আর কোন চুলোয় যাবি? ঘাটে পৌঁছে আবার সেই ষোল-বেহারা খুঁজব।

বটুক-দারোগাও বসে নেই। পচাকে সদরে পাঠিয়ে দিয়ে তোলপাড় লাগিয়েছে—বমাল চাই, মহাজন মানুষটাকেও চাই। গুরুপদ পচা বাইটার খবর বলল, তারপর লোকটা একেবারে ফৌত। থেকেও লাভ ছিল না। নিতান্ত বাইরের মনুষ্য, গূঢ় বৃত্তান্ত সে কিছু জানে না—ধুরন্ধর বটুকনাথ বুঝে নিয়েছেন সেটা ভাল মতো।

প্রতি সোমবারে এলাকার সমস্ত চৌকিদার থানায় এসে হাজিরা দেয়। বিধি এই রকম। সোনাখালির চৌকিদার এসেছে। তাকে আলাদা ডেকে বটুক দারোগা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পচা বাইটার বাড়ির লোকে হয়তো জানে—পচা নেই, এই সুযোগে চাপাচাপি করলে কিছু আদায় হতে পারে।

চৌকিদার বলে, বউয়ের সঙ্গে বনিবনাও নেই। পচা আর পচার মা একজোট, বউ আলাদা। সেই যে কোমরে দড়ি দিয়ে পচাকে টানতে টানতে নিয়ে এল, তার পরেই শাশুড়ী-বউয়ে তুমুল ঝগড়া। বউয়ের গলাধাক্কা দিল শাশুড়ি, বউ এখন বাপের বাড়ি গিয়ে আছে।

ভাল খবর, আশার খবর। রাগের বশে বউ বলে দিতেও পারে। বাপের বাড়ির গ্রাম দূরবর্তী নয়, এলাকার ভিতরেই। বটু-দারোগা লোক পাঠালেন, ভাইকে সঙ্গে করে বউ থানায় চলে এলো।

অল্পবয়সি, চেহারা মন্দ নয়। ভাইটা চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে। সে-ই শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছে। দারোগার পা জড়িয়ে ধরে বউ কেঁদে পড়ল: বাঁচান বড়বাবু।

ভয় পেয়েছে, বটুক-দারোগা তার উপর আরও ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চান। বলেন, আমি বাঁচাবার কে! খামখেয়ালি ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে গিয়ে পড়েছে, হাতে মাথা কাটে। তবে এখনো যদি সরলভাবে সমস্ত বলেকয়ে মালপত্র বের করে দিস, দয়া হয়ে যাবে। নইলে পাঁচ-সাত-দশ বছর অবধি ঠেলে দিতে পারে। একেবারে মাথা পাগল তো!

পুলকিত হয়ে উঠে বউ তাড়াতাড়ি বলে, তাই যেন দেয় বড়বাবু। নেহাৎ পক্ষে পাঁচটা বছরের কম না হয়।

ভাই এবারে বাকিটুকু বুঝিয়ে দিচ্ছে: ভাই-বোনে নাবালক আমরা তখন, মামা কর্তা। টাকাকড়ি খেয়ে মামা চোর পাত্তর এনে জোটালেন। কিন্তু

পান্তরের পুরো খবর মামাও বোধ হয় টের পান নি। মনের ঘেন্নায় তিন তিন বার বোন গলায় দড়ি দিতে গেছে। খুব লম্বা মেয়াদে যদি ফাটকে নিয়ে পোরে, ভেবে নেব বোন আমার বিধবা। আর ঐ বুড়ি শাশুড়ীরও তখন ডাঁট থাকবে না, কেঁচো হয়ে যাবে।

বটুক-দারোগা সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে নেন: সেই জন্যেই তো বলছি মালপত্র বের করে দিতে। পাজি আইন আজকালকার—বমাল বিনে মামলা টেঁকানো মুশকিল। হয়তো দেখবি, খালাস হয়ে বাড়ি ফিরে ডবল করে তোদের জ্বালাচ্ছে।

বউ বিপন্ন কণ্ঠে বলে, আমি তো দলের বাইরে, মালপত্রের কথা আমায় কিছু বলে না। বুড়ি মাগি জানে সব। ধরে এনে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ওটাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিন, পেটের কথা সব বমি হয়ে বেরুবে।

দারোগা ভেবে নিয়ে বললেন, ভাই-বোনে যাসনে তোরা এখন। বুড়িটা আসুক। দুপুরটা এইখানে থাক।

খুব রাজি তারা। গলাধাক্কা দিয়েছিল, খোয়ারটা দেখবে এইবার। নয়ন ভরে দেখে যাবে।

রাত দুপুর। ঘরে-বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে পচা বাইটা গল্প করছে। মুখোমুখি সাহেব। বলতে বলতে কথার মাঝখানে হঠাৎ পচা চুপ করে যায়। ফিসফিসিয়ে বলে, মানুষ—

সাহেব চোখ তুলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাইরে তাকায়। বলে, দেখতে পাইনে তো।

পচা খিঁচিয়ে উঠল: চোখ আছে কি তোমাদের দেখতে পাবে! দুনিয়াসুদ্ধ কানা। মানুষটা ছাঁচতলা হয়ে এবারে বেড়ার দিকে যাচ্ছে। চোখের উপর ছিল তখনই দেখতে পেলে না, এখন আর তুমি কি দেখবে?

অথচ একটিবারও পচা জায়গা থেকে নড়ে নি। নড়ে ঘুরে দেখবার কৌতূহল এখনও নেই। যেমন ছিল তেমনিভাবে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানছে, আর বলে যাচ্ছে দৈববাণীর মতো। পচার পিঠের উপরে বুঝি দুটো চোখ বসানো—পিঠের চোখে দেখেই যেন বলছে।

বলে, বেড়ার গায়ে মানুষটা এইবার ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল। চোখ রেখেছে—উঁহু, উঁকি দিয়ে কি দেখবে অন্ধকারে? শুনছে কান পেতে।

কিম্বা বুড়ো হয়ে মাথার গোলমাল হয়েছে পচার। মনের সন্দেহ-বাতিক। সাহেব অবহেলার ভঙ্গিতে বলে, শুনুকগে। গল্পই তো শুধু, যত ইচ্ছে শুনে

যাক। কিন্তু আমি ভাবছি, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—রাতের কুটুম আপনার উঠোনেও আসে!

বাইটা গভীর নিশ্বাস ফেলল: সে একদিন ছিল। এই সোনাখালি বলে কেন, আমায় খাতির করে আশপাশের পাঁচটা-সাতটা গাঁয়ে কোন কুটুম পথ হাঁটত না নিশিরাতে। সে পচা বাইটা এখন মরে আছে।

কান পেতে আবার একটু কি শোনে। বলল, বাইরের মানুষ নয়, চলনে তাই বলছে। এ বাড়ির। আমার বউ শয়তানী মরে গিয়ে হাড়ে বাতাস লাগল। অনেক দিন আরামে ছিলাম। মরণ পর্যন্ত অমনি কাটবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আর এক শয়তানী সংসারে ভর করেছে। ইচ্ছে করে, হারামজাদির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই কচকচ করে।

দাঁত একটিও নেই বৃদ্ধের গালে। সেই কারণেই বোধ করি মুণ্ডের বদলে জোরে জোরে তামাক টেনেই আক্রোশ মিটাচ্ছে।

নিঃসন্দেহে সে মানুষ মুকুন্দর বউ—সুভদ্রা। চোরের সংসারে যার বড় ঘৃণা। কোন একদিন ধর্ম-বাসা বাঁধবার আশায় স্বামীকে পাপ-সংসার থেকে সরিয়ে দিয়েছে। বার-কয়েক কেশে নিয়ে পচা বাইটা আবার গালিগালাজ শুরু করে দিল।

বলে, যত নষ্টের গোড়া ছোটবউমা। ভাল গৃহস্থ-ঘর দেখে মেয়ে আনলাম—দুটো দিন যেতে না যেতে দেখি, মেয়ে নয় বিচ্ছু। আরও ভুল, মুকুন্দটাকে ইস্কুলে পাঠানো। বিদ্যে শিখলে পৌরুষ থাকে না, ছিটেমন্তোর দিয়ে বউ তাকে গুণ করে ফেলেছে। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে, বাঘের মতন ভরায় বউকে। বর্ধনবাড়ি কোনদিন ধর্মকর্ম ছিল না, ওর শাশুড়িও পেরে ওঠেনি, ইচ্ছে হলে বাপের বাড়ি গিয়ে সেরে আসত। ছোটবউমা এসে ব্রত-নিয়ম, পূজো-আচ্চা ঢোকাচ্ছে। ছেলেটারও শতেক খোয়ার—আধা-বিবাগী হয়ে ফুলহাটা ইস্কুল-বাড়ি পড়ে থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে-বেড়ে খায়।

যত বলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে ততই। সাহেব জিজ্ঞাসা করে, এত রাত্রে ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন উনি?

আমি ঠিক মতন আছি না বেরিয়ে পড়েছি, সারারাত সেজন্য তক্কে তক্কে থাকে। ধর্মের পাহারাওয়ালা। ঘুমোবে না পণ করে টহল দিয়ে বেড়ায়। কিছু দেখলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। ওরে হারামজাদি, তুই বেড়াস ডালে ডালে—আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। রাতে বেরুব না—আবদার! অন্তত একটা বার যদি বেরুতে না পারি, তিন দিনেই তো অক্কা। সেই বেরুনো তুই ধরতে যাস কালকের কাঁচা-কচোড় মেয়ে!

বিরক্তিভরে সাহেবকে হঠাৎ বলে উঠল, যা যা, চলে যা আজকে তুই। গল্প কাল-পরশু যেদিন হয় হবে। হারামজাদি ছোট বউমার কানে ঢুকলে এই সব নিয়ে খোঁটা দেবে আমায়।

সাহেবও তাই চাচ্ছে। বাইরে গিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে দেখবে। চোখে না দেখে এই যে পচা বলে দি[illegible]পরখ হবে তার কথা।

সাহেব বেরিয়েছে। জমাট-বাঁধা এক টুকরো অন্ধকারেও সাঁ করে সরে গেল বেড়ার কাছ থেকে। পালায় না কিন্তু, দূরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। পথের মুখে জামরুলতলায়—ঐখান দিয়ে বাইরে যেতে হয়। সাহেবের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। শিকারি জন্তু ওত পেতে রয়েছে যেন।

আরও কিছু এগিয়ে যেতে যেচে কথা বলল সুভদ্রা-বউ। এই পাড়াগাঁ জায়গায় বউরা তো লম্বা ঘোমটা টেনে আড়ালে আবডালে বেড়াবে। কিন্তু এ বউয়ের খাপছাড়া রকমসকম। স্বল্পপরিচিত বিদেশি ছোকরা—মানুষটাকে নিজেই এসে ডাকছে। 'আপনি' বলছে প্রথম দিনটা: ও কি! দাঁড়িয়ে পড়লেন—ভয় পেয়ে গেলেন নাকি ঠাকুরপো? এই রাত্তিরে ভয় তো মেয়েমানুষেরই পাবার কথা।

খুকখুক করে চাপা হাসিও যেন কথার সঙ্গে। দ্রুতপায়ে সুভদ্রা-বউ একেবারে সামনে চলে এলো। ব্যবধান বোধ করি এক বিঘতও নয়। পচার ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে ধমক দেয়: মানুষটা কান দিয়ে দেখতে পায়। কাছে না এসে কি করে কথাবার্তা বলি? আপনি ঠাকুরপো, মেয়েমানুষের মতো লাজুক। চেহারাতেও ঠিক তাই। মেয়ে যদি হতেন, কোন এক রাজপুত্তুর হরণ করে রাজবাড়ি নিয়ে তুলত। আপনি আসেন, রোজ রোজ দেখতে পাই। ক'দিন সেই বড় বৃষ্টি-বাদলা গেল, তা-ও কামাই নেই। এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ভারি বজ্জাত চোর আপনি!

এবার হেসে সাহেব বলে, আপনিও কিন্তু বড় ঝানু গৃহস্থ। বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে সজাগ থেকে চোর পাহারা দেন। আজকে একেবারে হাতেনাতে ধরে ফেললাম।

সুভদ্রার কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেঁপে উঠল অন্ধকারের ভিতর। বলে, সবাই ঘুমোয়। এ বাড়িতে ঘুম নেই শুধু দুটো মানুষের। আমার, আর ও ঘরের ঐ বাসি বাইটার—

না, সাহেব ভুল ভেবেছিল। তীক্ষ্ণ নজর ফেলে দেখে, হাসছেই তো

সুভদ্রা। বলে, শ্বশুরের নাম ধরতে নেই কিনা। আমি তাঁই বলি, বাসি বাইটা। জিনিস যত ভালোই হোক, বাসি হওয়ার পরে আমার শ্বশুর হয়ে যাবে। বলুন তাই কিনা।

আবার বলে, এ তবু ভাল। আমার বড়দিদির কথা শুনুন। ভাসুরের নাম তুলসি, বর হল মধু। কবিরাজি অষুধ খায়। বলে, অষুধের সঙ্গে কবিরাজ অনুপান দিয়েছে ভাসুরের রস আর আমার তেনার ছিটে। বুঝলেন তো ঠাকুরপো? মধুর ছিটে তুলসিপাতার রসে—নাম ধরতে পারে না, তাই অমন বলছে।

মুখে কাপড় দিয়ে হাসছে এবার। ঘরের মধ্যে ওদিকে পচা বাইটা নতুন এক ছিলিম চড়িয়েছে। ফড়ফড় করে হুঁকো টানার আওয়াজ।

পচা বাইটার মা'কে থানায় নিয়ে এলো। খুনখুনি বুড়ি। পচা আজকে তেমাথা-মানুষ, বুড়ি সেই সময়টা অবিকল তাই। বটুক-দারোগার কাছে এনে তাকে হাজির করল।

বউকে দেখতে পেয়ে স্থান-কাল ভুলে বুড়ি করকর করে ওঠে: লাজলজ্জার মাথা খেয়ে এইখানে উঠেছিস—সর্বনাশের মূলে তবে তুই? সতী নারী স্বামীর দোষ ঢেকে বেড়ায়, তুই সর্বনাশী মিছামিছি লাগিয়ে স্বামীর হাতে দড়ি দিলি! উপরওয়ালা সব দেখতে পায়,—দেখে দেখে লিখে রাখে। হাতে যেদিন পাবে, বুঝতে পারবি সেইসময়। নরকে নিয়ে ঠাসবে।

বউয়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর। ভাইকে বলছে, চোরানি কি বলে, শোন দাদা। আমার নরকবাস, ওঁর জন্য স্বর্গধামে গদির বিছানা পেতে রেখেছে! গেলেই তো হয় সেখানে, সৃষ্টি-সংসার রক্ষে পেয়ে যায়।

লেগে গেল শাশুড়ি-বইয়ে! ঐ থানার উপরে। স্বয়ং বড়বাবু থেকে চাকর-বাকর সবাই দাঁত মেলে পরম পরিতৃপ্তিতে শুনছে। তারপরে একসময় বটুক-দারোগার কর্তব্যের কথা স্মরণ হল: থাম, থাম! কী হচ্ছে, সরকারি অফিস নয় এটা?

হুঙ্কার দিয়ে কলহ থামিয়ে বুড়িকে বললেন, কতটুকু কী আর জানে বউ, কী বলবে! বাড়ির বউকে মায়ে-পোয়ে তোমরা তো বিশ্বাস করো না। বউ শুধু বলল, শাশুড়ি-ঠাকরুনের ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে চামচিকের মতন কড়িকাঠে ঝুলিয়ে দাও, মালের খবর বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তুড়ুম রয়েছে আমাদের, মত বাঁধাবাঁধির দরকার কি? তুড়ুমটা কেউ একবার দেখিয়ে দাও বুড়ি-মাকে—

তুড়ুম দেখিয়ে পদ্ধতিটা সবিস্তারে বুঝিয়ে বুড়িকে আবার দারোগার কাছে নিয়ে এলো।

দেখলে ?

বুড়ির কিছুমাত্র ভয়ের লক্ষণ নেই। বটুক-দারোগা হাস্যমুখে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে তারিফ করেন: এই মা না হলে অমন ধুরন্ধর ছেলে! পাতিশিয়ালের গর্ভে মেনিবিড়াল জন্মে না কখনো।

বুড়ি বলছে, মালের খবর কিচ্ছু জানিনে বাবা। কাজটা আমার পঞ্চাননেরই নয়। ভুল খবর পেয়েছে।

খবর বাইরের মানুষের কাছ থেকে নয়। নিজেই একবার করে টিপসই নামসই দু-রকম দিয়েছে।

একরারনামার নকল আদ্যপান্ত বুড়িকে পড়ে শোনালেন। বলেন, পড়েছেও সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। যার নাম বিলাতি গোখরো! জলপানেই ওদের আধখানা করে গরু-শুয়োর লাগে, মেজাজটা কেমন এই থেকে বুঝে নাও।

বুড়ি বলে, তোমাদের যন্তোরে চাপিয়ে বাছার মুখ থেকে আবোল-তাবোল বের করে নিয়েছ। আজ চার মাস সে পায়ের ব্যাথায় বিছানায় শুয়ে। সমস্ত মিথ্যে, পঞ্চানন এর মধ্যে ছিল না। যাতে সে রক্ষে পায়, তাই করে দাও বাবা। আমরা তোমার কেনা হয়ে থাকব।

শুধুমাত্র মানুষ কিনে কারো সন্তোষ লাভ হয় না—বুড়ি অতএব কথাটা স্পষ্ট করে দেয়: যাতে খালাস হয়ে আসে, তাই করে দাও। ন্যায্য গণ্ডা দিতে পঞ্চানন আমার কসুর করে না। বেরিয়ে এসে খুশি করে দেবে।

আর কী চাই। বটুক নিজে যে কথা বলতে চাচ্ছিলেন, বুড়ির মুখ দিয়ে তাই বেরুল। উঠে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এলেন। মুখ বাড়িয়ে পচার বউকে বললেন, তোমাদের দরকার নেই, বাড়ি চলে যাও এবারে তোমরা।

আসন পিঁড়ি হয়ে বসলেন চেয়ারে। বলেন, এই জন্যেই তো ডাকিয়ে এনেছি মা। বুড়োমানুষ বলে আগে কষ্ট দিতে চাই নি—বউকে ডাকিয়ে আনলাম, তাকে দিয়ে যদি হয়ে যায়। তা দেখলাম, বউটা কাজের নয়, একেবারে বাজে।

বুড়ি মিনমিন করে বলে, মাল কোথায় যে বের করব ? আমরা কিছু জানিনে বড়বাবু।

বটুক বলেন, বউ যা বলল তোমার মুখেও অবিকল সেই কথা। আমাদের কিন্তু শোনা আছে বাইটা খুব মাতৃভক্ত, মাকে না বলে কিছু করে না। উপায় যখন নেই, কি হবে! পড়েছে পাগলা সাহেবের হাতে, দেবে নিশ্চয় বছর-দশেক ঠুকে। তোমার জীবনে ছেলের সঙ্গে দেখা হবে না। যাও বাড়ি চলে যাও।

কথাবার্তা শেষ করে দরজার কপাট খুলে দিয়ে দারোগা কয়েকটা ফাইল টেনে নিয়ে বসলেন। অর্থাৎ বিদায় হয়ে যাও—আমাদের যা করণীয়, করি এবার আমরা।

ক্ষণপরে চোখ তুলে বললেন, বসে আছ এখনো? বুড়োমানুষ যাবে তো এতটা পথ—

বুড়ি বলে, মামলা সত্যি তুলে নেবে তো?

বটুক-দারোগা বিরক্ত হয়ে বলেন, এক কথা কতবার বলি। মাল ফেরত ডেকে দিই, তার মুখেই শুনে যাও।

বুড়ি আর একটু ভেবে নিয়ে বলে, মুখের কথা মানিনে বাবা। ইস্টাম্বর-কাগজে লেখাপড়া করে দিক।

ইস্টাম্বর অর্থাৎ স্টাম্প। স্ট্যাম্প-কাগজে নিধিরাম দস্তুরমত দলিল করে দিক, পচার নামের মামলা তুলে নেবে। তবেই বুড়ি বিবেচনা করতে পারে। হল তাই—চার আনার স্ট্যাম্প-কাগজে এগ্রিমেণ্ট হল, স্থানীয় কয়েকজন সাক্ষি হলেন। কুটে-নিধে ও থানার কয়েকজন বুড়ির সঙ্গে সোনাখালি চলল—মালের হদিস দেবে সে এইবারে।

পচা বাইটাও এদিকে সদর থেকে ফিরল। ছোটবাবু বলে, শয়তানিটা দেখুন একবার। স্বেচ্ছায় সমস্ত স্বীকার করে রিচার্ডসনের কাছে ডাহা বদনাম দিয়ে এল, একরার নাকি জোর করে আদায় হয়েছে।

বটুক-দারোগা চোখ পাকিয়ে বলেন, বলেছিস এইসব?

সবিনয়ে পচা বলে, আজ্ঞে হাঁ। প্রাণ বাঁচানোর জন্য বলতে হল বড়বাবু। নয়তো রেহাই ছিল না, পাগলা সাহেব ফাটকে পুরত। সামনে নতুন মরশুম, সেই সময়টা ফাটকে ঢুকে পড়ে নবাবি করব—তা হলে কাজকর্মের কি, সংসার চলবে কিসে? ইতর-ভদ্দোর দশজনে যারা মুখের পানে চেয়ে আছে, তারাই বা কি বলবে?

বটুক বলেন, তবে বেটা একবার করতে গেলি কেন? আমাদের বেইজ্জতির জন্যে?

সে-ও প্রাণ বাঁচানোর দায়ে। সবাই বলছে, ঘা-খানা তোর ভাল নয় পচা। ভাল ডাক্তার দেখা, নয়তো জন্মের মতন খোঁড়া হয়ে থাকবি, ভয় হয়ে গেল বড়-বাবু। বলি, সদরের সাহেব ডাক্তারের চেয়ে তো বড় হয় না। মা-কালী সুবিধা করে দিলেন, আপনার মতন মানুষ নিজে চড়াও হয়ে পড়লেন গরিবের বাড়ি। নিখরচায় ডাক্তার দেখিয়ে নেব, অথচ ফাটকে যাব না—তার কায়দাটা কি? থানায় একরার করে সদরে গিয়ে বেকবুল যাব। হাজতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রমাণের

জন্য অদন্তে আসবে, মাল বের করবার চেষ্টাচরিত্র করবে। সেইসব হতে থাকুক, পায়ের ঘা তার মধ্যে ভাল হয়ে যাবে।

নিশ্বাস ফেলে পচা বলে, এইরকমই তো হবার কথা বড়বাবু, বলুন, হয়ে আসছে কিনা বরাবর। কপালের দোষে নয়-ছয় হয়ে গেল। এত বড় একখানা মামলা সাজিয়ে সদর অবধি চালান করলেন, এক কথায় ডিসমিস। আপনাদের বেইজ্জত করেছি—বলুন দিকি, আমি না ঐ পাগলা সাহেব? সাহেবের দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন।

দারোগা গর্জন করে ওঠেন: অত্যাচার করে কথা বের করেছি—সাহেবের কাছে তুই বদনাম দিয়ে এলি। তা-ও পারি। মিথ্যে বলে এসেছিস, সত্যি হোক এবারে। তোকে ছাড়ব না।

পচা সকৌতুকে বলে, তুড়ুমে শোয়াবেন বুঝি বড়বাবু?

সেকালের কাহিনী বলতে বলতে আজকের বৃদ্ধ পচা বাইটা খিকখিক করে উৎকট হাসি হাসে: বটুক-দারোগা তুড়ুমের ভয় দেখিয়ে কথা বের করবে, আ আমার কপাল! টেমিটা জ্বাল দিকি সাহেব, একটা জিনিস দেখাই।

হাঁটুর কাপড় তুলে পচা কালো কালো দাগ দেখাল। বলে, টেমি ঘুরিয়ে পিঠের দাগগুলো দেখে নে। গরম কলকের ছ্যাঁকা-দেওয়া—সেই সব দাগ গোল। আর চিমটে-বেড়ি পুড়িয়ে ধরে লম্বা দাগগুলো করেছে।

সাহেব অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে: ওরে বাবা!

এতেই বাবা বলিস। এসব তো আনাড়ির হাতের মোটা কাজ। গায়ে দাগ করে দিয়ে নিজেরাই শেষটা বিপদে পড়ে। ঝানুদের আলাদা কায়দা। পেটের ভিতর সিকিখানা কথা থাকতে দিল না, কিন্তু মানুষটার গায়ের উপর আঁচড়টি নেই—শ্বশুরবাড়ির খাটে শুয়ে পা দোলাচ্ছিল যেন সে এতক্ষণ। জো-সো করে একটা আসামিকে হাতকড়া পরালে তো তারপরে আর দেরি হবে না। দশ দিকে দশজনে বেরিয়ে হুড়মুড় করে একগাদা ধরে নিয়ে এলো। জিয়ানো মাছ যেমন তুলে নিয়ে আসে। কিনা, ধর্মে মতি হয়ে পয়লা লোকটা সমস্ত বলে দিয়েছে। ধর্মে যাতে মতি আসে, নানাবিধ তার কায়দাকানুন। বাইরের লোকে টের পায় না, এমন কি উপরওয়ালারাও না।

পচা বাইটার নিজেরই উপর বিস্তর রকম হয়ে গেছে। তারই দু-চারটে বলে স্মৃতি থেকে। আর তামাক টানে।

ছাই-ভরতি বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে সেই বস্তা এঁটেসেঁটে বেঁধে দিল: নিশ্বাস নিতে গিয়ে ছাই উঠে নাক বুজে যায়। হাত-পা বেঁধে হাঁটুর নিচে বাঁশ চালিয়ে

দিয়েছে ; বাঁশের দুই প্রান্ত ধরে দুজনে দোল দিচ্ছে ; দোলনে জোর দিয়ে দুমদুম করে মানুষটাকে আছড়ে মারে দরজার গায়ে। নাক ও কানের ফুটোয় লংকার গুঁড়ো দিয়ে দেয়। ঝুলিয়ে দেয় মানুষটাকে—হাতে পায়ে চুলে গোঁফে ঝোলানোর হরেক পদ্ধতি। দু-হাতের বুড়োআঙুলে দড়ি বেঁধে আড়ার সঙ্গে ঝোলায় ; শুধুমাত্র পায়ের বুড়োআঙুল মাটিতে ঠেকবে ; অজ্ঞান হয়ে যাবে এই অবস্থায়, নামিয়ে তাউত করে আবার ঝুলিয়ে দেবে ঐরকম। কাঁটার বিছানায় শোয়াবে। উপুড় করে ধরে মাটিতে মুখ ঘষবে। নখের মধ্যে বাবলাকাঁটা কিংবা সূঁচ ফোটাবে। রাতে ঘুমুতে না দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে ; প্রশ্নকর্তার ঘুম ধরে গেল তো তার জায়গায় আর-একজন এসে প্রশ্ন করছে। আর-এক কায়দা—চারপায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেলল মানুষটাকে, পা দুটো বেরিয়ে আছে ; পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে মারছে সেই পায়ের তলায় ; দাগ হবার শঙ্কা নেই, নির্ভাবনায় মেরে যাচ্ছে ; একজনের হাত ব্যথা করল তো আর একজন আসছে। আগুনের প্রক্রিয়া আর জলের প্রক্রিয়া : আগুনের চিহ্ন কিছু কিছু রয়ে গেছে পচা বাইটার গায়ে। সাঁড়াশি চিমটা কলকে অথবা জলন্ত কাঠই গায়ে চেপে ধরে, নাক-কানের ফুটোয় গরম তেল ঢেলে দেয়। শীতের রাত্রে নগ্ন গায়ে জল ছিটিয়ে চাবুক মারে ; খানিক মার হয়ে গেলে আবার জল ছিটায়। দুজনে পাখা করে যাচ্ছে দু-দিক থেকে।

সকলের চেয়ে সাংঘাতিক হল, নাভির উপর গুবরে-পোকা ছেড়ে দেওয়া। বাটি চাপা দেওয়া আছে, পোকা যাতে বেরিয়ে না যায়। পথ না পেলে পোকা তখন নাভির মুখে শুঁড় ঢুকিয়ে গর্ত খুঁড়তে লাগল। এমনি কত! এসব পুরানো পদ্ধতি, মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। একালের ধুরন্ধরেরা আরও কত নতুন নতুন বের করছে। সকল জন্তুর মধ্যে মানুষ বুদ্ধিমান। নিজের জাত জব্দ করতে মানুষের মতন কে পারবে ?

পচা বাইটার স্পষ্ট কথা : ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না বড়বাবু। মারধোরেও কায়দা করতে পারবে না। পুরোনো ঘাগি, বিস্তর ঘাটের জল খাওয়া আছে। আইনকানুন অজানা নেই। মালের খবর পাবেন না। বলেন তো আরও একবার না-হয় একরার সই করে দিচ্ছি, উপরে গিয়ে বেকবুল যাব।

বটুক-দারোগা বলেন, মালের খবর কে চাচ্ছে ? ব্যবস্থার বাকি আছে নাকি ? রিচার্ডসনের কাছে নিন্দে করে এলি, মেরে খানিকটা হাতের সুখ করব।

পচা হেসে আকুল : সুখ হবে না বড়বাবু, হাত ব্যথা হবে। যত ইচ্ছে মারুন, আমার অঙ্গে সাড় লাগবে না। চামড়ার নিচে রক্ত-মাংস নিয়ে এ

লাইনের কাজকর্ম হয় না। গোড়ার দু-চার বছর হয়তো ছিল, রক্ত-মাংস শুকিয়ে এখন পাথর। পাথরে হাতের কিল মারুন কিংবা লাঠির বাড়ি মারুন, নিজেরই কষ্ট। দেখুন না পরখ করে। আপনার মতো অনেকেই অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে, গায়ে কিছু চিহ্নও আছে। সেগুলোই একবার চোখে দেখুন।

পিঠের ও পায়ের দাগ দেখে বটুক-দারোগা বুঝলেন, চেষ্টা করা বৃথা। এমনি সময় পচার মা কুটে-নিধে এবং পুলিসের দলটা পথের মোড়ে দেখা দিল। সোনাখালি থেকে ফিরছে। এবং উল্লাস দেখে বোঝা যায়, ষোলআনা কার্যসিদ্ধি।

বটুক-দারোগা বলেন, মালের খবর তোকে দিতে হবে না, তোর মা-বুড়ি বলে দিয়েছে। মাল নিয়ে ঐ আসছে ওরা, দেখ চেয়ে।

পচা বাইটা তিলেকমাত্র বিচলিত নয়। বলে, আমার মা দেবে খবর! বরঞ্চ বলুন আকাশের এক চাংড়া উঠোনে ভেঙে পড়েছে, ঝাঁটার মুখে কুড়িয়ে নিয়ে এলো। সেটা তবু প্রত্যয় পেতে পারি। আমি যদি একগুণ হই, মা আমার এক-শ গুণ। মায়ের গুণেই যা আমার শিক্ষাদীক্ষা।

বুড়িমানুষ পচার মা থপথপ করে আসছে, বেশ খানিকটা দূরে আছে তখনো। জমাদার স্ফূর্তির চোটে ছুটে এসে সর্বাগ্রে খবরটা দেয়: কী জায়গায় সেরেছিল বড়বাবু। মাঠের মধ্যে খেজুরগাছ জড়িয়ে মস্ত বড় অশ্বত্থগাছ, তার গোড়ায় ফোকর। ফোকরের ভিতর মালসার মুখে সরা চাপা দিয়ে মাল রেখেছে। উপরে ঘাসের চাপড়া। না বলে দিলে খুঁজে বের করবে, কারও বাপের সাধ্যি নেই।

পচা বাইটা চকিতে ফিরে তাকাল। দলটা উঠানে এসে পড়েছে। পচা আর্তনাদ করে ওঠে: ও মা, তুমিই শেষে বের করে দিলে—তোমার এই কাজ?

বুড়ি এসে ছেলের হাত চেপে ধরল। দারোগাকে বলে, দাও বাবা, আমার পচাকে। নিয়ে চলে যাই।

ধূর্ত হাসি হেসে বটুক বলেন, নিয়ে আর যাবে কোথায়? গ্রামসুদ্ধ লোকের মোকাবেলা বমাল বের করে দিয়েছ, তুমিও বুড়ি বাদ যাচ্ছ না। মায়ে-পোয়ে সদরে একসঙ্গে চলে যাও। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার বেকবুল করে এসেছে পচা। মিথ্যে কথায় সাহেব ক্ষেপে যায়। আগের বার যা দিত, এবারে তার ডবল করে ঠেসে দেবে দেখো।

বুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, দারোগার একটা কথাও যেন বুঝতে পারে না। মালসা থেকে চোরাই মাল তুলে তুলে জমাদার সকলকে দেখাচ্ছে, আর শতকণ্ঠে নিজেদের বাহাদুরির কথা বলছে।

হঠাৎ বুড়ি চিৎকার করে ওঠে: যাব আমি সদরে। কুটে-নিধে ইস্টাম্বর

কাগজে দলিল করে দিয়েছে। দারোগা, তোমার সাক্ষি মানব। সাহেবের কাছে বিচার চাইব।

বটুক হি-হি করে হাসেন: আইন জান না বুড়ি। চোরাই মামলার ফরিয়াদ মহামান্য সরকার বাহাদুর। নিধিরাম যাচ্ছেতাই লিখে দিকগে, তার কি ক্ষমতা আছে মামলা তুলে নেবার !

পচার মা ভেঙে পড়ল: ধাপ্পা দিয়েছ বাবা বুড়োমানুষের সঙ্গে ? তোমাদের ধর্মাধর্ম নেই ? আমার পচা বেঁচে যাবে—আমি যে বড় আশায় মালিকের হেপাজতে মাল দিয়ে দিলাম।

জমাদার বলে, চোরাই মাল বের করেছ বুড়ি—পচা বাঁচলেও তোমার বাঁচন নেই। তোমায় নিয়ে ফাটকে পুরবে।

পচা গর্জন করে ওঠে: ফাটকে পুরবে আমার মাকে ? মা কী জানে ! এজলাসে দাঁড়িয়ে সমস্ত খুলে বলব। চোর আমিই। মাল রাখবার সময় মা কেমন করে দেখে ফেলেছিল। চোর ধরিয়ে দিল, আমার মায়ের সরকারী পুরস্কার তার জন্যে।

সেই প্রথম পচা জেল খাটতে গেল। ক্রুদ্ধ রিচার্ডসন রীতিমত ঠেসেই দিয়েছিল।

গল্প শেষ করে পচা বাইটা বলে, কথা ক্ষণে অক্ষণে পড়ে যায় রে সাহেব। বটুক-দারোগা যা বলেছিল—জেল থেকে বেরিয়ে এলাম, মা তখন নেই। মামলার রায় দিয়ে দিল, আদালতের বাইরে এনে কয়েদি-গাড়িতে আমায় টেনে তুলল। বটতলায় তখনো মা দাঁড়িয়ে আছে। মা আমার ডুকরে কেঁদে উঠল, কান্না শুনতে শুনতে চলে গেলাম। সেই আমার শেষ দেখা মায়ের সঙ্গে।

চুপ করল পচা বাইটা। ঘর অন্ধকার। সাহেব তাড়াতাড়ি আর-এক ছিলিম তামাক সেজে আনে। হুঁকা হাতে নিয়ে বাইটা বসে আছে, টানে না। মায়ের কান্না এখনো যেন শুনছে। পচাই আবার না ডুকরে কেঁদে ওঠে তার সেই মরা মায়ের মতন।

সাত

বেরিয়ে যাচ্ছে সাহেব। জামরুলতলায় ছায়ামূর্তি।

ও-ঠাকুরপো শুনুন শুনুন। রোজ রোজ কী আপনাদের বলুন তো? কী অত ফুসফুস গুজগুজ বাসি বাইটার সঙ্গে?

গল্প শুনি। ভাল ভাল গল্প করেন উনি, ভারি মজাদার।

তিক্তকণ্ঠে সুভদ্রা বলে, ঐ কাজটাই পারে এখন শুধু। কবে নাকি তালপুকুরে হাতি ঘোড়া তলিয়ে যেত, এখন ঘটি ডোবে না। বিঘত প্রমাণ জলও নেই—ঐ যে নাম করতে পারিনে, বাসি কাদাই সার। পারে না কিছুই—জাঁক করে তবু খারাপ নামটা বজায় রেখে যাচ্ছে। ঘেন্নাপিত্তি থাকলে কেউ করে না। কবে যে মরবে হাড়-জ্বালানো বাসি বুড়ো—

সাহেবের কাছে ঘেঁষে এসে বলে, গেল-শীতকালে, জানেন ঠাকুরপো, এক দুপুরে নাড়ি বসে গেল। কতই অবধি টিপে টিপে নাড়ি পায় না। সোয়াস্তির শ্বাস ফেলি: বিধাতা সদয় হলেন বুঝি এতদিনে! রান্নাঘরে রাত্রের জন্য মাছ ভেজে রেখেছে। এর পরে তো ক'দিন নিরামিষ চলবে—ভাবি, ওগুলো মিছে নষ্ট হয় কেন? রান্নাঘরে ঢুকে সকলে মিলে তাড়াতাড়ি শেষ করে কাঁদবার জন্য তৈরি হয়ে আছি। আঁচলে লঙ্কার গুঁড়ো বেঁধে নিয়েছি—চোখে জল না এলে এক টিপ চোখের ভিতর দেব। ওমা, সমস্ত ফুসফাস—সন্ধ্যে নাগাত বুড়ো উঠে বসে খাই-খাই করছে। মাছগুলো সব সেঁটে দিয়েছিস, বলি, পুকুর কাটা কার পয়সায়? দেখেশুনে ভরসা ছেড়ে দিয়েছি ভাই। কচুর পাতা মুড়ি দিয়ে এসেছে, যমরাজ দেখতে পায় না। ও-বুড়ো কোনদিন মরবে না।

হঠাৎ বুঝি বউয়ের গলাটা ধরে আসে: ঐ লোকের জন্য একজনকে ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশান্তরী হতে হল। আমিও পা বাড়িয়ে আছি। বাসা করবে শিগগির —বাইটা-বাড়ির মুখে লাথি মেরে চলে যাব।

সাহেব বলে, তাঁকে আমি জানি। ভাব-সাব হয়েছে তাঁর সঙ্গে।

কেমন করে ভাই? কোথায়?

সাহেব বলে, অনেক দিন ছিলাম যে ফুলহাটায়। তাঁর পাঠের আসরে গিয়ে বসতাম। আমার ছোড়দা তিনি, আমি সাহেব ভাই।

সুভদ্রা ব্যাকুল আগ্রহে বলে, আসুন না ঠাকুরপো রোয়াকে বসে দুটো গা

করে যাবেন। শুনি সেখানকার কথা। ভিতর-বাড়ির ঐ রোয়াক। সকলে ঘুমুচ্ছে, টের পাবে না। এ পোড়া-বাড়িতে কথা বলার একটা মানুষ পাইনে।

পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। বুঝি বা হাতই ধরে ফেলে। সাহেবের ভয়-ভয় করছে। বলে, আজ থাক বউঠান, আর একদিন।

এঁকেবেঁকে পালাল। কাজটা রপ্ত আছে ভাল মতন। পাহারাওয়ালা পারে না, গাঁয়ের বউ কি করে ধরবে!

•

এর পরে সাহেব আরও গভীর রাত্রে অতি সতর্কভাবে আসে, সুভদ্রা বউয়ের কবলে পড়ে না যায়। গল্পগুজব বেশ চলছে, খাতির জমেছে পচার সঙ্গে। কিন্তু আসল কাজের কিছুই হল না এত দিনে। একটু-আধটু ইঙ্গিত দিলে বাইটামশায় নতুন কোন জোরালো গল্প ফাঁদে।

একদিন মরীয়া হয়ে সাহেব স্পষ্টাস্পষ্টি বলে বসল, বিদ্যেসাধ্যি কিছু দিতে হবে বাইটামশায়। আশায় আশায় দূর-দূরন্তর থেকে এসেছি।

পচা উড়িয়ে দেয় একেবারে: বিদ্যে? সেসব কোনকালে হজম হয়ে গেছে। কোন বিদ্যে নেই এখন। থাকলে বুঝি হেনস্থা সয়ে এদের সংসারে পড়ে থাকি! যাও তুমি, চলে যাও, আর এসো না।

ওকথা বললে শুনছিনে বাইটামশায়। খালি হাতে কেন যেতে যাব? দেবেন কিছু, তারপরে যাবার কথা।

বাইটা রেগে বলে, গায়ের জোরে আদায় করবি?

আপোষে দিলেন আর কই!

হাসতে হাসতে পা-দুটো জড়িয়ে ধরতে যায়। ধ্বক করে চোখ জ্বলে উঠল বুড়োর। ছুই হাঁটুর মধ্যে ঘাড় গুঁজে হুকো টানছিল। কলকে ছুঁড়ে মারল রাগ করে। আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সাহেবের গায়েও পড়ল আংরার কয়েক টুকরো, কাপড় পুড়ে গোল গোল ছিদ্র হয়ে গেল। হাসছিল সাহেব— মুখের উপর এখনো তেমনি হাসি।

পচা বাইটা চোখ মিটমিট করে দেখছে। যেন কিছুই হয়নি—কলকে কুড়িয়ে সাহেব নতুন করে তামাক সেজে পচার হুঁকোর মাথায় বসিয়ে বলে, খান—

পচা হঠাৎ বলে, ছেঁক লেগেছে নাকি রে?

তাকিয়ে দেখে অবহেলার ভাবে সাহেব বলে, নাঃ!

ঠোলা উঠেছে ঐ যে—মিথ্যে বলছিস?

কি জানি, ঠাহর হয়নি তো—

ঘুরে বসে ঠোসকা-ওঠা জায়গাটা পচার চোখের আড়াল করল। কি ভেবে

তারপর বেড়ার একটু চোঁচ ভেঙে রিয়ে ছেঁদা করে দিল ঠোসকাগুলো। জল বেরিয়ে গিয়ে চামড়া সমান হয়ে যায়, চোখে দেখে কেউ ধরতে পারবে না।

পুরো ছিলিম শেষ করে পচা প্রশ্ন করে, জালা করছে না?

সাহেব একগাদা কথা বলে এবার: কী আশ্চর্য! দু-চারটে ফুলকি পড়েছে কি না পড়েছে, তার জন্যে ঠোলা উঠবে, জ্বালা করবে—আপনার শ্রীচরণে বসতে এসেছি তবে কোন্ সাহসে? শহুরে ছেলে শহরের খোপেই তা হলে পড়ে থাকতাম, ভাঁটিমুলুকে আসতাম না।

দন্তহীন মাড়িতে পচা একগাল হাসল। হুঁকো রেখে দিয়ে এইবারে সে শুয়ে পড়ে। বলে, রাত হয়েছে, ঘরে চলে যা। আর একদিন তোর কথা শুনব।

শুয়ে পড়েছে কুণ্ডলী হয়ে—সোজা হয়ে শোবার শক্তি নেই? বাইটার মুখে হাসি দেখে সাহেবের বড় স্ফূর্তি। পাশে বসে মোলায়েম হাতে পা টিপতে লাগল?

পচা বলে, ওকি রে?

পদসেবা করতে দিন। আমি তো কিছু চাচ্ছিনে।

বেটাচ্ছেলে বড় সেয়ানা তুই! ভারি নাছোড়বান্দা!

আর কোন উচ্চবাচ্য না করে পচা চোখ বোঁজে। বুড়োমানুষের ঘুম বেশিক্ষণ থাকে না, ক্ষণপরে চোখ মেলল। সাহেবের নিরলস হাত চলেছে।

নড়েচড়ে উঠে পচা বলে, আওয়াজ শুনতে পাস?

সাহেব কান পাতে। নিঃসাড় হয়ে শোনার চেষ্টা করে। মৃদু শব্দ একটু কানে আসে বটে। বলে, দেখে আসি—

বচা বাইটা বলে, না দেখেই বলে দিচ্ছি। কুকুর ঘুমুচ্ছে জামরুলতলার উত্তরে। তাই কিনা মিলিয়ে দেখ গিয়ে।

আবার বলে কাজ করতে হলে কান ভাল রকম রপ্ত চাই। সেই শিক্ষা সকলের আগে। রাত্রিবেলার কাজ—যত ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, ততই ভাল। ধরে নিবি চোখ দুটো নেই একেবারে, একটু-আধটু যা দেখিস সেটা উপরি। হতচ্ছাড়া চোখ ভুল জিনিস দেখিয়ে ক্ষতিই করে অনেক সময়, কান কিন্তু কখনো ভুল করবে না। চোখ বুজে কান খাড়া রেখে ঘোরাফেরা করবি—কানে শুনে বলে দিতে হবে কোনখানে কি ঘটছে। বলতে হবে কুকুর, না বিড়াল, না মানুষ। না আর কোন জীবজন্তু। বলতে হবে ঘুমন্ত না জেগে রয়েছে।

বিদ্যার ভূমিকা শুরু হয়ে গেল তবে। পচা বাইটার মতো গুরু—সাহেবের কত বড় কপালজোর। খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর পচা বলে, চলে যা এখন তুই কাল আসিস। আরও বেশি রাত করে আসবি। দুপুর-রাতে শিয়াল

ডেকে যায় প্রহর বাদে ফের আবার ডাকে। সেই তিন প্রহরের ডাকের মুখে এসে পড়বি। ছোট বউ হারামজাদি সেই সময়টুকু অঘোরে ঘুমায়। ভালরকম পরখ করা আছে আমার। আসবি খুব চুপিসারে। পা পড়ছে, কিন্তু পাতা পড়ার আওয়াজটুকু নেই। দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়াবি—ডাকবিনে, তুয়োরে টোকা দিবিনে, কিছু না। যা বললাম ঠিক ঠিক সেই নিয়মে আসবি।

পরের রাত্রে সাহেব এলো যেমন পচা বলে দিয়েছে। তিন প্রহর রাত্রে এত চুপিসারে এলো, অথচ যেইমাত্র উঠানে পা পড়া পচা সহজভাবে উঠে দরজা খুলে দেয়। কানে দেখতে পায়, সুভদ্রা বলেছিল। থ হয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে সাহেব ঐ কান তুখানার মহিমা ভাবছে। ঘাসে একটা ফড়িং লাফানোর যে শব্দ, তা-ও তো সে হতে দেয়নি।

পচা বলে, পায়ের শব্দ না-ই হল! মাটির উপর পা পড়ে, বাতাসে তার দোল লাগে—চেষ্টা করলে সেটুকু কেন শোনা যাবে না। সবুর কর না, তুইও শুনবি একদিন।

সগর্বে বলে, বড়বিদ্যে তবে আর বলে কেন? ইস্কুল-পাঠশালার বিদ্যে তো সোজা জিনিস। সে বিদ্যের কাজ যে একেবারে চলে না, এমন নয়। বেশির ভাগই তো করছে তাই। কিন্তু বিস্তর ভড়ং আর কায়দাকৌশল খাটাতে হয়। আমাদের বিদ্যেটা সোজা হলে মানুষ লেখাপড়ায় না গিয়ে সোজাসুজি সিঁধেল হতে যেত।

সাহেব যথারীতি তামাক সেজে দিয়েছে। মউজ করে ছিলিমটা শেষ করে হুঁকো রেখে দিয়ে পচা বলে, শোন, পিঠে খাওয়াব বলে রাত করে আজ আসতে বললাম। ঘুমুচ্ছে এখন ছোটবউমা—

সাহেব বাধা দিয়ে বলো ছোট বউ-ঠাকরুন ঘুমোন না যে মোটে! টহল দিয়ে বেড়ান—আপনিই সেদিন বললেন।

ইচ্ছেটা তাই বটে। কিন্তু একেবারে না ঘুমিয়ে পারে কেউ? আমায় পর্যন্ত ঘুমুতে হয়। একদণ্ড হোক আর আধদণ্ড হোক, না ঘুমিয়ে পার নেই। যে ঘুমোয় নিজেই হয়তো সে টের পায় না—ভাবছে, জেগে রয়েছি। ছোটবউমা সত্যি ঘুমই ঘুমুচ্ছে, নিজের কানে সঠিক শুনে এলাম। কাল বেটি চাল কুটেছে, সারাক্ষণ বসে বসে আজ পুলিপিঠে বানাল। এমনি হাড়বজ্জাত, কিন্তু রান্নাবান্নায় খাসা হাত। হরেক শিল্পকর্মও জানে, ঐসব নিয়ে থাকে। পুলিপিঠে বাসি করে খেতে ভাল, রান্নাঘরে তালাচাবি এঁটে রেখেছে। কুকুর উঠে এইবার কড়াই সুদ্ধ খেয়ে যাবে, মরবে কাল কপাল চাপড়ে।

তড়াক করে পচা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। এমনি তো ত্রিভঙ্গ মুরারি—শুয়ে পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়, উঠবার সময়টা আর একজনে ধরে তুলে দিলে ভাল হয়। কাজের বেলা সেই মানুষ দাঁড়িয়েছে যেন সোজা এক তালগাছ—দেহে একটুকু বাঁকচুর নেই। একেবারে আলাদা মানুষ। কোটরের ভিতর প্রায়-বিলুপ্ত চোখ দুটোও যেন বড় হয়ে উঁচুর দিকে বেড়িয়ে এসেছে। উঠানে নেমে পড়েই পচা বাইটা সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিঠের কড়াইয়ের অংশটা দু-হাতে ধরে ক্ষণ পরে ফিরে আসে। সাহেবকে নিয়ে বসে পড়ল কড়াইয়ের ধারে। বলে, কত সব ভালমন্দ রাঁধে ছোটবউমা—তা বেল পাকলে কাকের কি? আকণ্ঠ নিজে গিলবে, আর মুরারির বাচ্চা-গুলোকে গেলাবে। ভাসুরপো-ভাসুরঝির পল্টনটাকে খাওয়ায় খুব। এইসব হয়ে বাড়তি যা রইল, বাড়ির অন্য সকলের। আমার নামে রে-রে করে ওঠে: এত বয়স অবধি বিস্তর তো খেয়েছে, শুয়ে শুয়ে তাই এখন জাবর কাটুক। বিচারটা দেখ একবার। সারাটাদিন ধরে রকমারি রান্নার বাস নাকে আসবে, বুড়ো হয়েছি বলে কোন-কিছু দাঁতে কাটবার এক্তিয়ার নেই। আমিও তক্কে তক্কে থাকি—দিনমান গিয়ে আসুক না রাত্তির। আমার যেটা সময়, তাই এসে যাক। এক পেটের ভিতরে ছাড়া অন্য কোনখানে মাল রেখে রক্ষে করতে পারবিনে।

সাহেবের উপর হুমকি দিয়ে ওঠে: নেমন্তন্ন করে আনলাম, খাচ্ছিস তুই কোথায়? অন্ধকার বলে এ চোখ ফাঁকি দিতে পারবিনে। বাটি ভরে কেউ সাজিয়ে দেবে না, কড়াই থেকে থাবা তুলে ঝটপট খেয়ে নে।

সাহেব বলে, আপনি খান।

খাব না তো শুধু দানসত্র করবার জন্য কষ্ট করে নিয়ে এলাম? ঠিক খেয়ে যাচ্ছি—চোখ তোর চোখা নয় বলে দেখতে পাস না। ঘাবড়াস নে, হবে। চোখ আমারই কি একদিনে ফুটেছিল?

কিন্তু যে সামান্য দেখতে পাচ্ছে, তাতেই সাহেব তাজ্জব। কথাটা ভদ্রতা করে বলেছিল। কী খাওয়া রে বাবা খুনখুনে বুড়োমানুষটার! গবগব করে খাচ্ছে—কে বুঝি মুখ থেকে এক্ষুনি কেড়ে নিয়ে যাবে, এমনিতরো ভাব। দাঁতের অভাবে গিলে খাচ্ছে, চিবানোর কষ্ট কবতে হয় না, এই এক সুবিধা। বড় চুষিগুলো গিলবার সময় কোঁৎ-কোঁৎ আওয়াজ। সাহেবের বারংবার চমক লাগে, গলায় আটকে চোখ উল্টে পড়ে বুঝি এইবার।

এবারে উল্টো কথাই বলছে, তাড়া কিসের? আস্তে আস্তে খান বাইটা-মশায়। রয়ে সয়ে।

পুলিপিঠে ততক্ষণে সাবাড় হয়ে গেছে। খেয়েছে নেহাৎপক্ষে সাহেবের ডবল। হেঁচকি তুলে মুখের ভিতর যা একটু-আধটু ছিল, উদরস্থ করে নিয়ে পচা বলে, কাজের নিয়মই এই। শিখে নে। মাল এসে পড়লে যত তাড়াতাড়ি পারিস পাচার করবি, মায়া করে রেখে দিবি নে। আহা, চেটেমুছে খাস কেন রে. কড়াইয়ে কিছু ছড়ানো থাক। কুকুর হয়ে খেয়ে গেলাম যে আমরা।

থলথল করে পচা হাসে: হারমজাদি ছোটবউমা মরবে কাল বকুনি খেয়ে। মনের ভুলে দুয়োর দেয়নি, বড় বউমা তাই ধরে নেবে, কুকুর ঢুকেছে বলে হাঁড়িকুঁড়ি ফেলবে। গুরুজন শ্বশুরকে হেনস্থা করে—মুখের বকুনি না হয়ে ওকে যদি ধরে ধরে ঠেঙাত, সুখ হত আমার।

সাহেব তখন অন্য কথা ভাবছে। বলে, গিয়েই তো অমনি পিঠেসুদ্ধ কড়াই বের করে আনলেন। তালা খুললেন কেমন করে—মন্তোরের গুনে না অন্য কোন কায়দায়? শাস্ত্রে আছে, মন্তোরে দরজা আপনাআপনি খুলে যায়। গাছের পাতা ছোঁয়ালেও খোলে।

কৌতূহলী পচা বাইটা নড়েচড়ে ভাল হয়ে বসে: বটে বটে! বলাধিকারীর কাছ থেকে শাস্তরে পোক্ত হয়ে এসেছিস। বল দেখি দুটো-পাঁচটা কথা, শুনে নিই।

শাস্ত্রচর্চা চলে কিছুক্ষণ, শাস্ত্রের বিবিধ উপাখ্যান। যমুখকল্পের পথ-সংক্ষেপকথা—যে পদ্ধতিতে যোজন পথ লহলায় অতিক্রম করে, যোজন দূরের মানুষ আকর্ষণ করে আনে। বিদ্যা-হরণের কথা—অন্যের বিদ্যা নষ্ট করে দেবার অকাট্য প্রক্রিয়া। মায়াঅঞ্জনের কথা—যে বস্তু চোখে পরে চোর বাতাসের মতন মিলিয়ে যায়। সকলের চোখে সে অদৃশ্য, তার নিজের চোখ এখন শতগুণ প্রখর। রাজা ব্রাহ্মণ বৈশ্য নৃত্যগীত-রঙ্গোপজীবী চোখের জোরে [illegible]কে বশে এনে ইচ্ছাসুখে সে হরণ করতে পারে।

এক চোরকে নিয়ে কী কাণ্ড! মায়াঅঞ্জন পরে চুরি করতে ঢুকেছে। বুঝতে পারছে বাড়ির লোক, ধরবার উপায় নেই। একজনে বুদ্ধি করে তখন দুঃখের গল্প ফাঁদল—চোরের মায়ের মৃত্যুকথা। ইনিয়েবিনিয়ে বলছে। মায়ের শোক উথলে ওঠে চোরের, দরদর করে জল পড়ছে। চোখের জলে অঞ্জন ধুয়ে গেল। এইবারে যাবি কোথা চাঁদ—ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলে চোরের উপর।

মহাকুলীন রৌহিনেয়-কথা—পিতৃকুল-মাতৃকুল উভয় কুলই যার কীর্তিমান। বাপ পাখির মতন যে-কোন ঘরবাড়িতে ঢুকে পড়বার ক্ষমতা রাখে। নিজে রৌহিনের হরিণ ময়ূর থেকে আরম্ভ করে যে-কোন জন্তুজানোয়ার পাখপাখালির ডাকের নকল করতে পারে। যে বিদ্যার সামান্য কিছু পচা বাইটা নাতিকে

শিখিয়েছে। রৌহিনেয় উপাখ্যানে চৌরমন্ত্রের কথা আছে—যারা চোর ধরতে বেরিয়েছে, মন্ত্র পড়ে তাদেরই মধ্যে মারামারি বাধানো যায়। চোর ধরার কাজ মুলতুবি থাকে তখন।

ভরা পেটে পচা বাইটার মেজাজটা প্রসন্ন। সাহেবের মুখে অনেকক্ষণ ধরে শুনল। বলে, আমার কিন্তু মন্তোরতন্তোর নয় সাহেব। আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের তালা খুলেছি।

বলতে লাগল, মন্তোর ঢের ঢের শেখা আছে। নিদালি মন্তোর, চাবি খোলার মন্তোর, কুকুরের মাড়ি আঁটার মন্তোর—কতরকমের কতজিনিস. লেখা-জোখা নেই। একটা বয়স ছিল, যার মুখে যা শুনেছি—সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিতাম। দুটো-চারটের বেশি খাটিয়ে দেখিনি। শুধু মন্তোরে কি হবে—প্রক্রিয়া আছে, উচ্চারণের কায়দা আছে। উপযুক্ত গুরু না থাকলে রপ্ত করা যায় না। একালের ত্যাঁদোড় মানুষের উপর মন্তোর খাটেও না আর তেমন। না-ই বা হল মন্তোর—এমন হাত-পা কান-নাক-চোখ রয়েছে, গাছগাছড়া শিকড়-বাকড় রয়েছে, মন্তোরের উপর দিয়ে যায় এ সমস্ত। আমার কাজকর্ম এই সব নিয়ে।

রান্নাঘরে ঢুকে যাওয়ার কৌশল বলে দিল। অতি সহজ। চাবিওয়ালা তালা মেরামত করতে এসে যেমন করে তালা খোলে। উকো ঘষে পিছন দিককার বোল্টুগুলো ক্ষইয়ে ফেল, একটু চাপেই পাতখানা উঠে আসবে। আঙুলে ভিতরের কল ঘুরিয়ে দিলেই তালা খুলে পড়ল। কাজকর্ম অন্তে পিছন দিককার পাতা চেপে দিয়ে যেমন তালা তেমনি আবার ঝুলিয়ে দাও। কেউ কিছু ধরতে পারে না।

সেই পাকা ব্যবস্থা হয়ে আছে। সেদিন খুশি পচা ঢুকে পড়ে। ব্যবস্থাটা গোড়ায় ক্ষিধের তাড়নাতেই করে নিতে হয়েছিল। এখন সব ঘরে সর্বত্র স্বচ্ছন্দ গমনাগমনের ব্যবস্থা। প্রতিটি বাক্স-পেঁটরার তালার পিছনে উকো ঘষে মোলায়েম করা আছে, গা-চাবির ইস্ক্রুপ সব আলগা। বাড়ির এতোগুলো লোকের কারও চোখে তার একটা ধরা পড়ে না।

মোক্ষম এক তত্ত্ব শোনাল বহুদর্শী ওস্তাদ। মানুষ জাতটাই হল তালকানা অভ্যাসের দাস। ধরিয়ে না দিলে চোখে পড়বে না। ঘরে হয়তো তিন-চারটে দরজা—একটা তার মধ্যে বন্ধই থাকে সর্বদা। ঘরে জো-সো করে একবার ঢুকে সেই দরজার খিল খুলে রেখে এসো। রাত্রে শোবার সময় চালু দরজায় খিল ডবল করে দেবে, ছিটকিনি আঁটবে। বন্ধ দরজার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তালার ব্যাপারেও তাই—চাবি আঁটছে-খুলছে, তাতেই খুশি। উল্টো করে ঘুরিয়ে ধরে পিছন দিক দেখতে যাবে না।

গর্ব ভয়ে পচা বলে, ঐ যে কোন্ রৌহিনেয়র বাপের কথা বললে—পাখির মতন ঢুকছে বেরুচ্ছে, আমিও তাই। এই বয়সে—এখনো রোজ রাত্রে। বাড়ির অন্ধিসন্ধি জুড়ে।

বাড়িটা পচার নয় বুঝি? এইসব ঘরবাড়ি জমিজিরেত বাগান-পুকুর তার রোজগারে হয় নি? বুড়ো হয়ে পড়েছে বলে শত্রুপক্ষ বেদখল করে নিয়েছে। শত্রু তার নিজের ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনি এবং অন্য যারা ভোগে-সুখে রয়েছে তারই গড়া বাস্তর উপরে। দোচালা খোড়োঘরখানার ভিতর তাকে আটক রেখে সকলে নেচেকুঁদে বেড়ায়। দিনমানে সকলকে দেখিয়ে বুড়োমানুষটা চুপচাপ তক্তাপোশে পড়ে থাকে। রাত্রির শেষ প্রহরে, ছোটবউ সুভদ্রা অবধি যে সময়টা নিষুপ্ত, বন্দিত্ব ঝেড়ে ফেলে সেকালের পচা বাইটা উঠে পড়ে তখন। নিজের জায়গায় বিচরণ করে। যে ঘরে ইচ্ছা ঢুকে পড়ে, বাক্স-পেঁটরার মধ্যে যেটা খুশি খুলে ফেলে। হাতের আর মনের সুখ করে নিয়ে আবার রেখে দেয়। মরার পরে প্রেতাত্মা নাকি নিশিরাত্রে অলক্ষ্যে এমনি ঘোরাফেরা করে। পচা বাইটার তাই হয়েছে—মৃত্যুলোকেরই প্রাণী সে এখন। শ্মশানের বদলে বাইরের দোচালা ঘরটুকুতে সকলে মিলে তাকে বিসর্জন দিয়েছে।

আজকে সাহেব নিঃশব্দে সহজভাবে উঠানে বেরিয়ে এলো। বর্ধনবাড়ি নিশুতি। ছোটবউও ঘুমিয়ে গেছে বাইটামশায়ের হিসাব মতো। সত্যি তাই, উঠানের কোন প্রান্তে ছায়ামূর্তি নেই।

আট

বালগোপালের মূর্তি—দিব্যি বড়সড়, ফুটফুটে বাচ্চাছেলের মত। টানা চোখ, হাসি-হাসি মুখ। দুষ্টামির ভাব মুখের উপর। অর্থাৎ ফাঁক পেলেই ননী-চুরির কর্মে লেগে ওড়েন আর কি চতুর ঠাকুর। সুধামুখীর বড় ভাল লাগে। গোপাল সকৌতুকে যেন তার দিকে তাকাচ্ছে। খানিকটা দূরে গিয়ে সুধামুখী মুখ ফিরিয়ে দেখে। ডাকছে যেন তাকে: মা আমি বাড়ি যাব। সত্যি সত্যি ঠোঁট নড়ছে। মাটির পুতুল ডাকাডাকি করছে—তাই কখনও হয়! তবু স্থির থাকতে পারে না, পায়ে পায়ে ফিরে আসে আবার দোকানে। দোকানিকে বলে, পয়সা এখন কাছে নেই। এ গোপাল অন্য কেউ যেন নিয়ে না যায়। বাসা থেকে পয়সা নিয়ে আসছি।

বাসায় যেন পয়সার ভাণ্ডার—মুঠো করে এনে দিলেই হল। পারুলের কাছে ধার করতে হয়। ঘরের একটা কোণ এবং সেই দিককার দেয়ালটায় বালতি বালতি গঙ্গাজল এনে ঢালে। জলচৌকিটা গঙ্গায় নিয়ে রগড়ে রগড়ে ধোয়। অশুচি লেশমাত্র লেগে না থাকে। জলচৌকির উপর ঘরের ঐ কোণটায় গোপাল এনে বসাল। ঘুরে ফিরে এপাশে-ওপাশে সুধামুখী কত রকম করে দেখে। দেখে দেখে ছ-চোখের আশ মেটে না।

এই এখন সকলের বড় কাজ সুধামুখীর। গোপাল নিয়ে পড়ে আছে। কাপড় পরাচ্ছে, জামা পরাচ্ছে। টিপ পরাচ্ছে কপালে। পুঁতির মালা গেঁথে গেঁথে রকমারি গয়না বানাচ্ছে—সে গয়না একবার পরায়, একবার খোলে। সন্ধ্যার পরে শুইয়ে দেয়, সকালবেলা তুলে বসায়। মাটির বস্তু বলে স্নানটা চালানো যাচ্ছে না। আমতলার দিকে গাঁদা-দোপাটি ফুলগাছ কয়েকটা—ফুল তুলে জলচৌকির উপর সাজিয়ে দেয়। খেলনা-রেকাবি ভরে ভোগ সাজিয়ে গোপালের মুখের কাছে ধরে।

এই খেলা চলেছে অহরহ। মেয়েগুলো চোখ-ঠারাঠারি করে: যৌবন চিরকালের নয় রে ভাই। বৃদ্ধ হলে আমরা তপস্বিনী হই। হতেই হবে যদি না সময় থাকতে আখের গুছিয়ে নিতে পারি।

পারুল ঝঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে: কাণ্ডখানা কি দিদি, সমস্ত ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসিনী হতে চাও?

সুধামুখী বলে, ছাড়ছি কোনটা রে! তুই রাণীর এত খবরদারি করিস সন্ন্যাসিনী তুইও তবে। যেখানে যত মা আছে, সবাই সন্ন্যাসিনী।

এর পিছনে কত আশাভঙ্গের কথা! নিভৃতে ভাবতে গিয়ে পারুলের চোখে জল এসে যায়। তার রাণীর সঙ্গে সুধামুখী গোপালের তুলনা করল। ঠাকুর নয়, শয়তান। সংসারের বড় সাধ ঐ হতভাগীর। সংসার যতবার আঁকড়ে ধরতে যায়, লাথি খেয়ে ফেরে। গোড়া থেকেই ধরো না। বিয়ে হল—বলিষ্ঠ পৌরুষময় বর, লেখাপড়া জানা। সন্ধ্যারাত্রে বর নিয়ে মনের আনন্দে শুয়েছে, শেষরাত্রে কলেরা। পরদিন বেলা শেষ না হতেই বর চিতায় উঠল। তারপরে ভরা যৌবনের দিনে আর একজন উদয় হয়ে মনপ্রাণ রাঙিয়ে তুলল। বিপদের ইঙ্গিত বুঝে সুধামুখী বলে, বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক তবে—ভিনজাত, রেজিস্ট্রী বিয়ে হোক। সে মানুষ বলে, বিলাত-দেশ নয়, বিয়েতেও কলঙ্ক ঘুচবে না, বিষ খাও।

দায়ী যখন দুইজনেই, দুজনকে খেতে হবে একসঙ্গে।

সাইনাইড বিষ সংগ্রহ হয়েছে। কিঞ্চিৎ মুখে দিয়ে সুধামুখী কোটা ধরে এগিয়ে দিল: এবারে তুমি।

সে-মানুষ কৌটা ছুঁড়ে পিঠটান। ধরতে পারলে সুধামুখী তার প্রাণটাও বুঝি সঙ্গে নিয়ে যাবে! প্রাণ নিত না ঠিকই, অমন প্রাণ ঘৃণার বস্তু—ঘা কতক খাংরা মারত। আর সেই বস্তু বিষও নয়, সৈন্ধবনুনের গুঁড়ো। বেঁচে রইল সুধামুখী। সে-মানুষ ভেবেছিল চুকেবুকে গেছে—শেষটা গর্ভের মেয়ে মেরে নিষ্কলঙ্ক হতে হল। জলে ভেসে এসে আবার একদিন ছেলে কোলে উঠল, কষ্ট করে বড় করল তাকে। পাখা বেরিয়ে সেই ছেলেও এখন তেপান্তরের মুলুকে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সুধামুখী হেসে বলে, এবারের গোপাল ছেলেটা আমার বড় সুশীল। ছটফট করে না, বায়নাক্কা নেই কোনরকম। যা বলি চুপচাপ শুধু শুনে যায়। বসিয়ে দিলে বসে থাকে, শুইয়ে দিলে শোয়।

পারুল বলে, সাহেব তেপান্তরে ঘুরুক আর যা-ই করুক দিদি, মায়া এখনো ষোল আনা তোমার উপর। কালও তো শুনলাম মনিঅর্ডার এসেছে।

স্নিগ্ধ চোখে গোপালের দিকে চেয়ে সুধামুখী বলে, এই ছেলে বড় হোক, দেখিস তখন। ঘর ছেড়ে এক পা নড়বে না—যা কিছু আমার দরকার, ঘরে বসেই সমস্ত দেবে।

আর এক বড় কাজ—গোপালকে গান শোনানো। অতি মধুর গলা। সুরেই প্রাণ কেড়ে নেয়, তার উপর শিশু ঠাকুরের কাছে আজেবাজে গান চলে না—মহাজনদের রচিত পদাবলী-কীর্তন। গানের চর্চায় সুধামুখী উঠে-পড়ে লেগেছে—ভাল গান কত দূর ভাল গেয়ে প্রাণ মাতানো যায়, দিবারাত্রি সেই সাধনা। তখন যেন সম্বিত থাকে না—দু-চোখের জল বয়ানে ধারা হয়ে পড়ে। বস্তিবাড়ির যে যেখানে ছিল, কাজকর্ম ফেলে সুধামুখীর ঘরের সামনে ভিড় করে তখন।

গানের নামডাক বস্তির বাইরেও যাচ্ছে। বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে এবার। জন-কয়েক এসে প্রস্তাব করে, খোল-কত্তাল একতারা-হারমোনিয়াম নিয়ে পুরোপুরি কীর্তনের দল করি আসুন। পুণ্যি আছে, পয়সাকড়িও আছে। গোপাল একলা কেন শুনবেন, মানুষজন সবাই শুনুক আসর জমিয়ে বসে। থালা ভরে পেলা দিক।

নফরকেষ্ট কলকাতায় ফিরছে। ক্রমশ কালীঘাট-টালিগঞ্জ-চেতলায় তার নিজের কোটে এসে পড়ল। গাবতলির হাটে-সাহেব সেই নিরুদ্দেশ হল—সাহেবকে ফেলে সুধামুখীর সামনে আসতে ভরসা পায়নি। এখানে ওখানে অনেকদিন গেছে—অবশেষে মরীয়া হয়ে একদিন আড্ডির বস্তিতে ঢুকে পড়ে।

শহরে এসে একে একে পুরানো নেশার টান ধরছে, সুধামুখীকে বাদ দিয়ে কতদিন পারবে ?

পড়বে গিয়ে তো তোপের মুখে—সেই সময় কি বলে কোন্ কৌশলে মাথা বাঁচবে, অনেক দিন ধরে মনে মনে মহড়া দিয়ে নিয়েছে। নিরীহ মুখের প্রথম কথা : কেমন আছে সব, সাহেবের খবর কি ? অর্থাৎ সাহেবের পালানোর বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষরে নফরকেষ্ট জানে না—কোনরকম যোগাযোগ নেই তুজনের ভিতর।

কিন্তু দেখা সর্বপ্রথম রানীর সঙ্গে। বড় বড় চোখ মেলে মুহূর্তকাল রানী অবাক হয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে বুঝি একটু। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

রানী তো রাজরানী ! সেদিনকার একফোঁটা মেয়েটাকে একেবারে চেনা যায় না। বিধাতাপুরুষ নতুন করে গড়ে-পিঠে বানিয়েছেন। সাজপোশাকে গয়নায় পারুল সাজিয়েছেও বটে আদরের ধনকে। ঝুনঝুন করে পায়ের তোড়ার আওয়াজ তুলে রাজরাজেশ্বরীর মতো রানী এসে দাঁড়াল। এবং সারাপথ নফর যা তালিম দিয়ে এসেছে, সেই কথাগুলোই কেড়ে নিয়ে রানী বলে, সাহেবদা'র খবর কি ?

নেই বুঝি সে এখানে ? নফরকেষ্ট আকাশ থেকে পড়ে : আমি তো মা অনেকদিন বাইরে বাইরে। আমি কি করে জানব তার খবর ?

সে আর তুমি একই দিনে বেরুলে। সবাই বলে, তুমি সঙ্গে নিয়ে গেছ।

ঠিক এই কথাগুলোই সুধামুখীর মুখ থেকে শোনবার কথা। বলছে রানী। নফরকেষ্টও জবাব নিয়ে তৈরি। রাগ করে চেঁচিয়ে উঠতে হয় এর জবাবে : না, না—একশ' বার বলছি, না। আমার পথে আমি গেছি—সে যদি গিয়ে থাকে, তার আলাদা পথ। কত আমার আপন কিনা, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ! কারো সে আপন নয়, চরম স্বার্থপর ছোঁড়া—

আরও বিস্তর কথা ঠিক করা আছে। অনেকক্ষণ ধরে বলা চলে। কিন্তু রানী আঁচলে অবিরত চোখ মুছছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এই সেদিন মেয়েটাকে জন্মাতে দেখল, কোলেপিঠে নিয়ে বেড়িয়েছে কত ! মনটা কেমন কেমন করে উঠল নফরকেষ্টর, গলা দিয়ে ভিন্ন সুর বেরিয়ে আসে : হয়েছে কি তোর রানী ?

রানী ঝুপ করে মাটিতে নফরার পায়ের উপর পড়ল। দু পায়ে মাথা কুটছে : জান তো বলে দাও নফর-মেসো। আমার বড্ড দরকার।

হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে কালীমন্দিরের সামনে পাঁঠা বলি দেয়। বলির পাঁঠাই বুঝি মানুষের গলায় আর্তনাদ করছে। বলির পরে কবন্ধ পশুর ধড়ফড়ানি—

সে বস্তু খানিকটা যেন রানীর ঐ মাথা-কোটার মতো। কালীঘাটের মানুষ—মন্দিরে গেলেই বলি চোখে পড়ে। তুলনাটা তাই আপনাআপনি মনে এসে যায়। রানীকে তুলে ধরে সস্নেহে নফরকেষ্ট বলে, আরে পাগলী, বলবি তো সব কিছু! তাকে না পাস আমি তো আছি। সাহেবের আপন-জন। বল্ কি হয়েছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানী বলে, কিছু আমি বলতে পারব না। সাহেব-দা'কে চাই। এ-বাড়ি আমি থাকব না, আমায় সে নিয়ে যাক।

নফরকেষ্ট ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ভবঘুরে বাউণ্ডুলে একটা—সে কোথা নিয়ে যাবে তোকে?

যেখানে তার খুশি। আমি কি ভাল জায়গা চাইছি, ভাল খেতে পরতে চাইছি? খবর জানো তো বলে দাও নফর-মেসো, তোমার পায়ে পড়ি।

আবার পা ধরতে যায়। এমনি সময় গলা শুনেই বুঝি সুধামুখী বেরিয়ে এল। পলকে রানী পালিয়ে যায়। কথাবার্তা কিছু কানে গিয়ে থাকবে সুধামুখীর। বলে, রানী অমন করে ছুটল কেন?

এতকাল অদর্শনের পর নফরকেষ্ট ফিরছে, সে সম্বন্ধে একটি কথা নয়। পুরানো ব্যাপার—এর চেয়ে আরো বেশি দিন সে বাইরে থেকে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব একটা পাওয়া যাবে—সত্যি জবাব নয়। এতক্ষণ সুধামুখী গোপালের কাছে ছিল—আজেবাজে কথা-কথান্তর ভাল লাগবে না। রানীর কথা তাই জিজ্ঞাসা করে: বলছে কি রানী?

সাহেবের খবর নিচ্ছিল। সাহেব কোথায় আছে, আমি কেমন করে বলব? কালীঘাটে নেই, তাই তো জানতাম না।

সুযোগ পেয়ে তালিম-দেওয়া কথাগুলো শুনিয়ে দেয় সুধামুখীকে। শুনিয়ে সোয়াস্তি পেল। সুধামুখী বলে, যেখানে থাকুক ভালই আছে, রোজগারপত্তর করছে। তিনবার এর মধ্যে মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়েছে। অল্প টাকা—কিন্তু মনে করে পাঠাচ্ছে তো। আমায় তার মনে আছে।

নফরকেষ্ট কৌতূহলী হয়ে ওঠে: তবে তো তুমি সব জান। রানী তোমার কাছে জেনে নিলে পারে। কোথায় আছে সাহেব এখন?

ঠিকানা জানিনে, চিঠিপত্র লেগে না। মনিঅর্ডারের কুপনে কত-কিছু লেখা যায়, খরচা লাগে না—কিন্তু সাহেব লেখে নাম আর টাকার অঙ্ক। পিওনকে ধরলাম: ফরমে প্রেরকের কোন ঠিকানা আছে? চিঠি দিলাম, ভুয়ো ঠিকানা সেটা, শিলমোহরের অনেক ঘা খেয়ে সে চিঠি অনেকদিন পরে ফেরত এলো। সেই পোস্টাপিসের অধীন সে-নামের কোন গ্রাম নেই।

ঘরের মধ্যে গিয়ে নফরকেষ্ট কুপন উল্টে-পাল্টে দেখে। নাম-সই সাহেবেরই —ছয় টাকা চার আনা। পর পর তিন মাস পাঠিয়েছে। টাকা বরাবরই ছয়, আনায় হেরফের—কোনবার কিঞ্চিৎ বেশি, কোনবার কম। সাহেব কোন মাইনের কাজকর্ম ধরেছে নিশ্চয় এখন।

সহসা মন্তব্য করে ওঠে: বেটা বাপ-মায়ের স্বভাবখানা পেয়েছে।

সুধামুখী চমক খেয়ে বলে, কারা ওর বাপ-মা, জানতে পেরেছ নাকি?

মানুষ জানিনে, কিন্তু স্বভাব জানি বটে। এককোঁটা মায়ামমতা নেই তাদের। থাকলে আপন-ছেলের গলা টিপে জলে ফেলতে পারত না। এমন ছেলে—পর-অপর হয়েও আমরা তার জন্য আকুপাকু করে মরি।

সজোরে নিশ্বাস ফেলে আবার বলে, সাহেবও ঠিক তাই। এককোঁটা মায়ামমতা নেই ওর মনে। কারো সে আপন নয়।

সুধামুখী ঘাড় নেড়ে প্রবল আপত্তি করে বলে, অমন কথা মুখেও এনো না নফর। মায়ায় ভরা আমার সাহেব। যেখানেই থাকুক ভুলতে পারে না। ঘাটে-পথে শ্মশানের ভিতরেও দেখেছি। জানে আমার অভাব-অনটনের কথা—মুখ ফুটে চাইতে হয়নি—যা কিছু থাকে, মুঠো ভরে দেয়। কী দিল, তাকিয়েও দেখে না।

নফরকেষ্ট লুফে নিয়ে বলে, আমারও ঠিক সেই কথা। টাকাপয়সা বলে এক তিল ওর মায়া নেই। দেখ না, আনা অবধি মনিঅর্ডার করেছে। পয়সার মনিঅর্ডারের নিয়ম নেই, সেইজন্যে পারে নি। যখন কাছাকাছি ছিল, পকেট উল্টে উজাড় করে তোমায় ঢেলে দিত। নোংরা-আবর্জনা সরিয়ে দিয়ে যেন সাফ-সাফাই হল। মানুষের বেলাতেও ঠিক তাই। যত এই দিচ্ছে—তুমি ভাবো মায়ায় পড়ে, আমি জানি দয়া করে। কোনমানুষ কোনদিন ওর আপন হবে না। উদাসী সাধু-ফকিরের মতো। সংসারে না থেকে ও-ছেলে ভগবানের পথেও যেতে পারত।

সুধামুখী সহসা তিক্ত হয়ে বলে ওঠে, কিন্তু নিয়ে তো নিলে তোমার চুরির পথে—

নফরকেষ্ট বলে, ভাল চোর আর সাচ্চা সাধুতে তেমন কিছু তফাত দেখিনে। ভালো চোরের আশেপাশে থেকে বুঝে-সমঝে এলাম। কারিগর চোর থলিসুদ্ধ ডেপুটির দিকে ছুঁড়ে দিল। ডেপুটি দিল মহাজনের কাছে। ন্যায্য বখরা ঠিক ঠিক ঘরে এসে সরে যাবে, পাই-পয়সার এদিক-ওদিক হবে না। সিঁধ-কাঠি ধরে যা নেবার সোজাসুজি আমরা নিয়ে নিই। মক্কেলও ক্ষতির হিসাব সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যায়। অলিগলির চোরাপথে বেমালুম পরের মাল পাচার করে মুখে, সাধু সাধু বুলি কপচায়, তাদের চেয়ে অনেক ভাল চোর-ছ্যাঁচোড় আমরা।

নয়

পিঠে খেয়ে পরের দিন বিষম কাণ্ড। হয়তো বা সুভদ্রা-বউয়ের শাপমন্যি এর মূলে। পেট ছেড়ে দিল বুড়োমানুষ পচার। সঙ্গে বমি। বড়বউয়ের দেখা যাচ্ছে যা-একটু দয়ামায়া। কিন্তু গিন্নিবান্নি মানুষ, এক দঙ্গল ছেলেপুলের মা, ভাঁড়ারের চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে এ-ঘর-ওঘর করে বেড়ায়। সময় কোথা শ্বশুরের কাছে বসবার? এসে তবু ঘুরে যায় এক-একবার, মহিন্দারকে করকচি-ডাব পেড়ে মুখ কেটে দিতে বলে। জায়গাটাও একবার-দুবার নিজ হাতে সাফ করে দিয়ে গেছে। আর ছোটবউ সুভদ্রার গতিক দেখ—বাঁজা মানুষ, কাজ খুঁজে পায় না তো কার্পেটের উপর উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি তুলছে। শ্বশুরের ঘরে তবু একবার উঁকি দিতেও যায় না।

পরের রাত্রে সাহেব এসে দেখে এই ব্যাপার। ভাল হল। মানুষটার জন্য নয় ঠিক—এ হেন গুণীমানুষ মরে গেলে বিদ্যাটাও যে তার সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাবে। মন নরম হয়েছে, একটু-আধটু করে মুখ খুলছিল—খাড়া করে তুলতেই হবে যেমন করে হোক।

বড়ছেলে মুরারি জমিদার-কাছারির নায়েব। কাছারির কাজকর্ম সেরে অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরল সে। জিজ্ঞাসা করে, অসুখ কেমন? মিনমিন করে বড়বউ কি একটা জবাব দিল—শোনা যায় না এত দূরের ঘরের ভিতর থেকে। খাওয়াদাওয়া সেরে পান চিবোতে চিবোতে কোঠাঘরে গিয়ে মুরারি শুয়ে পড়ল। অপর ছেলে মুকুন্দ বাড়ি থাকলে বোধকরি জিজ্ঞাসাটুকুও করত না—চোর বাপের উপর এতদূর বিতৃষ্ণা! কিন্তু সাহেবের কথা আলাদা। পচা বাইটা বাপ নয় তার, ওস্তাদ। বিদ্যা আদায়ের ফিকিরে আছে। বিদ্যাটুকু পাওয়া হয়ে যাক, তারপরে পচা বাইটা তুমি অর্ধেক-মড়া হয়ে ঘরের তক্তাপোশে পড়ে আছ, কিংবা পুরোপুরি মরে চিতার উপর চড়েছে, বয়ে গেছে চোখ তুলে দেখতে।

রাত্রির পাটোয়ার-বাড়ি ফেরা চলবে না। পচার সাড়া নেই, আলো জেলে সাহেব সতর্ক চোখে ঠায় বসে আছে। কী করছে আর কী না করছে! করকচির জল খাওয়ায় ঝিনুকে করে, বার্লি খাওয়ায়, পাখা করে। একরকম হাত পেতেই মুখের বমি ধরছে। মাদুর নোংরা করে রেখেছে, ধোওয়ার জন্য ঐ রাত্রে পুকুর ঘাটে নিয়ে গেল।

নিশাচরী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে পাড়ের উপর। একনজর দেখে নিয়ে বলে ওঠে, ছিঃ—ছিঃ!

সাহেব চমকে তাকায়: কি বলছেন বউঠান?

অমন স্বর্গের চেহারা নিয়ে নরক ঘাঁটতে ঘেন্না করে না ঠাকুরপো?

সাহেব তিক্তকণ্ঠে বলে, নরক হতে দিয়েছেন কেন? কাজটা তো আপনাদেরই। দুর্গন্ধে ঘরের ভিতর তিষ্ঠানো যায় না। বাইটামশায়ের বেহুঁশ অবস্থা—ফেলে যেতেও পারি নে।

অন্যদিনই বা কি করে থাকো ভেবে অবাক হই। ভেদবমির কথা বাদ দিয়ে মানুষটারই তো বেশি দুর্গন্ধ। একজনে সেই দুর্গন্ধে ঘরবাড়ি ছেড়েই সরে পড়ল। নামের মধ্যেও দুর্গন্ধ। বাহাদুর বলি শ্বশুরের বাপ-মাকে, জন্ম থেকেই কেমন করে বুঝে ফেলে নামকরণ করেছিলেন। টাটকা নয়, তাজা নয়—একেবারে সেই নাম, আমি যাকে বাসি বলে থাকি।

ভিজে, মাদুর সাহেব উঠানের আড়ে ঝুলিয়ে দেয়, জলটা এইখানে ঝরে যাক। 'আপনি' থেকে কখন তুমিতে এসেছে, কি জন্যে এসেছে—তা সে জানে না।

সুভদ্রা বলে, কোমর বেঁধে শত্রুতায় লেগেছে, কেন বল দিকি? যমরাজ ভয়ে ও-লোকের কাছ ঘেঁষেন না—হয়তো দেখবেন, যে মহিষ চড়ে এসেছেন, কোন্ ফাঁকে চুরি হয়ে গেছে সেটা। চোরকে সবাই ডরায়। আমার বাবাই কেবল ডরাল না। বসে, স্থবির হয়ে পড়েছে, ক'টা দিন আর! মানুষটা গেলে জমিজিরেত দালানকোঠায় তো দাগ লেগে থাকবে না। পায়ের উপর পা দিয়ে ভোগ করিস। সে-ও তো হয়ে গেল আজ—

বিড়বিড় করে হিসাব করে নিয়ে কান্নার সুরে বলে উঠল, ও ঠাকুরপো, আট বছর হয়ে গেছে। আট-আটটা বছর ঐ এক ঘরে, এক বিছানায় এক ভাবে পড়ে রয়েছে।

মানুষটার এখন-তখন অবস্থা, পুত্রবধূ সেই সময়টা হিসাব নিয়ে পড়েছে। কান জ্বালা করে শুনতে। দ্রুতপায়ে সাহেব ঘরে ঢুকে গেল। সুভদ্রা মরে গেলেও ঢুকবে না—যে কথা ঐ বলল, ভেদবমির ভয়ে নয়, মানুষটারই দুর্গন্ধে। নিরাপদ দুর্গ অতএব—ঢুকে পড়ে সাহেব নিশ্চিন্ত।

সকালবেলা কাজের গরজে পাটোয়ার-বাড়ি ফিরতে হল কিন্তু সাহেবের মন পড়ে থাকে পচার কাছে। খেতে দিচ্ছে, মাইনে দিচ্ছে দীনু পাটোয়ার, তার কাজ ফেলে দিনমানে আসা চলে না। সন্ধ্যা হতে না হতে গরুর জাবনা দায়সারা গোছ মেখে দিয়ে পালায়। তিন-চার দিন চলল সেই এক অবস্থা। বড় শক্ত

বুড়ো—যমরাজ সাহসে ভর করে এবারে বোধকরি দোরগড়া অবধি এসেছিলেন, নিরাশ হয়ে ফিরতে হল।

এরই ভিতর সুভদ্রা আবার একদিন সাহেবকে ধরেছিল। টিপিটিপি বাড়ি ঢুকছে, সেই সময়টা—বাইটার ঘরে ঢুকে পড়বার আগেই বলে, আমারও পালটা শত্রুতা তোমার সঙ্গে। বাসি বাইটার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে, মতলব তোমার ভাল নয়। জব্দ তোমায় করবই—এবাড়ি আসা যাতে বন্ধ হয় তাই করব। ভেবেছিলাম, কোন একদিন রাত দুপুরে চিৎকার করে বড়-বর্ধনের কানে তুলে দেব—তুমি আমার হাত ধরে টানাটানি করছ। বাড়িসুদ্ধ রে-রে করে এসে পড়ে উচিৎ শিক্ষা দেবে।

সেদিন জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার মধ্যে সুভদ্রা কি রকম তাকাচ্ছে—মাথা খারাপ বোধহয় বউটার। হাত ধরে আজই না টানাটানি করে এবং মুলতুবি চিৎকারটা জুড়ে দেয়।

সুভদ্রা বলে, ভেবেছিলাম এমনি এত কি। কিন্তু ফিকির পেয়ে বড়-বর্ধন আমাকেও তো দূর করে দেবে বাড়ি থেকে। কলঙ্ক রটাবে। জমিদারি সেরেস্তার ঘুঘু নায়েব—চাচ্ছেও ঠিক এই জিনিস। ভাইটা সরেছে, আমি সরে গেলে একচ্ছত্র অধিপতি। ঠাকুরপো, আমি বড় দুঃখী।

গর্জন করে উঠেছিল, মুহূর্তে কেঁদে পড়ে চোখে আঁচল দেয়। মাথার গোলমাল ঠিকই। বলে আমায় কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না। যার উপর মেয়েমানুষের সকল নির্ভর, সে মানুষটা পর্যন্ত বিরূপ। ভাসুর সেই জন্যে জো পেয়ে গেছে। বাপ-মা দুজনেই গত হয়েছে, ভাইও একটা নেই। বাপের ভিটেয় ঘুঘু চরে বেড়ায়। পা বাড়ানোর জায়গা নেই এত বড় দুনিয়ার উপরে। হাত ধরে টানাটানি কিম্বা চিৎকার করে কলঙ্ক রটানো—তার মধ্যেও হয়তো সাহেব দাঁড়াতে পারত। কিন্তু হেন অবস্থায় পালানো ছাড়া উপায় নেই। তারও চোখ ভিজে আসবে, কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে। পাশ কাটিয়ে একছুটে সাহেব পচার ঘরে ঢুকে পড়ে। সেই নিরাপদ দুর্গে।

ক'দিনের সেবাশুশ্রূষায় বড়বউয়ের সঙ্গেও সাহেবের পরিচয় হয়েছে। বড়বউ প্রস্তাব করে: দিনমানেও ক'টা দিন থাকো না। তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

সাহেব বলে, সঙ্কট পার হয়ে গেছে, আর ভয় নেই।

বুড়োমানুষের ব্যাপার কিছু বলা যায় না। চোখে দেখছ দিব্যি ভাল, নাড়ি ধরে হয়তো বা নাড়ি মেলে না। শতেক কাজ আমার—ভাল করে একবার

তাকিয়েও দেখতে পারেনি। গা কাঁপে—দেখাশোনার অভাবে ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেলে চিরকাল মনের মধ্যে কাঁটা ফুটবে।

সাহেব অবাক হয়ে তাকাল। বাড়ির মধ্যে আছে তবে এমনি ধারা কথা বলার একজন। বড়বউ বলছে, থাকো এসে তুমি। এইখানে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিও। পাটোয়ারদের বলেকয়ে কাপড়-গামছা নিয়ে চলে এসো। ভাল করে সেরে উঠলে চলে যেও।

ভালই হল, সাহেবের, শাপে-বর হয়ে গেল। এককথায় সে রাজি। ভ্রুভঙ্গি করে বলে, বলাবলির ধার ধারিনে। কী এমন চাকরি গো! গরু রাখা আর ধানের হিসাব রাখা—আবাদ অঞ্চলে এখন যার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াব, সে-ই চাকরি দেবে।

সৌদামিনি নামে এক বিধবা মেয়ে রাঁধাবাড়ার কাজ করে—মুরারি-মুকুন্দর বোন হয় কি রকম সম্পর্কে। এক দুপুরে পচার ঘরে ভাতের থালা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে, মুরারির নজরে পড়ে গেল। সকালবেলার কাছারি সেরে বাড়ি ফিরছে সে তখন। দ্রুতপায়ে চলে এসে সৌদামিনীর পথ আটকে জিজ্ঞাসা করে, ভাত কোথায় দিয়ে এলি?

দুই থালা যেন দেখলাম—

ধরা পড়ে সৌদামিনী চুপ করে থাকে। ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে বড়বউ এগিয়ে এল। স্বামীকে যমের মতো ডরায়। কৈফিয়তের ভাবে বলে, ঐ যে ছেলেটা—দেখেছ তুমি তাকে, একটা থালায় করে তাকেও চাট্টি দিতে বললাম। রাত নেই দিন নেই যা সেবাটা করল—ওরই জন্যে এ যাত্রা রক্ষে হয়ে গেল। ভাবলাম, গৃহস্থবাড়ি দুপুরবেলা না খেয়ে থাকবে, সেটা ভাল হয় না—

ধমক দিয়ে মুরারি থামিয়ে দিল: ভাবনাটা আমার জন্যে রাখলেই হত। মরিনি আমি, দুপুরে ফিরে এসে আমিও তো খাব।

স্ত্রীর দিকে কঠিন দৃষ্টি হেনে মুরারি সেই ধূলো-পায়ে বাপের ঘরে উঠল। পচা আর সাহেব সামনা-সামনি বসে খাচ্ছে।

অসুখ তো সেরে গেছে, এখনো ছোঁড়া তুই কি জন্যে ঘুরঘুর করিস? কি মতলব? কাজকর্ম নেই কিছু তো?

তম্বি সাহেবের উপর। সাহেব বলার আগে পচা তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দেয়: কই আর সারল। ধরে বসাতে হয়, ধরে তুলে বাইরে নিতে হয়—

মুরারি বলে, অসুখ নয়, সেটা বয়সের দোষ। ঐ একটু ধরে তোলার অজুহাতে ছোঁড়া তুই থালা থালা ভাত ওড়াবি? অত মজা চলবে না। ভাবে পয়সা লাগে, ভাত এমনি আসে না।

সাহেবের চোখ দুটো ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু রোগশীর্ণ পদার দিকে চেয়ে সামলে নিল। ঠাণ্ডা গলায় বলে, উনি বলেন সেই জন্যে রয়েছি। দরকার না থাকলে তক্ষুনি বিদায় হয়ে যাব।

মুরারি খিঁচিয়ে উঠল: উনি আর বলবেন না কেন। গতর খাটিয়ে পয়সা আনতে হয় না, অনন্তশয্যায় চিত হয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে গল্প করার মানুষ পেয়ে গেছেন একটা। কিন্তু এর পরেও যদি পড়ে থাকিস, ভাত পাবিনে। উপোসি থাকতে হবে।

সাহেব গজর গজর করে: বার বার খাওয়ার খোঁটা, মানুষ যেন এই বাড়িতেই শুধু খেয়ে থাকে। খেয়ে খেয়েই এতখানি বয়স হয়েছে, এখান থেকে চলে গিয়ে তখনো খাব। খেতে কে চেয়েছে? এতদিনের আসাযাওয়া— খেয়েই তো আসি বরাবর। খাতির করে বলা হল খাওয়ার জন্যে, ভাত বেড়ে সামনের উপর ধরা হল। মা-লক্ষ্মীর ভাত কে ছুঁড়ে ফেলবে?

কী না জানি ঘটে যায়, মুরারির পিছু পিছু বড়বউও চলে এসেছে। তার উদ্দেশে মুরারি দন্ত-কড়মড়ি করে: কার ভাত কে বেড়ে পাঠায়। খাওয়াতে ইচ্ছে যায়, তোমার বাপের বাড়ি নিয়ে গিয়ে যত খুশি অতিথিসেবা করোগে! ... াসের মতন গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা দিচ্ছে, দিয়েই চলেছে—তাদের গেলাতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। তার উপরে অতিথি! লজ্জাঘেন্নাও নেই।

ঝড়তুফান বড়বউয়ের উপরে প্রায়ই বয়ে যায়, নতুন কিছু নয়। চুপ করে স দাঁড়িয়ে আছে, খাওয়া হলে থালা দুটো তুলে নিয়ে যাবে। রাগের ঝাল মিটিয়ে মুরারিও চলে যাচ্ছিল—

এমন সময় বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত। সুভদ্রার কণ্ঠ—বাইরের দাওয়ায় কখন ন এসেছে, হঠাৎ কেমন মেজাজ হারিয়ে ফেলে। ভাসুর বলে মান্য করে না। সৌদামিনী যদিচ কোনদিকে নেই, বলছে তবু তাকেই উদ্দেশ করে। মুরারি হয়ে শোনে। বলে, ছোড়দি, আমার নাম তুমি কি জন্যে চেপে গেলে? ওঁদের গণ্ডা গণ্ডা বাচ্চা, আমার একটাও নয়। একজন কেন, এক গণ্ডা-দুগণ্ডা অতিথিসেবার এক্তিয়ার আছে আমার। দিদি নয় আমিই ভাত বেড়ে পাঠিয়েছি তোমার হাত দিয়ে। খুলে বললে না কেন ভাসুরঠাকুরকে—

মুরারি নিস্তব্ধ হয়ে থাকে এক মুহূর্ত। তারপর খলখল করে হেসে ওঠে। অদৃশ্য সৌদামিনীকে সে-ও সম্বোধন করে: ওরে সদু, বলে দে, ভাসুর হয়ে ভাদ্রবধূর সঙ্গে কোন্দল করি কেমন করে? কুকুরে মানুষ কামড়ায়, তাই বলে মানুষ কখনো কুকুর কামড়ায় না। বলে দে পৈতৃক জমাজমি এক কাঠাও বজায় নেই ওঁদের। খাজনা না দিলে জমিদারে জমি নিলাম করে। সেই নিলাম

বড়বউ স্ত্রীধনে খরিদ করে নিয়েছে। বাড়িসুদ্ধ তারই খাচ্ছি এখন। ছোটবউমা নিজেই অতিথি—অতিথি আবার অতিথি আনবে কেমন করে ?

শেষ করে চলে যাচ্ছিল, আবার কিছু মোক্ষম কথা মনে এলো। ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, মহা বিদ্বান আমার মাষ্টার ভাই, মাস গেলে খাতায় সই করে পঁচিশ টাকা, পায় সত্যি পনের কি আঠারো। একবেলা ভাত আর একবেলা চিঁড়েমুড়ি খায়—দু-বেলা ভাতের সঙ্গতি নেই। বিবেচক ভগবান তাই বুঝেই ওদের কোলে-কাঁকালে দিলেন না। ছেলেপুলে হয়নি তবু রক্ষে। দেমাক করতে মানা করে দে সদু, ভাঙা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বেড়ালে লোকে হাসে।

যথোচিত প্রতিহিংসা নিয়ে মুরারি হেলতে দুলতে জামাজুতো ছাড়তে চলল। উঠানের উপর সুভদ্রা পাগলের মতো চুল ছিঁড়ছে, বুক থাবড়াচ্ছে, হাপুসনয়নে কাঁদছে: রোজগার দেখে বিচার হয় না। ধর্মপথে থেকে না খেয়েও সুখ। কাছারির ফুটো গোমস্তা হয়ে চাঁদের মুখে থুতু ফেলতে যান। তার কিছু নয়—থুতু ফেরত এসে নিজের মুখে পড়ছে।

বড়বউ দ্রুত এসে সুভদ্রাকে জড়িয়ে ধরে: ভিতরে চল্ রে ছোট, উঠোনে দাঁড়িয়ে লোক হাসাস নে। বিদেশি ছেলে একটা রয়েছে—তোদের ঝগড়াঝাটি দেখে সে-ই বা কী ভাবছে!

সুভদ্রা কেঁদে পড়ে: ছোটভাইকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি বেনামি করে নিয়েছেন—বেহায়ার মতন তাই আবার জাঁক করে বলা। চোরের বেটা ভুয়াচোর—কিন্তু গুরুজন বলে মুখের উপর কিছুই তো বলতে পারলাম না দিদি।

বড়বউ তাড়াতাড়ি হাত চাপা দেয় সুভদ্রার মুখে। বলে, বেনামি না আরো কিছু! আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম: বলে, ভাইয়ের যা মতিগতি, সম্পত্তি কোন দিন মঠ-মন্দিরে দিয়ে বিবাগি হয়ে বেরুবে। ছোটবউমার তখন উপায়টা কি? কায়দা করে তাই বেঁধে রাখা—ঘরের সম্পত্তি পরের হাতে না চলে যায়।

দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বড়বউ টেনে নিয়ে চলল। কানের কাছে বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে: বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার ওরা ভাইয়ে ভাইয়ে বুঝুকগে। পরের বাড়ির মেয়ে আমাদের কি? আবার তা-ও বলি, ভাসুরের কাছে অমন ক্যাট-ক্যাট করে বলা তো ঠিক হয়নি। এক কথায় দশ কথা উঠে পড়ল। কর্তামানুষ ওরা, পুরুষমানুষ—যেমন খুশি যাক বলে। অতিথি-সেবা হবে না—ওঃ, ঠেকাবে এসে! সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দেবে! আজকে হঠাৎ চোখে পড়েছে, তাই বলে বুঝি ছেড়ে দেবো! যা করবার, করে যাব আমরা।

গোলমাল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে সাহেব হি-হি করে হাসে: কলকাতার বড়

বড় হোটেলে উঁকি দিয়ে দেখেছি—খাওয়ার সময়টা বাজনা বাজে, নাচ হয়। আমাদেরও তাই একদফা হয়ে গেল।

পচাও হেসে বলে, সব অঙ্গের ভিতর কানের খাটনি আজকাল বেশি। ভাবছি, একজোড়া শোলার ছিপি সুতোয় বেঁধে কানে ঝুলিয়ে রাখব। গোলমালের সময়টা ফুটোয় ছিপি আঁটা থাকবে। কাজের মুখে সেটা খুলে ফেলব।

বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে ক্লান্তিতে পচা বাইটা শুয়ে পড়েছিলো। হঠাৎ সে উঠে বসে—বসা ঐ মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব। দুই হাঁটুর ভিতর থেকে জ্বলজ্বল করে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, কান রপ্ত করতে বলেছিলাম, কদ্দুর কি কি হল বল্।

করপোরেশন-ইস্কুলে পড়বার সময় বাড়িতে অঙ্ক করতে দিত। মাষ্টার হুঙ্কার দিয়ে ক্লাসে ঢুকত : হয়েছে টাস্ক ? পচা বাইটার ভঙ্গিটা অবিকল তাই।

সাহেবও সেই আমলের মতো মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, হল আর তেমন কই! আপনার অসুখ হয়ে পড়ল, ফাঁকই তো পেলাম না।

পচা বলে, আজকেই এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যা। আমার বড়ছেলে যা বলে গেল। নিজের আখের তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে। পনের-বিশ দিন পরে আসিস, পরখ করে দেখব।

সাহেব আমতা-আমতা করে, আপনি এখনও ভাল করে সেরে ওঠেন নি বাইটামশায়।

এবারে পচা রেগে উঠল : তাতে তোর কি ? তোর মাথাব্যথা কিসের ? বড়ছেলের বাক্যি কানে শুনলি, ছোটবউয়ের মধু-মাখা বোলও শুনে থাকিস। আপন লোক হয়ে তারা ঐ রকম করে, তোর কোন দায়টা পড়েছে বল দিকি ?

দম নিয়ে আবার বলে, আমার কাছে ঠায় না বসে ঘুরে ঘুরে বেড়া। যেখানে কথাবার্তা, সেইখানে কান পাতবি। নিশ্বাসের শব্দ শুনবি মন স্থির করে। দিনেরাত্রে সব সময় মানুষ ঘুমুচ্ছে—পুরুষমানুষ মেয়েমানুষ বুড়োমানুষ বাচ্চামানুষ কাছে গিয়ে চোখ বুঁজে নিশ্বাসের তফাত বুঝে নিবি। গাঢ় ঘুম, পাতলা ঘুম, সাচ্চা ঘুম মেকি ঘুম—নিশ্বাস সব আলাদা আলাদা। শুধু মানুষ হলেও হবে না—কুকুর বিড়াল গরু-ছাগল যত রকম জীব আছে, নিশ্বাস চিনে ধরতে হবে। ধারালো দুখানা কান তৈরি হল তো কাজের বারো আনা শেখা হয়ে গেল। যেমন যেমন বললাম সেই মতো করে হপ্তা দুই পরে আসিস।

হুঁ—বলে কি বলতে গিয়ে সাহেব চুপ করে যায়। কোমল কণ্ঠে পচা বলে, কি করে ?

মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখে সাহেব ভয়ে ভয়ে বলে, যে রকম

বললেন—কান খাটিয়ে ঘুরে বেড়াব এখন থেকে। কিন্তু থাকতে চাই এক জায়গায়, আপনার পাদপদ্মে। গুরু বলে মান্য দিয়েছি—পদসেবা করব, নিত্যি-দিন সুখের কথা শুনব। বিস্তর শিক্ষা তাতে। খাব না এ-বাড়ি, এত কথা কথান্তরের পরে ভাতের দলা গলা দিয়ে নামবে না—

বলে চলেছে এমনি। পচা অন্য কি ভাবছে! কথার মাঝখানে বলে উঠল, মার খেতে পারিস কেমন তুই? কিল-চড়-ঘুষিতে লাগে?

সাহেবের চমক লাগে। মারের কথা উঠল কেন হঠাৎ? কাছারির নায়েব মুরারি বর্ধনের হাতে লেঠেল-বরকন্দাজ বিস্তর। তারই একদল জুটিয়ে বোধহয় মারধোর দেবার তালে আছে। হায়রে রে হায়, কিলচড় সাহেব কবে খেল যে ফলাফল বলবে! কিল তো কিল, চোখ রাঙিয়ে একটা কথা বলার জো ছিল কারো! সেই একদিনের ব্যাপার—চালাঘর তুলে নফরকেষ্ট শুইয়ে পরখ করবে, ভয় পেয়ে সাহেব সুধামুখীর কাছে ছুটে গেল! কী আগুন তখন তার দুই চোখে—কপিল মুনি চোখের আগুনে সগরপুত্রদের ভস্ম করেছিলেন, নফরকেষ্টও ভস্ম হত আর খানিক দাঁড়িয়ে থাকলে। বাঘিনীর মতো আগলে রেখে সুধামুখী তাকে অপদার্থ করে দিয়েছে—

পচা প্রশ্ন করে: চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন। কোনদিনই ধরা পড়বে না, এমন কথা হলফ করে বলার জো নেই। ধরে তো ফেলল—কি করবে বল্ দিকি সকলের আগে?

সহজ প্রশ্ন, সোজা জবাব। সাহেব বলে, মারবে—

ঘাড় নেড়ে পচা সায় দেয়: তাই। গৃহস্থ মারবে, মারবার লোভে বাইরের মানুষ হুড়দাড় করে ছুটে আসবে। মানুষ মেরে যত সুখ, এমন কিছুতে নয়। মানুষই তখন আর নেই—চোর—মারধোর সেরে হাত বেঁধে চোরকে তো থানায় জমা দিয়ে এল। সেখানেও মার, সে মারের হরেক কায়দা। সামলাতে না পেরে আনাড়ি চোর একরার করে বসে—দলের কথা মালের কথা বলে দেয়।

সেই সর্বনাশ না ঘটতে পারে—বড়বিদ্যার গোড়ার পাঠ তাই। মারখাওয়া শিখে নেওয়া শিক্ষার পদ্ধতি আছে দস্তুরমতো—দলের মধ্যে এ ওকে পেটায়। হাত দিয়ে—ক্রমশ, লাঠি-বেত-বাঁশ যা হাতের কাছে মেলে। পিটিয়ে রক্ত বের করবে। অভ্যাসে গোড়ার দিকে গা-গতর ব্যথা হবে, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়েও পড়তে পারে। রপ্ত হয়ে গেলে তখন আর কিছু না—আদর করে হাত বুলাচ্ছে যেন গায়ের উপর।

পচা বলে, যন্ত্রণা মারগুতোনে নেই—যন্ত্রণা ভয়ের। মারের সময় কত ব্যথাই না জানি লাগবে—ভয়টা সেই। সাধুরা পেরেকের শয্যায় শুয়েবসে থাকে,

বৈশাখের ঠা-ঠা রোদ্দুরে বসে আগুন পোহায়, মাঘের রাতে ঠাণ্ডা দীঘিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ধ্যান করে! গাজনের সন্ন্যাসী পিঠে বড়সি গেঁথে বাঁই-বাঁই করে চড়কগাছ পাক খায়। হয় কি করে এসব?

সাহেব মৃদুকণ্ঠে বলে, ভগবানের দয়া সাধু-সন্ন্যাসীর উপর—

কথা শেষ করতে না দিয়ে পচা বলে ওঠে, সাধু আর চোর এক গোত্রের আমরা—উনিশ আর বিশ।

পচা বাইটার কথা সেদিন হেঁয়ালির মতো ঠেকল। পরে সাহেব মিলিয়ে দেখেছে। বলাধিকারীও এমনি কথা বলতেন। শরীরের কষ্ট নিয়ে সাধুসন্ন্যাসীর ভ্রূক্ষেপ নেই, চোরেরও ঠিক তাই। সাধুরা সত্যনিষ্ঠ, নিজ দলের মধ্যে চোরও তাই। বেচাল দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দল-ছাড়া করবে। খাঁটি সাধু কামিনী-কাঞ্চনে বিরাগী, মোক্ষলাভ তাঁর সাধনা। চোর এইখানটা একটি ধাপ নিচে—কামিনীতে বিরাগী কাঞ্চনের সাধনা তার। কাঞ্চনের ধাপ কাটিয়ে আর একটু উঠলেই নিষ্কলঙ্ক ষোল আনা সাধু। রত্নাকর বাল্মিকী হয়ে যান—মৃদু-মধুর হতে হলে জন্মান্তরের তপস্যা লাগবে।

কিন্তু এ-সব পরবর্তী কালে ধীর মস্তিষ্কের বিচার। মার খাওয়ার গুণগান করছে ওস্তাদ পচা। ভাল রকম মার খেতে পারলে শুধুমাত্র তারই গুনে বেঁচে আসা যায়—

সে কেমন?

ধরে ফেলে গৃহস্থ তো ঠেঙানি জুড়ল। পাড়া প্রতিবেশীরাও কোমর বেঁধে লেগে গেছে। চোরের কি কর্তব্য তখন? মারধোর অল্পে যাতে না থামে, সেইটে দেখতে হবে। মারুক, ক্রমাগত মেরে যাক। ক্লান্ত হয়ে মানুষের দম ফুরিয়ে এসেছে, রাগের ঝাঁঝ কমছে, ঝানু কারিগর সেই মুখটায় দুটো-পাঁচটা ফোড়ন কেটে রাগ বাড়িয়ে দেবে। পুরো জোর দিয়ে আবার লেগে যাক। নিজেও ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়বে, চোট লেগে যাতে কেটেকুটে যায়। পাঁচ-সাত জায়গায় রক্ত বের করতে পারলে আর কথা নেই। বেকসুর খালাস।

কেন?

অধীর কণ্ঠে বাইটা বলল, কী মুশকিল। কাজটা যে বে-আইনী। সরকারের নিয়মে হাতে মারার কারো এক্তিয়ার নেই। হাকিম রায় দিলে গুণেগুণে বেতের সেই কয়েকটা ঘা পড়বে, একটি তার বেশি হবার জো নেই। অথচ মারে সবাই—তলা থেকে উপর অবধি। জানেও সকলে। কিন্তু আইনের ইজ্জত আছে—দাগ রেখে কেউ মারবে না। ধরলে বেকবুল যাবে। সেই দাগ অঙ্গঅঙ্গে গেঁথে রয়েছে—দারোগা-হাকিম কোন্ ছার, তুই তো রাজচক্রবর্তী

তখন। যারা মেরেছে তারা চোরের অধম—থানা-পুলিশ করবার শখ নেই তাদের। গোলমাল না করে আপোসে যদি সরে পড়িস, তারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। চাই কি টাকাটা সিকেটাও হাতে তুলে দিতে রাজি।

অনেক কথাবার্তা হল। ভাতঘুম ধরেছে এবার, বাইটার চোখ বুজে আসে। সাহেব উঠে পড়ল, পাটোয়ার-বাড়ি একবার ঘুরে দেখে আসবে।

পচা বলে, সুঁচটা পড়লেই কানের সাড় হবে, আর পাহাড় ভেঙে পড়লেও গায়ের সাড় হবে না—শিক্ষা বলি তাকে। সে পাকা-লোক আজকাল আর দেখিনে। তোর হবে সাহেব, তোর কাজকর্ম দেখেশুনে তবে আমি যেন চোখ বুজি।

দশ

যা আন্দাজ করেছে তাই—চারদিন গরহাজির থাকার দরুন সাহেব বরখাস্ত। দীনু পাটোয়ার নতুন রাখাল রেখেছে। তবে ভাঁটি-অঞ্চলে শিক্ষিত মানুষের অকুলান বলে গোমস্তার কাজ এখনো খালি। শুধুমাত্র সেইটুকু হতে পারে। মাইনে গোমস্তাগিরি বাবদে ছিল তিন। দুরকমের কাজ একসঙ্গে—ধরে নিলাম তাই পাইকারি দর। এখন এই চাকরির জন্য কত হওয়া উচিত, তুমিই বল সাহেব। সাড়ে-তিন—কি বলো? কাগজ-কলমের কাজ হল বাবুভেয়ের কাজ—দর কিছু বেশিই হবে। মাইনে ঐ সাড়ে তিন সাব্যস্ত রইল।

সাহেব বলে পুরানো পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেন পাটোয়ারমশায়। এখানে থাকব না, চাকরি সকালবেলা এসে করে যাব।

দিব্যি হল। টাকাপয়সা যা ছিল সুধামুখীকে মণিঅর্ডার করে একেবারে শূন্য হাত। আবার কিছু নগদ এসে পড়ল হাতে। সকল দিকে চমৎকার। নিজ রোজগারের ভাত—তরে তক্কে থাকতে হবে না, মুরারি বর্ধন কখন এসে ধরে ফেলে।

পচাকে এসে বলে, চুকিয়ে-বুকিয়ে চলে এলাম। শোব আপনার ঘরে, যেমন যেমন বলবেন করে যাব। চাট্টি করে চাল ফুটিয়ে নেবো—এদের বাড়িতেও নয়। সীমানার বাইরে পথের ধারে জামরুলতলায়।

বাড়ি আজ ওদেরই বটে! ফোঁস করে পচা এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে: জীয়ন্তে মড়া হয়ে ওদের বাড়ি পড়ে আছি। গতর থাকলে আমিও আলাদা চাল ফুটিয়ে নিতাম। ওদের ভাত না গিলে আমার যে উপায় নেই।

সেই ব্যবস্থা। জামরুলতলায় পরদিন সাহেব ভাত চাপিয়েছে। তিনটে মাটির ঢেলা উনুনের তিনটে ঝিক, তার উপরে মেটেহাঁড়ি। পুকুরঘাটে স্নান করে সুভদ্রা কলসি নিয়ে হেলতে দুলতে ফিরছে। কাঁখের কলসির মতো দেহের কানায় কানায় ভরা যৌবন—চলনের সঙ্গে সে যৌবনও ছলকে ছলকে পড়ে যেন। সাহেবকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়, ঘাড় লম্বা করে দেখে।

কি হচ্ছে ঠাকুরপো? রান্না করছ ওখানে?

হুড়কো পার হয়ে ঘাসবন মাড়িয়ে জামরুল তলায় চলে আসে: রান্নার বিদ্যেও জানা আছে তোমার? ঠাকুরপোর সঙ্গে যার বিয়ে হবে, সে বড় ভাগ্যধারী। ঠাকুরপো রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে, সে মেয়ে বিনুনি বেঁধে আলতা পরে খাটে বসে পা দোলাবে। মাটিতে পা ছোঁয়াতে হবে না। তোমার সংসারে আজ আমার নেমন্তন্ন ভাই। রান্না হলে পাতা পেতে বসে যাব।

সাহেব জবাব দিল না, শুকনো ডাল-পাতা খুঁটে খুঁটে উনুনে দিচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে সুভদ্রা বলে, কি রাঁধছ গো?

ভাত, কাঁচকলা-ভাতে, ঝিঙে-ভাতে—

উঃ, যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া একেবারে! সাহসা উত্তেজিত হয়ে উঠল: হবে আর কোন্ ছাই, পাবে কি কোথায়? আমাদের বাড়ি পাত পাড়বে না, এমনি খেয়েই চলবে বুঝি বরাবর?

সাহেব বলে, মন্দ হল কিসে? দু-দুখানা তরকারি। তার উপরে কাগজি-লেবু আর কাঁচালঙ্কা তুলে এনেছি একজনের বাগান থেকে। ও কি, জল আমি ইচ্ছে করে কম দিয়েছি, ফ্যান গালবার হাঙ্গামে যাব না তো! ও কি, ও কি, ও কি—

হুড়হুড় করে কাঁখের কলসি উপুড় করে দিয়েছে সুভদ্রা। ভাতের হাঁড়ি জলে ভরতি। ঢেলার উনুন ভেসে গেল জলস্রোতে। সুভদ্রাও সেই সঙ্গে খিল-খিল করে করে হাসে। হাসিতে ভেঙে পড়ে।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে যায়: বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঠাকুপো। বর্ধনবাড়িতে থেকে জঙ্গলে বসে রান্না করে খাবে, লোকের চোখে কি রকম ঠেকবে বলো তো! এসব হবে না। খাবে যেমন এই ক'দিন খেয়ে যাচ্ছ।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সাহেব বলে, বড়বাবুর ঐসব কথার পরে এ বাড়ির ভাত গলা দিয়ে নামবে না।

সুভদ্রা বলে, সদু-ঠাকুরঝি ভাত আনবে না, আমি নিজের হাতে এনে দেবো। তবু যদি আটকে যায় হাত বুলাব গলার উপর। ঠিক নেমে যাবে তখন।

বলতে বলতে লঘুকণ্ঠ কঠিন হয়ে ওঠে: বড়বাবু যখন বাড়ি থাকে, ঠিক সেই সময়টা তার চোখের উপর দিয়ে ভাত বেড়ে আনব। আমি এ বাড়ির কেউ নই, ওদের দয়ার ভাত খাচ্ছি—তার একটা ভাল রকম বোঝাবুঝি হওয়া দরকার।

কিন্তু বোঝাবুঝিটা আমায় দিয়ে কেন বউঠান?

তা ছাড়া মানুষ কোথা আমার? মা নেই, বাপ নেই, একটা ভাই পর্যন্ত নেই। বরের ঘাড়ে ভূত চেপে তাকে বাড়ি-ছাড়া করেছে—

দাঁতে-দাঁত চেপে বলে, ভুল বললাম। ভূত নয়, ভগবান চেপেছে। মরুকগে ছাই। কিন্তু তোমায় সামনে করে বড়বাবু বলেছে, তোমাকেই নিত্যি দু-বেলা খাইয়ে তবে সে কথার খণ্ডন হবে। দিক তুলে পিঁড়ি থেকে, দেখি কত বড় ক্ষমতা! এ জিনিস তো অন্য কাউকে খাইয়ে হবে না ভাই।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অধীর কণ্ঠে সুভদ্রা বলে, উঠলে না এখনো?

দু-হাতে হাঁড়িটা তুলে আছাড় মেরে ভেঙে দিল, আধ-সিদ্ধ ভাত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বলে, রাগের পুরুষ, ঢের রাগ দেখানো হয়েছে। চলে এসো বলছি—

এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে, খপ করে সাহেবের হাত এঁটে ধরল। সাহেব স্তম্ভিত। দাঁড়াতে হল হাতকড়ি-পরানো এক চোরের মতোই।

ফিক করে সুভদ্রা হেসে পড়ে: দেখ, তুমি আমার হাত ধরেছ বলে চেঁচাব বলেছিলাম। উল্টোটা হয়ে গেল। তোমার বদলে আমাকেই ধরতে হল শেষটা। ধরিয়ে তবে ছাড়লে—তুমি কম লোক! চেঁচাও এবারে—

সৌদামিনী বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, কি করছ ছোটবউ? এক ফোঁটা জল নেই বাড়ি। কলসি নিয়ে ওখানে কি তোমার?

সুভদ্রা হাত ছেড়ে দিয়েছে। সাহেব বলে, সদু-দিদি কি ভাবল বলুন দিকি?

সুভদ্রা সহজভাবে বলে, কি করে বলি! তোমার রূপে মজে গেছি, তা-ও ভাবতে পারে। শ্বশুর চোর, ভাসুর ফেরেব্বাজ, বর পলাতক—সে বাড়ির বউ নষ্টদুষ্ট হবে, অবাক হবার কি!

কালীঘাট থাকতে কথকতা শুনত খুব সাহেব। রামায়ণ-মহাভারত পাঠ হত তা-ও শুনত। পুরাণের ঘটনা মনে আসে। কোন জাঁদরেল ঋষি বা রাজা, তপস্যার যখন বড় বেশি এগিয়ে যান, রম্ভা-মেনকা-উর্বশীরা আদা-জল খেয়ে লাগে তপোভঙ্গের জন্য। এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলেই সিদ্ধি। সাহেবের সিদ্ধির পথে এসে দাঁড়িয়েছে ছোটবউ সুভদ্রা। চেহারা সকলে ভাল ভাল করে সেই চেহারা কাল হয়ে দাঁড়াল। কালীঘাটে একটা মেয়ের মুখে এসিড ঢেলে

দিয়েছিল—প্রণয়ের রেশারেশি ব্যাপারে। বেঁচে উঠল মেয়েটা, কিন্তু মুখের দিকে তাকানো যায় না। প্রণয়ীরা তখন সব ভেগে পড়ল। সাহেব ভাবছে, তারও মুখেও কেউ অ্যাসিড ঢেলে চেহারা পুড়িয়ে-জ্বালিয়ে দিয়ে যেত!

সেই দুপুরে ভাতের থালা সুভদ্রা নিজে নিয়ে এলো। জল ছিটিয়ে পিঁড়ি পেতে গেলাস দিয়ে পরিপাটি করে আগে ঠাঁই করে গেছে। ঘরের ভিতরে নয়—বাইরের দাওয়ায়। কাছারি থেকে মুরারির আসার সময় হল—ভাগ্যবশে যদি এসে পড়ে, নয়নভরে দেখবে। প্রকাণ্ড বগিথালা, ভাতও প্রচুর, মোচার আকারে ঠেসে ঠেসে বাড়া। বাটিতে বাটিতে রকমারি তরকারি সাজিয়ে এনেছে। ভাতের থালা নামিয়ে চতুর্দিকে বাটিগুলো সাজিয়ে সুভদ্রা ডাক দেয়: চলে এসো ঠাকুরপো—

সেইমাত্র স্নান সেরে সাহেব উঠানে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছে। সুভদ্রা বলে, দুটো তরকারি আমি রেঁধেছি। আর সব সদু-ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির রান্না আগে খেয়েছ। আমার কোন্ দুটো চোখে বলে দেবে।

সাহেব আঁতকে ওঠে: সর্বনাশ, এত ভাত কে খাবে?

বসে পড় না তুমি। ভাত বেশি নয়, আগে থাকতে চেঁচিও না।

সামনের উপর সুভদ্রা চেপে বসল। কালীঘাটের সুধামুখী এমনি বসতে যেত, রাগ করে উঠত সাহেব। ভাত ফেলে উঠে পড়বার ভয় দেখাত। আজকে অনেক দিন পরে এত দূরের মুলুকে এসে আবার সেই ব্যাপার।

বিড়বিড় করে সুভদ্রা বলছে, এ পোড়া বাড়িতে কোন জিনিস কাউকে প্রাণ ভরে খাওয়াবার জো আছে! বড়জা যেখানেই থাকুক ছুটে এসে পড়বে। মুখ-মিষ্টি মানুষটা হাড়কঞ্জুষ। নিজের হাতে ভাত বেড়ে মাছ-তরকারি ভাগ করতে বসবে—অন্যের উপর ভরসা হয় না পাছে সে বেশি দিয়ে ফেলে। যত আঁটিসাটি পরের বেলা—নিজের পেটের একগাদা পঙ্গপাল, তাদেরই কেবল গণ্ডে-গণ্ডে গেলাবে। বদহজমে সবগুলো সলতে হয়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়বে না। তোমার ভাত বাড়ার সময় বড়দি'কে ঘেঁসতে দিইনি। খাওয়ার সময় এই যেমন আছি, তখনও এমনি আগলে বসে ভাত-ব্যঞ্জন সাজিয়েছি। ট্যাসট্যাস করে মুখের উপর বলি, সেজন্য ভয় করে আমায়। স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলতে পারল না, ছটফট করে বেড়িয়েছে।

সাহেব সকাতরে বলে, কিছু ভাত তুলে নেন বউঠান। মা-লক্ষ্মীকে ফেলা-ছড়া করতে নেই। লাগলে আবার চেয়ে নেব।

চাইতেই হবে তোমার। সে আমি জানি। আরম্ভ করে দাও, তখন বুঝবে।

কথা কানেই নেয় না। কেমন এক রহস্য-ভরা হাসি হাসছে সুভদ্রা। ভাত ভেঙে নিয়ে সাহেব হাসির কারণ বুঝতে পারে। ভাত অল্পই, বাড়া-ভাতের ভিতরে সাত-আটখানা মাছের দাগা। মাছ ভাতের তলে ঢাকা দিয়ে নিয়ে এসেছে।

সাহেব স্তম্ভিত হয়ে বলে, এত মাছ খেতে হবে ?

সুভদ্রা বলে, দুই ভাই ওরা, সমান শরিক। ছোট শরিকের প্রাপ্য নিতে পারিনে বলে বট্‌ঠাকুর আস্পর্ধা পেয়ে যাচ্ছেন। ওদের দশ-দশটা ছেলেমেয়ে কতগুলো করে খায় হিসাব করো দিকি।

সাহেব বলে, সেই দশখানা মুখের খাওয়া আমায় দিয়ে খাইয়ে শরিকানা বজায় রাখবেন ?

দশই বা কেন ! তার উপরে ও-তরফের বট্‌ঠাকুর নিজে রয়েছেন। আমাদের হা-ঘরে মানুষটা একবেলা ভাতে-ভাত খেয়ে ভিনগাঁয়ে পড়ে রয়েছে। তার হিসাবটাও ধরবে এই সঙ্গে।

সাহেব বলে, এতজনের খাওয়া একলা পেটে সামাল দিতে পারব না। মরে যাব বউঠান, রক্ষে করুন।

আমার যে একজনই ভাই। একলার বেশি কোথা পাই ?

গলাটা কেঁপে উঠল বুঝি সুভদ্রার। সঙ্গে সঙ্গেই স্বর বদলে তাড়া দিয়ে ওঠে : মাছ ক'খানা ফেলে রেখেছ কোন্‌ আক্কেলে শুনি ? বড়গিন্নি দেখতে পেলে পুটপুট করে বট্‌ঠাকুরের কাছে লাগাবে। ছুতো পেয়ে সে মানুষ চেঁচিয়ে জানান দেবে। যে কলঙ্ক এড়াতে চাইছ সেইটেই ঘটে যাবে। কিনা, ভালবাসার মানুষকে চুরি করে মাছ খাওয়াচ্ছি। ভাত চাপা দিয়ে দাও, যেমন করে নিয়ে এসেছি। আস্ত এক-একখানা মুখের ভিতর দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করো। পুরুষমানুষ হয়ে একটুও না পারবে তো বাসি বাইটার কাছে ঘোরাঘুরি কি জন্যে ? বাড়ি ফিরে গিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে আমাদের মতন বউ হয়ে বোসোগে।

ফিসফিসানি কথা—পচা বাইটার কিন্তু কান এড়ায়নি। ঘরের মধ্যে থেকে সে বলে, খেতে বসলি বুঝি সাহেব ? রোগা মানুষ আমারও যে ক্ষিধে পেয়ে গেছে। আমার ভাত কে এনে দেয় !

সুভদ্রা অমনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : রোজ যে মানুষ এনে দেয়, তাকে ডাকলেই তো হয়। আমি কবে দিয়ে থাকি, আমায় কেন ঠেশ দিয়ে বলা ?

সদয় হয়ে নিজেই ডেকে দেয় : ঠাকুরঝি, অ সদু-ঠাকুরঝি, ভাতের জন্য মূর্ছা যায় এদিকে মানুষ। কখন ভাত দেবে ?

সৌদামিনী সাড়া দেয় না। কোথায় কোন কাজে আছে, বাড়ির ভিতরেই নেই হয়তো। পচা বাইটা ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে: যমের দুয়োর থেকে ফিরে এলাম, তা বলেও কারো দয়ামায়া নেই। রোগা মানুষটা না খেয়ে পড়ে আছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচামেচি করে সেটা মনে করিয়ে দিতে হবে। কানে শুনেও সাড়া দেবে না।

সুভদ্রা টিপ্পনী কাটে: দুয়োর থেকে ফিরে আসতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? ঢুকে পড়লেই তো হত।

ক্ষেপে গিয়ে পচা বলে, হারামজাদির কথা শোন একবার। জন্মের পরে বাচ্চাকে মধু খাওয়ায়, তোকে বেয়ান নিমপাতা বেটে খাইয়েছিল।

নিঃশব্দে হেসে হেসে সুভদ্রা যেন পরমানন্দে উপভোগ করছে। সাহেবকে বলে, দোষ কিন্তু তোমারই ঠাকুরপো। এ যাত্রায় যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা তুমি ছাড়া কারো সাধ্য হত না। মানুষটার কষ্টের জন্য দায়ী তুমি। নিজে কষ্ট পায়, বাড়িসুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করে মারে।

পচা গজরাচ্ছে: এত কথা কিসের—সদুকেই বা ডাকাডাকি কেন? মুঠোখানেক ভাত নিজে এনে দিলে হাতে কড়িকুষ্ঠ হবে নাকি?

হতেও পারে, হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। ভাললোকের সেবায় পুণ্য। পাপীর সেবা মানেই তো পাপকে জিইয়ে রাখা বেশিদিন ধরে।

আর যাবে কোথায়! অসুখ থেকে উঠলে কি হয়, মুখের জোরটা দিব্যি আছে। রে-রে করে উঠল: ওরে আমার পুণ্যির বস্তা! চোখে দেখতে হয় না আমার, এমনিই সব টের পাই। শোন তবে লো রাই, কুলের কথা কই—

আর হাসিতে ফেটে পড়ে এদিকে সুভদ্রা। দু-কানে হাত চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে বলে, চালাও না, চালিয়ে যাও শ্বশুরঠাকুর—

সাহেবকে বলে, শুনে নাও ঠাকুরপো, কী সমস্ত বিশেষণ আমার!

সাহেব ধমকের সুরে বলে, শ্বশুর গুরুজন—তাঁকেই বা আপনি কেন অমন করে বলেন?

সুভদ্রা পাড়াগাঁয়ের চলতি মোটা রসিকতা করে একটা: আর লোকের শ্বশুর গুরুজন, আমাদের ইনি গরুজন।

হাসতে হাসতে হঠাৎ যেন আগুন ধরে যায় সুভদ্রার কণ্ঠে। বলে, দশের মধ্যে মুখ তুলতে পারিনে। বাইটাদের বউ বলে চোখ টেপাটেপি করে। ঐ মানুষের ছেলে হওয়ার ঘেন্নায় তোমার ছোড়দা দেশান্তরী হয়ে রইল, চোখেই তো দেখে এসেছ ভাই। অতবড় কাছারির নায়েব বটঠাকুর খরচা করে দালান কোঠা বানিয়েও বাড়ির নাম বর্ধন-বাড়ি করে তুলতে পারলেন না, সেই

চিরকেলে বাইটা-বাড়ি রয়ে গেল। মানুষটা মরে পুড়ে ছাই না হলে কলঙ্কের মোচন নেই।

বলে যাচ্ছিল সুভদ্রা এক সুরে। হঠাৎ সাহেবের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলে, বলতাম না এত সব ঠাকুরপো। মুশকিল হয়েছে, গাঁদালি-পাতার ঝোল রান্না হয় নি। ঐ ছাড়া কবিরাজ আর কোন তরকারি দেবে না। সদু-ঠাকুরঝির খেয়াল ছিল না—বাগানে বাগানে এখন সে গাঁদালিপাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঝগড়াঝাটি গালিগালাজে ভুলে আছে, নইলে ক্ষিধে-ক্ষিধে করে পাগল করে তুলত। যতক্ষণ ঠাকুরঝি না আসে, আমায় এমনি চালিয়ে যেতে হবে।

গালির স্রোত অবিশ্রান্ত চলেছে। নির্বিকার সুভদ্রা। এক-একবার বড় অসহ্য হয়ে ওঠে, দু-হাতে সেইসময় কান চাপা দেয়। হাসি-ভরা মুখে মৃদু-কণ্ঠে গল্প করছে সাহেবের সঙ্গে, খাওয়ায় ফাঁকি দিয়ে উঠে না পড়ে সতর্ক চোখে সেদিকে দৃষ্টি রেখেছে। একবার মনে হল, গালির তেমন যেন আর বাঁধন নেই। সৌদামিনী এখনো ফিরল না—বুড়োমানুষের দম ফুরাল নাকি ?

ভাণ্ডার সুভদ্রার জোগানেই থাকে। মুখ টিপে একটুখানি হেসে ঘরের মধ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, শোন ঠাকুরপো, কচি মেয়ে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলাম। শাশুড়ি বেঁচে নেই, ভালবেসে শ্বশুর নিজে এই সোনার চুড় পরিয়ে দিল। বলে, শাশুড়ির হাতের জিনিসটা, তোমার নাম করে রেখে গেছে ছোট-বউমা। ভাবি, সত্যিই বা! বড়দির কাছে পরে টের পেলাম, সমস্ত মিথ্যে, বউ-পরিচয় হবে বলে টাটকা সিঁধ কেটে এনেছে। কোন আটকুড়ো বাড়ির অপয়া জিনিস—বাড়ির উঠানে পা দিতে না দিতে তাই হাতে পরিয়ে দিল। বাঁজা নাম আমার সেই জন্যে ঘুচল না।

এত কুৎসা-গালিগালাজে যা হয় নি—নিজের এই কথায় সুভদ্রা-বউয়ের চোখ দুটো ছলছল করে আসে। বলে, বাসি বাইটার কি! দুই বেটার বউ—একটার যেমন হল না, আর একজনে তেমনি গণ্ডায় উশুল করে দিচ্ছে বছর বছর দিয়ে যাচ্ছে। হাঁস-মুরগির মতো। বলব কি ভাই—অন্ধকারে দরদালানে পা ফেলতে ভয় করে। কোন্‌টা কোন্ দিকে পড়ে আছে—পা চাপিয়ে না বসি। আর আমার নিজের ঘর—সে ঘরে জগঝম্প পেটাও, ট্যাঁ করে উঠবার কেউ নেই।

পচার গর্জন উঠল : ফেরত দিয়ে দে হারামজাদি আমার গয়না। নিরেট সোনার জিনিস, একগাদা পাথর বসানো। অপয়া যদি তো হাতে নিয়ে ঘুরিস কেন রে ? ভোগ-ব্যাভার করবি, মুখে এদিকে শতেক নিন্দে—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব কতদিন রাখতে পারিস হাতে। না দেখে ছাড়ব না।

আর সুভদ্রা এ-সব কথায় নেই, সৌদামিনীকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেছে। রান্নাঘরে সে গাঁদালির ঝোল রাঁধুক, ক্রোধের জের অন্তত ততক্ষণ অবধি চলবে। সাহেবকে নিয়ে পড়ল আবার। বলে, কী তুমি ভাই, গলা দিয়ে যে ঢুকতে চায় না, গলার নলি নিরেট বুঝি তোমার ? মাছ তো তিন-চারটে বাকি। বড়গিন্নী আসছে—যা আছে মুখে পুরে ফেল। শিগগির, শিগগির—। জিভ দিয়ে টাকরায় ফিরিয়ে এনে খুশি মতন এর পর জাবর কেটো।

সুভদ্রাকে বাঁচানোর জন্য করতে হল তাই সাহেবকে। মিছেকথা—কোথায় বড়বউ ! ফাঁকিজুকি দিয়ে খাইয়ে সুভদ্রা হি-হি করে হাসে। থালা শেষ হল তো সুভদ্রা তাড়াতাড়ি জামবাটি ভরে দুধ গরম করে নিয়ে আসে। দুধের মধ্যে মর্তমান কলা আর ফেনি-বাতাসা।

বলে তাকিয়ে কি দেখ ? ঢকঢক করে চুমুক দিয়ে ফেল। হিসেব করে দেখ, বড়গিন্নির দশ বাচ্চায় মিলে কত সের দুধ টানে। তার উপরে বট্‌ঠাকুরের গোঁফ ভিজিয়ে ক্ষীর খাওয়া আছে। আমি সেখানে কী পেলাম।

আর, ঘরের বাক্যবাণ অবিশ্রান্ত বাইরে এসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে। গাঁদালি-ঝোল আর ভাত এসে পড়লে তবে সেটা বন্ধ।

সিঁধের কথা উঠল।

পচা বলে, সাত রকম সিঁধের কথা বললি তুই—মোটে সাত ?

সাহেব বলে, আমি কি জানি আর কি বলব। বলাধিকারী বলেছেন। কথা তাঁরও নয়। পুরানো সংস্কৃত নাটকের বর্ণনা।

ছিল তাই হয়তো সেকালে। এখন সিঁধ আর সাতের মধ্যে নেই। সাত কেন, সত্তরে কুলাবে না। এক-এক দলের কাজ এক-এক কায়দায়। আজে-বাজে লোকে তফাত ধরতে পারে না। অনেক দলের আবার হাতে-লেখা নিজস্ব বই থাকে। গোড়ায় কোন বড় মুরুব্বির মুখ থেকে লিখে নিয়েছিল, তার উপরে কাটকুট চলে আসে। ওস্তাদ সেই জিনিস শিষ্য-সাগরেদের কাছে পড়ে শোনান, কায়দাগুলো হাতে-কলমে দেখিয়ে দেন। এ-দল ও-দলের মধ্যে কাজের ফারাক হবেই, যার চোখ আছে সে বলে দিতে পারে। আমার একদিন ছিল তাই, কাজ দেখে কারিগর বুঝতে পারতাম। এখন নজরের জোর নেই, খবরাখবরও রাখতে পারিনে আর তেমন।

নিশ্বাস ছেড়ে পচা বাইটা আপন মনে হুঁকো টানতে লাগল। মুখ তুলে আবার বলে, বটুক-দারোগা সবে নতুন এসেছে। আমার কাজকর্মের কথা শুনেছে—পিছনে লাগেনি তখন অবধি, ভাব রেখে চলে। এই সোনাখালিরই এক বাড়ি সিঁধ—দারোগা নিজে হদ্দমুদ্দ দেখে শেষে আমায় ডাকল।

তাতিয়ে দিচ্ছে: তোমার গাঁয়ের উপর অন্ত কারিগর ঢুকল, আস্পর্ধা বোঝ বাইটা।

সাহেবও অবাক এতবড় আস্পর্ধার কথা শুনে। নিয়ম হল, এক চোরের গাঁয়ে অন্য চোর ঢুকবে না। এই সুখে চোরের গাঁয়ের লোক রাত্রিবেলা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। দুয়োর খুলে রাখলেও ক্ষতি নেই।

অবাক হয়ে সাহেব বলে, আপনার গাঁয়ে এসে সিঁধ কাটে এমনটা হয় কি করে বাইটামশায়?

পচা বলে, বলছি তো সেই কথা, শোন। অন্যায় করেছে ঠিক, কিন্তু আমিই তার বিহিত করব। দারোগা এর মধ্যে ঢুকে পড়ে উপরওয়ালার কাছে নিজের পশার বাড়াবে, কেন সেই নিমিত্তের ভাগী হতে যাবো?

বটুকদাস প্রস্তাব করলেন, কারিগরের নামটা বলো বাইটা, দুয়ে মিলে সায়েস্তা করে দিই।

পচা আকাশ থেকে পড়ে: আমি কি করে জানব বলুন। টের পেলে কি হাত দিতাম?

দারোগার কাছে ঘাড় নেড়ে এলো। কিন্তু কাজের ধারা দেখে পচা বুঝেছে, কারিগর মুনসি আকুন্দি ছাড়া কেউ নয়। দো-চালা বাংলাঘর তার ভারি পছন্দ। বাড়ির সাত-আটখানা ঘর, সমস্ত তাই—চৌরিঘর সে বাঁধে না। সিঁধেরও হুবহু সেই ঢং—বাংলাঘর আড়াআড়ি যেমন দেখতে হয়।

আকুন্দির কাছে গিয়ে পড়ল: আমার পড়শির উঠোনে কোন্ সাহসে তুমি চলে যাও?

আকুন্দি বলে, সে জায়গায় তুমি ঢুকবে না, অন্য কেউ ঢুকতে পাবে না—মজা হল বেশ গৃহস্থর। রাজরাজড়ারা গড় বানিয়ে থাকত, সেইরকমটা হয়ে দাঁড়াল। দল তো আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে—যেখানে যাব সেখানকার কারিগর এসে ঠিক এই কথা বলবে। সিঁধকাঠি তবে তো গাঙের জলে বিসর্জন দিয়ে ঘরে উঠতে হয়!

ক্ষুব্ধ পচা বলেছিল, বাইটা আর আজেবাজে কারিগর এক হল তোমার কাছে?

আকুন্দি খাতির করত পচাকে, মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেল। তখন চুপ করে রইল। ক'দিন পরে শোনা গেল, বমাল সমস্ত মক্কেলের দাওয়ায় রাতারাতি ফেরত রেখে গেছে।

গল্প করতে করতে হঠাৎ পচা এক প্রশ্ন করে বসে: জবাব দে সাহেব, দেখি জ্ঞানবুদ্ধি তোর কেমন। সিঁধ কাটা সারা, অপর যা-কিছু করণীয়,

সমস্ত হয়ে গেছে। এবারে কারিগরি নিজে তুই সিঁধে ঢুকবি। কি ভাবে সেটা—মাথা আগে দি.বি না পা ?

গুণীরা এই নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। মতভেদ আছে, সুবিধা-অসুবিধা উভয় দিকেই। প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে আছে, সিঁধের গর্তে চোর মাথা দিতে যাচ্ছে, সর্দার হাঁ-হাঁ করে ওঠেঃ পরের ঘরে পা দুটোই ঢুকবে আগে। পচা বাইটারও সেই মত—সকল অঙ্গের আগে পা চালান করে দেওয়া। ঢোকার আগে নানান রকমে তুমি পরখ করে নিয়েছ, তা হলেও এক-একটা ঘাগি গৃহস্থ থাকে ধাপ্পায় তাদের ভোলানো যায় না। চোর ধরবে বলে বাপে-বেটায়, ধরো, সিঁধের পাশে ঘুণ হয়ে বসে আছে। উঠছে পা উঁচু হয়ে—উঠুক, উঠতে দাও। বেশ খানিকটা উঠে গেছে—দুই পা দুজনে চেপে ধরল অমনি 'কালী' 'কালী' বলে।

সেই উৎকট অবস্থাটা মনে মনে কল্পনা করে পচা বাইটা খিকখিক করে হাসে। বলে, গৃহস্থ চোরের পদধারণ করে আছে, গুরুঠাকুর ঘরে এলে যেমন হয়। কত বড় ইজ্জত, দেখ ভেবে সাহেব।

একচোট হেসে নিয়ে পচা বলে, গৃহস্থ পা এঁটে ধরেছে, বাইরে থেকে ডেপুটি ওদিকে কারিগরের মাথা ধরে টান। ঘরের মধ্যে নিয়ে তুলতে না পারে। পাহারাদার খোঁজদার—যারা সব এদিক-ওদিক ছিল, তারাও ধরেছে ডেপুটির সঙ্গে! কারিগরকে নিয়ে যেন দড়ি-টানাটানি—একবার বাইরের দিকে খানিকটা আসে, ঢুকে যায় আবার খানিকটা ভিতর দিকে। পা আগে দিয়েছিল তাই রক্ষে—এতক্ষণ ধরে এই কাণ্ড চলছে, কারিগরের তবু নিশানদিহি হয় নি। মুণ্ডু বাইরের দিকে, মুণ্ডু না দেখতে পেলে মানুষ চেনে কি করে ? ধরা যাক, শেষ পর্যন্ত হেরেই গেল এরা—গৃহস্থের টানের চোটে কারিগর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, ঠেকানোর কোনরকম উপায় নেই। তখন কি করতে হবে বল্।

কোন্ জবাব দিত গিয়ে বেকুব হবে, ওস্তাদের খিঁচুনি খাবে—সাহেব একেবারে চুপচাপ রইল। পচা নিজেই তখন বলে দেয়। যা বলল—সর্বনাশ! কানে শুনেই সাহেবের আপাদমস্তক হিম হয়ে গেল।

কথার কথা নয়, কাপ্তেন কেনা মল্লিক সত্যি সত্যি তাই করেছিল। না করে উপায় ছিল না। ঈশ্বর মান্না পুরানো লোক, মল্লিকের দলের পাকা সিঁধেল। এ হেন কারিগরকেও একবার সিঁধের মুখে ধরে ফেলল, পা ধরে হিড়হিড় করে ভিতরে নিয়ে তুলছে। ডেপুটি তখন হেঁসোদার এক কোপে মুণ্ডু কেটে নিয়ে দৌড়। খাও কলা গৃহস্থ। উল্টে কাটা-ধড় নিয়ে পুলিশের হাঙ্গামা। দলের একজন গেল, দুঃখের ব্যাপার নিশ্চয়ই···কিন্তু মানুষটা চিনলে গোটা দল

ধরেই টান পড়ত, অন্ন যেত বহুজনের। ঐ রকম অবস্থায় পড়ে বিবেচক কারিগর নিজেই কত সময় বলে, গায়ের বলে পেরে উঠবিনে তোরা, মুণ্ডু নিয়ে সরে পড়্‌—

সাহেবের মুখ ছাইয়ের মত সাদা। ভাব দেখে পচা খুশিই বরঞ্চ। বলে, আমারও এ-সব গরপছন্দ। মল্লিকটা চোর নয়, ডাকাতও নয়—দোআঁশলা একরকম। আমাদের কাজ হল—মাল বেমালুম সরে আসবে, মানুষের গায়ে কাঁটখানাও বিঁধবে না। সে মানুষ দলের হোক আর মক্কেলেরই হোক।

সাহেবের দু-গালে মৃদু মৃদু চাপড় মারে: গুম হয়ে রইলি কেন? ধরে নে কিছুই হয়নি, মক্কেলরা ঘরের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। নির্গোলে তুই তো সিঁধে ঢুকে গেছিস—তারপর?

সাহেব সসঙ্কোচে বলে, সেকালের কায়দা একটু-আধটু বলতে পারি—পুঁথি-পুরাণে যা আছে। বলাধিকারী মশায়ের কাছে শুনতাম। সিঁধে ঢুকে পড়ে শর্বিলক সকলের আগে ঘরের দরজা খুলে দেয়—নির্গমের পথ।

পচা ঘাড় দুলিয়ে বলে, এখনও তাই। তার আগেও কিন্তু কাজকর্ম আছে।

সাহেব বলল, আগ্নেয়-কীট ছাড়ল, দীপশিখার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে পাখার ঝাপটায় পোকা আলো নিভিয়ে দেয়। তারপরে বীজ ছড়িয়ে দেয় ঘরের মেজেয়। চোরের ভয়ে আর রাজার ভয়ে ধনরত্ন লোকে মেজেয় পুঁতত—সেইখানকার বীজ ফটফট করে ফুটে যাবে!

হেসে উঠে সাহেব কথাটা ফলাও করে দেয়: রাজা আর চোর দুটোরই ভয় তখন। রাজা মনে যদি জমিদার-চকদার দারোগা-চৌকিদার বলেন, বেশি ভয় এখনো তাদের নিয়েই।

পচা সায় দিয়ে বলে, আমরা যদি হই ট্যাংরা-পুঁটি তারা রাঘব বোয়াল। সাবেকি বীজ ছড়ানোর নিয়মটা আজও ঠিক চালু রয়েছে—আমরা ছড়াই মটরকলাই।

ঘরে ঢুকবার প্রণালীটা পচা সবিস্তারে বোঝাচ্ছে। পা থেকে উঠতে উঠতে আস্তে আস্তে গোটা দেহটা উঠে গেল। সোজা উঠে দাঁড়াতে নেই, উঠতে গিয়ে ঠকাস করে হয়তো মাথায় ঘা লাগল, কিম্বা মাথার ঘায়ে একটা কিছু পড়ে গেল আওয়াজ করে। গুঁটিসুটি হয়ে বসবি একটুখানি। মুঠোখানেক মটরকলাই ছড়িয়ে দিয়ে কান পাতবি। আওয়াজ সূক্ষ্ম বটে কিন্তু কারিগরের কানে ফাঁকি পড়ে না। কলাই মাটিতে পড়লে একরকম আওয়াজ, কাঠের বাক্সে একরকম। টিনের তোরঙ্গ খাট-বিছানা—প্রতিটি জিনিসের আলাদা আওয়াজ। ঘরের কোন দিকে কি রয়েছে, মোটামুটি আন্দাজে এসে গেল। কলাই আর

এক রকমের আছে, সাদা রং-করা। ছড়িয়ে দে তাই একেবারে। অন্ধকার ইতিমধ্যেই চোখে সয়ে এসেছে, সাদা জিনিস দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কতটা উঁচুতে কোন্ মাল তাও একবার বোঝা গেল। ঠাণ্ডা মাথায় নির্ভয়ে লেগে যা এইবারে।

সাহেব অঘোর ঘুম ঘুমাচ্ছে। গভীর রাত্রে পচা বাইটা নিঃশব্দে তক্তাপোশ থেকে নেমে তার গায়ে হাত দিল: চল—

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সাহেব বলল, কোথা?

পচা খিঁচিয়ে ওঠে: গুরু ধরেছিস তো তর্ক করবি নে। বলছি যেতে, তাই চল্।

দূর বেশি নয়, বেশি হাঁটবার তাগত হয়নি এখনো পচার। কোন দিন হবে কিনা কে জানে! গোটা দুই বাঁশবন পার হয়ে পরামাণিকদের বাড়ি। সেই বাড়ি ঢুকে পড়ল।

ফিসফিসিয়ে পচা বলে, টিপে টিপে হাঁটনা এবারে—বেড়ালের চলাচল। বেড়ালের পায়ে ঠিক যেন তুলোর গদি। কেমন করে ইঁদুর ধরে, দেখেছিস ঠাহর করে? গর্তের পাশে চুপটি করে আছে। গদির গুণে ইঁদুর টের পায় না। যেই বেরুল ঝাঁপিয়ে অমনি টুটি কামড়ে ধরে। চোরের পা-ও সেইমতো চতুর। হাঁটছিস, তার শব্দ নেই। পাঁই-পাঁই করে দৌড়াচ্ছিস উঁচু-নিচু মাঠ-জঙ্গল ভেঙে —তিল পরিমাণ শব্দ হবে না, হোঁচট খাবেনি। পায়ের তলায় তোরও যেন এক বিঘত পুরু গদি। দেহের সর্বঅঙ্গ শাসনে এনে ফেলতে হবে, হুকুমের গোলাম— যাকে যেমন বলবি সেইমত তামিল করে যাবে। এই যেদিন হবে—জানলি, বিদ্যা রপ্ত হয়েছে কিছু। বড় কঠিন বিদ্যা—সেই জন্যে বড়-বিদ্যা বলে।

শর্বিলকের গুণগরিমার কথা সাহেবের মনে পড়ে যায়। হাজার দুই বছর আগেকার কীর্তিমান সেই চোর! চলনে বিড়াল, ধাবনে মৃগ, ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বাজপাখি। মানুষ সজাগ কি সুপ্ত শুঁকে শুঁকে ধরে ফেলে কুকুরের মতো। সরে পড়বার সময় সাপ। ম্যাজিকের মতন পলকের মধ্যে চেহারা ও পোষাক বদলে ফেলে। নানান ভাষায় কথা বলে—স্বয়ং বাগ্‌দেবী বুঝি চোরের সজ্জায়। রাত্রিবেলায় দীপের মতো উজ্জ্বল। সঙ্কটে ঢোঁড়ার মত অবিচল। ডাঙায় ঘোড়া, জলে নৌকো, স্থিরতায় পর্বত। যখন ঘিরে ফেলেছে, তখন সে গরুড়তুল্য। খরগোসের মতন চটুল চোখে চারিদিক সে দেখে নেয়। কেড়ে নেবার বেলায় নেকড়েবাঘ, বল-পরীক্ষার মুখে সিংহ। এত গুণ এক দেহে নিয়ে তবেই সে এত বড় চোর হয়েছে।

এগারো

আগে আগে পচা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফিসফিসিয়ে বলে, ফাঁকা জায়গা এড়িয়ে চলবি। ফাঁকায় যমরাজ হাঁ করে আছেন—ফাঁকা না ধোঁকা। সাপে গর্ত খোঁজে, আমরা অবশ্য অতদূর পেরে উঠিনে—গাছতলায় অন্ধকারে আড়াল-আবডালে খুঁজে নিই।

যাচ্ছেও ঠিক তাই। অপথ-কুপথ ভেঙে। ঘরকানাচে এসে থমকে দাঁড়াল : এইখানটা মনে কর্ সিঁধ কাটতে হবে। বেড়ার ওধারে খাট-তক্তপোশ বাক্স-পেঁটরা নেই, পরিষ্কার মেঝে। খোঁজদার দেখেশুনে এই জায়গা পছন্দ করে গিয়েছে। কি করবি এবারে সাহেব ?

সাহেব থতমত খেয়ে বলে, কাটতে লেগে যাব—আবার কি !

এমনি ভাবে বসে ? হায় হায়, কী বোঝালাম তবে এতক্ষণ ধরে। বাড়ির কেউ যদি বেরোয়, সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বে একটা লোক ঐখানটায় বসে কি করছে। পথ-চলতি লোকেও দেখতে পাবে।

হতভম্ব হয়ে সাহেব বলে, তবে কি করব ?

ফাঁকটা মেরে দিবি সকলের আগে। পাতাসুদ্ধ বড় ডাল এনে পুঁতে দিলি, তার আড়ালে বসে বসে কাজ। লোকে কারিগরি দেখতে পাবে না, দেখবে গাছ একটা।

কিন্তু বাড়ির লোক জানে, ফাঁকা জায়গা—গাছগাছালি নেই ওখানে।

আচমকা ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে, সেটা মনে রাখিস। তখন অত তালিম করে দেখার হুঁশ থাকে না।

কানাচে ঘুরে দুজনে উঠানে এসে পড়ল। রাত ঝিমঝিম করছে, নিষুপ্ত বাড়ি। দাওয়ার ধারে গিয়ে পচা বলে, উঠে পড়। বেড়ায় গিয়ে কান পাত। বিদ্যার পরীক্ষা হবে।

শীর্ণ হাতের একটা আঙুল তাক করে ব্যঙ্গের সুরে পচা বলে, ধড়াস-ধড়াস করছে যে বুকের ভিতরটা অ্যাঁ, বাড়ি চল তাহলে। কাজ নেই।

সাহেব রীতিমত অপমান বোধ করে : লাইনের নতুন মানুষ নাকি ? কলকাতার মতো জায়গায় রাস্তার কাজ করে বেরিয়েছি, ভিড়ের কামরায় শুয়ে বসে রেলের কাজ করেছি। গৃহস্থ-বাড়িতে রাতের কাজও একবার হয়ে গেছে

গ্রামময় সোরগোল তুলে। জগবন্ধু বলাধিকারী হেন মানুষ কাজ দেখে তাজ্জব। তিনি তো আপনার হদিস দিয়ে দিলেন।

মুখে এই বলছে, মনে মনে কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেছে। এত বড় ওস্তাদের সামনে পরীক্ষা—ধুকপুকানি আসে বই কি! কিন্তু বুকের ভিতরের খবর এ-মানুষ টের পান কি করে? সে-ও কি কানের গুণে?

পচা বলে, ভয় নেই। মন্তোর বলে দিচ্ছি, নিদালি মন্তোর। জেগে থাকলে ঘুমে ঢলে পড়বে। কাঁচা ঘুম হলে ঘুম গাঢ় হবে। আমি দাঁড়িয়ে পাহারায় আছি। গুরু কাড়লি যখন, গুরুর উপর ভরসা রাখিস।

পায়ের নখে একটু মাটি তুলে নিয়ে পচা বাইটা মন্ত্র পড়ছে। পুজোআচ্চার মতন অংবং নয়। তড়বড় করে পড়ে যাচ্ছে। বাংলা ঠিকই, কিন্তু একটা কথাও বুঝতে পারা যায় না। মন্ত্র পড়ে মাটি ছুঁড়ে দিল ঘরের দিকে। বলে, চলে যা, ঘুমিয়ে গেছে। ভয় করিস নে, ভয় থাকলে কি নিয়ে আসতাম সঙ্গে করে?

লজ্জা পেয়ে সাহেব দাওয়ায় উঠে বেড়ায় গায়ে কান পেতে দাঁড়াল। পচা বাইটা সুড়ুৎ করে সরে আবার এক গাছতলার। গিয়ে কেবল দাঁড়ানো নয়, গুঁড়ির গায়ে জোঁকের মতন লেপটে আছে। সেই গাছতলায় দৈবাত কেউ এসে পড়লেও মানুষ বলে ঠাহর পাবে না, গাছের গুঁড়ি ভাববে।

কাজ সেরে সাহেব সেখানে এল। বাড়ির সীমানা ছেড়ে ওস্তাদ-সাকরেদ দ্রুতপায়ে বেরিয়ে পড়ে। অগণ্য বাঁশঝাড়, জোনাকি ফুটছে নিভছে, নিবিড় অন্ধকার জায়গাটা। সেখানে এসে দাঁড়াল।

আসল পরীক্ষা এইবারে: ঘরে ক'জন?

সাহেব বলে, দু-জন।

ঠিক করে বলছ বটে?

সাহেব দৃঢ়স্বরে বলে, হ্যাঁ, দু-রকমের নিশ্বাস ঘরের মধ্যে। এতক্ষণ ধরে, শুনে এলাম। দু-রকম ছাড়া তিন রকম নয়, এক রকমও নয়। তবে মানুষ নয় দু-জনাই, একটি ওর মধ্যে বিড়াল। বিড়াল ঘুমুলে ঘু-উ-উ—একটা শব্দ হয়। পাটোয়ার বাড়ি অনেকগুলো পোষ্য বিড়াল—শব্দটা ওখান থেকে চিনে নিয়েছি।

ভারি প্রসন্ন পচা। পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, সাবাস ব্যাটা! মানুষ এক জনই বটে। মানুষ ঘরে ঢুকে যখন দুয়োর দিল, বাঁশতলা থেকে আমি ডাক করেছিলাম তোকে আজ পরখ করব বলে। কী মানুষ দেখে বলতে পারিস কি তা।

মেয়েমানুষ। সধবা।

পচা প্রশ্ন করে, পুরুষ নয় কেন? সধবাই বা কেন বলছিস?

পাশ ফিরলেই চুড়ির আওয়াজ। বিধবা বা পুরুষ হলে হাতে চুড়ি থাকত না।

ভাল, ভাল। ঠিক বলেছিস। উল্লাসে ডগমগ হয়ে পচা বলে, সেই লোকের বয়সটা কী রকম বলতে পারিস? ছোট মেয়ে, না ভরভরন্ত যুবতী, না থুথড়ে বুড়ি? পারবি নে বলতে। দু-দিনে চার-দিনে, দু-মাসে চার মাসে কেউ পারে না। যতখানি বলেছিস, তাই তো তাজ্জব হয়ে গেছি। খাটতে হবে বাবা, বড় কঠিন সাধনা। তুই ঠিক পারবি। অন্তিম বয়সে আজ আমার বড় আহ্লাদ—ছেলের মতো ছেলে একটা পেয়েছি এতদিনে।

এত প্রসন্ন যে পয়লা পাঠ সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গেল—শুভ এই নিশি রাত্রি থেকে। ঘরের মধ্যে ঢুকে পচা বাইটা নিজ হাতে দরজায় খিল দিয়ে তক্তাপোষের উপর জুত করে বসল। সাহেবকে দেখিয়ে দেয়: বোস—

সকলের বড় শিক্ষা হল নিশ্বাস থেকে মানুষ চেনা। বেড়ার ঘর হলে বেড়ার উপর কান রেখে নিশ্বাস শোনে, পাকা দালান-কোঠা হলে দুয়োর-জানলার ফুটোয় কান পাতে। দুয়োর-জানলা নিশ্ছিদ্র করে এঁটেছে তো সিঁধ কাটা ছাড়া উপায় নেই। শুধুমাত্র নিশ্বাস পরখের জন্যে সিঁধ—কারিগর হেন ক্ষেত্রে পা নয়, মাথা কিছুদূর অবধি ঢুকিয়ে ঝিম হয়ে থাকবে। নিশ্বাস শুনবে ঘরের লোকের। কজন মানুষ নিশ্বাসের ফারাক থেকে গুণতি হয়ে যাবে। কার ঘুম কি রকম, গাঢ় কি পাতলা—বুড়োমানুষের ঘুম পাতলা, জোয়ানযুবা ও ছেলেছুলের গাঢ় ঘুম। এত সমস্ত বিচার—সর্বশেষে ঘরে ঢোকা। পরের ঘরে অমনি উঠে পড়লেই হল না।

আরও আছে। ছেলেপুলে নিতান্ত কচি-কাঁচা থাকলে বিপদ—ক্ষণে ক্ষণে কেঁদে উঠে অন্যের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। কাঁচা বয়সের চনচনে মেয়ে-বউর ঘুম অতি পাতলা। বয়সের দোষে ছটফট করে, উঠে বসে এক-একবার বিছানার উপর। নষ্টদুষ্ট হয় তো আরও গোলমাল। এমন মেয়েমানুষ যে ঘরে আছে—মুরুব্বিরা বলেন, হীরেমুক্তোর পাহাড় পড়ে থাকলেও সেখানে ঢুকবে না।

বহুদর্শী প্রাচীনদের কথা কারিগরে বর্ণে বর্ণে পালন করে। তবে বাঁধা সড়ক হল সাধারণ দশজনের জন্য—আসল গুণী যারা, তাদের কথা আলাদা। কোন নিয়ম বাঁধতে পারে না তাদের, অবস্থা বিশেষে নিজের পথ দেখে নেয়। নিষিদ্ধ পথেই বরঞ্চ সহজে কাজ হাসিল করে। যেমন এই সাহেব—শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদের দেওয়া কাঠি প্রথম হাতে পেয়েছে। কাঁচা বয়সের বউ-মেয়ের গা ছুঁতে মানা—সাহেব কিন্তু অবাধে আশালতার পাশে শুয়ে গায়ের গয়না ধীরে-

সুদ্ধে একটা একটা করে খুলে নিল। আশালতাই হাত বাড়িয়ে, কান বাড়িয়ে গলা বাড়িয়ে কাজের সুবিধা করে দিয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। আর এক বাড়ির কথা বলি—

নাম-ধাম বলা যাবে না, মহামানী গৃহস্থ। কাঁচা-বাড়ি, তবে মাটির উঁচু পাচিলে ঘেরা। বাড়ির স্ত্রীলোকেরা চন্দ্র-সূর্য অবশ্য দেখতে পান, কিন্তু নরলোকের কেউ না দেখে সেজন্য কড়াকড়ির অন্ত নেই। গিন্নি-ঠাকরুনের বয়স সত্তর উত্তীর্ণ হবার পর তবে কর্তা অনুমতি দিয়েছেন—এখন তিনি মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা টেনে দায়ে-বেদায়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে একটা-দুটো কথা বলেন। এমনি বাড়ি। বাড়ির জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছে আজ ক'দিন। মেয়ে অতএব সাজসজ্জা করে গয়নাগাঁটি যেখানে যা আছে অঙ্গে চাপিয়ে বরের কাছে শোয়। খোঁজদার দেখেশুনে গিয়ে আদ্যোপান্ত বলছে। ঐ গয়না বোঝা থেকে মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব মুক্তি দিতে হবে।

এক প্রহর রাত না হতেই নিশিকুটুম্বরা ঘরের কানাচে আস্তানা নিয়েছে। খেয়েদেয়ে জামাই ঘরে এসেছে, শুয়ে উসখুস করছে। বউ আসেই না। অনেক পরে বাড়িসুদ্ধ খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তখন বউ মৃদু পায়ে আসছে। কাচনির বেড়া বলে সুবিধা—বেড়ার চোখ-কান দুটো ইন্দ্রিয়ই পেতেছে সাহেব। ভারি লজ্জাবতী মেয়ে তো—বরের কাছেও মুখ খুলতে পারে না লজ্জায় ভেঙে পড়েছে। খোঁজদার উল্টো রকম বলেছিল কিন্তু। আলো নিভিয়ে দিল। খানিকক্ষণ পরে ঘুমুচ্ছেন দুজনে বিভোর হয়ে। যেখানটা সিঁধ হবে, জায়গা নিরিখ করা আছে। কাঠি হাতে নিয়ে ডেপুটি তৈরি—ইসারা পেলেই খোঁচ দেয়। সে ইসারা আসে না কিছুতে। ভোগান্তি কতক্ষণ ধরে আছে না জানি! ডেপুটি নিজেও একবার সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে শুনে এল—স্বামী-স্ত্রী যেন পাল্লা দিয়ে ভোঁস-ভোঁস করছে, ঘরে তৃতীয় কেউ নেই। তবু কিন্তু বেড়া ছেড়ে সাহেব নড়ে না, সেই এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। হুকুমহাকাম দেয় না কিছু।

অবশেষে একসময় সাহেব এসে ডেপুটির হাত ধরে টানে: সিঁধ হবে না, কাঠি বরঞ্চ পাহারাদারের জিম্মায় দিয়ে চলে এসো। কাজই হবে না এ-বাড়ি, আয়োজন বিফল—ডেপুটি ভাবছে এই সব। কিন্তু সাহেবের মুখে রহস্যময় হাসি, কাজে বেকুব হলে এমনধারা হয় না। ডেপুটিকে পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে—যেন দুটো মাটির ঢিবি অথবা দুখানা গাছের গুঁড়ি। অনেকক্ষণ কাটল। খুট করে মৃদু একটু আওয়াজ হয়ে ঘরের দরজা খুলে যায়। দরজা ভেজিয়ে রেখে নিশিরাত্রের অন্ধকারে বাড়ির মেয়ে যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল। খোঁজদার ঠিক খবরই দিয়েছে বটে—নষ্ট মেয়ে নাগরের কাছে গেল।

এ সময়টা ভয়-ডর থাকে না। কিন্তু অন্য কেউ না জানুক, স্বর্গের অন্তর্যামী আর মর্ত্যের চোর—এ দুয়ের চোখে পড়বেই। লুকিয়ে ছিল সাহেব এরই জন্যে —টুক করে ঘরের ভিতর গিয়ে বালিশের তলা থেকে মাল নিয়ে যথাপূর্ব দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে এলো।

এক কণিকা ধূলোমাটি গায়ে লাগল না। কানের গুণে টের পেয়েছে, জামাই আর মেয়ের মধ্যে একটা ঘুম মেকি। ঘুমের ভান করে আছে মেয়ে, বরের ঘুম এঁটে এলে বেরিয়ে পড়বে। এত গয়না বাইরে আনতে সাহস হয়নি —কে আর জানবে, বালিশের নিচে খুলে রেখেচে। বেড়ার গায়ে সাহেবের তীক্ষ্ণ কান অন্ধকার গয়না খুলে রাখার ব্যাপারও ঠিক ঠিক বলে দিয়েছে।

আনাড়ি কারিগর হলে হেন ক্ষেত্রে সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে। ঘরের মানুষ ঘুমন্ত ভেবে যে-ই না সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছে, পরিত্রাহি চেঁচিয়ে মেয়েটা পাড়া মাথায় করত। মুরুব্বিদের এই জন্যেই বারণ: কচি-শিশু, রোগি, বুড়োমানুষ, লুচ্চাপুরুষ আর নষ্ট মেয়ের ঘর সতত এড়িয়ে চলবে।

অনেক পরের বৃত্তান্ত এ সমস্ত। সাহেবকে পচা নিশ্বাস পাঠের কথা বলছে। নির্ভুল যে পড়তে পারে, সেই কারিগরের ভাবনার কিছু নেই। পা আগে যাবে না মাথা, তার জন্যে সে বিতর্ক নয়। সিঁধের গর্ত থেকে সোজা মাথা তুলে বীরের মতো সে ঘরে উদয় হবে।

সাহেব মাঝখানে বলে উঠল, নিদালি মন্তরটা ভাল করে শুনি একবার।

বলাধিকারীর কাছে প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্র শুনেছে। চোরচক্রবর্তী পুঁথির পদ্যও জানে। ভাঁটি অঞ্চলের নিজস্ব নিদালিটা পরামাণিক-বাড়ি পচা তড়বড় করে পড়ে এলো, সেটা ভাল করে একবার শুনে নেবে সাহেব। শুনে মুখস্থ করবে, দরকার হলে লিখে নেবে কাগজে। বলে, ধীরে ধীরে বলে যান বাইটামশায় কথাগুলো শুনি।

> নিদ্রাউলি নিদ্রাউলি
> নাকের শোয়াসে তুললাম মঞ্চপের ধূলি।
> ঘরে ঘুমের কুকুর-বিড়ালি
> জলে ঘুমায় রউ,
> নিদালি-মন্তোরের গুণে
> ঘুমাইয়া থাক গিরস্তর বেটা-বউ।

অতি-সাধারণ ছড়া একটা। পচা বলে, নাকের নিশ্বাস টেনে মঞ্চপের (মণ্ডপের) ধুলো তিনবার তোলবার কথা। আমি যা পায়ের নখ তুলেছিলাম।

সেকালে মুরুব্বিরা নাকেই তুলতেন—অকর্মা অপদার্থ আমরা, সে বুকের জোর কোথা পাব ? শ্বাসের টানে ধূলো ওঠে না, মন্তোরও খাটে না আর তেমন।

সাহেব বলে, রউ হল তো রুইমাছ ?

পচা বাইটা ঘাড় নেড়ে সায় দিল। বলে মানে নিয়ে কিন্তু কথা নয়। কথাগুলোর মধ্যে তেমন কিছু নেই, হাঁকডাক করে রাস্তার মানুষকে শোনাতে পারি। পড়াটাই আসল, পড়ার একটু হেরফের হলে মন্তোরে কাজ হবে না। বড় শক্ত কাজ। তেমন গুণীলোক এখন কম। সেইজন্যে বলি, মন্তোরে ভরসা না রেখে ক্রিয়াকর্মের উপর জোরটা বেশি দিবি তুই।

মাসখানেক ধরে দিবানিশি ক্রিয়াকর্মের ব্যাপারই চলল। সাহেব কোথায় থাকে কি করে দৈনন্দিন খাওয়াদাওয়ার দায়টা বা কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়, এ সব খবর অন্য কেউ জানে না। একলা পচা বাইটাই জানে বোধহয়। পচার ঘরে সে শোয়। অনেক রাত্রে আসে, তারপর দরজা বন্ধ করে ফুসফুস-গুজগুজ চলে দু-জনে। কৌতূহলী সুভদ্রা লুকিয়ে চুরিয়ে শোনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কানদুটো পাকাপোক্ত নয়, বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারে না।

একদিন রাত্রে বড় জ্যোৎস্না: পাখিগুলো পর্যন্ত দিনমান ভেবে বাসার মধ্যে ডেকে ডেকে উঠছে। কামিনীগাছ থোপা থোপা সাদা ফুলে ভেঙে পড়েছে —ডাল-পাতা প্রায় অদৃশ্য। ফুলের গন্ধে সারা বাড়ি আমোদ করেছে। সাহেব আসছে—সুভদ্রা-বউ তক্কে তক্কে ছিল—চিলের মতো ঝাপটা মেরে তার হাত এঁটে ধরে। চোরের হাতে হাতকড়ি পড়লে যেমন হয়—টেনে নিয়ে চলল হিড়হিড় করে। সর্বনেশে ব্যাপার। পরিষ্কার দিনমানের মতন চারিদিক ফুটফুট করেছে—নামেই শুধু রাত্রি। সাহস বেড়ে বেড়ে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সুভদ্রা! আর সাহেবের এমন অবস্থা—টানাটানি করে হাতখানা ছাড়িয়ে নেবে, সে ভরসা হয় না! শব্দ পেয়ে বাড়ির কেউ হয়তো জেগে উঠবে। দেখতে পেলে এ বাড়ি থেকে চিরকালের মতো বিদায়! মুরারি বর্ধন চাচ্ছেও তাই। হৈ-হল্লা করে সাহেবের সঙ্গে ছোটবউ সুভদ্রারও ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে পূজনীয় ভাসুরঠাকুর।

সাহেবের এত সব চিন্তা, বউটার তিলপরিমাণ ভয়ডর থাকে যদি! হেসে হেসে সর্ব অঙ্গে দোলন দিয়ে বলে, চোর ধরেছি গো। নিত্যি নিত্যি আসা-যাওয়া, আজকে তোমার রক্ষে নেই ঠাকুরপো।

হাত ছাড়ুন বউঠান, কেউ দেখে ফেলবে।

বেপরোয়া সুভদ্রা সকৌতুকে মুখ নাচিয়ে বলে, দেখলে আমার কি! অবলা

মেয়েমানুষের সাত খুন মাপ। বলে দেব, তুমিই হাত ধরে টানছ। পুরুষেই তো করে। আমাদের এই উল্টো রীত, মেয়ে হয়ে টানতে হল পুরুষকে—সে কেউ বিশ্বাস করবে না। ফাঁকা উঠোনের উপর তুমিই তো দেখার সুবিধা করে দিচ্ছ। অন্য কেউ না হোক বাসি বাইটা দেখছে ঠিক চেয়ে চেয়ে।

ফিক করে হেসে বলে, দেখলে কী-ই বা! চোরাই কাণ্ডবাণ্ড—চোরের বাড়ি সেটা বেমানান কিসে? চোরে চোরে লেগে গেছে—চোর বউয়ে আর চোর শ্বশুরে। বাসি বাইটা বরাবর পরের মাল চুরি করে নিজের ঘরে তুলেছে এবারে তার মালটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

সাহেব শিউরে উঠে বলে, ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন নাকি আমায়?

সেই তো ভাল। ঢুকিয়ে নিয়ে একবার দরজা দিতে পারলে কারও আর নজর যাবে না। ও কি, ভয়ে যে মুখ শুখাল তোমার! বাঘের গুহা নয়—আমার ঐ কোঠাঘর, যেখানে আমি থাকি।

শিকার কামড়ে ধরে বাঘ-কুমিরে যেমন হিড়হিড় করে নিয়ে, সুভদ্রা তেমনি চলল। মেয়েমানুষের কোমল হাতে সাঁড়াশির আঁটুনি—কুমিরে কামড়ের মতোই সে মুষ্টি খুলে পালাবার উপায় নেই। নিয়ে চলল বাড়ির ভিতর। জল্লাদ আসামিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, সাহেবের সেই অবস্থা। শীতের রাত্রে দস্তুর-মতো ঘাম দেখা দিয়েছে।

মুখের দিকে চেয়ে বুঝি সুভদ্রার করুণা হল। হাসতে হাসতে বলে, বেশ না-ই হল ঘরে। ঘরের সামনে বারাণ্ডায় গিয়ে বসিগে। ভয় নেই গো, লেপ ফেলে বাইরে এসে আমাদের লীলাখেলা দেখবে, এত দায় কারো পড়ে নি।

বলতে বলতে থেমে যায়। কণ্ঠ বুঝি কাঁপল একটুখানি, সাহেবের তাই মনে হল। বলে, দায়টা যার হত, সে মানুষ কোন্ মুলুকে পড়ে রয়েছে। সারারাত আমি যদি ধেই-ধেই করে নেচে বেড়াই, এ বাড়ির কেউ চোখ তুলে দেখতে আসবে না।

কোঠাঘরের সামনে টিনের চাল-দেওয়া বারাণ্ডা, সেইখানে নিয়ে বসাল। ঘরে ঢোকানোর প্রস্তাব, মনে হচ্ছে, নিতান্তই ভয় দেখানো। বারাণ্ডার উপর মাদুর পাতা, কাঁথার ডালা পাশে। ঘুম নেই তো বউটার চোখে—হতে পারে, নিরালা বারাণ্ডায় দিনের মতন এই চাঁদের আলোয় বসে বসে কাঁথা সেলাই করছিল। খেয়ালের বসে কাঁথা ফেলে উঠে পচা বাইটার ঘরের অন্তরালে ওত পেতে দাঁড়াল।

সেই কাঁথার ডালা হাতড়ে ছবি বের করে একটা। কাপড়ের উপর চিকন কাজ। বলে, তুমি ভয় পেয়ে গেলে ঠাকুরপো, রাত দুপুরে মেয়েমানুষের

কোন্ মতলব না জানি। সাধু স্বামীর সতী নারী আমি—তোমারই পাপ মন বলে খারাপ জিনিস ভাবলে। এই ছবিটা আজকে শেষ করেছি। কাকে দেখাই বলো? এ বাড়ির মেয়েলোকে বোঝে রাঁধাবাড়া আর ছেলেপিলের নাওয়ানো-খাওয়ানো, পুরুষে বোঝে টাকাকড়ি বিষয়আশয়। তোমায় সেইজন্য ধরে নিয়ে এলাম।

সাহেব পুরো বিশ্বাস করে নি। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে, আমিই সে সমঝদার লোক, জানলেন কিসে?

জানিনে তো—জানব কেমন করে? এসব করো না তাই—ভালো জিনিস একটা শেষ হলে কাউকে না দেখিয়ে সোয়াস্তি হয় না। মন আনচান করে—

কাপড়ের সেই ছবি সুভদ্রা মেলে ধরল সাহেবের চোখের উপর। বলে, খেটেছি কত দেখ। সুতোয় রং মিলিয়ে মিলিয়ে সরু সুতোর ফোঁড়—চোখ দুটো আমার অন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এ বাড়ি যারা আছে, এ জিনিসে হাত ছোঁয়াবে ভাবতে গেলেই গা-ঘিনঘিন করে। ভালমন্দ তোমার কিছুই জানি নে, চেহারায় দেখতে পাই সোনার পদ্ম। তাই কেমন ইচ্ছে হল। বোঝ না বোঝ, অমন হাতে ছবি আমার নোংরা হয়ে যাবে না।

শিল্পীমানুষ বটে সুভদ্রা-বউ। কালীঘাটের দরিদ্র মাতাল পটুয়ারা পট এঁকে এক পয়সা দু-পয়সায় বিক্রি করে। সাহেব দেখেছে সে বস্তু। হাল আমলে ফ্যাসন হয়েছে—বাবুলোকে মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে গলিতে ঢোকেন, এক পয়সার পট দরাজ হাতে এক আনা মূল্যে কিনে নিয়ে যান। সুভদ্রাও দেখি জাত পটুয়া একটি। ফুলবাবু তাকিয়া ঠেশ দিয়ে পড়গড়া টানছে, বাবরি চুলে টেড়ি, কোঁচা লুটিয়ে পড়েছে ফরাসের উপর, একটা টিয়া-পাখি খাঁচায় করে বাবুর কাছে বেচতে নিয়ে এসেছে। কাপড়ের উপর সুতোর বুনানিতে তুলেছে এই সব।

কেমন হয়েছে?

কী সুন্দর, মরি মরি! আপনার ক্ষমতা দেখে অবাক লাগে বউঠান।

খোশামুদির কথা নয়, শতকণ্ঠে তারিপ করবার মতো। কাছে এনে, কখনো বা দূরে সরিয়ে, অনেকভাবে দেখে সাহেব। দূরে নিলে কে বলবে সুতোয় বুনে তোলা। কাগজের উপরে এঁকেছে মনে হয়।

আনন্দে ডগমগ সুভদ্রা। বলে, তুলি ধরে কাগজেও এঁকেছি ঠাকুরপো। ঘরে কোন ঝামেলা নেই—না ছেলেমেয়ে, না কেউ। আমার মতো ভাগ্যবতী কে! দিনরাতের সময় কাটতে চায় না—কি করব, ছবি আঁকি বসে বসে। গাদা গাদা এঁকেছি।

সাহেব বলে, ছোড়দা জানেন?

মাষ্টার মানুষ, ছেলে ঠেঙিয়ে খায়। যেটুকু ফাঁক, ভগবানের নাম নিয়ে পরকালের কাজ করে। তার কি গরজ এ সবে? লজ্জার মাথা খেয়ে তা-ও একবার গিয়েছিলাম দেখাতে। একেবারে কাঁচা বয়স তখন—বড় আনন্দ করে দেখাচ্ছিলাম। তা বলব কি জানো ঠাকুরপো—ছাই-ভস্ম জিনিস কি জন্যে আঁকতে যাও, আঁকবে তো ঠাকুর-দেবতাদের আঁকো। আঁকবার সময়টা অন্তত তাঁদের চিন্তা মনে আসবে। বলি, সেটা কি ধর্মকর্মের বয়স, ঠাকুরদেবতা আসবে কেন তখন?

বলতে বলতে সুভদ্রা থেমে পড়ে। কথায় যেন হঠাৎ আগুন ধরে গেল। বলে, তারপরে আর দেখাইনে। পাবোই বা কোথা, ফুলহাটায় তেড়ে ধরে দেখাতে যাব নাকি? ঠাকুরদেবতা এখনো আসে না। কি করেছেন তাঁরা আমার, কেন আঁকতে যাব?

দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে গেল—কান্না সামলাতে না কি করতে? সাহেব অবাক। মুহূর্ত পরে বেরিয়ে এলো নিজের আঁকা একগাদা ছবি নিয়ে। পালকি চড়ে সমারোহ করে বিয়ের বর আসছে। গৃহস্থবাড়ির উঠানে বাচ্চা ছেলেপুলের কুমির-কুমির খেলা। হরি-সংকীর্তনের আসর। বাসরঘরের বর-কনে—মেয়েরা বাসর জাগছে। যা সমস্ত চোখে দেখেছে, ছবিতে ধরে রাখতে চেয়েছে। আজ পাড়াগাঁয়ের সাধারণ এক বউয়ের মধ্যে এমন গুণ লুকানো আছে কে ভাবতে পারে?

ছবি দেখতে দেখতে মনের মেঘ কেটে গেছে। মুখ টিপে হেসে সুভদ্রা বলে, তোমার ছোড়দার হাতে উল্কি আছে—

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে, বাঁ-হাতে আছে। আপনি এঁকে দিয়েছেন বুঝি? দিব্যি ছবিটা—

বড্ড ধারালো চোখ তোমার ঠাকুরপো। অন্যের চোখে পড়বে খানিকটা ধ্যাবড়া কালির পোঁছ। মানুষটার গায়ের রঙে আর ছবির রঙে মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে।

সাহেব বলে, ঠাকুর-দেবতার মন নেই বলছেন, কিন্তু সেই উল্কির ছবি কেষ্টঠাকুরের। মুখে মুরলী, ত্রিভঙ্গ হয়ে কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মানুষটা সাধ করে আমায় বলল, খুশি হব বলে করে দিলাম। বিয়ের অল্প দিন পরে—সে একদিন গিয়েছে—বিয়ে তো করোনি ঠাকুরপো! ও-মানুষকেও সেই সময়টা যেন পাগলামিতে পেয়েছিল। বলল, যে ঠাকুর তোমার পছন্দ তাই এঁকে দাও। তোমার ছোড়দা কেষ্টঠাকুরই তখন, আমি

রাধিকা। মুরলীর ডাক লাগে না, হাঁচি-কাশির একটু আওয়াজ পেলেই যেখানে থাকি কাজকর্ম ফেলে ছুটে গিয়ে পড়ি। আমার কেষ্টঠাকুরের হাতে কেষ্টমূর্তিই ভালো, সুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছবি করে দিলাম। এত আস্তে ফোটাচ্ছি, তাই যেন আমার নিজেরই গায়ে বিঁধছে। নতুন বয়সের বর-বউ কিনা তখন—সে এক কাণ্ড।

থেমে একটু দম নিয়ে সুভদ্রা আবার বলে, তোমার ছোড়দা-ও পাল্টা শোধ দিয়ে দিল আমার উপর। ছবি নয়, ছবি-টবি আসে না ও-হাতে—বুকের মাঝখানটায়, পরিষ্কার অক্ষরে লিখে দিল, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, হরগৌরী। ঠাকুর-ঠাকরুন জোড়ায়-জোড়ায়। আজও আছে। তুমি আমায় খারাপ বলে সন্দেহ করলে, একবার ঝোঁক হয়েছিল বুক খুলে দেখিয়ে দিই। সাহস হল না ভাই। চোখ তোমার বড্ড ধারালো, বুকের নিচেটাও দেখে ফেল যদি। সেখানটা খালি, ধূ-ধূ করছে তেপান্তরের মতো—

কথা ঘুরিয়ে প্রলুব্ধ কণ্ঠে সহসা বলে ওঠে, তোমার হাতে দিই না উল্কি করে। এমন ধবধবে হাতের উপর ছবি কাকে বলে দেখিয়ে দেবো। কাপড়ের ছবিটা তোমার পছন্দ, এটাই পুরোপুরি তুলে দিই। ধরে ধরে মনের মতন করে আঁকব —তাই করি ঠাকুরপো, অ্যাঁ ?

সবুর মানে না। এক ছুটে রঙ নিয়ে এসে তখনই বসে যায় আর কি! সাহেবের হাত ধরে নিরিখ করে দেখছে।

হাত সরিয়ে নিয়ে সাহেব বলে, আমায় নয় বউঠান। ছোড়দার বাঁ-হাতে এঁকেছেন, ডান-হাতেও আর একটা এঁকে দিন। কথা দিচ্ছি, আমি এনে হাজির করে দেবো। কেষ্টঠাকুর করেছেন, এবারে মহেশ্বর। সত্যিই ভোলা মহেশ্বর মানুষটি।

উঁহু, হনুমানজী। রাম-ভক্তিতে হনুমানকে ছাড়িয়ে যায়। ধরা পাই তো লেজওয়ালা হনুমান আঁকব এবারে।

হাসতে গিয়ে সুভদ্রা জলে ওঠে। বলে, তিন তিন জোড়া দেবদেবী লিখে বুক আমার নামাবলী করেছে। পেলে তাকে লেখাগুলো নষ্ট করে দিতে বলি। রঙ ঢেলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধ্যাবড়া করে দিক। আয়না ধরে আমিও কত চেষ্টা করেছি—নিজে নিজে হয় না। মানুষটাকে যারা পর করে দিয়েছে, তাদের নাম রাত্রি-দিন বুকে করে রাখতে বুক আমার জলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। কী যে যন্ত্রণা ঠাকুর-পো—

ফস করে বলে বসে, তুমি করে দেবে তো বলো—

সাহেবের মুখ শুকাল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। বদ্ধ উন্মাদ—কাণ্ডজ্ঞান

নেই, লোকলজ্জা নেই। পাগলা-গারদের বাইরে কেন রাখে এদের? রাগ হয় মুকুন্দর উপর। ভেড়াকান্ত মাস্টারমশায় পরিবার ধর্মের-ষাঁড়ের মতো ছেড়ে সরে পড়েছে—সঙ্গে রাখতে না পারে তো পিটুনি দিয়ে সায়েস্তা করে রেখে যাক।

তাকিয়ে দেখে, সুভদ্রা নিঃশব্দে দু-চোখে হাসছে। বলে, ঠাট্টা করলাম একটা। সাধু স্বামীর সতীসাধ্বী বউ—বুক দেখাতে গেলাম আর কি! কিন্তু রঙ নিয়ে যে বসে রইলাম, হাত সরালে কিসের ভয়ে? দারোগা-পুলিশ ভয় করো না, তাদের চেয়ে আমি বেশি ভয়ের লোক?

সাহেব আমতা-আমতা করে বলে, ভয় কেন হবে? উল্কি পরা আমি ভালবাসিনে।

ভয় নয়, তবে ঘেন্না। তোমার মতন ফর্সা মানুষ নই। কাছে বসে সুঁচ ধরে কাজ করব, ছোঁয়াছুঁয়িতে ধবধবে রঙ ময়লা হয়ে যাবে, সেই ঘেন্না তোমার? জানি, জানি। চোর কিনা তুমি—গায়ের উপর চিহ্ন রাখতে চাও না। এক চিহ্ন—জেল থেকে লোহা পুড়িয়ে চোর দেগে দেবে। তার পাশে আমার হাতের ছবি মানাবে কেন?

সাহেব এতটুকু হয়ে গিয়ে বলে, মিছামিছি আপনি ঝগড়া করছেন বউঠান—

ঝগড়া কে বলেছে, হাসি-মস্করা একটুকু। জানো ঠাকুরপো, দৃষ্টিতে আমার অভিশাপ আছে। যার কাছে আবদার করে একটা কিছু বলতে যাই, সে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ। পাষাণের মতো অসাড় আর কঠিন। যেমন তুমি হয়ে গেলে। এটা কিছু নতুন নয় আবার জীবনে।

এই ক'দিনে সাহেবকে কী চোখে দেখেছে, নিশিরাত্রে সুভদ্রা-বউ তার সামনে ভেঙে পড়ে। বলে, পাষাণের কাছে লজ্জা নেই—খুলে বলি আজকে তোমায়। বিয়ে যখন হল, কিছুই বুঝিনে—পুতুল-খেলার বয়স তখন আমার। খেলার মন নিয়ে হাতে উল্কি এঁকে দিলাম, ও-মানুষ আমার বুকে লিখল। তারপর একদিন দেখি বিশ্বসংসার রঙে রঙে ভরে গেছে। হায় আমার কপাল —মানুষটি তার মধ্যে কবে যে পাষাণ হয়ে গেছে টের পাইনি। লজ্জা-অপমান না মেনে পাগল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি তার উপর—দেখি, ঠোঁট নড়ছে বিড়বিড় করে। জোর করি তো ঠোঁট নড়া বেড়ে যায় আরও। কি মন্তোর পড়ছ গো? বলে, মন চঞ্চল হয়ে আসে কিনা—রাম-নামে মোহ কাটাই। রাতের বেলা ভয়ের জায়গায় রাম-রাম করে আমরা পথ চলি, ঠিক তাই। আমি তার কাছে পেত্নি-শাকচুন্নি। কিন্তু এ পেত্নি হে রাম-নামে ডরায় না! উপদ্রব অসহ্য হয়ে উঠলে শেষটা একদিন ঘর-বাড়ি ছেড়ে পিঠটান।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, বংশীর কাছে যে শুনলাম—

কথাটা সুভদ্রাই শেষ করে দিল: শুনেছ, ধর্মের কলকাটি আমি নেড়েছি। আমার বুদ্ধিতে বাড়ি ছেড়েছে। দু-জনে একদিন বাসা করে ধর্মভাবে সংসার করব, সেই আমার মতলব।

সাহেব সায় দিয়ে বলে, সকলে তাই জানে। বাইটামশায় অবধি সেই কথা বলেন।

আমি হতে দিয়েছি তাই। পাপের নামে নাক সিঁটকে সকলকে অকথা-কুকথা বলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ঘুরে বেড়াই। জীবনে কিছুই তো পেলাম না, ঐ একটু মিথ্যে রটনা আমার পাওনা: জাঁহাবাজ বউ আমি, বরকে নাকে-দড়ি দিয়ে ঘোরাই। দেমাক নিয়ে মাথা খাড়া করে আছি, নইলে তো কোনকালে মরে যেতাম—

হাসি-মস্করার কথা, অতএব হাসতে লাগল সুভদ্রা খিলখিল করে। কিন্তু সাহেব যে আর পারে না, ছুটে পালাবে। বুঝি জল এসে যায় চোখে। তার সেই চিরকালের রোগ।

বারো

আচ্ছা বিপদ হল দেখি। পচা বাইটার কাছে সাহেবের না এসে উপায় নেই, কিন্তু সুভদ্রা-বউ কোন্‌খানে ওত পেতে আছে কে জানে! ছোঁ মেরে হাত ধরবে এঁটে, হিড়হিড় করে টানবে। সে রাত্রে বারাণ্ডা অবধি গিয়ে ছাড় হয়েছিল, টানাটানি করে ঘরেই পুরে ফেলবে হয়তো এবার।

বর্ধন-বাড়ির অদূরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ দেখে তিনটা মানুষ! কাছাকাছি এলে চিনল, মুরারি বর্ধন এবং আগে-পিছে কাছারির দুই পাইক—মহাদেব সিং আর ভীম সর্দার। চোত কিস্তি চলছে, সাল-তামামি সামনে। খাজনাকড়ি কষে আদায়ের সময় এই। সোনাখালি তালুকের মালিক চৌধুরী কর্তা চলে আসছেন দিন কয়েকের মধ্যে, কাছারি-বাড়ি চেপে বসে নিজে তিনি আদায়পত্রের তদারক করবেন। বরাবরই আসেন এই সময়টা। বকেয়া বাকি বেশি দেখলে বকাবকি করেন: পান খেয়ে নিজেরা পেট মোটা করে বসে আছ—আদায় হবে কি! পান অর্থে ঘুষ। বুড়ো চৌধুরী আবার গুণগ্রাহীও বটে—আদায় ভাল হলে দরাজ বখশিস। মুরারি নায়েব দুতিন বছর পেয়েছে, এবারও প্রত্যাশা রাখে। দোর্দণ্ডপ্রতাপে কাজকর্ম চলেছে, কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে বেশি রাত্রি হয়। নায়েব গোমস্তাকে লোকে তো ভাল চোখে

দেখে না—রাত্রিবেলার চলাচলে তাই বেশি সতর্ক হতে হয়। মহাদেবের হাতে পাঁচ-হাতি লাঠি, ভীমের কাঁধে গাদা-বন্দুক।

ভীম সর্দারের আগে নজরে পড়েছে। হাঁক দিয়ে ওঠে: কে ওখানে?

সাহেব বলে, আমি। নায়েব মশায় আমায় খুব চেনেন।

এই ছোঁড়ারই পক্ষ নিয়ে ভাদ্রবউ অপমান করেছিল। মুরারি জ্বলে উঠল সাহেবকে দেখে। ধমক দিয়ে বলে, যা যা—চিনিনে তোকে! ভারি আমার গুরুঠাকুর কিনা, তাই চিনে রাখতে হবে। গাঁয়ের উপর কি মতলবে এখনো তুই ঘোরাফেরা করিস? আমি জানি চলে গেছিস বিদায় হয়ে।

সাহেব বলে, গৃহস্থ-বাড়ি কাজ করছি, মরশুম সারা করে তবে তো যাব। রাগ করেন কেন, বাইরে বাইরে তো থাচ্ছি এখন, শুই গিয়ে বাইটামশায়ের কাছে।

কেন্নোর মাথায় টোকা। মুহূর্তে মুরারি একেবারে গুটিয়ে যায়। দু-দুজন নিম্ন কর্মচারী, কাছারির পাইক—তাহাদের সামনে কথা বাড়াবে না। খাচ্ছে একটা মানুষ, তার ভাতের থালার সামনে গিয়ে ঝগড়াঝাটি করেছিল—ধান-চালের এই আবাদ অঞ্চলে সেটা অতিশয় নিন্দার ব্যাপার। অন্তরালে এরাই গিয়ে হাসাহাসি করবে: নায়েব কী কঞ্জুষ রে···অতিথিকে দুটো খেতে দিয়েছে বলে ভাদ্রবউয়ের সঙ্গে ধুন্দুমার।

সাহেবই বলতে বলতে চলেছে, শুয়ে থাকি আপনার বাবার কাছে। তারই কথায় বড়বাবু। বুড়োমানুষের কখন কি ঘটে বলা যায় না। রাত্তিরবেলা উঠতে গিয়ে হয়তো বা আছাড় খেয়ে পড়লেন। আমায় তাই বললেন, দিনমানে কাজকর্ম, রাত্রে তো কিছু নয়। পাটোয়ার-বাড়ি থেকে রাত্রে এসে আমার কাছে শুবি। খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরোই, শুধুমাত্র শুয়ে থাকা ওখানে।

শুনতেই পায় না আর মুরারি, দু-কানে বুঝি ছিপি-আঁটা। বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে পাইক দুটো ফিরে গেল। হনহন করে মুরারি ভিতরে চলল, ফিরেও তাকায় না। পচার কামরায় সাহেব ঢুকে পড়ে! আর কিসের ভয়, আর কি করতে পার বউঠান?

কৌশলটা চালু হল এবার থেকে—মুরারির পিছন ধরে আসা! কাছারির আশে পাশে সাহেব অপেক্ষা করে। মুরারি বেরিয়ে পড়লে পিছু নেয়। দূরে দূরে থাকে, বাড়ি ঢুকবার মুখে দ্রুত এসে একত্র হয়।

গুরু-শিষ্যে চুপিসারে কথাবার্তা। পচা নিজের কথা বলছে।

একবার হল কি—গৃহস্থ টের পেয়ে তাড়া করেছে। তিন সাঙাত আমরা। খাহিন গাঙ পড়েছে সামনে, বিষম তুফান। কুমির-কামট গাঙে গিজগিজ করছে,

সে জলে পা ঠেকালে রক্ষে নেই। খেয়া নৌকো শিকল করে, শক্ত তালা এঁটে মাঝিমাল্লা ঘুমুচ্ছে নৌকোর উপর—

পচার প্রশ্ন : কী করলাম বল্ দিকি তখন ?

সাহেব বলে, তালাটা খুলে ফেললেন কায়দাকৌশল করে। কিম্বা ভেঙেই ফেললেন।

ঘুমুচ্ছে ওরা নৌকোর উপরে—জেগে উঠবে যে! জেগে উঠে চেঁচামেচি করবে; ডাকাত নই, চোর আমরা—সেটা খেয়াল রাখিস।

দেমাক করে জোর দিয়ে পচা বলে, আমরা চোর, বুদ্ধির ব্যাপারি। গায়ের জোরে নয়, কলকৌশলে কাজ। কী করলাম বল্ ভেবে-চিন্তে।

ভেবে সাহেব কুল পায় না, চুপ করে থাকে।

মোরগ ডাক ডেকে উঠলাম। তাই শুনে পাড়ার যত মোরগ ডাকতে লাগল। এক সাঙাত বাগানে ঢুকে কাক ডাকল। এ-গাছে ওগাছে কাকে অমনি কাকা করে উঠল রাত পুইয়েছে ভেবে। মাথায় বোঝা তুলে তখন আমরা খেয়ার মাঝিকে ডাকছি : পাইকার ব্যাপারি—পাঁচ ক্রোশ গিয়ে আমরা হাট ধরব। নৌকো শিগগির খুলে দাও। দুপুর রাত্রি এমনি কায়দায় সকাল করে নিয়ে হাসতে হাসতে পার হয়ে চলে গেলাম।

জন্তু-জানোয়ার পাখ-পাখালির ডাক ভাল করে শিখে নিতে হয়। শিয়ালের ডাক সর্বাগ্রে। ভাব করতে হয় জীবজন্তুর সঙ্গে, কাজের দায়ে সময় বিশেষে জন্তু হতে হয়। ডাক আবার সকলের মুখে আসে না। বংশীটা পারে ভাল। সে শালা কিন্তু কদর বোঝে না, হেলাফেলার জিনিস মনে করে।

সাহেবকে নিয়ে সেই একরাত্রে কর্মকার-বাড়ি গিয়েছিল। শিক্ষা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে পচা এখন হামেশাই বেরিয়ে পড়ে। কঠিন বিদ্যা—শুধুমাত্র মুখের উপদেশে হয় না। নানান জায়গায় ঘোরে দুজনে—সোনাখালির বাইরেও। অনেক বাড়ি চলাচল। মোটরগাড়ি আর পাকাবাড়ি। যে-বাড়ি একজন-দুজন বেওয়া-বিধবা থাকে, আবার যে-বাড়ি কিলবিল করে মানুষজন। যে-বাড়ির বিশেষ পাহারার জন্য গ্রাম্য চৌকিদারের সঙ্গে পৃথক বন্দোবস্ত, যে-বাড়ি বাঘা বাঘা কুকুর। আবার এমন বাড়িও—যেখানে ঢেঁকিশালে শব্দ-সাড়া করে ঢেঁকির পাড় পাড়লেও ভয়ে মানুষ ঘর থেকে বেরুবে না।

সরকারি চৌকিদার কিম্বা মাইনে করা দারোয়ান এমন কিছু ভয়ের বস্তু নয়। বন্দোবস্তের উপরে বন্দোবস্ত চলে, টাকার খেলায় ভাব জমানো যায়। সামাল কুকুর নিয়ে। যে-বাড়ি কুকুর থাকে, রাতের কুটুম হঠাৎ সেখানে ঢুকবে

না। আগে থেকে হয়তো বা ছ-মাস এক বছর থেকে ব্যবস্থা চালাতে হয়। ছলে-ছুতোর দিনমানে যাবে সে-বাড়ি। ধরো, তবলদার হয়ে গেলে গৃহস্থের আমগাছ, জামগাছ, খেজুরগাছ চেলা করতে। করাতি হয়ে গেলে গাছ ফেড়ে তক্তা বানাতে। ব্যাপারি হয়ে গেলে ধানের দরাদরি করতে। জীবজন্তু যেন তোমার বড় প্রিয়, এমনিভাবে তু-উ-উ করে ডাকবে কুকুর। নিজে ভাত রান্না করে খাবে গৃহস্থ-বাড়ি, কিম্বা ভাত চেয়ে-চিন্তে খাবে—সেই ভাতের আধা-আধি দিয়ে দেবে কুকুরের মুখে। কুকুরের গায়ে হাত বুলাবে। যতদিন ভাল রকম চেনা পরিচয় হচ্ছে, রাত্রিবেলা গিয়ে পড়া ঠিক নয়।

পচা বলে, গভীর মনোযোগে সাহেব প্রতিটি পদ্ধতি শুনে নিচ্ছে। একবার বলে, মাড়ি আঁটার কী মন্তোর আছে শুনেছি—

পচা একটু হেসে বলে, মন্তোরে এত সব হাঙ্গামা নেই। ধুলো পড়ে ছুঁড়ে দিলে জীবের গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে মাড়ি এঁটে গেল। আওয়াজ বেরুবে না। মাড়ি ফাঁক করে খেতেও পারবে না। কাজ হয়ে গেলে সেইজন্যে ছাড়-মন্তোর পড়ে কারিগরে মাড়ি খুলে দিয়ে যায়।

সাহেবের ধ্বক করে নফরকেষ্টর কথা মনে পড়ে। শুধুমাত্র এই মন্তোরটা শেখা থাকলে তাকে কিছু ভাবতে হত না, ছোটভাইয়ের বাসায় পরমানন্দে জীবন কেটে যেত। কারখানা থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর বউয়ের মাড়ি এঁটে দিত, ঝগড়াঝাটি বন্ধ। সকালে কারখানা যাবার মুখে মাড়ি খুলে দিয়ে সরে পড়ত। শুধু নফরা বলে কেন, কত ভাল ভাল সংসারি লোকের উপকার হত মন্তোরটা জানা থাকলে!

পচা বলে চলেচে, মন্তোর আছে ঠিকই, সে মন্তোর খাটাতে পারলে হয়। একালের আনাড়ি মানুষে পেরে ওঠে না। মন্তোরের চেয়ে দ্রব্যগুণে এখন আমাদের বেশি ভরসা।

পোষা বিড়াল বেশি সতর্ক কুকুরের চেয়ে। ঘরে বিড়াল ঘুমিয়ে আছে—সিঁধের মুখে, যত নিঃসাড়েই ওঠ, বিড়াল জেগে উঠে লাফ দিয়ে পড়বে। তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, গৃহস্থ চোখ মেলবে না। বিড়ালের স্বভাবই এই। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরুলে বিড়ালে লাফ দেয়। আরশুলা-টিকটিকি দেখলেও। বিড়াল লাফালে গৃহস্থ জাগে না।

একদিন—সমস্তটা দিন ধরে পচা বাইটা ভারি ব্যস্ত। কামরায় দুয়োর দিয়ে খুটখাট করছে, জিনিসপত্র নাড়াচ্ছে সরাচ্ছে। নিশিরাত্রে সাহেব এসে দাওয়ায় দিয়েছে, পচা বেরিয়ে এসে শক্ত করে তার চোখ বাঁধল। তারপর ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে। টিনের পোর্টম্যাণ্টো বেতের তোরঙ্গ সারি সারি সাজানো।

টোকা দে সাহেব। খুব আস্তে—তুই কেবল শুনবি, অন্য কানে পৌঁছবে না। গৃহস্থ শুনতে পেলে তো ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। চোখে দেখেছিস না, কান দুটো খোলা। টোকা দিয়ে শুনে শুনে বল, কী আছে এসবের ভিতর।

শিক্ষা কত রকমের দেখ। মোটা মেহনতের কাজ যেমন, তীক্ষ্ণ অনুভূতির কাজও তেমনি। বড়-বিদ্যা বলে জাঁক করে এমনি এমনি নয়।

কানের উপর ভর করো মা দক্ষিণাকালী! পরীক্ষায় পারবে বোধ হয় সাহেব। একটায় বলে, কাপড়চোপড় আছে। কি করে জানলি রে তুই? আওয়াজটা শুনুন বাইটামশায়, ঢ্যাব ঢ্যাব করছে।

বেতের প্যাটরায় ঘা দিয়ে বলে, ঘটি-বাটি আছে। গয়নাগাঁটিও থাকতে পারে। খনখনে আওয়াজ।

চোখ খুলে বাক্সর ডালা তুলে মিলিয়ে দেখ্ এবারে—

যা বলেছে, ঠিক ঠিক তাই। পচা বাইটা আনন্দে থই পায় না। বলে, বয়স থাকলে তোকে আজ কাঁধে তুলে নাচাতাম রে সাহেব। জনম শেষ করে এসে এদ্দিন সাগরেদ একটা পেলাম বটে! এত হেনস্থা সয়ে বোধকরি এইজন্যেই বেঁচে রয়েছে। রাতের কুটুম আমরা—অন্ধকারে কাজকর্ম। যত অন্ধকার ততই ভালো। সে অন্ধকারে চোখের কাজ নেই, চোখ কানা হলেই বা কি! কাজ কানের আর হাত-পায়ের। নাকেরও কখনো-সখনো। বাক্সের উপর টোকা দিয়ে আওয়াজের তফাতে ভিতরের মাল চেনা—বাজে লোকের ক্ষমতা নেই, গুণী কারিগরেই পারবে শুধু।

আদর করে সাহেবের পিঠ ঠুকে দেয়। নিতান্ত আপনজনের মতো প্রশ্ন করে: বড্ড কাজের ছেলে তুই বাছা, বাপ কি কাজ করে?

জবাব কি আছে সাহেবের! দুনিয়ার সকল লোক ভাগ্যবান—বাপ-মা ভাই-বোন, জাতি-কুল শতেক রকমের পরিচয় তাদের। সাহেবের পরিচয় শুধু-মাত্র সে নিজে। লোকে নাকি মরার পরে বায়ুভূত হয়ে ভাসে, জীবন থাকতেই সাহেব নিরালম্ব হয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পচা বলে, তুই না বলিস, আমি ঠিক বলে দিতে পারি। মহাগুণী তোর বাপ। গুণীর বেটা, নইলে এইটুকু বয়সে এত ক্ষমতা সম্ভবে না। হয় সে হাকিম-দারোগা নয়তো পয়লা নম্বরের বাটপাড়। মাঝামাঝি মানুষ কখনো নয়।

শিকড়বাকড়, লতাপাতার শিক্ষা এর পরে। বনে-বাদাড়ে নিয়ে গিয়ে পচা বাইটা নানা রকমের গাছগুল্ম চেনায়। পচা পেয়েছিল গুরুর কাছ থেকে। তিনিও আবার তাঁর গুরুর কাছ থেকে। এমনি হয়ে আসছে। পুলিস অশেষ চেষ্টা করেও হদিস পায় নি। গুণী জনকয়েকের মাত্র জানা—তাদের পেটে

সাঁড়াশি ঢুকিয়েও কথা বের করা যায় না। এক রকমের পাতা জঙ্গল থেকে তুলে ছায়া-ছায়া জায়গায় শুকিয়ে রাখে। ঘরে ঢুকে কিছু পাতা খাটের তলে রেখে আগুন ধরিয়ে দাও—যে খাটে মক্কেলরা শুয়েছে। আগুনটা নিভিয়ে দাও এবারে, ধোঁয়া বেরোক, ধোঁয়া তাদের নাকের ভিতরে যাক। মধুর আলস্যে সর্বদেহ আচ্ছন্ন হয়ে আসে, স্নায়ুতন্ত্রীতে রিমঝিম বাজনা বাজে যেন। আরও আছে—সেই পাতার বিড়ি কারিগরের মুখে। দ্রুত হাতে কাজ করে যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ কান রয়েছে মক্কেলের নিশ্বাসের ওঠা-নামায়। পাতলা ঘুম বুঝলে বিড়িতে টান দিয়ে পরিমাণ মতো ধোঁয়া ছাড়বে নাকে। সর্বস্ব লোপাট হয়ে গেল, সারাক্ষণ মক্কেল তবু মিষ্টি স্বপ্ন দেখছে। সাহেব ঠিক এমনিটাই করেছিল জুড়নপুরে আশালতার পাশে শুয়ে।

•

সিঁধকাঠির দাবি এবার সাহেবের। পচা বলে, কাঠি বুঝি ইচ্ছেই করলেই ধরা যায়। ধরলে কি আর হাত পুড়ে যাচ্ছে—সে কথা নয়। কিন্তু ওস্তাদ সাগরেদের হাতে তুলে দিল, সে কাঠির দাম অনেক। সে কাঠির ঘা যেখানে মারবি, মা-কালীর দয়ায় ঝুরঝুর করে সোনাদানা খসে আসবে। কান দেখেছি তোর সাহেব, হাত দু-খানা একবার পরখ করে দেখতে দে। উতরে যাস তো কাঠির কথা তখন বিবেচনা করা যাবে।

কাঠি অভাবে খন্তা। পচা বলে, খেলতে জানলে কানাকড়িতে খেলা যায় রে বেটা। কাঁচাঘরে ছোটখাট একটু কাজ—খন্তাতেই হয়ে যাবে। গুরুপদ ঢালিকে দিয়ে খোঁজ এনেছি।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, কোন গুরুপদ ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ, সেই লোক। সর্দার হয়ে তোদের নিয়ে কাজে বেরিয়েছিল। পারে না হেলে ধরতে, ছুটল সে গোখরের পিছনে। সে-ও সাগরেদ আমার, খবর পেয়ে এসেছিল। এই কাজটার খোঁজদারি করেছে, ডেপুটি হয়েও সে সঙ্গে ঘুরবে।

পঞ্চমী তিথি, শুক্লপক্ষ। শেওলা-ভরা মজা দীঘির ধারে ধারে চলেছে পচা আর সাহেব। কেয়ার ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে ঢুকে যায়। ভিতরটা পরিচ্ছন্ন —আজ-কালের মধ্যে সাফসাফাই হয়েছে। সাফাই করে গেছে—আবার কে ?—গুরুপদই। কেয়াবনে সাপ থাকে, সেইটা বড় সুবিধা। সাপে আর চোরে সাঙাত-সম্পর্ক—চাল-চলন একই রকম বলে বোধহয় চোরকে সাপে কিছু বলে না। অথচ সাপের ভয়ে বাইরের লোক কেউ জঙ্গলে ঢুকবে না।

গুরুপদও এসে গেল। কিছু সূর্যের তেল ও মর্তমানকলা এনেছে, উবু

হয়ে বসে তেলে-কলায় চটকাতে লেগে যায়। বাইটা বলে, কাজের আগে চোরের গায়ে মাখিয়ে দেবে সাহেব।

গুরুপদর দিকে চেয়ে সাহেব সকৌতুক বলে, তিলকপুরের কাজেও ছিল কিন্তু এদ্দুর নয়।

পচা বলে, রীতকর্ম এইসব। সকলে সব সময় মানে না। কিন্তু মানা ভালো। মুরুব্বিরা দেখেশুনে মাথা খাটিয়ে তবেই এক-একটা বিধান দিয়ে গেছেন।

কাপড় ছেড়ে ল্যাঙট পরে নিয়েছে ইতিমধ্যে সাহেব। প্রয়োজনের বেশি এক ইঞ্চি বাড়তি কাপড়চোপড় থাকতে নেই, কোন প্রান্ত কেঁউ ধরে ফেলে বিপদ ঘটাতে পারে। ডেপুটি গুরুপদরও সেই পোশাক। সাহেবের গায়ে ডলে ডলে সে তেল-কলা মাখাচ্ছে। কেউ চোর ধরে ফেললে সড়াৎ করে পিছলে বেরুবে, রাখতে পারবে না।

তৈরি হয়ে এইবার আকাশ মুখো তাকাচ্ছে। চাঁদটুকু ডুবে গেলেই হয়।

ক'পোতায় ক'খানা ঘর? তার মধ্যে কোন্ ঘরটা পছন্দ? ঘরের কোন্খানে?

পাঁচচালা ঘরের কানাচে কাঁঠালতলায় জায়গা ঠিক করেছে। ঝোপঝাপ চারিদিকে, ছায়ান্ধকার—কাজের পক্ষে এত সুন্দর জায়গা হয় না।

খুঁজিয়াল গুরুপদ যাবতীয় খবর মজুত রেখেছে। তবু কিন্তু কারিগর কাজের মুখে নিজে পাকচক্কোর দিয়ে বুঝেসমঝে আসবে। সাহেব টুক করে একটু মাটির ঢিল ছুঁড়ল উঠানে। তারপরে চেলা-কাঠ একখানা। সাড়া নেই। মাথার উপর দিয়ে বাদুড় একঝাঁক পতপত করে উড়ে গেল কোন্-দিকে। পা টিপে টিপে এবারে ঘরের কাছে বেড়ায় ঘা দিল মৃদু হাতে। বেড়ায় কান রাখল।

পচার কাছে এসে সবিস্ময়ে বলে, সন্ধ্যেরাত্রি—কিন্তু গাঢ় ঘুম শুনে এলাম। কান ভুল করেছে, এমন তো মনে হয় না।

ঘাড় কাত করে পচা সায় দেয়: এমনিই হবে। খাওয়াদাওয়ার ঠিক পরেই এসেছি। ভাত-ঘুম এখন—ঠেসে ভাত খেয়ে শুয়ে পড়লেই ঘুম এসে যায়। বৃষ্টি না খরা, ঠাণ্ডা না গরম, শীতকাল না গ্রীষ্মকাল—এতসব বিচারের দরকার পড়ে না ভাতঘুমের অবস্থায়। তবে ঘুমের পরমায়ু অল্প, একটু পরেই পাতলা হয়ে আসবে। নতুন কারিগর তোদের এই সমস্তটা কাজ খানিক দূর এগিয়ে রাখা ভাল। শেষ ওঠানো সময় বুঝে হবে।

হুকুম দিল: লেগে যা সাহেব 'জয় কালী' বলে। কানের কথা অমান্য

করিসনে। রাতের বেলা চোখ ভুল করে বলে কান এই সময়টা বেশি রকম সজাগ।

তিলকপুরে সিঁধের ব্যাপার ছিল না। হাতে-কলমে সিঁধের কাজ এই প্রথম। পচা বাইটা অনতিদূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে খুঁটিনাটি সমস্ত দেখে যাচ্ছে। কয়েকটা ডাল ভেঙে এনেছে সাহেব, ডাল মাটিতে পেতে দিয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে এনেছে, কেউ বলে দেয়নি। ঠিক এমনিটাই চাই। কাজের আদ্যন্ত ভেবে নিয়ে তবেই সাহেব খন্তা হাতে নিয়েছে।

কাচনি অর্থাৎ ছেঁচা-বাঁশের বেড়া। বেড়ার নিচে গবরাট (বাঁশের ফালি আড়ভাবে পাতা, যার উপরে বেড়া রয়েছে)। মাটির ডোয়া পোতা। খন্তায় ডোয়ার মাটি খুঁড়ছে ধীরে ধীরে—অত্যন্ত নরম হাতে। ডেপুটি গুরুপদকে নির্দেশ দিয়েছে, দু-হাতে অঞ্জলি পেতে সিঁধের নিচে সে ধরে আছে, মাটি পড়ছে হাতের উপর। অল্পস্বল্প বাইরে যা পড়ছে, সে মাটি আলেগোছে ডাল-পাতায় পড়ে তাতে কোন শব্দ নেই। বাতিল হাঁড়ি একটা যোগাড় করেছে, হাতের মাটিতে হাঁড়ি ভরতি করে সন্তর্পণে দূরে নিয়ে চলেছে। যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। দেখে দেখে পচা চমৎকৃত হয়। সার্থক বটে তার শিখানো। উপদেশের কণিকামাত্র অপচয় হয় নি।

সিঁধ কেটে দেয়াল একেবারেই ফাঁক করতে নেই, কিছু বাকি রেখে দেবে। মেটে দেয়াল হলে চার-পাচ ইঞ্চির মতো, ইটের গাঁথনি হলে একখানা ইট। এ লাইনের বাঘা বাঘা মুরুব্বিদের এই অভিমত। মক্কেলের গভীর ঘুম দেখে কাজ শুরু করেছিলে, এখন হয়তো সে ঘুম পাতলা। বাইরের আলো হঠাৎ সিঁধের ফাঁকে এসে মানুষটাকে চমকে দিতে পারে। সইয়ে সইয়ে অতএব কাজ।

সাহেবও তাই করছে। খন্তা রেখে বেড়ার এদিক-সেদিক কান পেতে বেড়ায়। ক্ষণকাল তারপরে চুপচাপ বসে আবার যায় বেড়ার ধারে। অর্থাৎ সুবিধের নয়। রোগির নাড়ি দেখে পেট টিপে বুকে নল বসিয়ে ডাক্তার যেমন মুখ বাঁকায়, তেমনি অবস্থা। সিঁধটুকু শেষ করা এবং মাল পাচার করা—সবসুদ্ধ বড়জোর আধ ঘণ্টার ব্যাপার। কিন্তু এমন শোনা গেছে, এরই অপেক্ষায় বসে রাত কাবার হয়ে গেল, কাজ বরবাদ। দেয়াল কেটে ফিরে যাওয়া মানে সে মক্কেলের বাড়ি অন্তত বছর খানেকের ভিতর আর আসা চলবে না। আজকেও তাই না ঘটে।

পচার কাছে গিয়ে বলে, কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন ? আপনি চলে যান, আমি আর গুরুপদ থাকি।

পচা বাইটা পুলকিত কণ্ঠে বলে, আমি যাচ্ছি, তোরাও চলে আয়। আজকের মতন হয়ে গেল। ঘরে না-ই ঢুকলি, এমনিতেই বুঝে নিয়েছি

রাত থমথম করছে। ফিরে চলেছে জঙ্গুলে শুঁড়িপথে। উচ্ছ্বসিত হয়ে পচা বলে, তোর বাপ বলেছিলাম দারোগা-হাকিম, নয়তো বাটপাড়। ওসব কিচ্ছু নয় সাহেব, এইবারে সঠিক হদিস পেয়েছি।

সাহেব চমকে ওঠে: আজ্ঞে ?

তোর বাপ কচ্ছপ। কচ্ছপের বেটা তুই—গুটগুট করে কেমন হাত চলতে লাগল কচ্ছপের চলনের মতন।

নিজের রসিকতায় পচা বাইটা চাপাহাসি হাসে। বলে, পয়লা দিনেই যা নমুনা দেখালি, তা-বড় তা-বড় কারিগর পাকা হাতেও এমন পারে না।

•

চলে এমনিই প্রায়ই। হাতে-কলমে কাজ করে ঘাঁতঘোঁত বুঝে নেওয়া। প্রতি কাজেই গুরুপদ ডেপুটি। পচা বলে দিয়েছে, সেই কোন আমলে আমার সঙ্গে নেমেছিল—চুলই পাকল, আর কিছু হল না। সাহেব ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মরবার আগে শিখে নিয়ে যাও কিছু। ওপারে যমের রাজ্যে গিয়ে খেলা দেখিও। পচা তেমন যায় না—কষ্ট বেশি সইবার ক্ষমতা নেই। কাছাকাছি হলে হঠাৎ কখনো গিয়ে কিছুক্ষণ দেখে-চলে আসে।

একদিন গুরুপদ হন্তদন্ত হয়ে খবর দিল, মক্কেলের ঘরে সাহেবকে আটকে ফেলেছে।

কখনো নয়। ঘরের মানুষ জেগে পড়বে, এমনধারা কাজ সাহেব কেন করতে যাবে ? উত্তেজনায় পচা খাড়া হয়ে বসল: তুমি আবার যাও গুরুপদ, ভাল করে খবরাখবর আনো। সাহেবকে আটক করবে, এ কখনো হয় না। হতে পারে—চ্যাংড়া বয়স তো—সাহেবই তাদের নিয়ে খেলাচ্ছে।

কিন্তু খবর সত্যি। সাহেব তার নিজের দোষে আটকা পড়েছে। নিঃসংশয় হয়ে তবেই ঘরে ঢুকেছিল। মাটিতে বিছানা—মশারি টাঙিয়ে স্বামী-স্ত্রী আর বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। গুরুপদ খোঁজ এনেছে, দুটো ছেলের মধ্যে বড়টাকে শাশুড়ির ঘরে দিয়ে কোলের বাচ্চা নিয়ে বউ শোয়। আজ দুপুরে পাট-বিক্রির টাকা পেয়েছে, সে টাকা ঘরেই আছে, ঘর থেকে বেরুতে পারেনি এখনো।

সিঁধ থেকে ঘরে উঠে সকলের আগে দরজার খিল খুলতে হয়। মৃচ্ছকটিকের সময়েও এই নিয়ম। খিল খোলা রইল এই মাত্র—দরকার হলে যাতে দরজার প্রশস্ত পথে পালাতে পারো। দরজা ভেজানোই থাকবে, বাইরের আলো এসে নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটায়। সাহেব যাচ্ছিল সেই দরজার দিকে। বাচ্চাটা

গড়িয়ে কখন মশারির বাইরে এসেছে—পা পড়ল গিয়ে বাচ্চার ঘাড়ে। একবার ক্যাঁক করে উঠেই নিশ্চুপ।

কী সর্বনাশ! মুহূর্তে সাহেবের কেমন সব ওলটপালট হয়ে যায়। কাজ ভুলে বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়েছে—বয়স পিছিয়ে গিয়ে সাহেব নিজেই যেন এই অচেনা বাড়ির শিশু। তাকেও খুন করতে গিয়েছিল—হাত দিয়ে গলা টিপে নয়, হয়তো বা এমনিধারা গলার উপর পা চাপিয়ে।

ধকল কাটিয়ে বাচ্চা গলা ফাটিয়ে কেঁদে উঠল। মরেনি তবে। হুঁশ পেয়ে সাহেবও সঙ্গে সঙ্গে বুক থেকে নামিয়ে রাখে। মা জেগে পড়েছেঃ আরে, মশারির বাইরে যে ঢুলঢুল! পুরুষের ব্যস্ত কণ্ঠ : কাঁদে কেন, কামড়াল নাকি কিছুতে? মশারির বাইরে এসে মা বাচ্চা কোলে করে বসেছে। বাপ দেশলাই হাতড়াচ্ছে : বালিশের তলায় রেখেছিলাম যে, গেল কোথা?

একটি লহমা—যত কিছু করণীয় তার ভিতরে। বিছানার ওধারে দরজা—সাহেব যেখানটা এসে পড়েছে। দরজা খুলে উঠানে লাফিয়ে পড়া যায়—তার পরেই দৌড়। কিন্তু ক'টা খিল না-জানি দরজায়, হুড়কো-ছিটকিনি আছে কিনা—এইসব করতে করতেই তো পিছন থেকে জাপটে ধরবে। পুরুষলোকটা কাঠি জেলে প্রদীপ ধরাল। সাহেব আর নেই।

সিঁধের দিকে নজর পড়ে পুরুষ চেঁচিয়ে ওঠেঃ চোর এসেছে রে—চোর, চোর! ভয় পেয়ে বউটাও হাউ হাউ করে। বাড়ির লোকজন সব উঠে পড়ল, পাড়ার লোক ছুটো-ছুটি করে আসে। বিষম সোরগোল। সিঁধের মুখে আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। অন্ধিসন্ধি খুঁজছে।

একজন বলে, চোর বুঝি ঘরের মধ্যে বসে আছে ধরা দেবার জন্য। সিঁধের পথে বেরিয়ে গেছে কখন। বাচ্চা নিয়ে পড়লে তোমরা—অমন অবস্থার আর কি করবে? চোর সেই ফাঁকে পিঠটান দিয়েছে। জিনিসপত্র কি গেল দেখ এইবারে।

না, যায়নি কিছুই। ছেলের কান্নায় পালাবার দিশা পায় না, ফুরসত পেল কখন? অবোধ বাচ্চাই আজ চোর ঠেকিয়েছে। ক্ষতি-লোকসান যখন হয়নি, চোরের পিছনে ছোটবার তত বেশি গরজ নেই। ছোকরারা এদিক-ওদিক দেখে বেড়াচ্ছে। মাতব্বর মহাশয়রা দাওয়ায় চেপে বসেছেন, হুঁকো ঘুরছে হাতে হাতে, রকমারি চুরির গল্প হচ্ছে। কোন চোরের নাকি পান্তাভাত ছাড়া অন্য কিছুতে লোভ ছিল না, ভাতের লোভে রান্নাঘরে সিঁধ কেটে ঢুকত। এমনি সব গল্প।

গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ বোধকরি দাওয়ায় জড় হয়েছে, ঘরের ভিতর বউ

একলা। ছেলে এক-একবার ডুকরে ওঠে—প্রদীপ কাছে এনে বউ ঠাহর করে করে দেখছে, দুধ খাওয়াচ্ছে বুকের মধ্যে নিয়ে। কেন যে সাহেব বোকার মতন দু-হাতে তুলে নিতে গেল—দরজা খুলে অথবা সিঁধের গর্ত দিয়ে দিব্যি ঐ সময়টা বেরিয়ে যেতে পারত। যত গণ্ডগোলের মূলে কাদার মতন প্যাচপেচে বিশ্রী মনটা মা-কালী, ভালোর জন্য সকলের দরবার—আমি কোন ছোট্টবেলা থেকে মন্দ হবার জন্য মাথা-খোড়াখুঁড়ি করছি, সে জিনিসেও কৃপণতা তোমার!

মশারির ভিতরে সাহেব। পুরুষ বেরিয়ে এসে প্রদীপ ধরাচ্ছে, সাহেব তখন ওদিক দিয়ে নিঃসাড়ে ঢুকে গেল। আত্মরক্ষার এ ছাড়া উপায় নেই। সারা ঘর এবং তারপরে সারা বাড়ি চোর খুঁজে বেড়াল, সেই চোর তখন নরম তোষকের বিছানায় পাশবালিশ আঁকড়ে জামাইয়ের মতন আরাম করে পড়ে আছে। মশারিটা তুলে দেখবার কারো হুঁশ হল না।

ছেলে কোলে নিয়ে বউ—ছেলে ছাড়া আর কিছুই সে এখন দেখতে পাবে না। সরে পড়বার মহেন্দ্রক্ষণ এই। পুরুষ ফিরে এসে এটা-ওটা দিয়ে সিঁধের মুখ বন্ধ করবে, তারপর দরজা এঁটে ছেলে-বউ নিয়ে শোবে। তিলেক দেরি নয় সাহেব, দিব্যি তো খানিকটা গড়িয়ে নিয়েছ। এইবার—

সুবিধা আরও হল। দুধ খাইয়ে ছেলে কাঁধের উপর শুইয়ে বউ উঠে পড়ল। পায়চারি করে ঘরের এদিক-ওদিক, গুণাগুণ করে পিঠের উপর থাবা দিয়ে ছেলে ঘুম পাড়ায়। এদিকে যখন পিছন করেছে—সড়াৎ করে সিঁধের গর্তে নেমে পড়ো।

ইঁদুর যেমন ঢুকে যায়, সাপ ঢোকে শেয়াল ঢোকে, মানুষ কেন পারবে না?

তেরো

পরের দিনটা এক পা বেরুলো না সাহেব। পাটোয়ার-বাড়ি শুয়ে বসে কাটায়। বাইটার কাছেও যায় না। মুখ দেখাতেও লজ্জা।

রাত পোহাতে না পোহাতে গুরুপদ এসে হাজির। বলে, যাওনি কেন? তলব পড়েছে। এক রাত্রি না দেখে বৎসহারা গাভীর মতন হাম্বা হাম্বা করছে।

সাহেব সভয়ে প্রশ্ন করে, পরশুর ব্যাপার নিয়ে কথা হল নাকি?

হল বই কি! তোমার জুড়ি সাগরেদ বাইটামশায়ের আর নেই। ছিল না কখনো, হবেও না।

ঈর্ষার জ্বালা গুরুপদর কণ্ঠে। সাহেবের মনে হল বানিয়ে বলছে। বলে, আটকা পড়েছিলাম, তাতে বাইটা কি বললেন?

ইচ্ছে করে করেছিলে। আটক না হলে বেরুনোর খেলাটা দেখাও কি করে? যেও কিন্তু আজ, তুমি না গেলে আমার উপর দোষ পড়বে।

যেমন ইদানিং হয়ে থাকে—রাত্রে পা টিপে টিপে সাহেব বাইটার ঘরের ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। আবার পচারও যে নিয়ম—খুট করে দরজার খিল খুলে দেয় সঙ্গে সঙ্গে।

ঘরে পা দিতেই পচা বলে ওঠে, বাহাদুর বটে তুই ছোঁড়া!

গালির বদলে বাহবা পেয়ে সাহেব আরও ভেঙে পড়ল: আমার কিছু হবে না ওস্তাদ, জন্ম থেকে অভিশাপ আছে। আপনার সঙ্গে মিথ্যে ঘোরাঘুরি—হুকুম দিয়ে দেন, চলে যাই।

হাসিমুখে অবিচলিত কণ্ঠে পচা বলে, গুরুদক্ষিণা শোধ না করে যাবি কেমন করে? পাওনার জন্যেই তো ডেকেছি।

শীর্ণ হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে পচা তার মাথায় রাখে। বলে, কাঁচা বয়সের তোরা নির্গোলের কাজে সুখ পাসেন, সে জানি আমি। গোলমাল কাটিয়ে বেরিয়েও তো এলি।

সাহেব অধীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলে, সে-গোলমাল কেমন করে ঘাড়ে নিলাম, সেটাও তো শুনবেন।

ওস্তাদের কাছে ঢাকাঢাকি নেই। তা হলে বুক-ঢালা আশীর্বাদ মেলে না। ওস্তাদের আশীর্বাদ বিহনে গুণজ্ঞান সমস্ত বিফল।

আদ্যোপান্ত শুনে নিয়ে পচা—দেবে তো এইবার দূর-দূর করে তাড়িয়ে—কী আশ্চর্য, মুখ-ভরা হাসি নিয়ে উল্টে সাহেবের তারিফ করে: এই তো চাইরে! আমরা হলাম বড় বিদ্যার ব্যাপারি। বুদ্ধির খেলা আমাদের—ডাকাত বেটাদের মতন ভোঁতা কাজকর্ম নয়। বড্ড রক্ষে হয়ে গেছে। বাচ্চাটা যদি মরত, দলের মধ্যে তোর নাম হয়ে যেত খুনে ডাকাত। চিরকালের দাগী হয়ে যেতিস। জেলখানার দাগী হওয়ায় নিন্দের কিছু নেই। এই দাগী হওয়া দলের মধ্যে, নিজের সমাজে। কেউ তখন আর সঙ্গে নিতে চাইত না: অপয়া লোক, কাজ করতে গিয়ে কোন হাঙ্গামা ঘটিয়ে বসে ঠিক নেই।

সাহেবের মাথার পাষাণ-ভার যেন নেমে গেল। পিঠে এক আদরের থাবা বসিয়ে দিয়ে পচা বলে, সর্বরকমে পরখ হয়ে গেল বাপ আমার। পুরোপুরি লেগে যা এইবার। কাঠি কাঠি করিস, গুরুদক্ষিণা শুধে এবারে কঠিন হুকুম

নিয়ে নে। রাজার অট্টালিকা ফকিরের ডেরা মাছির মতন যথা ইচ্ছা নির্ভয়ে ঢুকে যাবি, বিশ মরদ মিলে চেপে ধরেও গুরুবলে আটকাতে পারবে না।

পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে সাহেব বলে, হুকুম হোক, কী রকমের দক্ষিণা—

সাক্ষি থাকো ষড়ানন, সাক্ষি কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী, জীবনপণে সাহেব গুরুঋণ শোধ করবে।

পচা বাইটা বলে, ক্ষেত্তোর পাত্তোর সবাই বলে দিচ্ছি। কুলের মুশল আমার দুই বেটা—মাল এনে যেদিন তুই হাতে দিবি, সকলের বড় বেটা বলে তোকে মেনে নেবো।

বাইটার পা ছুঁয়ে গদগদ কণ্ঠে সাহেব বলে, হুকুমটা হয়ে যাক—

তবু বাইটা ভূমিকা করে যাচ্ছে : বড্ড কঠিন ঠাঁই বাপু। গুরুদক্ষিণা চিরকালই কঠিন হয়—একবারের বেশি তো দিতে যাচ্ছিস নে। আমার যিনি গুরু, তাঁর কি দক্ষিণা দিতে হয়েছিল শুনবি ?

পচা বাইটার গুরুর যিনি গুরু, সেই পিতামহ-গুরুটি বিষম খুঁতখুঁতে। বললেন, মাটির উপরে নরম চলাচলের আমি দাম দিইনি। ওতে পরীক্ষা হয় না।

বাইটার গুরু কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, আজ্ঞা করুন।

মাটির উপরে নয়, গাছের মাথায় চড়ে চুরি করে আনবি। মিহি কাজ তাকেই বলে—হাতে-পায়ের উপর পুরোপুরি দখল না হলেও কেউ তা পেরে উঠবে না।

বড় এক জামগাছের তলায় শিষ্যকে নিয়ে উপরমুখো দেখান : মগডালের উপর পাখির বাসা। ঠাহর করে দেখ, বাসায় বসে পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। গাছে চড়বি, গাছের মাথায় চলে যাবি, হাত বাড়িয়ে পাখির পেটের নিচে থেকে ডিম পেড়ে নিয়ে আসবি। পাখি টের পাবে না, উড়ে যাবে না। যেমন ছিল, তেমনি ঠিক বসে থাকবে।

সাহেব পরমোৎসাহে বলে ওঠে, আমিও করব তাই। সেকালের মুরুব্বিরা পেরেছেন তো আমরাই বা কেন পারব না! দিনমানে কাল বাসা খুঁজে রাখব পাখি যেখানে ডিমে বসেছে।

পচা বলে, পাখির ডিমে আমার কী গরজ! ওটা তো কথার কথা। মান ইজ্জতের ব্যাপার—সাগরেদ হয়ে তুই আমার মান রাখবি। তোর কাছে দাবি আমার।

দাবির কথাটা শুনে সাহেব স্তম্ভিত হয়ে যায়। ক্ষেত্র এই বাইটা-বাড়িই। পাত্র অন্য কেউ নয় - সুভদ্রা সুভদ্রা। বউয়ের হাতের চুড় দুটো খুলে এনে দিতে হবে। গয়না দিয়ে শ্বশুর বউ পরিচয় করল, প্রথম উপহারের সেই জিনিস ফেরত চায় আবার।

বলে; ডাক হাঁক করে মুখের উপর বলে দিয়েছে—তুই তো ছিলি একদিন ভাত খাচ্ছিল ঐ দাওয়ায় বসে। বললাম, চুড় কতদিন হাতে রাখতে পারিস দেখে নেবো। রেখেছে তাই, হাত নেড়ে আজও ঝিলিক দিয়ে বেড়ায়। চক্ষু আমার জ্বালা করে সাহেব।

একটুখানি ইতস্তত করে সাহেব বলে, আগেভাবে জানান দেওয়া হয়েছে,—চিঠি ছেড়ে ডাকাতি করতে যায়, এ যেন তেমনি হয়ে গেল খানিকটা।

কাঁচা কাজ করে ফেলেছি, এখন সেটা বুঝি। বয়সের দোষ, মেজাজ ঠিক থাকে না। ভালো গয়না বারো মাস দিনরাত্তির পরে থাকবার কথা নয়, কিন্তু হারামজাদির সেই থেকে আতঙ্ক হয়ে গেছে, বাক্সয় রেখে সোয়াস্তি পায় না।

অনুতপ্ত বাইটা। গুরুর মুখে সাহেব এসব শুনতে পারে না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, হাতে পরে থাকুক আর যা-ই করুক, আপনার মুখ দিয়ে একবার যখন বেরিয়েছে, নির্ঘাৎ ও-চুড় চলে আসবে। আমি দায়ী রইলাম।

বাইটার দন্তহীন মাড়ি হাসির উচ্ছ্বাসে হাঁ হয়ে পড়ে: জোর তো আমার সেই। শুয়ে পড়ে চিঁ-চিঁ করি—কোন অঞ্চল থেকে গাঙ-খাল-ঝাঁপিয়ে হঠাৎ তুই এসে পড়লি। আমি যেন নতুন জন্ম পেয়ে গেছি বাপধন। ছোট-বউয়ের গয়না এনে দক্ষিণা শোধ করবি, তোর উপরে আমার হুকুম রইল।

সুভদ্রার নজর সব সময় সাহেব উপর। যখন সে পচা বাইটার কাছে বেড়ার গায়ে দুটি চোখ তাক করে আছে, টের পাওয়া যায়। এবারে সাহেবও নজর রাখছে। যেইমাত্র কোঠাঘরে ঢুকে সুভদ্রা দরজা দেয়, সাহেব সাঁ করে জানলার পাশে এসে বড় বড় মানকচু-পাতার অন্তরালে দাঁড়িয়ে পড়ে। দিব্যি এক লুকোচুরি খেলা—বাইরের অন্ধকারে ঠিকমতো জায়গা নিয়ে নির্বিঘ্নে অনেকক্ষণ ধরে নিরিখ করে দেখা চলে। শ্বশুরের শাসানিতে বউটা সত্যিই শঙ্কিত হয়েছে, ঘরে ঢুকে সকল দিক তন্নতন্ন করে দেখে নিয়ে তবে খিল আঁটবে।

দেখে যাচ্ছে সাহেব রাতের পর রাত। গোড়ায় ভড়কে গিয়েছিল: কাজ হবে না, ওস্তাদকে মিথ্যা আশা দিয়েছে। মজবুত গাঁথনির নতুন দেয়াল কেটে কোঠাঘরে ঢোকা অসম্ভব। একলা একজনের পক্ষে তো বটেই। তার উপরে

রূপকথার রাক্ষসীর মতোই কৌটোয় পুরে সন্তর্পণে বালিশের তলায় রাখে।

দেখতে দেখতে শেষটা বুদ্ধি খুলে যায়। এমন সোজা কাজ হয় না। কারিগর যেখানে সাহেব এবং মক্কেল সুভদ্রা, সেখানে ভয়ের কি আছে? দৈবাৎ যদি দেখে ফেলে, কথা জোগানোই আছে: উঁকি তুলবেন তো বলুন বউঠান,

সেইজন্যে এসেছি। তারপরে এটা-ওটা বলে কাটান দেওয়া। মেয়েমানুষ বোঝাতে কি লাগে!

গৃহস্থঘরে মেয়ে-বউদের নিয়ম সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নিজেরা তারপরে গল্পগুজব করে ধীরেসুস্থে অনেকক্ষণ ধরে খায়। সুভদ্রা-বউ আলাদা গোত্রের। ঝড়ের মতন একসময় রান্নাঘরে ঢুকে থালায় চাট্টি বেড়ে নিয়ে খেয়ে-দেয়ে চলে আসে। নিষ্প্রয়োজনে কথাটি বলে না কারো সঙ্গে।

আজও তেমনি খেয়ে ফিরছে, সাহেব নিঃসাড়ে পিছু নিল। সাহেব যেন ছায়া সুভদ্রার—সামনের দিকে আলো থাকলে পিছনের যে ছায়া পড়ে। সতর্ক বউ দরজায় তালা এঁটে গিয়েছিল, তালা খুলে ঘরে ঢুকল। কমজোরি হেরিকেন-লণ্ঠনের জোর বাড়িয়ে দিয়ে হাতে তুলে নিল। এবং রোজ যেমন করে—লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘরের অন্ধিসন্ধি দেখে বেড়াচ্ছে।

ঠিক পিছনে লেপটে আছে সাহেব—ছায়া বই কিছু নয়। ঈশ্বরের ভুলে দুটো চোখই সামনের দিকে—পিঠের উপরে যখন চোখ নেই, একলা মানুষের কাছে লুকিয়ে থাকা শক্ত হবে কেন? সুভদ্রা ঘুরছে, সাহেবও ঠিক-ঠিক ঘোরে তেমনি। ছায়ার সরে বেড়ানোর শব্দ হয় না, সাহেবেরই বা হবে কেন? তা-ই যদি হবে কী ছাই শিখল এত বড় ওস্তাদের কাছে!

নিচু হয়ে সুভদ্রা তক্তাপোশের তলাটা দেখে, ওখানে লুকিয়ে আছে কিনা কেউ। নেই—পরিষ্কার ফাঁকা জায়গা। সুভদ্রার সঙ্গে সাহেবরও দেখা হয়ে গেল—জায়গা পছন্দসই বটে। অতএব সে-ই ঢুকে পড়ল এবার। একেবারে নিশ্চিন্ত। সুভদ্রাও নিশ্চিন্ত হয়ে দরজায় খিল আঁটে, ছিটকিনি আঁটে, হুড়কো দিয়ে দেয়। দরজার আংটা ধরে টেনে দেখে অনেকবার। চোর না ঢুকতে পারে।

দরজা এঁটে গায়ের কাপড়-চোপড় ফেলে সুভদ্রা লঘু হচ্ছে। এই রেঃ, তক্তাপোশের তলে সাহেবের বুক ঢিবঢিব করছে। এতক্ষণ যা ভাবেনি। একটা নতুন বিপদ চোখে পড়ে তার। ঘরের মধ্যে সাহেব, সুভদ্রা বোধহয় টের পেয়ে গেছে। যেরকম চতুর, টুক করে দেখে নিয়েছে কখন। সৈন্যের মতো তলোয়ার খুলে তৈরি হচ্ছে আক্রমণের জন্য? সেই মুলতুবি কাজ—বুকের নামাবলীতে কালি ঢেলে ধ্যাবড়া করতে বলবে? নিজের ইচ্ছায় ফাঁদে ঢুকে পড়েছে, যা খুশি এখন করতে পারে। কপালে সাহেব হাত দিয়ে দেখে, ঘাম ফুটেছে সত্যি সত্যি।

না, শুয়ে পড়ল সুভদ্রা। সর্বরক্ষে রে বাবা! লণ্ঠনের জোর কমিয়ে দিয়েছে। সুস্থির হয়ে সাহেব এইবার মনের ঘাড়ে কড়া চাবুক কষিয়ে দেয়: এটা কি রকম হল ওহে কারিগরি? সুভদ্রা নারী কি পুরুষ, বুড়ি কি যুবতী, এটা

তোমার জানবার বিষয় নয়। মক্কেল মাত্র—জীবন্ত প্রাণী, এইটুকু খেয়াল রাখতে হচ্ছে কাজের কায়দা ঠিক করবার জন্যে। চুড় দুটো টিনেরবাক্স কিম্বা কাঠের তাকেও থাকতে পারত, না থেকে রয়েছে সুভদ্রা-বউয়ের দুটো হাতে। এইমাত্র তফাত। নজর থাকবে শুধুমাত্র বস্তুর উপরে, তার বাইরে নয়। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য মহাভারতে একদিন অর্জুনের লক্ষ্যভেদ পড়েছিল, অবিকল সেই ব্যাপার। নজর যখন শুধুমাত্র গয়নার উপর তার বাইরে আর কিছু দেখছে না—লক্ষ্যভেদ তখনই।

যেমনটি হবার কথা—চুড় খুলে কৌটোয় ভরে সুভদ্রা পরম যত্নে বালিশের নিচে রেখেছে। তক্তাপোশের তলে সাহেব কান পেতে নিশ্বাস শোনে। নিদালি-বিড়ির প্রক্রিয়াও আছে অল্পস্বল্প। অপারেশনের পূর্বমুহূর্তে অভিজ্ঞ ডাক্তার রোগীর অবস্থা যেমন সতর্ক হয়ে বিবেচনা করে। ঠিক সময়টিতে টিপি-টিপি বেরিয়ে লণ্ঠন একেবারে নিভিয়ে দিয়ে দরজার খিল-হুড়কো খুলবে। আজকে আর ভুল নয়—বাইরে পালানোর পথ সকলের আগে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে চুড় পরতে গিয়ে সুভদ্রা বালিশের নিচে পায় না। কৌটোসুদ্ধ লোপাট। বিছানা হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে খুঁজছে। নেই, নেই। দরজায় তাকিয়ে দেখে খিল-হুড়কো খোলা। আর কি, শুধু এখন কপাল চাপড়ানো! সিঁধও কাটেনি কোন দিকে। ইঁদুর-ছুঁচোর রূপ ধরে নর্মদার ফুটোয় ঢুকেছে নাকি? তা ছাড়া তো পথ দেখা যায় না।

দরজার শিকল তোলা বাইরে থেকে। ঘরের ভিতর আটক করে রেখে নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে। কাজের এ-ও বুঝি দস্তুর। সুভদ্রা দুয়োর ঝাঁকাঝাঁকি করছে, অবশেষে বড়বউয়ের কানে গেল।

ওমা, শিকল দিয়ে কে মস্করা করল?

সুভদ্রা কেঁদে পড়ে: মস্করা দেখছ দিদি, সর্বনাশ হয়েছে। চুড় চুরি হয়ে গেছে—কৌটো সুদ্ধ।

শিকল খুলে ঘরে এসেছে বড়বউ। মনে-মনে তৃপ্তি। এক নারীর গায়ের গয়না অন্য নারীর চোখে কাঁটার খোঁচা মারে। এই বড়বউও একদিন এ-বাড়ি এসেছিল, শাশুড়ি তখন বেঁচে। শিঙের উপর জিলজিলে পাতের দু-গাছা চুড়ির বেশি জোটেনি। ছোট জায়ের হাতে পাথর-বসানো চুড়—কেননা, সে শিক্ষিত ছেলের বউ। শাশুড়ির অবর্তমানে তখনকার দিনের রোজগেরে শ্বশুর গয়নাখানা নববধূর হাতে নিজে পরিয়ে দিলে।

উৎপাতের শান্তি এতদিনে। দরদটা সেই কারণেই বেশি করে দেখাতে

হয় : সত্যিই গেছে, না তামাসা করছিস ছোট? অনেক দাম যে! সিঁধ নেই, চোর কেমন করে নেবে? মনের ভুলে কোথায় রেখেছিস, খুঁজে দেখ ভাল করে।

সুভদ্রা কাঁদতে কাঁদতে বলে, দরজায় নিজের হাতে খিল দিয়েছি দিদি। ছিটকিনি দিয়েছি, হুড়কো দিয়েছি। সমস্ত খুলে বাইরে থেকে শিকল তুলে পালিয়েছে। আবার তা-ও বলি, শোবার আগে লণ্ঠন ধরে ঘরের অন্ধিসন্ধি দেখে নিয়ে তবে দুয়োর বন্ধ করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছে কি জান দিদি—বলব?

কৌতূহলে মুখ কাছে এনে বড়বউ বলে, কেন বলবি নে? যদি কোন উপায় থাকে, না বললে কেমন করে হবে?

দিব্যি করে বলতে পারি শয়তান বুড়োর কাজ। ঐ মানুষ ছাড়া কেউ নয়। এক মাথা ছিল—তিন-মাথা হয়ে শয়তানি তেতুনো হয়েছে। গুণীন লোক—বাতাস হতে পারে, মাছি হয়েও ঢুকে যেতে পারে। গয়না নিয়ে নেবে—হাঁক-ডাক করে কতদিন থেকে বলে বেড়াচ্ছে। তা-ই করল।

পাগলা হয়ে সুভদ্রা সেই শ্বশুরের কাছে গিয়ে পড়ে। ঝগড়া-ঝাঁটি নয় কথায় বাঁকা সুরও নেই। ঢিব ঢিব করে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে। প্রণামের শেষ নেই—প্রণামই নয়, মাথা খুঁড়ছে যেন।

মোলায়েম কণ্ঠে পচা বাইটা প্রশ্ন করে, কি হয়েছে মা-জননী?

এমনি। পায়ের ধুলো নিতে নেই বুঝি?

সে তো বটেই। গুরুজনের উপর ভক্তিটা বড় বেশি আমার মায়ের। ধুলো তো সব কুড়িয়েবাড়িয়ে নিলে—কথা কি আছে, এবার বলে ফেল।

শ্বশুরের মুখের দিকে সুভদ্রা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে বিদ্রুপের হাসি। ইচ্ছে করে, বাঘিনীর মতো থাবা মেরে হাসিসুদ্ধ ঐ মুখ ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেয়। কিন্তু রাগারাগির দিন আজ নয়। হাহাকারের মতো বলে উঠল, আহ্লাদ করে চূড়জোড়া দিয়েছিলে, সে কোথায় হারিয়ে গেল বাবা। কি হবে?

পচা বলে, বল কি, ভাল জিনিসটা গো! কেমন করে হারাল?

খুঁজে-পেতে এনে দাও বাবা। তোমার অনেক তুকতাক, ইচ্ছে করলেই পার। নইলে তোমার পা ছাড়ব না। লাথি মেরে ঝেড়ে ফেল, আবার এসে ধরব।

হি-হি করে পচা হাসতে লাগল : অপয়া জিনিসটা গেছে—ভালই তো, আপদ নেমেছে তোমার গা থেকে। কোল-কাঁখ ভরে আসুক এবার ছা-বাচ্চারা, বড়বউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চালাও। যে নিয়েছে, সে তোমার ভালই করল গো!

মজা দেখছে বুড়ো। বলবেই এমনি। আসাই ভুল এ মানুষের কাছে। ভরসা এখন সুভদ্রার একটি মানুষ—কেউ যদি পারে তো সেই একজন। নিরিবিলি চাই একবার তাকে। সুভদ্রা ছটফট করছে, নিজের খুশিমতো সাহেব বাইটার ঘরে আসবে, ততক্ষণ সবুর মানে না। আসেও ইদানীং মুরারির সঙ্গে ব্যূহরচনা করে, সুভদ্রা যাতে নাগাল না পায়। দিনমানে পাওয়া যাবে না, জানা আছে। রাত্রির অন্ধকারে বউমানুষ একলা বেরিয়ে পড়ল। যেতে হয় তো চলে যাবে, পাটোয়ার-বাড়ি অবধি, সেইখানে আচমকা গ্রেপ্তার করবে।

সাহেবের সেই বাড়ি বাড়ি উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ানোর কাজ। এ জিনিস বরাবর বজায় রেখে যেতে হবে। মোড় ঘুরে দেখে সুভদ্রা বউ। যেন পাতাল ফুঁড়ে সুভদ্রা বউয়ের আবির্ভাব। সাহেবের একখানা হাত মুঠো করে সে জড়িয়ে ধরে: চুড়জোড়া কাল রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। কে নিয়েছে তা-ও জানি।

সাহেব হকচকিয়ে যায়। চোর ধরে হাতে যেন হাতকড়ি পরিয়েছে। কণ্ঠে জোর নেই, কোনরকমে বলল, কে?

আবার কে? অন্তর্জলীর মুখে এসেও স্বভাব গেল না। নিজে যা আদর করে হাতে পরিয়ে দিয়েছিল, তাই আবার করল। দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়—তাই আছে ওর কপালে। গুরুজন, মান্য ব্যক্তি—আমি কিছু বলব না। কিন্তু ফিরে জন্মে বাসি বাইটা কুকুর হয়ে আধ-হাত জিভ মেলে রাস্তায় রাস্তায় হা-হা করবে। করতে হবে।—অন্যায়ের এমনি এমনি শোধ যাবে না।

মুখের কাছে মুখ এনে কাতর দুই চোখ মেলে সুভদ্রা বলে, তুমি উদ্ধার করে দাও ঠাকুরপো।

সর্বরক্ষে বাবা, দোষ বাইটার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে।

অবাক হয়ে সাহেব সুভদ্রার কথারই পুনরাবৃত্তি করে: উদ্ধার আমি করব?

কেউ যদি করে দেয়, সে তুমি। আর কাকে বলব? সুভদ্রা কেঁদে পড়ল: বাড়ির মধ্যে সকলের সব আছে, আমার কি আছে বলো? ভাসুরের কথা সেদিন নিজের কানে শুনলে—বন্দোবস্ত ঠিক করে রেখেছে, যেদিন ইচ্ছে বাড়ি থেকে দূর-দূর করে তাড়াবে। স্বামী থেকেও নেই। গ্রীষ্মের ছুটিতে আসছে তো বাড়ি—দেখো কী অবস্থা! ঘরে যেন জল-বিছুটি মারে, ছটফট করবে—কখন পালাই, কখন পালাই। কিছু নেই আমার ভাই—থাকবার মধ্যে গয়না দু-চারখানা। দুদিনের সম্বল। ছেলেপুলে নেই, গয়না নেড়েচেড়ে দিন কাটে। তার মধ্যে সেরা জিনিসটাই চলে গেল আমার।

মুকুন্দ আসছে, নতুন খবর সাহেবের কাছে। বলে, বাড়ি আসছেন ছোড়দা?

আসছে বাগানের আম খেতে। নিজের হাতে পোঁতা কলমের গাছে এবারে আম ফলেছে। এককালে বাগ-বাগিচার শখ ছিল—গাছের উপর বড় দরদ। আর এই যে এক অবলা মেয়েমানুষ, বাপ-মা নেই, ভাই নেই, দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর—

কি বলতে চেয়েছিল সুভদ্রা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে কথা শেষ করতে পারে না। টপটপ করে চোখের জল পড়ছে। দু-চার ফোঁটা সাহেবের হাতের উপর পড়ল।

একটু সামলে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলে, ছুটিছাটায় আসে কখনো-সখনো। কিছু যদি বলতে গিয়েছি—লজ্জার কথা কী বলি ঠাকুরপো, বলতে গেলেই জবাব হল : ভগবানের নাম করো, ক'দিনের তরে জীবন! বর-বউ এক খাটে পাশাপাশি শুয়েছি, তার মধ্যেও ভগবান। সেখানেও পাঠের আসর। বারো মাস বাইরে পড়ে থাকে, সে একরকম—এসে পড়ে আরও উৎপাত বাড়ায়। আসবে-আসবে যত শুনছি, আমার ভয় ধরে যাচ্ছে। শত্রু হাসবে, সেজন্যে আলাদা থাকতে পারিনে। উল্টে এমন দেখাই, ভালবাসায় গলে গলে পড়ছি যেন। হিংসেয় যাতে লোকে জলে-পুড়ে মরে আমার সুখ দেখে।

কী ঝোঁক চেপেছে, সুভদ্রা-বউ অনর্গল বকে যাচ্ছে। সাহেব আচ্ছন্ন হয়ে শোনে। হঠাৎ এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে সুভদ্রা আগের কথায় চলে যায় : যাকগে ভাই। ও-মানুষের কথা কেন, আমারই বা হ্যাংলামি কিসের? তোমায় যা বললাম—ঘরের বউ যার জন্যে এই রাত্তিরে ছুটে এসেছি, লোকলজ্জার ভয় করিনি। আমার হাতের জিনিসটা—

যে হাতে গিয়ে পড়েছে বোঝেন তো বউঠান, বড্ড কঠিন ঠাঁই।

একটু ভূমিকা। সাহেব আরও বলতে যাচ্ছিল, সুভদ্রা কানে না নিয়ে এক কথায় ঘুরে দাঁড়াল। চলে যাবার উপক্রম।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কি হল?

নিশ্বাস ছেড়ে সুভদ্রা বলে, ঠিক কথাই বলেছ ঠাকুরপো। কঠিন ঠাঁই। বিদেশি মানুষ, তোমার আর কী ক্ষমতা! বাইটার সঙ্গে কোনদিন কেউ পারে নি। ওর ছেলের আশা অনেক দিন ছেড়েছি, ওর ঐ গয়নার আশাও ছাড়লাম।

মুকুন্দর কথা বলতে বলতে বউ এখন আলাদা একজন যেন। উদাস কণ্ঠস্বর। এত টান গয়নার উপর—তা-ও বুঝি লোপ পেয়ে গেছে। অন্ধকার নিঃশব্দ এক-ছায়ামূর্তি ফিরে চলল।

সুভদ্রা জানে না—সাহেবও যাচ্ছে পিছু পিছু। চোখের জল হাতের উপর পড়েছিল—বউয়ের সেই কান্না চামড়া ভেদ করে শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে। মিথ্যে তুই লড়াই করে মরিস সাহেব, মন্দ হওয়া তোর ললাটে নেই।

হঠাৎ সাহেব কথা বলে ওঠে—সেই যেমন পচা বাইটাকে বলেছিল: চুড় পাবেন আপনি বউঠান। আমি দায়ী রইলাম।

সুভদ্রা ফিরে তাকাল। সাহেব তখন নেই। ঝোপেঝাড়ে জোনাকির ঝাঁক ঝিকমিক করছে। দেবতার মতন বর দিয়ে সাহেব অদৃশ্য। অপথ-বিপথ ভেঙে তীরের বেগে বিস্তর দূরে গিয়ে পড়েছে। আপন মনে গজরাচ্ছে: ভেবেছ কি বউঠান! চুড়েই শোধ যাচ্ছে না। লোকের হাত ধরে কেঁদে কেঁদে না বেড়াতে পারো, তাই করে আমি ছাড়ব।

চৌদ্দ

কঠিন ঠাঁই—মিছে বলেনি সাহেব। চুড় কাল রাত্রেই পচার হাতে চলে গেছে। গুরুদক্ষিণা চুকিয়ে দিয়েছে, দিয়ে আর দাঁড়ায় নি। মোটামুটি নিয়মও তাই—কাজ সমাধা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর্মস্থল থেকে সরে পড়বে। পরে আসতে পার ভাবগতিক ভাল করে বুঝেসমঝে দেখার পর। বাইটার কাছে রোজ রাত্রে আসে—না এলে সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে, সেই জন্যে যথারীতি আজও এসে উঠল।

পচাও অপেক্ষায় ছিল। পিঠে চাপড় মেরে বলে, বলিহারি বেটা! তুই আমার মান রাখলি। ছোটবউমা জেনে বসে আছে, কাজ আমারই। অপদার্থ ভাবত আমায় ইদানীং, গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। হারামজাদি আজকে এসে পায়ের গোড়ায় মাথা ঠোকে। তুই আমার নতুন ইজ্জত এনে দিলি বাবা।

সাহেব বলে, দক্ষিণান্ত হল, আশীর্বাদ দিয়ে দিন। আপনার শিক্ষার নিন্দে হবে, এমন কাজ কখনো যেন না করি—

মাথায় হাত রেখে পচা বাইটা বলে, একদিন তুই আমার অনেক উপর দিয়ে যাবি। একদিন কি বলি, এখনই তাই। ছোটবউমার গায়ের গয়না আনা আর বাঘিনীর কোলের বাচ্চা চুরি করে আনা একই জিনিস।

চুড় রেখেই সাহেব কাল চলে গিয়েছিল। সেই কথা পচা এখন তুলল। বাইরে কেউ ওত পেতে নেই—ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাবার্তা। পচা বলে, ছায়ার সঙ্গে মিলে গিয়ে ছায়ার মতন নড়াচড়া—এক হাত পিছনে থেকেও মানুষটা টের পাচ্ছে না, মানুষ ঘুরছে-ফিরছে তুইও ঠিক-ঠিক সেই পরিমাণ ঘুরছিস—বড় শক্ত কাজ রে বাবা! চলন ষোলআনা রপ্ত না হলে হয় না। পাখির বুকের তলা থেকে ডিম এনেছিলেন আমার গুরু, চেষ্টা করলে তুইও তা পারিস।

বাইটার পায়ে হাত দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে সাহেব বলে, আনব তাই। চলে যাবার আগে তা-ও দেখিয়ে যাব। আপনি আশীর্বাদ করুন।

আছি নরাধম পাপী মানুষ—শুনিই না দুটো-পাঁচটা ধর্মের কথা। ফাঁকতালে কিছু পুণ্যি হয়ে যাক, পাপের ভার কমুক।

রাত্রিবেলা বাড়ি বাড়ি কান পেতে বেড়ানো সাহেবের কাজ। গুরুর সেই নির্দেশ। শিক্ষার কখনো শেষ হয় না। কারিগরকে অন্তর্জলীতে নামিয়েছে, শ্মশানবন্ধুরা এসে বাঁশ ফাড়ছে, কড়ি-কলসির সংগ্রহ করছে—সেই একদণ্ডের পরমায়ুর মধ্যে হয়তো বা নতুন কিছু শিখে নেওয়া গেল। ইহলোকে কাজে না লাগুক, পরলোকে লাগতে পারে। হাসবেন না, হাসির কিছু নেই—সঠিক খবর কে দিতে পারে, যে সিঁধকাঠি সেই লোকে একেবারে অনাবশ্যক?

অন্তর্যামী ভগবান আর সিঁধেল চোরে শুধুমাত্র পদ্ধতির তফাত। তিনি এক জায়গায় বসে থেকে দুনিয়ার খবর ধ্যানযোগে জেনে নেন, নড়াচড়া করতে হয় না। চোর এবাড়ি-সেবাড়ি ঘুরে ঘুরে খবর নেয়। দুধাল গাই গোয়ালে ফেরেনি বলে গৃহকর্তার হা-হুতাশ, দু-বিঘে ধান জমির দায়ে নায়েবকে পান খাওয়ানোর শলাপরামর্শ, হাঁদা মেয়েটার মাথা-ঘোরানোর মতলবে ধান্দ ছোকরার গদগদ ভাব, মুমূর্ষুর শিয়রে আত্মজনের ফোঁত-ফোঁত করে কান্না, মাথার চতুর্দিকে কম্ফটার জড়িয়ে বিনা নিমন্ত্রণে কর্মকর্তার অজান্তে ভোজ খেয়ে আসার বাহাদুরি—এমনি সমস্ত শুনতে হয় নিত্যিদিন। আজকে মুখ বদলানো —উঁহু, কান বদলানো। অধ্যাত্মতত্ত্ব শোনা যাবে নিশিরাত্রে। অনেক কাল পরে বাড়ি এসে যুবতী রমণীর পাশে শুয়ে সংসার মায়াময়, জীবন অনিত্য—এবম্বিধ ভাল ভাল জ্ঞানের কথা।

মুকুন্দ মাস্টার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। আশ্বিন মাসে পূজোর সময় এসেছিল, আর এখন এই বৈশাখের শেষে। কলমের গাছে নতুন আম ফলেছে। তাছাড়াও বুড়ো বাপ কবে আছে কবে নেই—এমনিতরো অবস্থা। পাপী বাপ হলেও আসতে হয়। সাহেবও অতএব কানাচের মানকচু-বনের কালাচাঁদ হয়ে কান পেতেছে। চোর না-ই বা বললেন আজকের দিনে—মুকুন্দ হল ছোড়দা, সুভদ্রা বউঠান, দেওর হয়ে পাতান দিয়েছে জানলার পাশে। সুভদ্রা বলেছিল, দুয়ের মাঝখানটায় ভগবান এসে পড়ে নাকি ভণ্ডুল ঘটান, দম্পতির শয্যায় পাঠের আসর বসে যায় ফুলহাটার ইস্কুল-বাড়ির মতো। সত্যি-মিথ্যে জানা যাবে এইবার। ফিসফিসানির একটি কণিকাও কান ফসকে বাদ পড়তে দেবে না।

ঘরে এলো সুভদ্রা। কাপড় ছাড়ল, চুলের বিনুনিটা খুলে দিল। বারাণ্ডায় গিয়ে ঘটির জলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে আসে একবার। একটি কথা নেই। অন্য দিন একলা শোয়, আজকেও যেন ঠিক তেমনি—ঘরে দ্বিতীয় মানুষ আছে বোঝবার উপায় নেই। বউ মান করেছে, তা ছোড়দা তুমিই বলো না গো মান-ভঞ্জনের একটা-দুটো মধুর বচন। সেই মানুষই বটে! দুই বোবার ঘরবসত, হয়েছে বেশ। কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে গেল—ছিনেজোঁক বেরিয়েছে। সাহেবের গায়ে কত গণ্ডা লেগেছে ঠিক কি! মিছামিছি এই ভোগান্তি।

অকস্মাৎ চমকে ওঠে। কথা ফুটেছে মুখে। ভূমিকা মাত্র না করে সুভদ্রা বলে উঠল, লেখাপড়া শিখে ইস্কুলের ঐ পোড়া কাজ নিয়ে আছ কেমন করে তুমি?

দীর্ঘ অদর্শনের পর যুবতা নারীর প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ। বলে, ইস্কুলের মুখে নুড়ো জেলে বাড়ি চলে এসো।

মুকুন্দর মৃদুকণ্ঠ: এসে?

হাটবাজার কর। জনমজুর খাটাও।

হাটবাজারে লেখাপড়া লাগে না যদি কিছু লাগে সে ঐ ইস্কুলের কাজেই।

লেখাপড়াও তাহলে চুলোর আগুনে দিয়ে এসো।

জজসাহেবের রায়ের মতন অসঙ্কোচ দ্বিধাহান। পচা বাইটারও অবিকল এই কথা—দেখা যাচ্ছে, একটা ব্যাপারে অন্তত শ্বশুরে-বউয়ে মতদ্বৈধ নেই। ছেলে ইস্কুলে পাঠিয়ে ভুল করেছে, পচা শতকণ্ঠে স্বীকার করে। উপায় থাকলে পেটের বিদ্যা উগরে বের করে দিত। সুভদ্রাও সেই কাজে পরমানন্দে যোগ দিত শ্বশুরের সঙ্গে।

বেচারি মুকুন্দর দশা দেখে সাহেবও এখন তাদের সঙ্গে একমত। লেখা-পড়া অতি পাজি জিনিস—মানুষের ভিতরে পদার্থ রাখে না। মিনমিনে মেনি-বিড়াল করে দেয়। মুরারি লেখাপড়ার ধার ধারে না, সে কারণে পুরুষসিংহ হয়ে বিচরণ করে। পান থেকে চুন খসুক তো একটুখানি, হুঙ্কারে বাড়ি সচকিত করবে। স্বামীর আতঙ্কে বড়বউ থরহরি কম্পমান। কম্পনের রীতি-মতো হেতু আছে—এতগুলো সন্তানের জননী এবং বাড়ির গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও মুরারি সর্বসমক্ষে পায়ের চটি খুলে পটাপট ঘা বসিয়ে দেয়, দৃকপাত করে না। আর সেই মুরারির সহোদর ভাই মুকুন্দ আকৈশোর চোখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেও বউয়ের পাশে যেন ফৌজদারি মামলার আসামি।

সুভদ্রা গর্জন করছে: ঝাড়ু মারি তোমার বিদ্যের মুখে। বট্‌ঠাকুরের কী লেখাপড়া, কিন্তু তোমার মতন বিদ্বান ভাইকে শতেক বার বেচতে-কিনতে পারেন। জাঁক করে গলা ফাটিয়ে বলেনও তাই—

গলা ভিজে আসে পরক্ষণে। গর্জনের পর বৃষ্টি নামে বুঝি। বলে, বলা-বলির কি, কাজেও তো তাই। আমাদের অংশের জমাজমি নিলামে তুলে কিনে নিয়েছে। কে দেখছে! এর পরে দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে করা ভাগ্যে আছে আমার।

মুকুন্দ আগের কথাটার জবাব দিল এতক্ষণে: দাদার মাইনে কত জান? আমার অর্ধেকেরও কম। দশ টাকা।

হোক দশ টাকা। দু-হাত ভরে রমারম খরচ করে যাচ্ছেন, দশজনে কত মান্যগণ্য করে।

মুকুন্দ বলে যাচ্ছে, সেই মাইনেও মাসে মাসে নয়—চৈত্র মাসে সালতামামির সময় একেবারে বারো-দশকে এক'শ বিশ টাকা নিয়ে নেন। খুচরো খুচরো নিজেই নিতে চান না।

সুভদ্রা বলে, জমে থাকে। একসঙ্গে ভারী হলে কাজে লাগানো যায়। কী দরকার, মাইনে ছাড়াও কত রকমের রোজগার! তোমার মতন নয় যে গোণাগুণতি পঁচিশের উপর একখানা সিকিও নয়। তা-ও তো শুনি পুরোপুরি দেয় না।

মুকুন্দ বলে, সে রোজগার হল চুরির। কিন্তু হয়েছে কি বল তো—চুরির কাজে তোমার যে বড় ঘৃণা!

সে ঘৃণা এখনো। ওকে চুরি বলে না, উপরি। কেঁউ তার জন্যে চোর বলে না।

ঘৃণা চুরির উপরে নয় তবে, চোর, নামটার উপরে?

এই কথায় সুভদ্রা ক্ষেপে গেল: শ্বশুর গুরুজন, পায়ে মাথা রেখে শতেকবার প্রণাম করি। তবু সিঁধেল-চোর ছাড়া তিনি কিছু নন। তাঁর বেটা হয়ে তোমার এত শুচিবাই কেন জিজ্ঞাসা করি। বট্‌ঠাকুরের একটা নখের যোগ্যতা তোমার নেই, মুখের শুধু বড় বড় বুকনি।

কণ্ঠ কান্নায় ভারী হয়ে আসে: বড়গিন্নি দেমাকে মটমট করে। ইচ্ছাসুখে খরচ করছে—হবে না কেন? ছেলেপুলের জামা-জুতো এক থাকতে আর কিনে দেয়। ঘরের দুধ আছে, তার উপর নগদ পয়সায় আলাদা দুধ যোগান করেছে। রাতদিন গণ্ডেগণ্ডে গিলিয়ে এমন করেছে, কোন বাচ্চার পেটের অসুখ ছাড়ে না।

আমাদের যা-ই হোক সে ভাবনা নেই। দেবা-দেবী দু-জনা—খরচা কিসের!

কথা ক'টি মুকুন্দর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কি না বেরিয়েছে—আর যাবে কোথা? আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে: ঐ বুঝেই তো ছেলেপুলে এলো না। তারা

দেবতা, আকাশের উপর থেকে দেখতে পায়। আমার কোলে আসবে কি না খেয়ে শুকিয়ে পাকাটি হয়ে মরে যেতে?

রণ-দুন্দুভি। এর পরে আর না জমে যায় কোথায়? দ্বৈরথ সমরের কথা পুঁথি-পুরাণে শোনা যায়, সে বোধহয় এই বস্তু। সে এমন, কাঠের পুতুলেরও বুঝি নড়েচড়ে উঠতে হয়। বিদ্যা-শিক্ষা সত্ত্বেও মুকুন্দ একেবারে পুতুল নয়। অসহ্য হয়ে এক সময় তড়াক করে উঠে পড়ল। দরজা খুলছে।

সুভদ্রা হুঙ্কার দিল: যাচ্ছ কোথা শুনি?

ঢেঁকিশাল কি গোয়ালে—কোন্‌খানে ঠাঁই হয় দেখি। বিস্তর পথ হেঁটে এসেছি, কষ্ট হয়েছে, না ঘুমোলে মারা পড়ব।

খিল-হুড়কো খুলে মুকুন্দ কবাট টেনে দেখে, বাইরে থেকে শিকল দেওয়া।

সুভদ্রা বলে, ধাকাধাক্কি করে কেলেঙ্কারী বাড়িও না। যথেষ্ট হয়েছে, শুয়ে পড়ো এসে।

কেলেঙ্কারির ভয়েই বোধহয় সুভদ্রার গলা অনেকখানি খাদে নেমে এসেছে। বলে, রাগের পুরুষ অনেক রাগ দেখিয়েছ, শোও দিকি এবারে।

দরজায় শিকল দিয়ে গেছে—আবার কে, সাহেব ছাড়া? লড়াই কতক্ষণ চলে ঠিক-ঠিকানা নেই—শিকল দিয়ে ইতিমধ্যে সে নিত্যকার রোঁদে বেরিয়েছে। থাকুক এক খাঁচায় বন্দী হয়ে। লড়াইটা প্রায় এখন একতরফা, এই বড় ভরসা। সুভদ্রা যতই হোক দুর্বলা নারী, খুব বেশিক্ষণ দম রাখতে পারবে না। সাহেব আবার ঘুরে এসে দেখবে।

রাতদুপুরে শিয়াল ডেকে গেল, সেই সময় সাহেব পুনশ্চ মানকচু-বনে। কলহ নয়, এখন কথাবার্তা। মুকুন্দর গলা প্রথম কানে আসে: চঞ্চল হয়ো না ভদ্রা, ধর্মপথে থাক, মঙ্গল সুনিশ্চিত।

সুভদ্রা বলে, আছি তো। পোড়া ধর্ম চোখে দেখে কই? মঙ্গল না ঘোড়ার ডিম! বয়স চলে যায়, সাধআহ্লাদের পেলাম না কিছু জীবনে।

মুকুন্দ প্রবোধ দেয়: পাবে। সৎকর্মের ফল মিলবেই। এ জীবনে না হল তো পরজন্মে—

সুভদ্রা-বউ ক্ষেপে গিয়ে বলে, আমি পরজন্ম মানি নে—

মুকুন্দ বলে, নাস্তিকের কথা বলছ যে ভদ্রা।

সাহেব শুনে যাচ্ছে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে। চোর হয়ে শুনছে সে—চোরের আর মড়ার কথা বলার উপায় নেই। নয়তো চিৎকার করে বলাধিকারীর কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিত: পরজন্ম মানে যারা গাড়োল—নিতান্ত অপদার্থ যারা। এ জীবনে কিছুই পেলো না তো কোন এক আন্দাজি ভবিষ্যতের আশ্বাস

খোজে। কল্পনায় এক সর্বময় বিধাতা বানিয়ে নিজের অক্ষমতার দায় সেই কর্তার উপর চাপিয়ে দেয়।

সুভদ্রা বলছে, ধনদৌলত সুখ-শান্তি যশ-মান সাধুভাবে হবার জো নেই আজকাল।

হতে পারে খানিকটা সত্যি। মুকুন্দর কণ্ঠ হাহাকারের মতো শোনাচ্ছে: কিন্তু মিথ্যাকে মেনে নিয়ে হাত-পা ছেড়ে যদি বসি, মানুষের উপায় তবে কি রইল?

উপায়ও বলাধিকারী বলেছেন। কাল আলাদা তো মাপের কাঠিও কেন বদলাবে না? পাপ-পুণ্য উল্টে-পাল্টে ফেল। সেকালে যেটা পাপ ছিল, আজকের সেটা পুণ্য। পুরানো পুণ্যকে তেমনি ধরে নাও পাপ। যত গোলযোগ চুকেবুকে যাবে।

মোটের উপর সাহেব যা ভেবে চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে ঠিক ঠিক তাই। তখনকার ব্যাঘ্র-গর্জন সম্প্রতি বিড়ালের মিউমিউয়ে দাঁড়িয়েছে। পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের বিচার চলছে। সবুর করো, আরও নামবে। দুটো প্রাণ মজে গিয়ে সানাইয়ের সুর বেরুবে দেখো। সবুর করো আরও খানিক।

পরমানন্দে সাহেব আবার টহল দিতে বেরুল।

ফিরে এলো ভোররাত্রি তখন, আকাশে শুকতারা জলজ্বল করছে। মৃদু কণ্ঠগুঞ্জন—কান খাড়া করে থাকতে হয় দস্তুরমতো। কী কাণ্ড রে বাবা—পলকমাত্র ঘুমোয় নি। এই যে বলছিলে মাষ্টারমশায়, পথ হেঁটে কষ্ট হয়েছে, ঘুমানোর দরকার। ছি-ছি, নতুন বিয়ের বরবউকে হার মানিয়ে দিলে তোমরা!

মুকুন্দ বলছে, আর বেশি দিন নয়, বাসা করে থাকব দুজনে। সুবিধা-মতো একটা বাড়ির জোগাড় হলে হয়।

সুভদ্রা চপল কণ্ঠে বলে, যে সে বাড়ি নয়—তেমহলা অট্টালিকা চাই আমার জন্যে। আর গোটাকুড়িক দাস-দাসী। বাড়ি শুধু নয়, দাস-দাসীরও জোগাড় দেখো।

মুকুন্দ বলে, ঠাট্টা করছ ভদ্রা। সঙ্গতি নেই বলে মনে বড় লাগে। তবে পড়ানোয় নামযশ হয়েছে, টুইশানি পাব। ইস্কুলের পঁচিশ টাকার উপর সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলার টুইশানিতে আরও বিশ-পঁচিশ এসে যাবে।

সুভদ্রা গাঢ় স্বরে বলে, না। সারাদিনের খাটনির পর রাত্রে আবার বাড়ি বাড়ি টুইশানি করে বেড়াবে, আমি তা হতে দেবো না। পাঠের আসর বসবে তখন। এক-গাঁ মানুষ জুটিয়ে নয়—সে আসরে আমি একলা। তোমার মুখে ধর্মকথা একা একা শুনব। পঁচিশ টাকা তো বাঁধা আছে, তার উপর পাঁচ-দশ হলে রাজার হালে চলে যাবে। না হলেই বা কি! দু-জনের একলা সংসার—খরচটা কিসের?

পথে এসো বাছাধনেরা! যা চেয়েছিল, ষোলআনাই তবে মিলে। ভোর হয়ে আসে, পাখপাখালি ডাকছে। খুট করে দরজার শিকল খুলে দিয়ে সাহেব উল্লাসে লাফাতে লাফাতে পাটোয়ার-বাড়ির বাসায় চলল এবার। আর কাজ নেই, নিশ্চিন্তে এবার শুয়ে পড়বে।

ভাবতে ভাল লাগে, কোন এক কৌতুকী দেবতা সকলের অলক্ষ্যে নিশুতি রাতে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সৃষ্টিসংসার-জোড়া ছেলেমেয়ে—চোখের জল মুছে হাসি ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ঘরে। রাত পোহালে কে কোথায় ধরে ফেলে—তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে ফিরলেন দিনমানে এসে পড়বার আগে।

আজগুবি অলীক ভাবনা আমার! দেবতা তো ক্ষীরোদ-সমুদ্রে শীতল পদ্মপত্রের শয্যায় আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছেন। এক অভাগিনী গ্রামবধূ এবং ততোধিক অভাগ্য ধার্মিক স্বামীটির জন্য কারো যদি নিশ্বাস পড়ে থাকে—ত্রিলোক-বিধাতা ভগবান নারায়ণ নন তিনি, নিশির কুটুম এক চোর।

শিক্ষানবিশী শেষ। দক্ষিণান্ত হয়ে গেছে, গুরু প্রসন্ন। পাখির বুকের তলা থেকে ডিম চুরি করে এনে দেখাবে সাহেব—সেটা হল বাহাদুরি, ওস্তাদ বাইটার তাক লাগিয়ে দেওয়া। তার আগে—এখনই সাহেব কাঠির পুরো হকদার।

হুঁকো টানছে পচা বাইটা। জোরে এক সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আজকাল যে-না-সেই কাঠি ধরছে, গুরুর হুকুম নিয়ে ধরে ক-জনা? আমার ওস্তাদ নতুন কাঠি হাতে তুলে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, বাইটা বলে ডাকলেন। বাপ-পিতামহের বর্ধন গিয়ে বাইটা হলাম সেইক্ষণ থেকে। সারাজন্ম বুক ফুলিয়ে বাইটা পরিচয় দিয়ে এসেছি।

নীতিনিয়ম মেনে ওস্তাদের আশীর্বাদ নিয়ে কাঠি ধরলে অসাধ্যসাধন করা যায়। আজকালকার দিনে কেউ বড় মানে না, সেকালে অক্ষরে অক্ষরে মানত। কাঁচা কাজ-কারবার সেইজন্য চতুর্দিকে—চুরি কি ডাকাতি তফাত করা যায় না। সিঁধের গর্তে পা দুটো না ছোঁয়াতেই, এমন তো হামেশাই ঘটে, একগণ্ডা লোক কারিগরের ঘাড়ে চেপে পড়ল। অথবা সারারাত ভূতের খাটনি খেটে কারিগর নিয়ে এলো একটা ফুটো ঘটি আর খান দুই-তিন ছেঁড়া কাপড়। সেকালে এমন হত না।

বাইটা বলে, কমসে-কম তিরিশ বছর ঘোরাফেরা করছে ঐ গুরুপদ। ভক্তি আছে খুব—মুখ ফুটে বলতে হয় না, হাঁ করলেই ছুটে এসে পড়ে। কাঠির কথা সে-ও বলে মাঝে মাঝে। আর বাপু, ও জিনিস খাতিরে হয় না—এলেম দেখিয়ে আদায় করতে হয়: গুরুপদকে দিইনি, আপন নাতি বংশীকেও

দিতে পারলাম না। তুই সাহেব ক'দিন এসে নিজের জোরে আদায় করে নিচ্ছিস। হাতে ধরে তোকে দিয়ে দেবো। গুরুপদকে আজ আসতে বলেছি। ছটফট করিসনে, বোস একটু। সে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, কাঠির বায়না দিয়ে আসবি।

ফড়ফড় করে তামাক টানে কিছুক্ষণ। হুঁকো থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করে, কোন্ মুলুকে কাজ ধরবি, ভেবেছিস কিছু? ডাঙা-রাজ্যে দেশেঘরে ফিরে যাবি, না এখানে?

সাহেব বলে, বলাধিকারী বলে রেখেছেন, কাপ্তেন কেনা মল্লিকের দলে কিয়ে দেবেন।

মল্লিকের নামে বুড়ো ক্ষেপে যায়। আর একদিনের মতন কলকে ছুঁড়ে মারেই বা! বলে, গাধার গাধা ওটা। চোর না ডাকাতও না—দোআঁসলা। কলাকৌশল জানে না, জানে কেবল মারধোর আর খুনোখুনি। মল্লিক আবার কারিগর নাকি! গামছা বোনে, চট বোনে, মলমলে হাত দিতে ভয় পায়। বলুক দেখি কোন্ মিহি কাজটা করেছে জীবনে! যত-কিছু শিখলি, ওর সঙ্গে ঘুরলে সব বরবাদ হয়ে যাবে।

আরও অনেক রাত্রে সাহেব গুরুপদর সঙ্গে সিঁধকাঠির বন্দোবস্তে বেরুল। অনেক দূরের গ্রাম, তিন-চার ক্রোশ তো বটেই। জলে নেমে খালই পার হতে হল তিন-চারটা। পৌঁছুতে রাত্রি প্রায় শেষ।

গ্রামে ঢুকবার আগে থেকেই কানে আওয়াজ আসে—ঠনাঠন, ঠনাঠন। নেহাইর উপর লোহা পিটছে। সন্ধ্যারাত্রে খাওয়া সেরে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে রাত দুপুর থেকেই হাপর জ্বালিয়ে বসেছে! কাজের দস্তুর এই।

নবশাখ কর্মকার-শ্রেণীর এরা নয়। ঢোকরা। দা-কুড়ালও গড়ে—পেটের দায়ে গড়তে হয় বটে, কিন্তু নিরীহ কাজে উৎসাহ নেই। বন্দুক গড়ত এককালে এদের বাপঠাকুর্দারা। দেশি গাদা-বন্দুক ঘরে ঘরে তখন—গুলি হল জালের কাঠি। আর এদেরই কামারশালে বানানো ছররা। ইদানীং পুলিস কড়া হয়ে বিনি-পাশের বন্দুক রাখতে দেয় না। ঘরে ঘরে তল্লাসি করে বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে, মালিককে জেলে নিয়ে পোরে। কত বন্দুক মাটির নিচে পুঁতে ফেলেছে পুলিসের ভয়ে—সে বন্দুক কোনদিন কাজে লাগানো চলবে না, খদ্দের হলেন তো মাটি থেকে তুলে বেচে দিতে পারে! কিন্তু বন্দুক মানেই তো বিপন্ন—পয়সা খরচা করে আপনিই বা কেন যাবেন বিপদ কিনতে? নতুন বন্দুক গড়া একেবারে অচল, পুরানো ভাল ভাল জিনিস মরচে ধরে লয় পাচ্ছে।

বন্দুক গড়ে না, কিন্তু সে জায়গায় আর এক লাভজনক ব্যবসা জমে উঠেছে। সিঁধকাঠি গড়ানো। মোটামুটি টাকা পাঁচেক নেবে উৎকৃষ্ট একখানা কাঠির জন্য। সিঁধকাঠির অর্ডার আসে—সে ভারি মজার ব্যাপার। চোরে কামারে সাক্ষাৎ নেই—সাক্ষাৎ হওয়া বিধি নয়। রেওয়াজটা চিরকাল ধরে চলে আসছে। এই যেমন কামারশালের পাশ কাটিয়ে সাহেব আর গুরুপদ নিবারণ ঢোকরার নাতি যুধিষ্ঠিরের বাড়ি গিয়ে উঠল। অত্যন্ত চুপিসারে—ঢোকরা-বাড়িতেই যেন এরা সিঁধ কাটবে। নিয়ম এই। বাড়ি চুপচাপ, যুধিষ্ঠিরের প্রৌঢ় বয়সের নতুন-বউ সাঁঝ লাগতে লাগতে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। দরজার পাশে কুলুঙ্গি আছে দেখুন—ত্রিভুজাকৃতি ছোট্ট ফোকর! তার ভিতরে টাকা রেখে সরে পড়ুন আপনারা। রুপোর কাঁচা-টাকা, কাগজের নোট হলে হবে না। সকালবেলা দরজা খুলে যুধিষ্ঠিরের বউ সেই ফোকরে হাত দেবে সকলের আগে। পেয়ে গেল হয়তো পাঁচ টাকা। অথবা দশ টাকা এক-সঙ্গে—দু-খানা কাঠির জন্য। ঠিক সাতদিনের দিন রাত্রিবেলা আবার এসে দেখবেন, নতুন-তৈরি চকচকে সিঁধকাঠি কুলুঙ্গির নিচে দেয়ালের গায়ে ঠেশান দেওয়া আছে আপনার জন্য। নিয়মের কখনো অন্যথা হবে না। চোরাই লাইনে যারা আছে, সত্যপথে তাদের কাজকারবার। শুধু এক থলেদার ছাড়া—কিছু বাজে লোক ঢুকে পড়ে থলেদার-সমাজের বদনাম করে দিয়েছে।

কাজ চুকিয়ে ফেরার পথে সাহেব ও গুরুপদ কামারশালের অদূরে অন্ধকারে থমকে দাঁড়ায়। চোখ মেলে চেয়ে দেখবারই বস্তু। ফুঁসছে হাপর, টানে টানে আগুন জ্বলে ওঠে। লোহারের কালোকোলো দেহের উপর শাল আগুন ঝিলিক খেলে যায়। প্রধান কারিগর যুধিষ্ঠির ডগমগে লোহা সাঁড়াশি দিয়ে একহাতে নেহাইয়ের উপর ধরেছে, অন্য হাতে ছোট হাতুড়ির ঘায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গড়নের রূপ দিচ্ছে। আর এক মরদ দু-হাতে প্রকাণ্ড হাতুড়ি তুলে সর্বশক্তিতে ঘা দিচ্ছে। অগ্নিবর্ণ লোহা তারা কেটে ছিটকে ছিটকে পড়ে। আরও কিছুদিন পরে কাঠির জন্য রৈ-রৈ পড়ে যাবে—দুর্গাপূজা অন্তে কাঠি নিয়ে দলে বেরুবে। এত ফরমাস আসবে, মাল জুগিয়ে পারা যাবে না। কাজ তাই এগিয়ে রাখছে। এখন এই অবধি থাকল, টাকা হাতে পেয়ে বস্তুটা একটু আধটু পিটিয়ে উকো ঘষে ঝকঝকে করে দিলে হয়ে যাবে।

কামারশালা আরও কত। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঢোকরার নামডাক সকলের বেশি। এই নাম পিতৃপুরুষ থেকে এসেছে, নিবারণ ঢোকরার আমল থেকে। খদ্দেরের অন্ত নেই। মাঝরাত্রি থেকে পহরবেলা অবধি সে নেহাই-হাপরের পাশে। কাজ ছেড়ে স্নান করে ফ্যানসাভাত খেয়ে ঘুমুবে। উঠবে সন্ধ্যার আগে। আরও

একবার স্নান এবং তারপর গুরুভোজন। এতক্ষণে এইবারে একটু ফুরসত। বয়স কাটিয়ে যুধিষ্ঠির নতুন সাঙা করে এনেছে—বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ফষ্টিনষ্টি কামারশালে কাজে বসবার আগ পর্যন্ত।

সাতদিনের দিন—ধৈর্য ধরতে পারে না আর সাহেব, সন্ধ্যা হতে না হতে কাঠি আনতে বেরুল। একা—গুরুপদর প্রয়োজন নেই। সঙ্গে থাকলে তার মন খারাপ হবে। সাঁঝ থেকে সকালের মধ্যে কোন এক সময়ে গেলেই হল। সিঁধ-কাঠি তৈরি হয়ে আছে।

রাজার হাতে রাজদণ্ড উঠেছে যেন। কী আনন্দ, কী আনন্দ! দুনিয়া জুড়ে রাজ্যপাট, দুনিয়ার মানুষ প্রজাপাটক। রাজদণ্ড হাতে যেখানে খুশি চলে যাবে, যে জিনিস ইচ্ছা তুলে নিয়ে আসবে। নিশাকালে নিশুতি রাজ্যের রাজা। দিনমানের রাজারা জাগ্রত মানুষের কাছে খাজনা-ট্যাক্স আদায় করে। এরা আদায়ে আসে সেই সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়বার পর।

পনের

কাছারিবাড়ির পাশ দিয়ে সাহেব চলেছে, কানে এলো মুকুন্দর গলা। সুর করে মুকুন্দ রামায়ণ পাঠ করছে, ফুলহাটার ইস্কুলবাড়িতে করত যেমন। পথের উপর দাঁড়িয়ে সাহেব শোনে। পাইক-বরকন্দাজগুলোর অবিরত দৌড়-ঝাঁপ এবং ক্ষেতেল প্রজাদের ব্যাপারি ডেকে যে-কোন মূল্যে গোলার ধান ছেড়ে দেওয়া—এই দুটো ব্যাপারে কদিন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, খোদ মালিক চৌধুরি কর্তার মহালে শুভাগমন হয়েছে। মুরারির এখন নিশ্বাসটা ফেলার ফুরসত নেই। দিনমানে বাড়ি যায় না, রাত্রেও যেতে পারে না সকল দিন। কাছারি-বাড়ি পড়ে থাকে।

চৌধুরি-কর্তা এমনিই ধার্মিক লোক, তার উপর কিস্তির আদায়পত্র আশাতীত রকমের ভাল হওয়ায় ভগবানের উপর ভক্তিতে গদগদ হয়ে উঠেছেন। সারাদিনের ঐহিক কাজকর্মে মন পঙ্কিল হয়, সন্ধ্যার পরে কিছু না কিছু সৎপ্রসঙ্গের ব্যবস্থা। দিন দুই-তিন ভাগবত পাঠ করে গেছেন দূর-গ্রাম থেকে এক অধ্যাপক এসে। হরি-সংকীর্তন কালী-কীর্তন এবং বালক-কীর্তনও হয়ে গেছে। মুরারি তখন ভাইয়ের নাম প্রস্তাব করে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে—বড় সুন্দর পাঠ করে, বড় মিঠে গলা। মুকুন্দকে বলেকয়ে সে-ই এনে বসিয়েছে।

অনেকদিন পরে শুনছে সাহেব। আহা-মরি প্রাণ কেড়ে নেয়। মুকুন্দ আজ বড্ড জমিয়েছে, ফুলহাটার চেয়েও চমৎকার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁহাতক পারা যায়। উরুতে বাঁধা সিঁধকাটি ঝোপের ভিতর সামাল করে রেখে সে কাছারিবাড়ি ঢুকে পড়ল। নিজের ইচ্ছায় ঢুকছে তা বোধহয় না—পাঠের স্বর টেনেহিঁচড়ে তাকে ভিতরে নিয়ে তুলল।

আসর কোথা? বাইরের লোক একজনও নয়—চৌধুরি-কর্তার সঙ্গে একত্র পাঠ শুনবে আবাদের প্রজাপাটকের মধ্যে এত বড় তাগত কারো নেই। কাছারির লোকজন সব—জন আষ্টেক সর্বসাকুল্যে। জায়গাও অতি সঙ্কীর্ণ। দক্ষিণ দিককার দাওয়াটা তক্তা ও কাঠকুটোয় বোঝাই—কিছু কাঠকুটো সরিয়ে দিয়ে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে সকলে বসেছে। দেওয়ালের গায়ে জলচৌকি পেতে মুকুন্দর বেদি। কেন্দ্রস্থলে চৌধুরী—স্থূলকায় বিশালবপু ব্যক্তি, জায়গার সিকি ভাগ একলাই তিনি দখল নিয়ে বসেছে।

সাহেব সসঙ্কোচে সকলের পিছনে বসল। মুরারি চেয়ে দেখে। এই ছোঁড়াটার হয়ে ভাদ্রবধূ কলহ করেছিল, সে রাগ মনে গাঁথা আছে। ভীম সর্দারকে ইসারা করে দিল, ভীম এসে বলে. নেমে যাও—

কেন?

বাইরের কেউ থাকতে পাবে না, শুধু নিজেরা।

সাহেব শুনছে মুগ্ধ হয়ে। রসভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলে, আমিও বাইরের নই।

মুকুন্দ তাকিয়ে পড়ল। হাসিমুখ, খুশি হয়েছে শ্রোতার মধ্যে সাহেবকে পেয়ে।

ঘাড় বাঁকিয়ে সাহেব মুকুন্দকে দেখিয়ে বলে, বাইরের মানুষ নই আমি। পাঠ করছেন, উনি আমার ছোড়দা। জিজ্ঞেস করে দেখ।

পাঠের আসন থেকে মুকুন্দ বলে ওঠে, ভক্তমানুষ—থাকুক না!

সামনে মুখ করে চৌধুরি-কর্তা শুনছিলেন। মুখ ফেরালেন তিনি। সাহেবকে দেখে দু-চোখে আর পলক পড়ে না। মুগ্ধ হয়ে দেখছেন। বলেন, কি হয়েছে, কি বলছ তোমরা? ছেলেটা কে?

আত্মসমর্থনে মুরারি তাড়াতাড়ি বলে, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে ঢুকে পড়ল—ওটা ইয়ে। মানে বাজে লোকের ভিড় হয়ে যাচ্ছে—

বলতে যাচ্ছিল, ওটা চোর—। ঠোঁটের উপর চেপে নিল। নিজের বাপ চোর, সেই কথা উঠে পড়তে পারে। মুখে না বললেও মনে মনে কি আর বলবে না? পিতৃ-কলঙ্কের দায়ে নিখরচার ছুটো গালিগালাজও করবার জো নেই।

চৌধুরী-কর্তা বলেন, ভাল কথা শুনতে এসেছে, শুনুক না বসে বসে।

আমাদের শোনা তাতে কম হয়ে যাবে নাকি? বড্ড হিংসুটে বাপু তোমরা, কী রকম জড়সড় হয়ে আছে—এগিয়ে এসো ছোকরা, এইখানটা এসে বোসো।

কর্তা বসেছেন,—অদূরে মুরারি নায়েব—দু-জনের মাঝের জায়গা দেখিয়ে দিলেন সাহেবকে। হাত ধরে টেনে বসালেন। লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা। শক্তিশেলে লক্ষ্মণ নিহত। তুমুল কান্নাকাটি শবদেহ ঘিরে।

জমেছে খুব, নম্র হয়ে সকলে শুনছে। চৌধুরি-কর্তা এক সময়ে চঞ্চল হয়ে নড়েচড়ে উঠলেন: ক'টা বাজল বল দিকি?

খাজাঞ্চী সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হৈ করে ওঠে: সংক্ষেপে সারো মাষ্টার। কর্তা-বাবুর বাঁধা টাইমের খাওয়া। সাড়ে-ন'টায়। নিয়মের মধ্যে আছেন বলেই, বলতে নেই, দেহখানা অটুট রয়েছে।

মুকুন্দ বিপন্ন মুখে তাকাল! আঃ—বলে চৌধুরি-কর্তা খাজাঞ্চীকে নিরস্ত করেন: এ কি তোমার সেহা-করচা—পান খাইয়ে খুশি করল তো বকেয়া-সুদ বাদ দিয়ে হিসাব সংক্ষেপ করে দিলে। চারাগাছ বড় হবে, ফুলফল ধরবে—তার জন্যে সময় দিতে হবে বই কি! চেপে খাটো করা যায় না এ জিনিস। কিন্তু আমি বলি কি মাস্টার—

চৌধুরী-কর্তার রায় শোনবার জন্য মুকুন্দ পাঠ বন্ধ করে তাকাল।

আমি বলছি, ঠাকুর লক্ষ্মণ শেলবিদ্ধ হয়ে মরে আছেন, হনুমান পাঠিয়ে তড়িঘড়ি বিশল্যকরণী এনে প্রাণ পাইয়ে দাও। উঠে বসুন। তক্ষুনি কিছু আর রণে যেতে পারছেন না। শোক-টোক এখনো যাদের বাকি আছে, সেই সময়টা হতে পারবে। আমি এই ফাঁকে দুটো মুখে দিয়ে নেবো।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে মুকুন্দ বলে, যে আজ্ঞে।

কর্তামশায় কারণটাও বুঝিয়ে দিলেন: লক্ষ্মণ মরে রইলেন, সে অবস্থায় কেমন করে খেতে যাই বলো। খাওয়া যায় না, পাপ হয়। প্রাণটা সেজন্য আগে পাইয়ে দিতে বলছি। খাওয়াদাওয়া সেরে পরের কথা শুনব। বড্ড ভাল পাঠ হে তোমার।

মুরারির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাজে কটা?

ঘড়ি তো বেদির উপরে—

চৌধুরী-কর্তাও তাই দেখেছেন। ঘড়ি মুকুন্দর পাশে ছিল, প্রয়োজন মতো সে সময় দেখবে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মুরারি ব্যাকুল হয়ে বলে, যে ঘড়িটা আপনি আমায় খেলাত দিলেন। কত দামের জিনিস—টাকার দামে বলছি নে। আপনি হাতে করে দিলেন, সে যে হীরে-জহরতের দাম—

চৌধুরী-কর্তা বলেন, টাকার দামেও ফেলনা নয়। কুকভাইজার-ঘড়ি, বনেদি জিনিস। জলচৌকির আশেপাশে পড়ে গেল কিনা দেখ।

ঠাকুর লক্ষ্মণ রইলেন আপাতত মৃত অবস্থায়। ঘড়ির জন্য খোঁজ-খোঁজ পড়েছে, তন্নতন্ন করে দেখা হচ্ছে। নেই কোথাও।

অপমানে জলছেন চৌধুরী-কর্তা। তাঁর কাছারিবাড়ি তাঁরই চোখের উপর জিনিসটা লোপাট। কিন্তু কণ্ঠস্বরে জালার লেশমাত্র নেই। বলেন, সবাই ভাল-লোক আমরা, চোর কেউ নই। মনের ভুলে নিয়ে নিতে পারি। পারি কেন নিয়েছি নিশ্চয় কেউ না কেউ। সকলে আমরা জামা কাপড়-চোপড় ঝেড়ে দেখিয়ে দেব। ঘড়ি থাকলে বেরিয়ে পড়বে। আমি সকলের আগে—

হাঁ-হাঁ করে ওঠে সবাই : সে কী কথা। আপনি কেন, জিনিস তো আপনারই—

ততক্ষণে চৌধুরি-কর্তা উঠে দাঁড়িয়ে জামা খুলে নগ্নগাত্র হয়েছেন। তাই শুধু নয় মুরারির হাতখানা ধরে কোমরের চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়ে দিলেন : আমার পকেট নাই, কোমরের গাঁটেও নেই। খুশি তো এবার ? এক এক করে সকলে দেখিয়ে দাও।

খাজাঞ্চী উঠে দাঁড়িয়ে জামা খুলছে। মুরারি সাহেবের দিকে কটমট করে চেয়ে বলে, এর পরে তুই—

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলে : আজ্ঞে না, আপনি। আপনি নায়েব মানুষ—মনিব মশায়ের পরেই আপনার পালা। উঁচু থেকে ক্রমে নেমে আসবে।

এমনি সময়ে এক কাণ্ড। জলচৌকির বেদি থেকে মুকুন্দ নেমে পড়েছে। দাওয়া থেকে উঠানে নামলে।

ওকি, কোথায় চললে মাস্টার ?

হুঁ—হু, যাচ্ছি—অর্থহীন অস্পষ্ট কিছু বলে মুকুন্দ পা চালিয়ে দেয়।

চৌধুরী-কর্তা গর্জন করে ওঠেন : যেতে দিও না, নিয়ে এসো আমার সামনে। শিক্ষিত লোক, ইস্কুলের মাস্টার—ছি-ছি !

খাজঞ্চী বলে, কোন বাপের বেটা, সেটা দেখবেন তো—

এইটুকু বলে ফেলেই জিভ কেটে চুপ হয়ে যায়। নায়েব মুরারি বর্ধনের বাপও যে সেইজন। চৌধুরী-কর্তা সদরে ফিরে গেলে মুরারিই-তো সর্বময়। হঠাৎ কি রকমে বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেল।

ভীম সর্দার আর মহাদেব সিং দুই বরকন্দাজ ছুটো হাত ধরে ফেলে হিঁ ড় করে মুকুন্দকে দাওয়ার উপর তুলল। একটু আগে বেদিতে বসে

তন্ময় হয়ে পাঠ করছিল, চোর হয়ে সেইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! লজ্জা কাছারির নায়েব মুরারীরও। ভাইয়ের পাঠের প্রসঙ্গ কর্তার কাছে সে-ই তুলেছিল। ভাবখানা হল—খাজনা আদায়ের ব্যাপারে আমার ক্ষমতা দেখেছ, ভাইয়ের মুখে পাঠ শোন একদিন। ধর্ম অর্থ দুই বর্গের ধুরন্ধর আমরা দু-ভাই। এর ফলে বুড়ো মনিবের কাছে খাতিরটা বেশি হবে। কিন্তু বরবাদ সমস্ত। হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়াল।

মুকুন্দর গায়ে সাদা কামিজ, তার উপরে ছিটের হাত-কাটা ফতুয়া। বৈশাখের দিনেও সকলকে একটা-কিছু গায়ে রাখতে হয়েছে চৌধুরি-কর্তার সামনে নিতান্ত খালি গায়ে থাকা চলে না বলেই। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে বোঝা নামাবে, সেই চিন্তা। আর মুকুন্দ মাস্টার দেখ ডবল চাপান দিয়ে এসেছে। ফতুয়ার সবগুলো বোতাম আঁটা। গোড়ায় এই নিয়ে ঠাট্টাতামাসা হয়েছিল একটু। এখন চোখ ঠারছে: বেশি জামা পরে কি এমনি? পরেছে পকেটের দরকারে। ঠাঁইয়ের অভাবে বমাল ফেলে না যেতে হয়।

চৌধুরি-কর্তা বললেন, জামা খুলে ফেল।

মুকুন্দ দুটো হাত ফতুয়ার উপর চেপে ধরে। বোতাম খুলতে দেবে না। কিছুতে না। এর পরে তিল পরিমাণ সংশয় থাকে না। চোরাই ঘড়ি রেখেছে ফতুয়ার নিচে কামিজের বুক-পকেটের ভিতর।

নিজে খুলছে না তো দুই বরকন্দাজকে হুকুম দিলেন চৌধুরি-কর্তা। মাস্টারি করে, ছেলেপুলে মানুষ করার ব্রত নিয়েছে, মুখে ধর্মের খই ফোটে। দয়ামায়া নেই এই সব ভণ্ডের উপর।

এতগুলি লোকের মধ্যে সাহেবই কেবল ছটফট করছে: কী আশ্চর্য, ছোড়দাকে এরা চোর বানাল! কিছুই জানেন না উনি, কিছু করেননি—

চৌধুরি-কর্তা চোখ পাকিয়ে পড়তে থতমত খেয়ে সাহেব থেমে যায়।

ভীম সর্দার মুকুন্দর হাত দুটো পিছনে নিয়ে সজোরে এঁটে ধরে আছে, মহাদেব পটপট করে ফতুয়ার বোতাম খুলছে। এর পরেই হাত ঢুকিয়ে দেবে সার্টের বুকপকেটে—

হরি, হরি! পকেট নেই যে। পকেট সুদ্ধ খাবলাখানেক কিসে যেন ছিঁড়ে খেয়েছে। জীর্ণ শতছিন্ন কামিজ—উপরে ফতুয়া চাপা থাকায় বোঝা যায় না। ডবল জামা পরার রহস্যটা মালুম হল এবার। শুধু ফতুয়া গায়ে ভদ্রসমাজে বিচরণ চলে না, আবার কামিজের মধ্যভাগ দেখতে দেওয়াও হাস্যকর। গ্রীষ্মের কষ্ট তুচ্ছ করে মানের দায়ে এই ডবল বোঝা চাপানো।

আর ঠিক এমনি সময়ে বিস্মিত মুরারি বলে, ঘড়িটা দেখছি আমারই পকেটে। কেমন করে এলো ?

উড়তে উড়তে ঢুকে পড়েছে। বুড়ো চৌধুরি খিঁচিয়ে উঠলেন : মনের ভুলে নিজে পকেটে পুরে সবসুদ্ধ নাজেহাল করলে। ধার্মিক শিক্ষিত মানুষটাকে ডেকে নিয়ে এসে অপমানের একশেষ করলাম। এমন সুন্দর পাঠ একেবারে মাটি। খাওয়ারও দেরি হল—খাবোই না আজ আমি। উপোস করে অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হোক।

মুরারি বেকুব হয়ে গিয়ে খাজাঞ্চীকে বলে, ঘড়ি কেমন করে পকেটে আসে বুঝতে পারছিনে! নিজে আমি কখনো তুলিনি, অত ভুলো মন নয় আমার।

অবমানিত মুকুন্দর দু-চোখে টপটপ জল পড়ছে। ফতুয়া হাতে তুলে সাহেব বলে, পরে নাও ছোড়দা। সে-ই পরিয়ে বোতাম সমস্ত এঁটে দিল।

খাজাঞ্চী বলে, অমনধারা কেন করলে মাষ্টার ? ছুটে পালালে, জামা খুলতে দেবে না কিছুতে—তাতেই তো সন্দেহ দাঁড়াল।

মুকুন্দর চোখের জল, সাহেবের জামা পরানো—চৌধুরি-কর্তা এতক্ষণ নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছিলেন। জবাবটা তিনিই দিলেন : এ ছাড়া আর কি করবে ? পালানো সামান্য কথা—ছুটে গিয়ে কাছারির পুকুরে ঝাঁপ দিতেও পারত। যাক প্রাণ রোক মান। মানই তো আমাদের জামাকাপড়ে—তার বড় কি আছে ? তুমি আমি চোর আমরা সকলেই, কাপড়চোপড় আর ভালো ভালো বুকনির বাহারে রেহাই পেয়ে যাই।

সকলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সাহেব এসে মুকুন্দর হাত ধরল : চলো ছোড়দা—

খাজাঞ্চী বলে ওঠে, পাঠ তো শেষ হয়নি।

চৌধুরী-কর্তা এবারও জবাব দেন : গলা দিয়ে বেরুবে না এখন পাঠ। গলাটা মানুষের কিনা, গ্রামোফোন-রেকর্ড হলে কথা ছিল না।

কিন্তু লক্ষণ যে মরা অবস্থায় পড়ে রইলেন—

বেঁচে ওঠা ঠাকুরের অদৃষ্টে নেই। আমরাই বাঁচতে দিলাম না। ভারী গলায় চৌধুরি বলতে লাগলেন, ধিক্কার দিচ্ছি আমি নিজেকে। শঠ-তস্কর দেখে দেখে এমন হয়েছে, মানুষ বিশ্বাস করতে পারিনে। চোত-বোশেখে বছর বছর সোনাখালির মহালে আসি। কতকাল ধরে আসছি। মুকুন্দর জীবনের কোন খবর জানতে আমার বাকি নেই। আসল সময়ে তবু তাকে চোর ভেবে বসলাম।

মুকুন্দর দিকে চেয়ে বললেন, পাঠ শেষ হতে রাত্রি হবে—শুধু-মুখে যেতে দেবো না বলে ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু কোন্ মুখে তোমায় খেতে বলি! খাবেই বা কেন? চলে যাও তুমি বাবা, আর আটকাব না।

মুকুন্দ আর সাহেব বেরিয়ে পড়ে। সাহেব বলে, দোষটা আমারই ছোড়-দা, আমার দোষে, তোমার হেনস্থা। খেলা করতে গিয়েছিলাম একটু। বড়দা একদিন বউঠানকে ট্যাঙস-ট্যাঙস করে শোনাল আমারই কারণে। সেই রাগ পোষা ছিল। ঘড়িটা তুলে মুঠোয় রেখেছিলাম, কায়দা বুঝে তারপর বড়দার পকেটে ফেললাম। অপদস্থ হবে সকলের সামনে। ভেবেছি চৌধুরির ঘড়ি, সামনের উপর জল-চৌকিতে তিনি রেখেছেন। আন্দাজ আমার মিছেও নয়। কিন্তু সে ঘড়ি বড়দাকে বখশিস দিয়েছেন, কেমন করে বুঝব।

নিশ্বাস ফেলে মুকুন্দ বলে, রক্ত কথা বলে, দেখলে তো সাহেব? চোরের বাড়ি বলে পৈতৃক ঘরবাড়ি ছেড়ে ভাগনে বংশীর কাছে উঠলাম, সেখানেও কানাঘুষো। সব ছেড়ে ইস্কুলের শিক্ষক হয়ে আছি, যার চেয়ে ভাল কাজ হয় না। লোকের কিন্তু তবু ভাবতে আটকায় না।

সাহেব তিক্ত কণ্ঠে বলে, ভাববেই তো। নতুন অভিধানে কথার সব মানে পালটে গেছে—বলাধিকারী বলেন। শিক্ষক মানেই গরিব লোক। এ বাজারে গরিব হওয়া মানে মানুষটা এমন অপদার্থ, চোর হবারও ক্ষমতা নেই। চোর ভেবে তো সম্মানই করল তোমায়। তার উপরে সাধু নাম একটা আছে তোমার। সাধু মানেই ভণ্ড।

বর্ধন-বাড়ির উঠান অবধি সাহেব সঙ্গে এলো। মুকুন্দ বাড়ির ভিতর চলে যায়। পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তে সাহেব বাসায় ফিরছে। পচা বাইটার ঘরে আজ আর ঢোকা হল না। সিঁধকাঠি সেই ঝোপের ভিতর পড়ে আছে, মুকুন্দর সামনে তুলে আনতে পারে নি। দাম দিয়ে কাঠি আনা হয়েছে এইমাত্র, সে কাঠি গুরু পচা বাইটা হাতে তুলে দেবে, আর ষড়ানন ও মা-কালীর দোহাই পেড়ে সাগরেদের বিজয়-কামনা করবে। আজকে আর হল না—নিয়মরীতি কাল এসে সারবে। আসা-যাওয়ার অসুবিধা নেই এখন, দিনে রাত্রে যখন খুশি আসে। বিদায় নেবার আগে যত-কিছু জানবার যত-কিছু শোনবার জেনে-শুনে যাচ্ছে। সুভদ্রা-বউ আর ওত পেতে থাকে না, নিজের সুখ নিয়ে মজে আছে।

ঠিক দুপুরে বাতাসে যেন আগুনের হল্কা বয়ে যাচ্ছে। বাইটা-বাড়ি নিঝুম। যে যার ঘরে দরজা এঁটে পড়েছে। খাওয়ার পরে পচা বাইটাও একটু

তক্তাপোশে গড়িয়ে পড়েছিল। ঘুম আসে না, তক্ষুনি আবার উঠল। তামাক সেজে নিয়ে চৌকির উপর বেড়া ঠেসান নিয়ে মেজের পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসে পড়েছে। কি মনে হল, একটা পা চৌকির তলায় ঢুকিয়ে দেয় খানিকটা। আলগা মাটি পায়ে ঠেকে, কী ব্যাপার! এবারে হাত ঢুকিয়ে দিল। ইঁদুরে মাটি তুলে ভাঁই করেছে—

হুঁকো ছুঁড়ে ফেলে পাগলের মতো মাটির মেজেয় বসে পড়ে এক ধাক্কায় চৌকিটা সরিয়ে দেয়। যা ভেবেছে—ইঁদুর নয়, চোর। চোর এসে সর্বনাশ করে গেছে। সুভদ্রার হাতের চুড় কৌটোসুদ্ধ এইখানে মাটির তলে পুঁতেছিল। খালি কৌটো গড়াচ্ছে একপাশে।

স্তম্ভিত হয়ে থাকে, নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। হায় রে বাইটা, এত ভোগান্তি ছিল তোমার কপালে! অন্তিম বয়সে অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে পড়ে বিস্তর রকমে নাজেহাল হচ্ছে। কিন্তু এই লাঞ্ছনার সঙ্গে কোনকিছুর তুলনা হয় না।

বাকি দিনটুকু সেই এক জায়গায় একভাবে পচা বসে। মাথায় হাত দিয়ে আছে বসে একা একা। এমন বেঁচে থাকার কি লাভ? যমরাজের উদ্দেশ্যে কেবলই বলছে, পোড়া ঠাকুর, এদিক পানে চোখ তুলে তোমার মহিষটা দাও ছুটিয়ে, উদ্ধার নিয়ে যাও।

কাল দুপুরে সাহেব এসেছিল, অনেকক্ষণ থেকে তারপর কাঠি আনতে চলে গেল। কাঠি নিয়ে রাত্রিবেলা আসবার কথা। দেখা নেই সেই থেকে। পায়নি নাকি কাঠি? এমন হবার কথা নয়। আকাশে চন্দ্র-সূর্যের কাজের গাফিলতি হতে পারে, যুধিষ্ঠির ঢোকরার হবে না। এই নিয়েও খানিকটা চিন্তা। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, রোজগারের ক্ষমতা পড়ে গিয়ে তারা সব পর হয়ে পড়েছে। সাহেবই এখন আপন মানুষ—দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র আপন। প্রতিক্ষণ সাহেবকে ভাবছে। সাহেবের কাছে না বলা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। না আসে তো নিজেই তার খোঁজে বেরুবে।

দিনের আলো থাকতে পথ হাঁটতে পারে না। বয়সকালে তবু কিছু পারত, বুড়ো হয়ে এখন একেবারেই না। দিনমানের কড়া রোদে চোখ ঝলসে দেয়, মাটির পথ জলা জায়গা বলে ঠেকে। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি খুলে যায়—বাদুড়-পেঁচা-চামচিকের যে দস্তুর।

সন্ধ্যা গড়িয়ে পড়ল। কষ্ট হচ্ছে বিষম। কী আশ্চর্য, পা-দুটো জড়িয়ে আসে। অপমানের আঘাতে একটা দিনের মধ্যেই আধাআধি মৃত্যু হয়েছে যেন। বেড়া থেকে একটা বাঁশির খোঁটা খুলে নিয়ে লাঠির মতন ভর দিয়ে

চলে। বুড়ো বাইটা লাঠি ঠুক-ঠুক করে যাচ্ছে—হায় রে হায়, উড়ন-তুবড়ির মতো যে মানুষ একদিন জলে-ডাঙায় ঝিলিক দিয়ে বেড়িয়েছে।

খানিকটা দূর গিয়ে বড্ড হাঁপ ধরে গেছে। পথের ধারে দূর্বাবন পেয়ে গড়িয়ে পড়ল তার উপরে। কে মানুষটা আসে? যার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে সে-ই। সাহেব। সাহেব, তুই এসে গেছিস বাবা? মা-কালীকে ডাকছি, তোকে তিনি এই পথে খেদিয়ে নিয়ে এলেন। আমায় বেশি কষ্ট করতে হল না।

সাহেব বসে পড়ে বাইটার মাথা কোলের উপর তুলে নিল।

তোরই খোঁজে যাচ্ছিলাম রে সাহেব। আজকে আমার বুক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

সাহেব কিছু মুচকি হেসে বলে, কেন ওস্তাদ?

আমি আর বেঁচে নেই এখন, মরে গেছি। নিশ্চয় মরেছি। বুকে একটা ধুকপুকানি থাকলেই বেঁচে থাকা হয় না রে। বাইটা জ্যান্ত থাকলে নজরের সুমুখ দিয়ে কখনো জিনিস পাচার হতে পারত না।

দম নিয়ে পচা আবার বলতে লাগল, মেজের মাটি খুঁড়ে ছোটবউমার সেই গয়না নিয়ে গেছে, তুই যা আমায় গুরুদক্ষিণা দিয়ে এলি। রাতে আমি ঘুমুইনে, কাজ না থাকলেও ঘুম আসে না। খানিক খানিক চোখ বুজে ঝিম হয়ে থাকি, কিন্তু কুটোগাছটি নড়লে টের পেয়ে যাই। চিরকালের গরব আজ ভেঙে গেল সাহেব।

কেঁদে ফেলবে যেন বুড়ো, গলার স্বর তেমনি। সাহেব বলে, কাজ রাত্রি-বেলা হয়নি ওস্তাদ। তা হলে কানে পড়ে যেত। দিনমানের কাজ—

পচা বাইটা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে পড়ে: বলিস কি রে?

সাহেব এক সুরে বলে যাচ্ছে, চৌকির উপর বসে বেড়া ঠেসান দিয়ে তামাক খান, সেই সময়টা কাজ হয়েছে। এক দিনে নয়, সাত-আট দিন ধরে।

তুই কি করে জানলি? তবে কি—

সগর্বে বুকে থাবা মেরে সাহেব বলে, আপনার মতন গুরু যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার অসাধ্য কি আছে? এটা কেন বোঝেন না, ও-রকম মিহি কাজ এক আপনি নিজে পারেন, আর যদি কেউ পারে সে আপনার সাগরেদ। সৃষ্টিসংসারে এর বাইরে অন্য কেউ পারবে না। একটু একটু করে খোঁড়া হয়েছে সাত-আট দিন ধরে। কাল বিকালে সারা হল। মাল কাপড়ের নিচে নিয়ে চোখের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, ঘুণাক্ষরে আপনি টের পেলেন না ওস্তাদ।

সে মাল একটা দিন ও একটা রাত্রি সাহেব নিজের হেপাজতে রেখেছে।

এমন যে পচা বাইটা, তার মনেও সন্দেহের বাষ্পটুকু আসে নি। এমনধারা পরিপাটি নিখুঁত কাজ—সেকালের কথা জানিনে, একালের ক'টা কারিগর করতে পারে? বাহাদুরি যেটা দেখাবার, হয়ে গেল। গয়না সাহেব আবার পচার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। পথের উপর এই দেখা। আর নিয়েছে যুধিষ্ঠিরের গড়া নতুন সিঁধকাঠি। পাঠ নেওয়ার কাজ ষোলআনা সারা, বাইটা মশায় এবারে নিজ হাতে কাঠি তুলে দেবেন। শিরে গুরুর আশীর্বাদ আর হাতে গুরুদত্ত সিঁধকাঠি নিয়ে এদেশ সেদেশ চরে বেড়ানো এবার থেকে।

সাহেব বলে, কাঁচা মাটি দেখে ধরলাম, মেজের তলে মাল রয়েছে। ডিম সরানোর কথা হচ্ছিল—ভাবলাম, এ কাজটা বা খাটো কিসে তার চেয়ে? লেগে পড়লাম আপনারই দোহাই পেড়ে। চৌকির উপর বসে আপনি তামাক খান আর গল্প করেন, পায়ের কাছে বসে বসে শুনি আমি। সেই সময় এক হাতে পদসেবা করছি, আর এক হাতে চৌকির নিচে টিপিটিপি খুঁড়ে যাচ্ছি ছুরি দিয়ে। মাটি খুঁড়ি, চলে যাবার সময় আলগা মাটি গর্তে ফেলে ভরাট করে যাই। কাল বিকালে কাজ শেষ, কৌটো পেয়ে গেলাম। তার পরে আর ভরাট করিনি, মাটি ছড়িয়ে রেখে গেলাম যাতে নজরে আসে। নয়তো কত দিনে টের পেতেন, ঠিক কি!

পরাজয়ের দুঃখ ভুলে পচা মুগ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, আমারই আসনের নিচে কাজ, আমি তার ভাঁজটুকু জানলাম না। মরি মরি, হাত হয়েছে বটে একখানা! হাত না পাখির পালক!

সাহেব বলে, খুশি করতে পেরেছি তবে? পাখির বুকের তলা থেকে ডিম আনার সামিল হল কিনা বলুন এবারে ওস্তাদ।

পচা উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে, তার অনেক বেশি। আমার কান অনেক খর পাখির চেয়ে।

চুড়জোড়া কাহেব গাঁজিয়ার মধ্যে ভরে কোমরে বেঁধে এনেছে। পচার হাতটা কাপড়ের উপর দিয়ে সেই জায়গায় ঘুরিয়ে দিল। বলে, পায়ে বাঁধা কাঠিও আছে। বাড়ি চলুন, ঘরে গিয়ে এসব বের করব।

যেতে যেতে পচা বলে, গয়না তোরই এখন, আমার কোন দাবি নেই। দক্ষিণা পেয়ে গেছি। রাখতে যদি না পেরে থাকি, সে দোষ আমার। নিজের ক্ষমতায় জিনে নিয়েছিস। বিক্রি কর, দানসত্র করে দে, গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেল—যা খুশি করতে পারিস। বলবার কিছু নেই।

চপল কণ্ঠে আবার বলে, জিনিসটা ভাল রে: আমি বলি, বিয়ে করে বউয়ের হাতে পরিয়ে দিস। রেখে দে যত্ন করে।

পচা বাইটার পিছনে সাহেব নিঃশব্দে ভাবতে ভাবতে চলেছে। উঠানে পা দিয়ে সুভদ্রা-বউকে দেখতে পাওয়া যায়। কোঠাঘরের বারান্দার উপর এদিক পানে তাকিয়ে আছে। হাতছানি দিল সাহেবকে।

সে সুভদ্রা নয় আর এখন। নির্ভয়ে চলে যাওয়া যায়। আরও কোন কোন রাত্রে মানকচু-বনে দাঁড়িয়ে সাহেব শুনে এসেছে—স্বামীর সোহাগিনী বউ। সাহেবের সঙ্গে—এবং অনুমান করা যায়, বাড়ির সকলের সঙ্গেই মিষ্টি মধুর সম্পর্ক তার।

সুভদ্রা ডাক দিল, একটা কথা শুনে যেও ঠাকুরপো।

সাহেবও উত্তর দেয়ঃ যাচ্ছি বউঠান।

পচার ঘরে ঢুকে পায়ে-বাঁধা সিঁধকাঠি খুলে রাখল। চুড় বের করল কোমরের গাঁজিয়া থেকে। বলে, দানসত্র করবার হুকুমও দিয়েছেন ওস্তাদ, আমি তাই করব। যার গয়না তাকেই দিয়ে আসি। আদর করে আপনিই তো একদিন হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সত্যি সত্যি কক্ষনো ফেরত চান নি, জেদ বজায় রাখা নিয়ে কথা। সেটা হয়ে গেছে। সর্বদা চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারে নি। বউঠান জানে, কাজ আপনারই। বড় মিথ্যাও নয়, আপনার কাজটা আমার হাত দিয়ে করালেন। করিয়ে নিয়ে মান বাড়ালেন আমার।

বলতে বলতে সাহেব মলিন মুখে নিশ্বাস ফেলেঃ গয়নাখানার জন্যে বউঠান কান্নাকাটি করলেন, মনটা সেই থেকে কেমন হয়ে আছে। কেমন করে কদ্দিনে আমি যে এই মনের দফা নিকেশ করব! করবই। সোনাখালি আজকে আমার শেষ দিন। এ দিনটায় কারো মনে দুঃখ রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না! কি হুকুম আপনার ওস্তাদ?

ওস্তাদের সায় নিয়ে সাহেব সুভদ্রা-বউয়ের কাছে গেল। বারাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়েছে।

সুভদ্রা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, কাছারিবাড়ি গেছে তোমার ছোড়দা। চৌধুরি-কর্তা সকাল থেকে ডাকাডাকি করছে, দু-দুবার বরকন্দাজ এসে গেছে। আমি মানা করলামঃ কক্ষনো না, অমন হেনস্থা যেখানে থুতু ফেলতেও তাদের কাছে যাবে না। দুপুরে বট্‌ঠাকুর খেতে এসে বললেন, না গেলে বুড়োমানুষটা বলে দিয়েছে নিজে সে চলে আসবে। এর পরেও গোঁ ধরে থাকলে মনিব চটে যাবে, অন্তত বড়ভাইয়ের মুখ চেয়েও যেতে হবে একটিবার। কি করব ঠাকুরপো— বলে দিলাম, রোদ পড়লে সন্ধ্যার পর যাবে। দেখা দিয়েই চলে আসবে।

অনেকক্ষণ গেছে, এখনো ফেরে না। কখানা লুচি ভেজেছিলাম, ঠাণ্ডা হয়ে ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেল।

সাহেব দুষ্টামি করে বলে, সেই একদিন নামাবলী মুছবার কথা হয়েছিল, মনে পড়ে বউঠান?

সুভদ্রা আকাশ থেকে পড়ে: ওমা, কবে? কিসের নামাবলী ভাই?

সাহেব মুখ টিপে হেসে বলে, রাধা-কৃষ্ণ রাম-সীতা হর-গৌরী—জোড়ায় জোড়ায় যত দেবদেবী আছেন। বুক জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল, ছোড়-দা এসে সব মুছে দেবেন—ভুলে গেলেন সমস্ত কথা?

সুভদ্রা শিউরে উঠে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে, ভুলেও ওসব উচ্চারণ করবে না, পাপ হয়। বেশ তো আছেন দেবদেবীরা, আমার বুকখানা জুড়ে আছেন। তোমার ছোড়দা'কে বলব—তার নামটাও লিখে দেবে ঐ সব নামের নিচে।

যে জন্যে সাহেব এসেছে—হাসিমুখে চুড়জোড়া বের করে ধরল: গয়না নিয়ে নিন বউঠান। কথা দিয়েছিলাম—দেখুন, উদ্ধার করে আনলাম। নিন, পরে ফেলুন। ছোড়দা এলে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন।

বারাণ্ডার প্রান্তে রেখে দিয়েছে। তুলে নিতে আসছিল সুভদ্রা, এমনি সময় কাছারি-বাড়ির ফেরত মুকুন্দ উঠানে ঢুকল। ছেলেমানুষের মতো সুভদ্রা একছুটে তার কাছে চলে যায়: অত ডাকাডাকি কেন গো?

মুকুন্দ বলে, ইস্কুলেব কাজ ছাড়িয়ে চৌধুরিকর্তা আমায় নিয়ে যেতে চান। হাত ধরে অনেক করে বললেন। জাপান থেকে শিখে এসে ওঁর ছেলে চিরুনির ফ্যাক্টরি করেছে—ডাইনে-বাঁয়ে চুরি হচ্ছে, সামলাতে পারলে না। ছেলে কাজ বোঝে, কারবার একেবারে বোঝে না। ম্যানেজার করে আমার উপর ঐ দিকটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন।

সুভদ্রা হেসে বসে, তুমিই যেন কত বোঝ! চিরটা কাল মাস্টারি করছ—

চৌধুরিকর্তা চাচ্ছেন তাই। যারা রয়েছে তারা সব ঝানু লোক, বড্ড বেশী রকম বোঝে। কম বোঝে এমনি সৎমানুষ চান তিনি। আমার পাঠ শুনে খেতে গিয়েছেন। ম্যানেজারের কোয়ার্টার ওঁদের বাড়ির কাছাকাছি হাত ধরে বললেন, যে ক'দিন বাঁচি, সন্ধ্যাবেলাটা একটু একটু ভগবৎকথা শুনতে পাবে, সে-ই আমার বড় লাভের ব্যাপার। বুড়োমানুষ নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছেন।

সাহেব উল্লসিত হয়ে বলে, কারখানার ম্যানেজার আমাদের ছোড়দা, শহরের উপর বাসা! বউঠানের কত সাধ, বাসা করে দুজনে থাকবেন।

মুকুন্দ বলে, সেইটে জানি বলেই নিমরাজি হয়ে এলাম। দেখা যাক ভাল করে ভেবেচিন্তে যুক্তিপরামর্শ করে—

কিন্তু যে লোকের সাধ মেটাবার জন্য ভাবনাচিন্তা, নিতান্ত উদাসীন ভাব তার যেন, এত কথার একটিও বুঝি কানে গেল না। ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সুভদ্রা: গিয়েছে সেই কখন। সেখানে এতক্ষণ বকবক করে এলো বাড়ি এসেও তাই। হাত-পা ধুয়ে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলে এসো। খাবার দিচ্ছি।

তাড়া খেয়ে মুকুন্দ জলের বালতির দিকে যায়। খাবার দিতে সুভদ্রা রান্নাঘর ছুটল। সাহেব পিছনে ডাক দেয়: গয়না পড়ে রইল বউঠান। তুলে রেখে দিন।

ও, হ্যাঁ—

মনে পড়ে গেল সুভদ্রার, কয়েক পা ফিরে এসে চুড়জোড়া বাঁ-হাতে তুলে নিল। এত দামের গয়নাখানা—কোঠাঘরে যে সামাল করে রেখে আসবে তা নয়, দুটো আঙুলে ঝুলিয়ে অমনি রান্নাঘরে চলল। কত কষ্ট করে কত রকম কলকৌশল খাটিয়ে জিনিসটা উদ্ধার করে আনা—অকৃতজ্ঞ বউ তার জন্য সাহেবকে একটা মুখের কথা বলল না। মুখের দিকে তাকালই না একবার ভাল করে। বরকে খেতে দিতে হবে, বড় ব্যস্ত এখন।

ক্রোধ হওয়া উচিত, উল্টে হাসির আলোয় সাহেবের মুখ চিকচিক করে। ওস্তাদের হাত থেকে আজকেই সিঁধকাঠি পেয়েছে—কাঠি ধরে ঘরে ঘরে সে নাকি মন্দ করে বেড়াবে। তোমায় দিয়ে তা হবে না সাহেব। কাজ করতে পারা যায়। কিন্তু মন্দ করা বড্ড শক্ত।

ঠিক এই রাত্রে অনেক দূরে কালীঘাটের ফণী আড্ডির বস্তিতে হুলস্থুল কাণ্ড। রাণী গলায়-দড়ি দিয়েছে—পারুলের বড় আদরের মেয়ে রাণী। মাটকোঠার প্রান্তে যেখানটা পারুলের ঘর ছিল, সেখানে এখন দোতলা পাকা-দালান উঠেছে রাণীর জন্য। উপরের এক কুঠুরি, নিচে এক কুঠুরি এবং সিঁড়ি। উপরের ঘর রাণীর, নিচের ঘরে মা পারুল থাকে। রাণীর এখন গা-ভরা গয়না—ছেলেবয়সের মতন ঝুটো গয়না নয়, আসল গিনিসোনার জিনিস। এত সুখ নিয়ে হতচ্ছাড়ি মেয়ে আত্মহত্যা করতে গেল।

ছাতের কড়িকাঠ অবধি নাগাল পায় না, খাটের উপরে তাই টুল বসিয়েছে। শাড়ির এক প্রান্ত কড়িকাঠে বেঁধে অন্য প্রান্ত গেরো দিয়েছে নিজের গলায়। পায়ের ধাক্কায় টুল উল্টে দিয়ে তারপর ঝুল খেয়ে পড়ল। কাজের যেমন দস্তুর। খবরাখবর নিয়েছে—সরকার বাহাদুর ফাঁসিতে লটকান, সে পদ্ধতিও মোটামুটি এই।

কাজের কিন্তু খুঁত থেকে গিয়েছিল। টুলের উপর দাঁড়িয়ে ঠিক মতো হাত পৌঁছয়নি, কড়িকাঠের বাঁধন আলগা রয়ে গেল। রাণী বুঝতে পারেনি সেটা। যেই মাত্র ঝুল খেয়ে পড়া, বাঁধন খুলে ধপ করে সে মেজেয় পড়ে গেল। গলায় ফাঁস এঁটে গিয়ে গোঙানি। বিষম গুমট আজকে, হাওয়ার লেশমাত্র নেই। পারুল ঘরে শুতে পারেনি, সিঁড়ির ধারে রোয়াকের উপর মাদুর বিছিয়ে পড়েছিল। ঘরে না শুয়ে ভাগ্যিস ছিল আজ বাইরে! সশব্দে টুল এবং মানুষ পড়ে যাওয়া, পর মুহূর্তে দম-আটকানো গলায় বীভৎস ঘড়ঘড়ানি—ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করে পারুল উপরে ছুটল। জানালা খোলা। জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে পড়েছে ঘরের মধ্যে, সে আলোয় সঠিক কিছু ঠাহর হচ্ছে না। জানালার গরাদের উপর পারুল মাথাভাঙাভাঙি করছে: রাণী, ওরে রাণী, কি হয়েছে? জবাব দে মা, দোর খোল—

সব ঘরের সকল মানুষ এসে পড়ল। দমাদম লাথি দরজার উপর। খিল ভেঙে পাল্লা খুলে পড়ে। এই আর এক ভুল রাণীর। মরবার তাড়ায় শুধুমাত্র খিল এঁটেছে, হুড়কো দিতে মনে নেই। তা হলে এত সহজে হত না।

আলো কোথা? আলো নিয়ে এসো শিগগির! গলার ফাঁস খোল। খোলা যাচ্ছে না তে কেটে ফেল কাপড়ের ওখানটা—

স্পষ্টাস্পষ্টি কলহ নয় বটে—কথা-কাটাকাটি, মুখ আঁধার করে বেড়ানো, চোখের জল ফেলা ইদানীং লেগেই আছে মা ও মেয়ের মধ্যে। কিন্তু এত বড় কাণ্ড করে বসবে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি পারুল। ভারি চাপা মেয়ে—ভাবে যতখানি, বলে তার অতি সামান্য। গণ্ডগোলটা শুরু হয়েছে ফণী আড্ডি মরে গিয়ে মলয়কুমার আঢ্য মাটকোঠার যখন নতুন মালিক হল। সাহেবদের দলের সেই ঝিঙে ছোঁড়াটা মলয়কুমার এখন।

ফণী আড্ডির তিন ছেলে—ঝিঙে সকলের ছোট। প্রথম পক্ষ গত হবার পর ফণী দ্বিতীয় সংসার করেছিল, সে বউয়ের ছেলেপুলে হয়নি। ফণী যতদিন বেঁচে ছিল, বউছেলেরা সামনে আড়ালে শতেক কুচ্ছো করেছে—হাড়কঞ্জুষ মানুষ, নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়, এমনি কত। মরে যাবার পর এখন গদগদ অবস্থা—এমন বিচক্ষণ মানুষ হয় না। এবং চরম আত্মত্যাগী—পুরো মাপের কাপড় পরেনি জীবনে, আটহাতি ধুতি হাঁটুর উপর তুলে ঘুরে বেড়াত, শীত—গ্রীষ্মে একটিমাত্র গলাবন্ধ স্থতি-কোট। না খেলে প্রাণরক্ষা হয় না—ঈশ্বরের এই বিদঘুটে নিয়মের জন্য যেটুকু নইলে নয় তাই খেয়েছে, বউ-ছেলেদের খাইয়েছে। বয়স হয়ে অনেকের ধর্মে মতি যায়, দানধ্যানে পয়সা নষ্ট করে। ফণী আড্ডি মরে চিতার ছাই হল, কালীঘাটের পীঠস্থানে থাকা সত্ত্বেও মানুষটার

কাছে ধর্ম ঘেঁষতে পারেনি। ফলে হিসাবপত্র করে দেখা গেল, সম্পত্তিও নগদ টাকাকড়ির পাহাড় জমিয়ে গেছে বউ-ছেলেপুলের জন্য।

দ্বিতীয় পক্ষের বউ বোধকরি পুরুত-ঠাকুরের প্ররোচনায় প্রস্তাব করলেন: এত যখন রেখে গেছেন, শ্রাদ্ধটা ঘটা করে হোক। ব্রাহ্মণপণ্ডিত আত্মীয়স্বজন ছাড়াও কালীঘাটের কাঙালি ডেকে লুচি-হালুয়া খাইয়ে দেবো।

বড়ছেলে শিউরে আপত্তি করে ওঠে: ক্ষেপেছ মা—

মৃতে ভুরিভোজনের নিয়ম, ঠাকুরমশায় বললেন। আত্মা তৃপ্তি পায়।

তেমন ছেঁদো আত্মা আমার বাবার নয়। খাওয়ানো দেখলে উল্টে ছটফট করবেন স্বর্গধাম থেকে। চাই কি, ভূত হয়ে নেমে এসে ঘাড় মটকে শোধ নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রাদ্ধ অতএব নমো-নমো করে সারা হল। আলিপুরের এক মোক্তার ফণীর ভগ্নিপতি। এক জায়গায় সকলকে ডেকে মোক্তারমশায় বললেন, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই—আজ না হোক, কাল তো হবেই। আমি বলি, নিজেদের মধ্যে আপোষে ভাগবাঁটোয়ারা করে নাও। আপোষে না করলে পরিণামে লাঠালাঠি, মামলা-মোকদ্দমা—আদালতের আমরাই ভাগাভাগি করে নেবো, তোমাদের ভাগ্যে মুলোর ডাঁটা।

তিনিই মধ্যবর্তী হয়ে বাঁটোয়ারা করতে বসলেন। নগদ টাকার ব্যাপারে হাঙ্গামা নেই, সকলের সমান। সম্পত্তির সাড়ে-তিন ভাগ—তিন ভাগ তিন ছেলের, আধা ভাগটা বিধবার। নিয়ম হল, ছোটজন সকলের আগে পছন্দ করবে। মোক্তার বলেন, কোন্ ভাগটা নিবি রে ঝিঙে, ভেবেচিন্তে দেখ।

ঝিঙে গরম হয়ে বলে, বড় হয়েছি পিশেমশায়, ঝিঙে-ঝিঙে করবেন না। মলয়কুমার—

মোক্তার একগাল হেসে বলেন, বড় বুঝি এক্ষুনি হলি! কালও তো কতবার ঝিঙে বলে ডেকেছি।

বড়ভাই বলে, অতগুলো টাকা নগদ নগদ হাতে এসে গেল, বড় হতে তারপরে কি আর দেরি হয়? কিন্তু তোর পোশাকি নাম তো ষষ্ঠীকুমার, সাত জন্ম ধরে ভাবলেও বাবার মাথায় মলয়কুমার আসত না—

মেজভাই টিপ্পনী কাটে: নতুন সাবালক হয়ে মিষ্টি নাম নিল আর কি পছন্দ করে—

বড়ভাই বলে, তাই বুঝি? মলয়কুমার তবে নিতে গেলি কেন রে, ওর চেয়ে আরও মিষ্টি তো কত আছে! মিছরিকুমার, কিম্বা রসগোল্লাকুমার—

মোটের উপর ঝিঙে বলা চলবে না আর এখন বাবু মলয়কুমার আঢ্য।

টালিগঞ্জের একটা একতলা বাড়ি এবং আদিগঙ্গার তীরবর্তী মাটকোঠার মালিক সে এখন। মালিক হয়ে বস্তিতে আসা-যাওয়া বেড়ে গেছে খুব। আগে আসত ময়লা কাপড়ে খালি পায়ে, এখন সিল্কের চাদর উড়িয়ে জুতো মসমস করে। সেন্টের গন্ধে বাতাস ভরে যায়। পারুল হঠাৎ মা হয়ে গেছে তার—ভক্তিমান পুত্র যখন-তখন মা-মা করে পারুলের ঘরে ঢুকে পড়ে। ফিসিরফিসির গুজুরগুজুর দুজনে। ভবিষ্যতের নানা মতলব—মাটকোঠা ভেঙে পাকাকোঠা হবে এখানে—আজেবাজে ঘুণে-খাওয়া ভাড়াটে গুলোকে দূর করে তাড়াবে।

একদিন বলল, তোমার ঘর আর পাশের ঐ জায়গাটুকু রানীর নামে লিখে দেব ভাবছি। ওকে রাজি করাও মা, আমি বলতে গেলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে।

পারুল এতটুকু হয়ে বলে, আপন ভাল পাগলেও বোঝে। ঐ রকম একগুঁয়ে বাবা, ওর কথায় কিছু মনে কোরো না—

বড়ঘরের পাশে জিনিসপত্রে ঠাসা ছোট্ট ঘরটা দেখিয়ে পারুল আবার বলে, বড় হয়ে গেছে তো এখন, ঐ পায়রাখোপের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে থাকতে মনমেজাজ আরও বিগড়ে যায়। সকলের দেখছে কত সাজানোগোছান ঘর—

এই জন্যে? মলয়কুমার দরাজ হয়ে বলে, সোজাসুজি বলতেই তো পারে। মন গুমরে থাকে কেন?

অতএব গোটা বস্তি ভেঙে দিয়ে দালান-কোঠা যেদিন হয় হবে, রাণীর পাকাঘর এখনই চাই। বিবেচক পিতৃদেব নগদ টাকা রেখে গেছেন—হতে অসুবিধাও নেই। মাটির উপরেই বা থাকবে কেন রানী, তার ঘর দোতলায়। নিচের তলায় পারুল, পাশ দিয়ে সিঁড়ি। রানী এখন সকলের চেয়ে উঁচুতে। ঘরের জানলা দিয়ে মায়ের মন্দির, আদিগঙ্গার পুল দেখা যায়। কত সুখ রানীর!

সেই সুখের ঘরে ক'টা দিন বসবাস করে রানী মরতে গেলে। রাতদুপুরে তোলপাড়।

ষোল

সাহেবকে আরো কয়েকটা দিন সোনাখালি থেকে যেতে হল। সুভদ্রা-বউ ছাড়তে চায় না : ছটফট কর কেন ঠাকুরপো ? বউ যেন তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলছে, তেমন ভাবখানা তোমার।

মুকুন্দ সেই সঙ্গে যোগ দেয় : আহা, থাকোই না। তোমার সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই। যেমন রূপের দেহ, ভিতরেও মনটা তেমনি রূপময়।

আবার দীননাথ পাটোয়ারও বলে, ধানের কঁটা মোটা লেনদেন আছে। এদ্দিন রইলে তো আরও ক'টা দিন থাকো। কাজগুলো সারা করে মাইনে-পত্তোর চুকিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাও বাপধন। ধান নেবে না যখন, মাইনের সঙ্গে এক শলি ধানের দাম ধরে দেবো।

স্ফূর্তির চোটে সত্যি সত্যি নাচতে মন যায়। চলে যাচ্ছে সাহেব। গুরুপদর বাড়িটা একবার হয়ে যাবে, অনেক করে বলেছে। বাড়ি দূরবর্তী নয়, তিন-চার ক্রোশের ভিতরে। বিপদে আছে বেচারি তিলকপুরের সেই ব্যাপারটা নিয়ে। দারোগা বড় জ্বলাতন করেছে। লংকাকাণ্ড কবে হয়ে গেছে, আজও সেই লেজের আগুন নিভল না। সেই সমস্ত কথাবার্তাই হবে। এবং বউয়ের হাতের রান্না ভাত চাট্টি খাইয়ে দেবে বলেছে। অপূর্ব রাঁধে নাকি গুরুপদর বউ।

পথের মাঝখানে হঠাৎ বংশী। ফুলহাটা থেকে বোধহয় হেঁটে হেঁটেই আসছে। বংশী বলে, গুরুপদর কাছে যাচ্ছ তুমি ? বাড়ি যেতে হবে না, এতক্ষণে সে ঘাটে চলে গেছে। আমিও সেখানে যাচ্ছি।

কেমন রহস্যদৃষ্টিতে তাকায় : ক'দিন থেকে তোমার কথাই ভাবছি। সাহেবকে যদি পাওয়া যেত ! অনেক করে চেয়েছিলাম, মা-কালী তাই মিলিয়ে দিলেন। চলো—

সাহেব অবাক হয়ে বলে, কোথায় ?

ঘাটে। গুরুপদ সেখানে। আর একজনের সঙ্গে চেনা হবে—ধোনাই মিস্ত্রি। দেখনি তুমি তাকে, কাজের মানুষ।

বংশীর সাজ-পোশাকে বড় বাহার। সাহেব বলে, তুমিই যে সেই বংশী, চিনতে পারিনে। বলি, এ আমাদের সাঙাত বংশী নয়, কোন বড়মানুষের বেটা, বড় দরের লোক বংশীধরবাবু।

বংশী হেসে বলে, নেমন্তন্নে যাচ্ছ, বাবু না হয়ে কি কার! জাঁকজমকের বিয়ে, আমরা সব বরযাত্রী। গুরুপদ ধোনাই আর আমি তিনজন ছিলাম, তোমায় নিয়ে গণ্ডা পুরল।

সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরেছে। টেনেই নিয়ে যায়। ছাড়ানোর চেষ্টা করে সাহেব বলে, আচ্ছা পাগল! বিয়েবাড়ি গন্ধে গন্ধে গিয়ে উঠব? মানুষ আজকাল ত্যাঁদোড় হয়ে গেছে, ভোরের সময় তক্কেতক্কে থাকে। বিনি-নেমন্তন্নে গিয়ে বসলে পিটিয়ে পিঠ ভেঙে দেবে।

ঘাট অদূরে, দু-পা যেতেই পৌঁছে গেল। সেই লোকটা—ধোনাই মিস্ত্রি, অপেক্ষা করছে। বলে, নৌকো এ ঘাটে পাওয়া গেল না বংশী। গুরুপদ বরুইতলার ঘাটে গেছে। আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে—

সাহেব জিজ্ঞাসা করে: নেমন্তন্ন কোথায় বংশী?

মামুদ আলি মোল্লার ছেলের বিয়ে।

বংশীর সঙ্গে ধোনাই-এর চোখাচোখি হল। বুঝে নিয়ে ধোনাই একগাল হেসে ঐ সঙ্গে জুড়ে দেয়: গ্রাম মাদুরপলতা। বুড়িভদ্রা থেকে তেখরার খাল নেমে গেছে, সেইখানটা।

সাহেব চমকে ওঠে: ওরে বাবা!

বংশী অভয় দিয়ে বলে, নৌকোয় যাচ্ছি, বাবা বলবার কি হল গো? বিয়ে বাড়ির রশিখানেক আগে নেমে গুটগুট করে গিয়ে উঠবে।

অতএব বরুইতলার ঘাটে চলেছে। যেতে যেতে কথাবার্তা। ধোনাই মিস্ত্রি বলছে, ভাল অবস্থা করে ফেলেছে মামুদ আলি। নতুন দালান দিচ্ছে। বড়দলের হাটে গিয়ে বিয়ের বাজার করল, হাটবেসাতি দেখে-যত লোকের তাক লেগে যায়।

মিটিমিটি হেসে বংশী বলে, জাতের বায়নাক্কা নেই আমাদের, কে হিন্দু কে মুসলমান বুঝিনে। সব বাড়ি যাই আমরা। আয়োজন ভাল থাকলেই হল, নেমতন্ন লাগে না।

ব্যাপার বুঝতে সাহেবের বাকি নেই। হাসাহাসি চলছে তো চলতে থাকুক তাই এখন। নৌকো পেয়ে ভালই হল—গুরুপদর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে ফুল-হাটায় বলাধিকারীর কাছে যাবার মতলব। মাদুরপলতার মাঝপথে নেমে গেলে অনেক কম হাঁটতে হবে।

বরুইতলা এসে গেল। দূর থেকে গুরুপদকে দেখা যায়। ঘুরছে ঘাটের এমুড়ো-ওমুড়ো—ঘুরেই বেড়াচ্ছে। মাঝি-দাঁড়ি কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই, চুপচাপ ঘুরছে। এদের দেখে দ্রুতপদে কাছে এলো।

সাহেব পুলকিত স্বরে বলে, ওস্তাদের সঙ্গে কাজকর্ম সারা হয়ে গেল তোমাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে। চলে যাচ্ছি। তোমার বাড়ি যাচ্ছিলাম গুরুপদ।

গুরুপদর জবাবের আগেই বংশী প্রশ্ন করে: নৌকোর কি হল?

না, এখানেও নেই।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, কোথায় তবে?

নৌকোর ভার গুরুপদর উপরে। সে বলে, আছে, কোথাও না কোথাও। ঠিক বের করে ফেলব। বলি খোঁড়া নও তো কেউ। বাবুভেয়ে মানুষও নও। তবে আর কি! দাসপাড়ার ঘাটে যাই এবারে।

ঘোরাঘুরি হল দাসপাড়ার ঘাটে। সেখানেও নেই।

হাঁসখালি গিয়েই দেখা যাক তবে?

সাহেব বিরক্ত হয়ে বলে, নৌকো ঠিক করেছ—সে নৌকো কোথায় থাকবে, মাঝির সঙ্গে বলাকওয়া নেই? হেঁটেই তো এতক্ষণে প্রায় মাদুরপলতায় পৌছানো যেত।

কয়েকটা গাঁয়ে আরও কতকগুলো ঘাট ঘুরে মিলল অবশেষে নৌকো। জেলেডিঙি ডাঙার সঙ্গে কাছি-করা—মানুষজন নেই, বোঠে রয়েছে। অর্থাৎ ডিঙি বেঁধে কাছকাছি কোন একখানে গিয়েছে।

সর্বশেষ মানুষ গুরুপদ জোরে ধাক্কা দিয়ে ডিঙি স্রোতের মুখে ফেলল। জল ঝাঁপিয়ে নিজেও উঠে পড়ে। একটা বোঠে নিজে তুলে নিয়ে তাড়া দেয়: হাত-পা কোলে করে রইল সব? বোঠে ধরো, জোরে জোরে মারো—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, রাতদুপুর নেমন্তন্ন, তাড়াতাড়ির কি আছে?

গুরুপদ বলে, না, ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলো তবে। ধরতে পারলে জেলেরা ডাঙায় নামিয়ে নিয়ে পূজো করবে!

সাহেব ভয়ের ভঙ্গি করে বলে, বল কি গো—অ্যাঁ, ভালমানুষ হেঁটে হেঁটে চলেছি—খাতির করে এমনি নৌকোয় এনে তুললে। তোমার মাতব্বরিতে বড় ভয় গুরুপদ, সেই তিলকপুরের মতন না হয়।

যেমন বিয়ে তার তেমনি মন্তোর। বংশী দাঁত বের করে হাসে: দানধ্যান তীর্থিধম্মের মাঝে তো যাচ্ছিনে যে নৌকোর ন্যায্য ভাড়া মিটিয়ে দশের আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেরুব।

গুরুপদ বলে, মবলগ খরচ সামনে। খামোকা কেন টাকা দিয়ে নৌকো-ভাড়া করতে যাই? এক একটা পয়সা এখন বাপের হাড় আমাদের কাছে।

সাঁ-সাঁ করে ডিঙি চলেছে। সাহেব বলে, আমি তোমাদের নেমন্তন্নে যাচ্ছিনে। বলাধিকারী মশায়ের কাছে যাব, সেখান থেকে হয়তো বা দেশেঘরে

একবার। আবার কবে দেখা হবে—দু-চারটে কথাবাতার জন্য নোকোয় উঠেছি। নৌকো ওপারে নিয়ে ধরবে, নেমে চলে যাব।

বংশী ঘাড় নেড়ে বলে, মাইরি আর কি! একবার যখন তুলতে পেরেছি, ছাড়াছাড়ি নেই।

সাহেব কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে যাব তা হলে সেটা তো ঠেকাতে পারছ না।

সাহেবের মনেপ্রাণে আপত্তি। বলাধিকারীকে বলেকয়ে যাবে চলে কালীঘাট। সুধামুখীকে দেখে আসবে। আর রানীকে। মন বড় টেনেছে। কিন্তু সকলের বেশি দরকার কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে আসা। ইষ্টদেবী কালিকা। তার মধ্যে প্রধান হলেন কালীঘাটের দক্ষিণাকালী, আর বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী। কাজকর্মে হাত লাগানো কালীক্ষেত্রে পুজো চড়িয়ে আসার পর।

সাহেব বলে, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে—এমন হয় না। তৈরি-টৈরি হয়ে আসি আগে—তার পরে।

বংশী মিনতি করে বলে, এইবারটা মান রাখো ভাই সাহেব। বিয়ে-বাড়িটা সেরে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যাও। ধোনাইয়ের সাচ্চা খবর, এক বাড়িতেই কাজ হয়ে যাবে। নইলে প্রাণে মারা পড়ব আমরা।

মামুদ আলির বাড়ি না গেলে এরা মারা পড়বে—জিনিসটা মাথায় ঢোকে না। সাহেব অবাক হয়ে তাকাল।

বংশী বলে চলেছে, বউটা বরাবরই খ্যাচর-খ্যাচর করে। হালফিল আবার ছেলের মা হয়ে পাগলা হয়ে গেছে একেবারে। ছেলেমেয়ে তিন তিনটে গিয়ে ঐ একগুঁড়ো। সেই বাচ্চার মাথায় হাত রেখে দিব্যি করিয়ে নিল—অসৎ কাজে আর নয়, ভাল হয়ে থাকব। ছিলামও ভাল। কাজের কথা কেউ বলতে এলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁকিয়ে দিয়েছি। কিন্তু দিব্যি আমায় রাখতে দিল না। নেমন্তন্নের নাম করে বউকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েছি। সাজ-পোশাকের বোঝা সেইজন্য আরো বেশি করে চাপাতে হল। মোটে যাতে সন্দেহ না হয়।

কণ্ঠ কান্নায় ভেঙে আসে। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে সামলে নিয়ে বংশী বলে, জীবনে আর অসৎ পথ মাড়াব না ঠিক করেছিলাম। চাষবাস করব, খেটেখুটে গরিব ভাবে থাকব। হতে দেবে তাই? গরলগাছির দারোগা থানার উপর ডাকিয়ে নিয়ে খোলাখুলি বলে দিল। বয়স হয়েছে, চাকরি ছাড়বে এইবার, দেশের বাড়ি দালানকোঠা তুলে ধর্মকর্ম নিয়ে থাকবে। শেষ কামড় সেই বাবদে—আমার নাম ধরেছে এক-শ টাকা। কত কান্নাকাটি করলাম—এক-শ'র একটা টাকা মাপ হল না। চাষবাস করে ফালতু এক-শ কোথায় পাই।

সময়ও সংক্ষেপ—নতুন ফসল ওঠা অবধি সবুর মানবে না। তড়িঘড়ি আদায় দিতে হবে।

খোদাই বলে, আমার নামে দশ। জন-পনেরোর এমনি দশ করে ধরেছে। বংশীর মতন দাগি নই, ধরাছোঁওয়া পাচ্ছে না, সেইজন্ত সস্তা। ছিলাম না দাগি, কিন্তু কদ্দিন আর? দাগি না হলে হক-না-হক ট্যাক্স ধরতে পারে না যে!

গুরুপদ বলে, আমারও এক-শ। এক কাজের কাজি বলে বংশীর আর আমার এক অঙ্ক। সেই যে তিলকপুরের গন্ধ আমাদের দু-জনের গায়ে। তুমি বেঁচে গেছ সাহেব, বিদেশি মানুষ বলে তোমার নিশানা পায়নি।

সাহেব আর জেদ করে না। দারোগা নিশানা না পেলেও তিলকপুরের দায়-দায়িত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় না। তার উপরে বংশীর এই হাত-ধরাধরি ও চোখের জল। তুষ্টুরাম ফাটকে গেছে, বংশী আর গুরুপদর নাম সে-ই নাকি ফাঁস করে দিয়েছে।

সাহেব অবাক হয়ে বলে, তুষ্টু এমন কাজ করল? তারই জন্তে তো যাওয়া। ঢিল মেরে তার কপাল ফাটানোর শোধ তুলব—মনে মনে আমার ছিল সেই মতলব।

থানায় বংশীকে ডাকিয়ে বুড়ো-দারোগা কথা আদায়ের কায়দাটা খোলাখুলি বলে দিলেন—সন্দেহের কিছু নেই। বাহাদুরি জাহির করে বললেন, চাকরি শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন আর বলতে বাধা কি! কতরকম মাথা খেলাতে হয়—তোদের সায়েস্তা করতে গিয়ে তোদের উপর দিয়ে যেতে হয় আমাদের।

তুষ্টুরাম এবং ভিন্ন ভিন্ন কেসের আরও তিন-চারটে আসামি এক লক-আপে। মামুলি কায়দাকানুন করে দেখা হয়েছে—কাজ হল না। তখন দারোগার নিজের আবিষ্কার, অব্যর্থ মুষ্টিযোগ—

রাত্রিবেলা, বাইরের লোকজন একটিও আর থানায় নেই। লক-আপের তালা খুলে সিপাহিসহ দারোগা নিজে এসে হুঙ্কার ছাড়লেন: চুনের ঘরে নিয়ে যাও ওটাকে।

যার দিকে আঙুল তুললেন, সে মানুষ তুষ্টুরাম নয়। তুষ্টুর চোখের উপরে সেই আসামিকে টেনেহিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল।

নাম চুনের ঘর, কিন্তু এক কণিকা চুন নেই। আসামির পেটের ভিতরে কথা আদায় হয় সেখানে। একসময় রেওয়াজ ছিল—চুনের বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে বেঁধে রাখত, নিশ্বাসের সঙ্গে চুন উঠে নাক-মুখ বোঝাই হয়ে যেত। এখন ঢের

বেশি ফলপ্রদ পদ্ধতি বেরিয়েছে, সেকালের চুনের বস্তা বাঁধা থাকিত। ঘরের কেবল সেই পুরানো নামটা রয়েছে।

হুকুম দিলেন: চুনের ঘরে নিয়ে যন্ত্রআত্তি চালাওগে। নরম হয়ে এলে খবর পাঠিও।

বলে দারোগা সম্ভবত বিশেষ কোন জরুরি কাজে বসে গেলেন। যন্ত্রআত্তি শুরু হয়েছে ওদিকে। সেই যন্ত্রের যৎকিঞ্চিৎ কানে এসে লক-আপের ভিতর তুষ্টুরামের রক্ত হিম হয়ে যায়। দমাদম লাঠি পড়ছে আসামির বেওয়ারিশ দেহটার উপর। লাঠি চার-পাঁচখানা অন্তত—তেমনিধারা আওয়াজ। আর সেই সঙ্গে বাবা রে, মা রে—প্রাণান্তক চিৎকার। তারপর সমস্ত চুপচাপ। ক্ষণ পরে সিপাহির ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা যায়: বড়বাবু, নড়েচড়ে না যে—

সে কি রে?

চটি ফটফট করে ছুটলেন দারোগা চুনের ঘরে: কী সর্বনাশ, একেবারে শেষ করে দিয়েছিস?

সিপাহি বলে, পাঁচ হাতের কাজ, পাঁচজনে পাঁচ দিক থেকে পিটেছে—সকলে হাতের ওজন রাখতে পারে না। এখন কি হবে, বলুন বড়বাবু।

হবে কচু! মাকড় মারলে ধোকড় হবে। ঠিক ঠিক মরে থাকে তো কুয়ো-সই করে দে, আবার কি! ও-মাসেও তো হয়েছিল একটা।

সুস্পষ্ট অবিচল কণ্ঠ—রাত্রির নৈঃশব্দে প্রতিটি শব্দ তুষ্টুরামের কানে আসছে। পরক্ষণেই কুয়োর মধ্যে ঝপ করে একটা ভারী বস্তু পড়ার শব্দ।

দারোগার পরবর্তী হুকুম: চোর বেটাকে নিয়ে আয় এবারে। ওটাকেও শেষ করা হোক, কে আবার আদালতের হাঙ্গামায় যাবে!

খুন করার পরেই মানুষের নাকি খুনে পেয়ে যায় কখনো কখনো। ক্রমাগত খুন করে যেতে ইচ্ছে করে। দারোগার তাই হয়েছে। এবারে তুষ্টুরামের পালা।

চুনের ঘরে তুষ্টুরামকে নিয়ে এলো, দুপাশে দুই সিপাহি বজ্রমুষ্টিতে হাত এঁটে ধরেছে।

তিলকপুরে তোর সঙ্গে কে কে ছিল? বাঁচতে চাস তো বল্ খুলে সমস্ত—

বুড়ো-দারোগা বংশীকে বলেন, আর হেসে খুন হন। অনেক কাল আগেকার আরও এক ঘটনা বললেন তিনি। ঠিক এইরকম ব্যাপার। সদরের নিকটবর্তী পাইকগাছা থানায় তখন তিনি। সদরে বেনামি চিঠি গেল, দারোগা অমুক আসামিকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। অগস্তি সাহেব সেই সময় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট। সে লোকের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।

বাদার একটা বড় দাঙ্গার ব্যাপারে সাহেব সরেজমিন তদন্তে বেরিয়েছিলেন, পাইকগাছার ঘাটে বোট বেঁধে হঠাৎ নেমে পড়লেন। দারোগাকে বলেন, অমুক গ্রামের অমুক মানুষটাকে খুন করে লাস গুম করেছ তুমি—

দারোগা হাসিমুখে সহজভাবে বললেন, এবেলাটা দয়া করে ঘাটে থাকতে আজ্ঞা হয় হুজুর, বিকালে জবাব দেবো।

জমাদার ঘোড়া নিয়ে ছুটল। গ্রাম থেকে মানুষটাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে থানায় এনে হাজির করল।

দারোগা বললেন, এই লোক হুজুর, যাকে আমি খুন করে গাঙে ভাসিয়েছিলাম।

মানুষটা কসম খেয়ে বলে, খুনের কথা কি হুজুর, আমার গায়ে একটা আঙুল ঠেকায় নি কেউ। নির্দোষ বুঝে বড়বাবু একপেট খাইয়ে থানা থেকে ছেড়ে ছিলেন, পরমানন্দে সেই থেকে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছি।

খলখল করে হেসে বুড়ো-দারোগা এবার বংশীর কাছে রহস্যভেদ করেন : বুঝলে না? বস্তার মধ্যে খড়, চার-পাঁচজনে খড়ের বস্তায় লাঠি পেটাত। চেঁচামেচি কান্নাকাটি করত চৌকিদার একজন—বিস্তর মহলা দিয়ে তাকে শেখানো। তারপরে কুয়োর জলে ভারী জিনিস কিছু ফেলে দেওয়া। যাত্রার পালায় করে, তেমনি জিনিস আর কি!

ধাপ্পায় পড়ে বোকারাম তুষ্টু নাম বলে ফেলেছে, তাকে দোষ দিয়ে আর কি হবে? এইবারে দারোগা এদের সব নিয়ে পড়লেন। তিলকপুরের অপরাধী বংশী ও গুরুপদ মাত্র নয়—গোটা এলাকা ধরে টানাটানি। দশধারা রুজু হবে। ফৌজদারি কার্যবিধির একশ-দশ ধারা অনুযায়ী মামলা—চলতি কথায় দশধারা। ষোলআনা সাচ্চা আর কটা মানুষ—দায়ে-দরকারে ঘটিটা কি কুড়ালখানা কিম্বা পরের ক্ষেতের কলা-কচু সবাই নিয়ে থাকে। কোন কারণে দারোগা বিগড়াল তো দিল এক দশধারা ঠুকে। অমুক অমুক লোকের রীতি-প্রকৃতি খারাপ, খাওয়া-পরা চালানোর কোন সাধু পন্থা নজরে পড়ে না—এমনিধারা সন্দেহের উপর মামলা। দেশসুদ্ধ মানুষ সাক্ষি। শীতকালে হাকিমরা মফস্বলে বেরোন, মামলার শুনানি সেই সময়—গাঁয়ের উপর কোন এক অস্থায়ী ক্যাম্পে। জগৎবেড় জালে দিল তো সকলকে জড়িয়ে, যে পারে সে তদ্বির করে বেরিয়ে যাক। তদ্বির ঐ দারোগারই কাছে—নোট গুণে এবং টাকা বাজিয়ে তদ্বির করে এসো। যেমন এবারে বংশীর তদ্বির সাব্যস্ত হয়েছে এক-শ টাকা, ধোনাই মিস্ত্রির দশ। তদ্বির সারা হলে আসামির লিস্টি থেকে

নাম তুলে নেবে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, সাক্ষিদের উল্টোপাল্টা বলিয়ে বেকসুর খালাস আদায় করে আনবে হাকিমের কাছ থেকে। পাকা কোঠা-বাড়ি বানানোর খরচা সামান্য নয়—শোনা যাচ্ছে, পঞ্চাশ-ষাটটা নাম জড়াতে হয়েছে এবার।

বোঠে ফেলে বংশী খপ করে সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে : মাকালীর দিব্যি করে বলছি, মামলা ঠেকাতে যা লাগে তার উপরে সিকি পয়সার লোভ করব না। পুরো এক-শ টাকাও চাচ্ছি নে আমি। তিন বিঘে ধানজমি আর গাইগরুটার খদ্দের দেখে এসেছি। তাতে অর্ধেক আন্দাজ উঠবে। গুরুপদও ধারকর্য করে কতক জোগাড় করে ফেলেছে। সবসুদ্ধ মোটের উপর শ'-দেড়েক হলেই আমাদের হয়ে যাবে। তার উপরে যত কিছু তোমার। এই চুক্তি—মাগুনা খাটাতে যাব কেন বলো।

বংশী বোঠে মারে, আর বিড়বিড় করে দুঃখের কথা শোনায়। গাইগরু বিক্রির বন্দোবস্ত করে এসেছে। আট আনা মূল্যে এইটুকু এক মুলেবাছুর কিনে অনেক যত্নে এত বড়টা করল। বয়স হয়ে গিয়ে গাবিন হয় না, আশা একরকম ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিন পরে এইবারে প্রথম বাছুর হল। বংশীর বউ বলে, হয়েছে আমার বাচ্চার কপালে—বাচ্চাছেলে দুধ খাবে বলেই গুরুর দেবতা মাণিকপীর এতকাল বাদে বাছুর দিলেন। ঘরের গাইয়ের দুধ পেয়ে বলতে নেই, ছেলে বেশ ইয়ে মতন হয়েছে। বাচ্চার ভরপেট হয়ে এক-একদিন বাপের পাত অবধি দুধ এসে পড়ে। গাই-বিক্রির কথা বউকে ঘুণাক্ষরে জানানো যাবে না। কৌশলটা সে ভেবে রেখেছে। গাঁয়ের বাইরে কোনখানে গরু বেঁধে আসবে, সন্ধ্যার পর গরুর দড়ি খদ্দেরের হাতে তুলে দিয়ে টাকা নিয়ে নেবে। গরু ফিরছে না—বউ জানবে হারিয়ে গেছে। কার ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়েছিল, ধরে নিয়ে খোয়াড়ে দিয়েছে। লোক-দেখানো খোঁজাখুঁজিও হবে কয়েকটা দিন—মনে মনে বংশী সমস্ত ছকে রেখেছে।

গুরুপদ হঠাৎ গর্জে উঠল : ঐ যে থানায় থানায় দারোগা-জমাদার পুষে রেখেছে, ওরাই মানুষকে ভাল থাকতে দেবে না। ঘর থেকে তাড়িয়ে বের করে। ওদের বিদায় করুক, চুরি-ছ্যাচড়ামি দেখো আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কী বলছ তুমি ঢালির পো! সরল মানুষ ধোনাই মিস্ত্রি ঘোরপ্যাচের কথা বোঝে না। বলে, দারোগা পোষে তো চোর ঠেকানোর জন্যেই—

গুরুপদ বলে, আর দারোগা চোর পোষে চাকরি ঠেকানোর জন্য। তালুক-গাঁতি কিনবার জন্য, দালান-কোঠা দেবার জন্য। চোরের অনটন পড়লে চাপ দিয়ে ভাল গৃহস্থকে চোর বানিয়ে নেয়।

আঘাটায় ডিঙি বেঁধেছে, গাঁ নিশুতি হবে সেই অপেক্ষায় আছে। আহা-মরি কী চমৎকার রাত্রি! কৃষ্ণপক্ষ, তার উপর মেঘ থমথম করছে আকাশে। কোন দিকে বৃষ্টি হচ্ছে, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া। গরমকালে হঠাৎ যদি ঠাণ্ডা পড়ে যায়, তেমনি রাত্রি কাজকর্মের পক্ষে প্রশস্ত। মানুষ শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়বে। সে বড় গাঢ় ঘুম—মরণের দোসর। এমনি রাত্রে যে কারিগর ঘরে বসে থাকে, ওস্তাদের শাপশাপান্ত আছে: সেই অপদার্থ কাঠি ফেলে কলম ধরে কেন বাবু হয়ে যায় না?

ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে গায়ে। ধোনাই মিস্ত্রি সকলকে মক্কেলের বাড়ি হাজির করে দিল। মামুদ আলি লোকটা সত্যি পয়সা করেছে। চাষীর হাতে পয়সা এলে পর পর চার লক্ষণে প্রকাশ পাবে। উৎকৃষ্ট হালবলদ সর্বাগ্রে—সে এমন, কাজ ফেলে মাঠের যত চাষী আসবে বলদের গায়ে একবার করে হাত বুলিয়ে যেতে। বলদ হল তো ঘোড়া—হেঁটে বেড়ানো পোষাচ্ছে না আর তখন, ঘোড়ার পিঠে গমনাগমন। ঘোড়ার পরে বউ—একটা সকলেরই থাকে, কোন ঐশ্বর্যের চিহ্ন নয়, বিয়ে বা নিকে করে যাও যতগুলো সম্ভব। এবং সর্বশেষ পাকাদালান। মামুদ আলির চার দফাই হয়ে গেল। দালান দিয়েছে—একতলায় শেষ নয়, ছাদের উপরে দোতলার ঘর। সম্পূর্ণ হয়নি, দরজা-জানলা ও পলস্তারার কাজ বাকি। হতে হতে বিয়ে এসে পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ এখন দিনকতক। সিঁড়ি বাইরের দিকে, তারও ইটগুলো মাত্র বসানো হয়েছে। উঠতে পারা যায় এই পর্যন্ত। ধোনাই মিস্ত্রি গাঁথনির কাজে জোগাড় দিত, বাড়ির অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে।

বংশী অবাক হয়ে বলে, কী বিয়েবাড়ি রে বাবা! দেড় পহর হতে না হতে আলো নেভানো। ভেবেছিলাম, কতক্ষণ না নজর ধরে বসে থাকতে হয়।

ধোনাই বলে ছেলের বিয়ে যে! দুপুরবেলা বর নিয়ে সব মেয়ের বাড়ি রওনা হয়ে গেছে। বউ এসে পড়বার পর তখনই এবাড়ি বাজনা-বাদ্যি হৈ-হল্লা খানাপিনা। অঢেল আয়োজন করেছে, পাঁচ-সাত গাঁয়ের স্বজাত ভিনজাত আত্মীয় কুটুম্ব সকলের নেমন্তন্ন।

সাহেব ফিক করে হেসে ফেলে: রাতের কুটুম আমাদের ভোজ সকল কুটুম্বের আগে—

ভাঁড়ার উপরের ঘরে। জিনিসপত্র কেনাকাটা করে সেখানে এনে রেখেছে। ওস্তাদ বলেন, আগে বেরুনো, পরে ঢোকা। মানে হল, ঢোকবার আগে বেরুনোর বন্দোবস্তটা নিখুঁত হয় যেন। দোতলায় উঠবার নামে তা-বড় তা-বড় কাড়িগরও আঁতকে ওঠে। কিন্তু সাহেব বেপরোয়া—অন্তত আজকের

এই দিনটা। সাঙাতের কথায় এসেছে—তাদেরই কাজ। বংশীর আবার এ-কথাতেও আপত্তি: আমাদের কাজ হল কিসে? কাজটা বুড়ো-দারোগার—তাঁরই দালানকোঠা হবে। ধরতে পারলে নিয়ে তুলবে তাঁরই কাছে তো—তিনি কি আর বিবেচনা করবেন না?

কিন্তু হলে হবে কি—সিঁড়ির উপর মানুষ শুয়ে আছে আড় হয়ে। তাতে কি ডরায়! 'চলনে বিড়াল, সরে পড়ায় সাপ'। ছুটো সিঁড়ি বাদ দিয়ে পুনশ্চ একজন। তাকেও পার হল। আরও কিছু গিয়ে চাতালের উপর একগাদা মানুষ পাশাপাশি। কাজের বাড়ি মানুষ অনেক জমেছে। বৃষ্টি বাদলার মধ্যে জায়গার অভাবে সিঁড়িতেই শুয়ে পড়েবে। এত ডিঙিয়ে যাওয়া অসম্ভব—হনুমান না হলে হয় না। বেকুব হয়ে ফিরতে হল। খানিক দূরে এসে দেখে ধোনাই মিস্ত্রি নেই। যায় কোথা ধোনাইটা আচমকা এমন দল ছেড়ে?

বৃষ্টি তেমনি লেগেছে। টিপটিপ করে পড়ছিল—মুষলধারে এলো। ভিজে জবজবে। অনতিদূরে গোয়ালবাড়ি কাদের। একদৌড়ে ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

বংশী সাহেবের গা টেপে: ভিতরে মানুষ।

গোয়াল লোকে যেমন-তেমন করে ঘেরে, গরু না বেরুলেই হল। মশা তাড়ানোর জন্য সাঁজাল দিয়ে গেছে। আগুন গনগন করছে। সেই আগুন ঘিরে বসে ক'জনে হাত-পা সেঁকছে।

হেন ক্ষেত্রে টিপি টিপি সরে পড়া উচিত। কিন্তু সাহেবকে বজ্জাতি-বুদ্ধিতে পেয়ে বসল—হাঁক দিয়ে ওঠে: কারা ওখানে?

বংশী সন্ত্রস্ত হয়ে হাত টানছে পালাবার জন্য। সাহেব গ্রাহ্যের মধ্যে নেয় না।

কি করো তোমরা?

মিনমিনে গলায় জবাব আসে: খোলাট পাহারা দিচ্ছি।

সত্যি বটে, গোয়ালের ওদিকটায় গোলা, ধান তোলার খোলাট। গলার সুর আরও চড়িয়ে সাহেব ধমক দেয়: কে পাঠাল তোমাদের পাহারা দিতে? এসো, এদিকে চলে এসো, দেখে নিই—

লোকগুলো একলাফে উঠে পড়ে দৌড়।

সাহেব হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, দেখলে, আমি কেমন বুঝতে পারি। আমরাই মজা করে হাত-পা সেঁকি এবার। বাদলা রাতে ওরাও কাজকর্মে বেরিয়ে পড়েছে।

বংশী তিক্তস্বরে বলে, বেরিয়েছে ও দারোগার ঠেলায়—আমি দিব্যি করে বলতে পারি। এলাকা জুড়ে জাল বেড় দিয়েছে। মুখ ঢেকে পালাল, নয়তো

ঠিক চেনা মানুষ বেরুত। একই দশধারা মামলার আসামী। ঘাটটা নাম জড়িয়েছে, কেউ কি বাদ আছে এবারে?

গনগনে আগুন দেখে গুরুপদর তামাকের পিপাসা পেয়ে গেছে। বলে, কলকে-তামাক পেলে দু-টান টেনে নিতাম, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেছে গো—

ডিঙিতে ফিরে দেখল, ধোনাই ইতিমধ্যে এসে গেছে। গুরুপদ সর্বাগ্রে নারিকেলখোসার নুড়ি পাকাতে লেগে যায়। তামাক টেনে চাঙ্গা না হয়ে বোঠেয় সে হাত দিচ্ছে না।

বংশী ধোনাইকে প্রশ্ন করে: ডুব মেরেছিলে কোথা?

বোঠের গায়ে জল ঠেলতে ঠেলতে ধোনাই বলে, চিল পড়লে কুটোগাছটি না নিয়ে ওঠে না। সেই নিয়ম আমার, খালি হাতে ফিরিনে।

একটা চটের থলি পা দিয়ে ঠেলে দিল। হাত ঢুকাল বংশী—আর দু-জন পরমাগ্রহে চেয়ে রয়েছে। বেরুচ্ছে একে একে হাত-করাত, বাটালি, রেঁদা, আগর, সরকালি—মামুদ আলির নতুন দালানে ছুতোরমিস্ত্রি কাছ করে, কাজের শেষে যন্ত্রপাতি থলি ভরে রেখে যায়। পুরানো ক্ষয়া জিনিষ, রোজ রোজ ঘাড়ে করে নিয়ে যাবার মতন কিছু নয়। অন্ত বমাল না পেয়ে ঐ ছুতোরের থলিতে ধোনাই-এর নজর গিয়ে পড়ল।

খান দুই বাক এগিয়ে ধোনাই আবার এক কাণ্ড করে। পাশখালির মোহানায় জেলেডিঙি বাঁটা। ভাঁটা লাগলে জাল ধরবে, ততক্ষণ জেলেরা সুখ করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। হেসো-দা দিয়ে ধোনাই কাছিতে দিল পোঁচ। বনবন করে নৌকো পাক খাচ্ছে, লোকগুলো তবু জাগে না। চৈত্রের গাজনে চড়ক-গাছে ঘুরছে, তেমনি একটা কিছু ভাবছে হয়তো। গুড়োর উপর বেউটিজাল—জালগাছি তুলে নিয়ে ধোনাই জেলেডিঙিতে সজোরে ধাক্কা দিল। চলে যাক মাঝ-গাঙের দুরন্ত টানে। এখন জেগে পড়লেও ঐ টান কাটিয়ে পিছু নিতে পারবে না।

সাহেব রাগ করে ওঠে: জাল ওদের ভাতভিত্তি, সেই জিনিস নিয়ে নিলে তুমি?

ধোনাই হি-হি করে হাসে: বেঁচেবর্তে ভালাভালি ঘরে ফিরলে তবে তো ভাত! সে আর হচ্ছে না। ডুবে মরবে দ'য়ে পড়ে, ডুবে গিয়ে তবে যদি ঘুম ভাঙে!

হুঁকো চলছে হাতে হাতে। দু-চার টান টেনে তাড়াতাড়ি গরম হয়ে নেবার গরজ। ধোনাই সাহেবের দিকে হাত বাড়ায়: আমায় দাও—

হুঁকোর মাথা থেকে কলকে নামিয়ে সাহেব তার দিকে দিল: হুঁকো পাবে না, ছোটজাত তুমি—

সাহেব জাত-জাত করছে—আর দু-জন অবাক হয়ে গেছে। সেই সাহেব, একদিন যে ছুই ডোমকে হিড়-হিড় করে দাওয়ার উপর তুলেছিল। গুরুপদ বলে কাজের মধ্যে জাত-বেজাতী কী আবার! ও জিনিস গাঁয়ে ঘরে ফেলে এসেছি। ঘরে ফিরে গেরস্ত-মানুষ হয়ে কোঁপর-দালালি করব—সেই সময় তুলে নেবো।

সাহেব বলে, জাত কাজের মধ্যেও আছে। গরিব মেরে ছ্যাঁচড়া কাজকর্ম—সেই দিকে ধোনাই মিস্ত্রির ঝোঁক। ছুতোরের যন্ত্রপাতি হাতিয়ে আনল, জেলের জাল নিল। আমরা চোর, ধোনাই ছিঁচকে। ঘটিচোর বাটিচোর সেই দলের। হুঁকো দিলে জল মরে যাবে, জল বদলে ফেলতে হবে।

কলকে স্পর্শ করে না ধোনাই। দুঃখ পেয়েছে, দুখ ফিরিয়ে ঝপাঝপ বোঠে মারছে। বংশী তার হয়ে বলে উঠে: বেশ করেছে ধোনাই। গরিব না মেরে লাখপতি কোটিপতি পাই কোথা এখন? মামুদ আলিকে মনে করে এলাম, সে লোক তো কেঁসে গেল। খালি হাতে ফেরার চেয়ে পাঁচটা টাকাও যদি আসে, খানিক তবু এগোল। তোমার নিজের কিছু নয়—ফাঁকে ফাঁকে আছ, দয়া করতে এসেছ, আমাদের দায়টা কেমন করে তুমি বুঝবে?

আগের কথার খেই ধরে বংশী আবার বলছে, পাঁচ টাকা না হয়ে পাঁচ সিকে হলেই বা কে দেয়? এক-একটা দিন চলে যায় মাথায় যেন একটা করে মুগুরের ঘা দিয়ে। মাথার উপর দশধারা যদি না ঝুলত, হীরামাণিক মাঠে পড়ে শুকোলেও বাচ্চা ফেলে ঘর থেকে বেরুতাম না। কী বলব সাহেব—কুটুম্বাড়ি গিয়েও এখন ফালুক-ফালুক করি। চুল আঁচড়াতে চিরুনি দিয়েছে, সেটাও পকেটে ফেললাম। এক-শ টাকার কোন না এক আনার পয়সা উশুল হয়ে আসবে।

মা-কালীকে কাতর হয়ে ডাকছে: চলনসই একটা ঘর জুটিয়ে দাও মাগো। তারপর কে আর কাক-চিলের মতন ঠোকর দিয়ে দিয়ে বেড়ায়! আর দশটা গৃহস্থের মতো আমরাও বাড়ি গিয়ে উঠল।

চোর-ডাকাত-ঠগীর ইষ্টদেবী কালিকা-ঠাকরুন নিজে নাকি অদর্শন থেকে ভক্তদলের কাজকর্মের চালনা করেন। কিন্তু আজকের ব্যাপারে দেবীর চাড় দেখা যাচ্ছে না, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা রাত পেয়ে তিনিই বা ঘুমিয়ে পড়লেন।

আরও কয়েকটা জায়গায় নামল তারা ডিঙি থেকে। আশায় আশায় এগিয়ে যায়। এক উঠানে পা দিয়েছে কি, সাহেবের পিঠে যেন চাবুক পড়ে।

এসো, শিগগির বেরিয়ে এসো—। হাতের কাছে যাকে পেল, তাকেও টেনে বের করে আনে।

সকলে হকচকিয়ে গেছে। বংশী বলে, ভয় পেলে কেন সাহেব?

গৃহস্থ জেগে পড়লে টের পেতে মজা।

সে তো সব গৃহস্থ রে! কে কবে আমাদের ফুলচন্দন দিয়ে ডাকাডাকি করে?

সাহেব বলে, এরা তাই করত। আসতে আজ্ঞা হয় চোরমশায়রা। এসেই যখন পড়েছেন, দান করে যান কিছু।

কথা বড় মিছা নয়। বড়লোক ক'জন—তুনিয়াই তো এরা সব। দিনমানে দশের মাঝে অত বোঝা যায় না—বুঝতে দেয় না মানুষে, ঢেকেঢুকে সেরে-সামলে বেড়ায়। রাত্রিবেলা আপন জনদের ভিতর খাওয়া-দাওয়া সাজগোজ কথাবার্তা অসাবধান—নিরাবরণ। ঈশ্বরের খবর জানি নে, কিন্তু চোরের কাছে আসল অবস্থা চাপা থাকে না।

গাঙে-খালে অকারণ ঘুরে ঘুরে মন ভারী সকলের। সাহেবই কেবল হাসিখুশি। তার কিছু খারাপ লাগছে না। এক সময় বলে উঠল, হারুন-অল-রশিদ ছিলেন বাগদাদের খলিফা। তাঁরই মতন হল। উজির-নাজির নিয়ে ছদ্মবেশে সারারাত ঘুরে প্রজাপাটকের খবর নিতেন। আমাদেরও তাই কিনা, বলো ভেবে? এই যত দেখছি, প্রজাপাটক আমাদের। দিনমানে ভিন্ন রাজা—রাত্তির নিশুতি হলে মুলুক জুড়ে আমাদের রাজত্ব হয়ে যায়। যেখানে খুশি যাই—ত্যাঁদোড় প্রজারা নিজের ইচ্ছেয় দেবে না তো রাজকর ইচ্ছে মতো নিজের হাতে তুলে নিয়ে আসি।

একটু চুপ করে থেকে বলে, যত প্রজা এই দেখে এলাম—নিতে পারা গেল না তো দিয়ে আসাই উচিত। শুধুই নিলে রাজার রাজত্ব থাকে না, দিতে হয় অবস্থাবিশেষে। ভাল ভাল মুরুব্বি চোর দিতেন সেকালে। অপহারবর্মনের কথা ওঠে—চুরি করতেন তিনি গরিবকে ধনী, আর ধনীকে গরিব করবার জন্য। এক রকমের গুঁটিখেলা আর কি—ঝাঁকি দিয়ে চিৎ-গুঁটিকে উপুড় আর উপুড়-গুঁটিকে চিৎ করা।

সাহেবের রঙ্গরসে কারো কান নেই, নিজের ঝোঁকে সে বকবক করছে। আবার বিপদ, ক্ষিদে পেয়ে গেছে বিষম। ক্ষিদের দোষ নেই—জোয়ানপুরুষ, মরা নাড়ি কোনটার নয়। কোন্ তুপুরে চাট্টি মুখে দিয়ে বেরিয়েছে—এক মামুদ আলির বাড়ি হয়েই ফিরবার কথা, ক্ষিধে ঠেকাবার উপায় ভেবে আসেনি। এখন যত ভাবছে, পেটের মধ্যে তত হাঁউমাউ করে ওঠে? ঘোনাই মিস্ত্রি খাওয়ার

গল্প করে : রাতের কাজে বেরিয়ে কাদের রান্নাঘরে ঢুকে এক খোরা পান্তা মেরে দিয়ে এসেছিল একবার। পান্তাভাত আর কাসুন্দি।

গুরুপদ চটে উঠল : সাহেব ঠিক বলেছে, সত্যি তুই ছোটজাত। নজর নিচু। সেই রান্নাঘরে ঢুকলি, খেয়েও এলি। পান্তাভাত তবে কি জন্য খাবি, পোলোয়া-কালিয়া খেয়ে এলি নে কেন হতচ্ছাড়া?

ধোনাই অবাক হয়ে বলে, পোলোয়া-কালিয়া রেঁধে রাখে বুঝি—খেয়ে এসে তার গল্প করব?

সাহেব হাসতে লাগল : না খেয়েও গল্প হয় রে ধোনাই। পোলোয়া খায় তো বাবুভেয়েরা। মুখের গল্পে আমাদের সুখ।

গুরুপদ সাহেবের সুরে দোহার দেয় : সত্যবাদী যুধিষ্ঠির আমার—সত্যি বই মিথ্যে মুখে আসে না! নজর ছোট, ঐ যা বললাম। গল্পের খাওয়া—তা-ও পান্তার উপর উঠতে পারে না।

বংশীও আসরে নামে। পোলাও না হোক,—পাঁচ-সাতখানা তরকারি এবং পিঠেপায়সে চতুর্দিকে সাজানো বাড়া-ভাত সে খেয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি খেয়েছে, বানানো কথা নয়।

শিবপূজা বলে আছে এক ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলা বনের ধারে গলবস্ত্র হয়ে শিয়ালকে নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। তারপরে থালায় ভাত বেড়ে বাটিতে বাটিতে ব্যঞ্জন সাজিয়ে কোন ফাঁকা জায়গায় রেখে গৃহস্থ শুয়ে পড়ে। বনের শিয়াল চুপিসারে এসে খেয়ে যায়। পুঁথিপত্রে চোর-পুজোর এমনি কোন বিধান থাকত যদি! না থাকুক, বংশীই শিয়াল হয়ে সেবার শিবাভোগ খেয়ে এসেছিল।

গাঙ ছেড়ে ডিঙি খালে ঢুকে পড়েছে। সরু জলপথ—এর ঘরের কানাচ দিয়ে ওর বোধন-তলার নিচে দিয়ে। গলা ছেড়ে দিয়ে মানুষ এপার ওপারে দিব্যি গল্পগুজব করতে পারে। চুপ, একটি কথা নয়! বোঠে খুব নরম হাতে ধরো এবার—

পালাকীর্তন একবাড়ি—এত রাত্রেও চলছে। উঠানে পাল খাটিয়ে হেরিকেন ঝুলিয়ে দিয়েছে, খাল থেকে নজরে পড়ে। বোঠে ফেলে সাহেব উঠে দাঁড়ায়, ডিঙি লাগাতে বলে। না লাগালে ডাঙায় লাফ দিয়ে পড়বে, এমনিতরো ভাব।

ধোনাই বলে, এই দেখ। পেটে বাপান্ত করছে—ঠাকুরের নামে কি খিদে মরবে?

বংশী সাহেবের পক্ষে : চলোই না—শুনে আসি। কান পচে যাবে না।

বেয়ে বেয়ে শুধু হাতই ব্যথা—খিদে না মরুক, জিরানো যাবে তো একটুখানি।

বলে, ছোটমামা সাহেবকে বলত ভক্ত মানুষ। রোখ যখন চেপেছে, ঠেকানো যাবে না। তবে একটি কথা, লেপটে থেকো না সাহেব—একটু শুনেই চলে আসবে।

কিন্তু উল্টো বুঝেছ সাহেবকে। গলা বাড়িয়ে আসরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে সাহেব অন্য দিকে পা চালায়। কত বাড়ির কত উঠানে গেল। হারুন-অল-রশিদের নগর-পরিক্রমা। এক-একটা ঘর ধরে চক্কোর দিল কত সময়। মাটিতে পা ছোঁয় না যেন, মাটির পরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এরা তিনজন পিছনে—দূরে দূরে। সমস্ত পাড়াটাই ঘোরা হয়ে গেল। কাঠির কাজ আজ নয়। গুরুর হাতের কাঠি বউনির মুখে যন্ত্রতন্ত্র বের করা চলবে না। হাতের মাথায় যা আসবে, তাই কেবল তুলে নেওয়া। রাই কুড়িয়ে বেল—সে রাইয়ের একটি দানাই বা মেলে কই?

তবু সাহেব খুশি। নিকানো-আঙিনা ঘরদুয়ার গোয়াল-ঢেঁকিশালা ঘুরে ঘুরে দেখে—দিনমানের মানুষ যেখানে সংসার-ধর্ম করে, ছেলেপুলেরা খেলা-ধুলা করে, মেয়েরা ব্রতনিয়ম করে, বিয়েথাওয়া অন্নপ্রাশন কথকতা হয় যেখানে। দেবতার পীঠস্থানের মতো পুণ্যময় আশ্চর্য জায়গা—দেখে কিছুতে সাহেবের আশ মেটে না।

এক সময় বংশীর কানে কানে বলে, এ গাঁয়ের মানুষগুলো হুঁশিয়ার খুব—পুণ্যি করতে গিয়েছে ষোলআনা সামাল হয়ে। ঘরে ঘরে তালা, তালার চাবি আঁচলে গিঁট দিয়ে তবে বসে হরিনাম শুনছে। পাহারার মানুষও রেখে এসেছে কেউ কেউ। তোমরা দেখনি, আমি দেখে এড়িয়ে এসেছি।

বংশী বিরস মুখে বলে, আমাদের যাত্রাটাই অপয়া। চলো নৌকোয় ফিরি—

যে উঠানে গাওনা হচ্ছে, সর্বশেষ এবার সেই বাড়ির ভিতর ঢুকল। সামনের ঘরটা খোলা। এরাই অসাবধান—বাড়ির উপর গাঁয়ের তাবৎ মানুষ, সেই সাহসে বোধহয়। সাহেব আর বংশী ঘরে ঢুকে গেল। অন্য দুজন বাইরের পাহারায়।

ধামা-ঝুড়ি ডালা-কুলো যত আজেবাজে জিনিস। বড়ির হাঁড়ি, আমসত্ত্বর হাঁড়ি, আমসির ভাঁড়। মাচার উপরে উঠে পড়ল। তোষক-বালিশ-লেপ গাদা করা—কী বাহারের বিছানা মরি-মরি! সাহেব সেই যখন শ্মশানে শয়নঘর বানিয়েছিল, মড়ার সঙ্গে এমনি বস্তু দেখতে পেত।

বিছানা উল্টেপাল্টে টিনের পোর্টম্যান্টো পাওয়া গেল। চাবি-আঁটা। এই

তবে আসল বস্তু—নজরে না পড়ে সেজন্য বালিশ ঢেকে দিয়েছে। একটু চাড় দিতে পুরানো বাক্সর পতরের জোড় খুলে গেল। ধোপদুরস্ত কাপড়ে ঠাসা—দামি দামি বেনারসিও। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই'—ছেঁড়া বিছানা দেখে ছুত্তোর বলে চলে যায়নি ভাগ্যিস।

কত বড় আঁচল রে বাবা, কত শ' টাকা না জানি দাম! সাহেব বলে, এ শাড়িটা বিক্রি করা হবে না, বউকে দিও বংশী। খুশি হবে।

বংশী আঁতকে উঠল: সর্বনাশ, জেরা করে করে সব বের করে ফেলবে, আস্ত রাখবে না আমায়। বিক্রি কেন হবে, তুমি রেখে দাও সাহেব। তোমার বউ এলে পরাবে।

কৌতূহলে এরই মধ্যে একটু ভাঁজ খুলল। বউকে পরানোর বস্তুই বটে! ছিঁড়ে জাল-জাল হয়ে গেছে, বিঘত পরিমাণ আস্ত নেই। সলতে পাকানোর ন্যাকড়া অথবা গোবর নিকানোর ন্যাতা ছাড়া অন্য কাজে আসবে না। ছেঁড়া কাপড়গুলো এমন যত্নে কেন রাখা, অতিসঞ্চয়ী গৃহস্থই শুধু বলতে পারে। বেনারসি ফ্যাসফ্যাস করে ছিঁড়ে সাহেব শতেক ফালি করে। যত আক্রোশের শোধ তুলছে শাড়ির উপর।

স্ত্রী-কণ্ঠে কোন দিয়ে বলে উঠল: কারা ওখানে?

সাহেব চেপে থাকতে পারে না। গলায় বিকৃত আওয়াজ তুলে বলে, ছেঁড়া ত্যানা কার জন্যে পুঁজি করে রেখেছ? এই বেনারসি পরে শ্মশানে যাবার বুঝি সাধ?

এর পরেই তো চেঁচিয়ে ওঠে, এবং আসর ভেঙে মানুষের হৈ-হৈ করে পড়বার কথা। হয়ে থাকবে তাই। সাহেবরা কিছু জানে না, ডিঙি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

সতের

সকাল হল।

হারুন-অল-রসিদ ও তস্য উজির-নাজিরগণ রাতভোর রাজ্য দর্শন করে ঘুরেছেন। রাজকর সেই ছুতোরের যন্ত্রপাতি ও জেলের জাল—তার উপরে আর ওঠেনি। তবে ক্ষিধের ব্যবস্থা যা-হোক কিছু হয়েছিল বটে। কুকুরের অনুগ্রহে। মানুষ নয়, কুকুর।

কুকুর সে-বাড়ি একটা নয়, বোধকরি এক গণ্ডা দেড় গণ্ডা। যেই পা দিয়েছে, চতুর্দিকে থেকে গ-গ করে এসে পড়ল। দৌড়, দৌড়। কুকুরগুলোও তাড়া করেছে। সর্বনেশে কাণ্ড। মুরুব্বিরা এইজন্য মাথা-ভাঙাভাঙি করেন: যথোচিত বন্দোবস্ত বিনা কখনো কেউ কাজে না নেমে। গোঁয়ার্তুমিতে নিজের আখের নষ্ট এবং বৃত্তির বদনাম। সেই ব্যাপারই হতে যাচ্ছিল কাল রাত্রে।

কুকুরের তাড়ায় উঠি-কি-পড়ি ছুটেছে। গ্রাম ছেড়ে মাঠে পড়ল। ঝোপঝাড় পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে গেল! সন্ধান করতে না পেরে কুকুর আরও খানিক ডাকাডাকি করে ফিরল। তারপরেও অনেকক্ষণ এরা নিঃসাড়।

ঢোকবার সময় ঠাহর হয়নি—ভয় কেটে গিয়ে দেখে, আখের ঝাড়ের ভিতর ঢুকেছে। কুকুরকে তখন উপকারী বলে মনে হয়। ক্ষিধেয় ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছিল, কুকুরই আখের ক্ষেতে তাড়িয়ে তুলে দিল। ঘেউ ঘেউ করছিল, এবারে তার মানে পাওয়া যায়: চক্ষুহীন মূর্খের দল, খাদ্য বুঝি লোকের রান্নাঘর ছাড়া থাকতে নেই? কত খাবি, প্রাণভরে খেয়ে নে।

আখ ভেঙে ভেঙে দেদার খেয়েছে। এক জিনিসে ক্ষিধে-তেষ্টা উভয়ের শান্তি।

রাত্রি গিয়ে এবারে দিনমান। গোনে ছুটে চলেছে ডিঙি। চার মরদে আয়োজন করে বেরিয়েছে—কাজের ষোলআনা সামাধা না হওয়া অবধি এ ডিঙির মুখ ফেরাবে না। অর্থাৎ দারোগার টাকা পুরোপুরি যতক্ষণ না আসছে। বংশীদের হয়ে গিয়ে টাকা বাড়তি থাকে তো অন্য যারা ভিন্ন দল হয়ে বেরিয়েছে, তাদেরও দিয়ে দেবে। দশধারা যাতে অঙ্কুরেই বিনাশ পায়।

দিগ্বিজয়-যাত্রার মনোভাব: মারো বোঠে—শাবাস। জোরে মারে, আরও জোরে—। বোঠে মারা নয়, যেন বিয়ের বরণ করা হচ্ছে। কী গো মরদ-মশায়রা—

ধোনাই কাতর স্বরে বলে, উপোসি থেকে কত আর হবে ?

ভাতের বদলে একটা আস্ত পাহাড় গলাধঃকরণ করলেও এদের উপোস। সাহেব গান ধরে বসল অকস্মাৎ। গানে পুত্রশোক ভোলায়, ভাতের শোক যাবে না ? কালীঘাটের বস্তির ঘরে ঘরে এই সব গান উঠত। মুক্ত গাঙের উপর সাহেব আজ ক্ষণে ক্ষণে গলা ছেড়ে দিচ্ছে :

কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ,
জল আনতে যাচ্ছ একা, সঙ্গে নাইক কেউ।
যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে, কাঁদতে হবে অবশেষে,
কলসি তোমার যাবে ভেসে, লাগবে প্রেমের ঢেউ।

গান হাসিহল্লা হেনক্ষেত্রে ভালই। স্ফূর্তিবাজ চারটে ছোঁড়া চলেছে—লোকে ভাববে। খারাপ অভিসন্ধি থাকলে এমন হৈ-হৈ করে না। চুপিসাড়ে যায়।

বেলা চড়ে যেতে পেটে আবার সোরগোল উঠল। ক্ষণে ক্ষণে ক্ষিধে দিয়ে বিধাতা মানুষের সঙ্গে শত্রুতা সেধেছেন। নয়তো ভাবনার কী ছিল। বংশী একটুখানি ভেবে বলে, টেনে চলো দিকি। বাবুপুকুরে কুটুম্ব আছে, ধর্মদাস গরাই। সম্পর্কে মামাতো শালা। অতিথি হইগে, খাতির না করে পারবে না।

ধোনাই বলে, বাবুপুকুর কি এখানে ! হাতে-পায়ে খিল ধরে বোঠের মুঠো আলগা হয়ে আসছে। পেটে কিছু না পড়লে আমি বাপু শুয়ে পড়ব।

সকলের মনের কথাই মোটামুটি এই। গুরুপদ প্রস্তাব করে : বমাল কিছু ছেড়ে দেওয়া যাক। খোরাকি খরচার মতন। খালিপেটে খাটা যায় না।

এদের মাল হাটে-বাজারে নেওয়া যাবে না। সংসারে খারাপ মানুষ আছে তো কিছু কিছু, মাথা-গরম ধর্মধ্বজী মানুষ—হল্লা তুলে তারা ধরিয়ে দিতে পারে এ মালের জন্য আলাদা মানুষ—থলেদার বলে তাদের। থলেদার ফলাও কাজ-কর্ম ধরলে তখন মহাজন। জগবন্ধু বলাধিকারী যেমন। গুরুপদর চেনা এক থলেদার কাছাকাছি থাকে—নবনী ধাড়া। নবনীকান্তের চোটার কারবার। নিকারিরা মাছের ডালি মাথায় বয়ে হাটে হাটে বিক্রি করে—টাকা প্রতি দৈনিক এক আনা সুদে নবনী মূলধনের যোগান দেয়। সেইটে প্রকাশ্য, তদুপরি এই গুপ্ত লেনদেন।

ডিঙিতে রইল সাহেব আর বংশী, গুরুপদ ধোনাইকে নিয়ে চলল। ধোনাইর কাঁধে বেউটিজাল, গুরুপদর হাতে চটের থলি। বাড়ির কাছাকাছি বটে, তাই বলে কি ঘাটের উপর ? হাঁটতে হাঁটতে বেলা মাথার উপর এলো। তবু ভাগ্য, নবনীকান্ত বাড়ি আছে, সুদ আদায়ে বেরিয়ে পড়েনি। চোটার সুদ দিন-কে-দিন তুলে নিতে হয়।

গুরুপদবাবু যে! পথ ভুলে নাকি? আমি যে পয়সা দিই সে বুঝি ষষা? বাজারে চলে না?

গুরুপদ আমতা-আমতা করে বলে, কাজকর্ম নেই—খালি হাতে এসে কি হবে?

চেহারায় তো তেলটি-ফুলটি। চাকরি-বাকরি নিয়েছ—লাট সাহেব মারা গিয়েছিল, সেই চাকরিটা নাকি?

হেসে ওঠে নবনী হি-হি করে। বলে, ঘরে মুড়কি আছে—খাবে?

অতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু নৌকোর দুজনকে ফেলে খাওয়া চলবে না। এ-ও দলের নিয়ম। গুরুপদ বলে, দাও চাট্টি। এখানে খাব না, কোঁচড়ে করে নিয়ে যাই।

নবনীকান্ত বলে, কি এনেছ, দিয়ে দাও। দেখেশুনে রেখে আসি।

থলির মালপত্র বের করে। নবনী এক নজর দেখেই মুখস্থর মতো দাম বলে যায়, করাত সাত আনা, আগর আট আনা, বাটালি চার আনা, রেঁদা পাঁচ আনা, একুনে দাঁড়াল গিয়ে—

গুরুপদ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, কোহিনূর হীরে আনলেও আনার মধ্যে থাকবে। তোমার কাছে কখনো টাকা পুরতে দেখলাম না ধাড়ার পো। হাতকরাত বাজারে একখানা কিনতে যাও—কম-সে-কম সাত-আট টাকা। হোক পুরানো, তা বলে কি—

নবনী তাড়াতাড়ি বলে, পুরো টাকাই দিতাম আমি। কিন্তু করাতের তিনটে দাঁত যে ভাঙা। তিন আনা হিসাবে তিন-তিরিক্কে ন-আনা বাদ দিয়ে দেখ, এবারে কত দাঁড়ায়।

ধোনাই মিস্ত্রির কাঁধের জালের দিকে আঙুল তুলে বলে, দেখি, হাত দাও—

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, টাকা কেন—তারও উপরে দেওয়া যেত। পাঁচ সিকে অবধি উঠে যেতাম। কতগুলো ঘর ছেঁড়া, চেয়ে দেখ। ঘর পিছু ফুটো করে পয়সা হলেও পাঁচ-ছ' আনা বাদ চলে যাবে।

ধোনাই এক টানে জাল ছিনিয়ে আবার কাঁধে তুলল: যা নিয়েছ, একটা বেলার খোরাকি হবে। জাল থাকুক, গাঙে-খালে মাছ মারব।

নবনীকান্তও এবার অতিশয় কড়া। বলে, নিতে হয় তো জাল সুদ্ধ নিয়ে নেবো। কখনো বাতিল লোহা নিয়ে পয়সা গুণে দেবো, এত বোকা পাওনি। বয়স হয়ে গিয়ে ছেড়েও দিয়েছি এসব কাজকর্ম। ধর্মপথে থেকে চেটোর সুদ যা দু-চার পয়সা আসে, তাতেই পেট চলে যায়।

থলিসুদ্ধ ঠেলে দিয়ে নবনী উঠে পড়ল। অন্দরের দিকে হাঁক দিয়ে ওঠে: তেল পাঠিয়ে দাও গো। বেলা হয়ে গেচে, চান করে ফেলি।

অর্থাৎ কথাবার্তার শেষ। রাজি থাক মাল দিয়ে মূল্য নাও, নয় তো উঠে পড়ো এইবার।

গুরুপদ বিশুষ্ক মুখে বলে, নিয়ে নাও। গরজ বুঝেছ, আর কি রক্ষে রাখবে তুমি! যা দিচ্ছ, সে-ও তো অনেক দয়া।

আজেবাজে মন্তব্য কানে না নিয়ে নবনী বলে একুনে তা হলে কত দাঁড়াল, জুড়ে গেঁথে বলো।

গুরুপদ বলে, দাম ধরেছ তুমি। জুড়তে হয় ভাঙতে হয় তুমিই করো সব। যা দেবার দাও, বিদায় হয়ে যাই।

টাকা ও রেজগিতে নবনী দাম দিয়ে দেয়। গুরুপদ তাকিয়েও দেখে না, মুঠো করে নিয়ে গামছার কোণে বাঁধল।

নবনী বলে, গণে নিলে না?

জবাব ধোনাই মিস্ত্রি দিল: বেশী দেবার পাত্তর তুমি নও। কম হলে তো বলবে, সেইটেই উচিত দাম।

সাঙাত বড্ড রেগেছে গো! টেনে টেনে নবনী বলে, বিনি পুঁজির ব্যবসা তোমাদের। দাম নিয়ে তো পগার পার—আমি শালা মরি এবারে। মাল ঘরে রেখে সোয়াস্তি নেই, কোন ফিকিরে কোথায় পাচার করি। থানায় টের পেলে নির্দোষী আমারই হাতে-দড়ি পড়বে।

পথে এসে ধোনাই বোমার মতো ফেটে পড়ে: যা মুখ দিয়ে বেরুল, তাই ফলিয়ে দাও হে মা-কালী। হাতে-দড়ি দিয়ে বেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাক। চার চারটে মানুষ সারারাত তল্লাট চষে বেড়ালাম, মোট বওয়ার মজুরিটাও দিল না গো!

গুরুপদ বলে, দূর দূর, কাজের নিকুচি করেছে! যত বাটপাড় মিলে ভাগাভাগি করে নেয়, আমাদের কপালে কাঁচকলা! ঘেন্নায় সিঁধকাঠি গাঙে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছে করে। তা হবে কি করে—পেটের জ্বালা, পোড়ারমুখো সিপাই-দারোগার জ্বালা—

মুড়কি পেটে পড়ে এখন আলস্য লাগছে।

ভাত রান্না হাঙ্গামার কাজ। চাল-ডাল নুন-মশলা কেনো, কাঠকুটো কুড়োও উনুন ধরাও, জল ঢালো, ফ্যান গালো—হরেক রকমের প্রক্রিয়া। প্রায় এক দুর্গোৎসবের ব্যাপার।

ধোনাই মিস্ত্রিই এবারে বলছে, বাবুপুকুর দশক্রোশ বিশক্রোশ নয় গো—দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ব। বংশীর শালা-কুটুম্বর বাড়ি, যা একখানা খাতির পাওয়া যাবে—

গুরুপদ জোগান দেয়: এয়ারবন্ধু নিয়ে বোনাই এসে হাজির। হাত-পা ধুয়ে বসতে না বসতেই তো জলখাবার একপ্রস্থ—

ধোনাই বলে, কুটুম্বদের পথের কষ্ট হয়েছে—সন্ধ্যেটা গড়িয়ে যেতেই অমনি থালায় ভাত, চতুর্দিকে দশখানা তরকারি সাজানো—

রোসো—। বংশী বিড়বিড় করে হিসাব করছিল। ঘাড় নেড়ে বলে, উঁহু, সন্ধ্যের পরেই কি করে হয়! শনিবার তো আজ—বাবুপুকুরের হাটবার—হাটের ভালো মাছটা না খাইয়ে ছাড়বে? তার উপরে ধর্মদাস এই সেদিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে এককাঁড়ি পণের টাকা পেয়েছে—

কুটুম্ববাড়ি পৌঁছে উল্টোটাই শোনা যায়। নিতান্ত দায়ে পড়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া। বংশীদের হাত-পা ধোয়ার জল দিয়ে তামাক সেজে এনে ধর্মদাস সবিস্তারে আলাপ-সালাপ করছে। বড় দুর্দিন এবারে। অন্য বছর গোলা ভরতি হয়ে বাড়তি ধান আউড়িতে রাখতে হয়, এবারে ক্ষেতের বাঁধ ভেঙে নোনাজল ঢুকে সমস্ত বরবাদ। খোরাকি ধানের অভাবেই সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিল, অন্তত আর দুটো বছর রেখে খানিকটা সেয়ানা করতে পারলে পণের টাকা ডবল হয়ে যেত।

এরই মধ্যে একবার জিজ্ঞাসা করে: যাওয়া হচ্ছে কোন্‌দিকে কুটুম্বমশায়রা?

জবাব ঠিক করাই আছে। বংশী বলে, যাওয়া নয়—ফেরা হচ্ছে। দক্ষিণের আবাদে ধান কাটতে গিয়েছিলাম।

খিক-খিক করে হাসি ওদিকে উঠানের ছাঁচতলায়। মানুষটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পায়নি। ঐ মানুষ এখানে জানলে ভুলেও বাবুপুকুরের ছায়া মাড়াত না। দফাদার রতনমাণিক। চৌকিদার আট-দশ জনের মাথার উপর এক একটি দফাদার থাকে। কিন্তু শুধু দফাদারে রতনমাণিকের পরিচয় হয় না। ইচ্ছে করলেই যেন সে হাতে মাথা কাটতে পারে, এমনিতরো ভাব। তলোয়ার লাগে না, এবং সেজন্য কারো কাছে সে কৈফিতের ভাগীও নয়।

হেসে উঠে রতনমানিক বলে, ধান কাটতে কোন মুলুকে যাওয়া হয়েছিল বংশীধর? ধান কেমন উঠল? বলি দায়দেনা সব মিটে যাবে তো?

দফাদার সেই গরলগাছি থানার এলাকায়, যেখানে থেকে বুড়ো দারোগা দশধারার প্যাঁচ কষছে। সমস্ত জানে সে, আবরু রেখে প্রশ্নটা করল। বংশীও শুকমুখে হুঁ-হাঁ দিচ্ছে। আবার এই সময় ধর্মদাসের ছোট ভাই দুটো—কেষ্টদাস

আর রামদাস বাড়ি ফিরল—তারাও এসে কাছে দাঁড়ায়। কি কেলেঙ্কারি ঘটে এইবারে সকলের সামনে।

রতনমাণিকই কিন্তু ঠেকিয়ে দিল। ধর্মদাসের হাত ধরে টেনে বলে: চলো বেয়াই মশায়, হাটে এর পরে কিছু থাকবে না। কথাবার্তা থাক এখন—পালিয়ে যাচ্ছে না কেউ, সারা রাত্তির ধরে যত খুশি হতে পারবে।

খবরটা জানা ছিল না, এই রতনের ছেলের সঙ্গেই ধর্মদাস মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। নতুন কুটুম্ব এলে হাটে যাবে, দশগাঁয়ের মানুষের মধ্যে দু-হাতে খরচপত্র করে সচ্ছলতা দেখাবে, গৃহস্থ মানা করবে কিন্তু কানে নেবে না—এইসব হল দস্তুর। হাট ভেঙে যাবার আশঙ্কায় দুই বেয়াই হনহন করে বেরুল।

বংশী বেজার মুখে বলে, ও বেটা এসে জুটেছে—হাটের পথে পুটপুট করে আমাদের কুলের কথা বলবে। কুটুম্বর কাছে মুখ দেখানো যাবে না, সরে পড়ি এই ফাঁকে।

বসে ছিল ধোনাই মিস্ত্রি, ধপাস করে শুয়ে পড়ল মাদুরে।

কী হল ধোনাই ?

ভাতের চেহারাই ভুলে গেছি বাবা। এক পেট ঠেসে তারপর যা বলো রাজি আছি। খাওয়ার ডাক এলে উঠব, তার আগে কপিকলে বেঁধেও কেউ উঠাতে পারবে না।

গুরুপদরও সেই কথা: মুখ দেখতে না পার বংশী, কোঁচার খুঁট খুলে ঘোমটা ঢেকে বসে থাকো। গুরুমশায়কে গুরু বলে, ডাক্তারবাবুকে ডাক্তার বলে—কারো কিছু হয় না, চোর বললে আমাদেরই বা লজ্জা কেন হবে ?

মোটের উপর ভাত এরা খাবেই ধর্মদাসের বাড়ি। না খেয়ে নড়বে না। নিরিবিলি পেয়ে কাজকর্মের কথা হয়। কালকের রাতটা মিছা খাটনিতে গেল। আন্দাজি কাজের রকম এই। জুয়োখেলার মতন—প্রায়ই লাগে না, বিপদের ঝুঁকি পদে পদে। মুরুব্বিরা তাই পই-পই করে মানা করেন। ভাল কাজ লাগাবার আগে অনেকদিন ধরে তোড়জোড় করতে হয়। উৎকৃষ্ট খুঁজিয়াল চাই—যে মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এ-গ্রাম সে-গ্রাম এ-বাড়ি সে-বাড়ি খোঁজখবর নেবে, ভাব জমাবে লোকের সঙ্গে।

গুরুপদ ও ধোনাই মিস্ত্রি লাইনের পুরানো লোক—দুজন দুই পারে চুঁড়ে বেড়াতে পারে। কিন্তু নৌকো বাওয়া রান্নাবান্না কাজের কারিগরি—এত সমস্ত বাকি দুজনে হয় না। ডিঙিখানা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতন এদেশ-সেদেশে ছোটাবার বাসনা—বাড়তি মানুষ জুটিয়ে নাও তাহলে।

হাটুরে দুজনে হাট করে ফিরে এলো। বেসাতি রান্নাঘরের পৈঠায় নামিয়ে রতনমাণিক চেঁচামেচি করে : বংশী, ঘুমুলে নাকি তোমরা ?

ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। সাড়া দিলে যদি আবার সেই আগের সুরের কথা আরম্ভ করে দেয়! ধর্মদাসের ভাই কেষ্টদাস কথায় কথায় ইতিমধ্যে বলেছে, রাতটুকু পোহালেই রতনমাণিক চলে যাচ্ছে, সরকারি মানুষের বসে বসে কুটুম্ব-ভাতা খাবার সময় নেই। অতএব যেমন-তেমন ভাবে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া।

কত জিনিস কেনাকাটা করলাম, একবার চোখে দেখবে না তোমরা ? ডাকতে ডাকতে রতনমাণিক কাছে চলে এসেছে। বেসাতির জিনিস না দেখিয়ে যেন সোয়াস্তি নেই। বলে, নলেন-পাটালি পেয়ে গেলাম। ভারি, কতদিন পরে একসঙ্গে এত জনে মিলেছি—দুধ-পাটালি খাওয়া যাবে আমোদ করে। আর এক নতুন জিনিস—ফুলকপি। খুলনা থেকে এক দোকানদার নিয়ে এসেছিল, ডবল দাম ধরে দিয়ে তার কাছ থেকে কিনলাম।

ভালবাসায় গদগদ অবস্থা। বংশী অবাক হয়ে দেখছে। নিজ এলাকার মধ্যে যে দফাদারকে দেখে, এখানকার রতনমাণিক সে মানুষ নয়। কথাবার্তার ধরন, এমন কি কণ্ঠস্বর অবধি আলাদা। ধর্মদাসও তটস্থ হয়ে আছে—আদর-যত্নের তিল পরিমাণ ত্রুটি না ঘটে। হাট থেকে ফিরে এসে খাতিরটা আরও যেন বেড়েছে। ধর্মদাস তো এই—ভাই দুটোও মুকিয়ে আছে। হাঁ করতেই কেষ্টদাস দৌড়ে পান-জল এনে দেয়, রামদাস কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিয়ে আসে। রান্নাঘরে সমারোহ করে রান্নাবান্না হচ্ছে—ছ্যাঁকছোঁক আওয়াজ, ফোড়নের গন্ধ। হেসে ধর্মদাস বলে, এক হল কটুম্বের বাড়িতে গেলে সুখ, আর হল কুটুম্ব বাড়ি এলে সুখ। শাকটা মাছটা তোমরা খাবে, আমরাও বাদ পড়ব না। ক'টা দিন সেইজন্যে আটকে রাখব, 'যাবো' বললেই ছাড় পাবে না।

কাল রাতে ও আজ দুপুরে ভাত জোটেনি—একবেলায় এখন তিন বেলার শোধ তুলে নিল। বৈঠকঘরে তোষক-বালিশ-চাদর এসে পড়েছে—চারজনের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। বিছানাপত্র সমস্ত দিয়ে বাড়ির লোকে সুনিশ্চিত শুধু-মাদুরে গড়াচ্ছে। আরামে চোখও বুঁজেছে—

রতনমাণিক ভিতর-বাড়ি শুয়ে ছিল, পা টিপে টিপে সে এসে হাজির : ঘুমুলে নাকি বংশী-ভাই ? দুটো কথা বলবার জন্য সেই কখন থেকে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছি। বড়বাবু আবার আমায় ফুলহাটা পাঠালেন। গিয়ে দেখি, বাড়ি-ছাড়া তুমি। কোথায় গিয়েছ, বউও সঠিক কিছু বলতে পারে না।

বংশী বলে, বলেকয়ে সময় নিয়েই তো এলাম। তবু বড়বাবুর সোয়াস্তি নেই। তাগাদার পর তাগাদা।

রতনমাণিক হেসে বলে, জলের তলের মাছ আর পরের হাতের ধন মুঠোয় না আসা পর্যন্ত সোয়াস্তি কিসের! কিন্তু সেজন্য নয়। একটা জিনিস বড়বাবু হুঁশ করিয়ে দিতে বললেন। তা ছাড়া আমার নিজেরও কিছু বলবার আছে—

বংশী আগের কথা ধরে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, আমাদের কি জমিদারি তালুকদারি আছে যে ইচ্ছে মতন সিন্দুক খুলে মুঠো মুঠো দিয়ে দেবো? রোজগারপত্তরে বেরিয়েছি। বললে, বাড়িছাড়া আমি—ঘেন্নায় সব ছেড়েছুড়ে বাড়িই তো ছিলাম। থাকতে দিলে কই তোমরা? যা-কিছু পাবো নৈবিদ্যি সাজিয়ে তোমার বড়বাবুকে নিবেদন করে আসতে হবে।

রতনমাণিক প্রবল বেগে ঘাড় নাড়েঃ কথাই তো আমার তাই। শুধু বড়বাবুতে ফল হবে না। দুর্গা বলো কালী বলো সকল বড়-ঠাকুরের পূজোর সঙ্গে ষষ্ঠীপূজো। ষষ্ঠীর নৈবিদ্যি বাদ না পড়ে, খেয়াল রেখো ভাই।

ঠাণ্ডা করবার জন্য বংশীকে রতনমাণিক বোঝাচ্ছেঃ ভগবান হাত দিয়েছেন পা দিয়েছেন কাজকর্ম ছেড়ে বাড়ি কেন বসে থাকতে যাবে? দু-হাতে কাজ করে যাও যতদিন শক্তিসামর্থ্য আছে। তবে হ্যাঁ, বিচার-বিবেচনা থাকবে নিশ্চয় কাজের। বিবেচনায় ভুল করেই তোমরা ফ্যাসাদে পড়ে যাও।

গরলগাছি আর ঝিনুকপোতা দুই থানার পাশাপাশি এলাকা। রতনমাণিকের স্বার্থ গরলগাছি নিয়ে। কণ্ঠে তার ক্রমশ ধমকের সুর এসে গেলঃ দশধারার জন্য বড়বাবুকে দুষে বেড়াও, কিন্তু তোমরাই তো করাচ্ছ তাঁকে দিয়ে। না করে উপায় নেই, এমনি অবস্থায় এনে ফেলেছে। নজর-খাটো কতকগুলো ছুটকো ছোঁড়া কাজের জায়গা চিনে রেখেছে শুধু গরলগাছির এলাকাটুকু। এর বাইরে যেন দুনিয়া নেই। বদনাম হয় গরলগাছির, ঝিনুকপোতা বগল বাজিয়ে বেড়ায়। সদর থেকে হুড়ো এলে বড়বাবু তখন আর চোখ বুজে থাকেন কি করে?

বংশী ক্লান্ত স্বরে বলে, বলছি দফাদার ভাই, জো-সো করে এবারটা ছাড়ান করে দাও। কোন তালে আর নেই, গরলাছি ঝিনুকপোতা কোনদিকে জীবনে পা বাড়াব না।

রতনমাণিক গালে হাত দিয়ে বলে, এই দেখ—বললাম এক কথা, তুমি বুঝলে উল্টো? গরলগাছিতে বিস্তর হয়ে গেছে, সকলে এবারে ঝিনুকপোতা ধরো। ঝিনুকপোতার দর্প চূর্ণ করে দাও। এই জিনিসটা হুঁশ করিয়ে দিতে বড়বাবু আমায় ফুলহাটা পাঠালেন। তোমরা সব তার আগেই বেরিয়ে পড়েছ!

অনেকক্ষণ ধরে বিস্তর কথাবার্তা। পুলিশ আর চোর—পক্ষ হল দুটো। হামেশাই পরস্পরের মুখোমুখি হতে হয়। যত-কিছু গণ্ডগোল যথোচিত বুঝসমঝের অভাবে। ভোরবেলা রতনমাণিক চলে যাচ্ছে বংশীদের ডেকে তুলে জনে-জনের কাছে বিদায় নিয়ে গেল। নিতান্ত মায়ের পেটের ভাই হলেও লোকে এত দূর করে না।

আরও খানিক বেলা হলে গৃহকর্তা ধর্মদাস কোথা থেকে খাসিছাগল টানতে টানতে এনে জিওলগাছে বাঁধল। বলে, চলে যাবে—মাইরি আর কি! সরকারি মানুষ বেহাই মশায়কে ছাড়লাম বলে তোমাদেরও? এবেলা তো কিছুতে নয়! খাসি দিয়ে দুপুরবেলা চাট্টি সেবা হোক, তারপরে দেখা যাবে।

এতক্ষণ সশব্দে হচ্ছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর নেমে গিয়ে শোনা যায় কি না যায়। গলা খাকারি দিয়ে ধর্মদাস বলে, একটা কথা বলি ভায়ারা। শোন, সকলকেই বলছি। ক্ষেতখামারের কাজ মিটে গিয়ে ভাই দুটো বসে আছে। তোমরা সাথী করে ওদের নিয়ে যাও। বড্ড ধরেছে।

বংশী বলে, এখন কোথা নিয়ে যাব? কাজ অন্তে ঘরে ফিরছি তো আমরা।

ধর্মদাস ফিক করে হাসল: কালা নই, কানাও নই ভায়া। নিজের চোখ দিয়ে দেখি, নিজের কানে শুনি? যেটুকু যা বাকি ছিল, বেহাই মশায় খুলে বলল। ধাপ্পা দাও কেন?

ব্যাপার সমস্ত ফাঁস হয়ে গেছে। বংশী তবু কিছু ইতস্তত করে: এত বড় মানী গৃহস্থ তোমরা। কাজটা তো ভাল নয়—

নির্বিকার ধর্মদাস বলে, ভাল কি মন্দ কে জানতে যাচ্ছে! ঘরে ঘরে দেখগে এই। কলিযুগ তবে আর বলছে কেন! তা-না না-না করো কেন, সত্যি গুণের ভাই ওরা আমার। নয়তো বলতে যেতাম না। কেষ্টদাসের আবার বড় মধুর গানের গলা—সে গানে মানুষ কোন্ ছার, বনের পশু অবধি মজে যায়। কিন্তু মজলে কি হবে, পয়সা তো দেবে না সে বাবদ।

চার সাঙাতে সলাপরামর্শ হল। বিধি-মতন কাজ করতে হলে মানুষ তো দরকারই। ছোকরা দুটো লাইনে একেবারে নতুন—কিন্তু কাজ করতে করতেই শিখবে মানুষে। আপাতত দায়িত্বের কাজ নয়, বোঠে মারা থেকে শুরু। ডিঙি বাইবে, আর চোখ মেলে কাজ দেখবে। ডাঙায় নেমে বড়জোর পাহারায় দাঁড়াতে পারে দায়ে-দরকারে। মায়ের নাম স্মরণ করে চলুক তবে কেষ্টদাস আর রামদাস।

ছ-জন নিয়ে দলটা নেহাৎ মন্দ দাঁড়াল না। স্বচ্ছন্দে এবার নাবালে নেমে যাওয়া যায়। সেখানে গহিন নদী, ঘোর তুফান। কিন্তু ফসলে ভরা মাঠ—যার মানে হল গৃহস্থর গোলায় ধান, বাক্সে টাকা। কাজকর্মের বড় সুন্দর ক্ষেত্র—লোক-মুখে শোনা আছে।

দূরের পথ, কিছু বন্দোবস্ত সেরে নেবার দরকার তাড়াতাড়ি। বাঁশ ফেড়ে ডিঙির উপর চালি করে নিল শোওয়া-বসার সুবিধার জন্য। দরমার ছই মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, তালিতুলি দিয়ে নিল। অস্ত্র নেওয়া হল হাতের মাথায় যা-কিছু পাওয়া যায়—রামদা লেজা সাবল লাঠি ছোরা। কাঠি তো অঙ্গের সাথী। কেষ্টদাস তার গোপীযন্ত্রটা নিয়েছে। পাপের ভারবোঝা যখন বেশি বেশি লাগবে, কৃষ্ণকথা গেয়ে বোঝা খানিক হালকা করে নেবে। হঠাৎ কি মনে হল—বোষ্টমপাড়ায় গিয়ে কণ্ঠী জোগাড় করে নিয়ে এলো একজোড়া।

সাহেব হেসে বলে, তা বেশ হল, কাঠি-সাবল-লেজার মতো এ জিনিসও সরঞ্জাম কাজের।

রাতদুপুরে ডিঙিতে উঠে পড়ল। শেষরাত্রে জো এসে গেলে রওনা। জ্যোৎস্না উঠে গেল, গাছপালার মাথা ঝিকমিক করছে। আজকে ক্ষতি নেই, আকাশের চাঁদ আরও কয়েকটা দিন এই রকম জ্বালাবে। তারপরে অমাবস্যা, পুরো অন্ধকার। পেঁচা ডেকে উঠল কোনদিকে। প্রথম বোঠে জলে পড়ল—ঝপ! বোঠের পর বোঠে—ঝপাঝপ ঝপাঝপ। স্রোতের আগে আগে ছুটেছে ডিঙি।

সকালবেলা গুরুপদ আর ধোনাই দুজনে দু-পারে নেমে গেল। হেঁটে হেঁটে খোঁজদারি করে বেড়াক। সন্ধ্যার পর ফিরবে নৌকোয়। দরকার পড়লে দিনমানে ফিরতেও বাধা নেই। কোন পথ ধরে নৌকোর চলাচল, কোন্‌খানে চাপান দেওয়া—আগের রাত্রে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। দোহাই ষড়ানন ঠাকুর, দোহাই মা নিশিকালী, মুখ রেখো এবারে।

গোন-বেগোনের বাছবিচার নেই, ডিঙি চলবে। উজান মুখে টান কাটিয়ে এগুনো যাচ্ছে না, বোঠে মেরে হাত ব্যথা—গুণের দড়ি নিয়ে লাফিয়ে পড়ুক ওরা দু-ভাই। জলজঙ্গল কাঁটা-কাদা বুঝিনে—যতক্ষণ দিনের আলো তার মধ্যে থামাথামি নেই।

গাজি বদর-বদর!

আঠারো

ডাঙার মানুষ জলে জলে ভাসছে। হল কত দিন? কে জানে, পাঁজিপুঁথি ধরে কে হিসাব করতে গেছে? দিন-কুড়িক হতে পারে। এক মাস হলেও অবাক হবার নেই। বংশীর তো মনে হচ্ছে এক বছর। বাচ্চাছেলের জন্য মন টানছে। বংশীর এক খুড়তুতো ভাইকে বাদাবনে বাঘে তাড়া করেছিল। জলে ঝাঁপ দিল সে প্রাণ বাঁচাতে। বংশীরও ঠিক তাই। তিন-তিনটে মারা গিয়ে ঐ বাচ্চা, কিন্তু কোলে-কাঁখে নিয়ে ঘরবসত করবার জো নেই। বাঘ চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে, ডাঙায় উঠলে ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরবে। বাঘ নয়, বাঘের বেশি—গরলগাছির বুড়ো-দারোগা।

গাঙ-খাল গাঁ-গ্রাম কত ঘুরল। দুই তীরে দুই ভগ্নদূত ছুটোছুটি করে খবর খুঁজছে। সন্ধ্যাবেলা একত্র হয়। নাকে-মুখে যা-হোক দুটো গুঁজে তারপর কাজে বেরুনো। গৃহস্থের অজ্ঞাতে কুটুম্বর দল উঠানে ঘরকানাচে নানান অন্ধি-সন্ধিতে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। যাত্রা খারাপ, কিছুতে কিছু হচ্ছে না! খোরাকি খরচাটা কোন রকমে ওঠে, এই পর্যন্ত।

শখ করে কাজে ছুটি নিয়ে নিল হয়তো কোন একদিন। অজানা গাঁয়ের হাটের মধ্যে ঘোরাঘুরি ও কেনাকাটা করে বেড়াল। কোন বাড়ি যাত্রাগান খুব জমেছে—চাষীদের ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে গান শুনতে বসল। দলটার মধ্যে সবচেয়ে স্ফূর্তি সাহেবের। কাজকারবার না হোক, প্রাণ ভরে দেখাশোনা হয়ে যাচ্ছে। রকমারি মানুষজন দেখছে, মাঠঘাট বনজঙ্গল দেখে বেড়াচ্ছে। পোড়ামাটি শহুরে জায়গায় ছেলেবয়স কাটিয়ে এসেছে, যা দেখে সবই যেন তাজ্জব লাগে। বংশী আর গুরুপদ চটে যায়। পরের দায়ে এসেছে কিনা, দায়টা নিজের হলে আহা-ওহো করে স্বভাবের শোভা দেখবার পুলক হত না।

শিক্ষাটা নতুন করে হল, যথানিয়ম বিধিব্যবস্থা ছাড়া কাজ হয় না। মুরুব্বিদের কঠিন নিষেধ অকারণ নয়। কপাল ভাল তাই বড় রকমের বিপদ আসেনি, কিন্তু অপদস্থ হতে হয়েছে অনেক। সিঁধ কেটে দেখা গেল বিশাল ছাপাবাক্স গর্তের সমস্ত মুখটা জুড়ে। বাক্সর উপর মানুষ শুয়ে আছে, সে হাঁক দিয়ে উঠল: খসখস করে কি? কে ওখানে? বুদ্ধি করে বংশী কিচমিচ করে ইঁদুর ডাকল। ঘুমের মধ্যে বিরক্তি ভরে মানুষটা বলে, দেখাচ্ছি কাল

মজা, জাঁতিকল পাতব। ইঁদুর হয়ে বেঁচে এলো, নয়তো ভোগান্তি ছিল সেদিন। আর এক রাত্রে আয়োজন করে পাকা দেওয়াল কাটতে গেছে, যন্ত্র ফিরে ফিরে আসে—যেন লোহার পিঠে লোহার ঘা পড়েছে। কী ব্যাপার? সাবধানী গৃহকর্তা জানালার নিচে—চোরের যেখানটা সিঁধ খোঁড়ার সম্ভাবনা—চুনসুরকির বদলে মাটি দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। মাটি অর্থাৎ সিমেণ্ট। নাও, হল তো—হিমরাত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এবার ডিঙিতে ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। বিচক্ষণ খুঁজিয়াল থাকলে এমন হয় না। ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের মতো মানুষ ফুলহাটার উপর—তাঁকে একটিবার বলে দেখলে না কেন বংশী? এক মাস দু-মাস এমন কি বছরও ঘুরে যায় ক্ষুদিরামের এক-একখানা কাজ গড়ে তুলতে। গড়াপেটা সারা করে কারিগরকে জানান দিয়ে দেয়, কারিগর নিশ্চিন্তে নামিয়ে নিয়ে আসে। সে চুরি রীতিমত এক শিল্পকর্ম। সকালবেলা পড়শিরা এসে মুগ্ধ হয়ে দেখে। কানে শুনে দূর-দূরন্তরের মানুষ দেখবার জন্যে ছোটে। বুদ্ধি অধ্যবসায় আর পরিশ্রম যার পিছনে, তার বড় মর্যাদা। সে আপনি মহৎকর্মে প্রয়োগ করুন, আর চোরাই কাজে লাগান। আর এরা যা করছে—ছিঃ! কাজই তো নয়, জুয়াখেলা।

দিন যায়, শেষটা মরীয়া হয়ে উঠল। লাইনের যত-কিছু নীতি-নিয়ম ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। সাহেব সকলের চেয়ে বেশি বেপরোয়া। ওস্তাদের ছাড়পত্র নিয়ে প্রথম যাত্রায় বেকুব হয়ে ফিরবে না কিছুতেই নয়। আরও একটি বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—নতুন ছোঁড়া ছুটোর একটি—কেষ্টদাস। কালে কালে সে সাহেবেরই দোসর হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

কানাইডাঙার গাঙ্গুলিবাড়ি। শ্রীমন্ত লক্ষ্মীমন্ত বলবন্ত—এমনি সব ভাইদের নাম। আরও একটি আছে—অনন্ত। গুরুপদর খবর: সাকুল্যে কতকগুলো ভাই, সঠিক বলা যাবে না, একটা দিনে এর বেশি হয় না।

অনন্তর বয়স কম, এই বছর তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে তুখোড়। হাকিমের পেস্কার। যে হাকিমকে নিয়ে কাজকর্ম, রোজগারের হিসাবে অনন্ত বারকয়েক কিনে ফলতে পারে তাঁকে। গায়ের জামায় ফরমায়েস দিয়ে পাঁচ ছ'টা পকেট বানাতে হয়, মামুলি তিন পকেটে কুলায় না। কোর্টে যাবার সময় ফাঁকা পকেট, সন্ধ্যায় বাসায় ফিরবার সময় রেজগির ভারে পকেটগুলো ছিঁড়ে পড়বার দাখিল। আইন-আদালতের জন্মকাল থেকে অলিখিত নিয়ম চলে আসছে কোন্ কাজের কি প্রকার তদ্বির। বাঁ-হাত ঘুরিয়ে পিঠের দিকে বাড়ানোই রয়েছে—পয়সা-দুয়ানি সিকি-আধুলি পড়া মাত্র মুঠো

হয়ে পকেটে ঢুকে পলকের মধ্যে আবার পূর্বস্থানে। যন্ত্রবৎ এই প্রক্রিয়া সমস্তটা দিন। হাকিম মুখ একটু বাড়ালেই সমস্ত নজরে পড়ে যাবে। ছেলেরা আড়াল করে তামাক খায়—হুঁকোর ফড়ফড়ানি কানে আসে, কিন্তু তাকিয়ে দেখতে নেই। এ-ও তেমনি ব্যাপার। এমনও হতে পারে, ঈর্ষা ও অনুতাপের বশে মুখ গুঁজে থাকেন হাকিমমহাশয় : হায় রে, বাঁধামাইনের হাকিম না হয়ে হাকিমের পেস্কার হলাম না কেন যাবতীয় লেখাপড়া কর্মনাশার জলে দিয়ে?

এ হেন পেস্কারের চাকরি অনন্তর। খুলনা থেকে কাল বাড়ি এসেছে কদিনের ছুটিতে। বাদার ইজারা নিয়েছে বড়ভাই লক্ষ্মীকান্ত, বন কাটার জন্য জনমজুর লাগিয়েছে। শহর থেকে অনন্তই বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, টাকাকড়ির দায়ও তার উপরে।

গুরুপদ খোঁজ এনে দিল। ঘোরাঘুরিতে ক্লান্ত হয়ে ডিঙির চালিতে সে শুয়ে পড়েছে। আর রইল রামদাস। দুজনকে ডিঙিতে রেখে কালী-নাম স্মরণ করে অন্যেরা বেরিয়ে পড়ল। পথ বাতলে দিয়েছে গুরুপদ—সেই পথে অদৃশ্য রূপে মা-জননী আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলো। কাজের সময় সিঁধকাঠিতে ভর করো মা, কাঠি হবে বজ্রের মতন। সিঁধের মুখে কুবেরের ভাণ্ডার জড় করে রেখো মা—

কী যেন ঠাণ্ডা মতন পায়ের উপর। সাপ? না, কোলাব্যাং একটা। লাফ দিয়ে এসে পড়ল, আবার চলে গেল। কুঠির দীঘিতে সোলমাছ ধরতে গিয়ে সাপই পায়ে উঠেছিল। সাপে ছোবল দিলেও এ সময়টা হুল্লোড় করবার জো নেই, নিঃশব্দে ধীর পায়ে সরে যেতে হবে। রান্নাঘরের কানাচে কাচনির বেড়ায় চোখ রেখেছে সাহেব আর বংশী। কানে শুনছে ভিতরের কথা, চোখে দেখছে ভিতরের মানুষ।

বড় সংসার এক গাদা মেয়েলোক। গিন্নি যাকে বলা যায়, বয়স হলেও বেশ হাসি-খুশি মানুষটা।

নতুন-বউকেও ভাত দিয়ে দাও নমি। বাবুদের দাওয়ায় ঠাঁই হচ্ছে, নতুন-বউ ঘরের মধ্যে বসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিক।

নতুন-বউ সলজ্জে বলে, না দিদি, আগে খাব কেন? তোমরা যখন খাবে তখন। সকলে একসঙ্গে।

[সাহেব বলছে, নাও না খেয়ে বাপু, বড়র কথা শুনতে হয় আর কষ্ট দিও না। শীতটা বড্ড পড়েছে। খেয়ে নিয়ে এবার শুয়ে পড়োগে যাও।

বলছে সাহেব মনে মনে, ঘর-কানাচের ঝোপজঙ্গলে দাঁড়িয়ে।]

সেই বড়-জা হেসে নতুন-বউকে বলে, তোমার যে ভাই কাল থেকে চাকরি

চলছে—আপিসের হাজরে। ছোটবাবু চারদিনের জন্যে এসেছে—মিনিটের দাম হাজার হাজার, ঘণ্টার দাম লাখ।

নমি মেয়েটা বলে, অঙ্কে ভুল হয়ে গেল কিন্তু বড়বউদি—

একি ধারাপাতের অঙ্ক যে পাঁচ দুনো দশ ছয় দুনো বারো হতেই হবে। ঐ বয়সে এদের অঙ্ক আলাদা—

আরও কি সব বলতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে নমির দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়তে বসল।

নমি বিধবা। আহা, ন্যাড়া হাত—নরুনপাড় ধুতি পরেন।

সেই ছোটবাবুই বুঝি ঘরে ঢুকল। ছোটবাবু অর্থাৎ অনন্ত। সকলের অলক্ষ্যে নতুন বউয়ের দিকে চোরা চউনি হানা—মানুষটা অনন্ত না হয়ে পারে না।

বড়বউ বলে, দাওয়ায় পিঁড়ি পড়েছে ঠাকুরপো। সকলকে ডেকেডুকে নিয়ে খেতে বোসোগে। রাত করো না, যাও।

ফিক করে হেসে বলে, ভাবনা নেই ভাই, নতুনকেও খাইয়ে দিচ্ছি।

অনন্ত পুলকিত কণ্ঠে নিস্পৃহ ভাব দেখায়: ভারি মাথাব্যথা কি না তোমার নতুনের জন্যে! গিয়েই তো পড়ে পড়ে ঘুমুবে।

বটে! কাল রাত্রে বাড়িশুদ্ধ লোক ঘুমুতে পারিনে। তুমি একলাই তবে বকবক করছিলে?

[ঘর-কানাচে সাহেব মনে মনে গরম হচ্ছে। দেওর-ভাজে ন্যাকা-ন্যাকা কথাবার্তা কতক্ষণ চালাবে শুনি? মশাও জো পেয়ে গেছে—মজা করে রক্ত খাচ্ছে, চাপড়টা দেবার উপায় নেই।]

অনন্ত বলছে, নমিতাকে নার্স-ট্রেনিং-এ ঢোকালে কেমন হয় বড়উবদি? হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে খাতির আছে। তাঁকে ধরেছি, হয়ে যেতে পারে। দাদাদের বললাম, কারো অমত নেই। তোমরা কি বলো শুনি এবার। নার্স হলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার উপায় হয় একটা।

নিজেই নমিতা গোলযোগ করে ওঠে সকলের আগে: আমি যাব না; কক্ষনো না। হাসপাতাল অনাচারের রাজ্যি, ম্লেচ্ছ কাণ্ডবাণ্ড সেখানে।

বড়বউ বোঝাতে যায়: তুমি নিজে ভাল থাকলেই হল ঠাকুরঝি। অত ছোঁয়াছুঁয়ি বাচবিচার চলে না আজকালকার দিনে।

অনন্ত বলছে, এখনই পনর টাকা করে পাবি। পাশ করলেই হাসপাতালে নিয়ে নেবে, মাইনে সঙ্গে সঙ্গে ডবল। তিরিশটাকা। তুই যা চালাকচতুর, পাশ করতে একটুও আটকাবে না।

বড়বউ চোখ বড় বড় করে বলে, তিরিশ টাকা—ওমা, সে যে এককাঁড়ি টাকা। ভেবে দেখ নমি, ইচ্ছাসুখ খরচপত্তর ক ব, কারো কথার তলে থাকতে হবে না—

অনন্ত বলে, তিরিশেই শেষ নাকি, বাড়বে না মাইনে? তার উপরে প্রাইভেট প্রাকটিশ—

ঘাড় নেড়ে নমিতা ঝেড়ে ফেলে দেয়ঃ আমি যাব না। মেয়েলোকে খারাপ হয়ে যায় বাইরের কাজে বেরিয়ে—

বলতে বলতে কাঁদো-কাঁদো হয়ে ওঠেঃ লাথি-ঝাঁটা মেরে যদি তাড়িয়ে দাও বউদি, পরের বাড়ি যখন ধান ভেনে বাসন মেজে আমার একবেলার ভাতের জোগাড় করে নেবো। তবু আমি বাপের গা ছেড়ে নড়ব না।

বড়বউ মরমে মরে গিয়ে বলে, ছি-ছি এমন কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কেমন করে ঠাকুরঝি? তোমারই ভবিষ্যৎ ভেবে বলা। ঘরবাড়ি তোমাদের—তোমাদের ভাইবোনের। পরের মেয়ে আমরা—তাড়াতে হয়, আমাদেরই তাড়িয়ে দেবে।

।[ভাল জ্বালা হল দেখছি! সাহেব রাগে গরগর করছেঃ বলি, মশা কি ঘরের ভিতরের পথ চেনে না, বাইরের যত উৎপাত? ভবিষ্যৎ মুলতুবি রেখে চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড় এবারে। ঘুমিয়ে পড়—

বড়বউ ক্ষুব্ধ স্বরে অনন্তকে বলে, হে ক'টা দিন বাড়ি আছি ঠাকুরপো, নমির কথা কক্ষনো মুখের আগায় আনবে না। খেতে বোসোগে যাও, ভাত নিয়ে যাচ্ছি।

যাবার মুখে অনন্ত খোঁচা দিয়ে বলল, নাঃ ঘেন্না ধরালি নমি। ব্যবস্থা একটা হতে যাচ্ছিল—কপালে দুঃখ থাকলে কে খণ্ডাবে?

কপালের দুঃখ তুমি কি শোনাচ্ছ ছোড়দা, অহরহ বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলছে। দুঃখের কপাল না হলে মায়ের পেটের বোনকে সরানোর জন্য তোমরাই বা অজুহাত খুঁজে বেড়াবে কেন?

নমিতা হাইহাউ করে কেঁদে পড়ল। বেকুব হয়ে অনন্ত পালাবার দিশা পায় না।

আরও খানিক পরে রান্নাঘরের দাওয়ায় পুরুষরা খেতে বসেছে। বড়বউ মেজবউ পরিবেশন করছে। নমিতা জল পুরে গ্লাস এনে দেয়, নুন দেয় থালার পাশে পাশে। বাড়িতে একপাল বিড়াল—থালার বস্তু খাবা বাড়িয়ে টেনে খায়। বিড়াল তাড়ানো একটা বড় কাজ নমিতার। জোর-জবরদস্তি করে নতুন-বউকেও ওদিকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে।

সর্বশেষে বড়বউ বলে, ঠাকুরঝি, তুমি কি খাবে?

নমিতা হেসে হেসে বলছে, হীরের ভাত সোনার ডালনা রূপোর চচ্চড়ি—

বউবউ ঢোক গিয়ে বলে, কত রকমের রান্নাবান্না—বলছিলাম, তুমি কি ছুটো মুড়ি চিবিয়েই পড়ে থাকবে?

নমিতা বলে, সে-ও তো অনাচার। তোমাদের জেদে পড়ে করতে হয়। ভাতে আর মুড়িতে তফাত কতটুকু? চাল সিদ্ধ না হয়ে চাল ভাজা।

বড়বউ ভয়ে ভয়ে বলে, দিন দিন শুকিয়ে সলতে হয়ে যাচ্ছো। আয়না ধরে দেখ না তো—তা হলে টের পেতে। ভাতে মুড়িতে তফাত যদি না থাকে, ছুটি ছুটি ভাতই না হয়—

কথা শেষ হতে না দিয়ে নমিতা গর্জন করে উঠে: ছু-বেলা ভাত খাব বিধবা হয়ে? জীবনে এই হল—মরণ হয়ে পরের জন্মে ভাল থাকব, তাও হতে দেবে না তোমরা?

বড়বউ ভ্রূভঙ্গি করে বলে, ভারি আমার বিধবা রে! উনিশ বছরের এক-কোঁটা মেয়ে—আমার ভোলার চেয়েও ছু-বছরের ছোট। সাত ছেলের মা সত্তর-বছরের রাঁড়ি কতজনা মাছ-মাংস খেয়ে দফা সারছে, উনি বিধবাগিরি ফলাতে এসেছেন! রাখো ওসব।

গলা খাটো করে বলে, তোমার মেজপিসিমা মাছ খেতেন। বউ হয়ে এসে আমি নিজের চোখে দেখেছি। গুরুজনের নামে মিছে কথা বলি তো মুখে যেন আমার পোকা পড়ে।

নমিতা হাহাকার করে উঠল যেন: বোলো না বড় বউদি, তোমার পায়ে পড়ি—কানে শুনলেও মহাপাপ। যার যা খুশি করুক, মরে গেলেও আমার দ্বারা অনাচার হবে না। আবার যদি বলেছ, মুড়িও খাব না কিন্তু, ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ব।

বিরক্ত হয়ে সাহেব উঠে পড়ল। কথাবার্তা ও আহারাদি চলতে থাকুক, ততক্ষণে আর একটা চক্কোর দিয়ে আসবে। বেড়ার গায়ে বংশী একা রইল।

ধোনাই মিস্ত্রি কেষ্টদাস পাহারাদার—ধোনাই বাড়ির সীমানায় পগারের পাশে, কেষ্টদাস খানিকটা দূরে। এক সাংঘাতিক খবর বলল ধোনাই। মুখে কাপড়-ঢাকা লোক এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে এইমাত্র বাড়ি ঢুকে গেল।

চোর তাতে সন্দেহ কি! শীতকালে থানায় থানায় এখন দশধারার তোড়-জোড়। এ কাজে মুনাফা ছুদিক দিয়ে—যশ, অর্থ ছুরকমেই। চোর ছ্যাচোড় জালে ঘিরছে বলে উপরওয়ালা বাহবা দিচ্ছে, লিষ্টির নাম কাটানোর জন্য নিচের থেকেও তদ্বির আসছে। ঐ মানুষের হতে পারে, তাদেরই মতন দায়গ্রস্ত চোর একটি।

ধোনাই হতাশ ভাবে বলে, কাজ নেই, বংশীকে নিয়ে এসো সাহেব, চলে যাওয়া যাক।

সাহেব বলে, অনন্ত গাঙ্গুলির বাক্সভরা টাকা—গায়ের অর্ধেক রঙ মশার পেটে দিয়ে খালি হাতে ফিরব?

সে দুঃখ ধোনাইয়েরও। সাহেব প্রশ্ন করে, গেল কোন দিকে লোকটা?

হাত দিয়ে দিক নির্দেশ করে ধোনাই বলে, পলক ফেলতে না ফেলতে যেন বাতাস হয়ে মিলিয়ে গেল। আমাদের চেয়ে ঢের ঢের পাকা। ভালরকম খোঁজদারি ঐ কারিগরের পিছনে।

কি ভেবে সাহেব ঘর-কানাচে বংশীর কাছে যায় না, পা টিপে টিপে সেই চোরের পথে চলল।

বেড়ার গায়ে বংশী মগ্ন হয়ে আছে। নতুন-বউ মুখে না না—করে, আর গোগ্রাসে খেয়ে যায়, খাওয়া সেরে সে অনেকক্ষণ উঠে গেছে। পুরুষদেরও শেষ। অন্য বউরা খাচ্ছে এবার। নমিতা পাথরবাটিতে মুড়ি-গুড় আর নারকেল-কোরা নিয়ে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনেকখানি দূরে বসেছে।

[ওরে বাবা, কত খায় মেয়েলোকে! চটপট সেরে নাও মা-লক্ষ্মীরা। রাত পোহায়ে যায়, আমাদের কাজকর্ম কখন হবে এর পরে?]

হয় কি করে তাড়াতাড়ি! এর কথা তার কথা, এই বাড়িতেই নতুন-বউয়ের বেশরম কাণ্ডবাণ্ড। পাড়াপড়শির বিবিধ কেচ্ছাকাহিনী। মুখ তো একখানা বই নয়—সেই মুখে খাবে না রসের ঝর্ণা ঝরাবে? বিধাতার উচিত ছিল, মেয়েলোকের মাথার চতুর্দিকে গোটা পাঁচ-সাত মুখ বসিয়ে দেওয়া। তবে সামাল দিতে পারত।

আর শুদ্ধাচারিণী নমিতাসুন্দরীর ভাবখানা দেখ। মুড়ি চিবাতে চিবাতে অকৃত্রিম আনন্দ উদ্ভাসিত বদনে রসের গল্প শুনে যাচ্ছে। হঠাৎ কী যেন হল তার—গল্পের ভিতর দিয়ে অনাচার লেগে যাচ্ছে, তাই বোধহয় খেয়াল হল এতক্ষণে। দু-চার মুঠো গালে ফেলে তড়াক করে সে উঠে পড়ল। একেবারে নিজের ঘরে। ঘরে গিয়ে সশব্দে দুয়ার এঁটে দেয়। অনাচার তেড়ে এসে ধরে না ফেলে।

বংশী সেইভাবে বসে রয়েছে, হয়তো বা ভুলেই গেছে কাজের কথা। সাহেব এসেছে, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—খেয়াল করতে পারেনি। সাহেব হাত ধরে টানল তো বলে, রোসো না—

ফিসফিস করে উল্লসিত মুখে বলে, ভাল ঘরের মেয়েছেলেদের কথাবার্তা

শুনে নাও একটু। ধান ভেনে আর বাসন মেজে মেজে আমাদের মেয়েলোকের রসকষ কিছু থাকে না।

রাতদুপুরে নিরিবিলি খেতে খেতে মেয়ে-বউদের দুরন্ত আসর। ফুলহাটায় মুকুন্দ মাস্টারের আসর নয়—বউয়ের তাড়নায় কুইনিন গেলার মতো বংশী যেখানে বিরস মুখে কিছুক্ষণ বসে আসত। এ জায়গা থেকে টেনে বের করতে সাহেবকে অনেক বেগ পেতে হল।

দুপুর রাতের ঐ যে নতুন আগন্তুক—চোর না হয়ে কিন্তু পুলিসও হতে পারে। খুব সম্ভব তাই। সাহেবদের খবর কোনরকমে জানতে পেরে ওত পেতেছে। এই বাড়ি কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না আর এখন।

সাহেবকে বংশী বলে, তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে? নৌকোয় চলো।

তোমরা যেতে লাগো। ঘুমোবার জন্যে কি রাত? ঘুরে ঘুরে খানিকটা দেখেশুনে যাই।

কেষ্টদাসকে ডেকে বলে, থাকবি নাকি রে আমার সঙ্গে?

কেষ্টদাস আনন্দে গলে যায়।

অন্য দু-জন চলে গেলে কেষ্টদাসকে সাহেব ফিসফিস করে বলে, ধোনাই যেখানটা ছিল, সেইখানে চলে যা তুই। পাহারায় থাকবি। দেখি কিছু করা যায় কিনা।

রহস্যময় সাহেবের চালচলন। মনে মনে কোন এক মতলব ছকেছে। সাঁ করে সে দালানের পাশে চলে গেল। একটা জানলায় কান পাতল। অনেকক্ষণ ধরে আছে, নিশ্বাসটাও বুঝি পড়ে না। একসময় অবশেষে টিপিটিপি সরে এসে—বনতুলসির ঝাড় কতকগুলো, তার ভিতরে বসে পড়ল।

আরো কতক্ষণ কাটল। যে ঘরে সাহেব কান পেতেছিল, তারই একটা দরজা নিঃসাড়ে খুলে গেল একটুখানি। হতেই হবে—এরই জন্য সাহেব ঝোপের ভিতর অপেক্ষায় আছে। মাথায় আলোয়ান-জড়ানো মানুষটা বেরিয়ে আসে। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে অতি, সন্তর্পণে পা ফেলছে। সেই আগন্তুক—ধোনাই মিস্ত্রি এরই কথা বলছিল। আসছে এদিকেই।

হাঁটনা দেখে যে না সে-ই বলবে চোর। সাহেব টিপিটিপি পিছু নিল। সুযোগ বুঝে আচমকা এক ধাক্কা। ঝুপ করে বসে পড়ল মানুষটা—সকলের আগে দু-হাতে মুখ ঢেকেছে। হাতে সম্পূর্ণ ঢাকে না তো মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে।

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান—

ছেড়ে দাও বাবা, আর আসব না।

লক্ষ্মীবাবুকে ডেকে তুলি আগে। হাঁক দিয়ে পাড়াপড়শি জড় করি। ছেড়ে দিতে বলে তো তখন সে কথা।

জোড় করে উল্টে ফেলেছে। ফুলবাবু—কোঁচানো ধুতি, সিল্কের চুড়িদার পাঞ্জাবি, চুলে ফুলেল তেল।

কান মলছি নাক মলছি বাবা, এমন কর্ম আর হবে না। কেঁদে ফেলল মানুষটা। বলে, কে বাবা তুমি?

লক্ষ্মীবাবুর বন-কাটা মানুষ। বেলদার। বাড়িতে চোর হাঁটাহাঁটি করছে, আমায় তাই পাহারায় বসিয়েছে।

আমি চোর নই। দেখতে তো পাচ্ছ—চোরের মতো লাগে আমায়?

সাহেব বলে, সে বিচার লক্ষ্মীবাবুর কাছে। ডেকে তুলি বাবুকে। বাড়ির মানুষ পাড়ার মানুষ এসে পড়ুক—বলি, নিজের ইচ্ছেয় উঠবে, না রদ্দা মেরে তুলতে হবে?

লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবের সামনে আধুলি বের করে ধরল: পানটান খেও ভাই। আমি এবারে আসি—

দাঁতে দাঁতে রেখে সাহেব চাপা তর্জন করে: গন্ধমাদন নিয়ে তো চলেছ, আমার পানের বেলা আধুলি?

বলা নেই কওয়া নেই, লোকটার লম্বা ঝুল-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পুঁটলি বের করে ফেলল। রুমালে বাঁধা গয়না।

লোকটা ব্যাকুল হয়ে ছিনিয়ে নিতে যায়: অবলা বেওয়া মানুষের জিনিস—দায়ে পড়ে খবর পাঠিয়েছিল, বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছি। হাতের আংটি খুলে দিচ্ছি—আমার নিজের জিনিস। এই নিয়ে রেহাই দিয়ে যাও বাপধন।

ততক্ষণে অপর পকেট হাতড়ে বেরুল—নোট ভেবেছিল সাহেব, তা নয়—চিঠি একখানা। খামের চিঠি।

সাহেব বলে, অবলার প্রেমপত্তোর কখনো বুঝি পকেট-ছাড়া করো না? দলিল তোমার, কাজ হাসিলের অস্তোর—উঁ?

লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে: এ সব কি বলো তুমি?

না জেনে কি বলছি? আরও বলছি, কলকাতায় পালানোর জন্য ফুসলানি দিচ্ছ অবলা বেওয়া মানুষকে।

গলা কেঁপে যায় সাহেবের। বলল, শখ একদিন মিটে যাবে। তখন তো গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে—আদিগঙ্গায়, নয়তো বড়-গঙ্গায়।

লোকটা বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সাহেব বলছে, আড্ডির বস্তি নয়তো সোনাগাছি।

দেহে যেন দৈত্য ভর করে বসল হঠাৎ। পা ছুঁড়ে সজোরে লাথি দেয়। ছাড়া পেয়ে লোকটা কৃতকৃতার্থ, একছুটে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কী হয়েছে সাহেবের—আশার অতীত লাভ, হাতের মুঠোয় এত দামের জিনিস, তবু কেমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। কেষ্টদাসের কাছে এসেও একটি কথা বলে না, হাত ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল।

চলেছে। খালের ঘাটে ডিঙি—পা চলেছে সেইদিকে। হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, দেশলাই আছে কেষ্টদাস? ধরা দিকি।

কেষ্টদাস দেশলাই আর তুটো বিড়ি বের করল। একটা বিড়ি সাহেবের হাতে দেয়। বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে সাহেব বলে, কাঠি ধরাতে বললাম, বিড়ি কে তোর কাছে চেয়েছে?

কাঠি ধরিয়ে সেই চিঠি বের করে। প্রেমের চিঠি—পড়ার আগে জানলায় কান রেখেই সেটা বুঝে নিয়েছে। ডাকের চিঠি নয়, কারও হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল। প্রেমরসে কী পরিমাণ হাবুডুবু খেলে মেয়েলোক হয়েও এমন মরীয়া হয়ে ওঠে!

গোটা গোটা অক্ষর—সুধামুখীর ঠিক এমনি লেখার ছাঁদ। সুধামুখী প্রথম বয়সে এক লম্পটকে এমনি লিখত—হতে পারে, তুই যুগ পরে তারই একখানা হাতে এসে পড়ল। সাংঘাতিক চিঠি—অন্ধকার ঘরে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না, তখন হয়তো মিনমিন করে বলা যায়। কিন্তু ধীরেসুস্থে কলমের অক্ষরে আসে কেমন করে এই সব কথা?

আসতে পারে মাথা একেবারে যখন বিগড়ে যায়। জীবনে হঠাৎ এক এক মুহূর্ত আসে, মানুষ তখন দুরন্ত পাগল। আর যাই হোক, হাসাহাসি কিম্বা লাঠালাঠি কোরো না পাগল নিয়ে। পারো তো চোখের জল ফেলো।

তুই যেতে লাগ কেষ্টদাস। ডিঙি ছাড়বার আগেই আমি গিয়ে পড়ব।

কেষ্টদাস বলে, একলা কেন? থাকি না আমি সঙ্গে—

কথার উপরে কথা! খুব যে আস্পর্ধা এই ক'দিনের মধ্যে।

তাড়া থেকে কেষ্টদাস এতটুকু হয়ে গেল। সাহেবই তাকে সকলের বেশি টানে। কাজে নিষ্ফল হয়ে মেজাজ তার এখন বিগড়ে আছে।

আবার সাহেব গাঙ্গুলি-বাড়ি ঢুকে পড়ল। ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেয়: টুক-টুক-টুক। সে মানুষটা যখন ঘরে ঢোকে, কায়দাটা অলক্ষ্যে দেখে নিয়েছে। টুক-টুক-টুক তিনবার, একটুখানি থেমে আবার টুক-টুক-টুক—

দরজা খুলে গেল। ফিসফিস করে প্রশ্ন: ফিরে এলে যে বড়?

সাহেব আলাদা রকম গলায় বলে, তুমিই তো টেনে আনলে। পিদিমটা জ্বালো একবার দেখি—

এমনি স্বরে হুবহু এই কথাগুলোই একটু আগে হয়ে গেছে—আলো জেলে মুখটুকু দেখে নিয়ে সেই পুরুষের কণ্ঠ গদগদ হল। সাহেব জানলায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি কথা শুনেছে। কলকাতা গিয়ে একখানা ঘর নিয়ে দুয়ের অভিন্ন হয়ে থাকবার পরামর্শ। পরামর্শ পাকা হয়ে গিয়ে তারপর প্রদীপ ধরে ক'খানা গয়না রুমালে বেঁধে ফেলা কলকাতার বন্দোবস্তের জন্য। ব্যাপার দেখে তৃতীয় ব্যক্তি সাহেবের বুঝতে বাকি থাকে না, অতিশয় গভীর এই প্রেম—ছিপে মাছ ধরার মতন সেই গভীর থেকে টাকাপয়সা গয়নাগাটি দীর্ঘকাল ধরে টেনে টেনে তোলা হচ্ছে।

সাহেব বলছে, ছুটে এলাম তোমায় দেখব বলে—

আবার দেখবে কি? এতক্ষণ ধরে এই তো এত হয়ে গেল!

সোহাগে নমিতা গলে গলে যাচ্ছে। মুখ না দেখা যাক, কথার স্বরে বোঝা যায়।

দরজা খুলে বিছানার উপর নমিতা আলসে গড়িয়ে পড়েছে।

হচ্ছে গো, হচ্ছে। সবুর সয় না মোটে তোমার!

শিয়রে পিলসুজ, তোষকের নিচে দেশলাই। আলো জ্বালতে জ্বালতে নমিতা বলে, কী মানুষ রে বাবা! এই তো গেলে—ভয়ডর একটু যদি থাকে!

কথা শেষ হয় না, চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে পড়ে। মুখ ছাইয়ের মতো সাদা। ছোরা উঁচিয়ে ডাকাত গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। আলো পড়ে ছোরা চকচক করে উঠল।

ভয় সাহেবেরও। সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে, আলনা থেকে চাদর তুলে নমিতার উপর ছুঁড়ে দেয়ঃ গায়ে দাও আগে। একটি শব্দ করেছ কি কুচ করে মুণ্ড কেটে নিয়ে চলে যাব। এই কর্ম অনেক করা আছে। তুমি তো পুঁচকে মেয়েমানুষ, কত কত জোয়ানমরদ সাবাড় করেছি।

নমিতা কেঁদে পড়েঃ ধর্মবাপ তুমি আমার—

সন্তানের মরশুম পড়ে গেছে আজকের যাত্রায়। ঐ লোকটাও বাপ বলেছিল, 'বাবা—' বলে দে ছুট। ছেলে আর মেয়ে—কী গুণেরই সন্তান দুটি! নমিতা আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, সাহেব তাড়া দিলঃ চোপ! কি আছে তোমার, বের করে দাও—

কিছু নেই। মিছে কথা বলছি নে। বাক্সর চাবি দিচ্ছি, খুলে দেখ। আড়াই টাকা কি এগারো সিকে আছে কৌটোর মধ্যে। নিয়ে যাও সমস্ত, নিয়ে চলে যাও।

গয়নাপত্তোর ?

বিধবা মানুষের গয়না কী থাকবে বাবা। চাবি দিয়েছি—সত্যি কি মিথ্যে, দেখ খুঁজে তন্নতন্ন করে।

খোঁজাখুঁজি কি—গোটা বাক্স উপুড় করে জিনিসপত্র ঢেলে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিছু পুরানো কাপড়চোপড় ছাড়া সত্যিই নেই আর কিছু।

সাহেব ফিকফিক করে হাসে, কী দুষ্টামিতে পেয়ে গেল হঠাৎ। বলে, মাল না থাক, মানুষটা তুমি রয়েছ খাটখানা জুড়ে। পুণ্যের শরীর, আচারবিচার নিয়ে আছ—

বাক্সের জিনিসপত্র পায়ে ঠেলে দিয়ে সত্যি সত্যি সে আলুথালু নমিতার দিকে এগোয়: দেখ তাকিয়ে একবার। চেহারাখানা পছন্দর নয়—বলো না গো!

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নমিতা। সাহেব দাঁড়িয়ে পড়ে কঠিন কণ্ঠে বলল, তা বটে, সেয়ানা চোর সে জিনিসও নিয়ে নিয়েছে—কিচ্ছু ফেলে যায়নি। রজনীকান্ত নয় সে জন—প্রাণকান্ত।

চিঠির উপরে নাম পেয়ে গেছে, সেই নাম বলল। রাগে রাগে সেই চিঠি ও গয়নার পুঁটুলি তুলে ধরে দেখায়: তোমার রজনীকান্ত দিয়ে গেছে—

সেই মুহূর্তে এক কাণ্ড। নমিতা উঠে পড়ে যেন উন্মাদ হয়ে সাহেবের পা ধরতে যায়। থরথর করে কাঁপছে। বড় বড় দুটো চোখে ধারা গড়ায়।

দিয়ে দাও ধর্মবাপ আমার। গয়না না দেবে তো চিঠিটা আমায় দাও।

ততক্ষণে সাহেব উধাও। বাড়ির বাইরে অনেকটা দূর চলে গেছে। থমকে দাঁড়াল হঠাৎ—দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবে। নমিতার কান্নার চেহারা চোখের উপরে ভাসছে। দুশ্চারিণীর স্বল্পাবরণ দেহটার উপর কেমন যেন সুধামুখীর ছায়া পড়েছে। মায়ে-খেদানো সাহেবের মা হয়ে যে সুধামুখী একদিন নদীর কাদা থেকে বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়েছিল। নমিতার মধ্যে সেই মা-সুধামুখী।

পায়ে পায়ে ফিরে চলল আবার গাঙ্গুলিবাড়ি। কেষ্টদাসকে সরিয়ে দিয়েছে—দরজায় টোকা দিয়ে বেকুব হয় না কি হয়, কায়দাটা আগেভাগে দেখাতে চায়নি। সরে গিয়েছে ভাগ্যিস, নয়তো এই গয়নার পুঁটলি ফেরত দেওয়া চাউর হয়ে যেত, দলের মধ্যে নিন্দেমন্দ ও ঝগড়াঝাটি হত। ফেরত দিতে যাচ্ছে নমিতার ঘরে নয়, অনন্ত গাঙ্গুলি যে ঘরে শুয়েছে সেখানে—বন্ধ দরজার চৌকাঠের উপর। পুঁটলি রাখল, আর ঐ চিঠি। উড়েটুড়ে যাবে সেই শঙ্কায় ইটের টুকরো চাপা দিয়ে দিল চিঠির উপর। সকালবেলা অনন্ত দোর খুলে বাইরে এসে দেখতে পাবে—পড়বে চিঠি খুলে, বিমুগ্ধ হতভাগী মেয়েটার সামান্য সম্বল গয়না ক'খানা খুলেপেড়ে রাখবে। তারপরে চুলের মুঠো ধরে নিয়ে গিয়ে খুলনার

হাসপাতালে নার্সগিরিতে ঢোকাবে। এবং রজনীকান্তের খোঁজ করে উত্তম-মধ্যম দেবে। হোক না হোক, ভাবতে দোষ কিসের? দামি মাল মুঠোয় পেয়ে বোকার মত ফেলে দিয়ে গেলাম—কিন্তু নতুন একটা সুধামুখী আশাভঙ্গ হয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল, তার মজাটাই বা মন্দ কি! ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একটা সুধামুখী তবু কম হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে জুড়নপুরের আশালতার গয়নায় দশধারার দায় মিটে যাবার পর বংশীর কাছে চুপি চুপি সাহেব এই দিনের গল্প করেছিল। বেহিসাবি দুঃসাহসিক কাজ—যে মুরুব্বির কানে যাবে শতকণ্ঠে তিনি ধিক ধিক করবেন। মানা রয়েছে: নষ্ট মেয়েমানুষ যে-বাড়ি এবং লুচ্চো পুরুষের যেখানে আনাগোনা, কদাপি সেখানে যাবে না। হীরেমাণিক পড়ে থাকলেও না। সাহেব ঢুকল কিনা সেই লম্পটের ভেক ধরে। রঙ্গরসিকতাও হল—

সাহেব দুঃখ করে বলছে, দু-মুখো সাপ দেখেছ বংশী, মানুষও তেমনি সব দু-মুখো। বাইরে দেখতে একটা মুখ, পেটে পেটে দুটো। অনাচারের ভয়ে শহরে নার্স হতে যাবে না, আসল কারণ বৃন্দাবন-লীলায় তা হলে ভণ্ডুল ঘটে যায়। লীলাটা নির্ঝঞ্ঝাটে জমবে বলেই কলকাতা পালাচ্ছে। তাই দেখ, এক গলার নলি দিয়ে কেমন দু-রকম কথা বেরোয়। রান্নাঘরে ভাই-ভাজদের সঙ্গে একরকম, শোবার ঘরে পিরীতের জনের সঙ্গে অন্য। এক মুখওয়ালা দেখলাম কাজলীবালা একটি, শুনেছি বলাধিকারীর ব্রাহ্মণী ছেলের আর একজন। ক'জন এমন আছেন, আঙুলে গণা যায়। ওঁরা নিতান্তই একা—একঘরে হয়ে থেকে সারাজীবন দুঃখই পেয়ে যান।

সমস্ত শুনে বংশীও দোষ দেয়: শেষরক্ষা যখন করেছিলে নিয়মকানুনের কথা আমি ধরব না। কিন্তু চোর হয়ে তুমি যে পুলিশের কাজ করলে সাহেব। গাঙ্গুলিবাড়ির জবর চোরটাকে ধরিয়ে দিয়ে এলে।

বংশী বলে কি—যে শুনবে সেই-ই বলবে এমনি। চোরের কুলের কলঙ্ক। পুলিশের কাজ যদি বলতে হয়, এই একবারে তার শেষ নয়। কতবার হয়েছে জীবনে। আপনা-আপনি কেমন হয়ে যায়—জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোমানুষি মনের মধ্যে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, চেষ্টা করেও সাহেব রোধ করতে পারে না। একবার তো রীতিমতো রোমহর্ষক কাণ্ড—কুমির-চোর ধরা। পুলিশের বাপের সাধ্য ছিল না, সাহেব গিয়ে পড়ে সেই চোর ধরল।

উনিশ

চোরের কাজ নিশাকালে। নিশির কুটুম তাই বলে। দিনমানে যারা করে, তারা চোর নয়, ছিঁচকে। চোরের সমাজে অন্ত্যজ। দায়ে পড়ে এবারে এদের বাছ-বিচার নেই। দিন চলে যাচ্ছে—দারোগার দাবী না মেটালে জুড়ে দেবে দশধারায়। একবার জড়িয়ে পড়লে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। দারোগা তখন নিজে কোমর বেঁধে লাগলেও সহজ হবে না।

যত দিন যায় মরীয়া হয়ে উঠছে ততই। এক দুপুরে দেখা যায়, ধোনাই মিস্ত্রি নদীর কূল ধরে ছুটতে ছুটতে আসছে। হাত তুলে ডিঙি থামিয়ে কাদা-জল ভেঙে সে উঠে পড়ল। খবর আছে, খবর আছে! কলাবুনিয়ায় ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি। কুণ্ডুমশায় ধনী-মানী গৃহস্থ। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার—রাবণের গোষ্ঠীবিশেষ। অবস্থা ভাল হলেও বাড়িতে দালানকোঠার হাঙ্গামা নেই, মেটেঘর। কতদিকে কত ঘর, গণে পারা যাবে না। গোলকধাঁধাঁ বিশেষ। রাত্রিবেলা কাজকর্মের নিয়ম, কিন্তু সে নিয়ম এ বাড়ি চলবে না। যা-কিছু দিনমানে। জোয়ান-পুরুষ জন কুড়িক অন্তত, সবাই এখন ভুঁইক্ষেতের কাজে বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় ফিরবে। এক কুড়ি দৈত্যসম মানুষ ঘরে আর দাওয়ায় পড়ে ভোঁস ভোঁস করে কামারের হাপরের মতো নিশ্বাস ছাড়ছে—আওয়াজ কানে শুনেই চোরের হৃৎকম্প লাগে, কাজকর্ম হবে কেমন করে সেই অবস্থায়? ফিরে পালাবে সেই উপায়ও নেই, গোলকধাঁধাঁর মতো অন্ধকার আনাচে-কানাচে শতেক বার পাক খেয়ে মরবে। অতএব যা-কিছু সেরে ফেলতে হবে সূর্যিঠাকুর পাটে বসবার আগে, মরদেরা ঘরে না ফিরতে। কি করবে দেখ এবার সকলে ভেবেচিন্তে বিচার-বিবেচনা করে। সাহেব, তুমিই তো একটা দিনমানের খবর চেয়েছিল—খবর নিয়ে তাই আমি ছুটতে ছুটতে আসছি।

সাহেব বলে, শুনতে পেলি, ওরে কেষ্টদাস?

গোপীযন্ত্র হাতে কেষ্টদাস সঙ্গে সঙ্গে ছাইয়ের নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। কণ্ঠী এনেছে মুঠোয় করে, সাহেব তার গলায় বেড় দিয়ে বেঁধে দেয়। নৌকোয় বসে বসে দুজনে রকমারি মতলব করে, তারই একটা খাটিয়ে দেখবে এখন।

ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি ঢুকে বোষ্টমঠাকুর তান ছাড়ল: হরি বলো মনরসনা—ওরে তুই বাঁচবি ক'দিন? ভিক্ষে পাই চাট্টি মা-ঠাকরুন—

ঠাকুরদাসের স্ত্রী বড়াগায় রে-রে করে ওঠেন : বাড়িতে অসুখবিসুখ, ভিক্ষে দেওয়া যাবে না বাবাঠাকুর। ভিক্ষে দেয় লোকে সকালবেলা, সন্ধ্যেয় এসে ভিক্ষে চায় এমন তো শুনিনি রে বাবা। এই দেখ, ম্যাচ-ম্যাচ করে একেবারে তুলসিতলায় এসেছে। ওরে ভোলা—

মাহিন্দার ডাকছেন হাঁকিয়ে দেবার জন্যে। নিরুদ্বিগ্ন কেষ্টদাস ততক্ষণে তুলসিমঞ্চের সামনে নিকানো আঙিনার উপর বসে পড়ে গোপীযন্ত্রে গাবগুবাগুব আওয়াজ তুলে চক্ষু বুঁজে পদাবলী-কীর্তন ধরল একখানা। আহা-মরি গলাখানা, প্রাণ কেড়ে নেয়।

কোথায় সন্ধ্যা, বিকালবেলা সবে এখন। গিন্নিবান্নি বউমেয়ে ছেলেপুলে যে যেখানে ছিল একে-দুয়ে এনে জুটছে। গা ধোওয়া, জল আনা, গরুর ফ্যান দেওয়া, বাসন-মাজা, বাচ্চাদের খাওয়ানো-ধোয়ানো—এসময়কার যাবতীয় কাজ বন্ধ। সুরের লহরী খেলে যাচ্ছে কিশোর বাবাজীর কণ্ঠে। পর পর তিনখানা হয়ে গেল—গোষ্ঠলীলা, মানভঞ্জন আর রাই-উন্মাদিনী—ফরমাস তবু থামে না : আর একখানা হোক বাবাজী।

বড়গিন্নিই এখন সকলকে সামলাচ্ছেন : হবে বই কি, আবার হবে। জিরোতে দে একটুখানি তোরা। সেবা কিছু হবে না বাবাঠাকুর ? বাবাঠাকুর না বলে বাছাঠাকুর বলতে ইচ্ছে করে। খই-চিঁড়ে-নারকোলসন্দেশ আছে—দেবো ?

বাবাজি কেষ্টদাস ঘাড় নাড়ে : দিনমানে একহারী মা-ঠাকরুন। ঠাকুর কিছু মুখে ঠেকাব। আমি বলি, আজেবাজে খেয়ে ক্ষিধে মারব না—যদি দুটো চাল ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে দেন।

বড়গিন্নি লুফে নিয়ে বলেন, তাই হবে গো বাবা। ভাত, ডাল আর একখানা তরকারি। শেষ পাতে একটু গব্যও দিতে পারব—ঘরের গাইয়ের দুধ, গাছের সবরিকলা, ছাঁচবাতাসা—

অত হাঙ্গামায় কে যাচ্ছে মা-জননী ? গরিব মানুষ—দু-বেলা চাট্টি আলুনি ভাত জুটলে বর্তে যাই—

বড়গিন্নি নাছোড়বান্দা : অন্যখানে কি খাও বাবাজী, সে আমরা দেখতে যাইনে। গৃহস্থবাড়ির উপর আধ-উপোসি পড়ে থাকতে কেন দেবো ?

সে যা হয় হবে—সন্ধ্যেটা আগে পার হয়ে যাক। গানও হবে, অনেক হবে। বিশ্রামের মধ্যে কেষ্টদাস ইতিমধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছে। নিজের কথা। হাটে এসে এক বৈরাগীর আখড়ায় গানে মজে গিয়েছিল। গানে বসলে আর হুঁশ থাকে না। সঙ্গীরা খুঁজেপেতে না পেয়ে নৌকা ছেড়ে চলে গেছে। হেঁটে হেঁটে ঘরে ফিরছে সে এখন। পয়সাকড়ি শূন্য, তা বলে ভাবনার কি ! রাধাবল্লভের

সংসার—মুখে ছুটি অন্ন, রাতের একটু আশ্রয় তিনিই জুটিয়ে দেবেন। না হয় না-ই দিলেন—গাছের তলায় নামগানে বসব, কোন দিক দিয়ে রাত পোহায়ে যাবে টেরই পাবো না।

হতে হতে অনেক পুরানো কথা—পথে-ঘাটে দিন কাটানো ও রাত পোহানোর নানান বিচিত্র কাহিনী। গানের গলা শুধু নয়, গল্প বাঁধাতেও জানে বটে কেষ্টদাস। গল্প করে, আর সতর্ক চোখে বারম্বার ঠাহর করে দেখে, বাড়ির সকলে এসে জুটেছে তো এই জায়গায়—একটা কেউ ছিটকে পড়ে নেই কোনদিকে? টেনে রাখতে হবে আরও খানিকক্ষণ। গল্পে হোক, গানে হোক, হাতে দড়ি পড়ার মতো আবদ্ধ হয়ে থাকবে এখানটা। শুনছে সকলে তাজ্জব হয়ে। কেষ্টদাস দেখে নিয়েছে, সাঁ করে একজন অনতিদূরের চৌকিঘরে ঢুকে পড়ল। কে আবার—সাহেব ছাড়া অন্য কেউ নয়।

কুটোগাছটা নড়লে যে আওয়াজ, সাহেবের চলাচলে সেটুকু নেই। পা ফেলে চলে না, মাটির গায়ে যেন ভেসে ভেসে বেড়ায়। সিঁধের কাজে নারাজ এবারের যাত্রায়। বলে, ওস্তাদ যা হাতে তুলে দিয়েছ, সে জিনিস কি আদাড়ে-আস্তাকুড়ে বের করব? তার জন্যে চাই ভাল ক্ষেত্র, উত্তম বন্দোবস্ত। এখানে বিনা সরঞ্জামে যদ্দুর যা হাতড়ে নেওয়া যায়।

সেই মতলব নিয়ে এসেছে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর বাড়ি।

চৌরিঘরে ঢুকে গিয়ে সাহেব পিছন-দরজা খুলে দিল। ক্ষিপ্র হাতে কাজ চলছে। গল্পের জোর আলগা হয়ে আসে বুঝে দরাজ গলায় গান জুড়ল আবার নিমাই-সন্ন্যাস। বড় মোক্ষম পালা। শচীমাতার দুঃখে চোখের জলে ভাসবে না, এতদূর পাষাণহৃদয় অন্তত স্ত্রীলোকের মধ্যে নেই।

গান শেষ করে পশ্চিম-আকাশে মুখ তুলে কেষ্টদাস বলে, এইবারে মা-ঠাকরুনরা একটিবার ছেড়ে দেবেন। পুকুরঘাটে হাত-পা ধুয়ে জপটা সেরে আসি। এসে উনুন ধরাব। ভালই হল। কর্তারা সব এর মধ্যে এসে যাবেন। নামগান তাঁরাও শুনবেন দু-একখানা।

পুকুরঘাটের নাম করে কেষ্টদাস ছুটতে ছুটতে নৌকোয় এসে বলে, কষে বাও এবারে। গান গেয়ে গল্প করে বিস্তর খাটনি খেটে এসেছে, তা বলে উত্তেজনার মুখে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকতে পারে না। গোপীযন্ত্র ফেলে নিজেও বোঠে তুলে নিল। যা কিছু লভ্য হল, নিয়েথুয়ে দৌড় দাও এবারে। নৌকো নিয়ে দৌড়।

খান দুই বাঁক পার হয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত কেষ্টদাস বলে, পড়ল কিছু জালে?

সবাই নিজেদের লোক, ঠারেঠোরে বলবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, সহজ ভাবের কথা মুখে আসে না। বলছে, মাছটাছ হল কিছু?

সাহেবের সঙ্গে ডেপুটি ছিল বংশী, পাহারাদার ধোনাই। রামদাস নৌকোর পাহারায় ছিল। গুরুপদ নেই, থাকবার কথাও নয়, ওপারের দিকটা খোঁজদারি করে বেড়াচ্ছে। বংশীই ঘাড় কাত করে কেষ্টদাসের কথার জবাব দেয়ঃ হ্যাঁ—

সাহেব দেমাক করে বলে, পানা তুলে পুকুর তুই সাফসাফাই করে দিলি, আমি লোকটা খেওন ফেললাম, মাছ হবে না কি রকম!

তার মানে, বিস্তর জায়গায় বেকুব হয়ে এসে এইবারটা হয়েছে। পুলকিত কেষ্টদাস প্রশ্ন করে, রুই-কাতলা?

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, মনে তো লয় তাই—

সাহেব বলে, রুই হোক, কাতলা হোক, একটাই। একের বেশি দুই নয়। পাটার চালি উঁচু করে দেখ্।

দেখে নেয় কেষ্টদাস বস্তুটা। মাঝারি সাইজের কাঠের বাক্স—তিন জায়গায় তালা ঝুলছে। খোলা সহজ হবে না, ভাঙতে হবে।

বংশী বলে, কাপড়চোপড় বাসনকোসন আরও কত কি ছিল, সেসব আমরা ছুঁতে যাইনি। এই এক জিনিস বয়ে আনতেই তিন তিনটে মরদ হিমসিম খেয়ে গেলাম—অন্য দিকে চোখ মেলে কি করব?

বাক্সের ভিতরটা না দেখা পর্যন্ত মনে কারো সোয়াস্তি নেই। কিন্তু আপাতত হয়ে উঠছে না। কাটাখালির মুখে সন্ধ্যার পর ডিঙি বেঁধে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—গুরুপদ ওপারের খবরাখবর নিয়ে এসে গেছে সেখানে এতক্ষণ। পথের মাঝে এই কাজটা পড়ে দেরি করিয়ে দিল। তাড়িয়ে চলো ভাইসব দেরি হয়ে গেছে। গুরুপদকে তুলে নিয়ে তারপর কোন নিরালা ঠাঁই খুঁজে তবে বাক্স খোলা।

বাঁক ঘুরে যেতে জোর পিঠেন বাতাস। গাঙেও টান খুব। বড় আরামের যাওয়া এবারে—বোঠে জলের উপর ছুঁয়ে আছে, তরতর করে ডিঙি ছুটছে। নিম্ন কণ্ঠে গল্পগুজব করে সকলে, তামাক খায়। মনের স্ফূর্তিতে নাচতে ইচ্ছে করে।

বাক্সের ভিতরে কি, ধোনাই আর বংশীতে তাই নিয়ে তর্ক। ধোনাই বলে, লোহালক্কড়—কুড়াল-কোদাল, দা-বঁটি। ঐটুকু এক বাক্স আনতে জীবন বেরিয়ে গেছে। লোহা ছাড়া এমন হয় না।

বংশী বলে, পাথরের জিনিস নয় কেন? শিল-নোড়া, জাঁতা—

সাহেবের কানে পড়তে সে ধমক দিয়ে উঠলঃ আচ্ছা ছোট মন তোমাদের! আন্দাজই যখন, সোনদোনা মনে আসে না কেন? লোহা বলো, পাথর বলো সোনার চেয়ে ভারী কি আছে?

রামদাস তামাক খাচ্ছিল। হুকো থেকে মুখ তুলে বলে, তিন তিনটে তালা লাগিয়েছে—ঠিকই তো, পাথর-লোহা তালা দিয়ে রাখতে যাবে কেন? বাক্স সোনায় ভরা, খোলা হলে তখন দেখবে।

সাহেব হেসে আরও একপদ চড়িয়ে দেয়: শুধু সোনা কেন, সেই সঙ্গে মণি-মুক্তো থাকতে দোষ কি?

বংশী বলে, দারোগা মুন্সি জমাদার সকলকে একবাঁট দু-বাঁট করে সোনা দিয়ে দেবো। দিয়ে খত লিখিয়ে নেবো, কারো নামে কোনদিন দশধারা মামলা না গাঁথে। থানাওয়ালাদের খুশি করে তারপর নিজেরা এক একতাল হাতে নিয়ে বাড়ি গিয়ে উঠব। ইহজন্মে আর কাঠি ছোঁব না। উঠানের বাইরেই যাব না মোটে, ছেলে কাঁধে করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াব।

মহানন্দে আগডুম-বাগডুম বকে চলেছে। রামদাস হুঁকো এগিয়ে ধরে বংশীর দিকে: তামাক খাও বংশী

বংশী হাতও বাড়িয়েছে নেবার জন্য। ঠকাস করে হুঁকো-কলকে পড়ে যায়. আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তামাক মাথায় উঠে গেছে এখন—কালো একটা রেখা ছুটে আসছে না? দেখ তো, দেখ দিকি ঠাহর করে—ধনুক থেকে যেন তীর ছুঁড়ে দিয়েছে, এমনি বেগে আসছে। কাঁপা গলায় বংশী বলে, দেখ না—ঐ দেখ—

ধোনাই মিস্ত্রি বলে, গাঙের উপর সোজাসুজি বেয়ে পারা যাবে না, ধরে ফেলবে এক্ষুনি—

হতে পারে ঠাকুরদাস কুণ্ডুর লোক। অথবা পিটেল। পেট্রোল-পুলিশ নৌকো এবং মোটরলঞ্চ নিয়ে জলপথ পাহারা দিয়ে বেড়ায়—চলতি নাম পিটেল। ফাঁকা নদীতে পিটেলের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু দূরে সরু খাল একটা নজরে আসে। খালে ঢুকে পড়ে গা-ঢাকা দেওয়া—সেই একমাত্র উপায়। নতুন আমদানি হলেও কেষ্টদাসের এমন কিছু নয়—কিন্তু রামদাসের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তারও চেয়ে বেশি বংশীর। বমাল সমেত পেয়ে গেলে কত বছর ঠেসে দেবে, ঠিকঠিকানা নেই। বউকে বলে এসেছে কুটুমবাড়ি চললাম—এখন যে কুটুম্বর বাড়ি পাকাপাকি ঘরবসতের গতিক। আবার যেদিন বাড়ি যাবে, বাচ্চা ছেলে বড় হয়ে গেছে তখন। বাপ বলে চিনবে না। পরিচয় দিলে তখনও চোর বাপকে চিনতে চাইবে না।

এত কথা লহমার মধ্যে মনে খেলে যায়। সেই পিছনের বস্তুটা জলের উপর একটা কালো কৌটার মতো দেখাচ্ছিল—এইবারে পুরোপুরি নৌকো

হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছিপ-নৌকো—বাইচ খেলায় যে বস্তু নামায়। বাতাসের আগে চলে। একটি লহমা—খালের মধ্যে ঢুকে পড়তে যেটুকু দেরি। হতে পারে, ছিপনৌকো তাদের ঠাহর করতে পারেনি, যেমন আসছে সোজা গাঙ ধরে বেরিয়ে যাবে। আশা করা যাক এমনি—আশা একটা তো চাই।

খালে ঢুকতে গিয়ে—কী সর্বনাশ! দুই প্রকাণ্ড ভাউলে-নৌকো দুই দিকে বেঁধে রেখেছে। জল-পুলিশের এই কায়দা—বাহিরে-গাঙে তাড়া করে খালে এনে ঢোকায়। ডিঙি যেই মাত্র ঢুকে যাবে, দুদিকেই দুই ভাউলে আড়াআড়ি হয়ে সরু খালের মুখে আটকাবে। বনের হাতি তাড়িয়ে-তুড়িয়ে খেদায় ঢুকিয়ে যেমন মুখ আটকে দেয়। এমনিতরো কাজে মার্কামারা সরকারি সাদা-বোটের কদাচিৎ ব্যবহার। বুঝতে পেরে মানুষ তো সতর্ক হয়ে যাবে। সাধারণ নৌকো ভাড়া করে পিটেল ওত পেতে থাকে, যেমন এই ভাউলে দুটো। পিছু নেয়—সে-ও সাধারণ নৌকো ছুটিয়ে। যেমন ঐ ছিপনৌকো। মাঝিমাল্লার সাজে যারা রয়েছে, জাঁদরেল পুলিশের লোক তারা। লোক-দেখানো দাঁড় টানে হাল বায়, পাশে গুলি-ভরা বন্দুক। দরকার হলে মুহূর্তে নিজমূর্তি নিয়ে হুঙ্কার ছেড়ে উঠবে।

চোখাচোখি নিজেদের মধ্যে। মতলব ঠিক হয়ে গেছে। ছুটছিল ডিঙি, গতি থামিয়ে দিল। বোটে সবগুলো জলের উপর তুলে ধরেছে—নৌকো চলে কি না চলে। কাড়ালের দিকে ছইয়ের অন্তরালে বাক্সটা তুলে ধরে নামিয়ে দিল গহিন গাঙের জলে।

বমাল লোপাট—আর এখন কি করতে পারিস? বংশী আর ধোনাই মিস্ত্রি দাগি দুটো লোক আছে বটে ডিঙিতে—কিন্তু তাদের কি অন্য কাজকর্ম থাকতে নেই? হাটবাজারে কিংবা আত্মীয়-কুটুম্বর গাঁয়ে যেতে পারে না? ঠিক করাই তো আছে—ধান কাটতে গিয়েছিলাম দক্ষিণের নাবালে; কাজকর্ম শেষ, হেলতে দুলতে এবার ঘরে ফিরছি। লেজা-সড়কির কথা যদি বলো—বাঘকুমিরের মুখে পড়ি না চোরডাকাতের হাতে পড়ি, আপদবিপদের জন্য রাখতে হয় দু-একখানা। সবাই রাখে।

খালে না ঢুকে বড়-গাঙ ধরেই চলল। বমাল ফেলে হালকা হয়েছে, আর এখন কিসের ভয়? পিছনের ছিপ ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে, সাহেব একনজরে সেদিকে তাকিয়ে। কান খাড়া।

বাক্সর শোক ধোনাই ভুলতে পারছে না। নৌকোয় নামানোর সময় হাত ছেঁচে গিয়েছে, ফুলে উঠেছে কড়া আঙুল। একবার সে আঙুলের দিকে তাকায়, একবার অতল জলের দিকে। আর বিড়বিড় করে কেষ্টদাসের সঙ্গে

দুঃখ করে। এমনি সময় সাহেব বংশীকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, শোন দিকি ভাল করে। কি শুনতে পাও ?

মনে হয় বটে, ছিপের মানুষ কাছাকাছি হয়ে বোঠে মারার কায়দা বদলেছে। বোঠের মুখে যেন কথা বলতে চায়—যার নাম চোরসংজ্ঞা। ঠিকমতো হচ্ছে না। হতে পারে কাঁচা-হাতের চেষ্টা।

বংশীর এক বাচ্চা মারা গেলে চিন্তায় পুড়িয়ে গাঙের জলে দিয়েছিল। আজকের এই বাক্স-বিসর্জনের ব্যাপারটা সেদিনের মতোই সে নিঃশব্দে চোখ মেলে দেখেছে। এতক্ষণে হায়-হায় করে উঠল : মিছামিছি গেল জিনিসটা। ভাল করে চেয়ে দেখলে না, পাগল হয়ে উঠলে যেন তোমরা।

ধোনাই বলে উঠল, সোনা বেচে পয়সার পাহাড় হত রে! গোলায় যদি রাখতাম, গোলা ভরতি হয়ে যেত। অ্যাঁ, কেষ্টদাস ?

কেষ্টদাসকে সালিশ মানল। বাক্স ফেলার প্রধান উদ্যোগী সাহেব—তার দিকে কেষ্টদাস একবার তাকায়। লজ্জা পেয়ে হাসছে সাহেব মৃদু মৃদু। কেষ্টদাস উল্টো কথা বলে : সোনা না ঘোড়ার ডিম ! অতগুলো বউয়ের কারো গায়ে সোনার গয়না দেখতে পেলাম না। সোনা কখনো কুণ্ডুরা চোখে দেখেছে ! শিলনোড়া দা-কুড়ুল এই সব। বাক্স খুলে দেখে আমরাই তো ফেলে দিতাম, একটু আগে না হয় ফেলা হয়ে গেছে।

ধোনাই গরম হয়ে বলে, কী করে বুঝলি তুই ? শিলনোড়া বয়ে আনতে গেছি—আমাদের কোন আন্দাজ নেই, আমরা বোকা ?

কেষ্টদাস হেসে উঠে বলে, এইরকম তুমিও বুঝে রাখ না। মন ঠাণ্ডা হবে।

ছিপ আরও কাছে এসে গেছে। এখন আর সন্দেহমাত্র নেই। সাহেব প্রবোধ দিয়ে বলে, মুশড়ে গেলে যে তোমরা! রাজার ভাণ্ডার একটা, চোরের ভাণ্ডার রাজ্য জুড়ে। বাক্স গেছে, সিন্দুক এসে পড়বে দেখো। ধনসম্পত্তি যতদিন লোকের ঘরে আছে, আমাদেরও আছে। শুধু এনে ফেলার অপেক্ষা।

বংশীর পিঠে এক থাবা ঝেড়ে দিয়ে চাঙ্গা করে : বেরিয়েছি যখন, তোমার দশধারা ঠেকাবোই। গুরুর দেওয়া সরঞ্জাম আমার গায়ে, সেই জিনিস ছুঁয়ে কিরে করছি। কালনাগ-সাপের মাথার মণি যদি খুলে আনতে হয়, তাই নিয়ে আসব তোমার কাজে।

যে কথা বলল, সত্যি সত্যি করেও ছিল তাই। সদ্য বিয়ের বউ আশালতার গায়ের কাছে শুয়ে একটা-একটা করে গয়না খুলে আনল। মন্ত্র পড়ে কালনাগের মাথার মণি নিয়ে আসা এর চেয়ে কঠিন কিছু নয়।

ছিপ এখন একেবারে কাছে। হঠাৎ সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে ওঠে: কারা যাও তোমরা? মুখ ঘুরিয়ে মুচকি হেসে বলে, মজা করি একটু।

ছিপনৌকো থেকে মিনমিনে গলার জবাব আসে: ব্যাপারি—

কোন্ জায়গার ব্যাপারি? কি নাম? কিসের বাণিজ্য? সারবন্দি খাড়া হয়ে সব দাঁড়াও।

ডিঙির সাঙাতদের ফিসফিস করে বলে, ওরা চোর—আমরাই যেন পিটেল-পুলিশ। ছদ্মবেশ ধরে যাচ্ছি।

ছিপ নৌকোর বাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। শলাপরামর্শ করছে ওরা নিজেদের মধ্যে। হুকুম-মাফিক কেউ উঠে দাঁড়ায় না।

চাপা গলায় বংশী তর্জন করে: অবাক কাণ্ড, এই সময়টা রঙ্গরস লাগল তোমার! এত বড় লোকসানও মান লাগে না, কী মানুষ তুমি বলো দিকি—যোগীঋষি না কাঠপাথর?

সাহেব একমুখ হাসি নিয়ে ছিপের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার দেয়: হল কি তোমাদের, কথা কানে যায় না বুঝি?

দাঁড়িয়ে পড়ত তারা ঠিকই, কিন্তু বংশী মজাটা পুরোপুরি হতে দিল না। এ রকম হাসিমস্করা বড় বিপজ্জনক। তুমি আজ করলে, ওরাও কোনদিন অন্য কারো সঙ্গে করবে। রীতিনিয়ম তো উঠে যাবে এমনি হলে। তাড়াতাড়ি বোঠে তুলে নিয়ে বংশী জলে বাড়ি দেয়। গাবতলির হাটের নিচে সাহেবের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে যেমন করেছিল। এ কাজে বংশীর জুড়ি নেই।

বাড়ির পর বাড়ি। টেলিগ্রাম-যন্ত্রের টরে-টক্কার মধ্যে কথা—জলে বোঠে মেরে মাচ্ছিমাল্লাও তেমনি কথার চালান দেয়। ঝিমিয়ে-পড়া ছিপ মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠল। তরতর করে ডিঙির পাশে এসে গায়ে গায়ে লাগায়। পরিচয় হয়ে গেল, ভাইয়ে ভাইয়ে একেবারে গলাগলি এখন।

নিতান্ত উপমার কথাও নয়। বংশী আর চাঁদমিঞা একই দলে কাজ করে এসেছে। গোড়ার দিকে চাঁদমিঞার রাগ যে না হয়েছিল এমন নয়। পুরানো সাঙাত পেয়ে ভুলে গেল। পান-তামাকের লেনদের এ-নৌকোয় ও-নৌকোয়। দশরকম সুখ-দুঃখের কথাবার্তা। খালের মুখের জোড়া-ভাউলের বৃত্তান্তও চাঁদমিঞার কাছে পাওয়া গেল। ব্যাপারি-নৌকো সত্যি সত্যি। হাটে হাটে মাল গস্ত করে বেড়াচ্ছে। পরশুদিন গাবতলির হাট থেকে-চাঁদমিঞা নজর ধরে আছে, ফাঁকায় পেলে একটু মোচড় দিয়ে দেখবে। কিন্তু হল না, হবার উপায় নেই—

ফোঁস করে নিশ্বাস ছেড়ে চাঁদমিঞা বলে, এই আজ বিকেলেই পিটেলের নৌকো দেখলাম। ওরা এবার বড্ড লেগেছে। পুলিসের দিকে এক চোখ এক

কান আর মক্কেলের দিকে একচোখ এক কান—ভাগাভাগি করে কাজকর্ম হয় কখনো? দূর, দূর! কারিগর না হতে গিয়ে পুলিস হতাম, অনেক ছিল ভাল। অনেক বেশি রোজগার।

একটা গাঙের মুখে এসে চাঁদমিঞা ডাইনে ঘুরল। এরা ছুটেছে কাটাখালি মুখো।

কাটাখালিতে গুরুপদ সেই সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষায় আছে। কাজের কিছু নয় মক্কেলের খবরাখবর নেই, শুধু-শুধু হয়রানি। তার উপরে হোঁচট খেয়ে সে ভুঁইয়ের আল থেকে কাঁটাবনে পড়েছিল, গণ্ডা দশেক কাঁটা ফুটে আছে পায়ে। মন মেজাজ তিরিক্ষি। বাক্স ফেলার বৃত্তান্ত শুনে এই মারে তো এই মারে। বলে, বিধাতাপুরুষ হামেশাই মানুষকে দেয় না, জন্মের মধ্যে একবার হয়তো দিল। হাতের লক্ষ্মী বিসর্জন দিয়ে এলে, আমি বাপু নেই আর তোমাদের সঙ্গে। অপয়া তোমার সব। তিলকপুরে সেবারে জান নিয়ে কোন গতিকে ফিরেছিলাম—এবারে আরও সাংঘাতিক হবে, বুঝতে পারছি।

মক্কেলের অভাবে রাত্রে বেরুনো হল না। কাটাখালি খেজুরবনের পাশে চাপান দিয়ে রইল। গুরুপদ একটি কথা বলল না কারো সঙ্গে, শেষরাত্রে নেমে বাড়ির পথে হাঁটল।

কেষ্টদাস বলে, যাকগে, বয়ে গেল। বুড়োবয়সে কষ্ট করে পারে না, ঘরেও মনটা টেনেছে—তাই একটা ছুতো।

কিন্তু প্রধান উদ্যোগী বংশীও মিইয়ে গেছে। লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি আর নয়। মুনাফা নেই—বরঞ্চ পিটেল—পুলিসের যা খবর, বিপদ আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। দশধারার মামলা কাঁধে ঝুলছিল, দিন সংক্ষেপ হয়ে এখন মাথায় পড়েছে। মরীয়া হয়ে একবারের সর্বশেষ চেষ্টা। ফুলহাটায় যাই চলো, বলাধিকারী মশায়ের শরণ নিইগে। তিনি ছাড়া সুরাহা হবে না। বলাধিকারী থাকবেন মাথার উপরে, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য হবে খুঁজিয়াল। ক্ষুদিরামকে ধরে পড়ব গিয়ে, দায় জানাব। দয়া আছে মানুষটার। দয়ার চেয়ে বড়—দুঃসাহসের কাজে নামবার ঝোঁক। এখনো—এই বয়সে।

বলাধিকারী ডাকলেন, এরা কি বলছে শুনে যান একটু ভটচাজমশায় বড্ড ধরাপাড়া করছে।

ডাকাডাকিতে ক্ষুদিরাম এলো। বংশীর দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, টহলদারি শেষ হল—বেগ মিটেছে তো ভাল করে? রাত পোহাতে তা হলে কাকের ডাকই লাগে, পেঁচার ডাকে হয় না কি বলো?

অতএব দলের ভিতরের আজেবাজে কথাবার্তাগুলোও ক্ষুদিরাম জেনে বসে আছে। হাতের পাতায় বিধাতাপুরুষের হিজিবিজি গড়গড় করে পড়ে যায়—ও-মানুষের সঙ্গে কে পারবে? কান পেতে শুনতে হয় না, মুখে তাকিয়েই সে বোঝে।

গুরুপদর উপর রাগটা বেশি। ক্ষুদিরাম বলে, ডাকো একবার ঢালির পো'কে। এখন সে কী বলে শোনা যাক।

নেই, কেটে পড়েছে। কাতর হয়ে বংশী বলে, দায় উদ্ধার করতেই হবে ভটচাজমশায়। পাদপদ্মে এসে পড়েছি, লাথি মারলেও নড়ব না।

সত্যি সত্যি পা চেপে ধরতে যায়। দু-পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষুদিরাম বলে, এক্ষুনি তার কি! তোমাদের দায় বলে ক্ষেত্তোরখানা অমনি তো আকাশ থেকে পড়ছে না। খুঁজেপেতে দেখব, সময় লাগবে।

জগবন্ধু বলাধিকারী, দেখা যায়, এদের পক্ষেই আছেন। তিনি সুপারিশ করেন: রাখুন দিকি! আকাশের গ্রহনক্ষত্রগুলো নখের আগায় নিয়ে ঘোরেন। তাদের খবর টপাটপ বলে দেন। এইটুকু অঞ্চলের মধ্যে যেমন-তেমন একখানা ক্ষেত্তোরের খোঁজে আপানার এক যুগ বারো বছর লাগবে! ঘেন্নার কথা আর বলবেন না, হাসবে লোকে।

আর কথা না বাড়িয়ে ক্ষুদিরাম চোখ বুঁজে মুহূর্তকাল চুপ করে রইল। তারপর মুখস্থ করার মতো বলে যায়, নবগ্রাম সেনদের বাড়ি। কাজখানা আজকেই নামানো চলে। উঁহু, আজ ঠিক হবে না। সেনদের সাবেকি দালান-কোঠা—দেয়াল কমপক্ষে আড়াই হাত পুরু। দেয়াল কাটতেই রাত কাবার। কোন দরকার নেই, সবুর করো পাঁচটা সাতটা দিন। মক্কেল জুড়নপুরে ফিরে যাক। মেটে-ঘর সেখানে—দোঁআশলা মাটি। একটু একটু জল ছিটালে মাটি মাখনের মতো আপনি গলে আসবে।

সগর্বে বলাধিকারী সকলের দিকে চেয়ে বলেন, দেখ, আমি কি মিথ্যে বলেছি? অথচ দু-তিন মাসের মধ্যে ভটচাজমশায় গাঁয়ের বাইরে যাননি। না, তারও বেশি, কালীপূজার পর থেকেই তো বেরোননি।

ধোনাই মিস্ত্রি অবাক হয়ে বলে, মুলুকের খবরও গণেপড়ে বলে দিলে?

হাসতে হাসতে ক্ষুদিরামই তখন রহস্যভেদ করে: না হে বাপু। আমি কিছু গণতে যায়নি, মক্কেলরা গণাতে এসেছিল।

গণাতে এসেছিল এক মেয়েওয়ালা। পাত্র নবগ্রাম সেনবাড়ি শঙ্করানন্দ। প্রথম পক্ষ গত হতে না হতে ভাগাড়ে গরু মরলে কাক-শকুনের যেমন হয়, কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

কোষ্ঠি হাতে করে এক কন্যাপক্ষ উপস্থিত : সেনরা পাজিপুঁথি বড্ড মানে। রাজযোটক হলে এক পয়সা পণ লাগবে না। আপনি ব্যবস্থা করে দিন সামুদ্রিকাচার্য মশায়।

ক্ষুদিরাম বলে, পাত্রের কুষ্ঠিও নিয়ে আসুন। না মিলিয়ে যোটক-বিচার কেমন করে হবে ?

দেবে না, ঘুঘু আছে সেদিক দিয়ে। পাত্রের কুষ্ঠি তারা হাতে রেখে দিয়েছে। যা-কিছু এই কনের কুষ্ঠি থেকেই। সেই জন্যেই তো আসা আপনার কাছে। কুষ্ঠিটা মেরামত করে পুরানো তুলট-কাগজে লিখে দেবেন—পাত্রের কুষ্ঠি যেমনই হোক, রাজযোটক হয়ে দাঁড়ায় যেন।

ক্ষুদিরামের মুখ দেখে কি বুঝল কে জানে। জোর দিয়ে বলে, কেন হবে না ? রানী ভবানী, সুরেন বাড়ুয্যে চাই কি আকবর বাদশা—গোটাকয়েক দিকপাল মানুষের ছক থেকে জুড়েতেড়ে বসিয়ে দিন। কনের কুষ্ঠি দেখে ছেলেওয়ালারা হাঁ হয়ে যাবে, লগ্নপত্তোর করতে সবুর সইবে না।

দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র, কালোকুৎসিৎ চেহারা, দুটো গজদন্ত ওষ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে, চুলও পেকেছে দু-চারটে। কিন্তু হলে হবে কি—শঙ্করানন্দ সেনবাড়ির ছেলে। আর এক মস্ত কথা, আগের বউ সন্তান রেখে যায়নি, অঢেল গয়না রেখে গেছে আপাদমস্তক পরেও যা শেষ করা যায় না।

ক্ষুদিরাম সোজাসুজি ঘাড় নেড়ে দিল : কুষ্ঠি জাল করা আমার দ্বারা হবে না।

জাল কেন বলেন ? অরক্ষণীয়া মেয়ে কাঁধে—যাতে নামাতে পারি, তার জন্য এদিক-সেদিক খানিকটা মেরামত করে দেওয়া। করে তো সবাই।

তার কাছে যান।

কাজটা যে নিখুঁত চাই। সেনরা বড্ড ঘড়েল, ধরে না ফেলে। আপনি ছাড়া কারো উপর ভরসা হয় না। যে রকম দক্ষিণায় পোসায়, তার জন্য আটকাবে না।

ক্ষুদিরাম হাত বাড়িয়ে বাইরের পথ দেখিয়ে দেয় : চলে যান, এক্ষুনি—

যেতে যেতে কন্যার পিতা কটু মন্তব্য করে : কী আমার ধর্মঠাকুর রে ! কলি তরাতে এসেছেন—আরও যদি না জানতাম !

ক্ষুদিরাম নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, আমি লোকটা মেকি। কিন্তু সামান্য একটু বিদ্যে নিয়ে আছি, জেনেশুনে তার মধ্যে ভেজাল ঢোকাতে পারব না।

এই মানুষটির সঙ্গেই ক'দিন পরে আবার দেখা হয়ে গেল। কৌতূহলী ক্ষুদিরাম জিজ্ঞাসা করে : কুষ্ঠি মেরামত হল আপনার ?

এখন হয়ে কি হবে! আপনার জন্যেই তো মশায়! মর্মান্তিক ক্রোধে ক্ষুদিরামের উপর সে খিঁচিয়ে উঠল: আপনাকে না পেয়ে খুলনায় জ্যোতি-ভূষণমশায় অবধি ধাওয়া করতে হল। ফিরে এসে শুনি, জুড়নপুরের এক মেয়ের জন্য এর মধ্যে গেঁথে ফেলে দিয়েছে। লগ্নপত্তোর দিনক্ষণ নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন সারা।

বিয়ের তারিখ এগারোই—সেই লোকের কাছেই শুনেছিল। কর গুণে ক্ষুদিরাম এবার হিসাব করেছ: আর আজকে হল ষোলই। পাচ দিন বিয়ে হয়ে গেছে। কনে এখন শ্বশুরবাড়ি—নবগ্রামে। বিয়ের যাত্রায় কদ্দিন আর থাকবে? আরও চারটে পাঁচটা দিন ধরো। তারপরে মক্কেল জুড়নপুর যাবে। কাজ সেইখানে।

বংশী আবদারের স্বরে বলে, খোঁজ দিয়েই হল না। আপনাকে যেতে হবে ভটচাজমশায়, সাথেসঙ্গে থাকবেন। শিরে-সংক্রান্তি আমাদের, তড়িঘড়ি ভালো কাজ নামাতেই হবে একখানা।

ক্ষুদিরাম লুফে নিয়ে বলে, যাবোই তো। জবর কাজ--হাজারে একটা আসে এমন। ঘরে বসে থাকতে মনই বা মানবে কেন? কিন্তু কারিগরের বুকে বল আছে তো? ঢলঢলে ছুঁড়ি, ভরভরন্ত যৌবন— তার ঘরে ঢুকে গয়না নিয়ে আসা।

ধোনাই মিস্ত্রি বলে ওঠে, ওস্তাদের যে দিব্যি দেওয়া—

ক্ষুদিরাম মুখ ঘুরিয়ে সাহেবের দিকে চেয়ে বলে, তোমাদের নয়, আমি সাহেবকে বলছি। ঘর নয় সে টাকশাল। রুপো-তামা নয়, শুধুই সোনা। বিয়ের কনের গা থেকে সোনা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আসা।

সাহেব জলজলে চোখে তাকিয়ে। বংশী শিউরে উঠে বলে, ডবকা মেয়ের গায়ে হাত!

সাহেব মৃদু মন্তব্য করে: বিয়ে হয়েছে সে মেয়ের, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তো অর্ধেক-বুড়ি।

বলাধিকারী এতক্ষণে এইবার বললেন, কায়দাটা হল, বরের মতন টুক করে সেই মেয়ের পাশে শুয়ে পড়বে। মন দুলবে না গা কাঁপবে না—বড্ড কঠিন কাজ। ধরো, ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে সে তোমায় গায়ের উপর টানল—

অবহেলায় ভাবে সাহেব বলে, দীঘির পাড়ে কালকেউটে পায়ে উঠেছিল। তাতেও গা কাঁপল না, মেয়েমানুষে কি হবে?

বলাধিকারী বলেন, জেগে চেঁচিয়ে উঠতে পারে। ও বয়সের মেয়ের ঘুম বড় পাতলা।

সাহেব বলে, বাইটা মশায়ের ব্যবস্থা আছে। নিদালি-পাতা—বড় মোক্ষম জিনিস। পাতার বিড়িও মুখে নেবো। সকলের উপরে এই আমার রয়েছে—

হাত দুটো তুলে ধরে দু-হাতের আঙুল সগর্বে সঞ্চালন করে: দশ আঙুলে এই আমার দশ-দশটা কিঙ্কর। আঙুল বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে পারি। এ জিনিসও ওস্তাদের কাছে পাওয়া। পরখ হোক না বলাধিকারী মশায়, শুয়ে পড়ুন আপনি, ঘুম পাড়িয়ে দিই।

ওস্তাদের উদ্দেশ্যে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সাহেব হাঁটুর কাপড় সরিয়ে পায়ে-বাঁধা কাঠিতে হাত ঠেকায়। বলে ওস্তাদ হাত তুলে দিয়েছেন, শক্ত কাজেই এ জিনিসের বউনি। আশীর্বাদ করুন বলাধিকারীমশায়, জিনে এসে আবার আপনার পায়ের ধুলো নেবো।

কুড়ি

কাজের মতো কাজ একখানা—আশালতার গায়ের গয়না খুলে আনা। আগে যেসব হয়েছে তার কোনটি কাজ নয়, খেলা—কাজের নিয়মকানুন না মেনে হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়া কোন একখানে। সিঁধকাঠি যদি হয় রাজদণ্ড, রাজদণ্ড হাতে সাহেবের প্রথম প্রবেশ জুড়নপুরে আশালতার ঘরে। সিঁধের কাজও এই প্রথম।

কাজে নেমেই জয়জয়কার। বলাধিকারী শতকণ্ঠে তারিপ করছেন। তা-বড় তা-বড় পুরানো কারিগরের মধ্যেও সাড়া পড়ে গেছে। হিংসা সকলের: ছোকরা-মানুষ লাইনে এসেই কী তাজ্জব দেখাল! যারা এই কর্মে চুল পাকিয়ে ফেলল, তারাও এমন জিনিস ভাবতে পারে না। বিশ্বাসই করে না অনেকে। বলে, হতে পারে না, বাজে কথা।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত হৈ-হৈ, সে কেমন ঝিম-ধরা হয়ে আছে। যুবতী নারীর গায়ে বিষ, সে রাত্রে বিষের ছোঁয়া লাগল। জলুনির সেই থেকে বিরাম নেই। বুঝি যৌবনের জলুনি। ছুতো করে সাহেব জুড়নপুর গেল—রাতে যে মক্কেল মাত্র, দিনমানে নারীর রূপে দেখবে তাকে। গিয়ে আবার নতুন গোলমাল—রেলের কামরার সেই মা-জননী, সর্বনাশ তাঁদেরই করে এসেছে। সবিস্তারে মা গয়না-চুরির কথা বলতে লাগলেন: রাজরানীর সাজে তারা বউ পাঠাল—ভাববে, বাপের বাড়ির লোক অভাবে পড়ে গয়না বেচে খেয়েছে। সেই

মুহূর্তে এক মতলব আসে সাহেবের মনেঃ বলাধিকারীর ব্যবস্থায় গয়না এতক্ষণে গলে টাকা হয়ে গেছে। আবার এক রাত্রে এই বাড়ি এসে চুরি করে নগদ টাকা রেখে গেলে কেমন হয়? চোর মানুষের কাজ হরণ করে নেওয়া। সাহেব উল্টো ভাবছেঃ দিয়ে যাবে টাকা এখানে এসে। দশকুমার-চরিতের রাজপুত্র অপহারবর্মণ যা করতেন—

সে কাহিনীও বলাধিকারীর কাছে শোনা। চম্পা শহরে বিস্তর ধনী। কৃপণের জাসু তারা, হাতে জল গলে না। অপহারবর্মণের রোখ চাপলঃ ধন-ঐশ্বর্য নিতান্তই নশ্বর, ধনের অহঙ্কার অবিধেয়—এই সত্য প্রমাণ করে দেবেন তিনি। মুখের যুক্তিতে নয়, কাজে খাটিয়ে। রাজপুত্র যেমন শাস্ত্রজ্ঞ, চৌরকলার অনুশীলনে ঘুঘু-চোরও তেমনি। ধনীর টাকাকড়ি চুরি করে ভিক্ষুকদের দিলেন। পাশা উল্টে গেল—ভিক্ষুকরাই ধনী এখন, আগের দিনের ধনীজন ভিক্ষাপাত্র হাতে আগের দিনের ভিক্ষুকদের কাছে যায়। অপহারবর্মণ মজা দেখেন।

সাহেবও করবে তাই—বড়লোকের বাক্স টাকা অভাবীদের ঘরে পৌঁছে দেবে। এবং আশালতার মায়ের ঘরে সকলের আগে দু-চার বাক্স।

জুড়নপুর থেকে সাহেব ফুলহাটা ফিরছে উলুখড়ের আঁটি মাথায় নিয়ে। লোকে দেখে নিরীহ খড়—আঁটির ভিতরে লেজা-সড়কি-কাঠি। সারাপথ তখন এইসব চিন্তাঃ টাকা রেখে আসব চুপিসারে নিশিরাত্রে গিয়ে। টাকা হলেই গয়না—আশালতার হাতে কঙ্কণ উঠবে আবার, গলায় নেকলেস। সর্বাঙ্গ গয়না পরে যুবতী মেয়ে আরও কত ঝকমক করবে।

ফুলহাটা এসে সুধামুখীর চিঠি। সুধামুখী গলা ফাটিয়ে 'সাহেব' 'সাহেব' করে ডাকছে যেন চিঠির লেখায়। সেই এক সময়ে লণ্ঠন হাতে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে যেমন ডেকে বেড়াত। চিঠিতে সুধামুখী টাকা চায়নি, তবু কিন্তু সাহেব বখরার টাকা-আনা সমস্ত তার নামে পাঠিয়ে এলো। নতুন বাসা ভাড়া নিচ্ছে যাচ্ছে—বিস্তর খরচ যে তার এখন। বাসা নেবে বরানগরের দিকে, ফণী আড্ডির বস্তির মানুষ যে জায়গার হদিস পাবে না। গণ্ডা গণ্ডা কনে দেখে বেড়াচ্ছে—কত রূপের কত ঢঙের সব কনে—সাহেবকে পেলেই কনে একটা পছন্দ করে ঘরে এনে তোলে। সে ঘরে বুঝি গোলপাতার ছাউনি আশালতাদের মতো, সে বাড়ির উঠানে লাউয়ের মাচা, সে উঠানের পাশে ডোবার কলমিঝাড়ের মধ্যে পাতিহাঁস ভেসে ভেসে বেড়ায়।

সাহেবের কাজ দেখে ক্ষুদিরামের নতুন উৎসাহ। নিজে উদ্যোগ করে বার কয়েক ইতিমধ্যে বাইরে চক্কোর দিয়ে এলো। ভাল ভাল সব খবর। একটা

দুটো তার মধ্যে বাছাই করে ভাল দিনক্ষণ দেখে বেরিয়ে পড়া যাক। পয়
যাচ্ছে এ সময়টা, যা করতে হয় এখনই।

সাহেবের কিন্তু স্ফূর্তি নেই। চুপচাপ শুনে যায়। চাপাচাপি করো তো
'হুঁ' দিয়ে সরে পড়ল।

কেষ্টদাসও মেতে গিয়েছে। বাবুপুকুর থেকে ছুটে ছুটে সাহেবের কাছে এসে
পড়ে। বলে, জলে দাঁড়িয়ে ধান কেটে কেটে হাত-পা সব হেজে গিয়েছিল,
কাজে এসে বেঁচেছি। মটকায় চড়তে বলো, গাঙ ঝাঁপাতে বলো, কিছুতে
আমি পিছপাও নই। চলো বেরিয়ে পড়ি।

সাহেব হাঁকিয়ে দেয়: নিত্যি নিত্যি কেন এসে জ্বালাতন করিস? সময়
হলে খবর পাবি।

বলাধিকারী একদিন বললেন, জল-পুলিস বড্ড লেগেছে। জলের কাজ বাদ
দিয়ে ডাঙার কাজ ধর্। ডাঙার মানুষ দু-চারখানা খেল দেখে নিক। উচিতও
বটে। গাঙ-খাল নেই বলেই সে দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে থাকবে, এ কেমন
কথা! আবার ডাঙায় যখন কড়াকড়ি হবে, জলে নেমে পড়বি। হতে হতে
মরশুম এসে যাবে, কেনা মল্লিকের নলে ভিড়ে যাবি তখন।

আবার বলেন, যে দরের কাজকর্ম তোর, নলে গিয়ে নতুন আর কি শিখবি?
দু-এক মরশুম তবু ঘুরে আসা ভালো। বহুজন নিয়ে মিলেমিশে কাজকর্ম—
সে-ও একটা দেখবার বস্তু বইকি!

বংশী এসে এসে তাগাদা দেয়: বেরিয়ে পড়া যাক সাহেব-ভাই। পায়ে
হেঁটে ডাঙায় ডাঙায় ঘুরব। ভটচাজ বলছিল গুণরাজকাটি গাঁয়ের কথা। খুন-
খুনে এক বুড়োমানুষ যক্ষির মতো রাজার ভাণ্ডার আগলে আছে—

সাহেব ধমক দিয়ে ওঠে: এত যে দিব্যিদিশেলা, দায় মিটলে ঘরের বার
হবো না। দায় মিটিয়ে দিয়েছি, এখন আবার উসখুস করো কেন? তোমার
বউকে বলে দিচ্ছি দাঁড়াও।

হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে বলাধিকারীর দুই পায়ে হাত রাখল: আমি চলে
যাচ্ছি—

কোথায়?

কালীঘাটে মন টেনেছে।

সে কি, পাকাপাকি চললি—আর আসবিনে?

সাহেব বলে, তা-ও হতে পারে। এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না।

বলাধিকারী বিমর্ষ হলেন: কিন্তু তোর বিদ্যে তো শহরে-বাজারে খাটাবার
নয়। শহরে হল তাস-পাশা খেলার মতো—দু-পাঁচ হাত জায়গার মধ্যে একঘণ্টা

দু-ঘণ্টার ব্যাপার। তুই যে দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়ে ডাঙা-ডহর গাঁ-গ্রাম তোলপাড় করে বেড়াবি।

সাহেব চুপ করে আছে।

মৃদু হেসে বলাধিকারী এবার বলেন, মনটা টানলে কে, সেই কোন রানী বুঝি?

সাহেব ঘাড় নেড়ে বলে, মা—

কালীঘাটের মা দক্ষিণাকালী। বলাধিকারীর হাত দুটো আপনি কপালে উঠে যায়: বেশ বেশ! কাজে নেমে মায়ের পাদবন্দনা করবি, এই তো উচিত। মা তোর মঙ্গল করুন। আবার আসিস।

সাহেব বলে, চিঠি যার কাছ থেকে এসেছে—সুধামুখী দাসী। আমার সেই মায়ের কাছে যাচ্ছি।

মা যে নেই তোর?

সাহেব গাঢ় স্বরে বলল, মা না থাকলে এত বড়টা হলাম কি করে? মা ছাড়া কে এমন আনচান করে চিঠি লেখে?

চাকরিতে আছি, ভাবনাচিন্তা কোরো না। ছুটি নিয়ে যাব চলে বৈশাখ মাসের দিকে। টাকা পাঠাচ্ছি। নতুন বাসার বায়না দিতে হয় তো দিও—।

আর কি, দুঃখের দিনের শেষ! পোস্টকার্ডের এই চিঠি তার প্রমাণ। ইংরেজি ঠিকানা, ভিতরের লেখাটা সাহেবেরই। চিঠি সুধামুখী আঁচলে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়। ভাবের জন—পুরুষ হোক, মেয়ে হোক—পেলেই গিঠ খুলে চিঠি বের করে: পড়ো দিকি কি লিখেছে, আমি ঠিক ঠাহর করতে পারি নে।

যাকে পড়তে দিয়েছে সে হয়তো বলল, কেন, দিব্যি তো পরিষ্কার লেখা। পড়তে পারছ না কেন? লিখতে পড়তে তো জানো তুমি।

জানতাম। অনভ্যাসে এখন ভুল হয়ে যায়। চোখেরও জোর নেই তেমন। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি না?

সে লোক হয়তো সাহেবের বৃত্তান্ত কিছু জানে না। জিজ্ঞাসা করল, কে লিখেছে?

ছেলে—চাকরে ছেলে আমার। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনছি, এর পর নাতিপুতি আসবে। বলছি তো তাই—চোখ এখন অন্ধ হয়ে গেলেই বা কি!

সাহেব চাকরি করছে, ছুটি নিয়ে বাড়ি আসছে—লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ুক। জানুক সর্বজনে। শত্রু হিংসায় জ্বলুক। চিঠি পড়িয়ে পড়িয়ে সুধামুখী সৌভাগ্য জাহির করে বেড়ায়।

সেই চাকরে ছেলের আসলে কোন লাটসাহেবের চাকরি, বুঝতে সেটা বাকি নেই। মা-ছেলের সম্বন্ধ যখন, মায়ের মন আপনা-আপনি সব টের পায়। তার উপরে নফরকেষ্ট—ভালমানুষ ঐ লোকের কাছে হুমকি দিয়ে কথা বের করা কঠিন নয়। বড় দুঃসময় যাচ্ছে নফরা হতভাগার—একলা পড়ে গিয়ে রোজগারপত্তর বন্ধ। অতএব আবার সে ভাল হবার চেষ্টায় লেগেছে, নিমাইকেষ্টর বাসায় যাতায়াত করে। কিন্তু মুশকিল সে পথেও—নিমাইয়ের শ্বশুর রিটায়ার করেছেন, কথার তেমন ধার-ভার নেই। তবু চেষ্টা হচ্ছে চাকরির। আপাতত নফরার তাঁতের মাকুর দশা। হাওড়ার বানায় আছে, খরচার জন্য চাপাচাপি করলে কালীঘাট সরে পড়ল। সুধামুখীই বা কাঁহাতক খাওয়াতে পারে? পুনশ্চ হাওড়ায়। এই চলেছে। সাহেব এলে সুধামুখী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে নফরার এই পরিণাম। নতুন বাসায় যাবার দিন সাহেবও গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে। ভাল হবে সাহেব, গৃহস্থ মানুষ হবে।

বিগ্রহের জায়গাটুকু ধোয়ামোছা করতে করতে সুধামুখী একলাই পাগলের মতো বকবক করে: ও ননীচোরা ঠাকুর, তুমি যা আমার সাহেবও ঠিক তাই। আমি যে কী করি! চোর তোমরা দু-জনেই। চোরের মা আমি।

সংসারের লোভে জীবনভোর সে আকুলিবিকুলি করেছে। বর মরে গেল—তারপরে যে এলো, সেই মানুষ বিষ খাবার ব্যবস্থা দিল। বিষ না খেয়েই মারা পড়ল সুধামুখী।

উঁহু, মরেছে কোথা? ভেবেছিল মরে গেছে, কিন্তু সহজ নয় মরা জিনিসটা। প্রাণের ধুকধুকানি কিছুতে থামতে চায় না। এক পাগল আসত সুধামুখীদের বেলেঘাটার পাড়ায়। কী রকম তার বদ্ধ বিশ্বাস, মরবে না কিছুতে। জনে জনের কাছে কান্নাকাটি করত: কী সর্বনাশ, চিরকাল আমায় বেঁচে থাকতে হবে! কলির শেষ পৃথিবী লয় হবে. আমি তবু থেকে যাব। ডাক্তার-কবিরাজের কাছে গিয়ে ধর্না দিত: কি খেয়ে কেমন করে মরতে পারি বলে দাও। পাগলের কথায় লোকে হাসাহাসি করত। ডাকত: ও পাগল, শোন, আমি মরার কায়দা বলে দেবো। তার আগে এই চালের বস্তাটা আমার বাড়ি পৌঁছে দাও দিকি। মরবার লোভে পাগল তাই করত। সেই গতিক সকলের। বুঝতে পারিনে তাই—নইলে পাগলের মতোই আতঙ্ক হবার কথা। দেখ না, ঠাণ্ডাবাবুর সেই আমের অঙ্কুর কত বড় হয়ে ডালে ডালে এবার আম ফলেছে! এ নিয়তি সর্বজীবের—বেঁচে থাকবার জন্য ছটফটানি। একটু আলোর রেখা পেলে সেইদিকে মুখ বাড়ায়।

গোপাল, তুমি আমার ঘর-জোড়া হয়ে আছে। সাহেব আমার বুক-জোড়া।

সে আবার ঘরে আসবে, চিঠি লিখেছে। ভয় করে, রেশারেশি না হয় দু-ভায়ে। বাইরে তার নিন্দে, কিন্তু আসলে সে ভালো মানুষ। দেবতার মতন মানুষ।

সাহেবের চিঠির পরে সুধামুখীর তিলেক সোয়াস্তি নেই। ঘোর বেগে আবার পাত্রী দেখতে লেগেছে। কুমারী মেয়ে চোখে পড়লেই সাহেবের পাশে মনে মনে দাঁড় করিয়ে দেখে।

ফুটফুটে এক মেয়ে ঘাটে দেখল একদিন। সঙ্গে বর্ষীয়সী বিধবা। বিধবা গঙ্গাস্নান করছে, মেয়েটা সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে। সুধামুখী পুঁথি পড়ার মতো করে দেখে। আহা, লক্ষ্মীঠাকরুণটি। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, নাম কী তোমার মা?

মেয়েটা বলল, সুশীলা।

সুশীলা—কি? কোন জাত, পদবি কী তোমাদের মা?

মৃদুকণ্ঠে মেয়েটা বলে, কায়স্থ—

সুধামুখী ভাবে: অকাট্য প্রমাণ সহ একজনে, ধরো উদয় হল সাহেবের বাপ হয়ে। দস্তুরমতো সচ্ছল অবস্থা, এবং সেই লোক জাতে কায়স্থ। সুশীলার বাপের কাছে সাহেবের বাপ চলে যাবে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে: ছেলের এই চেহারা, রোজগারপত্তর এই, বাড়ির অবস্থা এই রকম—নগদে গয়নায় কত দেবেন বলুন? মেয়ে ভাল আপনার, কমসম করেই নেওয়া যাবে।

ক'দিন পরে আর একটা মেয়ে চোখে ধরল। মুখের গড়ন বোধকরি আগের সেই সুশীলার চেয়েও ভালো। মুখের হাসি আরও ভালো—আহা-হা, কী সুন্দর হাসিটুকু!

কি নাম তোমার মা? কোন্ জাত?

জাতে সুবর্ণবণিক।

সাহেবের বাপ অতএব কায়স্থ না হয়ে সুবর্ণবণিকই হোক তবে। ঠিকঠাক একজন বাপ না থাকায় এই বড় সুবিধা। যে মেয়েটা সবচেয়ে পছন্দসই, তার জাতকুল মিলিয়ে বাপ হোক না কেন সাহেবের!

আদিগঙ্গার কিনারে ফণী আড্ডির বদলে এখন মলয়কুমারের বস্তি। আর দুদিন পরেই তো রাণী-মলয়ের বস্তি আইনসম্মত ভাবে। নতুন নতুন সব বাসিন্দা—পুরানোর মধ্যে রাণী-পারুল তো থাকবেই, আর আছে সুধামুখী সে-ই যাই যাই করছে। যেতে হত অনেক আগেই, না গিয়ে উপায় ছিল না—শুধু গলাখানির জোরে আছে। ঠাকুরের ভজন ও কীর্তন গেয়ে গেয়ে সে

গলার আরও যেন বাহার খুলছে। এইটুকু না থাকলে ঘর ছেড়ে দিয়ে কবে এদ্দিন গৃহস্থবাড়ি বাসন-মাজার কাজ ধরত। অথবা মন্দিরের বাইরে কাঙালিদের মধ্যে গামছা পেড়ে ঠাঁই নিত। এ লাইনে বয়স হয়ে যাবার পরে যা দস্তুর।

কিন্তু গান শুনবার লোকও দিনকে দিন কমে এসে শূন্যে দাঁড়ানোর গতিক। নতুন বাঁধুনির গান চলে আজকাল, নতুন সুর, নতুন ঢঙ। এমনও হয়েছে, সুধামুখী তদ্গত হয়ে গাইতে গাইতে হঠাৎ চোখ তুলে দেখে, হাসছে শ্রোতাদের কেউ কেউ। একবার দেখেছিল, একজনে কানে হাত চাপা দিয়েছে —গান তবু শেষ করতে হল পেটের দায়ে। গান শোনার লোক এখন দাঁড়িয়েছে বুড়ো আধ-বুড়ো কয়েকটি লোক। পুরানো দিনের সেই আংটিবাবুকেও কিছুকাল থেকে আবার দেখা যাচ্ছে। চোখ বুঁজে নিঃশব্দে বসে শোনেন, গান শেষ হয়ে গেলেও নিবিষ্ট হয়ে থাকেন খানিকক্ষণ। অবশেষে কথা ফোটে: মরি মরি! মুরলীধর নিজে তোমার কণ্ঠে ভর করেন, ঐশীশক্তি ছাড়া এমন হয় না। একালে আসল গুণীর তো আদর নেই। বন্দোবস্তের ঢাকীরা জয়ঢাক পেটাতে লাগে, কান বাঁচানোর দায়ে লোকে তখন 'বাহাবা' 'বাহাবা' করে।

এমনি সব বলে বালিশের তলে কিছু রেখে দিয়ে আংটিবাবু পা চালিয়ে বেরিয়ে পড়েন। আগেও এই করতেন, সুধামুখীর হাতে হাতে কোনদিন কিছু দেননি। কিন্তু আগে যা রেখে যেতেন, ইদানীং তার সিকিও নয়। অবস্থা পড়ে গিয়েছে, চেহারা ও পোশাকআশাকে বোঝা যায়। আঙুলে আংটি অবশ্য বারো ডজনই—নয়তো আর আংটিবাবু কিসের? কম দিচ্ছেন বলে সুধামুখীর ক্ষোভ নেই—টাকার দিকে যা কমতি, প্রশংসায় তার অনেক বেশী পুষিয়ে দেন। এঁরা এই কয়েকজন গত হলে একেবারে নিখরচায় গাইতে চাইলেও তো শোনবার মানুষ জোটানো যাবে না।

কপাল খুলল হঠাৎ একদিন—সারা জন্মে যা কখনো ঘটেনি। মুজরার বায়না দিতে এলো। তদ্বির আংটিবাবুরই—যে লোক এসেছে, তার কাছে সবিস্তারে শোনা যায়। কত দয়া মানুষটির! বিদ্রূপ করে ঢাক পেটানোর কথা বলেছিলেন, সেই কাজ নিজেই করেছেন সুধামুখীর জন্য। জলসা পাতিপুকুরের এক বাগানে। বিরাট ব্যাপার, নামজাদা গুণীরা সব আছেন, যাঁরা শুনবেন তাঁরাও রীতিমত সমঝদার। দশ টাকা এখন দিয়ে যাচ্ছে, আর চল্লিশ সেইদিন। এবং আংটিবাবু নিঃসংশয়, শিরোপাও বিস্তর মিলবে। সুবর্ণময় ভবিষ্যৎ। একবার নাম পড়ে গেলে বায়না নিয়ে তখন কূল পাওয়া যায় না। টাকার অঙ্কটাও এক লাফে দুনো তেদুনো। দেদার কুড়িয়ে যাও। টাকার অনেক দরকার—সাহেবের বিয়ে, নতুন বাসায় সংসার গোছানো।

যত দিন ঘনিয়ে আসে, ভয়ে কাঁপে। ভাল না মন্দ করলেন আংটিবাবু কে জানে? মেতে গিয়েছে সুধামুখী, সর্বক্ষণ গানের তালিম। একমাত্র শ্রোতা ঠাকুর গোপাল। কেমন লাগল বলো গোপাল? জীবনে একবার এই দিন পেলাম মানে মানে যেন ফিরতে পারি। কাল তো শুনেছ আর আজ শুনলে—কোনটা ভাল দুয়ের মধ্যে?

মাটির দেহ গোপালের, সেই রক্ষা অহোরাত্রি গান শুনে শুনে নয়তো কানে তালা ধরে যেত। পুরানো বেনারসি শাড়ি রিপু করিয়ে কাচিয়ে এনে রেখেছে সুধামুখী। গয়না নতুন করে আমরুলপায় ঘষেছে। দিনের দিন সন্ধ্যাবেলা মোটরগাড়ি গলির মোড়ে রেখে সুধামুখীকে তুলে নিতে এলো—সেই লোকটাই এসেছে, যে এসে বায়নার টাকা দিয়ে গিয়েছিল। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে, এ যেন আলাদা সুধামুখী। গায়ের রং একেবারে বিপরীত। বয়সটা অবধি বিশ-পঁচিশ বছর পিছিয়ে নিয়েছে। মুক্তোর সিঁথিপাটি কপালে নাকে টানা-দেওয়া নথ, কানে ঝুমকো, দু-বাহুনে মোটা অনন্ত, কোমরে বিছাহার, গলায় সাতনরি। সাজসজ্জা ও গয়নাগাঁটিতে ঝলমল করছে। ভেক নইলে ভিখ মেলে না—আংটিবাবু বলে পাঠিয়েছিলেন, ওই লোকও বার বার বলেছিল। উপদেশ সুধামুখী অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেছে। অত বড় আসরে বসবার মতো চেহারা দাঁড় করতে নাকের জলে চোখের জলে হয়েছে আজ সমস্তটা দিন।

নিষ্পলক খানিকক্ষণ তাকিয়ে লোকটা ফিক করে হেসে ফেলে: মাসি, তুমি মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবে সকলের।

মুশকিল হল, নফরকেষ্টটা জ্বর হয়ে বিকালবেলা এসে পড়েছে। জ্বরে আইঢাই করছে। শিয়রের কাছে এক কলসি জল আর গেলাস রেখে সুধামুখী বলে, তেষ্টা পেলে খেও। পারুলকে বলে যাচ্ছি, খবর নেবে। খাওয়াদাওয়া নেই যখন দোরে খিল দিয়ে দাও। এক্ষুনি। আমি এনে খুলে দিও। দেড়টা দুটোর মধ্যে এসে যাচ্ছি, কি বলেন বাবু?

লোকটা বলে, অত কেন হবে! খুব বেশি তো এগারোটা। বাছা বাছা ভদ্দোরলোক—হৈ-হুল্লোড়ের মানুষ কেউ নয়।

সর্বশেষে সুধামুখী গোপালের কাছে বিদায় নেয়: গোপাল, আসি তবে বাবা। আজকের রাতটুকুন একলা তুমি। তোমার বড়ভাই আসছে—সে আমার বড়ঠাকুর। রক্তমাংসে ছেলে যে অমন সুন্দর হয়, সে তুমি না দেখলে বুঝবে না।

বিড়বিড় করে আবার বলে, লোকে কি বলবে—নয়তো কোলে করে নিয়ে

যেতাম আমায় ঠাকুর। অদর্শনে সঙ্গে তুমি থেকো, একা আমার ভয় করবে। এখানে এই যেমন, সেখানেও সামনের উপর থাকবে তুমি। চোখ বুঁজে যেন দেখতে পাই। তুমি থাকলে তবে আমার ভরসা।

রাত কেটে গেল, সুধামুখী ফেরে না। পরের দিন রোদ উঠে গেছে, তখনও দেখা নেই। নফরকেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পারুলকে ডেকে বলল। দুপুর গড়িয়ে যায়, কষ্টেসৃষ্টে তখন বিছানা থেকে উঠে ঐ পারুলকে সঙ্গে নিয়ে থানায় খবর লিখিয়ে দিয়ে এলো।

দিন কেটে গিয়ে আবার সন্ধ্যা। পুলিস এলো চারজন। বরানগরের বাজার ছাড়িয়ে খানিকটা ভিতর দিকে গিয়ে এক পোড়ো বাগানের ভিতর স্ত্রীলোকের লাস পাওয়া গেছে। লাস সনাক্ত হয়নি, মর্গে নিয়ে রেখেছে। দেখে যাও তোমাদের মানুষ কি না।

পারুল আর্তনাদ করে ওঠে: নিশ্চয় দিদি। সেই হতভাগী ছাড়া অন্য কেউ নয়। ভালোঘরের মেয়ে—গত জন্মের মহাপাতকে নরকবাস করছিল। নরকপুরী ছাড়বার জন্য ছটফট করত, এতদিনে পেরেছে। একেবারে চলে গেল।

সন্ধ্যায় সাজ-সাজ এখন ঘরে ঘরে। ভিড় করে এসে মেয়েরা সব শোনো। কেউ হায়-হায় করে, কেউ বা প্রবোধ দেয়: দিদি হতে যাবে কেন, দেখ গিয়ে অন্য কেউ। যা-হোক কিছু বলে দ্রুত যে যার ঘরে চলে যায়। অসম্ভব কিসে, আশ্চর্য হবার কি আছে? নিয়েছে অস্বাভাবিক উদ্ভট জীবিকা—মৃত্যু স্বভাবের নিয়মে না-ই যদি আসে, সে নালিশ কে শুনতে পাবে?

ঘোড়ারগাড়ি নিয়ে এলো পুলিসের তরফ থেকে। শাড়ির উপরে ছিটের চাদর জড়িয়ে পারুল বেরিয়ে এলো। সে যাবে। নফরকেষ্টও ধুঁকতে ধুঁকতে পারুলের গায়ে ভর দিয়ে গাড়িতে উঠে বসে। রানীও চলল সেই মোড় অবধি। পারুল বলে, তুই কেন আবার, ছেলেমানুষ তুই কি দেখতে যাবি? চলে যা মা, রাস্তার উপর দাঁড়াবিনে এখন। মলয় কখন এসে যাবে, সে রাগ করবে।

রানী নিরুত্তরে বাড়ি ফেরে। দোতলায় নিজের ঘরে যায় না। সুধামুখীর ঘরের সামনে অন্ধকার নির্জন দাওয়ায় অনেক রাত্রি অবধি একাকী বসে রইল।

লাস ঘরের বারাণ্ডার উপর কাপড়-ঢাকা রয়েছে। মুখের কাপড় সরিয়ে দিল। সুধামুখীই বটে। মুদ্রিত চোখ। গলায় কোপ মেরেছিল আচমকা পিছন দিক থেকে। পুলিশের একজন নিরিখ করে দেখে তাই বললেন।

বললেন, চিঠি নিয়ে লোক গিয়েছিল, সেই চিঠি খুঁজে বের করতে হবে। তাতে

যদি কিছু হদিস মেলে। আংটি নাম কারো হয় না। পুরানো যাতায়াত বলছ —আসল নামটা কেউ কোনোদিন জিজ্ঞাসা করো নি?

পারুল বলে, খাঁটি নাম আমাদের কাছে কেউ বলে না। মেকি নাম বানিয়ে বলবে, কী হবে শুনে? চেহারায় চিনতে পারব। আর এক নিশানা বলতে পারি, বাবুর দু-হাতে এক গাদা আংটি।

আংটি কী আর আঙুলে রেখেছে? বাগানের মধ্যে কতকগুলো আংটি পাওয়া গেল। মজাটা হল, সবগুলোই মেকি। সোনা নয়, গিল্টি। হীরে নয়, কাচ। ঝকমকিয়ে তোদের কাছে পশার জমাতো।

একটুখানি চিন্তা করে তিনি আবার বলেন, ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিছু জানিস? কিম্বা প্রণয়ের রেশারেশি? পুরানো জানাশোনার মধ্যে খুনখারাপি —উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

পারুল বলে, দিদির এক-গা গয়না ছিল। চেয়ে দেখুন হাত-গলা নাক-কান এখন সব ন্যাড়া। গয়নার লোভে মেরেছে।

লুফে নিয়ে নফরকেষ্ট বলে, সে-ও মেকি হুজুর। আমি কিনে দিয়েছিলাম। গিল্টি পরে ঠসক করে বেড়াত। ব্যবসাই এই। মানুষটা কিন্তু মেকি ছিল না।

এরই দিন দশেক পরে সাহেব এসে উপস্থিত। ফিরল কতদিন পরে কত অঞ্চল ঘুরে। পারুল দেখতে পেয়ে উঠানের উপর এসে কেঁদে পড়েঃ সাহেব এসেছিল—ক'টা দিন আগে আসতে পারলি নে? ওদিকে নয়। কেউ নেই ওঘরে, তালা দেওয়া। তালা দিয়ে নফরকেষ্ট সেই বেরিয়েছে, আর আসেনি। শুনিস নি কিছু? আমার ঘরে আয় বাবা—

আঁচলে বারম্বার চোখে মোছে, আবার ভরে যায়। বলে, সংসারের দুয়োরে চিরদিন দিদি মাথা ঠুকে ঠুকে গেল, দুয়োর খুলল না। আমায় সব বলত, আমার মতন কেউ তাকে জানে না।

সাহেব পাষাণমূর্তির মতো শুনছে। কান্না দেখে তারও চোখে জল। চিরকেলে প্যাচপেচে মন—এ মনের কিছুতে শাসন হল না। এতক্ষণে রানী দেখেছে, তরতর করে নেমে এসে সে হাত জড়িয়ে ধরল। মায়ের দিকে ভ্রূকুটি করে বলে, তেতেপুড়ে এলো, থাম তুমি এখন মা। উপরে চলো সাহেব-দা, হাত-পা ধুয়ে জিরোবে।

শুনতে কিছুই আর বাকি নেই। চোখের জল পড়ো-পড়ো, ঠিক সেই সময়টা রানী এসে পড়ল। হঠাৎ কী রকম হয়ে যায়, খল-খল করে সাহেব হেসে ওঠে। বলে, জানিস রানী, কষ্টিপাথর নিয়ে ঠিক ওরা গয়না কষতে

গিয়েছিল। পাথরে দাগ ওঠে না। কী বেকুব, কী বেকুব! নিজের গাল চড়াচ্ছিল বোধহয়—কী বলিস, অ্যাঁ?

রানী ব্যাকুল হয়ে হাত চাপা দেয় সাহেবের মুখে: থাক, থাক—আমার ঘরে চলো। কাঁদতে হবে না, হাসতেও হবে না তোমার।

একুশ

উপরের ঘরে রানী খাটের উপর ধবধবে বিছানায় নিয়ে বসাল। বলে, কদ্দুর থেকে কত কষ্ট করে এলে সাহেব-দা। খেয়েদেয়ে সারা বেলান্ত গড়াও।

জানালাগুলো খুলে দিল। ছত্রাকার আমগাছ। সেই এককোঁটা অঙ্কুর বড় হয়ে আজ আকাশ ঢেকেছে—দোতলার উপর বসে সেটা আরও ভাল বোঝা যায়। থোলো থোলো গুটির ভারে ডাল বুঝি ভেঙে পড়ে। আর, ও-পাশের জানালায় একবার দেখ না তাকিয়ে। গঙ্গা। ভরা জোয়ার এখন গঙ্গায়, কানায় কানায় জল।

রানী চোখ বড় বড় করে বলে, তবু তো গুটি কত ঝরে পড়েছে। ছোঁড়া-গুলো পাঁচিলের ওদিক থেকে ঢিল ছোঁড়ে, কখনো বা পাঁচিলে উঠে ডাল ঝাঁকায়। অন্যের কথা বলি কেন, আমিই কি কম? জানলার গায়ের এই ডালখানায় পাতা দেখবার জো ছিল না। হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সব শেষ করেছি। নুন আর লঙ্কা দিয়ে কাঁচাআম খেতে বড় মজা।

হাসে একটু রানী। হাসলে দুই গালের উপর ছোট্ট দুটি টোল পড়ে, সুন্দর দেখায়। বলে, সেই সময় তোমার কথা বড্ড মনে হত সাহেব-দা। কোন্ দেশে কোথায় আছে—গাছে প্রথম ফল ধরল, তুমি দেখলে না। ভাবতাম, পাকাবার আগে যেন এসে পড়। হল তাই সত্যি সত্যি। আমি খাটিয়ে দেখেছি সাহেব-দা, খুব একমনে যদি কিছু চাও ঠিক তাই পেয়ে যাবে।

না—। ঝাঁকি দিয়ে সাহেব ঘাড় তুলে তাকাল রানীর দিকে। তুমি পাও রানী, তাই বলে সকলে নয়। মা তো চেয়েছিল আমায় কাছে কাছে রাখবে, বিয়ে দিয়ে সংসারী করবে, ছেলে-বউ নিয়ে সংসারের গিন্নী হয়ে থাকবে। বিধাতার কাছে মাথা কুটে কুটে চেয়েছে - চিরকাল ধরে ঐ তার সাধ। কিন্তু কী পেয়ে গেল তার জীবনে?

গর্জন করে উঠল যেন অলক্ষ্য ক্রূর ভাগ্যনিয়ন্তার উপর। চিড়িয়াখানার

খাঁচার বাঘ যেমন গরাদের বাইরে থেকে উত্যক্তকারী নিরাপদ মানুষের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে। সর্বনাশ, রানীর এতক্ষণের এত সব বুকনি বৃথা? সুধামুখীর প্রসঙ্গ আবার না ওঠে, একথা-সেকথায় রানী ভুলিয়েভালিয়ে রাখছিল। ছোট শিশুকে নিয়ে মা যেমন করে। সাহেবকে এখন যেন অসহায় শিশুর বেশি ভাবতে পারছে না।

চতুর্দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেব ঐশ্বর্য্য দেখছিল। লঘুকণ্ঠে এবার বলে, ঝকঝকে এমন কোঠাঘর খাটপালঙ্ক গয়নাগাঁটি একমনে চেয়েছিলে তুমি রাণী, ঠিক তাই পেয়ে গেছ। তাই বলে কি সকলে? তোমার এই বয়সে কটা দিনের মধ্যে কার এত ভাগ্য খোলে বলো। জন্ম থেকে মাটকোঠার ঘরে—দেখেছি তোমাদের তো কম নয়।

ঘুরে এসে কথাটা তারই উপর পড়বে, রানী ভাবতে পারেনি। কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। লজ্জা সে গায়ে মাখে না, জোরে জোরে ঘাড় দুলিয়ে সমস্ত মেনে নিল। বলে, বয়সের কথা কি বলো সাহেব-দা, ভাগ্য আমার কি আজ নতুন খুলছে? কতটুকু তখন—তুমিই মন্তোর শিখিয়ে দিলে, ইচ্ছা-বর পেয়ে গেলাম আমি। যেটা ইচ্ছা করব, তক্ষুনি তাই পেয়ে যাই। মা-কালী জোগাচ্ছেন। চুলের ফিতে কাঁটা, গন্ধতেল—জোগাতে জোগাতে দেবীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ।

রানী খিলখিল করে হেসে ওঠে। সে হাসির ছোঁয়াচ লেগে যায় সাহেবের ঠোঁটে। বলে, মা-কালীকে দিয়ে শেষটা পায়ের জুতো বইয়ে ছাড়লে রানী, তুমি কম পাষাণ্ডী!

রানী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে: আচমকা তুমি-তুমি শুরু করলে কি জন্যে বলো তো? যেন আমি কেষ্টবিষ্টু মানুষ। আগের মতো তুইতোকারি করবে তো করো, নয় তো আমি চলে যাচ্ছি। কান জ্বালা করে।

রাণীর মুখে চেয়ে একটু হেসে সাহেব আগের কথার জের ধরে বলে, তোর গয়না চুরি করেছিলাম রানী, লাইনে সেই আমার হাতে খড়ি। তোর কানের ইহুদি-মাকড়ি। ঝুটো গয়না, দাম পুরো টাকাও নয়। হলে হবে কি—ছোট্ট মানুষের সাধের জিনিসটা নিয়ে আমার উপর অভিশাপ লেগে গেল। চোর আমি সেইদিন থেকে।

চোর না আরো-কিছু! ভ্রূভঙ্গি করে রানী সাহেবের কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়। বলে, চুরি করলে বটে সাহেব দা, কিন্তু চোর হতে পারো নি। হয়ে গেলে দেবতা। সত্যযুগের মতন জাগ্রতা দেবতা—চাইতে না চাইতে ভক্তের বাঞ্ছাপূরণ। এ কালের মতন কালা-দেবতা কানা-দেবতা নয়।

সাহেব বলে, জাগ্রত দেবতা কী নাকালটাই হলেন জুতো চুরি করতে গিয়ে? প্রাণ যাবার দাখিল। তোর আবদার কুলোতে গিয়ে কী করেছি আর না করেছি রানী। কারো কাছে সে-সব বলবার কথা নয়, ভাবতে গিয়ে নিজেরই লজ্জা করে।

মুচকি মুচকি হাসে রানী। দেমাক করে বলে, বোঝ ক্ষমতা। এঘরে-ওঘরে এখন সব নতুন মেয়ে, তারা হিংসায় জ্বলে। বলছিল, মালিকবাবুকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাও, তাজ্জব কাণ্ডবাণ্ড তোমার। মনে মনে হাসি আমি—ওরাই নতুন দেখছে, আমার কাছে নতুন-কিছু নয়। খাটপালঙ্ক কোঠাঘর গয়নাগাঁটি খোঁটা দিলে, কিন্তু সেই এককোঁটা বয়সে তুমিই তো অভ্যাস ধরিয়ে দিয়েছ সাহেব-দা। যা-কিছু চেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে এসে গেছে।

সমস্ত দিন সাহেব পড়ে আছে। কতকাল পরে আরামের একটু নিশ্চিন্ত বিছানা পেল। নিচে পারুলের ঘরে রানী। পা টিপে টিপে এসেছে দু-একবার, দরকার সেরে তক্ষুনি আবার চলে গেছে। সাহেবকে ডাকে নি। বিভোর হয়ে সে ঘুমোচ্ছে, দেখলে কষ্ট হয়। আহা ঘুমাক।

সন্ধ্যার পর সিঁড়ি দিয়ে উঠে কে যেন চাপা গলায় 'রানী' 'রানী' করে ডাকছে বাইরে থেকে, মানুষটা ঘরে আসে নি। সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। আলো দিয়ে গেছে ঘরে, জোর কমানো। তাই তো, কাজকর্মের সময় ওদের! তাড়াতাড়ি জামা গায়ে চড়াচ্ছে, কোন এক দিকে বেরিয়ে পড়বে। এটা কোন নতুন ব্যাপার নয়। এই বাড়িতেই ছিল, শিশুকাল থেকে এই তো বরাবর করে এসেছে। অভ্যাস আছে।

'রানী' 'রানী' করছে—নিচের ঘর থেকে ছুটে এসে রানী লোকটাকে ধরল। বিরক্ত স্বরে বলে, ভাই এসেছে আমার—বলে দিলাম তো। মায়ের এক বোনের ছেলে। সংসারধর্ম থাকতে নেই বুঝি আমাদের, মানুষ নই আমি? আজকের দিনটা ছাড়ো।

লোকটা এর পর কি বলল, শোনা যায় না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। অনতিপরে অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে রানী ঘরে উঁকি দেয়। সাহেব বেরিয়ে যায় তো দু-হাতে দুই পাল্লা ধরে পথ আটকে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ সুরে সাহেব বলে, রাত হয়ে গেছে, টের পাই নি। রোজগারপত্তর আজ তোর চুলোয় গেল। সরে যা, পথ ছাড়।

রীতিমত লড়াইয়ের ভঙ্গি মেয়েটার। বলে, এক পা নেমেছে তো মাথা খুঁড়ে মরব আমি। সিঁড়ির উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। জানো, তা পারি।

গলায় দড়ি দিয়েছিলাম শোন নি, দরকার হলে আবার তেমনি পারব। সেবারে হেরে এসেছি বলে বারবার হারব না। দয়া হবে নিশ্চয় যমরাজের।

সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। সুধামুখীর পরেও আছে তবে পথ আটকানোর মানুষ! রানীর রাগ দেখে হাসে মিটিমিটি। বলে, জামা-জুতো পরে মাথায় টেড়ি কেটে তৈরি হয়েছি যে। জামা খুলব না, টেড়িও ভাঙব না। কটা রাত তোর তো গেছেই—চল্ তা হলে দুজনে যাই। মা-কালী দর্শন করে আসি। কালীঘাট এসে সকলের আগে মা-কালী দর্শনের কথা। আমাদের লাইনের তাই নিয়ম, না করলে দোষঘাট হয়। আমি তা মানি নি—মা-কালীর আগে মা দর্শন করতে এসেছিলাম।

আমি যাব, রোস একটুখানি—। রানী ঝলকিত হয়ে উঠল। বলে, মায়ের আরতি কতদিন দেখিনি সাহেব-দা। নর্মদার পাঁকে ডুবে থাকি সে সময়টা মন্দিরে যাই কেমন করে? আজকে যখন ছুটি করে দিলে তুমিই সঙ্গে করে নেবে।

নিচের ঘরে সাহেব গিয়ে বসল। পারুল শতকণ্ঠে মলয়কুমারের ঐশ্বর্য ও দরাজ মেজাজের কথা বলছে। মলয়কুমার অর্থাৎ ঝিঙে। এমনি সময় রানী নেমে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কী সাজ সেজেছে মরি মরি! পলক পড়ে না চোখে। সাহেব বলে, শুধু রানী ডাকলে মানাবে না রে! মহারানী—রাজরাজেশ্বরী। কত সুন্দর হয়েছিস তুই, কী জৌলুষ! সাজগোজ করে এলি—রূপ তাই বেশি করে মালুম হচ্ছে।

উঠান পার হয়ে গলিতে পড়েছে তখন। রানীর মুখে ছলাৎ করে রক্ত নেমে এলো। মুখ-ভরা হাসি নিয়ে বলে, পা চালিয়ে চলো সাহেব-দা, কুচ্ছো করতে হবে না ইনিয়ে-বিনিয়ে।

সাহেব বলে, তোর গোলাপফুলের মুখ রাঙা হয়ে একেবারে রক্তজবা হয়ে উঠল রে! সত্যি রানী, অপরূপ হয়েছিস তুই। ডিগডিগ করে বেড়াতিস, তখন কি জানি একদিন এমনি হয়ে উঠবি!

রানী এবার ঝগড়া করে: রাঙা হয় রাগে—তোমার মুখেও এই সমস্ত শুনে। নিত্যিদিন কতজনাই বলে থাকে, তুমি কেন তাদের দলে হবে সাহেব-দা? তুমি বলছ—তখন মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হোক, ঢুকে পড়ি তার মধ্যে।

মন্দিরের কাছাকাছি এসে বড্ড ভিড়। সেই একবয়সে কত ঘোরাঘুরি করত এইসব জায়গায়। ভিড় ঠেলে চলেছে। লোকে তাকিয়ে দেখে।

সাহেব কানের কাছে মুখ নিয়ে রানী বলে, কি ভাবছে ওরা সব, বলো তো—

নিরীহভাবে সাহেব বলে, ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি—আবার কি!

রানী খিলখিল করে হাসে : কী বোকা তুমি সাহেব-দা! আমি বুঝি তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তোমায় আমায় কী সম্পর্ক ভাবছে ওরা বলো—

ভাবছে, চাকর সঙ্গে নিয়ে কোন্ মহারানী যাচ্ছেন। মা-কালী দর্শনের পর দোকানের কেনাকাটা হবে, চাকর বয়ে নিয়ে আসবে।

যাও—। রাগ করে রানী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

অন্যায়টা কি বলেছি! তোর ঝলমলে সাজগোজ গা-ভরা গয়না, তার পাশে আমার এই আধ-ময়লা ছেঁড়া কামিজ তালি দেওয়া জুতো—লোকে অন্য কি ভাবতে পারে?

রানী বলে, যে রূপ নিয়ে এসেছ সাহেব-দা, সাজগোজ যে লজ্জা পেয়ে যায় তোমার গায়ে উঠতে। বিধাতা আমাদের বঞ্চিত করেছে, নিজের হাতে তাই পূরণ করি। তোমায় চাকর ভাববে, হায় আমার কপাল!

বলতে বলতে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বলে, ওরা যা ভাবছে, তাই তো সত্যি সত্যি হবার কথা ছিল। নজর করেছ বোধ হয়—ভিড় কাটাতে কতবার আমি তোমার গায়ের উপর পড়লাম। দেখিয়ে—ইচ্ছে করেই। মানুষ কাছাকাছি হলেই তোমার দিকে এলিয়ে পড়েছি। যা হতে পারল না, কোনদিন আর হবে না, একটুখানি আমি সেই সাধ মিটিয়ে নিলাম। দেখুক লোকে—গৃহস্থঘরের আর দশটা ছেলে-বউর মতো আমরাও যেন একজোড়া। আমার এই হ্যাংলাপনায় রাগ করো না সাহেব-দা। পথের পাশে ঐ যত কাঙালি দেখছ, ছেঁড়া ন্যাকড়া সামনে বিছিয়ে বসে আছে—আমি ওদেরই একটি।

দু-হাতে মুখ ঢাকল রানী। বলে ফেলে লজ্জা হল? কিম্বা বুঝি জল এসে গেছে চোখে। এত দুঃখকষ্ট দিয়েও বিধাতার যেন তৃপ্তি নেই, জল দিয়ে ধুয়ে ধুয়ে দুঃখ আরও শাণিত করে দেন।

মন্দিরের আরতি দেখে তারপরেও একজুটি হয়ে বেড়াচ্ছে দু-জনা। ফিরতে মন নেই, ঘরসংসার-পালানো একজোড়া ছেলেমেয়ে। ঘুরে ঘুরে তারপরে পাড়ার ঘাটের চাতালে এসে বসল। নির্জন, আবছা অন্ধকার।

সাহেব বলে, মনে পড়ে রানী, এই চাতালে বসে বসে বসে নৌকো দেখতাম। তুইও এসে বসতিস। ভাঁটির দেশের কথা শুনতাম মাঝিমাল্লার মুখে। কপাল গুণে তারপর সেই দেশেই গিয়ে পড়তে হল।

রানী কি ভাবছিল। কোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, সেই সেই এসেছ সাহেব-দা, আগে কেন এলে না।

সাহেব বলে, সেই তো দুঃখ আমার ভাই। দুনিয়ায় লক্ষকোটি মানুষ, কিন্তু

ভালবাসার মানুষ একটি-দুটি। দুটো হপ্তা আগেও যদি আসতাম। মা চলে যাবার আগে।

রানী বলে, তারও আগে সাহেব-দা, আমি মরে যাবার আগে।

হেঁয়ালির মতন লাগে। রানীই আবার বলছে, শাড়ি গলায় বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়েছিলাম। গিঁঠ খুলে গেল, তবু আমার বাঁচা হল না। মরে গিয়ে পেত্নিশাকচুন্নি হয়ে বেড়াই। যে রানী তখন দেখতে, সে আর নেই। আজকে সব বলি সাহেব-দা, অনেক কেঁদেছি তোমার জন্যে। 'সাহেব-দা' 'সাহেব-দা' কত ডেকেছি। কত রাত গেছে, সারাক্ষণ ছটফট করেছি। তার পরে মরে গেলাম। সাজসজ্জা আমি চাইনি সাহেব-দা, জ্যান্ত থাকতে চেয়েছিলাম। এখানে ডাকলে নাকি ইচ্ছের জিনিস পাওয়া যায়—ছাই, ছাই! সেই মিথ্যে আমিই আবার নিজের মুখে বললাম! মিথ্যের পেশা নিয়েছি কিনা, মিথ্যে বলে যেতে বাধে না।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, তুমি যদি থাকতে সাহেব-দা, একচোট ঝগড়া করা যেত সুধা-মাসিমার সঙ্গে। কনে খুঁজে খুঁজে হয়রান, সকলকে বলতেন ভাল মেয়ের জন্য। আর একটা যে মেয়ে একই বাড়িতে পায়ে পায়ে ঘুরছে, তার দিকে চোখ পড়ে না। পিদ্দিমের নিচে অন্ধকার। কেন তা-ও জানি। এমন মেয়ে চাই কুলেশীলে রূপে-গুণে কোন বিচারে যার খুঁত বেরুবে না। কিন্তু ছেলেটাই বা কি—জাতে বুঝি সে নৈকষ্যকুলীন, পেশায় বুঝি টুলোপণ্ডিত?

কণ্ঠস্বরে রীতিমত উত্তাপ। সাহেব সায় দিয়ে বলে, ঠিকই তো! কিন্তু ঝগড়াটা আমার জন্য আটকে রইল কেন? করলেই তো হত।

গালে হাত দিয়ে রানী বলে, ওমা নিজের বিয়ের কথা মেয়েয় বুঝি বলতে পারে! বলাতাম তোমায় দিয়ে। আমাদের ছোট্টবেলায় বর-বউ বলে কি জন্য ওরা ক্ষেপাত! তোমায় দলে পেলে দাবি ঠিক আদায় করে ছাড়তাম। তা হলে আমি কি মরতাম সাহেব-দা, না সুধা-মাসির অমনধারা বেঘোরে প্রাণ যেত? ছেলের-বউ আর সংসার নিয়েই মজে থাকতেন, জলসার নাম করে খুনেরা তাঁকে ফাঁদে নিয়ে ফেলতে পারত না।

সাহেব স্তব্ধ হয়ে শুনল। তার পরেও কী ভাবে একটুখানি। বলে উঠল, দু-জনে কি সংসার হয় না রানী? কপালে নেই, মা আমার চোখে দেখতে পাবে না। আমরাই গিয়ে ঘর বাঁধিগে।

ছিঃ! রানী ঘাড় নাড়ল: হয় না সাহেব-দা। বোলো না ও-কথা, শুনলেও পাপ। কাক-চিলে ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে, সে জিনিষে দেবতার নৈবেদ্য হয় না।

সাহেব বলে, কে বলে দেবতা? মিথ্যে কথা। মিথ্যে বদনাম দিবিনে রানী, মানা করছি।

চোখের জলের মধ্যে হেসে রানী বলে, দেবতা তুমি আজ হয়েছ! আমার ছেলেবয়সের বিধাতাপুরুষ তুমি। চোখ পাকিয়ে যতই হুঙ্কার দাও, সে আসন কেড়ে নেবার ক্ষমতা নেই তোমার।

অধীর কণ্ঠে সাহেব বলে, দেবতা আমি নই, চোর। লোকে ঘেন্না করে, পুলিশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়ায়। চোরের সেরা চোর—একালের চোর-চক্রবর্তী।

রানী বলে, আমি মানিনে—

চোর-চক্রবর্তী রাজার পালঙ্ক থেকে রাজরানী চুরি করে নিয়েছিল। ঝিঙের খাট থেকে তোকেও চুরি করব, মানিস কি না দেখা যাবে তখন।

করবে? করো না তাই সাহেব দা—

কৌতূহলে মেতে উঠল রানী সেই সব দিনের ছেলেমানুষ রানীর মতন। মেকি ইহুদি-মাকড়ি নয়—পাথর-বসানো দামী ইয়ারিং ছুটো খাটের ক্ষীণ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে ঝলমলিয়ে ওঠে। বলতে হল চোর-চক্রবর্তীর গল্প—ঘুমন্ত রাজরানীকে চুরি করে নিয়ে চিঁড়েকুটির ঘরে শুইয়ে দেওয়া। ছোট্ট খুকীর মতো রাণী হাততালি দিয়ে ওঠে: পারো যদি, ক্ষমতা বুঝব তোমার সাহেব-দা। চোর বলো যা বলো ঘাড় হেঁট করে তখন মেনে নেবো। করো দিকি তাই। কালীমন্দিরের পিছনে বটতলায় কুটে-বুড়ি একটা বসে থাকে, এনে শুইয়ে দেবে ঝিঙের পাশে। সকালবেলা ঝিঙে দেখে আঁতকে উঠবে।

সাহেব হেসে বলে, কুটে-বুড়ি না হয় রইল, কিন্তু তোমায় কোথা যেতে হবে ভাবতে পারো? এই শহর, দোতলার সাজানো কোঠাঘর, গদির পালঙ্ক থেকে চোর-চক্রবর্তী নিয়ে চলল কত গাঙ-খাল, গাঁ-গ্রাম বিল-মাঠ পার হয়ে ভাঁটির দেশে—জঙ্গলের পাশে ছোট্ট কুড়েঘর বাঁধল। কুমির রোদ পোহায় চরের উপর, সন্ধ্যার পর বাঘ হামলা দেয়, চোত-বোশেখের ঝড়বাতাস যখন-তখন ঘরের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকায়। জলের সমুদ্দুর চারিদিকে, সে জলের একফোঁটা মুখে দেবার উপায় নেই। কলসিতে চাল থেকেও হয়তো বা রান্না হল না মিঠাজলের অভাবে—

রানী আকুল হয়ে বলে, অমন করে লোভ দেখিয়ো না সাহেব-দা। আমি পাগল হয়ে যাবো।

সাহেব সবিস্ময়ে বলে, লোভ কি বলিস রে! আমি তো ভয় দেখাচ্ছি। ভয় পাস না, কী দুঃসাহসী মেয়ে তুই!

জবাবে রানী একটি কথাও না বলে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ল। অন্ধকারে যেন চাপা কান্নার আওয়াজ।

রানীর পিঠের উপর হাতখানা রেখে মৃদুস্বরে সাহেব ডাকল: রানী—সাড়া মেলে না।

কী আমি বললাম তোকে! এই হাসিস, এই কাঁদিস, হয়েছে কি তোর শুনি?

মুখ তুলে রানী যেন হাহাকার করে উঠল: ভাড়াটে-ঘরের মেয়েগুলো হিংসা করে—কিন্তু কী আমি পেলাম, বলো তো সাহেব-দা। খাট আর কোঠা-ঘর আর গয়নাগাঁটি আর আঁস্তাকুড়ের ময়লা আর উনুনের ছাই? এই নিয়ে তুমিও আমায় খোঁটা দিলে। কিন্তু একটা ভিখারি মেয়ের যা আছে, তা-ও যে আমার নেই। আমার বয়সের কত মেয়ে মন্দিরে দেখলে। শাশুড়ি-ননদ জা-জাউলিরা সঙ্গে করে এনেছে। কিম্বা বরকে নিয়ে একলা চলে এসেছে, কোলে হয়তো দুধের বাচ্চাটা। চোখের সামনে ফরফর করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—আমি কখনো ওদের একজন হতে পারব না।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রানী। পাড়ার ঘাটে একটাও মানুষ নেই—রানী আর সাহেব। হঠাৎ সাহেবের কিরকম হয়ে যায়—জুড়নপুরের যুবতী নারীর গায়ের বিষ নিয়ে এসেছিল, তাই বুঝি দপ করে দেহে-মনে আগুন হয়ে জলে ওঠে। গভীর আলিঙ্গনে রানীকে সে বুকের মধ্যে তুলে ধরল।

রানী বোধ করি আচ্ছন্ন হয়েছিল লহমার জন্যে। সম্বিত পেয়ে নড়েচড়ে ওঠে: ছিঃ সাহেব-দা, তুমি এই?

ভর্ৎসনা সাহেব গায়ে মাখে না। অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে, দেবতা বানাবিনে আমায়, খবরদার! আমি মানুষ।

ততক্ষণে ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আলিঙ্গনমুক্ত রানী উঠে পড়েছে। কাঁপছে সর্বদেহে থরথর করে: ছি-ছি।

উদ্যত ফণা সাপের মতন সাহেব গর্জায়: কেন, তোমায় তো পয়সা ফেলে কেনা যায়। যে না সে-ই কেনে। ঝিঙে কিনেছে, আমি কিনতে পারিনে? কত টাকা দাম তোমার?

সাহেব যেন পাগল হয়ে গেছে। পকেটে টাকাপয়সা নোট যা ছিল, মুঠো করে ছুঁড়ে দেয়! বাঁধানো চাতালে ঝনঝন করে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, কত? দাম কত তোমার শুনি?

রানী কেঁদে সাহেবের পায়ের উপর পড়ল। বলে, রাগ কোরো না সাহেব-দা তুমি যে আপন আমার, পথের খদ্দেরে যা করে আপন লোকে কেন তা করবে?

চিবচিব করে মাথাটা কোটে। মুখ তুলল, দু-গালে মেয়ের ধারা নেমেছে। রাগ গিয়ে সাহেবের অনুতাপ আছে। আর লজ্জা। চুপচাপ রইল খানিকক্ষণ। বলতে হয়, তাই যেন অবশেষে বলে, কে আমি তোর রানী, কিসে আপন হলাম ?

শুনতে চাও ? বর—ছোটবেলায় যা সবাই বলত। তুমি বর, কলঙ্কিনী বউ আমি তোমার। আমায় ঘেন্না করো। ঝাঁটা মারো তো পিঠ পেতে দেবো, আদর আমি কেমন করে সইব ?

ঢং ঢং করে ওপারের জেলখানার পেটাঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজে। বেজেই চলেছে—বোধকরি বারোটা। উঠে দাঁড়িয়ে রানী সাহেবের হাত ধরল : চলো বাড়ি যাই। যা তোমার হকের দাবি, চোরের মতন তাই চুরি করে নেবে, খদ্দের হয়ে পয়সা দিয়ে কিনবে, এ আমার সহ্য হয় না সাহেব-দা।

•

বাড়িতে পারুলের ঘরে ছোটখাটো এক কুরুক্ষেত্র। উঠানে পা দিতেই বীররস কানে এসে গেল। রানী ফিসফিস করে বলে, ঝিঙে এসে পড়েছে। তুমি এলেছ টের পেয়ে গেছে কেমন করে। অনেক করে ছুটি চেয়ে নিয়েছিলাম, সে ছুটি বাতিল।

পায়ের শব্দ পেয়েই ঝিঙে দ্রুত বেরিয়ে এলো। কটমট করে একনজর সাহেবের দিকে চেয়ে রানীর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে চলল। একবার রানী তাকিয়েছে বুঝি নিচের দিকে—হেঁচকা টানে ঘরের মধ্যে নিয়ে দড়াম করে দরজা এঁটে দিল। সাহেবের শৈশবের পরমবন্ধু ঝিঙে, এত দিনের পরে দেখা—যা-কিছু মোলাকাত একবার ঐ চোখের দৃষ্টি হেনেই সারা করে গেল।

পারুল সজল চোখে ডাকে : ঘরে আয় বাবা সাহেব। আমাদের খোয়ারটা দেখলি ? মলয়কুমার ক্ষেপে গেছে। মলয়কুমার না কচুপড়া—সেই ঝিঙে শয়তানটা। বাপের টাকা পেয়ে কপালের শিং গজিয়েছে, কথায় কথায় ঢুঁশ মারতে আসে। সন্ধ্যেবেলা রানী বলেকয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ করে আবার এসেছে। হেনস্থা আছে আজ আমার রানীর কপালে।

সাহেব বলে, দু-চারটে কথা আমার কানে গেছে, তোমাদের যেন গরু ছাগলের মতো পুষছে। ঘাড় ধরবার জন্য হাত নিশপিশ করছিল। কিন্তু দেখলাম, বড্ড আপন মানুষ তোমাদের। বিস্তর কষ্টে নিজেকে সামলেছি।

বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল : একদলের মানুষ ছিলাম, দেখাসাক্ষাৎ না করে কি ছাড়ব ? বেরুবে তো সকালবেলা—তোমাদের বাড়িতে কিছু নয়,

পিছন পিছন গিয়ে পথের উপরে ধরে জিভখানা একটানে উপড়ে নেবো। নিয়ে বরঞ্চ সেই জিভ দেখিয়ে যাব তোমাদের।

শিউরে উঠে পারুল না-না—করে উঠল। লাঞ্ছনার জ্বালা নিভে গিয়ে এখন ভয়। বলে, না রে সাহেব, ঝগড়াঝাটি করতে যাসনে। দেখা করেও কাজ নেই ওর সঙ্গে।

সাহেব বলে, ভয় কিসের মাসি? দুনিয়ার উপর কি আছে আমার শুনি, কে-ই বা আছে? যাদের কিছু নেই, তাদের ভয়ও নেই। আমার সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ক্ষতি তোর নয় বাবা, রানীর। বাড়িটা করে দিয়েছে। দলিল লেখাপড়া হয়েছে—এখনো সই হয় নি, রেজেস্ট্রী করে দেয়নি। পড়শি তো কখনো অন্যের ভাল দেখতে পারে না—সকলে কান ভাঙানি দিচ্ছে। এই যে তোর সঙ্গে একটু বেরিয়েছিল—ঠিক কেউ খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, নয়তো টের পাবে কেমন করে?

খেতে দিয়েছে সাহেবকে। তার মধ্যে পারুল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, থাকবি দিনকতক, না যে-দেশে ছিলি সেখানেই ফিরে যাবি?

সাহেব তো পা বাড়িয়েই আছে—রাত কতক্ষণে পোহায়, সেই অপেক্ষা। মুখে উল্টো কথা বলে মজা করে। ঘাড় নেড়ে বলে, ক্ষেপেছ মাসি, এমন শহর-জায়গা ছেড়ে নোনা রাজ্যে কে মরতে যায়! কাঁধে শনি চেপে আমায় তাড়িয়ে বের করেছিল। ভোগান্তি অনেক হয়েছে, আর নয়।

যেমনটা ভেবেছে ঠিক তাই। পারুলের মুখ এতটুকু হয়ে গেল। মুখে তবু হাসির ভাব করে বলে, নিজের জায়গা তোর। এসে পড়েছিস তো থাক যে কটা দিন ভাল লাগে। আমি বলি, দিদিই যখন নেই বস্তিতে কেন পড়ে থাকতে যাবি? জায়গার এমন মহিমা, সাধু-পরমহংস থাকলেও বদমায়েস বলে নাম পড়ে যায়। ভালো পাড়ার কত ঘরবাড়ি রয়েছে, বড়রাস্তার উপর ভালো ভালো সব হোটেল—

সাহেব নিরুত্তরে খাওয়া শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে ভালমানুষের ভাবে বলে তোমার চাবির থোলোটা একবার দাও মাসি—

কেন রে?

আমাদের ঘরটায় তালা দিয়ে গেছে, কোন একটা চাবি যদি খেটে যায়। নয় তো তালাই ভাঙব। ঘর যখন রয়েছে, হোটেল খুঁজতে যাই কেন?

পারুল মরমে মরে যায়: আমি কি তাই বললাম রে, এই বুঝলি শেষটা? তালা খুলতে হয় যা করতে হয়, এক্ষুনি তার কি? ঐ দেখ, রানী মাদুর-বালিশ

পেতে রেখে গেছে, তোকে উপরের ঘরে দিয়ে এইখানে আমার ঘরে সে শুত। ঝিঙে এসে পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিল।

গভীর নিশ্বাস ফেলে পারুল বলে, এইটুকু বাচ্চা থেকে এত বড়টা হলি চোখের উপর। কপালে হল না—আমি তো ছেলে করে নিতে চেয়েছিলাম। এমন খাসা ঘর থাকতে আমিই কি তোকে বাইরে ছাড়তাম? কিন্তু ঐ যে-কথা বললি তুই—গোয়াল করে দিয়ে গরুর মতন রেখেছে আমাদের। দলিলটা ভালোয় ভালোই হয়ে যাক, জবাব তারপরে। সেদিন তোকেই লাগবে বাবা। জিভে অনেক বিষ ছড়িয়েছে, সত্যি সত্যি জিভ উপড়ে শোধ দিবি। এই ক'টা দিন চেপেচুপে থাক—তা ছাড়া উপায় নেই।

পরম দার্শনিক তত্ত্ব পারুলের মুখে: বুঝে দেখ্, মানুষের বলশক্তি রূপ-যৌবন দু-দিনের, কিন্তু ঘরবাড়ি বিষয়আশয় চিরকালের। দিদির হাতে-গাঁটে যদি জোর থাকত, জলসার নামে অমন ছুটে পড়ত না। আমার কপালেও একদিন তাই হবে যদি না আখের গুছিয়ে চলি। আমার রানীরও তাই।

সাহেব তখন বলে, ভোরে চলে যাচ্ছি মাসি। এ-বাড়ি বলে নয়, কালীঘাটেই থাকব না।

পারুল আন্তরিক দুঃখে বলল, কালীঘাট ছাড়তে তো বলিনি বাবা। কাছাকাছি থাকলে এক-আধ দিন তবু চোখের দেখা দেখতে পাবো। এই পাড়া ছাড়া কি জায়গা নেই, এই ছাড়া কি বাড়ি নেই, ঝিঙেটার সামনাসামনি না গেলেই হল। দৈবাৎ যদি দেখা হয়, রানীকে আর আমাকে আচ্ছা করে গালমন্দ করবি। বলবি যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ভালই হবে আমার রানীর।

সজোরে ঘাড় নেড়ে সাহেব বলে, রক্ষে করো মাসি। তোমাদের কালীক্ষেত্র ঠাকুর-দেবতার জায়গা—মা-কালীর আশেপাশে উনকোটি দেবতা। আমাকেও এক দেবতা বানানোর রোখ পড়েছে, মানুষ থাকতে দেবে না। এত দেবতার ভিতরে ভিড় বাড়িয়ে কি হবে? কালীঘাটে নয়, কলকাতা শহরেই আর নয়। সাহেব বলে যে ছিল, সেই মানুষটা মরে গেছে। ঝিঙেকে তাই বোলো।

পারুলের নিচের-ঘরে রানীর পাতা মাদুরে শুয়েছে সাহেব। এক ঘুমের পর উঠে পড়ল। সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরোয়। পারুল জানতে পারে না—জানবে তো ওস্তাদের কাছে কোন্ ছাই শিখেছ এতদিন ধরে? দোতলার বন্ধদার ঘরের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে পড়ে মনে মনে বলে, চললাম ভাই রানী। আমি মরে গেছি—পারুল-মাসি ঝিঙেকে বলবে। তুইও তাই

সত্যি বলে জেনে রাখ। তোর ঘরবাড়ি হোক, সুখশান্তি হোক। কাল রাত্রের মতো চোখে যেন আর কখনো জল না পড়ে।

চোখ বুঝি ভিজে আসে। কড়া হয়ে মনের উপর চোখ রাঙায়ঃ খবরদার!

নিঃশব্দে দ্রুতপায়ে লম্বা উঠানের ফালি পার হয়ে দরজা খুলে গলিতে গিয়ে পড়ল। 'চলনে বিড়াল'—সারি সারি খুপরিঘরের ভাড়াটে বাসিন্দা ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায় না।

গলির শেষে বড়রাস্তায় না গিয়ে উল্টো দিকের আঁস্তাকুড়-আবর্জনা ভেঙে আদিগঙ্গার কিনারে পড়ে। বড়রাস্তা এড়িয়ে চলাই ভাল। কনস্টেবলরা এসময়টা যদিচ চোখ বুঁজে বুঁজে পাহারা দেয়, তা হলেও দুর্জনের মুখোমুখি হবার কি দরকার?

ঘরবাড়ির বাধা পেয়ে গঙ্গার গর্ভ দিয়ে যেতে হচ্ছে। পায়ে পায়ে মাটি বসে যায়। আবছা অন্ধকার। জোয়ার এসেছে, জল বাড়ছে। পায়ের কাছে জল থলথল করে। একদিন বা দু-দিন বয়সের শিশুকে এই নদীস্রোতে বোঁটা-ছেঁড়া পাতার মতন কে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বড় হয়েও ভাসছে। রানী ও অন্যদের সঙ্গে কুমির-কুমির খেলত, উঠানটুক হত নদী—ঠিক তেমনি ডাঙার নদীতেই সাহেব জীবনভোর ভেসে ভেসে চলল। পায়ে মাটি পেল না।

একটা ঘরের পিছনে এসে থমকে দাঁড়ায়। খিলখিল খিলখিল তরঙ্গিত হাসি—হাসি স্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। যে কণ্ঠের হাসি, সে মেয়ে ঠিক যুবতী আর রূপবতী। আশালতা আর রানীর দোসর। চোখে না-ই বা দেখি, রূপসী না হলে হাসি এত মিষ্টি হয় না। অন্ধকার ঘরে সারারাত্রি না ঘুমিয়ে মনের মানুষের সঙ্গে গলাগলি শুয়ে সেই মেয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। ঘরে ঘরে কত জনা এমনি—কত পুরুষ কত মেয়ে গায়ে-গায়ে এক হয়ে আছে!

মনকে তাড়া দেয়ঃ খবরদার, খবরদার! দ্রুত পা চালিয়ে দেরিটুকু পুষিয়ে নেয়। সবজি গাড়ি ধরবে কালীঘাট স্টেশনে গিয়ে। শেষরাত্রে গাঁ-গ্রাম থেকে মাছ ও শাকসবজি বয়ে এনে হাজির করে, শহরের মানুষ চক্ষু মুছে বাজারে গিয়ে যত টাটকা জিনিস পায়। নাম সেইজন্তে সবজি গাড়ি। ঐ ট্রেনে শিয়ালদা—পিঠ পিঠ আবার খুলনার ট্রেন। শহর আজ যেন চাবুক উঁচিয়ে সাহেবকে তাড়া করেছে।

তারার ঝিকিমিকি আকাশে। অনেক দূরে অস্পষ্ট কালীমন্দিরের চূড়া দেখা গেল। হাতজোড় করে সাহেব কপালে ঠেকায়ঃ যাচ্ছি মা, আর আসব না।

আর্তনাদ শুনে হঠাৎ চমক লাগল। মহাশ্মশান—সেই শ্মশানে কে-একজন

মাথা কুটে কুটে কাঁদছে : ওগো তুমি কোথায় গেলে, তোমায় ছেড়ে থাকব কেমন করে? কত রাত্রি কাটিয়েছে এইখানে, এমন কত কান্না শুনেছে! সুধামুখীকে লাসঘর থেকে এই শ্মশানে এনে দাহ করেছিল। গরিব নফরকেষ্ট ধারধোর করে এবং নিজের সামান্য সম্বল খরচ করে সুধামুখীর শেষ-কাজ করেছে, তাতে কোন ত্রুটি হতে দেয়নি। মন্দির উদ্দেশ করে যা বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই কথাগুলো আবার সাহেবের মুখে এসে যায় : চলে যাচ্ছি মাগো—

ঘরগৃহস্থালীর আনাচকানাচ দিয়ে মানুষের হাসিকান্নার পাশ কাটিয়ে দ্রুতপায়ে সাহেব ছুটেছে। তারপরে ট্রেন। দিনমান এখন রোদ চড়ে উঠেছে। দু-পাশের জীবনযাত্রা সড়াক-সড়াক করে অন্তরালে চলে যায়। মাঠে লাঙল চষছে। মাল বোঝাই গরুর-গাড়ি চলেছে কাঁচা-রাস্তায়। ঘাটে চান করছে বউঝিরা। খোলা আটচালার পাঠশালে পড়ুয়ার দল। সাহেব এদের কেউ নয়, চোখে দেখে যায় শুধু। দেখলই কেবল সারা জীবন—নিশিকুটুম্ব রয়ে গেল, দিনমানের কুটুম্ব কখনো কারো হল না।

বাইশ

সেই প্রথমবার সাহেব খুলনার ঘাট থেকে বলাধিকারীর নৌকোয় গিয়েছিল। সে রকম মহাশয়-মানুষ প্রতিবারে মেলে না। সস্তায় শেয়ারের নৌকোও ঘাটে নেই। না-ই বা থাকল, ভাবনার কি? বিবেচক ভগবান পা পা দিয়ে রেখেছেন। একখানা নয়, দু-দুখানা। হেঁটে চলো সেই ভগবানের পৃথিবী দেখতে দেখতে। অসুবিধা যাওয়ার ব্যাপারে নয়—গিয়ে উঠবে কোনখানে সেই হল ভাবনা।

হাঁটতে হাঁটতে দিন-পাঁচ-ছয় পরে গুরুপদর বাড়ি।

সাহেব হঠাৎ কোথা থেকে?

গুরুপদ বেজার হয়ে আছে। একসঙ্গে দুনিয়া চষে বেড়িয়ে মুনাফার কাজ জুড়নপুরের দিনেই সে ফাঁক পড়ে গেল। দোষ তার নিজের। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, অন্যের ভালো দেখে বুক চড়বড় করে না এমন নিরেট বুক কার?

হঠাৎ কি মনে করে সাহেব?

সেই যে নেমন্তন্ন করেছিলে বাইটা-বাড়ি থাকবার সময়—

ভালোই তো, বড় আহ্লাদের কথা। বিপদ হল, ঢেঁকিতে বউয়ের হাত ছেঁচে গিয়েছে। সে আবার ডানহাতটা—বাঁ-হাত হলে বলতাম, চুলোয় যাকগে। রান্নাবান্না বিনে সংসার আমার অচল।

আসল কথাটা বুঝতে বাকি থাকে না। তবু ভয় দেখাবার জন্য সাহেব বেশি করে বলে, ভালো রাঁধতে পারি গুরুপদ ভাই। যদ্দিন হাত না সারছে, আমিই তা হলে থেকে যাই।

ঘরের মধ্যে গুরুপদর বউ, সেখান থেকে সে করকর করে ওঠে: হাত ছেঁচে গিয়ে কোন্ কাজটার কসুর হচ্ছে শুনি? পুরুষের কাজ চাল এনে দেওয়া, আমার কাজ পিণ্ডি সেদ্ধ করা। ওর কাজ ও করুক, আমারটা না হলে তখন যেন বলতে আসে।

অতএব সেই গোড়া থেকেই ধরতে হবে। চাল আনা থেকে। হোক তবে তাই। ধামা নিয়ে আমার সঙ্গে চললা গুরুপদ।

ভানকিরা ধান ভেনে চাল বিক্রি করে। এক ভানকির কাছ থেকে চাল কিনে চালের ধামা গুরুপদর হাতে দিয়ে সাহেব হনহন করে চলে যায়।

চললে আবার কোথা?

সাহেব বলে, তোমার বউ যখন রাঁধতে পারবে, আর আমায় কি দরকার? আমি সোনাখালি যাই। বেলা হয়নি, দেখতে দেখতে গিয়ে পড়ব।

শোননি বুঝি? সোনাখালির সে সোনা নেই। ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ল গুরুপদর: বাইটা চলে গেলেন। বিদ্যের পাহাড়। কী তুমি দেমাক করো সাহেব—পেয়েছ সেই পাহাড়ের পাথর দু-চার টুকরো। আমাদের তা-ও নয়। সব বিদ্যে কাঁধে বয়ে নিয়ে গেলেন। স্বর্গ-নরক যেখানেই যান, সে জায়গায় এখন সামাল-সামাল পড়ে গেছে।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহেব: বলো কি গুরুপদ, কি হয়েছিল?

নাড়ি ফেটেই গেলেন। রোগ জিজ্ঞসা করলে বলব, খাওয়া। আমরা সব না খেয়ে মরি, পচা খেয়ে মরলেন।

মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে শোনা গেল। বাড়িতে যজ্ঞি, মুরারির ছোট ছেলেটার অন্নপ্রাশন। ভিয়ান হয়েছে—ময়রা রসগোল্লা বানিয়ে চিনির রসে ফেলে চলে গেছে। বুড়ো বাইটার ভয়ে ভাঁড়ারঘরে তালাবন্ধ করে রাখা। কিন্তু ও-মানুষ যদি ইচ্ছে করে, ত্রিভুবনের মধ্যে কে ঠেকাবে? রসগোল্লা রস সমেত সাপটেছে। পেটে গিয়ে সেই জিনিস ফুলতে লাগল। গুরুপদর স্থির বিশ্বাস, পেটের ভিতরের নাড়ি ফেটে গিয়েছিল। ট্যাপামাছের মুখে ফুঁ দিয়ে ছেলেরা যেমন পেট ফাটায়।

তবে আর কি, সোনাখালিরও সম্পর্ক শেষ। স্রোতে ভাসছে সাহেব— তৃণগুচ্ছ মুঠোয় ধরে একটু জিরিয়ে নেয়, তার মধ্যে আবার একটা ছিঁড়ল।

ডাইনে সোনাখালির পথ ধরেছিল, ঘুরে বাঁয়ের দিকে মোড় নিল। এ পথ ফুলহাটার। বলাধিকারী আর বংশীর কি গতিক, দেখা যাক গিয়ে।

সেখানে খবর ভালো। ফুলহাটায় পা দিয়ে কুঠিবাড়ির কাছে বংশীর সঙ্গে দেখা। আস্ত কলাগাছ কাঁধে নিয়ে চলেছে, কুচিকুচি করে কেটে গরুর জাবনায় দেবে। ঘোর সংসারী বংশী। সাহেবকে ধরে এই টানাটানি : চলো, আমাদের বাড়ি থাকবে। বউ তোমার কথা বলে—

সাহেব শিহরণের ভঙ্গি করে বলে, ওরে বাবা! যা দারোগা-বউ তোমার, ঠেঙানি দেবে কায়দার মধ্যে পেলে।

যদিচ রঙ্গরসিকতা, বউদের নিন্দায় মর্মাহত হয়ে বংশী বলে, গিয়ে দেখই না ঠেঙানি দেয়—না আসন পেতে পা ধোবার জল দেয়, পান-তামাক দেয়, ভাতব্যঞ্জন দেয়।

বংশীর সুখসৌভাগ্যের কথা শুনতে শুনতে সাহেব যাচ্ছে। দশধারার বিপদ গেছে, যথোচিত বন্দোবস্ত পেয়ে বুড়ো-দারোগা বংশীর নাম তুলে নিয়েছে আসামির লিষ্টি থেকে। বউ-ছেলে, গরু-বাছুর, জমি-জিরেত ছাড়া কিছু সে জানে না। জানবেও না আর এ জীবনে। সাহেব হতেই সমস্ত, বউ অহরহ সেকথা বলে। দেখা হলে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে। গুরুঠাকুরের মতো আদরযত্ন করবে, দেখতে পাবে।

শতকণ্ঠে বউয়ের গুণগান। কানে শোনে সাহেব, আর বংশীকে দেখতে দেখতে যায়। ক্ষমতা আছে সত্যিই বউয়ের—বংশীর চেহারায় রীতিমতন চিকন আভা। দিনরাত এত খাটনি খাটে, তথাপি যেন ভুঁড়ির লক্ষণ। শুকনো কাঠে কুসুম-মঞ্জরী।

কিন্তু বংশীর বাড়ির দিকে না গিয়ে সাহেব সোজাসুজি চলল।

কি হল?

তোমার কথা শুনে ভয় ধরে গেল বংশী। তোমার নিজের দশাও চোখে দেখছি।

দশাটা মন্দ কি দেখলে?

সাহেব বলে, মন্দ নয়—ভালো। বাগে পেলে তোমার বউ আমাকেই ভালো বানিয়ে দেবে।

বংশী বলে, ভালো হওয়াই তো ভালো রে—

সাহেব রেগে যায় : কষ্ট করে এতসব শিখলাম কেন তবে? কু-ডাক ডেকো

না বংশী মন্দ আমি হবোই। আলবৎ হবো—চেষ্টায় কী না হয়! কে আছে আমার, ভালো হবার কী দায় পড়েছে, কোন দুঃখে আমি ভালো হতে যাব?

হনহন করে সোজা একেবারে বলাধিকারীর বাড়ি।

এসে গেছিস, ভাবছিলাম তোরই কথা। সাহেবের কানের কাছে হাসি-হাসি মুখ এনে বলাধিকারী সুখবর দিলেন: নতুন মরসুম এইবার, নতুন কাজ-কর্মের বিলি-ব্যবস্থা। কাপ্তেন কেনা মল্লিক এর মধ্যে একদিন এখানে এসে হাজির। মানুষটা গুণের কদর জানে, মুখের গল্প শুনেই লাফিয়ে উঠল: কোথায় সে সাহেব, খবর করে এনে দিন।

বলছেন, দুদিনেই কাপ্তেনের সুনজরে পড়বি তুই। ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি, কোন বেটা রুখতে পারবে না। নতুন মানুষ বলে এবারে না-ই হল, আগামী সন থেকে কোন একটা দলের সর্দারি দিয়ে দেবে। মজা করে এখন খাওয়া-দাওয়া কর, ঘুমো। মরসুম পড়ে গেলে তখন ছুটোছুটির অন্ত থাকবে না।

কাপ্তেন কেনারাম মল্লিক। ধুরন্ধর কাপ্তেন বেচা মল্লিক ছিল, তারই কনিষ্ঠ। কাপ্তেন তো কতই আছে কত জায়গায়, কিন্তু কেনারাম দ্বিতীয় নেই। এলাহি কাজকারবার। বউ চার-চারটে। পুরো বর্ষাকালটা বাড়ি থেকে চার বউয়ের সঙ্গে একত্র সংসার। দুর্গাপূজা অন্তে বিজয়া দশমীর পরের দিন দশেরা—কাজের সূচনা ঐ দিন।

রাতদুপুরে কেনারামের বাড়ি বহু লোকের মীটিং। মীটিং বলে না এরা, পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত পাকা ব্যবস্থা করে দেবে, তার পরেই শুভদিন দেখে নানান দল ও দলে ভাগ হয়ে বিষয়কর্মে বেরুনো। কেনারামের বুড়ি-মা এখনো বেঁচে—মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিজেও সে বেরোয়। পানসি নিয়ে গাঙে খালে ঘুরে সকলের তদ্বির-তদারক করে বেড়ায়। বড়বউ বাদে অন্য তিন বউয়ের কোন একটা অন্তত থাকবে নৌকোয়। বড়বউ গিন্নিমানুষ—সে বাড়ি না থাকলে সংসার অচল। বড়বউয়ের যাওয়া কখনো সম্ভব নয়।

পঞ্চায়েত জমজমাট। মনে তো হয়, অতিশয় অমায়িক মানুষ কেনারাম। সকলের কথা শুনছে, হেসে কথাবার্তা বলছে সকলের সঙ্গে। অথচ কাজের দরকারে এই কেনারাম নাকি নিজ দলের কারিগর ঈশ্বর মান্নার মুণ্ডু কেটে নিয়ে সরে পড়েছিল। মন টলেনি, হাত কাঁপে নি। খোদ পচা বাইটা বলেছিল সাহেবকে, গল্প অতএব মিথ্যা হতে পারে না।

চারখানা গাঁয়ের বাছা বাছা মরদের জমায়েত। মেয়েলোকও আছে—যারা

বেরিয়ে পড়বে, তাদেরই ঘরের কিছু মেয়েছেলে। এবং মেয়েলোক এলে কোলের বাচ্চাও ফেলে আসবে না—বাচ্চারাও পঞ্চায়েতের জরুরি বৈঠকে। কারা সব যাবে, রোজগারের ভাগ-বাঁটোয়ারা কেমন হবে এবারে, কোন লোকের কি রকম অংশ—মরসুমের মুখে যাবতীয় বন্দোবস্ত পাকা করে বেরুতে হয়। পরিণামে যাতে কথা-কথান্তর না হয়, গণ্ডগোল না বাধে। অনেক দলে ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম সব দলের একরকম নয়। ভাগের সেইজন্যে রকমফের।

প্রতি দলে ওস্তাদ একজন করে। কাজের যাবতীয় বুঝসমঝ তার কাছে—সিঁধ কাটা, মাল সরানো, লাঠি বা লেজা চালানো, যেমন যেটির প্রয়োজন। কোথায় কোন্ কায়দায় চলাচল—সাপের মতন বুকে হেঁটে, কিম্বা বাঘের মতন হামলা দিয়ে? সাধারণ নিয়মের যে ভাগ তার উপরে একটা বিশেষ ভাগ সেই লোকটার নামে—যাকে বলে ওস্তাদ-ভাগ। সকল কাজেই ওস্তাদ যে হাজির থাকবে, এমন নিয়ম নয়। ওস্তাদ বিহনে সর্দার তখন দলের কর্তা। প্রেসিডেণ্ট গরহাজির হলে ভাইস-প্রেসিডেণ্টকে চেয়ারে বসায়, তেমনি আর কি! সর্দারেরও বিশেষ ভাগ একটা—পরিমানে, অবশ্য অনেক কম ওস্তাদ-ভাগের চেয়ে। বড় বড় দলে আবার জমাদার বলে পদ থাকে সর্দারের উপরে। অ্যাডিসন্যাল বা অতিরিক্ত ওস্তাদ। আছে মহাজন। সে মানুষ ঘরে বসে থাকে, এক পা-ও বাইরে যায় না, কিন্তু দায়দায়িত্ব কাঁধে বিস্তর। কাপ্তেন কেনা মল্লিকের এত প্রতিপত্তি বলাধিকারীমহাশয়ের মতন বিচক্ষণ মহাজন পৃষ্ঠপোষক আছেন বলেই। দলের মানুষ যতদিন না ফিরছে, বাড়ির দরকার মতন মহাজন টাকাটা সিকেটা জুগিয়ে যাবে। মরদ ফিরে এলে হিসাবপত্র হবে। সুদ লাগে না—কিন্তু মহাজনি ভাগ আছে, সুদের উপর দিয়ে যায় সেটা। আর আছে খুঁজিয়াল—যারা খোঁজখবর এনে দেয়। অর্থাৎ স্পাই। এ কাজে ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের জুড়ি নেই। নিতান্ত খাতির-উপরোধ ছাড়া এখন আর বেরোয় না। কিন্তু বয়স হয়ে গেলেও ক্ষমতা পুরোদস্তুর বজায় আছে। বেরুল তো একখানা দু-খানা তাজ্জব কাজ গেঁথে আনবে—সে কাজের চেহারা দেখে হাল আমলের তরুণ খুঁজিয়ালদের চক্ষু কপালে উঠে যায়।

নানান ধরনের ভাগিদার। পঞ্চায়েত বছর বছর সকলের হিস্যা ঠিক করে দেয়। মরসুমের সুবিধা অসুবিধা নিয়েও রকমারি বিবেচনা। কেউ হয়তো মারা পড়ল বিভুঁয়ে—রোগপীড়ায় মরতে পারে অথবা খুনজখম হয়ে। তেমন ক্ষেত্রে বাড়ির লোকের প্রাপ্য কি? খুনজখমে বেশি পাওনা—মরেই যদি, জ্বর-ওলাওঠায় না মরে যেন খুন হয়ে মরে, মনে মনে প্রতিজনের এই বাসনা। যে

বাড়ি দ্বিতীয় পুরুষ নেই—মানুষটা বেরিয়ে গেলে গুচ্ছের মেয়েমানুষ পড়ে থাকবে, সে বাড়ির মেয়েমানুষই পঞ্চায়েতে চলে এসেছে পাওনাগণ্ডার কথা স্বকর্ণে শুনে যাবে বলে।

বাছা বাছা মরদ নিয়ে পঞ্চায়েত, কিন্তু খবর ইতরভদ্র সকলের জানা। রটনা একটা চালু করা আছে—মরদেরা নাবালে ধান কাটতে যাচ্ছে। আর কতক যাচ্ছে নাকি ব্যাপার-বাণিজ্যে—নৌকোয় যাবে তারা। কেনারাম মল্লিক চলেছে নিজের আবাদ তদারকি কাজে—ক্ষেতের ধান খোলাটে তুলে পাইকারদের মেপে দিয়ে নগদ তঙ্কা গনে নিয়ে ফিরবে। থানা দূরবর্তী, পুরো বেলার পথ। তা বলে কৈলাস থেকে ভোলানাথ নেমে এসে দারোগা হয়ে বসেন নি—দেশসুদ্ধ মানুষ জানে, তিনিই বা না জানবেন কেন? ধান কাটার কথা শুনে দারোগা মুখ টিপে হাসেন অন্তরঙ্গ মহলে : কাটবে তো কিছু বটেই—ক্ষেতের ধান না হল, ঘরের দেয়াল।

ব্যস, মুখের ঐ মন্তব্যেই শেষ। এলাকার ভিতরে চুরিচামারি হবার শঙ্কা নেই। কার ঘাড়ে ক'টা মাথা কেনা মল্লিকের জায়গায় ঢুঁ মারতে আসবে? দারোগা সেটা নিঃসংশয়ে জেনেবুঝে আছেন, তাবৎ গ্রামবাসীও জানে। তার উপরে কেনারাম অতিশয় বিবেচক ব্যক্তি—অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী যার যেমন প্রাপ্য ঘরে বসেই ঠিক ঠিক পেয়ে যাচ্ছেন। চুপচাপ থেকে লাভ বই লোকসান নেই কারো পক্ষে।

উল্টে বাইরের কত গ্রাম এসে কেনারামের কাছে ধন্না দিয়ে পড়ে, কী দোষে তারা বছরের পর বছর বাদ পড়ে থাকবে, তাদের নিয়েও আলাদা দল গড়া হোক। কিন্তু এলাকা বাড়াতে কেনারাম রাজি নয় : তামাম মুলুক জুড়ে নিয়ে সামাল দেব কেমন করে? কেনারাম ছাড়া কি কাপ্তেন নেই? অন্যদের ধরো নিয়ে।

হালফিল কয়েকটা মরসুম ভোকরাদের গ্রাম থেকেও ধরাধরি চলছে। ভোকরা—যারা সিঁধকাঠি লেজা-সড়কি বানানোর ওস্তাদ। এবারের পঞ্চায়েতে—চোখে দেখেও বিশ্বাস হবার কথা নয়—সকলের বড় কারিগর যুধিষ্ঠির নিজে এসে উপস্থিত।

কেনা মল্লিক অবাক হয়ে বলে, তুমি এর মধ্যে কেন? রাতদিন খাটনি খেটেও খদ্দের সামাল দিয়ে পারো না—তোমার কোন অভাবটা আছে শুনি?

যুধিষ্ঠির বলে, পয়সাকড়ির অভাব নয় মহারাজ। মরসুম লেগে গেলে আমার সব খদ্দের তো বেরিয়ে পড়বে, কাজকর্মেরই অভাব এইবার। সেইজন্যে আসতে হল। এখন গৃহস্থের দা-কুড়াল গড়ানো, আর নয়তো হাত-পা কোলে করে বসে থাকা। কোনটাই আমি পারিনে।

তার হাতের গড়া কাঠি নিয়ে নলের মানুষ দেশদেশান্তর বেরিয়ে চলল, যুধিষ্ঠির ভোকরার মন উড়ু-উড়ু। দা-কুড়াল ইত্যাদি গড়বার জন্য আছেন কর্মকার-মশায়েরা। ভালো জাত তাঁরা নবশাখের অন্তর্গত। বিদ্যে শিখে তাঁদের কতজনা শহরে গিয়ে দালান-কোঠা দিচ্ছেন। ঘরব্যাভারি দা-কুড়ালের কাজ যুধিষ্ঠিরও চেষ্টা করে দেখেছে। গত বছর দেখেছে, তার আগেও দেখেছে অনেক। এই কাজে হাপর টানতে গিয়ে সর্বদেহ ঝিমিয়ে আসে কেমন। নেহাই-এর উপর তপ্তলোহা পিটতে লক্ষ্য ভুল হয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক বাড়ি পড়ে। পিটতে পিটতে অন্যমনস্ক হয়: তারই হাতের যন্ত্র নিয়ে কত কারিগর রাজভাণ্ডার পলকে উজাড় করে আনছে, তার অস্ত্র হাতে করে নিঃশঙ্কে কত জনে পায়তারা কষে বেড়াচ্ছে এই নিশিরাত্রে, আর সে এখানে চালাঘরে বসে বসে শ্বাসরোগীর নিশ্বাসের মতো একটানা হাপরের আওয়াজ শোনে। হঠাৎ খেয়াল হয়, হাপর টানা বন্ধ হয়ে গেছে কখন, কাঠকয়লার আগুন নিভে গেছে। আবার নতুন করে ধরাতে মন যায় না, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যুধিষ্ঠিরের অবস্থা।

তাই সে কেনা মল্লিকের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল: মহারাজ, আমার হাতেরও একখানা কাজ পরখ করতে আজ্ঞা হোক। দিয়ে দেখুন একটিবার গরপছন্দ হলে আয়েন্দা সন আর কিছু বলব না। লোহাই পিটে যাব, দা-কুড়ুল বঁটি-খন্তা গড়াব।

কেনা মল্লিক বলে, হাতের কাজ তো হরবখত দেখাচ্ছ। মুলুক-জোড়া তোমার কাঠির নাম। তোমার গড়া কাঠি হাতে তুললে সাধুমহান্তেরও হাত সুড়সুড় করে। কার ঘরের দেয়াল কাটি, এই তখন মনের অবস্থা।

বলতে বলতে মল্লিক হেসে ফেলে: এত দেখাচ্ছ, আবার কোন গুণ পরখ করতে বলো এর উপরে?

যুধিষ্ঠির বলে, কাঠি গড়ে দিই—সে কাঠি ধরতেও পারি মহারাজ। হুকুম হয়ে যাক, আমিও বেরিয়ে পড়ি নলের সঙ্গে। বিনি কাজে ঘরে থাকা যায় না।

যুধিষ্ঠির সম্প্রতি নতুন এক নম্বর সাঙা করেছে। ব্যাপারটা কেনা মল্লিক জানে। বলল, কাজ না থাকাই তো ভাল। সাঙার বউর সঙ্গে বসে বসে ফষ্টিনষ্টি করবে।

এই ভোকরা জাত হিন্দু কি মুসলমান, বলা কঠিন। হিন্দু দেবদেবী নিয়ে নাম, কালীপূজা করে। কিন্তু সাঙা চলে এদের মধ্যে, মরার পর কবর দেয়।

কেনা মল্লিক পঞ্চায়েতের সর্বদিক নজর ঘুরিয়ে বলে, কথা শোন ভোকরার পো'র। কাজ নেই বলে নতুন বউ ঘরে ফেলে বেরিয়ে পড়বে।

যুধিষ্ঠির বলে, আমি যাব, আর বউ বুঝি ঘরে পড়ে থাকবে? সে যাচ্ছে তিলেসোনার জগদ্ধাত্রীপূজোর মেলায়। আমার বেরুনো তো তারই ঠেলায়। চৌপহর খিচখিচ করে: চালের নিচে বসে বারোমাস ঠুকঠুক করবে বাইরের কাজ ধরবে না—এ কেমনধারা পুরুষমানুষ!

তখন মালুম হল। যুধিষ্ঠিরের যাওয়া নিজের ইচ্ছেয় ততটা নয়—সাঙার বউ তাড়িয়ে তুলছে। আগের বউগুলো ভদ্রপাড়ার বউঝি'র মতো—ঘরে থেকে রাঁধাবাড়া ও সংসারধর্ম করে আসছে। বুড়োবয়সের সোহাগী বউ তাতে রাজী নয়—চিরকালের জাতব্যবসা ধরবে। সে হল ভিড়ের মধ্যে পকেট মারা এবং দিনে রাত্রে অন্য দশরকমের অভব্য রোজগার। ডোকরা মেয়েদের স্বভাবগত ক্ষমতা, মা-ঠাকুরমা হতে চলে আসছে—শিখে নিতে হয় না কিছু।

পঞ্চায়েতের কাজ এক রাত্রে মিটল না। পরের রাত্রেও বসতে হয়। বেরুনো কালী-নিরঞ্জনের পরের দিন। খড়ি পেতে আচার্যি ঠাকুর দিন সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। জঙ্গলের মধ্যে বিরিঞ্চি-মন্দির বলে একটা জায়গা—বিরিঞ্চি বা কোন নামেরই বিগ্রহ নেই সেখানে। মন্দিরও নেই—পাতলা পাতলা সেকেলে ইটের স্তূপ, দেয়ালের তিনটে দিকের খানিকটা মাত্র খাড়া। রাবিশ সরিয়ে সেখানে ভাঙা-চোরা বেদি বের করেছে, কালী-প্রতিমার স্থাপনা সেই বেদির উপর।

পূজো নিশিরাত্রে—কালীপূজোর যেমন যেমন বিধি। পাঁঠাবলি অনেক-গুলো, তার সঙ্গে মহিষও একটা। সে এক কাণ্ড! সন্ধ্যে থেকে মহিষটার শিঙে আর ঠ্যাঙে দড়ি টানা দিয়ে শুইয়ে ফেলে দুই মরদ গলার দুই দিকে ঘি মালিশ করছে। মালিশে চামড়া নরম হয়। অত বড় জীবটা এক কোপে কাটতে হবে, কোপে দুখণ্ড না হলে সর্বনাশ—সেজন্য বিস্তর রকম তদ্বির। সকলের উপরে অবশ্য দেবীর করুণা। তাঁর ইচ্ছা না হলে বাধা পড়ে যাবে, মেলেতুকে যত ধারই থাকুক আর কামার যতই বলবান হোক।

বলিদান সমাধার আগে পর্যন্ত কেনা মল্লিকের সোয়াস্তি নেই। প্রতিমার সামনে করযোড়ে অবিরাম মা-মা—করছে। চার বউ তার ডাইনে বাঁয়ে। তারপর উল্লাসের চিৎকার: নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে, তুষ্ট হয়ে দেবী বলি গ্রহণ করেছেন। পূর্ণসিদ্ধি। রক্তজবা নিয়ে কাপ্তেন নিজে এবার অঞ্জলি দিল।

পূজো শেষ। পুরুত এবং বাইরের যারা ছিল, বিদায় হয়ে গেল। পূজোর যাবতীয় উপকরণ সরিয়ে নিয়ে গেছে। আসল কাজ এইবারে। শুধুমাত্র নিজেদের লোক ক'টি। তক্ষক ডেকে উঠল অরণ্যের কোনখানে। বারকয়েক ডেকে ডেকে থেমে যায়। একেবারে নিঃশব্দে, গাছের পাতাটি পড়লে কানে

পাওয়া যাবে এবার। মস্তবড় মাটির প্রদীপ জলছে দেবীপ্রতিমার সামনে। বাতাসে আলো কাঁপে—চারটে সলতে একসঙ্গে ধরানো, সেইজন্য নিভে যায় না। কাঁপছে আলো ঘন ডাল-পাতার উপর। নিরেট অন্ধকারের গায়ে বাঘের মতন ডোরা কেটে যাচ্ছে। আলো পড়ছে বলির রক্তস্রোতের উপর। নিরুদ্ধশ্বাস থমথমে ভাব চতুর্দিকে।

কাপ্তেন কেনা মল্লিক হাঁক দিয়ে উঠল: সামনে চলে এসো তোমরা।

আবছা আবছা এতক্ষণ দু-পাঁচটিকে দেখা যাচ্ছিল। তারা এগিয়ে এলো। তারপর আরও সব আসতে থাকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একসঙ্গে এত মানুষ ছিল অন্ধকারে! গাছগাছালি আর গায়ের রঙে অন্ধকারের মধ্যে এক হয়ে মিলে ছিল।

এগিয়ে এসে মানুষ বলির রক্ত আঙুলে চুবিয়ে ফোঁটা দেয় কপালে। প্রতিমার পদতলে হাত রেখে মন্ত্রের মতো বলে যায়, এক-দল আর এক-দিল। দলের খবর বাইরে যাবে না, গলা কাটলেও কথা বেরুবে না।

প্রসাদী পাঁঠার পাকশাক ওখানেই। ফুর্তিফার্তি সারারাত্রি ধরে। সকাল-বেলা চোখ লাল করে সব ঘরে ফেরে। সারাদিন ঘুমোয়।

সন্ধ্যার কিছু আগে যাত্রা—আচার্যি ঠাকুর ঘণ্টা-মিনিট ধরে বলে দিয়েছেন। সাহেবও একটা দলের সঙ্গে। কালীঘাটের সম্পর্ক চুকিয়ে-বুকিয়ে এসে ভাঁটি অঞ্চলের দল বেঁধে এই ভেসে পড়ল। নদীর ভাঁটায় থোপা থোপা কেউটেফেনা ভেসে যায়, তেমনি।

কাক ডেকে উঠল না? ডালে বসে কাক ডাকছে। দলের সর্দার পিছিয়ে ছিল, উৎসাহে ছুটে চলে আসে। সাহেবকে সামনে পেয়ে বলে, দেখ দিকি, পুকুর যেন ঐখানে। সেই রকম মনে হয়।

সাহেব এগিয়ে দেখে বলল, পুকুর কোথা? ডোবা একটা—

জল আছে, তা হলেই হল।

পুকুর-ধারে গাছের উপর কাক ডাকা ভারি সুলক্ষণ। ফুর্তি সকলের। সর্দার বলে, জল রয়েছে তখন পুকুর ছাড়া কী! জঙ্গলের মধ্যে তোমাদের জন্য দীঘি কেটে ঘাট বাঁধিয়ে কে দিচ্ছে! কাক ডাকছে, কাজের বড্ড জুত এবারে।

[illegible] আর একবার কাক দেখার ঘটনা পুরানো কারিগরের মনে এসে যায়। কাপ্তেন নিজেই সেবার একটা দলের সর্দার হয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বর মাল্লাকে বলল, গাছটা জলের ধারে কিনা দেখে এসো। জলে ঠিকই—একটা মহিষ কাদাজলে

অর্ধেক গা ডুবিয়ে আরামে পড়ে আছে। জলে ও ডাঙায় মেকো-কাঁকড়া কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ঈশ্বর পাড়ের কাছে গিয়েছে, আর কাক সেই সময়টা একটা কাঁকড়া ঠোঁটে নিয়ে মহিষের পিঠে বসল। সাংঘাতিক দৃশ্য। নিঃসন্দেহ এরই ফলে ঈশ্বর হেন পাকা সিঁধেলকে সিঁধের ভিতর জাপটে ধরল। এবং পরিণামে প্রাণ গেল গুণী মানুষটার।

পরে যখন আচার্যি ঠাকুরের কানে ঈশ্বরের এই বৃত্তান্ত গেল, তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন: জলের ধারে কাক ডাকল—কানে শুনে নিলে, ঐ পর্যন্ত। সেই কাক উড়ে কোথায় বসে—কী দরকার ছিল তাকিয়ে দেখবার! দেখতে গিয়েই সর্বনাশ। মহিষ শুয়োর বা মড়ার উপর কাক বসেছে—চোখে দেখে সেই চক্ষু শতেকবার গঙ্গাজলে ধুয়ে ফেললেও দুর্ভোগ এড়ানো যাবে না। শাস্ত্রে এই রকম বলে।

সেই ঠেকে শিখল। কাকের দিকে চোখ তুলে না চেয়ে দলের মানুষ দ্রুত এগিয়ে যায়। চলেছে। খাল পার হতে ভোর হয়ে এলো। ওপারে চৌমাথা একটি—নানান দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। চৌমাথার উপর দাঁড়িয়ে পড়ল—চোর পথের কোন্‌টা ধরে যাবার হুকুম আসে দেখ। এদিক-ওদিক তাকায় আর ভাবে।

থুতু ফেলে সর্দার বাঁ-দিককার পথে। উন্মত্ত কালী, বাঁয়ের পথ ধরি কিনা বলো।

বেদীর সম্মতি থাকলে শিয়াল ডেকে উঠবে জঙ্গলের কোনখানে। সেই সঙ্কেত। চুপচাপ কান পেতে আছে।

অপেক্ষায় কাটে কিছুক্ষণ। সাড়া আসে না। সর্দার ব্যাকুল হয়ে বলে, যাবো কোন্ দিকে, ঠিকঠাক বলে দাও। ঝুলিয়ে রেখো না। কানা-খোঁড়া বেওয়া-বিধবা বাচ্চা-বুড়ো বিস্তর পুষ্যি। ঘরবাড়ি ফেলে যাচ্ছে মরদেরা, বাড়ির লোকের খাওয়াপরা আছে। মুখ ঘুরিয়ে থাকলে হবে না মা-জননী। বলে দাও, বলে দাও—

থুতু ফেলে এবারে ডানদিকে। নিঃশব্দ। নিশ্বাসও বুঝি পড়ে না কারো। শিয়াল ডেকে উঠল। অনতি পরে। হয়েছে, হয়েছে—মিলে গেছে হুকুম।

স্ফূর্তিতে যাত্রা এবার। চোরা-যাত্রা। দক্ষিণে অর্থাৎ আরও নাবালে নেমে চলল এই দল। নানান দল এমনি নানা দিকে—দেশ-দেশান্তর বিজয়ের সৈন্যবাহিনী যেন। সেনাপতি মা-কালী। অলক্ষ্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আছেন, হুকুম-হাকাম যত কিছু তিনিই দিচ্ছেন। সর্দার একজন উপলক্ষ মাত্র। অনাচার অনিয়ম না ঘটে, সতর্ক থেকো। ধনদৌলতের পাহাড় নিয়ে ঘরের মানুষ ঠিক ফিরে আসবে।

তেইশ

চোর-যাত্রা। এ যাত্রার বিরাম হল না সাহেব-চোরের জীবনে। বুড়ো হয়ে এক সময় জবুথবু হয়ে পড়ল সাহেব—সোনাখালি এসে গুরু পচা বাইটাকে যে অবস্থায় দেখেছিল। সেই বয়সকালের কথা ভাবে বসে বসে, ছোঁড়াদের কাছে সে আমলের গল্প করে। ঘরবাড়ি পথঘাট গাঙখাল নিয়ে বিশাল ভাঁটিঅঞ্চল যেন মাঠ একখানা, সেই মাঠের উপর খেলা করে করেই জীবন কাটিয়ে দিল। কাজের এমন নামডাক—সাহেব নিজে কিন্তু খেলার বেশি ভাবতে চায় না। খুব বেশি তো কাজ-কাজ খেলা।

বংশীর বাড়ি একটা আস্তানা, দায়ে-বেদায়ে সাহেব সেখানে এসে ওঠে, বংশীর বউ আদর-যত্ন করে। বাইরের দিকে আলাদা চালাঘর বেঁধে দিয়েছে তার জন্য। সঞ্চয় একটি পয়সাও নেই। নাকি অভিশাপ আছে চোরের সুখ-সম্পত্তি দালানকোঠা হতে পারবে না। অভিশাপটা সাহেবের বেলা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। সে জন্য দোষের ভাগী যদি কাউকে করতে হয়, সে সাহেব নিজে। হাতে পয়সা এলেই ছটফট করে। পয়সা যেন পোকা হয়ে কামড়ায়। চিরটি কাল ধরে এই চলল। কোন্ উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরিণী অজানা মায়ের কাছ থেকেই বুঝি উত্তরাধিকার।

পয়লা মরসুম শেষ করে ফিরল—সেইবারের এক ঘটনা বলি। শুনলে হাসি-মস্করা করবে লোকে, বিশ্বাসই করতে চাইবে না। বংশীর চালাঘরে এসে আছে। কাজকর্ম মাঝামাঝি রকমের, কিন্তু নামযশ নিয়ে এসেছে খুব। পচা বাইটার শিক্ষা আর বলাধিকারীর আশীর্বাদ ষোলআনা সার্থক। হিসাবপত্র হয়ে ইতিমধ্যেই বখরার টাকাপয়সা এসে পড়ল। এইবারে মহাবিপদ। নামযশ থাকুক, এবং আরও বৃদ্ধি হোক, কিন্তু টাকা নিয়ে এখন কি উপায়? বংশীর বউ কক্ষনো এ জিনিস ছোঁবে না—মনের মতন করে সংসার গড়ে তুলেছে, তার উপরে পাপের দাগ লেগে যাবে। সুধামুখী নেই, নফরকেষ্টও নেই। টাকা পাঠিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হবে, দুনিয়ার উপর এমন একটা নাম খুঁজে পায় না।

আষাঢ় মাস। বর্ষাটা চেপে পড়েছে আজ ক'দিন। এমনি সময় বাবুপুকুরের কেষ্টদাস ভিজতে ভিজতে সাহেবের চালাঘরে এসে উঠল। সম্পর্কে বংশীর শালা—সেই সুবাদে কুটুম্ববাড়ি বেড়াতে এসেছে। বর্ষাকালে

ক্ষেতখামারের কাজ বন্ধ, এই সময়টা কুটুম্ববাড়ি ঘোরা ভাটিঅঞ্চলের রেওয়াজ। কুটুম্বে কুটুম্বে অনেক সময় পথের উপর ঠোকাঠুকি হয়। অর্থাৎ আমি যার বাড়ি চলেছি, সেই কুটুম্ব আবার আমার বাড়ি মুখো রওনা হয়ে পড়েছে—আমিও কুটুম্ব তার বটে। কুটুম্বপ্রীতির কারণ উভয়ত একই—আমার ঘরে তণ্ডুলাভাব, তার ঘরেও তাই। দেখা হয় উভয় মুখে একই প্রকার অমায়িক হাসি : ফুরসত পেলাম তো খবরাখবর নিতে বেরিয়েছি। হাসি মুখের উপরে, কিন্তু বুকের নিচে ধড়াস-ধড়াস করছে : মিষ্টালাপ পথে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল চালানো যাবে না—দু-জনের মধ্যে কে এখন ঘরমুখো ফেরে সঙ্গে কুটুম্বমানুষটি নিয়ে?

কেষ্টদাসের অবশ্য এ ব্যাপার নয়। মা-লক্ষ্মী এবারটা অফুরন্ত ঢেলেছেন, ধান এখনো গোলার আধাআধি। আসল গোলমালটা নিজের মনের মধ্যে। আর সেই আগের কেষ্টদাস নেই—যে বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, ভাঁটার খালে মাছ ধরে খেতে তার ঘৃণা লাগে। লাঙলের মুঠোয় হাত ছোঁয়ালেই রি-রি করে হাত জ্বালা করে এখন কেষ্টদাসের। ভাইয়েদের চাপাচাপিতে ধান রোয়াটা যা হোক করে হয়েছে। কাটবার মুখে আবার না ক্ষেতে নামতে হয়, সেইজন্য ফুলহাটা এসেছে। এবং কুটুম্বর কাছে না গিয়ে সোজা ঢুকে পড়েছে সাহেবের চালাঘরে।

এ মরসুমে ছাড়ছিনে সাহেব ভাই, তোমার পিছন ধরে চলে যাব।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিয়ে দিল। বলে, একটা খোঁজদারি করে আয় দিকি কেমন পারিস। জুড়নপুরে সেই আমাদের পুরানো মক্কেলবাড়ি—

কেষ্টদাস অবাক হয়ে বলে, এক বাড়ি দু'বার যাওয়ার নাকি নিয়ম নেই?

সগর্বে সাহেব বলে, আমার ভিন্ন নিয়ম। যুবতী নারী কারিগরে কেউটে-সাপের মতো এড়িয়ে চলে, ওঝা হয়ে সাপ আমি বশ করে ফেললাম।

দিন চারেক পরে কেষ্টদাস ঘুরে এলো। খবর ভাল নয়। পঙ্গু বুড়োকর্তা কার্তিক মাসে দেহ রেখেছেন। বাপ মরে ষোলআনা কর্তা হওয়ার পর মধুসূদন সংসারের কুটোগাছটি ভাঙে না। অহোরাত্রি অন্যায়ের সঙ্গে লড়ে বেড়াচ্ছে। গন্ধ একটু পেলে হল—পাড়ায় হোক, গ্রামে হোক, এমনকি ভিন্ন গ্রামে হলেও ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়বে। কলিযুগ ঘুচিয়ে দুনিয়ায় সত্যযুগ না এনে ছাড়াছাড়ি নেই। ফলে গোটা পাঁচ-সাত ফৌজদারি মামলার আসামি ইতি-মধ্যেই, এবং সংসার একেবারে অচল। বাগানের আম-কাঁঠালগাছ ও বাঁশ বিক্রি কোনরকমে চলছে। মা তাই নিয়ে কি বলতে গিয়েছিলেন। তুমুল হয়ে উঠল, গর্ভধারিণী সম্পর্কে নানা বিচিত্র বিশেষণ প্রয়োগ হতে থাকল। শান্তিলতা মায়ের পক্ষ হয়ে লড়তে গেল তো মধুসূদন রামদা নিয়ে তাড়া করল—কেটেই ফেলবে তাকে। মা-বোন যতই হোক ন্যায়-ধর্মের-চেয়ে আপন নয়। যায় যাক পরিবার-

পরিজন, জমি-জিরেত, আওলাত-পশার—ধর্মটা বজায় থাকুক। মা তখন সোমত্ত মেয়ে শান্তিলতাকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ি চলে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। জীবনে আর এমন ছেলের ভাত খাবেন না। পাড়াপড়শি সকলের কাছে কেঁদে বলে গেলেন।

সাহেব গুম হয়ে শুনল। জুড়নপুরের ঘরের দাওয়ায় জামাই-ভোগ খেতে বসেছিল—তারই ক'টা দিন মাত্র আগে সেই ঘরেই সিঁধ কেটে গিয়েছে। মা-ঠাকরুন সর্বনাশের ঘটনা সব বললেন: বড়লোক কুটুম্ব গা-ভরা গয়নায় বউকে রাজরানী সাজিয়ে পাঠিয়েছে—তারা ভাববে, গরিব বাপ-ভাই গয়না বেচে খেয়েছে অভাবে পড়ে। শুনে কষ্ট হয়, বমাল ফেরত দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গয়না তো গলে টাকা হয়ে গেছে তখন। সে টাকাও সুকর্মে খরচ হল—বংশী ও অন্য পাঁচজনার কাজে। আজকে খানিকটা ঋণ শোধ করা যায়, কিন্তু মা-ঠাকরুনকে পাওয়া যাবে কোথা? এই এক মজা দেখা যায়, যার নাম মনে পড়ে সেজন নাগালের বাইরে। টাকা জলে ফেলে ভারমুক্ত হতে হবে হয়তো বা শেষ পর্যন্ত।

আশালতার কিছু খবর নিলে কেষ্টদাস?—বাড়ির সেই বড়মেয়েটা?

কেষ্টদাস বলে, নবগ্রামে বরের ঘর করছে।

এটা অবশ্য জানা-ই। সোমত্ত বউ বাপের বাড়ি ফেলে রাখবে তো শঙ্করানন্দ সেই দ্বিতীয় পক্ষ করতে গেল কেন?

কিন্তু তার বেশিও আছে। কেষ্টদাস ঘুরে ঘুরে নানাসূত্রে খবর জোগাড় করেছে। গয়না-চুরি নিয়ে কেলেঙ্কারী কাণ্ড। কাঁচা-বাড়িতে চুরি হয়ে যায়, সেজন্য জুড়নপুরে তারা আর বউ পাঠাবে না। গয়না খুলে রেখেও পাঠানো চলে না। কমপক্ষে সেরখানেক সোনা গায়ে পরে বেড়াবে, নইলে আর সেন-বাড়ির বউ কিসের! অর্থাৎ মা-ঠাকরুন সাহেবকে যা বলেছিলেন, বর্ণে বর্ণে তাই তাই খেটেছে। সন্দেহ করেছে গরিব কুটুম্বদের।

কেষ্টদাস বলে, দালানকোঠা যদি সেখানে হয়, তবেই নাকি বউ জুড়নপুরে পাঠাবে। সে আর হয়েছে! কাঁচা ভিটের চাল ক'খানা ক'দিন খাড়া থাকে তাই দেখ। বুঝলে সাহেব-দা, বাড়ির লক্ষ্মী হলেন গিন্নিমা। ক'মাস তো গেছেন, এরই মধ্যে সব যেন উড়েপুড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোকে এইকথা বলতে লাগল। নিজের চোখেও দেখলাম। লক্ষ্মীমন্ত গেরস্থালি দেখে এলেছি, আজকে হতচ্ছাড়া চেহারা।

খুজিয়ালের এ হেন খবরে কারিগরের তো হাত-পা ছেড়ে বসে পড়বার কথা। সাহেবের উল্টে রোখ চড়ে যায়: মধু-বেটার ফের ঘর কাটব। চল কেষ্টদাস

তুই আর আমি, বেশি লোকের গরজ নেই।

বংশী কাজের মধ্যে নেই, কিন্তু কৌতূহল আছে—পরামর্শের মধ্যে বসে বসে শোনে। সে বলে উঠল, ঘর কেটে কষ্ট করতে যাব কেন? তোমার কাজ তো জানলা দিয়েও হবে।

মিটিমিটি হেসে কথাটা বিশদ করে দেয়: দয়ার মানুষ তুমি—দুঃখকষ্ট দেখে উল্টে মক্কেলকেই তো দিয়ে আসবে। সে কাজ জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেও তো হতে পারবে। তা মন্দ হবে না—মাকে দেবার জন্য ছোঁকছোঁক করছিলে, মায়ের বদলে ছেলেয় পাবে।

দয়ার মানুষ না আরো কিছু! কী শত্রুতা তোমার সঙ্গে বংশী, বদনাম কেন রটাচ্ছ শুনি?

বলেই ধ্বক করে সাহেবের মনে পড়ে যায়, রটনা নয়—মা-ঠাকরুনের মুখে দুঃখের কথা শুনে এসে বংশীকে সে নিজেই বলেছিল সে-বাড়ি কিছু দিয়ে আসা যায় কিনা? সেই ছেঁদো কথা হতভাগা বংশী মনে গেথে রেখেছে।

চটেমটে উঠে সাহেব বলে, মাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেয়, ছোটবোনকে কাটতে যায়—সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে নচ্ছার মানুষটার কান দুটো আমি কেটে আনব।

বংশী এবার উচ্চহাসি হেসে উঠল: তা পারো তুমি, কান কাটারই সম্বন্ধ সে মানুষের সঙ্গে।

কেষ্টদাস বলে, কি রকম—কি রকম?

বংশী বলে, তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, ঠিক তাই। শালা-ভগ্নিপতি। তোমার আমি কান মলতে পারি—কান কেটে নিলেও সম্পর্কে বাধে না। সাহেবে আর মধুবাবুতেও তাই। বোনাই হয়ে শুয়েছিল যে বোনের খাটে। একটা রাতের হলেও সম্পর্ক কিছু থেকে যাই বইকি!

সাহেবকে বলে, কান কোন্ কায়দায় কাটবে ভেবেছ কিছু সাহেব-ভাই? বোনের বেলা তো বর হয়েছিলে। সিঁধ কেটে এবারে তুমি বউ সেজে মধুর কোলের মধ্যে শুয়ে পড়বে। আদর-সোহাগ করতে করতে অজান্তে দেবে কানে পোঁচ বসিয়ে।

কেষ্টদাস হি-হি করে হাসে। সাহেব বলে, হাসিস কেন রে? পুরুষেরা কানকাটার চেয়ে মেয়েমানুষের গা থেকে গয়না খোলা অনেক বেশি শক্ত। তা-ই পেরে এসেছি। গাঙে চান করতে করতে কামটে পা কেটে নেয়। মানুষটা ডাঙায় উঠে খোঁজে, পা কোথায় গেল আর একটা? কামটের যেমন দাঁত, আমার তেমনি হল হাত। সকালবেলা উঠে মধু হাত বুলিয়ে দেখবে, কান

কোথা গেল আমার ?

পরের দিন গাবতলির হাট। হাটুরে মানুষ হয়ে সাহেব আর কেষ্টদাস শেয়ারের নৌকোয় উঠে পড়ল। গাবতলি নেমে সেখান থেকে হাঁটনা।

বিড়ি-দেশলাই কিনতে কেষ্টদাস হাটের ভিতর গেছে, ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে সাহেব অপেক্ষা করছে। এমনি সময় এক কাণ্ড।

অন্ধ নাচার বাবা, একটা আধেল দিয়ে যাও, ভগবান ভাল করবেন, দাও বাবা আধেলা—গাছতলায় এক ভিখারির একটানা আর্তনাদ। কানে তালা ধরিয়ে দেয়, শান্তিতে একটু দাঁড়ানোর জো নেই। সাহেব চলে যায় সেখানে।

আধেলা কেন, গোটা পয়সা দেবো। কোন্ পা-খানা খুঁড়িয়ে হাঁটি, সেইটে যদি তুমি বলতে পারো।

একদম দেখতে পাইনে বাবা—

পুরো আনি যদি দিই ?

এত বড় লোভনীয় প্রস্তাবে যখন দৃষ্টি খোলে না, লোকটা অন্ধ সত্যিই। এই সব গাঁ-গ্রামের লোক শহরের ফেরেব্বাজি তেমন বোঝে না। মুঠো ভরে সাহেব পয়সা নয়, আনিও নয়—নোট দিয়ে দিল তার হাতে।

গামছায় জড়িয়ে নিয়ে চলে যা।

অন্ধ বলে, কী দিলে বাবা ?

সাহেব গর্জন করে উঠল : পালা বলছি এখান থেকে। আর কোনদিন দেখি তো গলা কেটে দু-খণ্ড করব। খুনে-ডাকাত আমি।

ভয়ে ভয়ে লোকটা উঠে পড়ল। আজেবাজে কাগজ ভেবেছে। নিয়ে গিয়ে অন্য কাউকে দেখাবে। ধোঁকা দিয়ে সেই লোক গাপ করতে পারে। করে করবে—অন্ধটাই বা কী এখন আপন লোক ? আপন লোক অভাবে জলে ফেলে দিলেও ক্ষতি ছিল না।—ধরে নেওয়া যাক তাই।

বিড়ি কিনে কেষ্টদাস ফিরল। ট্যাঁকের বোঝা হালকা হয়ে সাহেব এখন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

কেষ্টদাস বলে, জুড়নপুর ওদিকে তো নয়—

সাহেব বলে, ভেবে দেখলাম মধু যা মানুষ, কান কাটলে তার আরও গরব বাড়বে। হাটের মানুষ মেরে কপাল ফাটিয়ে দিল, সেই কপালের ফুটো দেখিয়ে বলে জয়পতাকা। কান কাটলে কাটা-কান গলায় ঝুলিয়ে হয়তো বলবে মেডেল। কাজ নেই, নবগ্রামের সেন-বাড়ি যাওয়া যাক। ভদ্রলোক তারা, ভাল মুনাফা হবে।

কেষ্টদাস থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে : সেখানে তো যাইনি সাহেব-দা।

যেতে বলোনি। শোনা আছে, মস্ত বাড়ি, কাজ বড্ড শক্ত।

সাহেব বলে, সেকালে রাজরাজড়ারা দুর্গ বানাত, সেই কায়দায় বাড়ি। যাইনি আমিও। ক্ষুদিরাম ভটচাজ জানে না হেন জায়গা নেই। তার কাছে শুনেছিলাম একদিন। মস্ত বাড়িতেই তো কাজের জুত—মক্কেলের ডর থাকে না, বেহুঁশ হয়ে ঘুমোয়।

সাহেবের কণ্ঠে সহসা যেন আগুন ধরে যায়: শঙ্করানন্দ সেনের ঘরে ঢুকে দেখিয়ে আসব, গয়না পরিয়ে বউ পাকা-দালানে নিজের পাশে রাখলেও সে গয়না থাকে না। গরিব কুটুম্বদের চোর অপবাদ দিয়েছে, সে পাপের ভোগান্তি হওয়া চাই।

কেষ্টদাসের দিকে চেয়ে বলে, বড় বাড়ি বলে ভয় করে তো ফিরে যা তুই। কাজ আমি একলাও পারি।

এক একখানা কাজ নামানো সহজ নয়। পিছনে অনেক দিনের খাটনি, বিস্তর সাধনা। নিপাট ভালমানুষ হয়ে ঘোরাঘুরি করছে—চোখজোড়া আর কানজোড়া কিন্তু উঁচানো—একগণ্ডা সুঁচাল তীরের মতো। রাতের পর রাত মক্কেলের আনাচে-কানাচে। চোর দেখছে সকলকে, টের পাচ্ছে সকলের কথা—তার কথা কেউ জানতে পারে না। চোরও তাই অন্তর্যামী—অন্তরীক্ষবাসী অলক্ষ্য দেবতার সঙ্গে তফাত বড় বেশি নেই।

বুড়ো বয়সে অথর্ব হয়ে পড়ে সাহেব-চোর এই বয়সকালের কথা ভাবত। রোজগারের মন কোন কালেই নয়—যেন এক রকমের খেলা। পিতৃলোকের দিন নাকি গোটা কৃষ্ণপক্ষটা, রাত্রি শুক্লপক্ষ। দেবলোকের দিন শীতের ছয়মাস, বাকি ছয়মাস রাত্রি। সাহেবের দিনরাত্রিও তেমনি উল্টোপাল্টা। অন্য মানুষের যখন রাত্রি, তার সেই সময়টা দিনমান। কাজ বলো, আর খেলাই বলো সাহেব তখন বেরিয়ে পড়েছে। আর বেরিয়েছে পেঁচা। বাদুড় ও চামচিকে, সাপ, বাঘ। এবং অনুমান করা যায় ভূত-প্রেতরাও। আকাশে আলো ফুটে যেইমাত্র মানুষজন আড়মোড়া ভাঙছে, তাড়াতাড়ি আবার কোটরে ঢুকে যায়। সন্ধ্যার আগে আর উদ্দেশ নেই।

নবগ্রামে এত আক্রোশভরে গিয়ে সেদিন যা হল, সে এক খেলাই। সাবেকি অট্টালিকা সেনদের। জানলা নেই—আলো আসবার জন্য ছাতের কাছাকাছি ঘুলঘুলি এক একটা। যত বেঁটে মানুষই হও, সাধ্য কি দরজা দিয়ে খাড়া হয়ে ঢুকবে—ঘাড় নোয়াতেই হবে। কবাটের তক্তা বিঘতখানেক পুরু, গায়ে গায়ে গুলপেরেক বসানো। কুড়াল মারলেও কোপ বসবে না, কুড়াল ফিরে আসবে। ডাকাতের ভয়ে সেকালের বড়লোকেরা এমনি ঘরবাড়ি বানাত।

বাড়িটা যখন অটুট অভগ্ন ছিল—ডাকাত বলে কি, একটা ইঁদুর-আরশুলা অবধি ঢুকতে পারত না।

এখন আর চকমিলানো আঁটোসাটো বাড়ি নয়। বাইরের দেয়াল কতক আপনি ভেঙে পড়েছে, কতক বা শরিকেরা নিজ নিজ সুবিধা মতন ভেঙে বাড়ির মুখ এদিক-সেদিক বের করে নিয়েছে। একটা বাড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গোটা দশেকে দাঁড়িয়েছে।

গোড়ার কয়েকটা দিন খোঁজদারিতে গেল। কেষ্টদাসের গানের গলা এখানেও খুব কাজ দিয়েছে। বাইরের উঠানে বোধনপিড়িতে বসে বিনা ভূমিকায় সে রামপ্রসাদী গান ধরল একটা। একটু পরে দাসী গোছের একজন এসে ডাকে: বাড়ির ভিতর এসো বাছা, মায়েরা সব শুনতে চাচ্ছেন। প্রত্যাশাও ঠিক এই। সেনবাড়ির অন্তঃপুরের সবগুলো স্ত্রীলোকই বোধহয় কেষ্টদাসের চতুর্দিকে। আশালতার বর্ণনা দিয়েছে সাহেব, কোনজন আশালতা বুঝতে আটকায় না। কপালক্রমে আশালতার শোবার ঘরটা চোখের সামনেই—খোলা দরজায় ভিতর দেখা যাচ্ছে। কোন্ পাশে খাট, কোথায় বাক্স, পেঁটরা, কোন্ দিকটা একেবারে খালি। একখানা কালীকীর্তনেই এতদূরে এগিয়ে দিল। মায়ের দয়া বিনে এমন হয় না, বন্দোবস্ত মা-ই সব করে দিলেন।

সেন-বাড়ির দেয়ালে কাটির ঘা বোধকরি এই প্রথম। বাইটামশায় হাতে তুলে দিয়েছে, সেই পবিত্র সিঁধকাঠি। কাঠির গুণে এবং মা-কালীর দয়ায় পুরানো ইট ধুলোর মতন গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়েছে। মাখনে গড়া এক পাহাড় —তার ভিতরে সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে যেন। পাহাড়ই সত্যি—সারা রাত্রি কেটে কেটেও বুঝি দেয়ালের অন্ত মিলবে না। মালিনীর ঘর থেকে সুড়ঙ্গ কেটে সুন্দর বিদ্যার ঘরে গেল—তেমনি দীর্ঘ সিঁধ। তবে বসবার জায়গাটা বড় পছন্দসই, দেয়ালের গা অবধি ভাঁটকালসুন্দের নিবিড় জঙ্গল। সারা রাত্রি কেন, সারা বছর ধরে কেটে গেলেও কেউ উঁকি দিয়ে দেখবে না। কেটে যাচ্ছে সাহেব। কেষ্টদাস দু-হাতে ইটের গুঁড়ো সরিয়ে সরিয়ে স্তূপাকার করছে।

ভিতরের মানুষের হালচাল না বুঝে সিঁধের মুখ খুলবে না—মুরুব্বি-মশায়রা বলেন। সে মুরুব্বি সেনবাড়ি দেখেন নি। জানলা-দরজার বিচিত্র বন্দোবস্তে কারিগর এখানে অসহায়। নিশ্ছিদ্র ঘরের ভিতরে কামানের লড়াই হতে থাকলেও বাইরে মালুম হবে না। মরীয়া হয়ে সাহেব ওধারে একটু ফোকর বের করে গর্তে মাথা ঢুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে রইল।

আছে তো আছে-ই। কী এত শুনছে কে জানে, নড়াচড়া নেই—হার্টফেল করে মানুষ হঠাৎ মারা পড়ে, তেমনি কোন ব্যাপার নয় তো? অবশেষে

অনেকক্ষণ পরে মাথা বের করল। কেষ্টদাসকে বলে, ডবকা বউ আর বুড়ো বয়ে বহুৎ-আচ্ছা জমিয়েছে। ঝগড়াঝাটি এবারে।

কত গণ্ডা জোঁক গায়ে লেগেছে, দিনমানে বোঝা যাবে। অন্ধকারে সাহেবের মুখ দেখা যায় না—কিন্তু কণ্ঠস্বরে বিরক্তি নেই, স্ফূর্তির ভাব। স্বামী-স্ত্রী দুজনে নিশিরাত্রি অবধি না ঘুমিয়ে বকবক করে কাজের ভণ্ডুল ঘটিয়ে সাহেবকে যেন কৃত-কৃতার্থ করেছে।

আবার অনেকক্ষণ পরে—ঘড়ির ঘণ্টা-মিনিট ধরে কে বলবে—কিন্তু সে অনেকক্ষণ। কান পেতে আবার একটু শুনে কাঠির দুটো-একটা ঘায়ে সিঁধ শেষ করে সাহেব ঘরে ঢুকে গেল। ডেপুটি কেষ্টদাস ছুটে গিয়ে দরজার সামনে তৈরি হয়ে দাঁড়ায়। দরজা খুলে কারিগরে মাল পাচার করবে এইবার, মাল নিয়ে সে সরে পড়বে।

কোথায়! সিঁধের পথেই সাহেব তক্ষুনি বেরিয়ে এলো। কেষ্টদাসের হাত ধরে টেনে বলে, চল্। আজ হবে না, জেগে রয়েছে।

আজকে ফিরে যাচ্ছি, কাল এসে আবার হবে—তেমন ব্যাপার এসব কাজে হয় না। যাওয়া তো একেবারে চুকিয়েবুকিয়ে চলে যাওয়া। জাগ্রত মানুষের ঘরে ঢুকে বেকুব হয়ে বেরিয়ে আসা—এমন কাঁচা-ভুল শিক্ষানবিশ চোরেও তো করবে না!

কেষ্টদাস ধমকের স্বরে বলে, কী ঘোড়ার ডিম তবে অতক্ষণ ধরে শুনলে?

সাহেব হি-হি করে হাসে। আসল কথা খুলে বলা যায় না। কী করবে—ঠিক কাজের সময়টা খেলায় পেয়ে বসল যে হঠাৎ! ঘরে দুটো মানুষ—আশালতা আর শঙ্করানন্দ। দু-জনেই ঘুমিয়ে। তার আগে বেশ একচোট বচসা হয়েছে। ওটা কিছু নয়—প্রণয়ের বাড়াবাড়ি অবস্থায় হয় এমনি। আখ পিষলে তবেই মিষ্টি রস বের হয়। নিজের ঘর না-ই হল, পরের ঘরে ঘুরে ঘুরে সাহেব শিখেছে—সংসারী দশজনার চেয়ে বেশি শিক্ষা তার। বচসা করে আশালতা খাট ছেড়ে মেজের উপর আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পুরুষের শাস্তি এর উপর আর হয় না। অভাগা শঙ্করানন্দ অনেকক্ষণ খাটের বিছানায় আইঢাই করেছে, ফোঁসফোঁস করে নিশ্বাসও ছুঁড়েছে যুবতী বউকে তাক করে। বড় কঠিন মেয়ে, কিছুতে ঘায়েল হল না, উল্টে সে ঘুমিয়ে পড়ল। রণে পরাস্ত শঙ্করানন্দ কি করবে—পুরুষমানুষ হয়ে মেজেয় নেমে পড়ে কেমন করে? সে যেন একেবারে দন্তে তৃণ ধারণ করার ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। অগত্যা সে-ও ঘুমাল। সত্যি সত্যি ঘুমিয়েছে—ভালরকম বুঝে নিয়ে তবে সাহেব ঘরে ঢুকল।

রোখে রোখে ঢুকে পড়েছিল। ভুবনপুরে তোমাদের বউয়ের গয়না

চোরই নিয়ে নিয়েছে, দুর্গের মতো শক্ত ইমারতেও সে চোর ঠেকানো যায় না। হাতেনাতে দেখিয়ে যাবে সেই জেদ নিয়ে এসেছিল সাহেব। অলক্ষ্যের মা-চামুণ্ডাও যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন—স্বামীর পাশ ছেড়ে আশালতা শুয়েছে এসে ঠিক সিঁধের গায়ে। ঘুমের মধ্যে একখানা হাত এসে পড়ে গর্তের কিনারায়। হাত নয় গো, স্বর্ণলতা—হাত বেড় দিয়ে থোপায় থোপায় স্বর্ণফুল ফুটে আছে। চুড়ির গোছা ঝিনমিন বাজে নড়াচড়ায়, আঙুলের হীরার আংটি অন্ধকারে ঝিকমিক করে। বাঁক, মানতাসা, কঙ্কণ—কত কি গয়না! ডাল থেকে ফুল তোলার মতন নিয়ে নিলেই হল। ঘরে না ঢুকে সিঁধের গর্ত থেকে হাত বাড়ালেও নাগাল পাওয়া যায়।

আরও আছে। ঘুমের ঘোরে আলুথালু আশালতা। সাহেবের চোখ অন্ধকারেও জ্বলে, হঠাৎ বুঝি নিশ্বাসে তার আগুন ধরে গেল। রানীর সেই যে হাত চেপে ধরেছিল, সেদিনের মতোই বিদ্যুৎ-শিহরণ। দেহপণ্যা রানী দেবতা বলে তার মুখে চাবুক কষিয়েছিল। ভয় পেয়ে আজকে নিজে থেকেই সাহেব শামুকের মতন সিঁধের ভিতরে ঢুকে পড়ল। ক্ষণকাল চুপ থেকে মিউমিউ করে বিড়াল-ডাক ডাকে সেখান থেকে। ফলটা কি রকম দাঁড়াল—মুখ একটুখানি উঁচু করে তুলে পিটপিট করে দেখে নেয়। সুড়ৎ করে পুনশ্চ ঢুকে পড়ে গর্তে। খেলায় পেয়ে বসেছে।

বিড়ালে বড় ভয় আশালতার, বিড়াল দেখলেই সে তিড়িং করে ছিটকে পড়ে। জুড়নপুরে সাহেব দেখে এসেছিল। আবার এই ক'দিনের খোঁজদারিতে দেখল। যা ভেবেছে, ঠিক তাই। ঘরে যেন বাঘ ঢুকেছে—ধড়মড়িয়ে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে কাঁপতে কাঁপতে আশালতা খাটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুখ গুঁজল বরের বুকে। কলহ, কান্না এবং অতঃপর আলাপ বন্ধ ও শয্যাত্যাগ—পর্বগুলো একের পর এক এগিয়ে চলেছে সন্ধ্যারাত্রি থেকে। আর বাইরে ততক্ষণ অন্য দুটো প্রাণীর যাবতীয় দেহরক্ত জোঁকে ও মশায় শুষে খাচ্ছে। বার কতক বিড়াল-ডাক ডেকে মন্ত্রের কাজ হল—পলকে মানভঙ্গ ও সন্ধিস্থাপনা। যুবতীকে বুকের মধ্যে পেয়েছে শঙ্করানন্দ। জুটি হয়ে ঘুমাক এখন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখুক। সাহেব-চোরের কাজ পণ্ড, কিন্তু মজা হল বিস্তর। হাসি-হাসি মুখ করে সে সিঁধ থেকে বাইরে বেরুল।

কেষ্টদাস ক্লান্তপায়ে পিছন পিছন ফিরেছে। মনের দুঃখ সামলাতে পারে না। বলে উঠল, মানুষই যখন জেগে, কি জন্যে তুমি পুরো ফুটো কাটতে গেলে? ঘরে ঢুকতে গেলেই বা কেন?

বলা যাবে না কাউকে লজ্জার কথা। সাহেব এড়িয়ে যায়: গাছের সবগুলো

ফল কি পাকে, দু-পাঁচটা ঝরে যায়। মন খারাপ করিসনে, চল্। আবার একদিন পুষিয়ে দেবো।

এমনি খেলা কতবার হয়েছে! অন্যের কাছে বলার কথা নয়। বুড়ো হয়ে ইদানীং গল্প করে, তাই লোকে জানতে পারছে। যে-বাড়ি কাজ হয়ে গেল, অন্য কারিগরে ভুলেও সে পথ মাড়ায় না। সাহেবের ভিন্ন রীতি। একবার দু'বার যাবেই সে মক্কেলের বাড়ি। কত যত্নে কাজ নামানো—ফলাফলটা নিজ কানে না শুনে সুখ নেই। অন্যদের টাকাপয়সা হলেই হল, সাহেব জানতে চায় কাজের কারিগরি নিয়ে কি বলছে লোকে।

এক বাড়ি অমনি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছে। পড়শিরা সব জুটেছে। মক্কেল দশাসই জোয়ান। তিন-চার দিন কেটে গেছে—বামালের শোক সামলে নিয়ে মানুষটা এখন বীরত্বের কথা বলছে: জিনিস একটাও কি থাকত? ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ঘুসি খেয়ে মাজা বাঁকাতে বাঁকাতে চোর পালাল।

একতরফা বকে যাচ্ছে, অসম্ভব মুখ বুঁজে থাকা। সাহেব বলে ওঠে, আঁ-আঁ করে তো তক্তপোশের তলায় ঢুকে গেলে। ঘুসি কি সেখান থেকে?

বলেই দৌড় বনজঙ্গল ভেঙে। লোকে তাড়া করল। যে শুনবে সে-ই তো টিটকারি দেবে সাহেবক, বোকা বলবে। কিন্তু ঘুসি খেয়ে পালিয়ে এসেছে—সে-ই বা এমন অপবাদ কি করে সহ্য করে।

আর একবার।

বউটা সমবয়সী এক মেয়ের কাছে কেঁদে কেঁদে বলছিল—সাহেব কান পেতে শুনেছে। বলে, ধানশীষ-হারছড়া চোরে নিয়ে গেল। আমার মা দিয়েছিল। মা মারা গেছে, আর কোনদিন কেউ আদর করে দেবে না। নতুন উঠেছে ঐ জিনিস, খুলনা থেকে একজনেরা গড়িয়ে আনল। বলল, তোর গলায় আরও ভাল মানাবে। ভাঙাচুরো গুঁড়োগাড়া যা-কিছু সোনা ছিল, স্যাকরা ডেকে দিয়ে দিল। বানির টাকা কী কষ্টে যে শোধ করেছিল মা—

বউয়ের কণ্ঠরুদ্ধ হয়। আর বাইরে সাহেবের অনেক বেশি—দুচোখে ধারা গড়াচ্ছে। মা কোনদিন ছিল না তার—ইচ্ছে করে হাত বাড়িয়ে কোন জিনিস কেউ তাকে দেয় নি। তার পৃথিবী অন্য সকলের থেকে আলাদা। ধানশীষ-হার তখন থলেদারের হাতে গিয়ে পড়েছে। সহজে ফেরত দেবার মানুষ কি সে-জন—সাহেব কেবল তার পা দুটোই ধরেনি। উদ্ধার করে তারপর আবার বিস্তর পথ হেঁটে বউয়ের ঘরে হারছড়া ছুঁড়ে দিল। ছেলেবেলা রাণীর মাকড়ি ছুঁড়ে দিয়েছিল—এ বয়সেও সেই ছেলেমানুষী দেখলে লোকে হেসে খুন হবে। কাউকে তাই বলতে পারেনি। এখন বলে।

বাহাদুরির কাজও কি নেই, দশের কাছে যা জাঁক করে বলা যায়? লোকের মুখে মুখে সত্যি-মিথ্যে ভালো-মন্দ অনেক জিনিস তার নামে চলছে। সাহেব-চোরের নামে লোকে তটস্থ, ছড়া বেঁধেছে কত তার নামে! সেই কুমির চোর ধরার সময়টা কী হাততালি দিন কতক! চোর হ'য়ে সাহেব পুলিসের কাজ করে দিল। তা-বড় তা-বড় পুলিস থ হয়ে গিয়েছিল, এ হেন তাজ্জব কাণ্ড কী করে মাথায় ঢোকে লোকটার! এখন সবাই ভুলে গেছে। মানুষের নিয়ম হল, মন্দটাই মনে রাখে. ভাল জিনিস চট করে ভুলে যায়।

ভাঁটিঅঞ্চলের এক গাঙের বাঁকে মা-গঙ্গার আবির্ভাব হয়। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে। উৎকট নোনাজল সেই ক'টা দিন গঙ্গাজলের মহিমা লাভ করে। আসল যে পতিতপাবনী, তিনি অনেক দূরের। বাদার মানুষ সেখান কেমন করে যায়—নিয়ে যাবে কে, টাকাপয়সাও বা কোথা? দয়াময়ী সেজন্য নিজে চলে আসেন পাপী তরাতে। বছরের মধ্যে দশটা দিন—ভাদ্রের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা, ফাল্গুনেরও তাই। এই দিনগুলোয় জয়গাটা মহাতীর্থ হয়ে যায়, গঙ্গা-স্নানের জন্য অঞ্চল ভেঙে মানুষ আসে। প্রকাণ্ড মেলা বসে যায় নদীর কিনারে।

ভাদ্রের ভরা গাঙে অত্যধিক ভিড়ে খেয়া ডুবল একবার। মানুষ এখানে জলচর বটে, পেট থেকে পড়ে শিশু হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে, সাঁতারও শেখে। কিন্তু হলে হবে কি—হাঙর-কুমির পোকার মতন জল ছেয়ে আছে, তাদের মচ্ছব লেগে গেল। অনেক মরল। মেলা শেষ হবার পরেও অনেক দিন ধরে জেলের জালে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ওঠে। সরকার থেকে হাটে হাটে কাড়া দিল: হাঙর-কুমির মারলে পুরস্কার। পুরস্কার পাচ্ছেও অনেক।

ফকিরচাঁদ জেলের জালের ওস্তাদ। জলেই স্ফূর্তি, শক্ত ডাঙার মাটিতে চলেফিরে বেড়ানোয় বরঞ্চ অসুবিধা লাগে তার। কুচো-চিংড়ির কারবার—খটি আছে, চিংড়ি শুকিয়ে সেখানে বস্তাবন্দি হয়। হাঙর দুটো-একটা বরাবরই ফকিরচাঁদ নিজের প্রয়োজনে মেরে আসছে। চিংড়ি ধরবার বড় কায়দা—সরু খালের মুখ পাটা দিয়ে ঘিরে দেয়; মাছ বেরুতে না পারে। হাঙর পচিয়ে ফেলে দেয় জলে, হাঙরের প্রকাণ্ড মুখটা হাঁ করিয়ে রাখে। পচা মাংসের গন্ধে চিংড়ি সেই মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গাদা হয়ে যায়। ছাঁকনি দিয়ে সব চিংড়ি তুলে নিল তো আবার এসে জমে। দিনরাত্রি বারম্বার এই রকম তুলছে। খালের যেখানে যত চিংড়ি, আলোয় পোকা পড়ার মতন চলে আসে। চিংড়ি ধরার কাজেও তাই হাঙরের গরজ।

তার উপরে সরকারি পুরস্কারের খাতির-সম্মান ও টাকা। চিংড়ির কাজ আপাতত মুলতুবি রেখে ফকিরচাঁদ হাঙর মারতে লেগে গেল। মেরেছেও পর

পর কতকগুলো—সরকারি মহলে নাম হয়ে গেল ফকিরচাঁদের, উৎসাহ-বর্ধনের জন্য তাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হল একটা। ইতিমধ্যে ফকিরচাঁদ আবিষ্কার করে ফেলল, পুরস্কারের টাকার চেয়েও অনেক, অনেক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে গেছে হাঙরের। মরা হাঙরের পেটে যেন শক্ত শক্ত কী জিনিস—কৌতূহলে পেট চিরে গয়না পেয়ে গেল। মেলার স্ত্রীলোক চোয়ালে কেটে গিলেছে—হাড়মাস হজম হয়ে গয়না জমে রয়েছে পেটে।

সোনোরূপোর এই আজব ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়ে গেল। তারপর থেকে ফকিরচাঁদ পাগল হয়ে হাঙর মেরে বেড়ায়। গয়নার লোভে। শেষটা আর গয়না মেলে না। মেলা ফুরিয়ে গেছে, গয়না-পরা রমণী হাঙরে আর পাবে কোথা? হাঙরই অমিল—ফকিরচাঁদ পায় না, অন্যেরাও নয়। হয় মরে নিঃশেষ হয়েছে অথবা অন্য যেখানে মেলা চলছে সেইখানে চলে গেছে ভালো খাদ্যের লোভে।

শেষেরটাই ঠিক। ফাল্গুনের মেলা জমলে আবার হাঙরের উৎপাত। সময় বুঝে চলে এসেছে। পর পর কয়েকটা নিয়ে গেল। তখন আর দূরের দিকে মানুষ যায় না, ঘাটে দাঁড়িয়ে মাথায় খানিকটা জল থাবড়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানের কাজ সংক্ষেপে সেরে নেয়। তাতেও রেহাই হয় না, ঘাটে এসেই সকলের মধ্যে থেকে টুক্ করে একটাকে জলতলে ডুবিয়ে নেয়। এবারের হাঙর বিষম চতুর। বড় দুঃসাহসী!

সাহেব এসে পড়েছে মেলাক্ষেত্রে। মেলায় কিছু কাজ নামিয়ে যাবে, এই অভিপ্রায়। দেশদেশান্তরের বিস্তর নৌকো ঘাটে বেঁধে আছে, সেইসব নৌকোয় কাজ হতে পারবে।

এসে দেখে হাঙরের কাণ্ড। অতিশয় চতুর হাঙর, আবার রুচিবানও বটে। শুধুমাত্র স্ত্রীলোক নিয়েছে, পুরুষের গায়ে আঁচড়টি পড়ে নি। স্ত্রীলোকের মধ্যেও আবার বেওয়া-বিধবার কাছ ঘেঁসে না—গয়নাগাটি পরে ঝলমল করে যেসব মেয়ে-বউ। দশ বাঁক বিশ বাক পরে ভাসন্ত দু-একটা শবদেহ পাওয়া গেল—সর্ব অঙ্গ ঠিকঠাক আছে, গায়ের গয়নাই কেবল নেই।

সাহেবও স্ত্রীলোক হল। আহা, কী রূপসী বউটা গো! খরচপত্র মন্দ হল না, কিন্তু উপায় কি, সত্যিকারের মেয়েমানুষ নয়—সোহাগ করে কে তাকে শাড়ি-গয়না দেবে? পিতলের কানঝাপটা একজোড়া কিনল মেলার দোকান থেকে। জবর গয়না—কান দুটোর পুরো আয়তন ঢেকে গেছে। ভারী ভারী দুই কঙ্কণ দু-হাতে ঝিকমিক করছে। শাড়ির নিচে আরও কত কি আছে, দেখা যাচ্ছে না। বাইরের একখানা দুখানার এই নমুনা।

* গাঁ-ঘরের নির্বোধ বউমানুষ—সাঁতার কাটতে কাটতে দূরের গাঙে গিয়ে

পড়ে। কতজনে মানা করল—বউটা কালা, না কি গো? শুনতেই পায় না কোন-কিছু। জল কেটে চলেছে। এবং যে ভয় করা গিয়েছিল—হাঙর ঠিক ধরে ফেলেছে। বউও ঝাপটে ধরেছে হাঙর। হুটোপুটি, কেউ কাউকে ছাড়ে না—জলের তলে ভুড়ভুড়ি কাটছে হাঙরে আর বউয়ে। মেলার যত মানুষ নদীর ধারে এসে জমেছে। অনেক লড়ালড়ির পর বউ অবশেষে জলের উপর ভেসে উঠল। এবং হাঙরকেও ভাসিয়ে তবে ছাড়ল।

হাঙর সেই ফকিরচাঁদ জেলে—কী সাংঘাতিক ব্যাপার! মেলার ঘাটে নৌকোর ভিড়—ফকিরচাঁদ দূর থেকে ডুব-সাঁতার দিয়ে কোন একটা নৌকোর নিচে আশ্রয় নিত, তীক্ষ্ণ নজর ফেলত চতুর্দিকে। মক্কেল একটি তাক করে নিয়ে দিত আবার ডুব—আচমকা টানে মানুষকে কায়দা করে জলের নিচে দিয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটত। কুমিরও ঠিক এই প্রণালীতে শিকার ধরে। ফকির জেলে জলতলে দম বন্ধ করে বিস্তর সময় থাকতে পারে, অন্য মানুষের ততক্ষণে দু-বার তিনবার মরা হয়ে যায়। নিরিবিলি নিরাপদ জায়গায় উঠে গয়না খুলে নিয়ে মক্কেলটাকে তারপর জলে ফেলে দেয় আম খেয়ে আঁটি ছুঁড়ে ফেলার মতন।

মেলার মানুষ পরমোৎসাহে ফকিরচাঁদকে নিয়ে পড়েছে। মানুষটা ছিল অতি নিরীহ, কুচো-চিংড়ি ধরত খালে খালে, পাঁচ বছুরে ছেলেটার সঙ্গেও আজ্ঞে-আপনি করে কথা বলত। লোভ বেড়ে গেল হাঙর মারতে গিয়ে। কুচো-চিংড়ি থেকে হাঙর, হাঙর থেকে মেয়েমানুষ। হাঙরের পেটে যখন গয়না মেলে না কি করবে—নিজেকেই তখন হাঙর হতে হল।

ঝাঁকাঝাঁকি চলছে ফকিরচাঁদকে নিয়ে, জনতা পেটের কথা আদায় করছে। সাহেব ফাঁক বুঝে সরে পড়েছে। হাতের ও মুখের বেগ সম্পূর্ণ মিটে যাবার পর জনতার হুঁশ হল: প্রাণ তুচ্ছ করে এত বড় কাজ করলেন, ছদ্মবেশধারী সেই সজ্জন মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে না তো? গেলেন কোথা তিনি? মেরামতের জন্য ডিঙি একটা উপুড় করে রেখেছে খানিকটা দূরে, সাহেব-চোর সুড়ুৎ করে তার নিচে গিয়ে আরামে শুয়ে পড়েছে। আর তাকে কেউ পাবে না। দেবতারা নরহিতের জন্য কখনো দেহধারণ করেন, কাজ অন্তে বাতাসে মিশে যান। সাহেবও যেন তাই।

চব্বিশ

সাহেব-চোরের বুড়োবয়সের এই সব গল্প—বিশ্বাস যদি না করেন, নিরুপায়। সারা জন্ম কত মক্কেলের কত মাল পাচার করেছে! আকাশের তারা, পাতালের বালির মতো সাহেবের মক্কেল গোনাগুণতিতে আসবে না।

গল্প শুনতে শুনতে কৌতূহলী একজন প্রশ্ন করেছিল, এত মক্কেলের মধ্যে সকলের বড় কে সাহেব? কার ছিল সবচেয়ে দামি মাল?

সাহেব নিজের গায়ে থাবা মেরে দেখাল: আমি।

সকলের বড় মক্কেল সে নিজেই, যা কিছু তার ছিল নিজেই সে চুরি করেছে। আশ্চর্য দেহ-রূপ নিয়ে এসেছিল, সেই বস্তু অবধি। অন্য ব্যাপার সঠিক জানিনে, এই কথাটা সাহেব কিন্তু খাঁটি সত্যি বলেছে।

অক্ষম অথর্ব সে এখন। বিষ-হারানো ঢোঁড়া, লোকে বলে। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নেবার প্রয়োজনে বংশীর বাড়ি এসে পড়ে। বংশী মারা গেছে—বউ আছে, সে কখনো 'না' বলে না। সাহেবের উপর করুণা—মনে মনে একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও বটে। সাহেব না হলে সেবারের দশধারায় নির্ঘাৎ বংশীর জেল। পাপচক্রের ফেরে একবার পড়লে জীবন থাকতে রেহাই মেলে না, ছেলে-বউ-নাতিনাতনী নিয়ে এই জমজমাট সংসার কখনো হতে পারত না। সেই সব মনে রেখেছে বংশীর বউ। বাইরের চালাঘরখানায় ঢুকে পড়ে সাহেব নিজের বাড়ির মতন মাতুর বিছিয়ে নেয়। বংশীর বউ কলকেয় আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে নিতে আসে।

বছর কয়েক পরে বংশীর বউ মারা গেল। সাহেব মরবে না, মরণে ভয়। বিধাতাপুরুষ যা পরমায়ু দিয়েছেন, তার থেকে সিকি বেলাও কমতি হতে দেবে না। হপ্তায় হপ্তায় থানায় গিয়ে এত্তেলা দিতে হয়—বৈশাখের রোদ, আষাঢ়ের বৃষ্টি কিম্বা মাঘের শীত বলে রেহাই নেই। যমালয়েও এমনি তো চিত্রগুপ্তের অফিসে হাজিরা দিতে হবে, ডাণ্ডস মারবে, নরকে নিয়ে ঠাসবে। আরও কি কি করবে সঠিক জানা নেই। সরকারের জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসামি একদিন ফেরত আসে, তার কাছে জেলের ভিতরের ব্যাপার শোনা যায়, শুনে শুনে ভয় ভাঙে। নিজের যখন যাবার সময় আসে, জেনেবুঝে তৈরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যমালয়ের সেই বড় জেলখানা থেকে কোনদিন কেউ ফেরত এলো না, সেখানকার গতিক একেবারে জানা নেই। এখানে এই, সেখানকার না-জানি আরও কোন ভয়াবহ ব্যাপার। কায়ক্লেশে অতএব যত দিন সম্ভব মরণে দেরি করিয়ে দেওয়া।

বংশীর ছেলেরা সব সমর্থ হয়েছে—তাদেরই এখন ছেলেমেয়ে। বংশীর বদনাম ছিল—ছেলেরা চায় না কোনরকম তার ছোঁয়া লেগে থাকে। ধুয়েমুছে সব সাফসাফাই করেছেন—সেদিনের সম্পর্কে সাহেবও কেন আর চালাঘর জুড়ে থাকবে। রাত্রে বাড়ির উপর চৌকিদারের আনাগোনা ভাল কথা নয়। মা-বুড়ি বর্তমান থাকতে কিছু বলবার জো ছিল না, সাহেবকে যেন বাঘিনীর

সন্তানের মতো আগলে থাকত। মায়ের উপরে কথা বলবে, এত সাহস কার? সে বাধা সরেছে এতদিনে!

বড়ছেলের পেটে কিছু বিদ্যে আছে, সে ভাল সদালাপী। বিনয়ীও বটে। চালাঘরে ঢুকে পড়ে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়ে বলে, আমাদের বাবা নেই, তুমি আছ খুড়োমশায়। পর্বতের আড়ালে রয়েছি। কিন্তু পোড়া লোকের চোখ টাটাচ্ছে, সেটা বুঝি আর চলতে দেয় না।

সাহেবের মুখ শুকাল। কানাঘুসো চলছিল, আজকে এইবারে স্পষ্টা-স্পষ্টি। মিনমিন করে বলে, কি হয়েছে, কে কি বলল বাবা।

বাইরে শুধু নয়, ঘরের লোকগুলোও কম! পরের মেয়েদের বউ করে ঘরে আনলে—তারা অবধি শতেক রকম শোনাচ্ছে। ভয় ঢুকে গেছে, এই আর কি! পেটের মেয়েরা সেয়ানা হচ্ছে, বিয়েথাওয়া দিতে হবে, নানান জায়গা থেকে সম্বন্ধও আসছে—

শুধুমাত্র শেষ কথা ক'টিই যেন কানে ঢুকল। মুখের উপর হাসি টেনে এনে সাহেব উল্লাস প্রকাশ করে: শঙ্করী-পটলির সম্বন্ধ আসছে? বাঃ বাঃ, বড় আনন্দের কথা ওরা বড় ভালো।

হলে কি হবে? ঐ সম্বন্ধ অবধি—আসে আর ভেঙে যায়, এগুতে পারে না। সেই জন্যে বলি, তুমি একটা আলাদা আস্তানা দেখে নাও খুড়োমশায়। এ গাঁয়ের ভিতর না হওয়াই ভাল। নইলে বিয়ে গাঁথবে না।

বলে দিল দিব্যি এক কথায়। হায় রে হায়, তোমাদের খুড়ামশায়টির জন্য কত গাঁয়ে কত কোঠা-বালাখানা বানিয়ে রেখেছে, একটু শুধু দেখে নেবার অপেক্ষা। ইচ্ছে করেই যেন গড়িমসি করছি, ভাবখানা এই রকম।

ভক্তিমান বাবাজীবন প্রবোধ দিয়ে বলে, থাকো গিয়ে কোনখানে। মেয়ে ক'টার বিয়ে হয়ে যাক, নিজের জায়গায় তখন ফিরে এসো।

বাস, নিশ্চিন্ত। তিন ভাইয়ের একুনে সাত মেয়ে। সব কটায় বিয়ে হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে আরও সাতটার যে জন্ম হবে না, এমন কথাও কেউ বলতে পারে না। হয়ে যাক সব বিয়েথাওয়া, বাঁধা যায়গা তারপরে তো রইলোই।

জবাব দাও খুড়োমশায়—

এ হেন সদ্বিবেচনার পরে অন্য কোন জবাব হতে পারে? সাহেব বলে যাবো তাই।

কবে যাচ্ছ? গাঁয়ের মানুষ ভাংচি দেয়: চোর পোষে ওরা বাড়িতে চোরের রোজগারে খায়। এমন বাড়ির মেয়ে কে নিতে যাবে বলো। এই মাসের ভিতরেই যাবে তুমি খুড়োমশায়। শঙ্করীর নতুন একটা সম্বন্ধ আসছে।

অনেক গেছে, এটা কিছুতেই বরবাদ হতে দেব না।

হাকিমের রায় দেবার মতন স্বর। পরক্ষণেই হেসে ওঠে: চোরের রোজগারে খাই আমরা—কথা শোন একবার! কোন্ আমলে তালপুকুর ছিলো, সেটাই লোকে মনে করে রেখেছে। আমাদের খাইয়ে দরকার নেই—বিড়িটা-আসটাও যদি নিজের রোজগারে খেতে, দিনের মধ্যে কোন না দশ ছিলিম তামাক আমাদের বেঁচে যেত।

থানা চার ক্রোশ পথ। তার উপরে তিনটে খাল পার হতে হয় এবং একটা বড় গাঙ। 'সারা পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি'—শুধুমাত্র খেয়ার পারাপারেই পুরো বেলা লেগে যায়।

তারও উপরে আছে—খোঁড়া একটা পা। কতকাল আগে তিলকপুরে রাখালপতির গোলা থেকে সেই লাফ দিয়েছিল, পা মচকেছিল তখন। উত্তেজনার মুখে সেদিন আর টের পায় নি। এবং যতদিন বয়স ও কাজকর্ম ছিল, তার মধ্যেও খেয়াল করেনি তেমন। বুড়ো হয়ে পড়ে মচকানো পায়ে বাত ভর করেছে, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় হাঁটু ফুলে ঢোল।

তবু যা-হোক চলছিল। বংশীর বউ গত হবার পর বাবাজীবন এখন দিনের মধ্যে পাঁচবার সাতবার চালাঘরে গিয়ে খুড়োমশায়ের খবরাখবর নিচ্ছে। বউরা ঢপ করে ভাতের কাঁসর রেখে শুনিয়ে শুনিয়ে আর্তনাদ করে: পিণ্ডি বয়ে বয়ে পারি নে বাবা। এক মাসের কড়ার ছিল, সে মাস কবে পার হয়ে গেছে।

এর পরে একদিন ভাত আর আসে না। সাহেব ডাকাডাকি করে, কিন্তু তিনটে বউ একসঙ্গে কালা হয়ে গেছে। সাহেবের শোনাশুনি নেই—ভাত আনিয়ে তবে ছাড়ল। দুপুরবেলার ভাত রান্নাঘর থেকে এসে পৌছল সন্ধ্যার পর।

পরের হপ্তায় থানায় এসে সাহেব দারোগার কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ায়: দয়া করুন দয়াময়।

হল কি রে?

বংশীর বাড়ীর বৃত্তান্ত সাহেব আদ্যোপান্ত বলল: খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, চেয়েচিন্তে চলছে। গাছের আম-কাঁঠাল পেকেছে, তাই রক্ষে। কিন্তু সে আর ক'দিন।

দারোগা নীতিবচন ছাড়ে: সৎপথে গেলিনে, আখের বুঝলিনে। দুনিয়ার মানুষ খেয়ে-পরে সুখ-স্বচ্ছন্দে আছে, পাপীলোক বলেই তো খোয়ার তোদের।

তা বটে! সুখেই আছে বটে মানুষ—আর যদি নিজে চোখে না দেখা থাকত! সাহেবের ঠোঁট পর্যন্ত প্রতিবাদ এসেছিল, চেপে নিল। চোরে আর দারোগায় তফাৎ আছে বই কি! চোর হল সর্বজনার—ধনীর বাড়ি গরিবের

বাড়ি চোরের আনাগোনা সর্বত্র। দারোগা শুধুমাত্র ধনীজনের। ডাকাতও তাই। ডাকাত আর দারোগা সমগোত্রের—বড়লোক দেখে দেখে মক্কেল বাছাই করে। খেয়েপরে সকলেই আরামে আছে—এমনধারা কথা মুখে আসে তাই। চোর-সাহেবের কোন বাড়ি বাদ দিলে চলে না। এক এক বাড়ি এমনও ঘটেছে—পরের দিনের খোরাকির চাল রেখে আসতে হল। নইলে ছা-বাচ্চা সবসুদ্ধ উপোস।

দারোগা বলছে, বুড়ো হয়ে গেছিস, আর কেন? ঠাকুর-দেবতার নাম নে ধর্মপথে চল এবার থেকে—

কথার মাঝখানে সাহেব বলে ওঠে, যাচ্ছিলাম তাই হুজুর—

তা কি হল? ধর্ম দাড়ি অবধি এসে আর বুঝি এগোল না।

হাসি-বিদ্রূপ সাহেব কানে নেয় না। বলে, সত্যি সত্যি ভালো হতে যাচ্ছিলাম। বংশী বউয়ের ঠেলায়। না হয়ে উপায় ছিল না। জানেন না হুজুর, বড় শক্ত মেয়েমানুষ। বংশী হেন মানুষটাকেও শেষ অবধি এমনি করেছিল, দাওয়া থেকে উঠানে নামতে হলেও জিজ্ঞাসা করে হুকুম নিয়ে নিত। বংশী গেল, তার পর আমায় নিয়ে পড়ল। ঐ এক স্বভাব ছিল, ভালো না করে যেন বংশীর বউয়ের ভাত হজম হত না।

কাতর হয়ে কাকুতিমিনতি করে: ভালো হয়েই থাকতে চাই বাকি কটা দিন। ছুটাছুটিতে ঘেন্না ধরে গেছে। হুজুর তার ব্যবস্থা করে দিন।

দারোগা ঠিক ধরতে পারে না। সাহেব তাড়াতাড়ি বলে, নির্ঝঞ্ঝাটে যাতে খাওয়া-থাকাটা চলে। পাদপদ্মে সেই আমার দরকার।

দারোগা খিঁচিয়ে ওঠে: তবে আর কি—থানার উপর অন্নসত্র খুলে বসি! সরকার আমাদের সেজন্য রেখেছে।

থানায় না-ই হল, সত্র আছে বই কি! যার নাম জেলখানা। সাহেব এবারে মরিয়া হয়ে মনের মতলব স্পষ্টাস্পষ্টি বলল। দারোগার পা জড়িয়ে ধরতে যায়: তারই একটা বন্দোবস্ত পাব, আশা করে এসেছি। হাতে আপনাদের কত রকমের কায়দাকানুন, দয়া হলেই হয়ে যাবে।

আস্পর্ধা দেখে দারোগা চোখ পাকিয়ে পড়ে: দয়াটা কি জন্যে হবে বল দিকি? দয়ার পাত্রাপাত্র থাকবে না? জেলখানা পিঁজরাপোল নয়, যত বুড়ো-হাবড়া জুটে খাবেদাবে আর ঝিমোবে, সরকার সেজন্য বানিয়ে রাখে নি। সক্ষম সমর্থ মানুষের জায়গা। হতিস জোয়ানযুবো, বিবেচনা করে দেখতাম। দিতাম দশধারা ঠুকে, কি অন্য কিছু করতাম।

বলতে বলতে স্বর কড়া হয়ে উঠল: আমার এলাকা ঠাণ্ডা। জেলের

লোভে বাদ। কিছু বেচাল করতে গেছিস, পিটিয়েই শেষ করব। মামলা জুড়ে হাকিমের দরজায় নিয়ে যাব, স্বপ্নেও মনে ভাবিস নে। পোকামাকড় মারতে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাগে না।

আরও চলত নিশ্চয়। একটা লোক এই সময় তেল মাখাতে এলো। দশাসই জোয়ান পুরুষ—সেই একদা নফরকেষ্ট ছিল, তারই দোসর। জামা-গেঞ্জি খুলে দারোগা উঠানে জলচৌকির উপর বসে পড়ল। কোলকাতার আস্তাবলে সহিস ঘোড়ার ডলাইমলাই করে, সাহেব ছোট বয়সে অনেক দেখেছে। অবিকল তাই। খানিকটা ঘষাঘষির পর সশব্দে থাবা মারে ঘোড়ার পিঠে। এ লোকটাও তেমনি করছে। দেখছে সাহেব তাকিয়ে যেদিন আসতে দেখতে পায়। স্নানের আগে এসে পরম যত্নে দারোগাকে তেল মাখায়, পয়সা-কড়ির কথা ওঠে না। পয়সা কী আবার, দারোগার দেহ স্পর্শ করে তেল মাখাচ্ছে, তাতেই কৃতকৃতার্থ। একলা এই তেল-মাখানো মানুষটি নয়—ভালোমন্দ অনেক জনেরই আনাগোনা। অনুগত-আশ্রিতের অন্ত নেই। বিস্তর জন ঘুরঘুর করে বেড়ায়, কোন একটা কাজে ডেকে ধন্য করে যদি থানার মানুষ। জীবনভোর সাহেব তো কত ঘরেই ঘুরল, কত রকমের মানুষ দেখেছে সংসারে—দারোগার মতন সুখ কারো নয়। নতুন জন্মে বিধাতাপুরুষ যদি বলেন, সেবারে বিস্তর দুঃখকষ্ট পেয়েছিলি সাহেব—এ জন্মে কি হতে চাস? সাহেব এক কথায় বলে দেবে দারোগা।

সামনে পুকুর। তেল মাখানো শেষ হলে গামছা কোমরে বেঁধে দারোগা জলে নেমে পড়ল। সাঁতার কাটে খানিক। তারপর বাঁধানো ঘাটের উপর বসে রগড়ে রগড়ে গায়ের তেল তুলে ফেলছে। সাহেব সেই একখানে বসে। দারোগার সাফ জবাব পেয়ে বড্ড মুসড়ে পড়েছে সে। নিরুপায়—চোখের সামনে অন্ধকার। শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বলাধিকারী বলতেন, নানা মুনির নানা মত। দারোগাদেরও তাই। অনেককাল আগে আলাদা এক দারোগা—উমাপদ দারোগা—তাঁর কাছেও সাহেব একরকম চেষ্টা করেছিল। সেবারে হল না কাঁচা-বয়সের দোষে। আজকেও নয়—বুড়ো-বয়সের দোষে। কোন বয়সেই না হবে তো সরকার উঁচু পাঁচিলের অমন সব আহা-মরি ঘরবাড়ি বানিয়ে রেখেছে ইঁদুর-চামচিকের বসবাসের জন্যে? সাহেবের এত নামডাক—সে তুলনায় জেলের বিশ্রাম ঘটেছে অতিশয় সামান্য!

নবীন বয়স তখন। হাতেনাতে ধরে সাহেবকে থানায় নিয়ে চলল। আগে পিছে গ্রামবাসীরা। চোরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কিম্বা সমারোহে বর চলেছে বরযাত্রীর দল নিয়ে—পয়লা নজরে কেউ বুঝতে পারবে না। উমাপদ দারোগা

সেই সময়টা থানায় নেই। সাহেব-চোরকে ধরা সামান্য ব্যাপার নয়—মাতব্বরেরা বসে আছে দারোগাকে স্বমুখে শুনিয়ে বাহাদুরী নেবে। একটা তদন্তে বেরিয়েছিল উমাপদ—

আকাশের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে সাহেব বেলার আন্দাজ নেয়। উমাপদ থানায় ফিরল, এমনি বেলাই তখন। পুকুরও একটি ছিল সেই জায়গায়, পাতিহাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করছিল। অনেক দিন হলেও ঝাপসা রকম মনে পড়ে যায়।

সাহেবকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধেছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে উমাপদ সোজা তার কাছে এলো। আপাদমস্তক দেখল কয়েকবার। তারপর বোমার মতো ফেটে পড়ে—চোর-সাহেবের উপর নয়, যারা চোর ধরে এনেছে তাদের উপর।

ঠায় বসে কেন সব? বলি মতলবখানা কি? চোর ধরে থানার হেপাজতে পৌঁছে দিলে—তারপরেও কোন কাজ থাকতে পারে তোমাদের? জেল-ফাঁস-দ্বীপান্তর যা দিতে হয় সরকার বাহাদুর আছেন, সরকারি আইন আছে, তারাই সব করবে। ভিড় বাড়িও না—যাও, বিদেয় হয়ে যাও সব।

চোখ পাকিয়ে প্রবল হুঙ্কার। চোর ধরে এনে তারাই যেন অপরাধ করেছে। জেল-দ্বীপান্তরের কথা হল—দেরি করলে উমাপদ তাদেরই উপর বোধহয় সেই ব্যবস্থা করবে।

পলক ফেলতে না ফেলতে থানার উঠান খালি। আছে সাহেব আর উমাপদ। উমাপদ একদৃষ্টে চেয়ে বোধকরি সাহেবের দেহলাবণ্যই দেখছে। ভারী গোঁফের নিচে থেকে সহসা শাঁখের আওয়াজ বেরিয়ে এলো: তুই তো সাহেব। এ সমস্ত কি ব্যাপার?

আজ্ঞে, আর করব না।

রীতিমত ধমক এবারে: কি করবিনে? চুরিচামারি—মুখ দিয়েছে ভগবান, যা-খুশি একখানা বলে দিলেই হল! কেমন?

অর্থাৎ বিশ্বাস করে নি উমাপদ দারোগা। দারোগা বলে কি, একটা শিশুও তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এ ছাড়া জবাবই বা কি দিতে পারে? হেন ক্ষেত্রে সকলে যা বলে, সাহেবও তাই বলছে।

কনষ্টেবল ডেকে উমাপদ সাহেবের হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলল। শিউরে উঠে বলে, বেঁধেছে কী রকম! বুনো হাতিও লোকে এমন করে বাঁধে না। পাষণ্ড বেটারা।

সঙ্গে সঙ্গে সশব্দ হাসির তোড়ে উমাপদ দারোগার গোঁফজোড়া আন্দোলিত হতে লাগল: চুরি করবি নে—এটা কী বললি হতভাগা। ধরা পড়বি নে, সেই কথা বল্।

আজ্ঞে না, চুরিই করব না।

তা হলে চলবে কিসে রে?

সাহেব বলে, ধর্মপথে থেকে খুদকুড়ো যা জোটে তাতেই একরকম চালিয়ে নেবো।

চোখ বড় বড় করে উমাপদ দারোগা বলে কী সর্বনাশ! এত বড় ডাকসাইটে সাহেব—তোরও ধর্মে মতি? দুনিয়ায় ভরসার কিছু রইল না। তুই না হয় চালিয়ে নিবি, বলি আমাদের চলবে কিসে? যা বেটারা সব সাধু হয়ে—চাকরি খুইয়ে আমরাই তবে সিঁধকাঠি নিয়ে বেরুই?

তারপরে গলা নামিয়ে বলল: ঢং খুব দেখালি, চলে যা এইবার। ওরা সব রাস্তা-পথে গেল, পাঠক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে পড়্ তুই। দেখতে পেলে খচ্চরগুলো আবার ধরে নিয়ে আসবে।

এত কাণ্ডের পর উমাপদ দারোগা এক কথায় ছেড়ে দিচ্ছে, কানে শুনেও সাহেব বিশ্বাস করতে পারে না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উমাপদ ব্যঙ্গের স্বরে বলে, যেতে মন চাইছে না, জেলে মন টেনেছে বুঝি? জেলের বড্ড সুখ শুনেছিস, সত্যাগ্রহ করে থাকবি? জোয়ান বয়স, কাজকর্মের সময়—লজ্জা করে না এখন বুড়োহাবড়ার মতন জেলে গিয়ে ঢুকতে? সে তদ্বির বুড়ো-বয়সে, খেটে খাবার তাগত যখন থাকবে না।

একটু থেমে আবার বলে, সরকার জেলখানা করেছেনও সেই জন্যে। চোর সাধু সবাই সরকারের প্রজা—সকলের কথাই ভাবতে হয়। যেদিন অক্ষম অথর্ব হয়ে পড়বি, তখনকার আশ্রয়। কিন্তু কাঁচা বয়সেও তোরা যদি বসে বসে জেলের ভাত ওড়াবি, সরকার দুদিনে ফতুর হয়ে যাবেন যে।

উমাপদ দারোগার বিবেচনা ছিল, ভদ্রতাও ছিল। বাসাঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে উঠল: চিঁড়ে-টিঁড়ে দিয়ে যা রে বড়-কারিগরকে। পেট খালি থাকতে নড়বে না—

দারোগার বাসা থেকে জামবাটি ভরতি চিঁড়ে-নারকেলকোরা-গুড় এসে পড়ল। ভরপেট খেল সাহেব বসে বসে। ঘটিতে জল দিয়েছে, ঢকঢক করে পুরো ঘটি মুখে ঢালল। খেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ-দারোগাকে ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করে সাহেব উঠে পড়ল।

আশীর্বাদ করে উমাপদ বলে, ধর্ম রেখে কাজ করে যা। ভগবান সহায় থাকবেন, আপদ-বিপদ ঘটবে না। ন্যায্যের বেশি লোভ করিসনে। যার যে রকম পাওনাগণ্ডা ঠিক মতো দিয়ে দিবি।

বলাধিকারী মশায়ের কথাও এই। অংশের ভাগ বুঝসমঝ করে দিয়ে তবে

নিজেরটা। বড় বড় মুরুব্বি সবাই এই কথা বলবে।

উমাপদ আবার বলে, ভাল ভাল কারিগরে আমাদের প্রাপ্য আপনা থেকে হিসাব করে দিয়ে যায়, মুখ ফুটে চাইতে হয় না। দেশভুঁই ছেড়ে পড়ে থাকি, সে তো সত্যি সত্যি সরকারি শুখো মাইনে ষাটটে টাকার জন্যে নয়। সোনার-চাঁদ তোরা সব রয়েছিস, সেই ভরসায়। নিজেরা খাবি, দশজনকে প্রতিপালন করবি। তা নয়, জেলে ঢোকবার সাধ কাঁচাবয়সে! তোকে চিনতাম না কিন্তু তোর কাজের ধারা জানতে কিছু বাকি নেই। ওসব হবে-টবে না, সাফ কথা আমার। বুড়োথুখুরে হলে আসিস, জেলের আবদার সেই সময় শোনা যাবে। কথা দেওয়া রইল।

স্পষ্টভাষী ছিল উমাপদ, মানুষটা এক কথার। সে থাকলে নিশ্চয় কথা রাখত। কিন্তু গোড়ার হিসেবেই তো গোলমাল। উমাপদ দারোগা দেড়াবয়সি ছিল আমার—আমিই আজ এমন বুড়ো, কথা রাখবার জন্য থানার উপর এতকাল সে কেমন করে থাকতে পারে? কাজকর্ম ছেড়ে কবে বিদায় হয়ে গেছে। খুব সম্ভব ধরাধামেই নেই।

স্নান সেরে এতক্ষণে দারোগা উঠে আসছে। সাহেব গিয়ে ঘাটের কাছে দাঁড়াল।

এখনো আছিস তুই?

সাহেব বলে, তবে হুজুর হুকুম দিয়ে দিন, আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যাই। কালীঘাটের গঙ্গাতীরে—

ধর্মে মতি হয়ে গেল তো? আত্মপ্রসাদে ফেটে পড়ে দারোগা। বলে, হতেই হবে। আমি যদ্দিন থানার উপরে আছি, একলা তুই নোস, সব চোরছ্যাচোড়ের ধার্মিক হয়ে যেতে হবে। যখন যে থানায় গিয়েছি, ধর্মের বান বয়ে গেছে।

সাহেব বলে, তা নয়, জন্মসূত্রে আমি কালীঘাটে। মরণের পরেও দেহ আদিগঙ্গায় ভাসাবে, সেই আমার বড় সাধ।

দারোগা সহাস্যে ঘাড় দোলায়: সে কি আর বুঝিনে বাপ্? বজ্জ চোখে চোখে রেখেছি, কাজকর্মের জুত নেই। বাইরে গিয়ে হাত-পা খেলাবি, সেই মতলব। আমার মতন করে কে তোদের ঠেকাতে যাবে?

সাহেব জিভ কেটে বলে, কী যে বলেন হুজুর! শরীরের এই হাল হয়েছে, তা ছাড়া—পায়ের দিকে তাকাতে বলি কোন্ সাহসে?—একখানা পা একেবারে জখম। একঘুমের রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ি, পায়ের দোষে তা-ও এক একদিন দেরি হয়ে যায়। হুজুর তাই নিয়ে মারধোর করতে যান।

হাতের লাঠিখানা পড়ে গিয়েছিল, তুলতে গিয়ে থরথর করে হাত কাঁপে,

হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাহেব জল-ভরা চোখে বলে, দেখুন কা দশা হয়েছে চেয়ে দেখুন একবার।

যত অনুনয়বিনয় করছে, দারোগার হাসি তত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বলে, একে দিনমান চোখের উপরে কাঁপুনি বইকি! রাত্তিরবেলা ঐ হাতে হাতির বল আসে, সিঁধকাঠি ধরে মোটা মোটা দেয়াল কেটে ফেলিস। খোঁড়া পা তখন ঘোড়ার মতন চক্কোর দিয়ে বেড়ায়। ভাঁওতা দিবিনে বুঝলি? তোর কীর্তিকথা সরকারি দপ্তরে মজুত হয়ে আছে। থানায় যে যখন নতুন আসে, চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। জানতে আর-কিছু বাকি থাকে না।

কথায় ছেদ টেনে দারোগা রান্নাঘরের দিকে চলল। জমাদারকে হাঁক দিয়ে বলে টিপসইটা নিয়ে ছুটি দিয়ে দাও অদ্দুর যাবে তো আবার ফিরে।

পথে বেরুল সাহেব। দারোগা খেতে বসেছে। তারপরে ঘুম। দুনিয়া লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলেও খাওয়ার পরে লম্বা একটা ঘুম চাই। উঁকি দিয়ে দিয়ে সাহেবের চোখ রপ্ত—গরজ না থাকলেও অভ্যাস বশে সকলের সব কথা জানা হয়ে যায়। খাইয়ে-মানুষ এই দারোগাটি—এবং হাটবার আজকে, পহরবেলা থেকে হাট জমেছে। খাওয়া অতএব আজ রীতিমত গুরুতর। অন্য একজন আয়েস করে খাচ্ছে—কথাটা যতবার মনে ওঠে, ক্ষিধেটা ততই যেন দেহ ধরে ঝাঁকুনি দেয়। ক্ষিধে যেন ডাকাত—চেপে ধরেছে সাহেবকে। কবলমুক্ত হয়ে ছুটে পালাবে, কিন্তু পেরে ওঠে না অক্ষম অথর্ব মানুষ। সাহেবকে রেহাই দিয়ে ক্ষিধে ঢুকে পড়ুক ঐ দারোগার রান্নাঘরে যেখানে ভূরিভোজনের আয়োজন। সেকালে ছিল, গৃহস্থবাড়ি গিয়ে উঠলেই কিছু না হোক ভাত চাট্টি আসবেই মুখের কাছে। অতিথি অনাহারে ফিরলে গৃহস্থের অকল্যাণ। জুড়নপুরে রাতের কুটুম্বিতায় মেয়ের গায়ের গয়না হরে নিল, দিনমানে সেই বাড়ি অষ্টব্যঞ্জন সাজিয়ে ভাত বেড়ে আনে। ছাড়লেন না কিছুতে মা। এমনিই ছিল। সমস্ত সুখ এখন উড়েপুড়ে গেছে। চোর-ডাকাতের এমন যে জেলখানা, তার ফটকও খুলতে চায় না। শতেক রকম বায়নাক্কা। দুর্মূল্যের দিনকাল—নিখরচায় সরকারি অন্নের লোভে সাধুসজ্জনরাও কোন এক অজুহাত নিয়ে ঢুকে পড়েন। তাঁরাও ভিড় জমাচ্ছেন—ভালোয় মন্দয় তফাৎটা কি তবে? সাহেব তবে কষ্ট করে মন্দ হতে গেল কেন?

পঁচিশ

হাট-ফিরতি নৌকা যাচ্ছে। গাঙের কূলে সাহেব হাত তুলে দাঁড়ায়: যাবে কোথায় মাঝি?

খান পাঁচ-সাত নৌকা বহর সাজিয়ে যাচ্ছে, যার খুশি জবাব দিক। দিল তাই একজনে: কানাইডাঙা—

আমি কানাইডাঙা যাবো। একটুখানি ধরো বাবা, তুলে নাও।

মাঝি বলেছে কানাইডাঙার নাম। যদি বলত বাদাবন কিম্বা খুলনা শহর কিম্বা রসাতল—সাহেবের ঠিক একই কথা: যাবো সেখানে। সব জায়গাই সমান নিষ্ঠুর—ঠাঁই দেবে না কেউ, পেটে খাওয়াবে না। এদের নৌকায় তবু কালীঘাট মুখো খানিক পথ এগিয়ে যাওয়া হবে। কালীঘাটে রানী থাকে। ধু-ধু করা তেপান্তরের বিলে একটুকু ছায়া। কোন প্রেমিক সুধামুখীর মতন ইতিমধ্যে রানীকেও যদি কেটে গিয়ে থাকে, তবে অবশ্য চুকেবুকে গেল।

নদীকূলে দাঁড়িয়ে সাহেব কাতর হয়ে ডাকছে: খোঁড়া মানুষকে দয়া করো বাবা, বেঘোরে ফেলে যেও না।

ডাঙার দিকে মাঝি নৌকা ঘুরাল। হয়েছে দয়া। কাঁচা বয়সে চেহারাখানায় কাজ দিত। এখন বোধ করি ফুরফুরে দাড়িতে। তার উপরে রয়েছে খোঁড়া পা একখানা। চিনতে পারোনি বাছাধন—সাহেব আমি, সাহেব-চোর। নামটা কানে গেলেই হাতের বৈঠা ঠকাস করে পড়ে যাবে। আপাদমস্তক তাকাবে। পাকা চুল-দাড়ির এই নিরীহ মূর্তিটা মনে হবে ছদ্মবেশ—তাকিয়ে তাকিয়ে পোশাক-চাপা বন্যজন্তুটাকে খুঁজবে। সাহেব নাম আর সাহেব-চোরের পুরানো কীর্তিগুলোই কাল হয়েছে। ভাঁটিঅঞ্চল ছেড়ে সেই জন্যেই আরও বেশি করে পালাতে চায়। কলকাতা শহর সমুদ্রবিশেষ। কোন এক সাহেব ছিল কোন এক কালে, আবার একদিন সে ফিরে এসে ফুটপাথের উপর মুখ থুবড়ে মরে রইল, বেওয়ারিশ লাস মড়া-কাটা ঘরে চালান করে দিল, এসব খবর নিয়ে শহরের মানুষের মাথাব্যথা নেই।

চলল অতএব সাহেব কানাইডাঙা। নামটা চেনা-চেনা ঠেকে। মাঝিমাল্লারা গেঁয়ো মানুষ—নৌকায় চুপ করে থাকতে দেয় না, খুঁটিয়ে পরিচয় নিচ্ছে। হঠাৎ কানাইডাঙার যাবতীয় ঘটনা মনে পড়ে গেল। বহুকাল আগে এই গাঁয়ে গাঙ্গুলিমশায়দের বাড়ি ছোটখাট একটু কাজ নামিয়েছিল। লক্ষ্মীমন্ত বলবন্ত বুদ্ধিমন্ত অনন্ত—ভাইয়ের সব নাম। নিষ্ঠাবতী বিধবা বোন নমি। মাঝির জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে সাহেব এক মর্মান্তিক গল্প ফাঁদল: জন্ম থেকেই দুঃখ-কষ্ট—মা'কে কেটে ফেলল, বাপ নিরুদ্দেশ সেই থেকে। বউ নষ্ট। সংসার হল না, বিবাগী হয়ে তাই পথে পথে বেড়াই। খুলনায় অনন্ত গাঙ্গুলি পেস্কার-মশায়ের সঙ্গে এক সময় পরিচয় হয়েছিল, তাঁর কানাইডাঙার বাড়ি তিনি যেতে বলেছিলেন। তোমরা যখন দয়া করলে মাঝি, সেইখানেই তবে গিয়ে উঠি।

না করলে অন্য কোন দিকে চলে যেতাম।

ঘাটে পৌছতে সন্ধ্যা। নৌকা ঘাটে বেঁধে হাটুরে-মানুষ মাঝিমাল্লা সব চলে গেল। সাহেবও চলল। আম-কাঁঠাল ও পুকুরের জলে পেট ভরে, কিন্তু ভাতের তৃষ্ণা যায় না। মা-কালী, ভাত জুটিয়ে দাও চাট্টি। বৈশাখের পুণ্যমাসে গৃহস্থ শিবপূজা করে—ভাতব্যঞ্জন সাজিয়ে বাইরে রেখে দেয় শিয়ালের খাওয়ার জন্য। বংশী একবার যা খেয়ে এসেছিল। তেমনি কোন এক শিবা-ভক্ত বাড়িও পাওয়া যায় না!

বর্ধিষ্ণু বড় গ্রাম কানাইডাঙা, দালানকোঠা অনেক। গাঙ্গুলি-বাড়ি কোন পথে, এতকাল বাদে ঠাহর হয় না। গিয়ে লাভও নেই অমন ভিড়ের জায়গায়। বয়স আর অনভ্যাসের দরুন হাত-পা খেলবে না। সরঞ্জাম নেই—খেলাবেই বা কোন বস্তু হাতে দিয়ে? ছুটতেও তো পারবে না, তাড়া করলে মুখ থুবড়ে পড়বে। উৎকৃষ্ট কাজের শক্তি নেই, খুচরো এক-আধটা জুটিয়ে দাও মা-কালী। স্টিমারে সার্চলাইট ফেলে—তেমনি সাহেব এদিক-সেদিক দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে টিপিটিপি চলেছে।

চলেছে, চলেছে—কত পথ এসেছে, আন্দাজ নেই। গ্রাম বুঝি শেষ হয়ে এলো। তেপান্তর বিলের প্রান্তে ভাঁট-আশশ্যাওড়ার জঙ্গল, বাঁশঝাড়, আম-বাগান। ভিতরে ঘরও যেন একটা। এককালে রাত্রিবেলা চোখ দুটো জ্বলত, সে চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। এগিয়ে দেখে ঘরই বটে। টেমির আলো জানলা দিয়ে গাছগাছালির উপর পড়েছে। আলো নিরিখ করে সাহেব ঘরের কানাচে এসে দাঁড়াল।

ছিটের বেড়া, কাঠের চৌখুপি জানালা। ভিতরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে পুলকের সীমা থাকে না। মা-কালীর দয়া। উপোসি ভক্তের কষ্ট দেখে শিবাপুজো না হোক, ঠিক তেমনি নির্বিঘ্ন ক্ষেত্র জুটিয়ে দিলেন। মায়ের দয়া নইলে এমন হয় না।

টেমির আলোর সামনে ছোট-ছেলে আর ছোট-মেয়ে। বাঁশঝাড়ে ক্যাচকোঁচ আওয়াজ—ভূতপ্রেত দত্যিদানো বুঝি দাপাদপি করে বেড়াচ্ছে। গুটিসুটি হয়ে দুটিতে গায়ে গায়ে বসে। মেয়েটা বলে, মামামণি আসছে। দেখ না, ঠিক আসছে এইবার।

সাহেব চমকে যায়: দেখে ফেলল নাকি—তাকে দেখে বলেছে?

ছেলেটা বয়সে কিছু বড়। তড়াক করে সে উঠে দাঁড়াল। বলে, দূর, কোথায় কে? ডালপালা পড়ল কি বেজে লাফ দিল, সেই শব্দ।

জানালায় উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে বলে, ভয় পেয়েছিস তুই সোনা। দু-দু'জন আমরা, কিসের ভয়? আমার ভয় করে না—পুরুষমানুষ, একলা

থাকলেই বা কি!

সোনা মিনমিন করে বলে, ভয় কে বলল, ভয় কেন হবে?

সাহসের প্রমাণ স্বরূপ আরও জুড়ে দেয়: দু'জনই বা কেন, ভগবান আছেন না? আকাশের উপরে ভগবান রয়েছেন। একবার নেমে যদি আসেন, বেশ হয়। না রে ঘণ্টু?

হু-হু করে হাওয়া আসে বিলের দিক থেকে। আকাশে চাঁদ। চতুর্দিকে সাহেব চক্কোর দিয়ে দেখল—না অন্য কেউ নেই। শুধু ঐ ছেলে আর ঐ মেয়ে। বাড়ির যা দশা, তাতে ঐ দুই প্রাণীর উপরে থাকতে পারে বড় জোর ফুটো-কলসি ফাটা-থালা ভাঙা-গেলাস দু'চারটে ছেঁড়া কাপড়চোপড়। বাপরে বাপ, এই সম্বল নিয়েও দেখি চোরের ভয়। সাহসের পাল্লাপাল্লি শেষ করে দুটিতে সুর করে এবার চোর-তাড়ানি শ্লোক ধরল:

চোর-চোরানি বাঁশের পাতা
চোর এলে তার কাটব মাথা।
ছুটুরপুটুর লোটা কান
চৌকিদারি ঘরউঠান।
নয়া লাঙল পুরানো ইশ
বন্দিলাম দশ দিশ,
বন্দিলাম ছিরাম-লক্ষণে
ঘুরে বেড়াক চোর উঠানে।

শ্লোক এমনি তো বিষম কড়া, তায় রিনরিনে কচি গলার পাঠ। চোরের রক্ষে আছে! গেলেই তো মাথা কাটবে, উঠানে ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে উপায়টা কি! ঘোরে সাহেব এদিক-সেদিক, আর ঘরের কাছে বারম্বার এসে কথা শুনবার জন্য প্রলুব্ধ কান পাতে। নিয়মও এই বটে। ওস্তাদের হুকুম: কাজের আগে এক দণ্ডের খোঁজ তিন দণ্ড ধরে নেবে, কাজে নেমে তিন দণ্ডের কাজ এক দণ্ডে সারবে। সতর্ক দৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে দেখছে কাছে-পিঠে মানুষ আছে কিনা। সব চেয়ে কাছের বাড়ি কত দূরে।

শ্লোক পড়তে পড়তে সোনা চেঁচিয়ে ওঠে: ঘণ্টু রে, ওই দেখ—

প্রতি বছরই দেখে আসছে—দেখে দেখে এত বড় হয়েছে, তবু কিন্তু ভয় ঘোচে না। উঠান শেষ হয়ে কিছু ঝোড়ঝাড় ও উলুক্ষেত, তারপরে ফাঁকা বিল। বিল শুকনো। মাঘ মাসে ধান কাটা শেষ হয়ে গোড়াগুলো পড়ে আছে, তাকে বলে নাড়া। ক্ষেতে এবার লাঙল নামবার সময় হল, নাড়ায় আগুন দিয়ে চাষীরা ক্ষেত সাফ করে। নাড়ার ছাই সারও বটে—লাঙলের মুখে মাটির সঙ্গে

ছাই মিশে গিয়ে ফসলের তেজ বাড়ায়।

ক্ষেত ছেড়ে গ্রামে উঠবার সময় সন্ধ্যাবেলা নাড়ায় আগুন দিয়ে গেছে। ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে বিলের বাতাসে এক সময় দপ করে জলে ওঠে। সারা রাত্রি বিলময় সেই দখে ভারি ভারি জোয়ানপুরুষ আঁতকে ওঠে, এরা তো ছেলেমানুষ! আলোয়ার দল বুঝি চরে বেড়াচ্ছে ঐ—চোর-ডাকত বাঘ-ভালুক এমন কি ভূতপেত্নির চেয়েও সাংঘাতিক আলেয়া। বিল জুড়ে বিস্তর কূয়া, কূয়ার ধারে কসাড় শোলাবন। দিনমানে আলেয়ারা কূয়ার জলে অথবা শোলাবনে লুকিয়ে থাকে, রাত হলে তেপান্তরে চরতে বেরোয়। আলেয়ার চেহারাও মোটামুটি আন্দাজ আছে—কালোরঙের বিশাল গোলাকার বস্তু, গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়ায়। অবয়বের মধ্যে শুধু প্রকাণ্ড মুখ, এবং চকচকে ছোরার মতো দাঁত দু'পাটি। হাঁ করে ঘন-ঘন—মুখের ভিতর থেকে সেই সময় ভলকে ভলকে আগুন বেরোয়। নাড়ার আগুনও আছে বটে—কিন্তু ভাঁটিঅঞ্চলের আবালবৃদ্ধ সকলে জানে, অসংখ্য জায়গায় ঐ যত জলছে সবগুলোই তার আগুন নয়—আলেয়া। কোনটা আগুন কোনটা আলেয়া রাত্রির বিলে তফাত ধরবার জো নেই। চলতে চলতে পথ হারিয়ে পথিকের ধন্দ লেগে যায়। আলো দেখে ভাবে গ্রাম সেই দিকে। অথবা লণ্ঠন নিয়ে কেউ গ্রামের দিকে চলেছে। আশায় আশায় ছোটে। কাছে এসে দেখে কিছুই নয়, নীরন্ধ্র আঁধার। দপ করে ভিন্ন একখানে জলে ওঠে তখনই। ছুটল সেইদিকে। না, কিছুই নয়। আবার, আবার। একবার এদিক একবার সেদিক ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। অসহায় অবসন্ন ভয়ার্ত মানুষটা এক সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মজা তখন—সারা বিলের যেখানে যত আলেয়া কিলবিল করে মুমূর্ষুকে ঘিরে ধরে, শত শত মুখ লাগিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত শোষে। রক্তপানের পর বিষম ফুর্তি—মদ খেয়ে মাতালের হয় যেমনধারা

এক একদিন গভীর রাত্রে বিলের বাতাস প্রবল হয়ে ঝড় বইতে থাকে। আগুনের শিখা বাতাসে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়— আগুন সেদিন ঘোড়সওয়ার হয়ে বিল জুড়ে ছুটোছুটি করছে। কিছু নয়—ভোজের পরে সেই ফুর্তির ব্যাপার। বীভৎস নাচানাচি। গাঁয়ের মানুষ বিলের দিকে তাকিয়ে তখন নিশ্বাস ফেলে: আহা, কোন্ মায়ের ছেলে ঘর শূন্য করে পড়ল গো আজ রাত্রে! দিনমানে দেহ খুঁজে না-ও পেতে পারো। রক্তহীন খোলাটা খানিক লোফালুফি করে খেলার শেষে আলেয়ারা নাড়ার আগুনে ঠেলে দিয়ে গেছে।

ঘরে ঘরে বড়দের এমনি বলাবলি—এরা তো দুই শিশু। জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকে টেমির আলো কাঁপে, বেড়ার গায়ে ছায়ারা নড়াচড়া করে ওঠে।

ছায়া ওদেরই, ঘরের এটা ওটা জিনিসপত্রের।

কাঁপতে কাঁপতে সোনা আঙুল দেখায়ঃ ঐ দেখ রে ঘণ্টু, কারা সব এসেছে—

মাঝ-বিলের ভয় এবারে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। আজব চেহারার একপাল জীব ভয় দেখাচ্ছে ছোটমানুষদের। সোনার চেয়ে ঘণ্টু বছর দুয়েকের বড়। বড় হওয়ার দায়িত্ব বশে যথাসম্ভব সে সাহস দিচ্ছেঃ কিচ্ছু নয়, ভয়ের কি আছে? দেখ্ না দেয়ালে হাত বুলিয়ে। দেখে আয়—

জানলার কাছে সাহেব কান রেখে আছে। সর্বশুভ। দুটি ছাড়া তৃতীয় মানুষ নেই, নিঃসন্দেহ এখন। খোড়োবাড়ি একটা কাছাকাছি দেখে এসেছে, তা-ও জনমানবশূন্য। মরেহেজে গেছে সে-বাড়ির লোক, অথবা বিদেশ-বিভূঁয়ে থাকে? ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ছাড়া এত দূর সম্ভবে না। সর্বরকমে নির্বিঘ্ন করে কাজখানা তিনি গেঁথে রেখেছেন।

কারিগরের যেটুকু করণীয়, সেরে ফেলুক এইবারে তবে। নিমেষমাত্র লাগবে। ঘরে ঢুকে এক হাতে ছেলেটার আর হাতে মেয়েটার টুঁটি টিপে ধরে—। উঁহু, উল্টো ফ্যাসাদ তাতে। বন্ধ ঘরেই কেঁপে মরছে, বীরমূর্তি দেখলে গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে অজ্ঞান হয়ে পড়বে ঠিক। তখন খোঁজো জলের ঘটি কোথায়, শিয়রে বসে পড়ে জল থাবড়াও—

ঘরে ঢুকবার কায়দা ভাবছে। সিঁধকাঠি নেই—যা-কিছু দরজার পথে। বাইরে থেকে ঘা দিয়ে দরজার খিল ভাঙবে। চুরি নয় ডাকাতি—তা-ও করতে হচ্ছে, হায়রে হায়, দুটো অবোধ শিশুর উপরে। বাইটামশায়, স্বর্গনরক যেখানেই থাকো, আজকের কাজ চেয়ে দেখো না। আমগাছ-তলায় ভিটার উপরে ঢেঁকি—বোধ করি ঢেঁকিশাল ছিল ওখানটা। ঢেঁকির ঘায়ে ডাকাত গৃহস্থর দরজা ভাঙে—এটা খুব চলতি রেওয়াজ। পুরো ঢেঁকি একলা সাহেব কেমন করে তুলবে—ছেয়াখানাও পড়ে আছে একদিকে। কাঠের দণ্ড ঢেঁকির মাথার দিকে লাগানো থাকে, তার নাম ছেয়া। অনেক কষ্টে সাহেব ছেয়া কাঁধে তুলে নিল, ঘা দিতে হবে দরজায়। ভারী জিনিসের আঘাত ভিন্ন খিল ভাঙে না। কোমর বেঁকে যায়, এগোতে গিয়ে টলে পড়বার অবস্থা। অলক্ষ্য হাতে ধরে নাও আমায় মা-নিশিকালী।

লজ্জা করে চেপে থাকতে পারে না আর সোনা। বলে উঠল, আমার ভয় করছে ঘণ্টু।

কিসের ভয়। বললাম তো, ছায়া ওরা সব। সত্যি কিনা, হাত বুলিয়ে দেখ্ বেড়ার উপর।

প্রবোধ দিতে গিয়ে ঘণ্টুর নিজেরই গলা জড়িয়ে আসছে, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপে। বলে, যতক্ষণ ঘরের মধ্যে আছি, কারও কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ঘর হল বন্ধনতলা, বাস্তুপুজো হয় ঘরের মধ্যে। বাইরেই ওঁদের জারিজুরি, ভিতরে সেঁদোবার জোটি নেই। ঠাকুর লক্ষ্মণ তো, ঘরদোর কিছু নয়, একটু গণ্ডি মাত্র কেটে দিয়েছিলেন। অমন যে শমনদমন রাবণরাজা—সাধ্যি হল না তার ভিতরে যাবার। ভুলিয়েভালিয়ে সীতাকে বাইরে এনে তবে সীতা-হরণ। রাম-নাম কর্ সোনা, ভয় থাকবে না।

বলে সোনা কি করে সে অপেক্ষায় না থেকে ঘণ্টু নিজেই তার স্বরে রাম-রাম করে।

সোনা বলে, ভয় কিন্তু তোরও হয়েছে ঘণ্টু—

যাঃ!

হয়েছে। বুঝতে পারছিসনে।

ঘণ্টুর মুখে আর জোর প্রতিবাদ আসে না। আমতা-আমতা করে বলে দাদু এখনো এলেন না। দুজনে একা একা তো—

দু'জন কিসে? আরও আছেন—আকাশের ভগবান। এবারে সোনাই সাহস দেয় ঘণ্টুকে: ভগবান উপর থেকে আমাদের দেখছেন।

ঘণ্টু অধীর হয়ে বলে ওঠে, দেখে শুধু শুধু কি হবে? দাদুর দেরি হচ্ছে—তা আসুন না ভগবান একটু নেমে। সত্যযুগে তো কথায় কথায় আসতেন।

ঠিক এমনি সময় আওয়াজ বাইরে। ঢেঁকির ছেয়া কাঁধ থেকে সাহেব ধপাস করে ফেলে ছিল। নয়তো নিজেই আছাড় খেয়ে পড়ত। সোনার কি হল—ভয় ভেঙে গিয়ে দ্রুত জানলায় চলে আসে। আম-ডালের ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। জ্যোৎস্নার আলপনা উঠানে। তার উপরে মানুষ একজন। লম্বা দেহ। মাটিতে চলাচল যেন অভ্যাস নয়, মাটি পায়ে ফুটছে। দাওয়ার পৈঠার দিকে মানুষটা টলতে টলতে যাচ্ছে।

ও ঘণ্টু, মানুষ এসেছে রে, মানুষ!

মানুষই বটে! মানুষ দেখে সোনার বড় আহ্লাদ। ঘণ্টুর হাত ধরে টানে, সে-ও দেখুক এসে জানলায়। নিঃশব্দে এ ওর মুখে তাকলে। দেখ্, দেখ্, কী আশ্চর্য, মানুষটা দাওয়ায় উঠবেন। পৈঠার দিকে যাচ্ছেন ঐ।

ফিসফিসিয়ে সোনা জিজ্ঞাসা করে: কে রে ঘণ্টু?

ঘণ্টু গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল: ভূত-টুতও অনেক সময় কিন্তু নরমূর্তি ধরে আসে।

সোনার সে বিশ্বাস নয়। সে ভাবছে অন্য। আকাশের ভগবানের কাছে

কাকুতি-মিনতি করছিল, তিনিই বোধহয়। ভূত বলছে ঘণ্টু, কিন্তু ভগবান হতেই বা বাধা কিসের ?

জানলায় চোখ দিয়ে নিবিষ্ট হয়ে দেখে। চলেছেন দেখেশুনে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে। হবেই তো এমনি। মাটির উপরে পা দিয়ে চলা অভ্যাস নয়, আমাদের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে যাবেন কেমন করে ?

ঠাহর করে দেখে সোনা হাসিমুখে ঘণ্টুর দিকে ফিরল : না রে, ভূত কক্ষনো নয়। চাঁদের আলোয় উঠানের উপর ছায়া ফেলে যাচ্ছেন যে ! চেয়ে দেখ।

যুক্তি অকাট্য। সবাই জানে, অপদেবতার ছায়া নেই ! তাঁদের চেনবার নিরিখ হল এই। সোনা ছায়া দেখেছে, ঘণ্টুকে দেখাল।

ভূত সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে এবারে ঘণ্টু বলে, তবে বোধহয় চোর—

সোনা বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করে : চোর কেমন করে হবে ? মানুষ একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—দুই হাত, দুটো চোখ, নাক, মুখ—কোনটা নেই মামামণি যেমন মানুষ, ইনিও তাই।

সে-ও একটা কথা বটে ! তা ছাড়া চোরতাড়ানি পড়ে চোরের পথ আটক করে দিয়েছে। চোর হলে সারা রাত উঠানের উপর ঘুরতে হবে, দাওয়ায় উঠতে হবে না বাছাধনের। সে-ও এক পরীক্ষা।

সোনা বলে, ঐ যে তুই ভগবানকে আসতে বললি, সত্যযুগের নাম করে খোঁটাও দিলি আবার। লাজে-লজ্জায় তাই আসতে হয়েছে।

ধৈর্য ধরতে পারে না সোনা। প্রশ্ন করে : কে ?

সাহেব থতমত খেয়ে যায়। মিষ্টি কচি গলা—অন্তরাত্মা তবু কেঁপে ওঠে। জবাব হাতড়ে পায় না ! জড়িত কণ্ঠে বলে, আমি—আমি—

দেবতাগোঁসাইরা বেশি কথা বলেন না। আত্মপরিচয় দেবেন না তো, বেশি বললে মিথ্যে বলতে হয়। বুদ্ধিমানে ঐ সামান্য থেকেই বুঝে নেবে।

ইতিমধ্যে জবাব কিছু ঠিক হয়েছে। সাহেব বলে, বিদেশি মানুষ আমি তোমাদের অতিথি—

রামায়ণ-মহাভারতের সব কথা জানা এদের। ভাঁটির দেশের কোন ছেলেমেয়ে না জানে ? সোনা বলে, রামচন্দ্র—বুঝলি রে ঘণ্টু ? গুহকের বাড়ি রাম হঠাৎ এমনি অতিথি হয়েছিলেন।

ঘণ্টু প্রণিধান করে বলে, দূর ! রাম কত বড় বীর—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললে দেখিস না ? রাম বুঝি খোঁড়া ?

ঐ রীতি ঠাকুর-দেবতার। খোঁড়া হয়ে, কানা হয়ে, কুটে হয়ে দেখা দেন ষোলআনা আসল মূর্তি হলে সে তেজ লোকে সামলাতে পারবে কেন ?

আড়ালে পড়ে গেল এই সময় সাহেব। জানলায় ভাল দেখা যায় না তো সোনা খিল খুলে সন্তর্পণে দরজা একটু ফাঁক করে দেখে। বলে, ঠিক বলেছিস রে ঘন্টু। রামচন্দ্র নয়, বাল্মীকি মুনি। রামায়ণের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ, একেবারে আসল। তেমনি দাড়ি, তেমনি বড় বড় চুল। রামচন্দ্র বাল্মীকিকে পাঠিয়ে দিলেন।

মুখ বাড়িয়ে এবারে সোজাসুজি ডাক দিল: আমাদের ভয় করছে। এসে বসবে একটু? অতিথি হয়েছে, খেতেও দেবো। দু'জন আছি—আমি আর ঘন্টু। আমরা বাইরে যাব না কিন্তু—ঘর ছেড়ে এক পা-ও বেরুবনা। তুমি চলে এসো।

দুই বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ঘরের ভিতর ডেকে নিচ্ছে। দরজা ভাঙতে হল না, কোন রকম ঝামেলা নেই, আপনা-আপনি সব হয়ে যাচ্ছে মন্ত্রের মতন। সাহেব-চোরকে ঘরে ডাকছে, হেন তাজ্জব কাণ্ড ভাবতেও পারে না কেউ। মা-কালীর করুণা। কত কাল হয়ে গেল মা, কালীঘাটের কালীক্ষেত্র ছেড়ে এসেছি—ভাঁটি অঞ্চল তো ভিন্ন এক দুনিয়া—অনাথ অধম সন্তানকে এত দূরেও নজর ফেলে দেখছ।

ঘরের মধ্যে এসে সাহেব এদিক-ওদিক তাকায়। যা ভেবেছে—দৈন্যের অবস্থা, জিনিসপত্র বলতে থালা-ঘটি-বাটি আর প্রকাণ্ড এক টিনের তোরঙ্গ। খাসা ফুটফুটে মেয়েটা কিন্তু, আট-হাতি নীলাম্বরী পরে গিন্নিবান্নির মতো দেখাচ্ছে···আরে আরে, হার চিকচিক করছে গলায়—হারের সঙ্গে লকেট। কেমিকেল নয়, আসল সোনা—নজর হেনেই সাহেব বলতে পারে। সেদিন নেই—সেই যে রানীর ঝুটো মাকড়ি মুঠোয় নিয়ে বুড়ো-স্যাকরার কাছে গিয়েছিল। থলেদার যত ছ্যাচড়াই হোক, এ জিনিস একশটি টাকা না দিয়ে পারবে না। ভাল থলেদার হলে অনেক বেশি দেবে। যে ক'টা দিন জীবনের মেয়াদ আছে, এতেই চলে যাবে। আর কিছু করতে হবে না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করে, বাড়ির অন্য সবাই কোথা?

ঘন্টু বলে, একজন তো মোটে—আমার দাদু। সোনার হলেন মামামণি। আমার বাপ-মা কেউ নেই—ঐ দাদু। সোনার মা নেই, বাপ আছে—সে বাপ এখানে থাকে না।

বকবক করে ঘন্টু আরও বিস্তর পরিচয় দিয়ে যায়: গাঙুলি-বাড়ি দাদু কাজ করে। ফিরতে এক-একদিন রাত হয়ে যায়, ততক্ষণ গোপলার মা থাকে। আজ গোপলার মা রান্না করছিল—এমনি সময় খবর এলো, গোয়ালে গরু তুলতে গিয়ে গোপলাকে ষাড়ে ঢুঁশ মেরেছে। গোপলার মা বেরুল। দুজন আমরা একা।

খিদে পেয়েছে, বাচ্চা-ছেলে তো—নির্ভয় হয়ে ঘন্টুর এতক্ষণে সেটার হুঁশ

হল। সোনার দিকে চেয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে, ভাত-ডাল সবই তো এঘরে। খেয়ে নিলে হয় কিন্তু।

আর দেরি কেন সাহেব। এক টানে মেয়ের গলার হার ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ো। মরুক ছুটোয় চেঁচিয়ে। ডাকঘরের মধ্যে মানুষ নেই। মানুষ জমতে জমতে তার মধ্যে তুমি বিল পাড়ি দিয়েছ।

ঘণ্টু বলে চলেছে, গোপলার মা থাকলে খাওয়া কখন হয়ে যেত। পিঁড়ি পেতে গেলাসে জল পুরে সুন্দর করে সে ভাত বেড়ে দেয়।

সোনাকেই যেন ঠেশ দিয়ে বলা নতুন মানুষটির সামনে।

সোনা ঝগড়া করে: জল পুরে পিঁড়ি পেতে আমি বুঝি দিইনে কখনো? গোপলার মা-র চেয়ে ভালো ভাত বাড়ি আমি।

এবং প্রমাণস্বরূপ তখনই সশব্দে ছুটো পিঁড়ি ফেলে হাঁড়ি টেনে এনে সাহেবকে সাক্ষি রেখেই যেন ভাত বাড়তে বসল। একমনে ভাত চেপে চেপে মোচার মতো মাথা সরু করে তুলছে।

কাজকর্মের মধ্যে কাঁধের কাপড় পড়ে যায় একবার, সোনার হার বেরিয়ে টেমির আলোয় ঝিকমিকিয়ে ওঠে। লহমার দেরি নয় সাহেব। মা-নিশিকালী সামনে এনে ধরেছেন, ছিঁড়ে নাও গাছের ফলের মতো।

মাছুরে বসেছিল সাহেব, তড়াক করে উঠে সেই ভাতের জায়গায় সোনার কাছে চলে গেল। হাত বাড়িয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা বাঁ-হাতের ছোঁ মেরে ধরে ফেলে সাহেবের হাত। ধরে এই টান—কী টান রে বাবা, কত শক্তি ধরে এইটুকু মেয়ে, থানার সিপাহির কড়কড়ে মুঠোর চেয়ে শক্ত।

হকচকিয়ে সাহেব বলল, কী হচ্ছে?

পিঁড়ি দেখিয়ে সোনা হুকুমের স্বরে বলে, বসে পড়ো। খাবে, অতিথি যে তুমি। অপর পিঁড়ির দিকে নির্দেশ করে ঘণ্টুকে বলে, তুইও বোস। ছু'জনে খেয়ে নে তোরা।

কত বড় গিন্নি যেন! হাতা কেটে কেটে ডাল দিচ্ছে। ঘাড় বেঁকিয়ে ঘণ্টুকে বলে, ভাত বাড়া কেমন হয়েছে বললিনে যে ঘণ্টু? গোপলার মা-র চেয়ে ভাল কি না বল।

কৃপাময়ী মা-জননী। সারা দিন পেটে দানা পড়ে নি, সেই ব্যবস্থা জননী সকলের আগে করে দিলেন। পিঁড়ির উপর বসে সাহেব ভাত ভেঙে নিয়েছে। পিঁড়িতে বসে ভাত খায় নি কতদিন—কালীঘাট থেকে পালিয়ে বেরুল। নফরকেষ্টর সঙ্গে, তারপরে পিঁড়ি এই প্রথম। উহু, আর একবার—জুড়ানপুরে আশালতার বাপের বাড়ি। সেই বাড়ির মা পাশে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছিলেন,

আশার বোন শান্তলতা পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে দিয়েছিল। না না, আরও তো আছে। সুভদ্রা-বউ পিঁড়ি পেতে ভাত বেড়ে সামনে খাওয়াত

ভাত নয়, পাথরের কুচি যেন। গরুর মুখে দিলে মুখ ফিরি নেবে। সারা দিনের পর সেই ভাতই অমৃত সাহেবের কাছে। খেতে খেতে বুড়োমানুষ সাহেবের দুচোখে জলে ঝাপসা হয়ে আসে। গর্ভধারিণী মা গলা টিপে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিল, বংশীর বাড়ির বউরা খাওয়া বন্ধ করে পথে তাড়িয়ে দিল। তাই বলে জন্মটা কী করলি হারামজাদিরা! দুনিয়া জুড়ে আমার মা ছড়ানো। আশালতার বুড়ি মা ছিলেন, আবার একফোঁটা এই সোনা মেয়েটাও। মা হবার বাছ-বিছার নেই—হঠাৎ কোন একখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। বয়সেও ধরা যায় না।

ঘণ্টু বলে, তুই বসলিনে কেন সোনা?

পরে—

আবার পরে কেন? ক্ষিধে নেই?

বা রে, মেয়েলোক না আমি? মেয়েরা তো পরে খায়। খেয়ে ওঠ তোমরা আমি তার পরে।

কোন দিকে না তাকিয়ে সাহেব গবগব করে খেয়ে যাচ্ছে। নিরুপদ্রবে ভাত খাওয়া দস্তুরমতো বাবু হয়ে বসে। বলে, ডাল দে আর একটু।

সোনা নড়ে না। বিরক্তভাবে মুখ তুলে সাহেব হতভম্ব হয়ে যায়। খাচ্ছে সে—থালা থেকে ভাত তুলে মুখে তোলা অবধি যাবতীয় প্রক্রিয়া সোনা নিষ্পলক চোখে দেখছে। ঘণ্টুরও তাই—নিজের খাওয়া ভুলে হাঁ করে সাহেবের দিকে তাকিয়ে। বড় আরামে খেয়ে যাচ্ছে, পরিমাণের তাই আন্দাজ করতে পারে নি। খাওয়াটা অসঙ্গত রকম বেশি হয়ে গেছে।

খাওয়া থামিয়ে সলজ্জে সাহেব বলে, এই যাঃ আমিই সমস্ত খেয়ে ফেললাম।

সোনা সকরুণ হেসে বলে, ডাল যা ছিল তোমায় দিয়েছি। আর চাইলে হবে না।

সাহেব, কি জানি কেন, হঠাৎ রেগে উঠল: কেন আমায় খেতে বসালি তবে? এ কি তোর মেনিবিড়াল সে চুক-চুক করে ডাকলি আধ-ঝিনুক দুধ পরিতোষ হয়ে খেয়ে চলে গেল। খেয়েছি, বেশ করেছি। আরও খাব, যতক্ষণ পেটে ধরে খেয়ে যাব।

বলতে বলতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পিঁড়ি থেকে। হাত-মুখ ধুয়ে মাদুরে গিয়ে বসল। ভাগ্যিস মুখ তুলেছিল, নইলে যা গতিক—একটি কণিকাও তো পড়ে থাকত না মেয়েটার জন্যে।

ঘণ্টুর খাওয়াও শেষ। এমনি সময় জোর বাতাস দিল। উঠানের আম-তলায় টুপটাপ টুপটাপ আম পড়ে একঝাঁক।

ঘণ্টু ছটফট করে: তলায় অনেক আম পড়ে আছে, সেই সন্ধ্যে থেকে পড়ছে। সোনা যে ভয় পায়—সেই জন্যে দুয়োর খুলতে পারিনি।

সে ভয় কোন অতীতের কথা। আগন্তুক নতুন মানুষের সামনে ভীরু অপবাদ সোনা ঘাড় পেতে নেবে কেন? মুখের ভাত ক'টা গিলে ফেলে সোনা তাড়াতাড়ি বলে, ভয় আমার না তোর?

বেটাছেলে—আমার নাকি ভয়! বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে ঘণ্টু সাহেবকেই সাক্ষি মানল: বলে কি শোন। দেখাই তা হলে—একলাই গিয়ে কুড়িয়ে আনি, দাঁড়াতে হবে না। এ তো ঘরের উঠোন—একা একা বড়বাগ পর্যন্ত গিয়ে আম কুড়োতে পারি।

দরজার কবাট আলগা করে দিল দু-দিকে। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে। তিড়িং করে ঘণ্টু দাওয়ায় পড়ল। সেখান থেকে উঠানে। পেয়েছে আম কয়েকটা। আরও খুঁজছে।

সোনা একেবারে একা। এইবারে সাহেব নিজমূর্তি ধরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ো, মজা বুঝুক সাহেব-চোরকে ঘরে ডেকে আনার। কিন্তু একলা আছে বলেই কাজে ঝাঁপ দিতে হবে, তার মানেটা কি! না হয় দু'জনই হল—মেয়েটা আর ছেলেটা। দুটো ছেলেমানুষকে কায়দা করতে পারব না, সত্যিই কি এমন দশা আজ আমার? ক্ষিধের অন্ন সামনে নিয়ে বসেছে, খাওয়ার মধ্যে ভণ্ডুল দিতে নেই। অতি-বড় শত্রু হলেও নয়। মেয়েটার গলার হার ধরতে গেলে হাতের মধ্যেই এসে রয়েছে। থালার ভাত ক'টা শেষ হতে দাও, পলকের মধ্যে ছিঁড়ে নিয়ে বেরুবো।

উল্টে সাহেব অভিভাবকের মতো ঘণ্টুকে ডাকাডাকি করছে: এই দেখ, ম্যাচ-ম্যাচ করে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরছে। ঘরে আয়। উড়ো-কাল এখন, সাপখোপ জন্তু-জানোয়ার বেরোয়। সাপ না হল, চেলা-বিছেয় তো কামড়াতে পারে।

সোনাও ডাকছে, যা পেয়েছিস নিয়ে চলে আয়। সকালবেলা দুজনে মিলে ভালো করে কুড়োব।

খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে—যায় কোথা রে সোনা? বাইরে কোথাও নয়—তক্তাপোশের বিছানা থেকে ছোট্ট বালিশটা নিয়ে ঝুপ করে সাহেবের মাদুরে শুয়ে পড়ল। ঘুম ধরেছে বুঝি—না, কি? কচি তুলতুলে হাত একটা এসে পড়েছে সাহেবের কোলে। গলার হার গায়ে ফুটছে। মা-কালীই তো করাচ্ছেন সোনাকে দিয়ে—হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিতে আলস্য, হার সেজন্য গায়ের উপরে

লেপটে ধরেছেন। গিনিসোনার জিনিস—লকেটে দামি পাথর বসানো। সাহেবের গা শিরশির করে ওঠে। কিন্তু হল কি বল তো, হাত একেবারে অসাড়! পা খোঁড়া, হাত দুটোও কি নুলো হয়ে গেল বুড়ো হয়ে? কী সর্বনাশ!

মেয়েটা আবদার করে: গল্প বলো একটা। মামামণির কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমরা ঘুমোই।

ভারি মজা তো! গল্প না হলে মহারানীর ঘুম হবে না—বকবক করে চালাও এবারে গল্প। সাহেব-চোর গল্প বলার লোক, এমন আজগুবি কথা কোনদিন কেউ ভাবেনি। সাহেব নিজেও না। মা-মরা মেয়ে বলে মাতুলমশায় আদর দিয়ে মাথায় তুলেছে। ইচ্ছে করে ত থাপ্পড় কষে গল্প শোনার শখ ঘুচিয়ে দেয়।

করে ঠিক বিপরীত। সাহেব হেন মানুষের কণ্ঠে স্বর যতদূর মোলায়েম করা সম্ভব, তেমনিভাবে বলে, কিসের গল্প শুনবি?

সোনা বলে, ভূতের—

ঘণ্টু ছুটে এসে সাহেবের গা ঘেঁসে ওপাশে শুয়ে পড়ল। সোনাকে তাড়া দিয়ে ওঠে: রাত্তিবেলা ওসব কি? বাঘের গল্প হবে।

সোনাও ছাড়বার পাত্র নয়: বাঘের তো নামই করে না কেউ রাত্তিরে। চরে ফিরে বেড়ায়—নাম করলে ভাবে, ডাকছে বুঝি কেউ। ঘরের মধ্যে চলে আসে। তবে তুমি চোরের গল্প করো—

চোরও তো মনে ভাবতে পারে—

সাহেব ভাবছিল, আজেবাজে গল্পে হুঁ-হাঁ দিতে দিতে এখুনি ঘুমিয়ে যাবে, নির্গোলে কাজ সেরে বেরুবে তখন। চোরের নামে চমকে উঠল।

ঘণ্টু বলছে, চোরও ভাবতে পারে তাকে ডাকছে। ঘরে ঢুকে পড়বে। রাত্তিরবেলা চোরেও তো চরেফিরে বেড়ায়।

এইবার সাহেব বলবার কথা পেয়ে যায়। বেজার মুখে বলে, হুঁ, চরতে দিল আর কি! সে এককালে ছিল বটে! এখন বিশ হাত অন্তর থানা, পাড়ায় পাড়ায় চৌকিদারের উপরে দফাদার।

বলে কী ফ্যাসাদে পড়ল। চোখ বুঁজে ছিল সোনা—কৌতূহলে চোখ মেলে বলে, আমায় দেখাবে চোর? কি রকম দেখতে তারা—বাঘের মতন, সাপের মতন?

বলেছে মেয়েটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। বুকে হেঁটে সিঁধের গর্তের ভিতর দিয়ে চোর ঘরে উঠল—তখন সে সাপ বই আর কি! বাড়ির লোকে টের পেয়ে হৈ-হৈ করে বেরিয়েছে—নিরুপায় চোর হঠাৎ তখন বাঘ হয়ে হামলা দিয়ে

পড়ে। আরও আছে। পালাচ্ছে চোর—দৌড় দৌড়! চোর এবার হরিণ। দৌড়ে গিয়ে ঝপ্‌পাস করে গাঙে পড়ল, জোয়ারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। চোর এবারে কুমির। ভবসংসারে যত জন্তু-জানোয়ার, সমস্ত মিলেমিশে তবেই এই একটা চোর।

ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে সোনা। হঠাৎ সোজাসুজি প্রশ্ন: তুমি কে?

সাহেবের মুখ শুকাল। কাঠগড়ার আসামি যেন উকিলের জেরায় পড়েছে। চটপট মিথ্যে আত্মপরিচয় বানিয়ে কত কত জায়গায় বেঁচে এসেছে, রক্ষে নেই আজকের এই একফোঁটা মেয়ের কাছে। কথা বেরোয় না মুখে, আমতা-আমতা করছে: আমি, আমি—

মেয়েটাই আবার উদ্ধার করে দিল। হাসছে ফিক-ফিক করে। বলে, ঝণ্টু বলেছিল ভূত। ভূত মানুষের রূপ ধরে আসে—তাই বলে কি এমন খাসা মানুষ। ঘণ্টু বোকা—না?

ঘণ্টু বলে, আর তুই বললি দেবতা। শুধু-মানুষই বা কেন হবে না?

তর্কে পারবে সোনার সঙ্গে! বলে, মানুষ হয়েও দেবতা বুঝি হওয়া যায় না। ওঁরা সব কি ছিলেন শুনি?

বেড়ার গায়ে নানান ছবি আঠা দিয়ে আঁটা। কীর্তি এই দুজনেরই। ছবি নিয়েছে রামায়ণ থেকে, মহাভারত থেকে—রামের হরধনুভঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জুন, এমনি সব। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবিও এর মধ্যে। আঙুল তুলে সোনা সেইসব দেখিয়ে দিল।

আরে সর্বনাশ, মনে মনে সাহেব শতেক বার জিভ কাটে। সাহেবের কথার মধ্যে লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে এঁদের সব দেখায়। অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল সাহেবের। জীবন মারগুতোন কত খেয়েছে, তাতে এমন হয়নি। মারের কষ্ট এতদূর নয়। রানীর ফাইফরমাস জোগান দিয়ে ছেলেবেলায় দিন কয়েক দেবতা হয়েছিল। কোন নির্ণিরীক্ষ স্থানের আসল-দেবতা মহাপাপীকে সেদিন বুঝি অভিশাপ দিলেন—বুড়োবয়সে মরতে বসেও এখনো শাপমুক্তি ঘটেনি।

তবে দেখ্ কেমনধারা এই দেবতা! দেবতার লীলাখেলা মনের মধ্যে চিরজন্ম গাঁথা হয়ে থাকবে। শুয়ে পড়েছে সোনা একেবারে গাঁয়ের উপর, হাঁ করে কথা শুনছে, হাত এগিয়ে গলার হার সাহেব শক্ত মুঠোয় ধরেছে—

খোলা দরজায় সেই সময় মানুষ ঢুকে পড়ল। নাটকীয় আবির্ভাব। ঘণ্টু ধড়মড় করে উঠে বলে, দাদু—। সোনা এক কাণ্ড করে—গলার হার খুলে চক্ষের পলকে মাদুরের নিচে ঢুকিয়ে দিল।

সাহেব পাথর হয়ে গেছে। চিনতে মুহূর্তকাল দেরি হয় না—মধুসূদন।

আশালতার ভাই—জুড়ানপুরের সত্যসন্ধ গোঁয়ার মানুষটা। ন্যায়ের নামে অঞ্চল সুদ্ধ যে লড়ে বেড়াত। কপালের উপর সেই আঘাতের দাগ, যাকে বলে জয়তিলক। সাহেবের চেয়ে অনেক বেশি বয়স, দেহ নুয়ে পড়েছে। কিন্তু রাজার রাজমুকুটের মতো কপালের ক্ষত হাজার মানুষের মধ্যে আলাদা করে চিনিয়ে দিচ্ছে।

মধুসূদন তাকিয়ে পড়ে সাহেবের দিকে। সাহেব নির্ভয়। কতক্ষণেরই বা দেখা সেই রেল কামরার মধ্যে! বছর ধরে দেখা থাকলেও আজ চিনত না। নতুন বয়স তখন—যে দেহরূপ ছিল, জলেপুড়ে তার চিহ্নমাত্র অবশেষ নেই। বলিরেখা সারা মুখে জাল বুনে রাত্রি-জাগা কাহিনীগুলো অবোধ্য অক্ষরে লিখে দিয়েছে। তার উপরে আকণ্ঠ চুল-দাড়ি। যে বিধাতাপুরুষ এত যত্নে গড়েপিঠে ভবধামে পাঠিয়েছিলেন, তিনি পর্যন্ত সাহেবকে আজ চিনতে পারবেন না। দেখুক মধুসূদন যতক্ষণ খুশি। সুধামুখী বেঁচে থাকলে চেহারা দেখে সে-ও বোধকরি চিনত না।

মধুসূদন বলে, কে তুমি? ঘণ্টুর দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করে: কে রে?

ঘণ্টুর আগে সোনা-ই গড়গড় বলে, ভয় করছিল মামামণি। ইনি যাচ্ছিলেন, ডাকাডাকি করে নিয়ে এলাম। বড্ড ভালো। কত সব গল্প হল এতক্ষণ ধরে।

যা-কিছু বলা উচিত, সোনা একাই কেমন গুছিয়েগাছিয়ে বলে যায়। ঘণ্টু বলে, এত দেরি করলে কেন দাদু?

বিয়ের কাজকর্ম বাবুদের বাড়ি। আজকে তবু তো আসতে পেরেছি—কাল বউভাত, কাল আর ছেড়ে দেবে না।

তারপর মধুসূদন বলে, খেয়েছিস তোরা?

ঘণ্টু বলে, ডাল নেমে গেছে, সেই সময়টা গোপলার খবর এলো—

বলতে বলতে আরও কি বলে বসে—বোকা ঘণ্টুকে বিশ্বাস নেই—নিজেরা না খেয়ে অতিথি খাইয়েছে, বেরিয়ে না পড়ে কথাটা। সোনা আগ বাড়িয়ে বেশি বেশি করে বলে, খেয়ে পেট টনটন করছে মামামণি। শুয়েই পড়লাম খাওয়ার চোটে।

ভয়ানক রকম খেয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ প্রাণপণ চেষ্টায় ঢেকুরও তুলল একটা।

সাহেব উঠে পড়ল। দাওয়ায় নেমে বলে, তোমার মামামণি এসে গেছেন, যাচ্ছি এবারে সোনা।

আজেবাজে কথায় কাজ নষ্ট করে এলো। নিজের গাল চড়াতে ইচ্ছে করে সাহেবের। তবে একটা মুনাফা, ভাত খেয়ে এসেছে—পিঁড়ি পেতে বাবু হয়ে

পরিতৃপ্তির ভাত হাওয়া। খাচ্ছে, আর বিড়বিড় করে মা-কালীর উদ্দেশে তার চিরকালের অনুযোগ জানায়ঃ পরমায়ু শেষ হয়ে আসে, সাচ্চা-মন্দ তবু হতে দিলে না। সত্যপথের পথিক মধুসূদন, অসতের সঙ্গে চিরকাল লড়ে বেড়ায়। তার দুর্গতির মনে বোঝা যায়—এখন কষ্ট, পরিণামে স্বর্গসুখ। কিন্তু আমার কি—ইহকালে এই হেনস্থা, পরলোকের জন্য যমদূত তো মুকিয়েই আছে। নাকের নিশ্বাসটুকু বন্ধ হলেই চুলের মুঠি ধরে কুম্ভীপাক-নরকে নাকানি-চোবানি খাওয়াবে।

ছাব্বিশ

আজকে হল না তো কাল—কাল রাত্রে সুনিশ্চিত। মধুসূদন কাল ঘরে ফিরবে না, ধীরেসুস্থে কাজ করতে পারবে। সমস্তটা দিন সাহেব, ঠিক কানাই-ডাঙা গাঁয়ের উপর না হয়ে, এদিক-সেদিক ঘুরল। জুড়নপুরের বাস ছেড়ে মধুসূদন অনেক দিন এখানে ঘর বেঁধেছে—খোঁজখবর পেতে অসুবিধা নেই। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি এক কাঠাও নেই এখন, মামলা মোকদ্দমায় গেছে। শত্রুকে লোকে অভিশাপ দেয়, ঘরে যেন মামলা ঢোকে—জুড়নপুর থাকতে মধুসূদন ফৌজদারির ফৌজদারি লড়ে বেড়িয়েছে। তার উপরে যমের মার—ছেলে ছেলের-বউ তিন দিনের আগপাছ বসন্ত রোগে মারা গেল। স্ত্রী আর একফোঁটা নাতিটাকে নিয়ে পেটের দায়ে অবশেষে এইখানেএসে কাজ নিয়েছে—গাঙ্গুলিদের গোমস্তাগিরি। মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে ন্যায়ধর্মের খ্যাতিটা সদর অবধি ছাড়িয়েছিল, পেস্কার অনন্ত গাঙ্গুলি ডেকে তাকে কাজটা দিল। দুঃখের আরো আছে স্ত্রী মারা গেল বছর কয়েক পরে, এসে জুটল অনাথ ভাগনীটা। হবে না হবে না করে আশালতার বেশি বয়সের মেয়ে—ঐ সোনা। সাহেবের মতোই সোনা মায়ের মুখ দেখেনি, প্রসব হতে গিয়ে আশালতা মারা গেল। শঙ্করানন্দ বিবাগী হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘোরে, শ্মশানে শবসাধনা করে এমনও শোনা যায়।

পরের সন্ধ্যায় সাহেব তাড়াতাড়ি বলে এসেছে। গৌরচন্দ্রিকা নয়, চটপট কাজ হাসিল করে সরে পড়বে।

ঘণ্টু বলে, গোপলার মা আছে, সোনার আজ ভয় করবে না।

শুকনো মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাহেব বলে, কই গোপলার মা, কোথায় সে?

ছ্যাৎছোৎ করছে রান্নাঘরে, শুনতে পাও না? রাঁধছে।

দেখতে পেয়ে সোনা ছুটে এসে হাত জড়িয়ে ধরেঃ কাল শুধু ডাল-ভাত

খেয়ে গেছে, খাবে কিন্তু আজ। মামামণি আসবে না, অনেকক্ষণ ধরে আমরা গল্প করব।

সেকালে সেই আশালতায়   ছোট্ট নাতনিটির
উঠলেন। খাওয়ানোর জন্যে তিনিও আঁকুপাকু করেছিলেন একদিন। কিন্তু যে কাজে এসেছে—সোনার গলা যে খালি!

ব্যাকুল হয়ে বলে, হার কি হল তোর?

সোনা বলে, হার পরে আমায় ভাল দেখাচ্ছিল না? বলো তুমি—

খুব ভালো। যেন রাজকন্যে—

মিছাও বড় নয়। রূপবতী বলে থাকি আমরা শুধু একটা মেয়ে ধরেই নয়—সে মেয়ের গায়ে গয়না পরনের কাপড়চোপড় পায়ের আলতা কপালের টিপ একসঙ্গে সমস্ত মিলিয়ে মিশিয়ে। ঝুটো-মাকড়ি পরেই বা রানীর কী বাহার খুলত! সব মেয়েরই তাই।

সাহেব বলে, হার খুলে রাখতে গেলি কেন রে? না-ই পারবি তো গয়না কিসের।

মুখ ম্লান করে আশালতার মেয়ে বলে, হার আমার নয়। মামামণি পরশুদিন এনেছে, ঐখানে রেখে দিয়েছে।

বাঁশের খুঁটির উপরটা দেখায়। খুঁটির খোলে যখন তুলে রাখছে, পিটপিট করে আমি দেখে নিলাম। ঘণ্টু গাছে চড়তে পারে, কাল ঐ খুঁটিতে উঠে পেড়ে দিয়েছিল। আর দেবে না, বজ্জাতি করছে আজ।

ঘণ্টু বলে, টের পেলে দাদু মেরে ফেলবে। কাল তো ধরেই ফেলত আর একটু হলে। তাড়াতাড়ি মাদুরের তলে গুঁজে দিল। তবু আক্কেল হয় না।

সোনা কাকুতিমিনতি করে: আজকে তো আসবেই না মামামণি। একটিবার দে। উনি এত ভাল বলছেন, হার পরে দেখিই না একটু আয়নায়। তক্ষুনি আবার খুলে দেবো। বিষ্ণের কিরে—এই বকুলতলায় বসে দিব্যি করছি।

ঘণ্টু গুম হয়ে আছে। সোনা তখন সাহেবকে বলে, তুমি উঠতে পারো না? দেখো, পড়ে যেও না আবার—

দেহ জীর্ণ, পা খোঁড়া—তবু কাজের মধ্যে আর এক মূর্তি। লম্ফ দিয়ে সাহেব উঠে গেল উপরে। হাতের মুঠোয় লকেটসুদ্ধ হার। একশ টাকা কি—দাম তিন-চারশ'র নিচে নয়।

দুয়োর খোলা, বেরিয়ে পড়লেই হয় এবার। কিন্তু গলা বাড়িয়ে আছে অবোধ মেয়েটা। মেয়ে আশালতার—অনেক কাল আগে যার যৌবন-ভরা দেহ বঞ্চনা করে গয়না খুলে খুলে নিয়েছিল। চোর হয়ে গয়না কেবল খুলে খুলেই

নিলে সাহেব, চোখ বোঁজবার আগে একজন কাউকে পরিয়ে দেখবে না! হায় রে হায়, সাহেব-চোরেরও সাধ!

হার পরিয়ে সত্যি সত্যি সুন্দর দেখায় সোনাকে। আশালতা ছিল নিশি-রাত্তের ঘুমন্ত মেয়ে, তার মেয়ে সাঁজের বেলা হার গলায় পরে আয়নায় দেখছে। আর এক ছোট্ট মেয়ের মুখ মনে এলো—পোশাকের দোকানে মোমের পুতুলের মতো বড় ঘরের মেয়েটা, সঙ্গে দুর্গাপ্রতিমার মতো তার মা। নফরকেষ্টর হাত্তের খেলায় পছন্দর জামা খুলে দিতে হল মেয়ের গা থেকে। বড়দের বেলা আটকায় না, ছোটমানুষের গায়ের জিনিস খোলা বড় কঠিন কাজ।

আজও করতে হত তাই। সাহেব নিশ্চয় করত। কিন্তু মা-কালী বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন।

মধুসূদন রাত্রের মধ্যে ফিরবে না এরই মধ্যে এসে পড়ল। আগেপিছে বোধকরি গাঁয়ের অর্ধেক মানুষ—কোমরে দড়ি বেঁধে হৈ-হৈ করে তাকে নিয়ে এলো। দস্তুরমতো মারধোর হয়েছে—মুখের একটা দিক ফুলে চোখ একেবারে ঢেকে গিয়েছে। কপালের পুরানো দাগটার নিচে। যৌবনে চৌকিদার ঠেঙানোর ঐ দাগ—অন্তিম বয়সে না-জানি কোন অন্যায় রুখতে গিয়ে আবার নতুন জয়-পতাকা জুটিয়ে আনল।

সেই মূর্তি দেখে সোনা ডুকরে কেঁদে মামামণির দিকে ছুটে যায়। গাঙ্গুলি বাড়ির ছোটবাবু অনন্ত পুরোবর্তী। সে ধমক দিয়ে উঠল: এইও তফাত যা—সরে যা—

ফণা-তোলা সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে। ভীষণ এক বাচ্চা-গোখরো।

কেন বেঁধেছে আমার মামামণিকে? দড়ি খোল কষ্ট হচ্ছে—

ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনা মধুসূদনের উপর। দড়ি ধরে টানাটানি করে: খুলে দাও, খুলে দাও। গরু-ছাগলের মতো কি জন্যে মামামণিকে বেঁধে আনবে?

অনন্ত খিঁচিয়ে ওঠে: চোর-ছ্যাচোড়কে বাঁধবে না তো ফুলের মালা পরিয়ে পূজো করবে?

চোর!

যেন চাবুক খেয়ে সোনা পিছিয়ে আসে। খানিকটা সরে এসে সবিস্ময়ে মধুসূদনের দিকে চায়। যেন এক নতুন মানুষ দেখছে। অনতিস্ফুটকণ্ঠে বলে, চোর মামামণি?

ভিড়ের থেকে কে যেন বলল, না না, এ মানুষ চুরি করবে, তাই কখনো হয়! ভিতরে অন্য-কিছু আছে।

অনন্ত বলে, আমিও তাই ভেবেছিলাম। অন্য সবাইকে সন্দেহ করেছি—

যে মানুষ অন্যায়ের সঙ্গে লড়ে সর্বস্ব খুইয়েছে, তার কথা মনে আসে কি করে? কিন্তু আমার আড়াই বছরের মেয়ে দেখিয়ে দিল—সে তো আর মিছে কথা বলবে না। হাকিমের সামনে আইডেন্টিফিকেশন-প্যারেড হয়, তেমনি ব্যাপার আমাদের বাড়ি। পরে অবশ্য নিজেও স্বীকার করল—অভাবে পড়ে নাকি করে ফেলেছে।

স্বীকারটা কি ভাবে করল, মুখের উপরেই তার সুস্পষ্ট চিহ্ন। এত মানুষের ভিতর বোধ করি কিছু লজ্জা হয়েছে অনন্তর। বলে, ভাল বংশের একজন মুরুব্বি-মানুষ— তাঁর কাণ্ড দেখে মেজাজ থাকে না। অভাবের কথা আমাদের বললেই হত, মাইনে কিছু বাড়িয়ে দিতাম। তাই অসৎপথে মতি যাবে—ছিঃ-ছিঃ

বলছে অন্য কেউ নয়, খুলনা কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত পেস্কার অনন্ত গাঙ্গুলি। ভিড়ের লোকেরাও যা মুখে আসে বলছে। ভণ্ড পামরের উপর সকলেরই জাতক্রোধ (নিজের প্রতিচ্ছবি পায় বলে নাকি?)।

সোনার পলক পড়ে না, একদৃষ্টে চোর দেখছে। কই, চোর হয়েও এক তিল বদল হয়নি মামামণি। মুখের দিকে অবোধ করুণ চোখদুটো তুলে আবার প্রশ্ন করে: মামামণি, তুমি চোর?

চোরাই-মালের খোঁজে তোলপাড় ওদিকে। মধুসূদন খুঁটির মাথা দেখিয়ে দিয়েছে, নেই সে বস্তু। বারবার হুঙ্কার দিচ্ছে অনন্ত: কোথায় বের করো শিগগির। ঘরের জিনিসপত্র তচনছ করছে, রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ভাঙছে। বস্তায় চাল ছিল চাট্টি—উঠানে ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

সোনা হঠাৎ অনন্তর কাছে ছুটে গিয়ে পড়ে। দু-চোখে ধারা গড়াচ্ছে, কাতর দৃষ্টি মেলে কেঁদে কেঁদে বলে, মামামণি চোর নয়। ওদের বলে দাও ছোটবাবু, মামার বাঁধন খুলে দিক।

কাপড়ের নিচের হার খপ করে এঁটে ধরে অনন্ত চেঁচিয়ে ওঠে: এই যে—দেখ তোমরা। আড়াইবছুরে মেয়ে আমায় ঠিক ঠিক চোর ধরিয়ে দিল। এই সে জিনিস।

সাহেব ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে। আমতলা পার হয়ে ঝোপের ভিতরে চলে যায়। কয়েক পা গিয়েই বিল। খুশি মতন আ'লের আড়ালে বসে পড়লে, মানুষ কোন ছার, যমদূতেও খুঁজে পায় না। কিন্তু পা দুটো কে যেন আটকে দিল। এই বীরত্বের আসরে কথাবার্তা কেউ খাটো গলায় বলছে না। চোরের নামে মধুসূদনের যে উৎকট ঘৃণা! ট্রেনের কামরার সেই কথাগুলো: চোরের অল্পস্বল্প শাস্তি নয়—ফাঁসি লটকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে।

সেই মানুষটা নিজেই আজ চোর হয়ে যাচ্ছে!

হার হাতে নিয়ে অনন্ত গর্জায়ঃ লকেটে নাম লেখা আছে, এই দেখ। আমার মেয়ের হার চুরি করে ভাগনির গলায় পরানো হয়েছে।

সাহেব এসে বলে, পেন্নাম হই গাঙ্গুলিমশায়। ও হার আমি পরিয়ে দিয়েছি। বল্‌রে সোনা, কে পেরিয়েছে। সত্যি কথা বলবি। সাহেব আমি। নাম শোননি?

[মা-কালী, মন্দ হবার জন্য ছোট বয়স থেকে মাথা খুঁড়ছি—দুনিয়া জুড়ে সকলের ভাল করে বেড়াচ্ছ, আমার বেলা মন্দটুকুও সরল না তোমার!]

জরায় জীর্ণ বুকের উপর থাবা মেরে সাহেব বলে, আমি সাহেব-চোর। কাজখানা দেখেও বুঝল না কেউ?

সোনার দিকে চেয়ে হেসে বলে. চোর দেখতে চেয়েছিলে খুকি, দেখে নাও। চোখ বড় বড় করে দেখ। এত বড় চোর তল্লাটে আর নেই।

জনতার আক্রোশ ফেটে পড়ে। মাথা ঘুরে সাহেব পড়ে যায়। মসীময় করাল স্রোত—ধাক্কা মেরে যেন তার মধ্যে ফেলে দিল। বিশ্বসংসার ডুবে গেছে সেই আবর্তে। তীরের বেগে সাহেব ভেসে চলল। অন্ধকারের সমুদ্রে নিয়ে ফেলবে লহমার মধ্যে। সাহেব আঁকুপাঁকু করে। মরলে হবে না—যমদূত সেখানেও ডাণ্ডস নিয়ে তৈরি। সে নাকি আরও নিদারুণ! বাঁচাতেই হবে, না বাঁচলে রক্ষা নেই।

যেন বাতাসে খবর হয়ে গেল, সাহেব-চোরকে ধরে গাঙ্গুলি-বাড়ি নিয়ে আটক করেছে। যজ্ঞিবাড়ি এমনিই বিস্তর লোক, এখন লোকারণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলে মধুসূদনের পক্ষে। ন্যায়ের জন্য জীবন দেয় মানুষটা, কপালের উপর সেই জয়তিলক বয়ে বেড়াচ্ছে—নির্যাতনের চোটে কী একটা কথা বলল, সেইটেই মেনে নিতে হবে!

অনন্ত বলেছে, মধুবাবু ছাড়া কাছাকাছি অন্য কেউ আসেনি, আমি বিশেষ খোঁজখবর নিয়েছি—

বড়ভাই লক্ষ্মীকান্ত চটে গিয়ে বলেন, মধুসূদন না হয়ে আমি যদি কাছাকাছি থাকতাম, আমাকেও ঠেঙাতে ঐ রকম?

লজ্জিত অনন্ত বলে, মধুবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ব্যস্ত হয়ো না দাদা। পঁচিশটা টাকা দিয়ে দেব। মলম-টলম লাগিয়ে দু-দিনে ঘা সেরে নেবেন।

এমনি সময় নমিতা বেরিয়ে এলো। আহ্নিকে বসেছিল, সেজন্য দেরি। সরে গিয়ে সকলে পথ করে দেয়। বয়সে প্রৌঢ়া হয়ে শুচিবাই আরও বেড়েছে, বকের মতন লম্বা পা ফেলে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এসে দাঁড়াল। গাঙ্গুলিবাড়ির

সম্ভ্রম বিবেচনা করে বুদ্ধিমান অনন্ত প্রেমপত্র ও গয়নার ব্যাপার চেপে গিয়েছিল সেবার। বাড়ির মধ্যে গোপন তর্জন-গর্জন হয়ে থাকবে, বাইরে কিছুই প্রকাশ নেই।

নমিতার চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে: মাগো মা, কী সাংঘাতিক চোর মচ্ছবের বাড়ি ঢুকে টিপিটিপি কাজ সেরে পালাল, কারো একটিবার চোখে পড়ল না।

সাহেব প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ খুলে নমিতাকে দেখে। টিপিটিপি আরও যে একদিন ঢুকেছিলাম পুণ্যবতী ঠাকরুন, চিনতে পারো না? চোখে ধারা গড়িয়েছিল, পা ধরতে যাচ্ছিলে, ধর্মবাপ বলেছিল।

কিন্তু দুই ঠোঁট একত্র করে দাঁতে দাঁত চেপে সে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। ভালোরা ভালোই থেকে যান—দাগি মানুষ আমরা সজ্জনদের কলঙ্কের দাগ ভাগ করে নেবো। ভালো তো সবাই—যতক্ষণ না ধরা পড়ে যাচ্ছে। সে ধরা ক-জনেই বা পড়ে!

জনতার ভালো লোকেরা শাস্তির নানান রকম পন্থা বলছে। কেউ বলে, আর এক-পা খোঁড়া করে হাত দুটো মুচড়ে ভেঙে নুলো করে ছেড়ে দাও।

অন্য জনে জুড়ে দিল: তারপর বস্তায় পুরে ডাঙা-মুলুকে ফেলে দিয়ে এসো। বেড়াল যেমন বাড়ি থেকে বিদায় করে।

চোরের উপর আক্রোশ সর্বজনার। আর এক ভালো লোক বলে, ডাঙা-মুলুক জ্বালিয়েপুড়িয়ে মারবে, নুলো করে দিয়ে ঠেকাবে না। বস্তায় মুখ বেঁধে মাঝগাঙে ফেলে দিয়ে এসো, শাস্তি!

কোন যুক্তি খাটল না। চোরের কপালটা ভালো। থানার ছোটদারোগা পাশের গাঁয়ে তদন্তে এসেছিল, সাহেব-চোরের কথা শুনে নাম কেনবার লোভে দলবল নিয়ে এসে পড়ল। খাতা বের করে সকলের মুকাবেলা নাম-ধাম-বিবরণ লিখে নিচ্ছে।

নাম কি তোর?

গণেশচন্দ্র পাল—

সাকিন?

সাহেব চুপ করে থাকে। একটু যেন হাসির ঝিলিক মুখের উপরে।

সাকিন বলিস না কেন রে? ভাল চাস যদি ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যা।

সাহেব বলে, একটা সাকিন পাকা আছে হুজুর, সেই মাত্র জানি। এখানে নয়, ওপারে গিয়ে। কুম্ভীপাক-নরক। দুনিয়ার উপর আমার কোন সাকিন নেই।

কি লিখে নিল দারোগা, কে জানে। লিখে সাক্ষিদের সই নেওয়া হল।

কাজ চুকিয়ে, আসামি নিয়ে চলে যাচ্ছে এবার। নমিতা কি কাজে একটু ভিতর দিকে গিয়েছিল, ছুটে এসে পড়ে: খাওয়া হল না যে!

দারোগা একগাল হেসে বলে, ব্যস্ত হতে হবে না। আপনাদেরই তো খাচ্ছি। তদন্তে যেখানে গিয়েছিলাম, তারা ছাড়ল না। গলায় গলায় হচ্ছে। নেমতন্ন তোলা রইল দিদি, আর একদিন এসে হবে।

নমিতা বলে, আপনার না হল দারোগাবাবু, এ মানুষ যে উপোসি। বাড়িতে বউভাত, নতুন বউ জনে জনের পাতে ভাত দিয়ে বেড়াল—

চোরের পাতেও ভাত দেবেন নাকি?

আবদারের স্বরে নমিতা বলে, আপনাকে একটু বসতেই হবে। একমুঠো না খাইয়ে আমি ছাড়তে পারব না।

চোখ বুঁজে সাহেব দেয়াল ঠেস দিয়েছিল, চকিতে চোখ মেলে তাকায়। দুশ্চারিণী ভণ্ড স্ত্রীলোকটির কণ্ঠের মধ্যেও আশালতার মা কথা বলে উঠলেন। যেন সুধামুখীর গলা, বউঠান সুভদ্রার গলা। বলাধিকারীকে মনে পড়ে অনেক দিনের পর। স্ত্রী ভুবনেশ্বরীকে দেখেছেন, কাজলীবালাকে দেখেছেন, হদ্দমুদ্দ নিজেও চেষ্টা করছেন। একদিন বুঝি বড় হতাশ হয়েই কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল: মানুষ জাতটারই দোষ রে! চেষ্টা যতই করো, মন্দ হবার জো নেই। সুধামুখীর ঘরে ঠাণ্ডাবাবুও নাকি এমনি সব বলতেন: অমৃতের পুত্র—মরতে সবাই গররাজি।

উৎসব-বাড়ির পেট্রোমাক্স আলোয় তাকিয়ে দেখল, নমিতার বড় বড় চোখের সজল দৃষ্টি তার উপরে। মারের চোটে ঝিম হয়েছিল সাহেব, স্ফূর্তি পেয়ে হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ভালোর অভিশাপ একলা তার উপরেই নয়। এ জীবন বিস্তর ভালো চোখে পড়েছে। যাদের দেখেনি তাদের মধ্যেও কত না-জানি রয়েছে। দেখে যাদের মন্দ ভেবেছে—তিলকপুরের মন্দাঠাকরুন যেমন—আজকে মনে হচ্ছে, ঢং দেখিয়ে তারা মন্দ সেজে বেড়ায়। দায়ের মুখে ভালো মূর্তিটা বেরিয়ে পড়বে। অমৃতের বেটা-বেটি সব, ভালো না হয়ে উপায় আছে? মানুষ যতকাল আছে, জাতের স্বধর্ম বয়ে বেড়াতে হবে।